Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১ম সংখ্যা। | ১লা মাঘ, বুধবার, ১৩৪২ সাল, ১৮৫৭ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 15th. January, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্মোৎসবের পরমদেবতা! নববিধান যেমন স্বর্গের নিখুঁত ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ তোমার দান, ইহাতে মানবীয় কোন গন্ধ নাই, তেমনই নববিধানের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি, প্রতিষ্ঠানগুলি তোমারই সাক্ষাৎ ইচ্ছা-সম্ভূত স্বর্গের ব্যাপার। নববিধান-ক্ষেত্রে তোমার স্বর্গের ব্যবস্থা-সম্ভূত যতগুলি অনুষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে মাঘোৎসবরূপ মহা মহোৎসব ব্যাপার, মনে হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। নববিধানে তোমার প্রেরিত মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণরূপে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তোমারই ইচ্ছা ও প্রেরণাতে পরিচালিত হইয়া, এই মহা মহোৎসবের কার্য্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা যন্ত্র হইয়া, হে পরম যন্ত্রী! তোমার হস্তে ব্যবহৃত হইতেন; এ মহা ব্যাপারের কোন কিছুর মধ্যে তাঁহাদের আপনাদের ইচ্ছা রুচি বাসনার সামান্য অভিব্যক্তিরও অবকাশের সম্ভাবনা থাকিত না। উৎসবের আগাগোড়া, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই স্বর্গের প্রেম পুণ্যের সুগন্ধে, স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য প্রদর্শন করিত। তখনকার মাঘোৎসব ছিল বিশ্বাসী ভক্তের প্রাণে পৃথিবীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ-দর্শন, সাক্ষাৎ স্বর্গ-সম্ভোগ। ছোট বড় যে সকল সেবক ও কর্ম্মিগণের যোগে এই উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাঁহারা নিজেরা ছিলেন দীনাত্মা, তোমার কৃপার একমাত্র ভিখারী। তাঁহারা জানিতেন, তোমার কৃপা ভিন্ন তাঁহাদের জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে এ স্বর্গীয় ব্যাপারের কিছুই সম্পন্ন হইতে পারে না। এখনও নববিধান-ক্ষেত্রে তোমার সাক্ষাৎ জীবন্তলীলা চলিতেছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। এখনও জীবন্ত উৎসবদায়িনী জননীরূপে তুমি উৎসব-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা যথার্থ দীনাত্মা ও তোমার কৃপায় একমাত্র ভিখারী হইয়া, এই মহা মহোৎসব ব্যাপারের সকল কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, এবং তোমার স্বর্গীয় ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া তোমারই ইচ্ছাকে উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গরূপে, অনুষ্ঠান-রূপে, আকার দান করেন, তোমার লীলাধীন হইয়া তোমার লীলাকেই উৎসবের ব্যাপাররূপে অভিব্যক্ত করেন। তাই কাতরপ্রাণে তোমার শ্রীপদে ভিক্ষা করি, আমাদের সকলকে এই উৎসব-ক্ষেত্রে দীনাত্মা কর, তোমার কৃপার একমাত্র ভিখারী কর। তোমার শ্রীহস্তের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আমরা উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করি; তোমার কৃপার একমাত্র

ভিখারী হইয়া এই উৎসবের সমস্ত ব্যাপার তোমার শ্রীহস্তের স্বর্গীয় প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া, সম্ভোগ করিয়া জীবন ধন্য করি।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

—:—

মাঘোৎসবে সাদর আহ্বান।

আমাদের অতি প্রিয় এবং পুণ্য-স্মৃতিমাখা মাঘোৎসবরূপ মহা মহোৎসব সমাগত। অতীতের এবং বর্ত্তমান কালের, স্বদেশের এবং বিদেশের স্বর্গবাসী ঋষি আত্মা, যোগী আত্মা, ভক্তাত্মা, বিশ্বাসী সাধু আত্মা, প্রেরিত মহাজন আত্মা সকলের সমাগম ভিন্ন, কি পৃথিবীতে স্বর্গের মহা-মহোৎসব সম্ভব হয়? আবার দূরের, নিকটের, যেমন নববিধান-বিশ্বাসী পরিবারের সকলের শুভাগমন, তেমনই আদি-সমাজের, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সকলের শুভাগমন ও সকলের সম্মিলন ভিন্ন কি নববিধানক্ষেত্রের মহা মহোৎসব সম্ভব হয়? সুধু তাহাতেও নহে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, জানিত, অজানিত, সকল বিশ্বাসী মণ্ডলীর শুভাগমন ও উৎসবক্ষেত্রে মিলন ভিন্ন কি নববিধানক্ষেত্রের মহামহোৎসব সফল হয়? আবার মানবসমাজের পতিত, ঘৃণিত, ত্যাজ্য, অস্পৃশ্য নরনারীর অনুতপ্তহৃদয়ে, কাতরপ্রাণে আগমন ভিন্ন কি নববিধানের উৎসব পূর্ণ হয়? যখন নববিধান ঘোষণা হইল, তখন অতি স্পষ্ট ভাষায় ইহাও ঘোষণা করা হইল যে, আদিসমাজ, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজও নববিধানের অন্তর্গত। তখন ইহাই ঘোষণা করা হইল, যে কোন ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত বিশ্বাসী এই নববিধানের অন্তর্গত। অতএব ইঁহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া আমরা উৎসব করিতে পারি না। যাঁহাদের শারীরিক ভাবে আসা সম্ভব হয়, আসিবেন; শারীরিক ভাবে যাঁহাদিগের আসা সম্ভব না হয়, তাঁহাদিগকেও প্রাণে লইয়া, সমস্ত জগদ্‌বাসীকে হৃদয়ে পূরিয়া নববিধানের মহা মহোৎসব, পুণ্য মাঘোৎসব আমরা সম্পন্ন করিব। কাহাকেও বাদ দিলে, কাহাকেও প্রাণ হইতে দূরে রাখিলে, আমাদের উৎসব সুসম্পন্ন হইবে না। আমাদের উপাস্য দেবতা বিশ্বপিতা, বিশ্বজননী যিনি, তিনি গুরু হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, নিজ মুখে বলিয়াছেন, তোমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনের উপাসনা পর্য্যন্ত সমস্ত জগদ্‌বাসীর কল্যাণের জন্য; সেখানে পুণ্য, অস্পৃশ্য, পুণ্যবান্ পাপীর কোন ভেদজ্ঞান নাই। অতএব ঈশ্বরের পুত্র কন্যা জানিয়া সকলকে আমরা বৎসরান্তে আবার এই মাঘোৎসবে সাদরে আহ্বান করিতেছি। যাঁহাদিগের সুবিধা হয়, শারীরিক ভাবে উপস্থিত হইয়া, যাঁহাদের তাহা সম্ভব না হয়, আত্মিকভাবে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া এই মহোৎসবকার্য্য সম্পন্ন করুন। তাঁহারাও ধন্য হউন, আমাদিগকেও ধন্য করুন।

নববিধানক্ষেত্রের আমাদের সমবিশ্বাসী প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয়া ভাই ভগ্নীদিগকে প্রাণের একটী বিশেষ কথা বলিয়া আমাদের এ প্রবন্ধ শেষ করিব। কি আয়োজন লইয়া আমরা উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইব? আমরা যে উচ্চ ধর্ম্ম পাইয়াছি, যে বিচিত্র সত্য সাধনার পথে আহূত হইয়াছি, সে তুলনায় আমাদের জীবনে কিছুই সঞ্চয় হয় নাই, তাহা আমরা জানি; আমরা আত্মিক জীবনে অতি দীন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্বুদ্ধ হইয়া দীনবেশে আমরা উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হই। শুনিয়াছি দীনাত্মারা ধন্য, কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। আবার অপরদিকে আশা বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া, প্রাণের কোণে যতটুকু ভক্তি অনুরাগ সঞ্চিত আছে, তাহা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হই। আশা বিশ্বাস ভিন্ন একদিনও আমরা শারীরিক জীবন শান্তিতে যাপন করিতে পারি না; আশা বিশ্বাস ভিন্ন উচ্চ আত্মিক পথে একপদও অগ্রসর হইবার কি সম্ভাবনা আছে? আশা বিশ্বাসের ভূমি কোথায়? আমাদের দিক দিয়া ধর্ম্মজীবনপথে আমাদের শত ত্রুটী লক্ষিত হইবে সত্য; কিন্তু আমরা যে বৎসর অতি বাহিত করিয়া নূতন বৎসরের হিসাবে নূতন মহোৎসবে যোগ দান করিবার জন্য স্বয়ং উৎসবজননী কর্ত্তৃক আহূত হইতেছি, সেই অতীত বৎসরের দিনে দিনে, পলে পলে, জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনায়, আমাদের জীবনে স্নেহময় পরম পিতা, স্নেহময়ী পরম জননী হইতে তাঁহার আদরপূর্ণ স্নেহালিঙ্গন কি আমরা সত্য সত্য লাভ করি নাই, তাঁহার দিব্য প্রেমমুখ কি দর্শন করি নাই, তাঁহার দিব্যবাণী, আশা উৎসাহপ্রদ, প্রাণপ্রদ, জীবনপ্রদ, শক্তিপ্রদ বাণী কি শ্রবণ করি নাই? তিনি আমাদের জীবনের নানা অপ্রস্তুতি, অভাব ও অপরাধ সত্ত্বেও গুরু হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে নববিধানের পরম গুহ্য তত্ত্ব আমাদের নিকট

কি ব্যাখ্যা করেন নাই, ব্যক্ত করেন নাই ? তিনি কি সাথী হইয়া অজানিত অব্যক্ত অদৃশ্য অনন্তের পথে আমাদিগকে লইয়া চলেন নাই ? সে পথকে দিব্য জ্ঞানালোকে আমাদের জানার ও দর্শনের বিষয় করিয়া, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া, ধারণার বিষয় করিয়া অসীম অনন্ত পথকে মনোহর ও চিত্তাকর্ষক করিয়া, সেই পথে আমাদিগকে অগ্রসর করেন নাই ? আমাদের নিত্য উপাসনা, প্রার্থনায় স্মরণে, মননে, ধ্যানে ও সাময়িক উৎসবানুষ্ঠানে, তিনি বাহিরে বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়াও, অন্তরিন্দ্রিয়ের নিকট কেমন দর্শনীয়, শ্রবণীয়, স্পর্শনীয়, গ্রহণীয়, তাহা কি প্রত্যক্ষের বিষয় করেন নাই ? আপনি গূঢ় শিক্ষা দিয়া, বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া, আমাদের প্রাণের অন্ধকার, অবিশ্বাস নিরাশা কি দূর করেন নাই ? তিনি তাঁহার নিজ কৃপাগুণে আশাতীত রূপে তাহা করিয়াছেন। তিনি কি নিজ কৃপাগুণে তাঁহার প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনগণের স্পর্শ, পরিচয় জীবনে উপস্থিত করিয়া, সাধু-সঙ্গের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদে আমাদিগকে সময় সময় বিশেষ ভাবে ধন্য করেন নাই ? তিনি কি আমাদের শুষ্ক প্রাণে সময় সময় স্বর্গের শ্রদ্ধা ভক্তি সঞ্চার করিয়া, দিব্য অনুরাগের উৎস উৎসারিত করিয়া, আমাদের মলিন হৃদয়কে পুণ্যের বিমল জ্যোতিতে পূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মজীবনের বিশুদ্ধ সুখ সৌভাগ্যের প্রসাদবিতরণে আমাদিগকে কি তিনি ধর্ম্মের দিকে প্রলুব্ধ করেন নাই ? আসুন, এ সময় সারা বৎসরের তাঁহার দেওয়া আশীর্ব্বাদের জীবন্ত পুণ্য-স্মৃতি বক্ষে লইয়া নব আশা বিশ্বাসে পূর্ণ হই এবং সেই আশা বিশ্বাস লইয়া, দীনাত্মা হইয়া উৎসব-ক্ষেত্রে আগমন করি। উৎসবজননী উৎসবক্ষেত্রে আমাদিগকে তাঁহার শ্রীহস্তে স্বর্গের প্রসাদ বিতরণ করিয়া ধন্য করিবেনই করিবেন।

—০—

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

দীর্ঘ উপাসনা।

এখন দীর্ঘ উপাসনা কেহ ভালবাসে না। বিশেষতঃ ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাববিহীন কেবল কতকগুলি কথা বলা বা একই কথা পুনরুক্তি করা প্রকৃত উপাসনা নয়। এরূপ উপাসনা নিশ্চয়ই ঈশ্বর এবং সাধকগণের অগ্রাহ্য। যে উপাসনা স্বয়ং পবিত্র আত্মা করান, তাহা দীর্ঘই হউক বা ছোটই হউক, নিশ্চয়ই উপাসকদিগেরও প্রাণ স্পর্শ করিবে এবং যিনি উপাসনা করিবেন, তাঁহারও হৃদয় আত্মা চরিতার্থ হইবে। উপাসনায় যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহাদেরও হৃদয় যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে যিনি উপাসনা করেন, তাঁহারও ভাব খোলে না; আর যাঁহারা অপ্রস্তুত ভাবে যোগ দেন, ভাল উপাসনাও তাঁহাদের ভাল লাগে না। শরীরে রোগ থাকিলে যেমন সুস্বাদু খাদ্য অপ্রীতিকর হয়, ইহাও সেইরূপ। অতএব যিনি উপাসনা করিবেন বা যাঁহারা উপাসনায় যোগ দিবেন, উভয়েরই তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; এবং উপাসনা করিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে উপাস্যদেবতার কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে।

উদ্বাহ।

নরনারীর উদ্বাহ একটী স্বর্গীয় ব্যাপার। ইহা একটী পার্থিব প্রথা নয়। পৃথিবীতে স্বর্গের প্রেম-পরিবার বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহাকে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বিধি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। পার্থিব বিবাহের মিলন অচিরে ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহার মিষ্টতা ও আনন্দ দুদিনেই ফুরাইয়া যায় এবং নরনারীর মধ্যে নানা প্রকার অকল্যাণ অশান্তি আসিয়া থাকে। প্রকৃত বিবাহ আত্মার বিবাহ। বিধাতা স্বয়ং পুরোহিত হইয়া আত্মার সহিত আত্মার মিলন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। নরনারী যদি তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া পরস্পরকে বিবাহ করেন এবং পরস্পরের মন, প্রাণ, হৃদয়, আত্মা বিনিময় করিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই চিরপ্রেমে মিলিত হইয়া, পৃথিবীতে স্বর্গের প্রেম-পরিবার রচনা করিয়া, নিত্য সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করিবেন। তখন সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য-সাধন ঈশ্বরেরই উপাসনা হইবে।

শিশু।

শিশু স্বর্গের নিদর্শন। স্বাভাবিকতা, সরলতার নিদর্শন শিশু। স্বাভাবিক ভাব বিনা আমরা সত্যস্বরূপকে পূজা করিতে পারি না। শিশুর জ্ঞান স্বাভাবিক জ্ঞান। সে কেমন করে মার স্তন্যপান করিতে শিখে, কেমন করিয়া মাকে চিনিতে পারে, এ কেহ জানেনা; শিশু নিত্য নিত্য নব নব ভাবে তিল তিল করিয়া শরীরে মনে জ্ঞানে পুষ্টি লাভ করে এবং ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া উন্নত হয়। স্নেহের প্রতিমা শিশু মা বই কিছু জানে না, মাকে সে সর্ব্বশক্তির আধার জ্ঞান করে। শুদ্ধতার মূর্ত্তি নিষ্কলঙ্ক শিশুর মত আর কে? সদানন্দ শিশু যেমন, এমন আর কে? তাই ঈশা বলিলেন, শিশুর ন্যায় পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিব না। এই নববিধান নবশিশুরূপে সমাদৃত, নববিধানের নিদর্শন নবশিশু।

—•—

সংসারের ধর্ম্ম ও স্বর্গের ধর্ম্ম।

(ব্রহ্মানন্দ শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের "Regenerating Faith" নামক বক্তৃতার ভাবানুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বন্ধুগণ, আত্মার অনন্ত জীবন সম্বন্ধেও এই সকল কথা অনেক পরিমাণে সত্য। আমি জানি, তোমরা বুদ্ধির আলোকে এই মত গ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু এইরূপ বুদ্ধির একটা আলোকে মত-গ্রহণকে প্রকৃত বিশ্বাস বলা উচিত নয়। আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতির দ্বারা পরকালকে উজ্জ্বল সত্য বলিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা ইহা আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনে বল দিতে পারিবে না। বিশ্বাসরূপ অটল পাহাড়ের উপরে আমাদের অনন্ত জীবনের আশাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যদি দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচলিত তর্ক যুক্তির উপরে নির্ভর করি, এবং বুদ্ধি-যোগে এই মত গ্রহণ করি, অনেক সময়ে এই মতে সন্দেহ হইবে এবং পাপ প্রলোভনের সময়ে এই মত আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবেনা।

ভক্তি বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, নির্ভয়ে সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে। বুদ্ধির আলোকে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ জানা এক কথা, আর হৃদয়ের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ অনুভব করিয়া ন্যায়কে বরণ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। যে সকল দুর্নীতি ও কুসংস্কার এ দেশে প্রচলিত আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে মুখের কথায় প্রতিবাদ করা, আর তাহাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হওয়ায় অনেক প্রভেদ। অনেক লোক স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করেন; কিন্তু তাহার অধিক স্বদেশপ্রীতির আর কোন পরিচয় দেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ মিথ্যা, অনাচার ও সাংসারিকতায় ডুবিয়া যাইতেছে। যাহা বুদ্ধির দ্বারা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহাকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিতে হইবে, ধনমান অপেক্ষা সত্যের অধিক সম্মান করিতে হইবে; বরং মৃত্যুকে তুচ্ছ করিবে, কিন্তু সত্যকে লঙ্ঘন করিবে না। যদি সত্যে বিশ্বাস কর, সত্যের স্বর্গীয় শক্তি তোমাদের পথ হইতে পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া দিবে। যদি নিজেদের পরিত্রাণ চাও, যদি দেশের মঙ্গল কামনা কর, তবে তোমাদের আলোচনা-সভা বন্ধ কর, কপট তর্ক বিতর্ক বন্ধ কর, এবং দীনভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে অগ্রসর হও। নিশ্চয় জানিও, আশাতীত সফলতা লাভ করিবে।

পাপের জন্য সরল অনুতাপ ব্যতীত ভক্তিবিশ্বাস এবং নবজীবন লাভ করা অসম্ভব। যদি আমরা আমাদের অপরাধের গুরুত্ব না বুঝি, অতীত জীবনে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, যদি সেই সকল দুষ্কর্ম্মকে ঘৃণা না করি, এবং নিজেদের দুর্দ্দশার জন্য যদি গভীর লজ্জা অনুভব না করি, তবে আমরা কিছুতেই আমাদের অন্তরে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবনা। কিন্তু অনুতাপ নবজীবনের পূর্ব্বগামী সাধনা মাত্র, ভক্তিবিশ্বাস ব্যতীত অনুতাপ মানুষের আত্মাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। কেহ কেহ পাপের জন্য অনুতাপ করেন, হয়ত প্রচুর পরিমাণে অশ্রুপাত করেন, এবং মনে করেন যে, অশ্রু দিয়া অতীত জীবনের পাপরাশি ধুইয়া ফেলিবেন; কিন্তু তাঁহাদের অনুতাপ যতই তীব্র হউক না কেন, তাঁহাদের দীনতার মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন থাকে। তাঁহারা নিজেদের পরিত্রাণ নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম, ভাবুকতার ধর্ম্ম, স্বর্গের ধর্ম্ম নহে। ভক্তি বিশ্বাস ব্যতীত জ্ঞান বা কর্ম্ম যেমন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না, অনুতাপও তেমনি আমাদিগকে মুক্তি দিতে অক্ষম। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহাত্মা যীশু প্রচার আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে "জন" (John the Baptist) নামক আর এক মহা সাধু স্বদেশবাসীকে এই বলিয়া জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, "তোমরা পাপের জন্য অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে।" তিনি আরও বলিতেন যে, "আমি তোমাদিগকে জলাভিষেকে দীক্ষিত করিতেছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসিতেছেন (অর্থাৎ যীশু), তিনি তোমাদিগকে অগ্নিময়ে দীক্ষিত করিবেন।" ব্যক্তিগত জীবনেও এই কথা সত্য। আগে জলাভিষেক, আগে অনুতাপের অশ্রুজল, তাহার পরে ভক্তি বিশ্বাসের অগ্নিময় উৎসাহ। ভক্তি বিশ্বাস ও প্রার্থনাই অনুতপ্ত পাপীকে পথ দেখাইয়া স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায়, এবং সেখানে ঈশ্বরের করুণা তাঁহাকে নবজীবন দান করে।

কিন্তু নবজীবন ব্যাপারটা কি? নবজীবন লাভ করিলে মানুষের অবস্থা কিরূপ হয়? নবজীবনের লক্ষণ কি? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবজীবনের অর্থ শুধু ইন্দ্রিয়-দমন নয়, শুধু ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ হইতে বিরতি নয়, কিন্তু পশু প্রকৃতির বিনাশ এবং ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন। নবজীবন লাভ করিতে হইলে মানুষকে সংসার সম্বন্ধে মৃত হইতে হইবে। তাহাকে আসক্তি, স্বার্থপরতা এবং নীচ বাসনা কামনাকে উৎসাহের হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়া একেবারে ভস্ম করিতে হইবে, তাহাকে পাপের অতীত হইতে হইবে, পাপের আকর্ষণ পর্য্যন্ত সে আর অনুভব করিবে না। যে ব্যক্তি প্রলোভন হইতে দূরে থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি কখন কখন প্রলোভনকে অতিক্রম করে, সে ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়াছে, এ কথা বলা উচিত নয়। যাহার প্রলোভন আছে, তাহারই ভিতরে পশুভাব প্রচ্ছন্ন আছে।

কিন্তু শুধু সংসার সম্বন্ধে মৃত হইলে চলিবে না, আত্মাকে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অনেকে কৃচ্ছ্র সাধন করেন, কিন্তু ইহা এক প্রকার আত্মঘাত। যে পরিমাণে পশুত্বের মৃত্যু, সেই পরিমাণে দেবত্বের স্ফুরণ। যে পরিমাণে আমরা সংসার হইতে দূরে যাই, সেই পরিমাণে আমরা স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তী

হই। প্রত্যেক ধর্ম্মেই দেখা যায়, কতকগুলি মত গ্রহণ করিয়া, অথবা কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করিয়া, অথবা কতকগুলি নীতির অনুসরণ করিয়া অনেক লোক মনে করেন যে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়াছেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হন। কিন্তু যদি তাঁহারা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তাঁহারা পাপের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের জীবন এখনও ব্রহ্মময় হয় নাই—তাঁহাদের জীবন এখনও ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তবে তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, তাঁহাদের নবজীবন কল্পনা মাত্র, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। তাঁহাদের অন্য যে গুণ থাকে থাকুক, কিন্তু তাঁহারা স্বর্গরাজ্য হইতে এখনও বহু দূরে।

কিন্তু ব্রহ্মময় জীবন সামগ্রীটা কি? আত্মাকে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ কি? সংসারের সঙ্গে আমাদের শরীরের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আত্মার ঠিক সেই সম্বন্ধ। আমরা শরীর লইয়া সংসারে বাস করি এবং কতকগুলি শারীরিক সংস্কার বা প্রবৃত্তি আমাদের শারীরিক জীবনকে রক্ষা করে। ঠিক সেইরূপ আত্মারও কতকগুলি সংস্কার বা প্রবৃত্তি আছে, সেইগুলিই আমাদের ধর্ম্মজীবনকে রক্ষা করে। আমরা যে আহার করি, তাহার মূলে বুদ্ধি বিচারও নয়, তর্ক বিতর্কও নয়, কিন্তু ক্ষুধার তাড়না। ঠিক সেইরূপ নবজীবন লাভ করিলে আমাদের আত্মা যে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহার মূলে বুদ্ধি বিচারও নয়, তর্ক বিতর্কও নয়, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। নবজীবনে কর্ত্তব্যপালনেই মানুষের সুখ। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিকেই মানুষ মৃত্যু বলিয়া অনুভব করে। তখন তিনিই মানুষের চক্ষুর আলোক ও হৃদয়ের আনন্দ হন; এবং মানুষ সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া, দিবারাত্রি তাঁহার সহিত পবিত্র ইচ্ছাযোগে যুক্ত হইয়া, হৃদিস্থিত স্বর্গরাজ্যে বাস করে।

মহাত্মা যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে নবজীবন লাভ করিয়া শিশুর মত হইতে হইবে, নতুবা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এই কথাগুলি কত সুন্দর, কত সহজ, অথচ কত গভীর! আর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসিতে দাও; কারণ স্বর্গরাজ্য ত তাহাদেরই।" ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাসি কি মধুর! কেমন তাহাদের বিনয়, কেমন তাহাদের কোমলতা, কেমন তাহাদের নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব! ভগবান্ যে নিজের প্রকৃতি দিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শিশুদের দেখিলে সে কথা বুঝা যায়। কিন্তু শিশুরা যে এত সুন্দর, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তাহাদের নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক জীবন, তাহাদের স্বর্গীয় পবিত্রতা। তাহাদের পরীক্ষাও নাই, প্রলোভনও নাই, সংগ্রামও নাই। তাহাদের মনে পাপের কল্পনা পর্য্যন্ত আসে না। স্বার্থপরতা লোভ কামনা বাসনা অহঙ্কার—এ সকলের ছায়া পর্য্যন্ত তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদের হাতে হীরামুক্তা দাও, তাহা লইয়া তাহারা খেলা করিবে; তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার কর, মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা ভুলিয়া যাইবে। তাহারা যে এত সুন্দর, এত নির্ম্মল, এত পবিত্র—সে কথা তাহারা জানে না এবং সেজন্য তাহাদের অভিমানও নাই। তাই যীশু আপনার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, "শিশুর মত না হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন তাহাদের পিতামাতা ভিন্ন আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদেরই উপর একান্ত নির্ভর করে, বন্ধুগণ, তোমাদিগকেও সেইরূপ প্রার্থনা-সহকারে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তোমাদের সেই স্বর্গীয় পিতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি শিশুদের মত নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা আকাঙ্ক্ষা কর, তবে শিশুদের মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। এই বিশ্বাস থাকিলে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, এবং পাপের আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তখন আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। বিশ্বাস পরলোকযাত্রীর অন্তিম শয্যা হইতে সকল ভয় ও উদ্বেগ দূর করিয়া দেয় ও তাহাকে আশা ও আত্মসমর্পণের শক্তি দান করে।

যিশু তাঁহার শিষ্যগণকে এমন কথা কখন বলেন নাই যে, "তোমরা দৃঢ়তার সহিত নীতি পালন কর, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।" তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি এই আদেশ ছিল যে, "তোমাদিগকে স্বর্গের পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে হইবে, নবজীবনের দেবত্ব লাভ করিতে হইবে।" তিনি বলিয়াছেন যে, "কোন ব্যক্তিই ঈশ্বর ও শয়তান উভয়ের সেবা করিতে পারে না।" যাঁহারা তাঁহার শিষ্য হইতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি এই আদেশ করিতেন যে, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। এমন কি সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তিনি বলিতেন যে, "নিজের জন্য কিছুই রাখিতে পাইবে না; কিন্তু চিন্তা, কথা ও কাজে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইতে হইবে।" মানুষ যে নিজের বুদ্ধি মত, নিজের সুবিধা মত, নিজের অবসর মত, নিজের শক্তি ও সাধ্য মত ধর্ম্মসাধন করিবে, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল; মানুষ যে খানিক খানিক ভাল হইবে, ইহাও তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল। ধর্ম্মের উৎসাহে মানুষকে তিনি পাগল দেখিতে চাহিতেন। পশু প্রবৃত্তিকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া মানুষ নবজীবন লাভ করিবে এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে—তিনি ইহাই চাহিতেন। মানুষ সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গরাজ্যের আনন্দ শান্তি ও পবিত্রতা সম্ভোগ করিবে—তিনি ইহাই চাহিতেন।

বন্ধুগণ! তোমাদের শিক্ষা এবং সভ্যতা, তোমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক সদ্গুণের জন্য সংসারের লোক তোমাদের

প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু এই মূল্যে অনন্ত জীবন ক্রয় করা অসম্ভব। ঈশ্বরকে পিতা, বন্ধু এবং পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস কর, সজ্ঞানে তাঁহার মধ্যে বাস কর এবং তাঁহার সেবায় অর্থাৎ তাঁহার আদেশপালনে দৃঢ়ব্রত হও—নবজীবন লাভ করিবে। এইরূপে ভক্তি বিশ্বাস ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতি যখন একটী বিরাট ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করতঃ পরম পিতা পরমেশ্বরের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এক একটা দেশের অধিবাসিগণের সমষ্টি ব্যতীত জাতি আর কি? একটা দেশের অধিকাংশ লোক যদি সত্য ঈশ্বরের পূজা করে ও নবজীবনে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই আমরা সেই দেশে স্বর্গরাজ্যের সূচনা দর্শন করি।

বন্ধুগণ, কোন ব্যক্তি বিশেষের কথাই বল, কিম্বা কোন একটি জাতির কথাই বল, সাংসারিক উন্নতি ও ধন সম্পদের সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। কোন দেশ যে বাহ্যিক সভ্যতা দ্বারা, বা প্রচুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, বা জ্ঞান বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া নবজীবনে উদ্দীপিত হইবে, এরূপ কল্পনা মনে স্থান দিও না। স্বর্গরাজ্য বাহিরের বস্তু নয়, কিন্তু অন্তরের সামগ্রী। ইহা একটি আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃমণ্ডলী। স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিরও প্রয়োজন নাই, বিদ্যারও প্রয়োজন নাই, অর্থেরও প্রয়োজন নাই, একমাত্র ভক্তিবিশ্বাসের প্রয়োজন। অল্প কয়েকজন লোকের অন্তরে ভক্তিবিশ্বাসের পবিত্র অগ্নি জ্বালিয়া দাও,—হৌন তাঁহারা দীনহীন, হৌন তাঁহারা নিম্নজাতীয়, তাহাতে ক্ষতি নাই—তাঁহাদেরই হৃদয়ের উৎসাহ সহস্র সহস্র হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। এইরূপে সেই ক্ষুদ্র দল হইতে ধর্ম্মের স্রোত উৎসারিত হইয়া সমগ্র দেশকে মহা প্লাবনে প্লাবিত করিবে। ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভ্রাতৃগণ, ভক্তি বিশ্বাস যদি অন্যত্র এইরূপ আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিয়া থাকে, তবে উহা যে আমাদের এই ভারতভূমিকেও নবজীবন দান করিবে, সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ করিব কেন? আমাদের দেশকে ধনসম্পদে ও বর্ত্তমান সভ্যতার বাহ্য গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তাহার উন্নতি হইবে বলিয়া আমরা মনে করিব কেন? যদি ভারতের প্রকৃত মঙ্গল কামনা কর, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ের উপর নির্ভর করিও না। একনিষ্ঠ হইয়া আপনাপন অন্তরে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করিবার চেষ্টা কর, তাহার অনিবার্য্য ফলে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী স্বদেশবাসীর অন্তরে ঐ ভক্তিবিশ্বাস সঞ্চারিত হইবে। বাসনার পরিতৃপ্তি বা সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যীশু বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ কর, তোমাদের অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা ভগবান তোমাদিগকে দিবেন।" তবে দৃঢ়তার সহিত, বিনয়ের সহিত, প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে ভক্তি বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও। সরলভাবে নিজ নিজ পাপ স্বীকার কর। অনুতাপপূর্ব্বক মুক্তিদাতা ঈশ্বরের চরণে মাথা রাখ, তাঁহাকে সর্ব্বদাই এই কথা বল, "হে প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" সেই দয়াময় পিতা তোমাদের মস্তকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। সেই পবিত্রস্বরূপ দেবতা তোমাদের এইরূপ ভক্তি বিশ্বাসের ভিতর দিয়া এই দেশের সকল লোককে অর্থাৎ এই জাতিকে নবজীবন দান করিবেন ও ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—০—

বাংলার ধর্ম্মবিধানে কেশবের স্থান।*

(অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ,)

কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবন পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার জীবনব্রতের ত্রিবিধ বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়; যথা:—

১। বাংলার ধর্ম্মসাধনা হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহাতে নবশক্তির সঞ্চার করা।

২। হিন্দুস্থানে প্রচলিত ধর্ম্মধারা হইতে প্রেরণা লাভ করা এবং ইহার আত্মকেন্দ্রাভিমুখী বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা আত্মস্থ করা।

৩। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা ঘোষণার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মবিধানগুলিকে এক অখণ্ড ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের অঙ্গীভূত করিবার জন্য সমন্বয়ের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পন্থা নির্দ্দেশ করা।

কেশবচন্দ্রের শেষোক্ত আদর্শ দুইটির কথা আমাদের মধ্যে অনেকেই স্মরণ ও স্বীকার করেন; কিন্তু বাংলার ধর্ম্মধারার সঙ্গে তাঁহার যোগ ও তাহার পুষ্টি সাধনে তাঁহার সেবার কথা অনেকে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়া আছেন। এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কেশবজীবনের এই দিকটা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। এই স্থলে বঙ্গের ধর্ম্মধারার ক্রমবিকাশের সারাংশ উল্লেখ অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়।

বাংলার ধর্ম্মবিধানের সীমানা যদিও সকল সময়ে একভাবে থাকে নাই, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের ধর্ম্মবিধানের আদি লীলাভূমি

মিথিলা

রাজর্ষি জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্য এখানকার দুইটি দীপ্ত জ্যোতিষ্ক। তারপর বিধাতার নির্দ্দেশে

গয়া

ভূমিতে শাক্য সমাগম হইল ও বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব প্রেরণা লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল বটে, কিন্তু

* "Keshub place in the Religious Culture of Bemgal" প্রবন্ধের অনুবাদ।

ইহা বঙ্গীয় ধর্ম্মজীবনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিলুপ্ত হইবার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা বাংলা দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল। বঙ্গীয় ধর্ম্মবিধানের কেন্দ্র মধ্যযুগে

নবদ্বীপের

নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিল। সেখানে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সহচর-বর্গের সরল ভক্তি আসিয়া অচিরে পুরাতন পাণ্ডিত্যকে স্থানভ্রষ্ট করিল। অতঃপর এই কেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে নামিয়া, গঙ্গার উপকূল বাহিয়া অবশেষে তাহার স্থায়ী আশ্রয় লাভ করিল

কলিকাতা

ধামে। নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী খণ্ডভূমিকে 'বঙ্গদেশের পবিত্র পীঠস্থান', এই উপযুক্ত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য ও রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ভক্তি ও শক্তির ধর্ম, ধর্মসত্ত্ববাদে আস্থা ও বিশ্বাস এবং দেশপূজা—এই দেশেই উচ্চারিত ও প্রচারিত হয়। অতঃপর কলিকাতায় শ্রীকেশবের আবির্ভাব।

কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যাঁহারা বাংলাকে প্রভাবিত করিয়াছেন, সেই সকল পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাংলার ধর্ম্ম জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলার ইতিহাসে ইহাকে বরাবর ভক্তদিগের দেশ বলিয়া দেখা যায়। ইহা সকল সময়েই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, তথা জগতের সমস্ত ধর্ম্মবিধানের মধ্যে যাহা কিছু সত্য ও উদার, তাহা গ্রহণ ও আত্মস্থ করিতে তৎপর। ধর্ম্ম অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণীয় বিশিষ্টতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের যুগে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নরনারীর সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধ যুগে এই নীতি অনুমোদিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। অধিকন্তু জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন এই যুগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন; গৌরাঙ্গদেবও সেই পথাবলম্বী হইলেন। বাংলার ইতিহাসে দেখিতে পাই, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে ধর্ম্মই চিরকাল সহায় ও উন্নতি-সাধকরূপে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং পরম পবিত্র পুরুষের সহিত জীবের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ শুধু অনুষ্ঠান ও আচার আড়ম্বরের মধ্য দিয়া নহে; পরন্তু একদিকে ধ্যান, ধারণা ও উপাসনা, অপরদিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত বৈরাগ্য ধর্ম্মের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া এখানে সাধিত হয়। ইহা খুবই সত্য যে, জাতীয় জীবনে যখন ভোগ-স্পৃহা প্রবলতম হইয়াছিল, তখন যাঁহারা শাক্ত ধর্ম্মের ভোগানন্দে আধ্যাত্মিক আনন্দ খুঁজিতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর দিয়া বহু যৌগিক ক্রিয়া কলাপ জন্ম লাভ করিয়াছিল। এইরূপ ধর্ম্মভাবের উল্লাস জাতির তেজ ও শক্তিকে ঘনীভূত করিয়া আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিল এবং ভোগের মধ্য দিয়াই ধর্ম্মপিপাসা বৃদ্ধি পাইল। ফলে বাংলার ধর্ম্মজীবন আরও খরতর বেগে চলিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত আরও বলা যায় যে, যাঁহারা জীবনকে সংসার-বিচ্ছিন্ন একটী বিশিষ্ট বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে চান না, তাঁহাদের কাছে শাক্তধর্ম্ম চিরকাল আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের একটি বিশেষ পথস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

কেশব শুধু বাংলার ধর্ম্মজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অঙ্গগুলির বিশেষ ভাব সকলও লইয়াছিলেন। মৈত্রেয়ীর প্রার্থনার সহিত কেশবের প্রার্থনা পদ্ধতি অবিকল একরূপ ছিল; বৌদ্ধজীবনের বিশেষ ভাবগুলি, অহিংসা, মধ্যপথ, পবিত্রতা এবং সমগ্র সমাজের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্বকে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া কেশবের জীবনে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছিল। শাক্তদের কালী এবং দুর্গাপূজার বিশেষ ভাবগুলি তাঁহার আত্মাকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত করিত। পরিশেষে, তিনি শুধু সংগীতের দ্বারাই ভগবদুপাসনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন আবার এদেশে পুনরুজ্জীবিত করিলেন।

এইরূপে কেশবচন্দ্র উপনিষদ, বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণবযুগের পূর্ব্বগামিগণকে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। এখন বাংলার ধর্ম্মবিধানের ইতিহাসে কেশবের বিশিষ্ট দান কি, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কেশবের যুগ সামঞ্জস্য ও মিলনের যুগ। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির সংযোগস্থলে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কোনটি ছাড়িবে, কোনটি গ্রহণ করিবে, বুঝিতে পারিতেছিল না। শিক্ষিত বঙ্গ সমাজ বহু দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভোগ-স্পৃহা-পরিচালিত ও উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কে নিমজ্জিত আত্মসুখি যুবকের দল জাতীয় দুর্দ্দশার জ্বলন্ত প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাই দেখিতে পাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কতিপয় সংস্কারক কতকগুলি বিশেষ আদর্শ লইয়া আসিলেন। আদ্যোৎকর্ষরূপ শিক্ষালয়ে শিক্ষিত রামকৃষ্ণ প্রচার করিলেন, সকল ধর্ম্মের গম্যস্থান এক, সুতরাং বিরোধ বিবাদের কোন কারণ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসীকে সনাতন ধর্ম্মবিধানের অনুসরণ করিতে বলিলেন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে উপনিষদের আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণভাবে বিভিন্ন জাতির আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই জনগণমনের ভিত্তির উপর সমাজ গঠন করেন নাই, কারণ এইরূপ দলবদ্ধ সমাজই একাধারে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় মুক্তি আনয়নে সমর্থ।

এই বিশেষ কর্ম্মসাধন কেশবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন এবং

নানাবিধ বক্তৃতা দ্বারা এক গভীর দিব্যদৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া এমন কতকগুলি নরনারী আসিয়া যোগদান করিলেন, যাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজ অচিরে বাংলার ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। বাংলা উদ্ধার পাইল, কিন্তু শুধু তাহাই নহে; বাংলার ধর্ম্মবিধানও উদ্ধার পাইল, এবং আরও পুষ্ট হইল। কেশব বিভিন্ন ধর্ম্মবিধানগুলিকে বিচিত্র পুষ্পের স্থায় মনে করিতেন, যাহা বর্ণ ও গন্ধের দ্বারা সকলকে আকৃষ্ট করিয়া বিধাতার নন্দনকাননের অনন্ত জীবনবারতা আনিয়া দেয়। যে সমন্বয়ের জন্য বাংলা যুগ যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহাই পাইল। কেশবের পরবর্ত্তিগণ, যাঁহাদের উপর ধর্ম্মবিধানের পুষ্টির ভার পড়িয়াছিল, তাঁহাদের ভাগ্যে ইহাই নিয়ন্ত্রিত হইল যে, সমন্বয়ের জীবনীশক্তি মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মজগতের সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে হইবে, এবং ইহা এরূপভাবে করিতে হইবে, যাহাতে একদিকে মানুষ ও অপরদিকে সমাজ, প্রকৃতি ও বিধাতার সহিত সহজ ঐক্যের ও মাধুর্য্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার জগদীশচন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আপন আপন সাধনার ধারা কেশবের আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শেরই বহুল প্রচার ও বিস্তার বলা যাইতে পারে। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্মৃতি আসিতে পারে, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, কেশব আত্মা আজও এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তাসনে বসিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছেন।

বাংলার ধর্ম্মবিধানে যে সকল মনীষী ও কর্ম্মিবৃন্দ অধুনা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব কতখানি, তাহা নিরূপণ করিবার সময় এখনও আসে নাই। এখানে একথা বলিয়া রাখা উচিত যে, শুধু বাংলার আধ্যাত্মিক সম্পদেই আমাদের ভক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে কেশব কখনও বলেন নাই। তিনি স্থির জানিতেন যে, তাহাকে সজীব রাখিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরদেশের ধর্ম্মগুরুদের শিক্ষাসম্পদও আত্মস্থ করিতে হইবে। বস্তুতঃ যাঁহারা পৃথিবীর সকল যুগ-প্রবর্ত্তকদের পদতলে শিক্ষার্থী হইয়া বসিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বাংলার ধর্ম্মবিধানের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। যখন জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মবিধানের সঙ্গে আমাদের যথার্থ যোগ হইবে, তখনই আমাদের নিজ জন্মভূমির পরিপূর্ণ স্বরূপখানি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। যখন আমাদের আত্মা জগতের মহাপুরুষসমাগমে ও সহবাসে নবজীবন লাভ করিবে, তখনই আমরা যোগসূত্রে সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইতে পারিব। শুধু তাহাই নহে, এই ধর্ম্মবিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব, সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্য কেশব-প্রতিশ্রুত ধর্ম্মজীবন কত সুমহান ও উচ্চ! সেইদিন বাংলার ধর্ম্মবিধান আমাদের নিজস্ব বলিয়া ধরিতে পারিব, এবং কেশবই আমাদের যথার্থ বন্ধুরূপে চিরস্মরণীয় ও আদরণীয় হইয়া চিরদিন আমাদের সঙ্গে বিরাজমান থাকিবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

(কুমারী বনলতা দে)

এ বৎসর পূজাবকাশে দিদি ও আমি পূর্ব্ববঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বিহার প্রদেশে বহুদিন হইতে অবস্থান করা হেতু পূর্ব্ববঙ্গে কখনও যাওয়া হয় নাই। তাই এবার স্নেহের ভ্রাতা করুণারঞ্জন দাস গুপ্তের আগ্রহে পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়া স্থির করি। কলিকাতা হইতে খুলনা মেলে রওনা হই। খুলনা হইতে ষ্টীমার যোগে মাদারিপুর যাই। এখানে আমাদের স্নেহের সন্তান সুশীলকুমার সবডিভিসনাল অফিসার থাকাতে যত্নের কোন ত্রুটী হইল না। সহরটীতে অনেক ভদ্রলোকের বাস, তবে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত কেহ আছেন বলিয়া শুনিলাম না। কিন্তু সুশীল-কুমারের শ্বশুর ও শ্বশ্রূ মহাশয়া ডাঃ ডি, এন, মৈত্র ও তাঁহার স্ত্রী এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য এখানে আসাতে, সকলে মিলিয়া উপাসনা, আলোচনাদিতে অতি সুন্দর ভাবে কাটিল। ইঁহাদের দেশ ফরিদপুর জিলা। এদিককার ব্রাহ্মদিগের কথা ইঁহাদের নিকট অনেক শুনিলাম। ইঁহারা 'তারপাশার' নিকটবর্ত্তী বেলগাঁও হইয়া আসিলেন। সেখানে ৺প্রসন্নকুমার চৌধুরীর পরিবারস্থ অনেকে এখনও থাকেন।

মাদারিপুরে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব এবং অধিবাসি-বৃন্দ অনেকের সহিত আলাপ হইল। সকলেই সুশীল ও বধূ-মাতার কার্য্যে ও ব্যবহারে বিশেষ প্রীত দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।

মাদারীপুর হইতে ষ্টীমার যোগে আমরা ঢাকা রওনা হই। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিলে, সেখান হইতে শ্রদ্ধেয় মতিলাল দাস গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র করুণারঞ্জন দাস গুপ্ত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ঢাকা লইয়া যায়।

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের নববিধান-বিশ্বাসীদিগের একটী প্রধান কেন্দ্র। এখানে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমাজের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে ও অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ঢাকায় যান, তখন ওখানকার অনেক লোক দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৺বঙ্গচন্দ্র রায় একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেন। ঢাকার একটী অংশকে বিধানপল্লী নাম দেওয়া হইয়াছে। সেখানে কেবল ব্রাহ্মদিগের বাড়ী আছে। এইখানেই নববিধানের প্রাচীন সাধক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায়, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয়ের বাড়ী। বিধানপল্লীতে একটী দেবালয় আছে। এখানে সকলে মিলিয়া প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা হইবার বন্দোবস্ত আছে। আমার দিদি (শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী)

সেখানে একদিন উপাসনা করিলেন। বিধানপল্লীর ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা, সন্তান সন্ততি অনেকেই যোগদান করিলেন।

ঢাকায় দুইটী সমাজ আছে, একটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও একটী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। আমরা দুই জায়গায়ই গিয়াছিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে শ্রীআচার্য্যদেবের স্বহস্তে রোপিত একটী বৃক্ষ এখনও রহিয়াছে। নববিধান মন্দিরটীতে বন্দোবস্ত ভালই। মন্দির-সংলগ্ন একটী পাঠাগার আছে, প্রয়োজন হইলে কোন প্রচারক-পরিবার সেখানে বাস করিতে পারেন। রবিবারে মন্দিরে উপাসনায় গিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা এবং মতিলাল বাবুর কন্যাগণ সংগীত করিলেন; কিন্তু উপাসক-সংখ্যা অল্পই। ঢাকার মত সহরে আরো অধিক লোক আশা করিয়াছিলাম। বিধানপল্লীর ব্রাহ্মদিগের ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখিয়া কলিকাতার মঙ্গলপাড়ার কথা মনে হইতেছিল। ভক্তিভাজন দুর্গানাথ রায় মহাশয়কে দেখিয়া মনে হইল, পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন তিনি নিরাসক্ত এবং স্বর্গলোকের দিকেই উন্মুখ। একতন্ত্রী-যোগে তাঁহার স্বরচিত মধুর সংগীত মনকে সহজে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার কন্যা, আমার পুরাতন বন্ধু কুমুদকুমারীকে বহুদিন পরে দেখিলাম। কি সুন্দর ভাবে, সকল স্বার্থ ভুলিয়া পিতামাতার সেবায় ব্যাপৃতা। এমন অল্পই দেখা যায়।

শ্রদ্ধেয় মতিলাল দাস গুপ্ত মহাশয় ব্রহ্মানন্দের পরম ভক্ত। কুটীরখানি বৃক্ষলতা-পরিশোভিত, নববিধানের আদর্শ গৃহরূপে, আচার্য্যের সুন্দর ছবি দ্বারা সজ্জিত করিয়া, তাঁহার জীবন ও ধর্ম্ম সপরিবারে পালন করিতেছেন দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। ঢাকায় অবস্থান কালে তাঁহাদিগের যত্ন ও আতিথ্যে পরম প্রীত হইয়াছি। পুত্রকন্যাগণ বেণু, রুণু, সুনু, সর্ব্বদাই আমাদিগের জন্য কিছু করিতে প্রস্তুত। আমাদিগকে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হোষ্টেল, এডেন হাই টাউন স্কুল, হল, নূতন ও পুরাতন সহর সমস্তই দেখাইয়া আনিল।

ঢাকায় দুইদিন থাকিয়া আমরা ময়মনসিং যাই। করুণা এবারও আমাদের সঙ্গী ও গাইড। ঢাকা হইতে ময়মনসিং যাইবার পথটী সুন্দর। শুনিলাম, এই পথে যাইবার সময়ই নাকি শ্রীআচার্য্যদেব তাঁহার "True Faith" পুস্তকখানি রচনা করেন।

ময়মনসিংহে করুণার দাদা প্রেমরঞ্জন বাবুর অতিথি হইলাম। প্রেমরঞ্জন বাবু চিত্রকর। তাঁহার একটী ষ্টুডিও আছে। এই কাজ লইয়া তিনি এখানে অনেক বৎসর আছেন এবং সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। বাড়ীতে স্ত্রী, দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র। সকলেরই ব্যবহার অতি চমৎকার। ময়মনসিংহে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আমাদের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস, ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়, নবীনচন্দ্র আইচ এবং স্বর্গগত বিহারীকান্ত চন্দ মহাশয়ের পুত্র কন্যা ও জামাতাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন দাস মহাশয়কে অনেককাল পরে দেখিলাম। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার আশ্চর্য্য উৎসাহ, মনের প্রফুল্লতা, উপাসনায় অনুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত ভাল লাগিল। তাঁহাদের উদ্যানমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র উপাসনা-গৃহে অতি প্রত্যুষে ব্রহ্মোপাসনা হয়। তিনি নিজেই প্রতিদিন সরল সুমিষ্ট উপাসনা করেন এবং নবীনচন্দ্র আইচ মহাশয় ও তিনি নিজে, দুজনে মিলিয়া অনেকগুলি সংগীত করেন। বৈদ্যনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী যোগদান করেন। আমরা দুইদিন তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনা করিয়া অনেক উপকৃত হইলাম। একদিন তাঁহাদিগের বিশেষ অনুরোধে দিদি উপাসনা করিলেন।

ময়মনসিংহে আর একজন আমাদের পুরাতন ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইঁহার বয়স প্রায় ৮৭ বৎসর। ইনি এক রকম শয্যাশায়ী এবং শুনিতে পান না। আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উঠিয়া বসিয়া শ্লেটে লিখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। বাবা ও দাদার সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল এবং রমণীবাবু তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সে সকল বিষয় অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার লিখিত বইখানি উপহার দিলেন।

স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দ এখানে একজন অনেক দিনের ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি একটি ছোট স্কুলে সামান্য বেতনে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া, নিজ অধ্যবসায়বলে ব্যবসায় দ্বারা স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিজের বৃহৎ পরিবারকে লালনপালন, সন্তানগণকে শিক্ষা-দান এবং নিবাসের জন্য অনেক জমি ক্রয় করেন। সেই জমি প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে অল্প অল্প দান করিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দ হইল, প্রত্যেকে সেখানে ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। বিহারীবাবু নিজ চরিত্রগুণে এখানকার সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত উদ্যানের এক প্রান্তে দেবালয় আছে, তাহারই নিকটে সমাধি-স্থানে তাঁহার নিজের, তাঁহার স্ত্রীর, তাঁহার কনিষ্ঠ প্রিয়তম ভ্রাতা রমণীকান্ত চন্দের এবং পরিবারস্থ আরো কাহারও কাহারও সমাধি আছে। ঐ দেবালয়ে জামাতা কৈলাসচন্দ্রের অনুরোধে পরিবারস্থ সকলকে লইয়া দিদি একদিন উপাসনা করিলেন। সন্তান সন্ততি, পৌত্র পৌত্রী সকলে মিলিত হওয়াতে গৃহে স্থান সঙ্কুলান হয় না। উপাসনা ও সংগীত বড় সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপাসনার পর কৈলাসবাবুর বাড়ীতে আহারাদি হয়। বিহারীবাবুর আশীর্ব্বাদে এই পরিবার তাঁহার আদর্শমত চলিলে, ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কাজ হইতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

ঢাকার সংবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৩শে নবেম্বর, শ্রদ্ধেয় ভাই কে শাম্বশিব রাওয়ের স্বর্গারোহণ দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই কে শাম্বশিব তৈলঙ্গদেশনিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনে বিশ্বাস এবং সরলতার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখা গিয়াছে। তিনি যৌবনকালেই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া, নবধর্ম্মের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, স্বদেশ কোকনদ হইতে কলিকাতাতে চলিয়া আসেন। এবং কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে স্থিতি করিয়া, শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য বন্ধুদের পরিচালিত Theological College এ অধ্যয়ন করেন। সেখানে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসাম পরিভ্রমণে বাহির হন। প্রথমতঃ বরিশাল হইতে ঢাকাতে কয়েক দিন স্থিতি করেন। এ সময় একদিন নিমন্ত্রণে বিধানপল্লী দেখিতে আসেন। সে সময় বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে বসিয়া ভাই মহিমচন্দ্র সেন রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। শাম্বশিব রাও অপর দুইটী বন্ধুসহ তথায় উপস্থিত হইলে, বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি আগন্তুকদিগকে সমাদর করিয়া বসিতে দেন এবং পল্লীবাসী অন্যান্য বন্ধুদিগকে আসিবার জন্য সংবাদ দেন। অপর কেহ আসিবার পূর্ব্বেই শাম্বশিব প্রশ্ন করেন, "সাধারণ সমাজ" এবং "নববিধান সমাজ" এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? তদুত্তরে ভাই মহিমচন্দ্র বলেন, "এক কথায় উত্তর দিতে হইলে আমি দেখি, একটী চন্দ্র এবং আর একটী সূর্য্য। অর্থাৎ নববিধান সমাজ সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় আলোকে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ও কিরণমালা বিকীর্ণ করিতেছে; আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, চন্দ্রমা যেমন সূর্য্যালোকে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদি ও মধ্য অবস্থার ভাব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহার নূতনত্ব নাই।" শাম্বশিব বলেন "আমি এ বিষয়ে আপনার সহিত একমত হইতে পারি না।" এখানেই প্রসঙ্গ শেষ হয়। শাম্বশিব ঢাকা হইতে অন্যান্য স্থান হইয়া আসাম গমন করেন এবং কলিকাতা ফিরিবার পথে গোয়ালন্দ ষ্টেশনের নিকট তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। তিনি কলিকাতাতে পৌঁছিয়া নববিধানে দীক্ষিত হন এবং পরবর্ত্তিকালে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্ম পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া আমেরিকাতে গিয়া মেডিয়াবেল স্কুলের নিয়মানুসারে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি ভাই মহিমচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এখানে আমাকে অধ্যাপকের সহিত বাক্ যুদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়।"

২৬শে নবেম্বর, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের স্বর্গারোহণ দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। প্রার্থনাতে "অনাথ আশ্রম" তাঁহার ও তদীয় পত্নীর কীর্ত্তি উল্লিখিত হয়।

২৯শে নবেম্বর, পরলোকগত মুকুন্দলাল সেনের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই মহিমচন্দ্র সেনের বিধান-পল্লীস্থ 'আনন্দ-কুটীরে' সায়ংকালে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। ভাই মহিমচন্দ্র সেন, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। মতিবাবু বিশেষ ভাবে পরলোকগত আত্মার সাধুভাবের বিষয় উল্লেখ করেন।

৬ই ডিসেম্বর ভাই মহিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর পরলোকগমনের দিনে সায়ংকালে তদীয় কুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি ঘোষ ও ভাই মহিমচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন।

৭ই ডিসেম্বর, ভাই কালীনাথ ঘোষের স্বর্গারোহণ দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। ১লা ডিসেম্বর বিশ্বাসী ভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ উমানাথ গুপ্তের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণ না থাকায়, ৭ই তারিখে শ্রদ্ধেয় উভয় আত্মাকেই স্মরণ করিয়া প্রার্থনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন।

৯ই ডিসেম্বর, সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের স্বর্গারোহণ দিনে বিধান-পল্লীস্থ দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র উপাসনা করেন। সায়ংকালে দিগ্‌বাজার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উপাসনা হয় এবং অঘোরনাথের জীবনী হইতে পাঠ হয়। ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দার প্রার্থনা ও পাঠ করেন।

১৮ই ডিসেম্বর, শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে, শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় প্রার্থনা করেন।

প্রচার—ভাই মহিমচন্দ্র সেন, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসন্ন সেন, রমেশচন্দ্র সমাদ্দার এবং একটী বালক খোল করতালসহ প্রতি শনিবার বন্ধুদের গৃহে গমন করিয়া উপাসনা এবং কীর্ত্তন করিতেছেন।

—০—

প্রার্থনা।

(স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের ২৮শে ডিসেম্বরের মাসিক স্মৃতিতে)

ঠাকুর! আজ কোন্ দিন আনিলে? আজ বৎসরের শেষ ২৮শে তারিখ। ঠাকুর! তুমি এসে বল, বৎসর কি শেষ হোল? তোমার নববিধান বলিতেছেন, তোমার বৎসর শেষ হয় না। অনন্তের কিছুরই শেষ নাই। তোমার পথের মানুষ চিরদিনই ঐ পথে চলিতেছেন। তোমার পথের মানুষ বিনয়কুমার তোমার বৎসরে নবজীবন লাভ করিয়া নবশিশুর মত নূতন পথে চলিতেছেন। আমরা পৃথিবীর মানুষ।

আমাদের বৎসর শেষ হইতেছে। বিনয়কুমার অনন্তের বৎসর ধরিয়াছেন। তাঁহার বৎসরের শেষ নাই। তাঁহার সঙ্গে যে যোগ, সে যোগও অনন্ত। এই যোগই নববিধানের নূতন বিবাহ ও নূতন "নবসংহিতা"। তুমি কন্যা শান্তিদায়িনীকে এই যোগে যোগিনী করিলে। ঠাকুর! তোমার নববিধানে তুমি এই যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছ। যোগিনী শান্তিদায়িনী আজ তপস্বিনী। তুমি কন্যাকে তপস্বিনী করিলে। তুমি যে মীরার ভক্তি দিয়া নূতন নূতন মীরা রচনা করিতে পার। নববিধানে কি মীরা মৈত্রেয়ী আসিবেন না? তুমিই যে রচয়িতা। তোমা ভিন্ন এ সব কে রচনা করিতে পারে? এবার তুমি আমাদের ঘরে নব তপস্বিনী দিলে। তাপ না দিলে তপস্বিনী হয় না। সূর্য্যের তাপ না পেলে শতদল ফোটে না, সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে চায় না। তাপ না পেলে তরল রস শর্করায় পরিণত হয় না। তুমি তাই এ তাপ ঢালিয়া দিলে। তবে তুমি শতদল ফোটাও। সূর্য্যমুখীকে সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে দাও। তরল জীবনকে শর্করায় পরিণত কর। কন্যা শান্তিদায়িনীকে আমাদের সম্মুখে শিক্ষয়িত্রী করিয়া নিয়োজিত কর। কন্যা ছোট, কিন্তু তুমি তাঁকেই বড় করিলে। ক্ষুদ্র খদ্যোতিকাও আলোক দেয়। সাধক বলিলেন যে, "The little glow-worm lights its own lamp." ছোট কন্যা এবার তাই করিবেন। তোমার দীপালোকে দীপ্ত বিনয়কুমারও শান্তি ও সমাধিপূর্ণ; কন্যা শান্তির তপস্যাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের সমক্ষে তোমার পঞ্চ প্রদীপের মত প্রকাশিত হউক। আমরা তোমাকেই দেখি ও তপস্যার তাপ শিখি। ঠাকুর! তুমি আজ বৎসরের শেষ ২৮শে তারিখের প্রার্থনা পূর্ণ কর। শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিপূজা

এলবার্টহলে জনসভা।

১৯৩৮সালে শতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিকল্পনা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিপঞ্চাশৎ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে গত বুধবার অপরাহ্ণ ৬ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে একটী বিরাট জনসভা হয়। ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে কেশবচন্দ্রের একটী প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পে বিভূষিত করা হইয়াছিল।

উদ্বোধন-সংগীত এবং প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আজ আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি এমন এক ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে, যাঁহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানববর্গের অন্যতম বলা যাইতে পারে। আজ হইতে ৫১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শ এখনও আমাদিগের মধ্যে গভীর অনুপ্রেরণা জোগাইতেছে। যে যে গুণাবলীর অধিকারী হইলে মানব মহামানব হইতে পারে, সেই সেই গুণাবলীর দিক হইতে দেখিলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে একজন মহামানব ছিলেন, একথা সকলেই আজ নির্ব্বিচারে স্বীকার করিবেন। আজ বাঙ্গলার তথা সমস্ত ভারতের দুর্দ্দিনে তাঁহার চরিত্র এবং গুণাবলীর আলোচনা দ্বারা আমরা যে বিশেষ উপকৃত হইব, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি একজন বড় বক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলকে পবিত্র এবং উচ্চ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিত। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, অন্তরের সহিত তিনি যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার এই সত্যোপলব্ধি বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারি। তিনি ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সামাজিক এবং জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন মোটেই সম্ভবপর নহে। তাই তিনি এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে সমাজের দ্বারা জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার হইবে, যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা এবং জনসাধারণের শিক্ষার প্রসারতা লাভ করিবে। তাঁহার এই সমাজ-সংস্কারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়নের মহান্ উদ্দেশ্য আমরা দেখিতে পাই। তিনি অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, সকলেই একই ভগবানের সন্তান, তাই সকলেই ভাই ভাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই মতই প্রচার করিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ম্মেই কিছু না কিছু ভাল আছে এবং সর্ব্বধর্ম্মেরই কেন্দ্র হইতেছেন ঈশ্বর। তাঁহার এই মহান্ আদর্শগুলি তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। আমরা যদি তাঁহার আদর্শ এবং মত গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, তবেই আমরা তাঁহার স্মৃতিকে যথার্থ পূজা করিব।

তৎপর সভাপতি মহাশয় কেশবচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ১৯৩৮ শতবার্ষিকী স্মৃতিরক্ষার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য একটী 'কমিটী' সংগঠিত হইবে।

(১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটী অট্টালিকা এবং হলগৃহ নির্ম্মাণ।

(২) সর্ব্বধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীপূর্ণ একটী পাঠাগার স্থাপন।

(৩) ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা।

(৪) একটী ব্যায়ামগার এবং

(৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটী কারখানা স্থাপন।

স্যার নীলরতন সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতি যে সময় আধ্যাত্মিকতায় আস্থা হারাইয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষাগ্নিতে জর্জ্জরিত হইতেছিল, সেই সময় জাতির মুক্তির জন্য কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। তাঁহার জ্ঞান যে কত গভীর ছিল এবং তিনি কত বড় ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনী এবং তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী হইতে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। সর্ব্ববিষয়ে বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দেয়। সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যেই যে একটী অখণ্ডনীয় যোগ আছে, ইহা তিনি আমাদিগকে স্পষ্ট এবং প্রথম শুনান।

তৎপর ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনী এবং জাতি-সংগঠনে তাঁহার আদর্শের অনুপ্রেরণা প্রভৃতি সম্বন্ধে সারগর্ভ এবং নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদানন্তর অধিক রাত্রে সভাভঙ্গ হয়।

ময়ূরভঞ্জের মহারাণী, মিঃ এন. সি, সেন, ডাঃ বি, সি, ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র শেঠ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(৯ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবারের "আনন্দবাজার" হইতে উদ্ধৃত)

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৬ই জানুয়ারী, ২৪।৩ বাহির মির্জ্জাপুর রোডে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহার প্রিয়তম শিশু পুত্র "শ্রীমান্ সুবীরের" জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শিশুর মাতৃদেবী ১৲ টাকা এবং মেজো পিসীমা শ্রীমতী শান্তিলতা রায় ১৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ৩রা জানুয়ারী, ১২৮নং হ্যারিশন রোডে, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্রী, ডাঃ শরচ্চন্দ্র নন্দীর শিশুকন্যার শুভনামকরণানুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "গোপা" নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে শিশুর মাতামহী প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১০ই পৌষ, ভাগলপুর-নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার বিনয়ভূষণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্মৃতিকণার সহিত রাঁচিনিবাসী স্বর্গীয় হিমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সৌরাংশুনাথের শুভবিবাহ ভাগলপুরে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই অনুষ্ঠানে কন্যার মাতৃদেবী শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরে ১৲ ও মুঙ্গেরে মহিলাশ্রম-নির্ম্মাণার্থে ২৲ টাকা দান স্বীকার করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা—বিগত ৯ই পৌষ, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় হিমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সৌরাংশুনাথ ও স্বর্গীয় ডাঃ বিনয়ভূষণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্মৃতিকণা নবসংহিতানুসারে নবদীক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। স্মৃতিকণার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তরুভূষণ বসু ও মাসীমাতা শ্রীমতী নলিনী ঘোষ দীক্ষার্থীদিগকে আচার্য্যসমক্ষে উপস্থিত করেন। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ গম্ভীরভাবে দীক্ষা দান করিয়া, আসন ও পুস্তকাদি উপহার দান করেন। ভগবান্ নব-দীক্ষিতদিগকে শুভাশীষ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১লা জানুয়ারী, কটকে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মধুসূদন রাওয়ের সহধর্ম্মিণীর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত সুকান্ত রাও ও শ্রীমতী অবন্তী দেবী মাতৃজীবনী পাঠ করেন। নগরের সম্ভ্রান্ত লোক অনেকে এসে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে ১৪ই পৌষ, আদমপুরস্থ বাসভবনে শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু সময়োচিত ব্রহ্মোপাসনা করেন। দৌহিত্রবধূ শ্রীমতী প্রীতিকণা রায় ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরে ১৲ ও মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ দান স্বীকার করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা জানুয়ারী, স্বর্গগত কেদারনাথ দের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, কলিকাতায় ২১৭নং রাসবিহারী এভিনিউতে পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এবং ২১৪নং লোয়ার রেঞ্জে কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। পাটনায় কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দের গৃহে ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং রাঁচিতে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা চন্দের গৃহে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ২৲ এবং শ্রীমতী বনলতা দে ১০৲ টাকা মাঘোৎসবে দান করিয়াছেন।

গত ১লা জানুয়ারী, হাওড়ায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের পিতৃদেব স্বর্গীয় হরকালী দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৫ই জানুয়ারী, ১০নং নারিকেলবাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে যোগেশ বাবু প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্র।

১লা মাঘ, ১৮৫৭ শক; ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ খৃঃ।

ষড়ধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে, ১লা মাঘ, ১৩৪২ (১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৬) হইতে আরম্ভ করিয়া, ৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত, নিম্নলিখিত পুস্তক সকল স্বল্পমুল্যে, ৮৯নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ প্রচারকার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ যোগে বই পাঠান হইবে।

পুস্তকের তালিকা।

পুস্তক	মূল্য	হ্রাস মূল্য
ব্রহ্মসঙ্গীত (নূতন দ্বাদশ সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	২॥০	২৲
চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী (গীত রত্নাবলী ও পথের সম্বলের সমুদায় গান একত্রে) নূতন সংস্করণ, কাপড়ে বাঁধাই	১৸০	১॥০
শ্লোকসংগ্রহ (নূতন সংস্করণ)	১৲	৸০
অনুষ্ঠান-সঙ্গীত ১ম (ভাই কালীনাথ ঘোষ)	॥০	।৵০
ঐ ২য় ঐ	।০	৶০
নামসুধা ঐ	।০	৶০
আত্মদান ঐ	।০	৶০
বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত (স্বর্গীয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন)	১৲	॥০
হিন্দি শতগান (শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ)	॥০	।৵০
উপদেশাবলী (প্রেরিতগণের উপদেশ)	১।০	৸০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ, চারি খণ্ড (৺কালীশঙ্কর দাস)	১৲	॥০
যোগ (রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশ-অনূদিত)	।০	৶০
অখণ্ড জীবন (স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার)	৴০	৹১০
কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম (By N. C. Mitter.)	৵০	৴১০
নিবেদন ঐ	॥০	।৵০
নববিধান অপরিহার্য্য	৵০	৴১০
প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস (জীবনচরিত)	॥০	।৵০
উপাসনার স্বাভাবিকত্ব (ডাঃ ৺পরেশরঞ্জন রায়)	৴০	৹১০
খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ (স্বর্গীয় অশ্বিকাচরণ সেন)	৴০	৹১০
শাক্যমুনিচরিত (সাধু অঘোরনাথ কৃত)	১।০	১৲
গোস্বামী রঘুনাথ দাস ঐ	৶০	৵০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ঐ	॥০	।০
দেবর্ষি নারদের নবজীবনলাভ ঐ	৹১০	
নানকপ্রকাশ ১ম ও ২য় (ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু) প্রতিখণ্ড	৸০	॥০
বুদ্ধদেবের স্থান (ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী)	৵০	৴১০
মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র ঐ	॥০	।৵০
নিত্যভিক্ষা ঐ	।০	৶০
যুবকদের প্রতি উপদেশ ঐ	৶০	৵০
ব্রহ্মোপাসনা ঐ	॥০	।৵০
জীবনবেদের পরিচয় (অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৵০	৴০
শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু (স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদার প্রণীত) ১ম ও ২য় (প্রতি খণ্ড)	১৲	৸০
নবতত্ত্বামৃতম্ (সংস্কৃত) ঐ	১৲	৸০
ঋগ্বেদ, ১ম ও ২য় (অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত) প্রতিখণ্ড	২॥০	২৲
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন, ১ম ঐ	২৲	১॥০
ঐ ২য় ঐ	৩৲	২৲
ইস্‌লাম ঐ	১॥০	১৲
কোরাণের সুরা ও বেদের সূক্তসংগ্রহ ঐ	১৲	৸০
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ঐ	১৲	৸০
সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বা নববিধান ঐ	।০	৶০
Behold the Man Do	১॥০	১৲
Rigveda Unveiled Do	5 0	3 0
Vedantism Do	1 0	0 12
Keshub Chunder Sen (G. P. Mazumder)	1 0	0 8
Life of Bhai Balodeb Narayan Do	0 4	0 3
Keshub Chunder Sen (Testimonies in Memoriam) G. C. Banerjee Cloth	1 8	1 4
Paper	1 4	1 0
গীতা-অধ্যয়ন (অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন)	৵০	৴১০
সত্য-কথা (ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন)	॥০	
সাধু প্রমথলাল (শ্রীশরৎকুমার রায়)	৵০	
ব্রহ্মতত্ত্ব (৺নিবারণচন্দ্র মুখার্জি)	॥০	।৵০
ঐ কাপড় বাঁধাই	৸০	॥০
(স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত)		
ধর্ম্মতত্ত্ব (বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন) ১ম	॥৵	।৶০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) প্রতি অংশ	॥০	।৵০
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম	১॥০	১৲
বেদান্তসমন্বয় (বাঙ্গালা)	৫৲	৩৲
গীতাসমন্বয়ভাষ্যম্ (সংস্কৃত)	৩৲	২৲
বেদান্তসমন্বয়ঃ ঐ (কাপড়ে বাঁধাই)	৪॥০	৩৲
গীতাপ্রপূর্ত্তিঃ ঐ	৩৲	২৲
নবসংহিতা ঐ	৸০	॥০
ভাষাসঙ্গমনী (১ম খণ্ড) ঐ	১৲	৸০
কেশবচন্দ্র—উপাধ্যায়ের বক্তৃতা	১॥০	১৲
উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা	৶০	৵০
শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি	৴০	৹১০
ত্রিবিধ জন্ম	৴০	৹১০
বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব	৴০	৹১০
আর্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ	৶০	৵০
গায়ত্রীমূলক ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন	৴১০	৴০
[স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত]		
রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও উক্তি	৶০	৵০
মহালিপি	।৵০	।০
ধর্ম্মসাধন-নীতি	।৵০	।০
চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী (নূতন সংস্করণ)	।৵০	।০
ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য	৶০	৴১০
মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এস্‌লামধর্ম্ম	৸০	॥০
হদিসের বঙ্গানুবাদ (পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ) প্রতিখণ্ড	॥০	।৵০
তত্ত্বসন্দর্ভমালা (নূতন সংস্করণ)	।৵০	।০
এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনী (নূতন সংস্করণ)	১।০	৸০
চারিজন ধর্ম্মনেতা (নূতন সংস্করণ)	৸০	॥০
হাফেজের বঙ্গানুবাদ (প্রথম ভাগ) ভাল বাঁধান	১৲	৸০
হিতোপাখ্যানমালা—১ম ভাগ (গোলস্তান)	।৵০	।০
" ২য় ভাগ (বোস্তান)	৸০	।৵০
" ১ম ও ২য় (মনোনীতাংশ) প্রতি খণ্ড	।০	৶০
নীতিমালা (কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্কলিত)	।৵০	।০
তাপসমালা (৬ ভাগে সমাপ্ত)	৩৲	২॥০
তত্ত্বরত্নমালা (নওকোত্তয়র ও মওলানা রোম)	॥৵০	।৵০
মহাপুরুষচরিত—প্রথম ভাগ	॥৵০	।৵০
দরবেশী (নূতন সংস্করণ)	।০	৶০
তত্ত্বকুসুম	৴০	৹১০
আত্মজীবন	১৲	॥০
Keshub Chunder Sen—Correct statement of some disputed facts in his life	0 8	0 6
ব্রহ্মগীতা (ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল-প্রণীত)	১॥০	১৲
ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা ঐ	১৲	॥০
ঈশাচরিতামৃত—১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি খণ্ড ঐ	৸০	॥০
কেশবচরিত—নূতন সংস্করণ, ঐ	১৲	
সত্য-রত্ন (Rev. P. M. Choudhury)	১৲	॥০
সুনীতি-কুসুম ঐ	১৲	॥০
প্রতিমা (নূতন সংস্করণ) ঐ	।০	৶০
England & India Do.	1 0	0 8
God's Treasury Part I Do.	0 8	0 4
The Apex of Man Do.	2 0	1 0
God and Man Do.	1 0	0 8

Minister K. C. Sen's works :—

Lectures in India (Cassell's Edition) Part I and II (Cloth) each	3 0	2 8
Lectures in England (Part I)	1 4	1 0
Yoga—Subjective & Objective	0 4	0 3
The New Samhita	0 4	0 3
Essays—Theological and Ethical	1 8	1 0
Discourses and Writings—Part I	0 8	0 6
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I. & Vol. II. each	1 8	1 0
True Faith (ordinary paper)	0 2	0 1
,, (superior paper)	0 4	0 2
Social Reformation in India	0 2	0 1
Spiritual Progress (sayings and writings collected by Sujata Debi)		0 4
ভক্তিযোগ		৴•
নামমালা (ব্রহ্মানন্দের পুস্তকাবলী হইতে মণিকা দেবী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)	।•	
দৈনিক প্রার্থনা (ভারতাশ্রম) ১ম ও ২য়, প্রতিখণ্ড	৸•	॥•
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর) ৩য়—৮ম, প্রতিখণ্ড	৶•	
হিমালয়ের প্রার্থনা ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	৵•	।•
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও ৩য় (প্রতি খণ্ড)	৶•	
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	।৵•	।•
মাঘোৎসব (নূতন সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	॥•	।৵•
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ (নূতন সংস্করণ)	৸•	॥•
সাধুসমাগম (নূতন সংস্করণ) কাপড়ে বাঁধাই	৸•	॥৵•
" " কাগজের মলাট	॥•	।৵•
সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	১৲	৸•
ঐ ঐ ৩য় খণ্ড	১৲	৸•
ঐ ঐ ৪র্থ খণ্ড	৸•	॥•
ঐ ঐ ৫ম খণ্ড	॥•	।৵•
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	৸•	॥•
ঐ ২য় খণ্ড ঐ	১৲	৸•
ঐ ৩য় খণ্ড ঐ	৸•	॥•
ঐ ৪র্থ খণ্ড ঐ	১৲	৸•
ঐ ৫ম খণ্ড ঐ	১৲	৸•
ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঐ	১।•	১৲
ঐ ৭ম খণ্ড ঐ	১৲	৸•
ঐ ৮ম খণ্ড ঐ	১৲	৸•
ঐ ৯ম খণ্ড ঐ	১।•	১৲
ঐ ১০ম খণ্ড ঐ	১॥•	১৵•
দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	।•	৶•
সঙ্গত—(সঙ্গত-সভার আলোচনা)	১৲	৸•
জীবনবেদ	॥•	।৵•
বিধানভগ্নীসভ্য (বালিকাদিগের প্রতি উপদেশ)	১।•	১৲
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)	॥•	।৵•
উপাসনাপ্রণালী	৴•	৴১০
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	৸•	॥•

Rev. P. C. Mozoomdar's works :—

আশীষ (নূতনসংস্করণ)	১৲	৸•
স্ত্রীচরিত্র (নূতনসংস্করণ) কাপড়ে বাঁধাই	৸•	॥৵•
" " কাগজের মলাট	॥•	।৵•
The Silent pastor	0 8	0 6
The Spirit of God (New Edition)	2 0	1 8
The Oriental Christ Do.	2 0	1 8
Faith and Progress of the Brahmo Somaj (New Edition) Cloth Bound	2 0	1 8
Do Paper	1 8	1 0
To Young men of India		0 1
Language of the New Dispensation		0 1

নববিধান প্রেস—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নববিধান ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Life & Teachings of Keshub Chunder Sen by P. C. Mazumdar (New Ed.)	3 0	
Life of Protap Chunder Mozumdar Vol. I & II (Bound together)	2 0	1 0
Life of Benoyendranath Sen (In English)	3 0	2 0
,, ,, (In Bengali)	2 0	1 0
উপদেশ ১ম খণ্ড (ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত)	।•	৶•
উপদেশ ২য় খণ্ড ঐ	।৵•	।•
উপদেশ ৩য় খণ্ড ঐ	।•	৶•
Intellectual Ideal (By Prof. B. N. Sen	1 0	
Lectures & Essays Vol. I.(Literary) do.	1 8	1 0
Vol. II. (Theological do.	1 0	0 12
Vol. III. (Sermons) do.	0 12	0 8
আরতি do.	৸•	॥•

বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় (ভাই মহিমচন্দ্র সেন)	৴•	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা (নূতন সংস্করণ) ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রণীত	॥•	।৵•
শ্রীমদ্গীতাপূর্ত্তি (সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ) ঐ	৩৲	২॥•
ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ (কাপড়ে বাঁধাই) ঐ	৸•	॥•
পারমহংস্যধর্ম্মঃ ঐ	।•	৶•
শ্লোকসংগ্রহ (পদ্যানুবাদ) ঐ	১৲	৸•
নববিধানের নূতনবেদ জীবনবেদ (ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ)	৵•	৴১০
বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান— ঐ	।৵•	।•
Fragments, Parts I—V, Do.	1 2	
The Apostles and Missionaries of Navavidhan, Prof. N. Niyogi, Cloth bound	5 0	4 0
Do. Paper bound	3 12	3 0
ভক্ত-কেশব—(অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী	৵•	৴•
ঋষিপ্রতাপচন্দ্র —(নূতন পুস্তক) "	৸•	
কেশব-সমাগম—শ্রীমতিলাল দাস	১৲	॥•
কেশব-কাহিনী ঐ	১॥•	১৲
ধ্যানযোগ (তত্ত্ব ও সাধন) নূতন পুস্তক শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ প্রণীত	৸•	॥•
Keshub as seen by his Opponents— G. C. Banerjee	1 0	0 8
Keshub Chunder & Ramkrishna Do.	2 0	1 8
বিষয়নির্ঘণ্টসূচী (নূতন পুস্তক) Do.	।৵	।•
The Way to Prakriti Land—Sujata Devi	-/6/-	-/4/-
Why New Dispensation Do	-/1/-	
Jeevan Veda, Hindi translation	0 8	0 6
The New Veda (Translation of Jeevan Veda) by J. K. Koar	0 8	0 6
The Evolution of Navavidhan— By Miss N. Ghosh	1 0	0 12
Sloka Sangraha (Translated in Hindi)	0 8	0 6
In the Sanctuary of Silence (Nandalal Sen)	-/8/-	-/6/-
Faith and Culture of the New Dispensation—	-/2/-	
নালুদার চিঠি—১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, প্রতি খণ্ড	১৲	
Keshub Chunder Sen and Coochbehar Betrothal (Dr. P. K. Sen)	1 0	0 12
Presidential Address (Madras Theistic Conference)—Dr. P. K. Sen	0 4	
The Lawgiver of Modern India (P. L. Sen)		0 1
Songs of Tomorrow— Lolitmohun Chatterjee Paper		0 4
Cloth		0 8
Brahmo Pocket Diary for 1936 Cloth		0 6

শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ

কার্য্যাধ্যক্ষ।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ২।৩য় সংখ্যা। ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল, ১৮৫৭ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 30th. January & 14th. February, 1936. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা।

মা জীবন্ত জাগ্রতরূপা নববিধানবিধায়িনী মহামহোৎসবদায়িনী মা, ধন্য ধন্য তুমি। তুমি যে আমাদের, আমার ন্যায় পাপাসক্ত অহংকৃত নরাধমেরও মা হয়েছ; কেন না, তোমার নববিধানে নবজীবন দিবার জন্য ডাকিয়া ধরিয়া আনিয়াছ। তোমার নবভক্তের অঙ্গে গাঁথিয়াছ এবং প্রতিদিন প্রত্যক্ষ ভাবে নব প্রেম, নব লীলা দেখাইয়া, এ পাপীকে উদ্ধারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া রহিয়াছ। তাই আবার স্বর্গের অমরাত্মা দেবদেবীদিগকে লইয়া ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহামহোৎসবসাধনে ধন্য করিলে। যুগে যুগে যেমন, এই কলি যুগেও তেমনই তুমি আমাদের ন্যায় পাপীকে পরিত্যাগ কর নাই, করিতে পার না। তাই এই নূতন বিধানে পরিবর্ত্তিত জীবন দিবার জন্যই যে আমাদিগকে এ বিধানে আনিয়াছ, ইহাই তুমি দেখাইলে ও দেখাইতেছ। আমি যতই কেন পাপ করি, তোমার দয়া যে অনন্ত, পাপ ত আমার তত নয়। তাই পাপীকে কেমন করিয়া তোমার প্রেমে পরিবর্ত্তিত কর, তাই ত দেখাইতেছ; আবার উৎসবের পর উৎসব দিয়া এ জীবনকে উত্তরোত্তর গঠিতই করিতেছ। নববিধানে তুমি ইহাও দেখাইতেছ যে, আমি সত্য সত্য কিছুই নই, আমি নিজ চেষ্টায় বা পুরুষকার-বলে বা সাধ্য সাধনা করিয়া ভাল হব, আমার সে শক্তি নাই; কেন না, তাহাতে আমি কিছু করিতে পারি, এই অহং আসিতে পারে। ইহাই তুমি আত্মজ্ঞান দিয়া তোমার নববিধানালোকে শিখাইতেছ। রুগ্ন শিশুর যেমন মাই সর্ব্বস্ব, মা না শুশ্রূষা করিলে সে রোগমুক্ত হয় না, মা না লালন পালন গঠন করিলে সে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি আমি নিতান্ত পাপ-রোগে রুগ্ন, সর্ব্বক্ষণই রোগে জর্জ্জর ও মর মর, আর তুমিই মা হইয়া আমার যখন যাহা প্রয়োজন, যেমন করিয়া আমি রোগমুক্ত হইয়া বাঁচি, তুমি তাহাই দিতেছ ও করিতেছ। এই আত্ম-জ্ঞান যেন লাভ করি এবং কেবল মা মা বলিয়া কাঁদি। তুমি নিজগুণে আমায় বাঁচাও, মানুষ কর, তোমার কর। বারবার পাপ-রোগে পড়ি, বারবার তুমি ঔষধ দিয়া, স্তন্য দিয়া, সেবা শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাও। আমি তোমার নববিধানে আশ্রয় পাইয়াও, তোমার ভক্তের অঙ্গে গাঁথা হইয়াও, তোমার নববিধান-সম্বন্ধে কত অপরাধী হইয়াছি, কত তোমার ভক্তকে কষ্ট দিয়াছি, এখনও দিতেছি, এই ভাবিয়া কেবল কাঁদি এবং অনুতপ্ত হই। এই পাপ-বোধ যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে। আমার দুরবস্থা দেখিয়াই তুমি স্বর্গের দেবদেবীদের লইয়া, আমার আত্মার

স্বস্তি ও শুশ্রূষা বিধানের জন্য মহোৎসব আনিলে। যেমন বায়ু-পরিবর্ত্তনে রোগীর পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি আমাকে সপরিবারে সদলে ভক্তগণের আত্মিক প্রভাবে স্বর্গের আবহাওয়া সম্ভোগ করাইয়া চিরপাপরোগমুক্ত এবং আত্মার পরিপুষ্টি বিধান করিবে, এই বিশ্বাস বিধান কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ও তোমার ভক্তগণের প্রভাবে এবার শুদ্ধ এবং সুখী হই, এবং উৎসবের মহাফলে নব জীবনে বাঁচিয়া যাই।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

—১—

মহা মহোৎসব।

বৈজ্ঞানিক নিয়মে পৃথিবী কখনও কখনও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, আবার কখনও তাহা হইতে দূরে পতিত হয়। এই নিয়মে পৃথিবী জড়রাজ্যে চলিতেছে। ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেও পৃথিবী কখনও স্বর্গের নিকটবর্ত্তী হয় ও কখনও স্বর্গ হইতে দূরে পতিত হয়। এই ভাবে পৃথিবীতে মানবজীবনও বিধাতার বিধানে পরিচালিত ও গঠিত হইতেছে।

মহামহোৎসব সেই সময়, যে সময় আমাদের বিধান-পরিবার স্বর্গের নিকটবর্ত্তী হয়, অথবা স্বর্গ আমাদের পৃথিবীতে অবতরণ করে। নব নব বিধানের আগমনও এইরূপ। ধরায় স্বর্গের বিশেষ আগমন বা বিধাতার অবতরণ। ব্রহ্ম বিধাতৃরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া যখন ধরাকে স্বর্গের দিকে উত্থান করান, তখনই আমরা বিধানের মহোৎসব-সম্ভোগে ধন্য হই।

বিধান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে আমরা ইহাই উপলব্ধি করি। বিধানের ব্যাপারে বা বিধান-সাধনে মানবীয় পুরুষকারের স্থান নাই। বরং মানুষ যখনই আপন জ্ঞান বুদ্ধি বিচার ও পুরুষকার যায়, তখনই সে বিধানচ্যুত হয়। বিধাতার হস্তে সম্পূর্ণ ফলাইতে আত্মসমর্পণই বিধান-সাধন।

এই জন্যই আমরা বিধানসাধনে এত বিফল-মনোরথ হইয়া মণ্ডলীর উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ হই। জ্ঞান বুদ্ধি বিচার আত্মশক্তি অংং যেখানে, বিধান নাই সেখানে। যাহা শিশুর পক্ষে সহজ, পণ্ডিতের পক্ষে তাহা দুর্জ্ঞেয়; মূর্খ, সরল বিশ্বাসীর পক্ষে যাহা সহজলভ্য, কঠোর তপস্বী বা যাগী গুরুর পক্ষে তাহা দুর্লভ। এই জন্যই আমাদের মনে হয়, বিধানসাধনে আমরা অকৃতকার্য্য হইতেছি।

বাস্তবিক নববিধান অতি সহজ বিধান। এই বিধানের উপাস্য যিনি, তিনি সেই আগেকার দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম নন। আমরা ব্রাহ্মসমাজে তাঁহারই সাধ্য সাধনা করিতে শিখিয়াছি, আমাদের তাহাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি ও পুরুষকারবলে আমরা জীবনের উন্নতি করিব, ধর্ম্ম সাধন করিব, অবস্থা ও পাপ জয় করিব, জ্ঞান বিচার দ্বারা সমাজের কার্য্য চালাইব, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব, তর্ক যুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত খণ্ডন করিব, ইহাই আমাদের অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই আমরা আপনারাও নববিধানের নবজীবনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না, অন্যকেও নববিধানের পরিবারে আনিতে পারিতেছি না।

তাই স্বয়ং নববিধানবিধায়িনী জননী আবার একটী উৎসব লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। উৎসব স্বর্গের পবিত্র আত্মার অবতরণ বা ঝড় বা প্লাবন। ঝড় যেমন পুরাতন হাওয়া বদলাইয়া দেয়, প্লাবন যেমন পুরাতন আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি আমাদের পুরাতন জীবন বদলাইয়া, আমাদের পুরাতন মত বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি ভাসাইয়া দিয়া, আমাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইবার জন্য উৎসব আসিল।

পুরাতন বৎসর যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, নূতন বৎসর আসিল, তেমনি আমার এই পুরাতন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলাইয়া দিয়া নূতন জীবনে সঞ্জীবিত ও নব নব উৎসবের প্রবাহে প্রবাহিত করিবার জন্য এই উৎসব। উৎসবের অর্থ ঊর্দ্ধগতি; আমাদের জীবনকে, আমাদের পরিবারকে, আমাদের মণ্ডলীকে, আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে, আমাদের জগৎকে, নব নব উন্নতি বা ঊর্দ্ধগতিতে তুলিয়া লইবার জন্য এই উৎসব। মা প্রতিদিন এক এক নূতন নূতন সাধনা বিধান করিয়া আমাদিগকে ঘনতর উৎসবের রাজ্যে উত্থিত করিলেন।

নবদেবালয়ের দ্বার উদ্ঘাটনের সঙ্গে আমাদের হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন, যেন তাঁহার সর্ব্বতীর্থসমন্বয়রূপ নবদেবালয়ে বসিয়া আমরা নিত্য নব নব ভাবে মার পূজা করি। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের আদি

প্রতিষ্ঠাতা এবং মণ্ডলীগঠন-কর্ত্তার সহিত আমাদিগের যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, তাহাও উপলব্ধি করিতে দিলেন।

নববিধানের মাহাত্ম্য এবং মহান্ ভ্রাতৃত্ব-যোগ সমাধান করিয়া, নববিধানে যে সর্ব্বসমন্বয়কারী চির উন্নতিশীল নবজীবন লাভ হয়, তাহার আস্বাদ দিয়া তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধন করিয়া দিলেন। মাতৃভূমির গৌরবানুভূতি ও নববিধান-সমুচিত সেবা, গৃহে নবধর্ম্ম সাধন, শিশুসেবায় শিশুত্ব লাভ, দীনসেবায় দীনাত্মতা অর্জ্জন, নববিধানাচার্য্যের স্বর্গারোহণে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, সাধু-সমাগমে সাধুসম্মান ও তাঁহাদের অধ্যাত্ম জীবনাদর্শের অনুসরণ, জনহিতৈষিগণের আত্ম-স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপর কর্ম্ম অবলম্বন, উপকারী বন্ধুদিগের উপকার-স্মরণে কৃতজ্ঞতা সাধন, বিরোধিগণের বিরুদ্ধতায় ক্ষমা সাধন করিয়া আত্মায় আত্মস্থ এবং সর্ব্বাঙ্গীনরূপে চিত্ত-শুদ্ধতা লাভ করিয়া আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া উৎসবের দ্বারে আনিলেন।

মহা মহোৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ব্রহ্মারতি-যোগে উৎসব আরম্ভ হইল। ব্রহ্মের বিরাটরূপ না দেখিলে কি উৎসব হয়? তাই এই ব্রহ্মারতির সাধনা। হৃদয় থালে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, পুণ্য, বিবেক রূপ পঞ্চ দীপ জ্বালিয়া নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করাইলেন। যেমন ব্রহ্মদর্শন, তেমনি তাঁহার বিধান-পতাকা গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান নারীগণ কর্ত্তৃক নিশান-বরণ।

ব্রহ্ম-মন্দিরে আমরা ব্রহ্মোপাসনা-যোগে ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারি, কিন্তু যদি তাঁহার বিধান আমাদের ঘরে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে যথার্থ উৎসব কি হইতে পারে? তাই আমাদের ঘরের পরিবারের মহিলা-গণ ছেলেমেয়েদের লইয়া যাহাতে নববিধানকে বরণ করিয়া লন এবং তাহা আমাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে তাহাই সাধিত হইল।

কোন রাজা যে কোন রাজ্যকে জয় করিলে সেই রাজ্যে তাঁহার জয়-পতাকা নিখাত করেন। নববিধানের রাজাও আমাদের গৃহে তাঁহার নিশান পুতিয়া আমাদের সংসার তাঁহার অধিকৃত করিয়া লইলেন। ইহাই নিশানবরণের নিদর্শন।

তাহার পর উৎসব-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে বিভিন্ন প্রকার সাধন-সহযোগে আমরা স্বর্গের মহোৎসবে সমুত্থিত হইলাম।

আকাশে উঠিলে যেমন সূর্য্য চন্দ্র এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে আমরা পড়িয়া যাই এবং পৃথিবীর নিম্নভূমির দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত হই, এখানকার নীচসঙ্গ কিম্বা সাংসারিক মানবীয় হট্টগোল হইতে যেমন আমরা ঊর্দ্ধলোকে উত্থান করি, নিম্নভূমির অতীত অবস্থায় উঠি, উৎসবও তেমনি আমাদিগকে পার্থিব অবস্থা হইতে সমুত্থিত করিয়া, স্বর্গীয় আনন্দ-সম্ভোগদানে ধন্য করিল।

বাস্তবিক উৎসব মানুষের হাতে নয়, ইহা বিধাতার স্বর্গীয় চক্র। তিনিই আমাদিগকে তাঁর অনির্ব্বচনীয় করুণাগুণে সংসারের নীচ ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে তুলিয়া, তাঁর স্বর্গের দেবদেবীগণের সঙ্গসহবাসজনিত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব-সম্ভোগে সক্ষম করিলেন এবং তজ্জ-নিত স্বর্গের অবস্থায় আনন্দলোকে এই এক মাস কাল বাস করিতে বা ভ্রমণ করিতে সৌভাগ্য দিলেন, ইহা যেন আমাদের চির জীবনের সম্বল হয়। এই উৎসবানন্দ হইতে নিত্য আনন্দোৎসবে যেন আমাদের জীবন উত্তরোত্তর বিধাতারই কৃপায় সমুন্নত হয়।

মার কোলে শিশু আত্মা উঠিয়া যখন মার অপার স্নেহগুণে স্বর্গের দেবদেবীগণের সহিত স্বর্গীয় আনন্দ ও স্বর্গীয় জীবন সম্ভোগ করে, তাহাই ত প্রকৃত উৎসব। এবারকার উৎসবে ইহাই সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইলাম।

—০—

যুগধর্ম্ম।

যৌবনকাল মানবজীবনের মধ্যাহ্নকাল। মধ্যাহ্নকালে প্রতিদিনে যেমন সূর্য্য ঊর্দ্ধাকাশে উত্থান করে ও আপন প্রখর তেজ বিস্তার করে, তেমনি মানুষের জীবনে যৌবনকালে তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভের প্রধান কাল। তাই এই কাল মানবের বিশেষ সৌভাগ্যের কাল। তবেই সৌভাগ্য হয়, যদি এই কালে সমুদায় হৃদয় মন জীবনদাতার চরণে মানুষ সমর্পণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য-সাধনে আত্মনিয়োগ করে। তাহা না করিলে এই কাল জীবনের মধ্যে বিশেষ পরীক্ষা-সংকুল হয়। জ্ঞানাভিমান, বিষয়-লালসা ও রিপুগণের প্রলোভন এই সময়ে মানুষকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত করে। সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় নীতি এবং ধর্ম্মবল। সে বল অর্জ্জিত না হইলে জীবনের উৎকর্ষ লাভ হইবে না। এই জন্য এই কালই ধর্ম্মার্জ্জনের বিশেষ কাল। ধন্য সেই যুবা বা যুবতী, যিনি তাঁর উত্তম উৎসাহ এবং মনের সমগ্র চিন্তা ও

আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মবল উপার্জ্জনে নিয়োগ করেন। বিদ্যালাভ করিবার জন্ত বা উৎকর্ষ-সাধনের জন্তই তাঁরা বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যমশীল হন; হৃদয় মনের উৎকর্ষ-সাধন এবং ইচ্ছাশক্তির সবলতাসাধনে আত্মনিয়োগ করাই যৌবনের প্রধান ধর্ম্ম। এবং তাহা করিতে জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার নিকট প্রার্থনাই প্রধান সাধন। তাহা ব্যতীত যৌবনের প্রকৃত গৌরব লাভ হইবে না এই জন্তই শাস্ত্রকার বলিলেন, "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" যৌবনকালেই ধর্ম্ম আচরণ করিবে। যিনি তাহা না করেন, জীবনের অপরাহ্ন কালে তাঁহাকে অধিকতর বিপদ পরীক্ষায় পড়িতে হইবে। সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

ব্রহ্মারতি।

ব্রহ্মারতি-যোগে উৎসবের উদ্বোধন আমাদের পরম সাধন। নিরাকার পরব্রহ্মকে উপাসনা ও আরাধনা-যোগে দর্শনসাধন বরাবর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু নববিধান কিনা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বিধান; তাই ইহাতে উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনের সঙ্গে বাহ্যানুষ্ঠানিক সাধনও সমন্বিত। কেবল আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রার্থনাই যদি আমাদের অবলম্বন হয়, তাহাতে কালক্রমে ইহাতে শুষ্কতা ও মৌখিক ভাব আসিয়া পড়িতে পারে; তাহা ছাড়া ইহা সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগের পক্ষে বোধগম্য বা গ্রহণীয় না হইতে পারে। সেইজন্ত বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারায় অধ্যাত্মসাধনার সরলতা-বর্দ্ধন আবশ্যক। সেইজন্ত অপৌত্তলিক ভাবে বাহ্য অনুষ্ঠান নববিধানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দীপালোককে অন্তরের বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, পুণ্য, বিবেকের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া, নিরাকার ঈশ্বরের উজ্জ্বল রূপ দর্শন করিবার প্রচেষ্টাই এই আরতি। যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই আরতি সাধন করেন এবং যাঁহারা তাহাতে যোগদান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্ত হন। জীবন্ত বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে যাঁহারা এই আরতি করেন ও যোগদান করেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে ইহার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এই অনুষ্ঠানকে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা যদি ভক্তিভাবে ইহাতে যোগদান করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইবে। যিনি এই আরতি করেন, তিনি নিজেও রূপান্তরিত হইয়া যান, এবং সকল মানবকেও রূপান্তরিত দেখেন। সূর্য্যের জ্যোতি যেমন চন্দ্রে ও গ্রহ নক্ষত্রে প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়, তেমনি বিশ্বাসাদি পঞ্চপ্রদীপ-যোগে ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিলে, নর নারীর মুখেও ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্তার রূপ প্রতিভাত দেখা যায়।

৮ই জানুয়ারী।

আজ কি সেইদিন, যেদিন কলিকাতায় কমলকুটীরে নববিধানের নবীন ঋষির শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়া গেল! আজ কি সেইদিন, যেদিন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা ভীষণ শোকের প্রবাহ ছুটিয়া গেল এবং সমগ্র পৃথিবীতে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে একটা নিদারুণ শোকের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল! আজ কি সেই দিন, যেদিন কলিকাতার প্রশস্ত পথে পুষ্পমাল্য-পরিশোভিত সমাহিত নীয়মান দেহের পশ্চাতে সহস্র সহস্র ভারতবাসী ও ইংরাজ নীরবে ও গম্ভীর ভাবে অনুসরণ করিল এবং দ্বিতলত্রিতলবাসী পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনির সহিত সেই দেহের উপরে ভক্তিপুষ্প বর্ষণ করিল! আজ কি সেইদিন, যেদিন কলিকাতা নগরীর তৎকালীন "বঙ্গবাসী" পত্র সেই সমাহিত ঋষির শোক-চিত্র আঁকিয়া স্পন্দিত লেখনীতে লিখিলেন যে, "বহুদিন পরে ভারতের ভাগীরথীবক্ষে ঋষিভস্ম ভাসিয়া গেল!" আজ কি সেই দিন, যেদিন বঙ্গের ইংরাজী মুখপত্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" মহা শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় সেই চিত্র আঁকিতে গিয়া তাহার উপক্রমণিকায় লিখিলেন যে, "The Prince has fallen" এবং Bengali পত্রও সেই ভাষা লিখিতে লিখিতে বলিলেন, "Even England could not boast of such an orator"! আজ কি সেইদিন, যেদিন বঙ্গের তৎকালীন কবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতায় "কেশব-বিয়োগ" গ্রন্থ বাহির করিলেন এবং আমিও সেই সময় পীড়া-শয্যায় শায়িত অবস্থায় স্পন্দিত লেখনী ধারণ করিয়া কবিতা ছন্দে "কেশব-প্রয়াণ" নামে ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ সেই স্মৃতিতে নিবেদন করিলাম। আজ এই অবসরে সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে ২।৪টী চরণ উদ্ধৃত করিলাম:—

"কমলকুটীর-স্বামী কমলকুটীরে
আর না বিরাজে আজ মরু-দরশন!
নববিধানের সেই নবীন ঋষিরে
আর না দেখিবে আজ ভারত ভবন।
আর কি কেশব আজ নববৃন্দাবন
কমলকুটীরে আজ করে অভিনয়;
"পাহাড়ী বাবা"র বেশে আর কি এখন
সে মূর্ত্তি দেখান আজ মরুক্ষেত্রময়!
আর কি এখন সেই টাউন হলেতে
মন্ত্রমুগ্ধ মত শ্রোতা শুনিবে এখন;
তাঁহার সে বীণা-শব্দ বীণা-কণ্ঠ হ'তে
আর কি করিবে আজ অমৃত বর্ষণ!
ভারত শ্মশান আজ—সে মূরতি নাই!
সেই ঋষিমূর্ত্তি আজ অদৃশ্য এখন;

বিরলে বিমনে আজ নরনারী তাই
গৃহেতে গৃহেতে করে অশ্রু বরষণ।

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল, এই সুর উঠিয়াছিল। আজও কি সেই সুর উঠিবে? এখন সে সুর আর খাটিবে না। এখন শ্রীকেশবকে আরও দেখিবার ও চিনিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহাকে চিনিবার পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। তিনি যে যোগ, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য, বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাসের সহজ পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা এখনও সে পথ চিনি নাই, এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতেও পারি নাই। আমরা যদি সেই পথ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে আরও দেখিতে পাইতাম। ঋষিত্ব লাভ না করিলে ঋষিকে চেনা যায় না। ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র তাঁহার "জীবনবেদে", তাঁহার যোগতত্ত্বে (Yoga Philosoply), তাঁহার "ব্রহ্মগীতোপনিষদে", তাঁহার "True Faith"এ এবং তাঁহার নবসংহিতার ভিতরে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছেন। বিশ্বাসের রাজ্যে আমাদের সে দর্শন ও সে বিচরণ এখনও আসে নাই। অমানিশা অতীত না হইলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় না। সাগরগর্ভে না ডুবিলে কে মণিমুক্তার সংগ্রহ করিতে পারে? ফুলের ভিতরে প্রবেশ না করিলে মক্ষিকা মধু সংগ্রহ করিতে পারে না। অনেক প্রস্তর ভেদ না করিলে সহস্র ধারার ধারা প্রবাহিত হইত না। বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ, আজ তাই বলিতেছি যে, আমাদের সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ কেশব বর্ত্তমান; আমরা কি আজ বলিব যে, তিনি নাই? চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দেখ, তাঁহার সেই যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও প্রেম পুণ্য সকলি বর্ত্তমান। তাঁহার সেই নববৃন্দাবন এখনও মূর্ত্তিমান। তাঁহার সেই বংশীরব (clarion call) এখনও আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা পথ ধরিতে পারিতেছি না, পথ না ধরিলে পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। অসীম ও অতলস্পর্শ সাগরবক্ষে নির্দ্দিষ্ট পথ (line) না ধরিলে ভাসমান তরী গন্তব্য উপকূলে উপস্থিত হইতে পারে না। আজ তাই সেই পুরাতন উচ্ছ্বাস ভুলিয়া গিয়া, নূতন উচ্ছ্বাসে ও নূতন ছন্দে ২।১টী চরণ লিখিতে আসিলাম :—

ঐ দেখ ভাই আজ নববৃন্দাবনে
দাঁড়ায়ে কেশব আজ নবীন বিধানে;
দেখ ভাই চেয়ে আজ বিশ্বাস-নয়নে
"পাহাড়ী বাবা"র বেশে যোগের আসনে।

(২)

দেখ তাঁর যোগ ভক্তি, কর্ম্মযোগ তাঁর,
নববিধানেতে তাঁর নূতন জীবন;
নূতন "পাহাড়ীবাবা" দেখ না আবার,
নূতন সংহিতা তাঁর কর অধ্যয়ন।

(৩)

"আমি পক্ষী" উড়ে গেছে নব কেশবের,
আবার বিবেক-কর্ণে শুন ভাই সবে;
ব্যাকুল জিজ্ঞাসা তাঁর ব্যাকুল প্রাণের
শুন ভাই আজ সব নির্জ্জন নীরবে।

(৪)

শুন ভাই শুন আজ কেশব আবার
জিজ্ঞাসেন আমাদের ব্যাকুল হইয়া;
"সত্যি করে বল তোরা মাকে কি আমার
দেখেছিস্, বল্ তোরা বল্ না আসিয়া"।

(৫)

এই স্থানে দেখ ভাই নূতন কেশব,
এই স্থানে দেখ তাঁরে আরও নূতন,
এই স্থানে দেখ তাঁরে ভাই ভগ্নী সব,
এই স্থানে তাঁর সাথে চল অনুক্ষণ।

(৬)

তাঁহার জীবন-গ্রন্থ কর অধ্যয়ন,
তাঁর সঙ্গে কর নববিধান সাধন,
তাঁহার জীবনবেদে নূতন জীবন
আনন্দেতে কর লাভ ভাই ভগ্নিগণ।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দান।

(৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬, বুধবার, সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতার মর্ম্ম)

কেশবচন্দ্র যে শ্রেণীর মহাপুরুষ, ইতিহাসে তাঁহাদের কীর্ত্তি কি কি, ও স্থান কিরূপ, সেই বিষয়ে আলোচনাই এইরূপ স্মৃতি-সভায় সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে। কিন্তু আজ আমার এখানে কিছু বলবার কথা ছিল না। তাই আমি সে ভাবে প্রস্তুত হ'য়ে আসি নাই। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে আমাকে কিছু বলবার জন্য দাঁড়াতে হ'ল। আমি ঐ বিষয়ে তিনটি কথায় সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র ক'রে, কেশবচন্দ্রের নিকটে আমার ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে আমি কি কি ঋণে ঋণী, সে বিষয়ে কিছু নিবেদন করতে প্রবৃত্ত হব; কারণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এখন তাই আমার পক্ষে সম্ভব।

প্রথমতঃ, বিবেকানুমোদিত আচরণকে মানুষের জীবনে ও ধর্ম্মে উচ্চ স্থান দিতে শিক্ষা দিয়ে কেশবচন্দ্র ভারতের সকল কল্যাণ-চেষ্টার ইতিহাসে এবং ধর্ম্মের ইতিহাসে একটি নবযুগ প্রবর্ত্তিত ক'রে দিয়েছেন। বহুকাল হ'তে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, ভারতবাসী জনসাধারণের চরিত্রের প্রধান সদ্‌গুণ উদারতা,

সহিষ্ণুতা ও কোমলতা। এখন সেই কোমল-প্রকৃতি ভারত-বাসীর চরিত্রে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে, আদর্শরক্ষার জন্য বীরত্ব, কল্যাণ কর্ম্মের জন্য ত্যাগ, যাহা অসত্য, অন্যায় বা অপবিত্র, তাহাকে বাধা দিতে অনমনীয় দৃঢ়তা। ভারতবাসীর চরিত্রে ও ধর্ম্মে এ ধারাটী প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কেশবচন্দ্রের শিক্ষা হ'তেই তার আরম্ভ।

দ্বিতীয়তঃ, সকল দেশের ও সকল যুগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহা-পুরুষদের সাধনাকে নিজ ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত ক'রে নিতে কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। দেহের খাদ্য-পানীয় সম্বন্ধে মানুষ স্বদেশী বিদেশীর ভেদ করে না; কিন্তু আত্মার খাদ্য-পানীয় সম্বন্ধে মানুষ আগে স্বদেশী বিদেশীর ভেদ করত। এক দেশে উৎপন্ন শস্য অন্য দেশের মানুষের শরীর পুষ্ট ক'র্তে পারে; কিন্তু মানুষ আগে ভাবত যে, বিদেশীর ধর্ম্মভাব দিয়ে আমার আত্মার পুষ্টি কেমন ক'রে হবে? কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে পর কেহ নাই। তাঁর শিক্ষা এইটুকু মাত্র নয় যে, সকল স্থান হ'তে সত্য সংগ্রহ করতে হবে; তিনি বলেছেন, সকল দেশের ও সকল সাধু ভক্তের ধর্ম্মাদর্শকে আমার ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লে সাধন না করলে, আত্মস্থ না করলে, আত্মার রসরক্তে পরিণত না করলে, আমাদের ধর্ম্মসাধন সম্পূর্ণ হয় না।

তৃতীয়তঃ, বাংলা দেশের ইতিহাসে দেখা যায়, কেশবচন্দ্রের জন্য বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কাছে সম্মানিত ও তাদের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে উঠল। তিনি বাংলাদেশকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও জগতের অন্যান্য দেশের ভগিনী ক'রে দিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের যে বন্ধুতার ফলে পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেসের জন্ম হয়, কেশবচন্দ্র সে বন্ধুতার প্রথম প্রবর্ত্তক।

এখন আমি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের যোগের কথা বলি। আমি তাঁকে চক্ষে দেখি নাই; কিন্তু আমার মনের চোখের সম্মুখে তাঁর ছবি খুব উজ্জ্বল।

আচার্য্য শিবনাথ বলতেন, ধর্ম্ম শুধু জানবার শোনবার শোনাবার বিষয় নয়; ধর্ম্ম সত্য হ'লে ধর্ম্মকে দেখা যায়। চৈতন্যদেব তো অতি অল্প কথাই বলেছেন; তিনি আপনাকে দেখিয়েই আপনার ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেছিলেন। কেশবচন্দ্র অনেক শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন বটে; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মজীবনে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার চেয়েও, তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন, তার প্রভাব অনেক বেশী প্রবল। তিনি একজন ঈশ্বর-'গ্রস্ত' মানুষ ছিলেন; উঠতে বসতে খেতে শুতে, সব সময় তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকতেন। সারাদিনের সব কাজ-গুলিকেও, এমন কি শরীর-সম্পর্কিত কাজগুলিকেও, তিনি ব্রহ্মসহবাসের অন্তর্ভুক্ত ক'রে না নিয়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর নবসংহিতার আশীর্ব্বাদটি কি চমৎকার! যেন জলে নয়, ব্রহ্মে স্নান করা; যেন জল গায়ে ঢালা নয়, ব্রহ্মকে গায়ে ঢালা; যেন হরিকে দিয়ে অঙ্গমার্জ্জন, অঙ্গ শীতল করা। এই ভাবে চলতে চলতে শেষ চৈতন্যদেবের মতন তাঁরও চোখ হয়ে গিয়েছিল আবিষ্টের চোখ, 'গ্রস্ত' মানুষের চোখ; জগৎ তাঁর কাছে ব্রহ্মময় হ'য়ে নূতন হ'য়ে গিয়েছিল। এমন একজন মানুষকে মনের চক্ষে বারে বারে দেখতে পেলে ধর্ম্মসাধনে যে সাহায্য পাওয়া যায়, আর কোন বস্তু হ'তে তা হয় না।

ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম শুধু জ্ঞান নয়, ধ্যান নয়, পূজা নয়, কর্ম্ম নয়। আচার্য্য Sunderland ব'লেছেন, ধর্ম্ম হ'ল মানবাত্মার একটি experience এর ধারা। ধর্ম্ম মানবজীবনে কি কি করেন? এ প্রশ্নের একটি উত্তর এই যে, মানবজীবনকে নব নব অনুভূতির দ্বারা নানা স্বাদে স্বাদযুক্ত করেন, তাকে নানারূপে সম্পদবান্ করেন, enrich করেন। কেশবচন্দ্র আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন, আমাদের ধর্ম্মে কত স্বাদ আছে।

বিজ্ঞান বলেন, গোলাপ ফুল আদিম যুগে 'এক-পেটে' ছিল, অর্থাৎ তাতে এক স্তর মাত্র পাপড়ি ছিল। ক্রমে তার উন্নতি ক'রে ক'রে মানুষ তাকে বসরাই গোলাপে পরিণত করেছে; সে গোলাপে পাপড়ির কত স্তবক, তার কেমন সুন্দর বর্ণ ও কেমন সুগন্ধ! ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগে শুধু ঈশ্বরের মহিমা ও গাম্ভীর্য্যস্তোতক অর্চ্চনা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের সেই পূজা যেন ঐ 'এক-পেটে' গোলাপ। কেশবচন্দ্র যেন তাকে বসরাই গোলাপে পরিণত করে দিলেন। এখন ঈশ্বরকে আমরা যে ভক্তি নিবেদন করি, তাতে স্তরে স্তরে কত ভাব, তাঁর সঙ্গে কত প্রকার সম্বন্ধ; সে ভক্তিতে এখন কত স্বাদ! কেশবচন্দ্র দেখালেন যে, ঈশ্বরকে কত ভাবে ভালবাসা যায়, তাঁকে নিয়ে কত কি করা যায়। শুধু ঈশ্বরের অর্চ্চনা নয়, ঈশ্বরের বাণী শোনা যায়, সেনাপতিরূপে তাঁকে দেখে, তাঁর আদেশ পালন করা যায়; তাঁকে নিয়ে সংসার করা যায়, খেতে বসা যায়, বেড়াতে যাওয়া যায়, রান্না করা যায়, খেলা করা যায়, আমোদ কৌতুক করা যায়, মত্ত হওয়া যায়, ক্ষিপ্ত হওয়া যায়।

বহুযুগ পূর্ব্বে চৈতন্যদেব এ ভাবের কথা বলেছিলেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর যে অমৃতময় কথোপকথন হয়, তাতে দেখা যায় যে, পুরাতন শীর্ণ আদর্শগুলি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারল না। 'দেবতার সন্তোষ বিধান',—এ আদর্শে তিনি তৃপ্ত হ'লেন না। এমন কি, গীতার 'নিষ্কাম কর্ম্ম' যে এমন উন্নত আদর্শ,—তাও তাঁকে তৃপ্ত করতে পারল না। তিনি তৃপ্ত হ'লেন সেই বহু-স্বাদযুক্ত ভক্তিতে, যার ভিতরে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরের সমাবেশ। আমাদের নববিধানী ভাইয়েরা একটি বড় মিষ্টি গান করেন, সে গান ক'রে আমিও অনেক সময় সুখী হই; তাতে আছে,—"আমি কবে যাব সেই মধুপুর? আর কত দূর! যথা সামঞ্জস্য শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর!"

এক সাদা আলোর ভিতরে কত বিচিত্র রং আছে, prism

তা দেখিয়ে দেয়। ভক্তপ্রাণ যেন ভক্তির পক্ষে সেই prism। ভক্তির ভিতরে কত রং, আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের স্বচ্ছ প্রাণ তা আমাদের কাছে প্রকাশ করে। তাই ভক্তদের মুখে নিত্য নিত্য ভগবানের নূতন নূতন নাম সৃষ্টি হয়। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে 'তাপময়ী মা' বলেছেন; 'রূপবান্' 'মনোমোহন' বলেছেন; হাফিজের অনুকরণে 'চিত্তলুণ্ঠনকারী' বলেছেন; শস্যক্ষেত্রে নানা রঙের সমাবেশ দেখে ব্রহ্মকে 'সৌখীন' বলেছেন। তাঁর ভাবে ভাবিত ধর্ম্মসাধকদের মধ্যে এখনও ঈশ্বরের এই সকল মিষ্ট নাম প্রচলিত।

শুধু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই যে বহু স্বাদযুক্ত ও বহু ভাবের সমাবেশ, তা নয়। মানবীয় প্রেমও তাই। George Eliot তাঁর Adam Bede নামক উপন্যাসে বলেছেন, প্রত্যেক সবল পুরুষের অন্তরে তার দয়িতার প্রতি যে প্রেম জাগে, তার মধ্যে মাতৃস্নেহের অনুরূপ একটি ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে; সে নিজ দয়িতাকে মায়ের মতন সকল অমঙ্গল হতে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়। কথাটি আশ্চর্য্য, কিন্তু অতি সত্য। মানবীয় প্রেম যতই উন্নত হয়, ততই সে বহু-স্বাদযুক্ত হয়।

মানুষের ভক্তির বিষয় ছেড়ে দিয়ে যদি ঈশ্বরের অনন্ততার কথা চিন্তা করি, দেখতে পাই, এ বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র-প্রমুখ ভক্তদের সাধন হতে আমরা কত মধুময় অনুভূতি লাভ করি। ঈশ্বর অনন্ত কিসে? শুধু কি দেশে কালে? শুধু কি তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর শক্তিতে, তাঁর মহিমা ও ঐশ্বর্য্যে? না; শুধু তা নয়। এই শ্রেণীর অনন্ততার ধারণা মনকে শুধু একঘেয়ে বৃহত্ত্বের ছবি দেখায়; বিচিত্রতার অনুভূতি দিতে পারে না। এই mathematical infinitude জ্ঞানকে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি দিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে তৃপ্তি দিতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ততার প্রধান স্বাদ মানুষের সঙ্গে তাঁর বিচিত্র লীলায়; বিশেষ ক'রে ভক্তদের সঙ্গে তাঁর বিচিত্র মধুময় লীলায়। এ অফুরন্ত স্বাদটি যোগ ক'রে দিয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র আমাদের ঈশ্বরারাধনার মধ্যে 'অনন্ত' স্বরূপে একটি অমৃতময় ধারা প্রবর্ত্তিত করে দিয়েছেন।

শুধু ঈশ্বর ও মানুষের সম্বন্ধ বিষয়ে নয়, সাধুভক্তদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের ভাবেতেও আচার্য্য কেশবচন্দ্র একটি অপূর্ব্ব স্বাদ সঞ্চার ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। সাধুভক্তদের প্রতি আমাদের মনের ভাবে ক্রমশঃ অধিক অধিক অন্তর্ম্মুখীন চারিটী স্তর আছে। (১) তাঁরা বিদেশী বলে, অথবা ভিন্ন যুগের মানুষ বলে, আমাদের মন বিমুখ হবে না, এই উদারতার ভাবটি প্রথমে শিক্ষা করতে হয়। কেশবচন্দ্র যে এ শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, তা আমি প্রথমেই বলেছি। (২) আরও ভিতরে গেলে আসে, ঐতিহাসিক গবেষণার স্তর; সাধুদের সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করবার জন্য মনের ব্যাকুল ভাব। (৩) মানুষের ধর্ম্মসাধনে যা প্রয়োজন, তা কিন্তু আরও একটু ভিতরের ব্যাপার; তা হ'ল শ্রদ্ধাপূর্ণ শিষ্যত্ব স্বীকার। এই শ্রদ্ধাপূর্ণ শিষ্যত্ব-স্বীকারের ফলেই আমরা আমাদের ধর্ম্মসাধনে ভক্তদের জীবন ও উক্তি হ'তে অনুপ্রাণন লাভ করি।

(৪) কিন্তু আরও ভিতরের স্তর আছে। কোনো মানুষকে জানা বা তাঁর উপদেশ অধ্যয়ন করা, এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এই দুই এক নয়। ব্যাকুল ধর্ম্মসাধকের হৃদয় উৎসুক হয় যে, কত দিনে ভক্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হবে; কত দিনে এমন হবে যে, আমি তাঁকে ডেকে নিজের সব মনের কথা বলতে পারব, আমি তাঁর আশ্বাসবাণী, উৎসাহবাণী, আদরের বাণী শুনতে পাব, তাঁর সঙ্গে আমার চোখে চোখে চাওয়া হবে, মনের কথার বিনিময় হবে; আমি তাঁর অন্তরঙ্গ দলের একজন মানুষ হব।

এই স্তরে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত ভক্তসঙ্গের প্রকৃত সুফল লাভ করা যায় না। আমার যৌবনে আমি যখন জীবনের নানাবিধ সংগ্রামে বড়ই জর্জ্জরিত ও ভারাক্রান্ত ছিলাম, আমি অনুভব করতে চেষ্টা করতাম যে, যীশু আমাকেও ডাকচেন; তাঁর সেই অমৃতময় আহ্বানটি,—"যাহারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দান করিব",—আমার জন্যও আসচে। আমি এই অনুভূতির দ্বারা বড় সান্ত্বনা লাভ করতাম।

কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে এইরূপ যোগস্থাপন ব্রাহ্মসমাজে অনেকেই বুঝতে পারেন না। আমার যৌবনের ঐ অনুভূতির কথা শুনে সে সময় আমাকে আমার একজন পূজনীয় ব্যক্তি বলেছিলেন, "তবে তুমি খ্রীষ্টান হ'লে না কেন?" কি আশ্চর্য্য! আমি কি যীশুকে ঈশ্বরের স্থানে বসাচ্ছি? তা তো নয়। কিন্তু তাঁকে মানুষ বলে জেনেও, তাঁর সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গতা স্থাপন না হ'লে তাঁর কাছ থেকে আমার যা পাওয়া সম্ভব, তার অনেকখানি কম পড়ে যেত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই অর্থেই ধর্ম্মসাধনের ভিতরে "সাধু-সমাগম" নামে একটি নূতন অমৃতময় সাধন যোগ ক'রে দিয়েছিলেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের এই ভাবে ভাবিত হ'য়ে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর একটী গানে লিখেছিলেন, "করব প্রেম-ভিক্ষা তাঁদের (ভক্তদের) চরণে ধ'রে", অর্থাৎ ভক্তেরা যেন আমাকেও তাঁদের ভালবাসার মানুষগুলির অন্তর্গত ক'রে লন, যেন আমাকেও তাঁদের অন্তরঙ্গ ব'লে স্বীকার করেন, মন এই কামনা করে। ভক্তদের সঙ্গে এ ভাবে ঘনিষ্ঠ হতে না পারলে আমাদের প্রাণের গভীরতম পিপাসা তৃপ্ত হয় না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দীক্ষাব্রত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিবস ৭ই পৌষ।

অদ্য শুভ ৭ই পৌষ। এই শুভ ৭ই পৌষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য কুড়ি জন সঙ্গিগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই জীবিত নাই—সকলেই পরলোকে। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনপ্রভৃতি যাঁহারা দীক্ষা-গ্রহণে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে পরলোকগমন করিয়াছেন। আর অল্পসংখ্যক লোকই, বোধ হয়, ইহলোকে জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক ব্যতীত কেহ যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত সম্পূর্ণরূপে পালনপূর্ব্বক উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তাহা শুনিতে পাই না।

২। ৭ই পৌষ পবিত্র কেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রত সম্পূর্ণ উদ্‌যাপন করিয়া দীক্ষা-দিবসকে পূর্ণ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। মহর্ষি দেখাইলেন যে, দীক্ষার অর্থ কেবল কতকগুলি অর্থহীন মন্ত্র মুখস্থ আওড়ান নহে, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের অর্থ হৃদ্‌গত করিয়া তাহা সাধ্যমত জীবনে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা—এক কথায় এইরূপ মন্ত্রের সাহায্যে নিজের জীবনকে সংগঠিত করা, ইহাতেই দীক্ষাদিবসের পবিত্রতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনের দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। এই কারণে ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই নিকটে ৭ই পৌষ বড়ই পবিত্র বলিয়া গৃহীত হয়।

পবিত্র ১১ই মাঘ জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক-ভাবের ব্রহ্মোপাসনার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ঐ দিবস যেমন জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও উৎসবের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ পবিত্র ৭ই পৌষ দিবসে দীক্ষাপ্রণালী-প্রবর্ত্তনের দ্বারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাসকদিগের সংসারের সকল ক্ষেত্রে ও জীবনের সকল বিভাগে অপ্রতিম পরমেশ্বরের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাইলেন ও তাঁহার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন বলিয়া, ঐ দিবসও জগদ্বাসী ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই নিকট একটি পুণ্য দিবসরূপে গৃহীত হইয়াছে ও হইতে থাকিবে।

৩। দীক্ষাব্রতের গুরুত্ব।

এই দীক্ষাব্রতের গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল স্মৃতিদিবসস্বরূপে বা উৎসবের দৃষ্টিতে এই দিবসকে দেখিলে চলিবে না; দীক্ষার গুরুত্ব ও পবিত্রতা, দীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া উহাতে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে এবং ভগবানের সহিত আপনাকে একাত্মযোগে যুক্ত করিতে হইবে, তবেই এই ৭ই পৌষে উৎসব অনুষ্ঠানের সার্থকতা হইবে।

৪। দীক্ষাপ্রবর্ত্তন বিষয়ে মহর্ষির উক্তি।

এই দীক্ষাপ্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মহর্ষি বলেন, "যখন সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে, লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্য আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন।। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই।......যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে, যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন।"

৫। দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রয়োজনীয়তা।

দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত সেই আদিম দীক্ষাপ্রণালীর অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দীক্ষাপ্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপরপ্রচলিত বিবাহসম্বন্ধীয় পণপত্র প্রভৃতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দীক্ষাকালেও একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাকে উহার অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা দীক্ষাগ্রহণের একটা বহিশ্চিহ্ন মাত্র স্বীকার করি। অন্তরে প্রতিজ্ঞা-পালনের তীব্র ও গভীর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে শত স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র যে সাধারণতঃ ছিন্নপত্ররূপে গৃহীত হইবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অন্তরে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা প্রতিজ্ঞাগ্রহীতাকে ব্রতপালনে প্রভূত সহায়তা করে এবং বিপথে পদার্পণ হইতে সহজে রক্ষা করে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, সুরাপাননিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার ফলে অনেক ব্যক্তি সুরাপায়ীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণের বলবিধান সম্বন্ধে আমরা মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হইতেও যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

৬। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালী সরল ও সহজ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত দীক্ষাপ্রণালী অতি সরল ও সহজ। ইহার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের কোন প্রকার ঘনঘটা আবশ্যক নাই, অথবা কুলগুরু প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষেরও অপেক্ষা নাই; প্রত্যেক মানবই ভগবানের সন্তান এবং তিনি প্রত্যেক মানবেরই পিতামাতা। প্রত্যেক সন্তান যেমন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলেই কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া তাহার পিতামাতার নিকটে সহজে উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক মানবসন্তানও আকাঙ্ক্ষা জাগিলে যাহাতে পরম পিতামাতা পরমেশ্বরের নিকট সরল ও সহজ পথ ধরিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তাহারই উপযুক্ত পথনির্দ্দেশক করিয়া এই দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৭। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালীতে সাম্প্রদায়িকতার অভাব।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বেও সুবিস্তৃত সকল ধর্ম্মসমাজের মধ্যেই নিজ:নিজ ধর্ম্মমতের অনুযায়ী দীক্ষা লইবার প্রথা যে প্রচলিত ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কোন না কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ বা ব্যবহার করা সেই সকল প্রণালীর অঙ্গীভূত ছিল, দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণের বা ব্যবহারের অবসর আসে নাই এবং আসিতে পারেও না।

৮। দীক্ষামন্ত্র গোপনীয় রাখার কুফল।

ব্রাহ্মসমাজের এই দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা গোপনীয়—ইহার মন্ত্রও গুপ্তমন্ত্র নহে এবং ইহার প্রকৃত ইষ্টদেবতা যিনি, তিনি অকিঞ্চনগুরু এবং প্রত্যেক মানব-সন্তানেরই অন্তরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। যতদূর বোঝা যায়, আমাদের দেশে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব অবধি দীক্ষা লওয়ার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশে তান্ত্রিক দীক্ষারই সমধিক প্রাবল্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। আজকাল কি তান্ত্রিক, কি বৈষ্ণব, প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের সর্ব্ববিধ দীক্ষাপ্রণালীতেই দীক্ষামন্ত্র ও ইষ্টদেবতার নাম গোপন রাখিবার অনুশাসন দেওয়া হয়—মনে হয়, এই সকল গোপন রাখাই দীক্ষাদাতা কুলগুরু-দিগের সমস্ত অনুশাসনের মুখ্য ভাব। এই প্রকার গোপন রাখিবার অনুশাসনের ফলে দীক্ষার্থীর হৃদয় যে অজ্ঞানের কিরূপ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার পথে অগ্রসর হয় এবং সে কিরূপ কঠোর মানসিক পরাধীনতার দাসখতে স্বাক্ষর করে, তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অনুশাসনের ফলে অযথা গুরুবাদ ও তদনুসঙ্গী শতবিধ অনাচার এই প্রাচীন জরা-জীর্ণ সমাজগাত্রে এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজ আজ শতবর্ষ চেষ্টার ফলেও সেগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া, সমাজদেহে উপযুক্ত নববল সঞ্চার করিতে পারিতেছেন না।

৯। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষার গোপনীয় কিছুই নাই।

ব্রাহ্মসমাজ যে দেবতাকে অন্তরে ধারণ করিয়াছেন, সে দেবতার নামও যেমন গোপনীয় হইতে পারে না, তাঁহার পূজার মন্ত্রও সেইরূপ গুপ্তমন্ত্র হইতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্বভাবতই প্রচলিত দীক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বপ্রথম দীক্ষার ভাব সুস্পষ্ট বুঝাইয়া প্রকাশ্যভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ইহা বুঝাইয়া দিলেন, ইষ্টদেবতা যিনি, কতকগুলি শব্দের অর্থবোধ না করিয়া সেগুলির আবৃত্তিমাত্রই তাঁহাকে পাইবার পথ নহে। অন্তরের দেবতা যিনি, একমাত্র কুলগুরু ও তাঁহার মুখনিঃসৃত শব্দের উপর, বুঝি বা-না বুঝি, অটল বিশ্বাস তাঁহার নিকট পৌঁছিবার প্রশস্ত পথ নহে। ব্রাহ্ম-সমাজ বুঝাইলেন, বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানবের অন্তরে মঙ্গলময় পরম দেবতারূপে যিনি চির বিরাজিত, যিনি পাপী তাপী, সাধু অসাধু বিশ্বরূপের একটি মানবকেও পরিত্যাগ করেন নাই, প্রত্যুত প্রেমপূর্ণ আহ্বানে প্রত্যেক মানবকেই নিজের অভিমুখে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে সরল পথে পৌঁছিবার জন্য যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, তাহার মধ্যে গোপ-নীয় কোন কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানব-সন্তান কোন কিছুর অভাব বা কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করিলে, অথবা কোন কারণে প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে, যেমন সহজেই পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানব প্রত্যেকের ইষ্টদেবতা বিশ্বপিতা ও অখিলমাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সহজেই উপস্থিত হইতে পারে—তাহাতে এতটুকু বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ভগবানের চরণে উপস্থিত হইবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, মনীষার প্রয়োজন নাই—চাই কেবল প্রাণের গভীর ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পিতামাতার নাম গোপন রাখিবার, অথবা পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সরল পথ ধরিবার নিষেধবিধানে কে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারে? সেইরূপ আমরা ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, যে দীক্ষাপ্রণালী প্রাণের ইষ্টদেবতার নাম অথবা তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার সরল পথনির্দ্দেশক মন্ত্র গুপ্ত রাখিবার অনুশাসন দেয়, সেই দীক্ষা-প্রণালী নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নহে।

১০। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালীর উদারতম ভিত্তি।

ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মদীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া-ছেন, তাহার জন্য যেমন বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ অভ্রান্ত গুরুরও কোনও অপেক্ষা নাই। দীক্ষার্থীর প্রাণে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে, তিনি স্বয়ং অকিঞ্চন-গুরুরূপে দীক্ষার্থীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন; এবং তাঁহার অন্তরে স্বহস্তে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া সরলপথে নিজের অভিমুখে তাঁহাকে পরিচালিত করেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কেবল তোমার বা আমার জন্য নহে, কিন্তু বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানবেরই জন্যে। সেই কারণে সেই সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দীক্ষাপ্রণালী ও তাহার মন্ত্র জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই দীক্ষাপ্রণালী ও মন্ত্র স্বভাবতই উদারতম ভিত্তির উপর সংগঠিত—সেই দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে গোপনীয় কোন কিছুই নাই, অথবা তাহার মন্ত্র গুপ্তমন্ত্র নহে এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা আসিলেই দীক্ষার্থী যে কোন উপযুক্ত সাধক ও জ্ঞানী সাধু পুরুষের নিকট উক্ত মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন।

১১। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষামন্ত্রের মূলভাব।

সেই দীক্ষামন্ত্রের মূল অবলম্বন মাত্র দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দীক্ষার্থীকে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার আত্মা যেমন তাঁহার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিতি করে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ

জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয় ও অপ্রতিম পরমাত্মা এই বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এবং প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে কিন্তু পৃথকস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের করুণাময়ী মাতা ও স্নেহময় মঙ্গলবিধাতা পিতা। তাঁহার ও জীবাত্মার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। তাঁহাকে পাইতে চাহিলে সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে এবং যে সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়, অনুরাগের সহিত সেই সকল কার্য্যই সাধন করিতে হইবে। ইহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তিত দীক্ষাপ্রণালী এবং ইহাই হইল তাহার মন্ত্র। এই মন্ত্র কেবলমাত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সরল পথের নির্দ্দেশক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রমাত্র। সেই কারণে ইহার মধ্যে সীমাবদ্ধ মূর্ত্তি-পূজার কোনপ্রকার ছায়া অথবা অভ্রান্ত গুরুবাদ প্রভৃতির ভ্রান্ত মতবাদ অর্গলরূপে দাঁড়াইতে পারে না।

১২। মহর্ষিদেবের দীক্ষায় শিক্ষণীয়।

আজ যাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিবার দিন, তাঁহার জীবনের অনুধ্যানে যদি আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি ও হইতে চাই, তবে আমাদের প্রাণে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তীব্ররূপে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের অন্তরে বরণ করিয়া উহারই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণের সার্থকতা যদি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তবে মূর্ত্তিপূজা ও তদনুসঙ্গী গুরুবাদ প্রভৃতি শতবিধ গণ্ডী চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, একনিষ্ঠভাবে ভগবানের চরণতলে অগ্রসর হইতে হইবে, আমাদের সমস্ত জীবন তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। অপ্রতিম পরমাত্মাকে সত্যই আমাদের পিতামাতা বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। পাপী তাপী সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে সকল মানবকেই তাঁহার পূজার মন্ত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে বিতরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মানবকেই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সরল পথপ্রদর্শনে সর্ব্বান্তঃ-করণে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। এই শুভদিনে এই শুভকার্য্যের ব্রতগ্রহণে অগ্রসর হও।

ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন—যেন আমাদের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক অনুষ্ঠান তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত হয়।

—o—

যুবোৎসব।

(যুব উৎসবের সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদারের অভিভাষণ)

আমার যুবক ও তরুণ বন্ধুগণ! আজকার আনন্দ-সম্মিলনে এই বিদেশস্থ প্রৌঢ় বন্ধুকে আপনারা সভাপতি মনোনীত করায় আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কলিকাতা নগরীতে বহু উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত হিতৈষী বন্ধু আপনারা সহজেই পেতে পারতেন। তাহা না করিয়া এরূপ নির্ব্বাচনের মূলে আমি দেখিতে পাই, আপনাদের প্রীতিই এই অজানা বন্ধুকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছে। আমি সঙ্কুচিত হৃদয়ে আপনাদের প্রীতি ও ভাল-বাসার উপর ভিত্তি স্থাপন করে, এই সম্মানের জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সম্মিলনে আনন্দ-উৎসবে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া দু একটা কথা নিবেদন করচি।

আপনারা জানেন, এই শান্তিকুটীর আমাদের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আবাস ছিল। তাঁহারই আবাস আজ তাঁহারই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর মহৎ উদ্দেশে আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আজন্ম সাধক ও সেবিকা। কলিকাতার এই আবাস শান্তিকুটীর চিরকাল শান্তি ও শুদ্ধতার পূর্ণ ছিল। এখন ইহা আশ্রমে পরিণত হয়ে এই আবাস-তীর্থ শান্তি ও শুদ্ধতার গৌরবে পূর্ণতর হউক, ইহাই আমাদের যেন লক্ষ্য হয়।

প্রতাপবাবু ছিলেন যুবকদিগের আজন্ম বন্ধু। তিনি নিজে অপুত্রক ছিলেন। এখানে হয়তো কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা জানেন, তিনি যুবকদের নিয়ে কি রকম আন্তরিক ভাবে মিশতেন। তাঁহারই চেষ্টায় Society for the Higher Training of Youngmen এবং পরিশেষে Calcutt University Institute স্থাপিত হয়। আমি আশা করি, আমার তরুণ বন্ধুগণ প্রতাপচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রৌঢ়দের সঙ্গে মিলিত ভাবে কাজ করিবেন।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতা ছেড়ে বহু দূরে বর্ম্মায় চলে গিয়েছি। এই দীর্ঘ ৪০বৎসরে নানা রকম পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এখানে ও অন্যান্য স্থানে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহার জন্য স্বদেশেই থাকি বা বিদেশে থাকি, নিজের বাঙ্গালা দেশের উন্নতি দেখলে গৌরব মনে করি। এই গৌরবকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে তরুণের দিকে তাকাতে হয়। তাঁহারাই হচ্ছে ভবিষ্যতের আশা এবং সেইজন্য দেশে দেশে আজকাল এত আন্দোলনই চলচে। ইহাকে জয়যুক্ত ও কার্য্যে পরিণত করতে হলে আমাদের সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে (Team work); নতুবা সফলতা কখনই দেখা দিবে না। দশজনে মিলে কাজ করতে গেলেই অপরের ত্রুটী ও নিজের আত্মাভিমান সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়ে কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। আমরা যদি ত্যাগ স্বীকার করিতে আরও অভ্যস্ত হই, তবে উল্লিখিত বাধা অতিক্রম করিতে বেগ পাইতে হয় না। আমি মনে করি, আজ বাঙ্গলা দেশে আমাদের বিশেষ ভাবে মিলিত হয়ে কাজ করিবার অত্যন্ত অন্তরায় আসছে। ঐ বিপত্তি বহুকাল থেকে আছে এবং এখনও ইহা বিশেষ ভাবে দর্শন দিতেছে। আপনারা জানেন, সেদিনের Australianদের সঙ্গে All India Cricket খেলার পরিণাম। বিদেশীরা পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন যে, ভারতী-

য়েরা সম্মিলিত ভাবে খেলতে পর্য্যন্ত জানেন না বলেই তাঁরা হেরে গেলেন। এটা বিশেষ লজ্জার কথা। খেলাকেও যদি আমরা খেলা বলে না নিতে পারি, সেখানেও যদি আমরা আমিত্বকে কিছু ছোট করে না দেখতে পারি, তবে এই আমিত্বকে লইয়া আমরা কোন্ আনন্দধামে যাইব? এখানে এই ক্ষুদ্র "আমি"কে আমাদের আচার্য্যদেবের "Little bird I" মনে করিতেছি না, মুনি ঋষিদের "সোঽহং" ভাবিতেছি না, বোধিসত্ত্বের "নির্ব্বাণের" কল্পনাও করিতেছি না। আমার মনে হয়, আমাদের দৈনিক জীবনে অপরের জন্য বা মণ্ডলীর জন্য সহায়তা পোষণ করে, যদি কিছু সময়, সামর্থ বা সাহায্য দিয়া যাই, সময়ে সেটা আমাদের জীবনের দ্বিতীয় অঙ্গরূপে দাঁড়াইয়া যাবে। যখন মানুষের এইরূপ চরিত্র গঠিত হয়, তখন তিনি যে অবস্থাতেই পতিত হউন না কেন, অপরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা চরিত্রে গঠিত হইয়া যাবে। একটী বাস্তব সামান্য ঘটনা হইতে এইখানে ইহার দৃষ্টান্ত দিই। ১৯১০ সালে আমি চিকিৎসা ও অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমার এক আত্মীয় আমাকে লেখেন, তাঁর ২০০০৲ টাকার Duplicate Cheque, Thomas Cook এর মারফতে তাঁহার নামধারী কোনও বাঙ্গালী যুবক ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন। আমি সে সময় মোটে ৭দিন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছি। কাহাকেও চিনিনা বলিলেই হয়। Thomas Cook ব্যাঙ্কিং রীতি অনুসারে আমাকে অপরাধীর নাম ও ঠিকানা দিবেন না। সেখানে কাহাকেও চিনিনা, সেখানে আইন বিষয়ে যিনি সবার বড়, তাঁর কাছে যাওয়া ঠিক মনে করে, আমি Attorney General এর আপিষে গিয়ে উপস্থিত। Rufus Issac তখন Attorney General। কার্ড পাঠান মাত্রই তিনি তাঁহার কক্ষে লইয়া গিয়া অতি সমাদরে আমাকে জানাইলেন, তিনি আমার জন্য কি করিতে পারেন। আমি আইন পড়িতে লণ্ডনে আসিয়াছি এবং আমার বন্ধুর ২০০০৲ টাকার চেক আমি পুলিসের সাহায্যে উদ্ধার করিতে চাই বলিলাম। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে টাকার মালিক ভিন্ন অন্য কাহারও দরখাস্ত করিবার অধিকার নাই বলিলে, আমি একটু তর্ক করিবার উপক্রম করাতে, তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, আমি ভারতীয় কোন আইন ব্যবসায়ী, এবং ভারতীয় Criminal Law এর প্রশ্নাদি করিয়াছি। আমাকে অতি সাগ্রহে জানাইলেন যে, যতদূর সম্ভব, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। তাঁর ডেপুটীর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন আমার বাসার নিকটস্থ Detectiveকে phone করিলেন। তিনি বাড়ী ছিলেন না—তখন বলিলেন, কাল ৮॥টায় আমার বাসাতে আসিয়া যাহা করিবার সমুদয় করিবেন এবং দরকার হইলে আমি যেন আবার তাঁহার নিকট যাই। বলা বাহুল্য, আমাকে কোনও রূপ বেগ পাইতে হয় নাই। Detective এর সাহায্যে চেক দেখিলাম, যিনি নাম জাল করিয়া টাকা লইয়াছেন, তাহাও জানিতে পারিলাম। এবং দুই এক দিনের মধ্যে সেই বঙ্গীয় যুবক আসিয়া আপনার কু-কীর্ত্তির পরিচয় দিলেন। আমি তাহার পর অনেক দিন মনে করিয়াছি, সেদিন ইংলণ্ডের Attorney General এর যেন অন্য কোনও কাজ ছিল না! আমার জন্যই তিনি যেন বসিয়াছিলেন! এবং একজন অপরিচিত ভারতবাসীকে তিনি কিরূপভাবে তাঁর সময় নষ্ট করিয়া সাহায্য করিলেন! দ্বাদশ বৎসর পরে ইনিই ভারতে Viceroy হইয়া আসেন। আপনারা Lord Reading এর অল্পদিন হল লোকান্তরে তাঁর অনেক কার্য্যকারিতার বিষয় সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন। আমি এই সামান্য ঘটনাতে তাঁর পরোপকারের স্পৃহার একটী স্পষ্ট ছবি দেখিতে পাই। যিনি জাহাজের সামান্য কেরাণী হইতে ভারতের Viceroy ও অন্যান্য উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দৈনিক কার্য্যলিপি কিরূপ, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! মানুষের এই যে চরিত্র, ইহা একদিনে গঠিত হয় না। ইহা আজীবন কর্ম্ম-সাধনার পূর্ণ বিকাশ। আর একটী কথা এখানে বলিলে হয়তো অত্যুক্তি হইবে না। সেটী আমার ১৯১০ সালের সেই বঙ্গীয় যুবক। তখন ধরা পড়াতে, লণ্ডনের তাঁর পরিচিতদের দল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কেন না তাঁহার সুনাম ছিল। তার কিছুদিন পূর্ব্বে Dhinger কীর্ত্তি ঘটিয়াছিল। আপনাদের দুঃখের সহিত আমি জানাচ্ছি, এই যুবক কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হয়েছিলেন, এবং ২।৩ বৎসর আগে Receiver এর মামলার অনেক টাকা আত্মসাৎ করে জেলে গিয়াছেন। যখন দৈনিক পত্রে এই সংবাদ পড়ি, তখন আমার মনে পড়েছিল, সেই ২৬ বৎসর আগেকার কথা। এই Criminal mentality সে সময় দেখা দিয়াছিল, পরিণত বয়সে তাহা তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। সদ্গুণের পরিচয় সৎসঙ্গ; তাহাতে আপনাকে জড়িত করার মত সদুপায় খুব কমই আছে। সেই সঙ্গে আমাদের নবধর্ম্ম আমাদের পথ সহজ ও সরল করিয়া দিতেছেন। আমরা আনন্দ-হৃদয়ে, একভাবে মিলিতে শিখিয়া নিজেকে ধন্য করিবার পথে অগ্রসর হই, এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মহামহোৎসবের প্রাস্তুতিক সাধনা।

জয় মা আনন্দময়ী বলিয়া পূর্ব্ব বর্ষকে বিদায় দেওয়া হইল। নববর্ষারম্ভে রাত্রি ১২টার সময় নবদেবালয় ও কমলকুটীরের এবং মঙ্গলবাড়ীর নববিধানাশ্রমের ছাদে শঙ্খধ্বনি সহকারে নববিধান নিশান উত্তোলিত হইল।

১লা জানুয়ারী, প্রত্যুষে ৬টায়, নবদেবালয়ের রোয়াকে

সংগীত করিতে করিতে নবদেবালয়ে প্রবেশ করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ নববিধান-নিশান স্কন্ধে ধারণ করিয়া প্রবেশ করেন। ভ্রাতা সরলচন্দ্র সেন আচার্যদেবের দেবালয়-প্রতিষ্ঠার শেষ প্রার্থনা গম্ভীরভাবে আবৃত্তি করেন।

বেলা ৯টায় নববর্ষের উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই চন্দ্রমোহন দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক কয়টী নূতন সংগীত করেন। উপাসনার সার মর্ম্ম তিনিই যাহা লিপিবদ্ধ করেন, নিম্নে প্রদত্ত হইল। আচার্যদেবের ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন এবং ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপদেশ পঠিত হয়।

আরাধনা

সত্যং, তোমা ছাড়া আমরা নেই, এইটে সাব্যস্ত করবার জন্য তুমি আছ। তোমার আবির্ভাবে পুরাতন মরে যায়, নূতন জন্মায়। তুমি আমাদের 'আমি' হবার জন্য এই নবদিনে নূতন জন্ম দিলে। আজ উড়ে গেল আমার "আমি"। তোমাকে ছেড়ে তোমার সন্তান যেতে পারেন না, আমিও পারি না। তাই তোমা ছাড়া, তোমার সন্তান ছাড়া, আর কিছু আমি নই। তুমি আমাদের চোখের আলো হলে, আজ তোমাকে নূতন করে দেখাবার জন্য চিন্ময় জ্যোতির আলো জ্বাললে। অতীতে সিনাই পর্ব্বতে দেখা দিয়েছিলে, এখন তুমি প্রত্যেককে দেখা দিচ্ছ। তুমি দেখা দিয়ে আপনি আপনাকে ধরা দিয়েছ। তুমি বিশ্ব ঘিরে ভরে এমনি ভাবে তোমার সত্তায় ডুবিয়ে রেখেছ যে, যত ডুবি, আরও ডুবি, যত চাই, আরও চাই; অবশেষে পাল্লাম না বলে তুমি আমার কাছ ঘেঁসে এলে। তোমার নাম কি বলব, বল না? তুমি যে বড্ড ভাল মা। তুমি কি ভালবাসায় পাগল হয়ে গিয়েছ, জানি না। এই ছেলেটা মার কোল মলিন কচ্ছে, তবু তুমি ঠেলে ফেল না। যারা দুর্ব্বল শিশু, তারা কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারে? তাই তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব হয়ে রয়েছ। তাই তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হলে। ব্রহ্মানন্দ তোমাকে শুধু একমেবাদ্বিতীয়ম্ পিতা বল্লেন না, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সন্তান হ'লেন। তাই ত সকল মানবের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেলাম। এখন আর পাপ কোথায়? হাতে দেখি, ঈশার হাত, সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তের অঙ্গ। তোমার পরিত্রাণের নূতন মন্ত্র শেখালে। আর পাপ স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি ছুঁয়ে আছ, আমরা ছুঁতে পারি না। তোমার ব্রহ্মানন্দ তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করে আমাদের ছুঁয়ে আছেন। আর পুরাতন পাপ থাকতে পারবে না। নূতন জীবনে নবশিশু করে নিয়ে তুমি আত্মপ্রকাশ করেছ। আজ সেই নবশিশুর চক্ষে তোমার আনন্দময়ী মা, নববিধানবিধায়িনী মা রূপে দেখি। আজ সেই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে, অখণ্ড জীবন প্রাপ্ত হই।

প্রার্থনা

অদ্যকার দিনে আমাদিগের জন্য নবদেবালয় নবভক্তকে দিয়ে প্রতিষ্ঠা কল্লে। আজ তিনি দেহের মায়া পরিত্যাগ করে, আমাদের পরিত্রাণের জন্য এই নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা কল্লেন। আমাদের যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর হয়। আমাদের প্রত্যেককে সেই দেখা দেখতে দাও, যে দর্শন ভক্তকে দিলে। আমাদের প্রাণে সেই আবেগ দাও, যে এখানে এলে পরে তোমাকে দেখা যায়। আজ নূতন করে দেখা দাও। তোমাকে না দেখতে পেলে জগতের কল্যাণ হবে না। নূতন বৎসরের দিনে জগতের দুর্দ্দশা দেখ। তাই আজ জগৎকে দেখা দাও। আজ বলে দাও—"আমি তোদের সবার মা, কাউকে বাণবিদ্ধ করিস নে।" দেশে দেশে শান্তি স্থাপন কর। অখণ্ড ভ্রাতৃত্বে সকলকে মিলিত কর। আজ হতে নূতন বিধানে নূতন উৎসবের দ্বার খুলে দিলে। আজ এই ভিক্ষা চাই, ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্মপিতা যে ধর্ম্মপরিবারের সূত্রপাত করিলেন, যেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হই; এবং আমরা কাহাকেও বিচার না করি, পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে এক অখণ্ড পরিবার রচনা করতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ প্রসঙ্গাদি হয়। ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রথমে আচার্য্যদেবের ইংরাজীতে লিখিত জগজ্জনকে নববর্ষের লিপি পাঠ করেন। তাহার পর ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের উপদেশও পাঠ করেন। তাহার পর সেই সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়।

২রা জানুয়ারী ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রাতে নবদেবালয়ে উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ নববিধান সম্বন্ধে আচার্যদেবের উপদেশ পাঠ করেন ও বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ প্রসঙ্গ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র নববিধান সম্বন্ধে উপদেশ পাঠ করিয়া আত্মনিবেদন করেন।

৩রা জানুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন। মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া প্রার্থনা হয়। ভারতের পূর্ব্বগৌরব যেমন স্মরণ করিব, তেমনি ইহা যে নববিধানের জন্মভূমি, এখানে জন্মলাভ করিয়া আমরা কত সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী হইয়াছি ভাবিব। যাহাতে তাহার উপযুক্ত আমরা হইতে পারি এবং শরীর মন প্রাণ দিয়া ভারতের সেবা করিতে পারি, ইহাই কাতরে ভিক্ষা করা হয়। দেশমান্য কোন স্বদেশ-সেবকের নিকটও প্রার্থনাটী বিশেষভাবে আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ প্রসঙ্গাদি হয়। ভ্রাতা হরিসুন্দর পাঠ করেন।

৪ঠা ভাই চন্দ্রমোহন দাস নবদেবালয়ে উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ পাঠাদি করেন এবং বিশেষ প্রার্থনা করেন। গৃহে ধর্ম্মসাধন নববিধানের বিশেষ সাধন। সংসার ছাড়িয়া, সংসারের প্রলোভনের অতীত স্থানে গিয়া ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বকালের সাধন, অপেক্ষাকৃত সহজ সাধন; কিন্তু প্রলোভন-পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে

থাকিয়া ধর্ম্মসাধনই পূর্ণ সাধন, ইহাই বিধাতার বিধান। তাই তিনি আমাদিগকে গৃহবাসী করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী হইয়া আছেন, এই বিশ্বাসে সংসার সাধন করিলেই ইহা সহজ হয়। প্রার্থনায় ইহাই উপলব্ধ হইল। মন্দিরে পাঠ প্রসঙ্গাদি সেই ভাবেই হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠ করেন।

৫ই জানুয়ারী, ভাই প্রিয়নাথ নবদেবালয়ে উপাসনা করেন এবং ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন। শিশুই স্বর্গের নিদর্শন। স্বাভাবিকতা, সরলতা, শুদ্ধতা ও মাতৃনিষ্ঠার আদর্শ শিশু; তাই নববিধান নবশিশুরূপে মূর্ত্ত হইয়াছে এবং সেই জীবনলাভই আমাদের আদর্শ, ইহাই প্রার্থনা হয়। অপরাহ্নে মঙ্গলপাড়ার শিশুদিগকে সম্মিলিত করিয়া সেবিকা হেমন্তকুমারী আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাই প্রিয়নাথও শিশুর ভাষায় সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। শিশুদের প্রত্যেকের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। শিশুগণ নৃত্য করিতে করিতে একটী নব রচিত সংগীত গান করে। তাহার পর কোন শ্রদ্ধেয়া ভগ্নীর সাহায্যে শিশুদিগকে লেবু ও সন্দেশ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনা ডাঃ সত্যানন্দ রায় সম্পাদন করেন; তিনিও শিশু-সেবা বিষয়ে পাঠ প্রসঙ্গাদি করেন।

৬ই জানুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা ও পাঠাদি করেন। এই দিন ভৃত্যসেবার দিন ও ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়েরও স্বর্গারোহণ দিন। সেই ভাবে প্রার্থনাদি হয়। এই দিন সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই গোপালচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রসঙ্গ করেন। প্রচার-কার্য্যালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ ভৃত্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রীতিভোজন করান।

৭ই জানুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন এবং ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ এ দিনের উপযোগী একটি স্বরচিত গান করেন। দীন-সেবা সম্বন্ধে পাঠ ও প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই চন্দ্রমোহন প্রার্থনা করেন ও প্রিয়নাথ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া প্রসঙ্গ করেন। দীন-সেবা-সাধনে দীনাত্মতা শিক্ষা হয়; বিশেষ ভাবে এই দিনে আচার্য্যদেবের তিরোধানের পূর্ব্ব রজনী স্মরণ করিয়া, আমরা সত্যই কত দীনহীন হইয়া পড়িয়াছি ইহা উপলব্ধি করিয়া, যাহাতে আমরা কল্যকার মহাপ্রয়াণ দিন সাধন করিতে প্রস্তুত হই, এই ভাবে প্রসঙ্গ হয়।

৮ই জানুয়ারী, আচার্য্যদেবের মহাপ্রয়াণ দিন। গত রাত্রে মহাপ্রয়াণ-প্রকোষ্ঠে কেহ কেহ জাগরণ করিয়া ধ্যানাদি করেন। প্রত্যূষে ৬টায় সমবেত ভাবে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ হয়। এই সময় একদল বন্ধু উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে নবদেবালয় ও সমাধি প্রদক্ষিণ করিয়া যান। ৯টায় উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ বিনীত ও গম্ভীর ভাবে উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন। মহাপ্রয়াণ-মুহূর্ত্তে ধ্যানান্তে শান্তি শান্তি শান্তি উচ্চারিত হয়। স্বরূপারাধনার ভিতর আচার্য্য-জীবনের দিব্য-জ্যোতি ও সাধনের স্ফুরণ উপলব্ধ হয়। তিনি যে আমাদিগকে তাঁর অঙ্গরূপে গাঁথিয়াছেন, এই বিশ্বাসের অভাবেই আমাদের আমিত্ব হেতু পতন এবং তজ্জন্যই তিনি আত্মদান করিয়াছেন; আমরা আমাদের আমিত্বের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যদি আজ সহমৃত হইতে পারি, তবেই আমরা তাঁহার সহিত উজ্জীবন লাভ করিতে পারিব। অনুতাপ করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আজ আমিত্বের বলিদান দিয়া যেন আমরা পরিবর্ত্তিত নবজীবন লাভ করিতে পারি, ইহারই জন্য প্রার্থনা হয়।

৯ই জানুয়ারী, মহাজনগণ সাধনের দিন। নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ এক এক যুগে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মের এক এক আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের আদর্শ অনুসরণ এবং গ্রহণ করিয়া পূর্ণ আদর্শ লাভ করিতে হইবে, ইহাই নববিধানের শিক্ষা। নববিধানাচার্য্য এই ভাবে সর্ব্বধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের আদর্শ জীবন গ্রহণ করিয়া নববিধান-মূর্ত্তিমান হইলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত একাত্মতাবলম্বনে যাঁহাতে আমরা সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের জীবন পরিধান করিয়া জীবনে নববিধানের লোক হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করা হয়। ইতিপূর্ব্বে আচার্য্যদেব দেহে অবস্থানকালে ৯ই জানুয়ারী মহাজনগণের দিন সাধন করেন। বিধাতার অনির্ব্বচনীয় লীলায় তিনি এইদিনেই স্বর্গারোহণ করিয়া, যেন সর্ব্বভক্ত-সঙ্গে মহাযোগে কেমনে আত্ম-বিলীন হইতে হয়, তাহাই দেখাইলেন।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মহাজনগণ সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই প্রিয়নাথ, ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বসু এই সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করেন। দৈনন্দিন জীবনে কেমন করিয়া যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকে আত্মস্থ করিতে হয়, তাহার জন্য যেমন প্রতিদিন ঈশা মুষাকে স্মরণ করিয়া তাঁদের নাম গান করিবার প্রথা সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তেমনি প্রাতঃ উত্থানকালে একটী গান করিয়া তাঁহাদের চরিত্র আত্মস্থ করিবার সাধন যাহা ভাই প্রিয়নাথ অবলম্বন করেন, তাহাও উল্লেখ করিলেন।

১০ই জানুয়ারী, জনহিতৈষিগণের দিন, ভাই প্রিয়নাথ নবদেবালয়ে উপাসনা করেন, ভাই চন্দ্রমোহন দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ প্রসঙ্গাদি হয়। ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বসু আচার্য্যদেবের জনহিতৈষী সম্বন্ধে প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া বলেন যে, পূর্ণ ধর্ম্মসাধনের দুই অঙ্গ, এক আধ্যাত্মিক, আর এক বৈষয়িক। এক

ধর্ম্ম, আর এক কর্ম্ম। মহাপুরুষগণ যেমন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধানের জন্য প্রেরিত, তেমনি জনহিতৈষিগণ আমাদের পরসেবা-সাধনের বা কর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধনার আদর্শ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত; তাই জনহিতৈষিগণের আদর্শ অনুসরণ মহাপুরুষদিগের অনুসরণের সঙ্গে সমভাবে সাধন করিলে, তবে আমরা নববিধানের পূর্ণ আদর্শ গ্রহণে সক্ষম হইব, এবং নববিধানের উৎসব-সাধনে উপযুক্ত হইব। ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কিছু কিছু বলেন। ভাই চন্দ্রমোহন প্রথমে প্রার্থনা করেন।

১১ই জানুয়ারী. উপকারিগণের উপকার স্মরণের দিন; নব-দেবালয়ে প্রাতে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সমগ্র মানবজাতির উপকারী যেমন জনহিতৈষিগণ, তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা আমাদের উপকার করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নিকট ঋণ স্বীকার না করিলে, আমরা কখনই নববিধানের উপযুক্ত হইতে পারিব না, ইহাই প্রার্থনায় উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়। ভাই চন্দ্রমোহন, ভাই প্রিয়নাথ, ভাই গোপালচন্দ্র, ভাই অক্ষয়কুমার, ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বসু, ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস আলোচনায় যোগদান করেন।

১২ই বিরোধীদিগের প্রতি ক্ষমা-সাধনের দিনে প্রাতে নব-দেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। আমিই যে আমার সর্ব্বপ্রধান বিরোধী, বরং বাহিরে যাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধতা করেন, তাঁহারা আমাদের দোষ দেখাইয়া দিয়া আমাদের আরও ভাল হইবার জন্য সহায়তাই করেন, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রণত হইতে হইবে। যদি কেহ আমাদিগকে শত্রু মনে করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে হইবে এবং তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে, ইহাই এই দিনের সাধনের তাৎপর্য্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, দুর্নীতি, সুরাপান, ব্যভিচার ইত্যাদি দ্বারা যাহারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তাহাদিগকেও আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই, তাদের জন্যও প্রার্থনা করিব। উপাসনা প্রার্থনায় ইহাই উপলব্ধ হয়। রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার জগন্মোহন দাস উপাসনা করেন। তিনিও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "শত্রুদিগের জন্য" অবলম্বন করিয়া উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন, আমাদের অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধভাব দমন না হইলে, আমরা আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি না। বিভিন্ন যুগে যখনই যে বিধান আসিয়াছে, তখন তাহার বিরোধিদল উঠিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাহার ফলে ধর্ম্মেরই জয় হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধানেও সেইভাবে যাঁহারা বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা সত্যেরই জয়লাভে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা যেন বিরোধীদিগের বিরুদ্ধতায় তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ না করি, কিন্তু সকল বিরোধীকে ক্ষমা করিতে শিখি।

১৩ই জানুয়ারী, আত্মার জন্য বিশেষ সাধন। নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। উৎসবের প্রাস্তুতিক সাধনায় এতদিন আমরা বহিরঙ্গ সাধন করিতে করিতে এখন অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হই। উৎসব আত্মার উৎসব। আত্মলোকে অমরাত্মাদের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রস্তুত না হইলে, আমরা কেমন করিয়া উৎসব-রাজ্যে প্রবেশ করিব? এইজন্য আমরা যে জড় নই, আমরা আত্মা, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তাই আত্মায় আত্মস্থ হইবার সাধন উৎসবের বিশেষ সাধন. বাহিরের আড়ম্বর যথার্থ উৎসব নয়। আত্মার আত্মায় যোগ-সাধানে প্রকৃত উৎসব। পরমাত্মার সহিত যোগ, ভক্ত আত্মাদিগের সহিত যোগ এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত আত্মিক যোগ, ইহাই পূর্ণ যোগ। এইজন্য আত্মদর্শন এবং আত্মার পরিপুষ্টিসাধনের দ্বারা আমরা যেন যথার্থ উৎসব-সম্ভোগে প্রস্তুত হই, ইহাই প্রার্থনায় উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে যথাবিহিত পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হয়। ভাই চন্দ্রমোহন প্রার্থনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ, ভাই গোপালচন্দ্র, ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র, ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রসঙ্গ করেন।

১৪ই জানুয়ারী, চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধনা; ভাই প্রিয়নাথ নব-দেবালয়ে উপাসনা করেন এবং ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন। আজ দেশদেশান্তর থেকে কত হিন্দু নরনারী দেহ-শুদ্ধি চিত্ত-শুদ্ধির জন্য গঙ্গা-স্নানে সাগর-সঙ্গমে তীর্থযাত্রী হইয়া ছুটিতেছেন; তাঁহাদের সকলকার উদ্দেশ্য, পাপ ধৌত করিয়া চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করা। কিন্তু কয়জন পারিতেছেন? বাস্তবিক বিশ্বাস করিয়া যদি আমরা হরিপদোদ্ভূত পুণ্যগঙ্গায় স্নানাবগাহন করিতে পারি, তবেই আমাদের প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি না হইলে আমরা পুণ্যময় নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরের সান্নিধানে কেমন করিয়া উপস্থিত হইব এবং অমরাত্মাদলে মিশিয়া উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব? এই জন্য পূর্ব্ব পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হওয়াই এই চিত্ত-শুদ্ধি-সাধনের উদ্দেশ্য। বিধানজননীর কৃপায় যাহাতে আমরা প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া উৎসব-সাধনে ও সম্ভোগে সক্ষম হই, ইহাই উপাসনা এবং প্রার্থনায় নিবেদিত হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের প্রাস্তুতিক উপাসনা হয়। মহারাণী সুচারু দেবী ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও বেদীতে বসিয়া সুন্দর উপাসনা করেন। এইরূপে বিভিন্ন ভাবে প্রাস্তুতিক সাধন করাইয়া, আমাদিগকে মহামহোৎসবের মহাযজ্ঞে মা উপনীত করিয়া ধন্য করিলেন।

মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের তিরোধান।

মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের তিরোধানে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ঘোর শোক-সন্তপ্ত। তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুন, জন্মগ্রহণ করেন। রাজরাজেশ্বরী মা ভিক্টোরিয়ার তিনি প্রিয় পৌত্র ছিলেন। তাঁর অনেক সদ্‌গুণ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মা ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের তিনি দ্বিতীয় পুত্র, তাঁহার সিংহাসন লাভের সম্ভাবনাই ছিল না। ইংলণ্ডের রাজবিধি অনুসারে রাজার প্রথম পুত্রই সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড অকালে দেহত্যাগ করাতে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জুন ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; এবং পর বৎসর ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি মহারাজ্ঞীর সহিত ভারত-সম্রাটরূপে এদেশে অভিষেক গ্রহণ করেন। মহাসমারোহে নবদিল্লীতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পাদিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে কোন ইংলণ্ডেশ্বর ভারতে স্বয়ং শুভাগমন করিয়া অভিষেক গ্রহণ করেন নাই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জই প্রথম ভারতে আসিয়া অভিষেক লইয়াছেন; তাই তাঁহাকে আমাদের ভারতেশ্বর রূপে বরণ করিয়া ভারত ধন্য হইয়াছিল। তিনি তখন হইতে ভারতের কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্য বরাবর আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। ভারতের প্রজাবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ কেমনে হয়, তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। এবং এদেশের রাজনৈতিক নেতৃগণকে নিজ রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়া ভারতের অভাব অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন এবং যাহাতে ভারতশাসন সম্বন্ধে ভারতবাসীর উপযুক্ত অধিকার লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সহানুভূতি করিতেন। তাঁহার সহৃদয়তা এবং উদারতা গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ছিলেন। ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, তখন তিনি শান্তি-সংস্থাপনের জন্য শেষ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। এবার যখন ইতালী ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিনি দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল না হওয়ায়, তিনি নিতান্তই মর্ম্মাহত হন। যাহা হউক, তিনি যথার্থ ই ধর্ম্মপ্রাণ ও কোমল-হৃদয় ছিলেন।

গত ২০শে জানুয়ারী, রাত্রি ১১—৩৫মিনিটের সময় তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। ২৮শে জানুয়ারী, অপরাহ্ণ ৫টার সময় তাঁহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের গির্জ্জা, মস্‌জিদ, মন্দিরাদিতে তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনা প্রার্থনাদি হয়। এই সময়ে আমাদের ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরেও বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

ইহা ব্যতীত আমাদের শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশনে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত মর্ম্মে শোকসহানুভূতি-প্রকাশ-সূচক নির্দ্ধারণ হইয়াছে :—

আমাদের প্রিয়তম মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পরলোক-গমনে আমরা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। আমরা আন্তরিক রাজভক্তি সহকারে আমাদের সম্রাটের তিরোধানে, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড, সম্রাজ্ঞী মেরী মাতা এবং রাজ-পরিবারস্থ সকলকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি; এবং প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়তম সম্রাটের আত্মা নিত্যশান্তিধামে শান্তিলাভ করুন। শান্তিদায়িনী জননী শোক-সন্তপ্তদিগকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

যেহেতু রাজভক্তি নববিধানের একটী বিশেষ বিধি। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ উপলক্ষেও তাঁহার সন্নিধানে অবলুণ্ঠিতচিত্তে আমরা রাজভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি। ব্রহ্মকৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি বিধান করুন।

—০—

শ্রীকেশবাত্মজ নির্ম্মলচন্দ্র স্বর্গে।

"হায় মা! এ কি করিলি, বিনা মেঘে কেন এই বজ্র হানিলি?" এই গানই মনে আসে, আর অশ্রুতে চক্ষু অভিষিক্ত হয়, যখন ভাবি, কি আকস্মিক ভাবেই আমাদের প্রিয়তম আচার্য্য-পুত্র ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রকে দেহমুক্ত করিয়া মা আপন কোলে তুলিয়া লইলেন!

বর্ষাধিক কাল যদিও তিনি রক্তাধিক্য রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু তিনি সে রোগ হইতে বেশ সুস্থতা লাভ করিয়া আবার মণ্ডলীর ও দেশের হিতকর কর্ম্মসাধনে নিরত হন। তিনি কমলকুটীর ট্রাষ্টের একজন ট্রাষ্টি ছিলেন। অন্যতম ট্রাষ্টি মিঃ তুলসীচরণ গোস্বামীর গৃহে ট্রাষ্টিদিগের একটী কার্য্যকরী সভার অধিবেশন গত ২০শে জানুয়ারীতে হয়। সেই সভায় গিয়াই তাঁহার হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধি হয়। সেখানে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন; জীবন-রক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ভগ্নী মহারাণী সুচারু দেবী সংবাদ পাইয়াই তথায় উপস্থিত হন এবং সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি পরিবারবর্গ পরে আসিয়া উপস্থিত হন। চিকিৎসকগণের সাহায্য লইয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু বিধাতার বিধান কে লঙ্ঘন করিতে পারে? অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সে দিব্য দেহ হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া গেল!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র আচার্য্যদেবের সন্তানদিগের মধ্যে এখন জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর মধ্যম পুত্র। কলুটোলার বাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়। মহর্ষিদেব তাঁর নামকরণ করেন। আর মহর্ষিদেবের

স্বর্গারোহণ দিনেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। আবার তার পর দিন ২১শে জানুয়ারী তাঁর জন্মদিনও ছিল। ইহলোকের জন্ম দিনেই তাঁর যেন পরলোকেরও জন্মদিন আরম্ভ হইল।

তিনি বড় অমায়িক, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পিতৃমাতৃভক্ত, নববিধানের প্রচারাকাঙ্ক্ষী, উদারচরিত, সর্ব্বজনপ্রিয়, দীনজন-সেবক, রাজভক্ত, স্বদেশপ্রিয় ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি বাল্যকালে আমাদেরই এলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা পাইয়া কৃতিত্ব লাভ করেন। প্রথমে গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করেন। সে কাজ ছাড়িয়া কয়েক বৎসর কোচবিহার ষ্টেটে মিলিটারী সেক্রেটরীর কার্য্য করেন। পরে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের পরামর্শদাতার পদে নিয়োগ লাভ করিয়া, গত ১৯২৮ সাল অবধি সে কাজ করিয়া অবসরগ্রহণানন্তর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কার্য্যে কৃতিত্ব জন্য C.B.E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি বড় শান্তিপ্রিয় ছিলেন। আমাদের মণ্ডলীতে যখন প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন তাহার মধ্যস্থতা করিবার জন্ত আমাদের মধ্যে সাতজন যুবা ভার গ্রহণ করেন। নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্ততম। মণ্ডলীতে শান্তি সংস্থাপনের জন্ত তিনি সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।

যতদিন বিলাতে ছিলেন, লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তাহা পরিচালন করিয়াছিলেন এবং প্রতিবর্ষে বিলাতের প্রধান প্রধান সহানুভূতিকারী বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া বক্তৃতা করাইতেন, সমারোহে আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব করিতেন এবং স্বর্গোরোহণ দিন সম্পাদন করিতেন।

ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র ভাগলপুরবাসী আমাদের পুরাতন বন্ধু স্বর্গীয় লাড্‌লিমোহন ঘোষের বালবিধবা বিদুষী কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত উদ্বাহিত হন। এই বিবাহ ব্যাপার তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। উভয়ে উভয়ের সহযোগী সহযোগিনী হইয়া দেশহিতব্রতে জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের একটী পুত্র ও তিন কন্যা, সকলেই সুশিক্ষিত। দুই কন্যা সুপাত্রে বিবাহিত হইয়াছেন। নির্ম্মলচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশেষ ভাবে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্যে এবং মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্য্যের সহায়তা-বিধানে মনোযোগী ও উৎসাহী হইয়াছিলেন।

নবদেবালয়ে যাহাতে শ্রীদরবার ও মণ্ডলীর পরিচালনায় উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদি পূর্ব্বের স্থায় নিয়মমত সংসাধিত হয়, তাহার জন্ত তাঁহার প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ছিল; তাহার ব্যবস্থাও তিনি যথাসাধ্য করেন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহারাণী সুনীতি দেবীর সহকারিরূপে তিনি কতই কার্য্য করিতেন এবং তাঁরই পরলোকগমনে তিনি নিতান্তই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রায় বর্ষাধিককাল রোগ ভোগ করিয়া নিতান্ত ক্লিষ্ট হন; সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর অক্লান্ত সেবা ও যত্নে তিনি নিরাময় হন। সুস্থ হইয়া নব উদ্যমে আবার কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা কতই আশা করিতেছিলাম, ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র পিতৃদেবের পদাঙ্কানুসরণে আমাদের বিধানের সেবায় শেষ জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি করিবেন।

আচার্য্যদেবের জন্ম-শতবার্ষিকীর সাফল্য-সম্পাদনের জন্য কতই তাঁহার উপর আশা করিতেছিলাম; কিন্তু হায়! কি জানি, কেন বিধাতা তাঁহাকে এমন আকস্মিক ভাবে আমাদের নিকট হইতে তুলিয়া লইলেন। সত্যই আমরা তাঁহার পরলোকগমনে নিতান্তই আপনাদিগকে বিপন্ন বোধ করিতেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি, আমাদের মঙ্গলময়ী জননী যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্তই করেন; এই বিশ্বাসে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া, এই শোক-শেল বহন করি। মা তাঁর প্রিয়সন্তানকে তাঁর শান্তি কোলে ভক্ত পিতা মাতার সদনে ভাইভগ্নীগণ সনে শান্তি দান করুন; এবং পতিবিহীনা বিয়োগবিধুরা পত্নীকে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকন্যাদিগকে ও ভাই বোনদিগকে এবং আমাদের মণ্ডলীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতার স্বর্গারোহণ-সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে, গত ২১শে জানুয়ারী প্রাতে তাঁহার ২৪নং থিয়েটার রোড ভবনে বহু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সমবেত হন। প্রাতে ৯টার সময় তাঁহার পবিত্র শবদেহকে ঘিরিয়া আন্ত্যেষ্টিক উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ শোকসন্তপ্তপ্রাণে উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র নবসংহিতার প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। অতঃপর পর্য্যঙ্কে শায়িত শবদেহ পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মাল্য, ভাগ্নেয় ময়ূরভঞ্জ মহারাজকুমার ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র, ভ্রাতা সরলচন্দ্র, সুব্রতচন্দ্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" উচ্চারণ করিতে করিতে নগ্নপদে স্কন্ধদেশে শবাধার বহন করিয়া কমলকুটীরে আসিয়া নবদেবালয়ের সম্মুখে সমাধিমণ্ডপে তাহা রক্ষা করেন। এখানেও ভাই প্রিয়নাথ এবং ভাই চন্দ্রমোহন প্রার্থনা করিয়া পবিত্র শবের সংবর্দ্ধনা করেন। এখানে সে সময়ে মণ্ডলীস্থ অনেক ভাই ভগিনী সমবেত হইয়া যোগদান করেন।

তাহার পর এখান হইতে শববাহকগণ পূর্ব্ববৎ বহন করিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ক্রিমেটরিয়মে শবদেহ লইয়া যান এবং ভাই প্রিয়নাথের পৌরোহিত্যে শ্রীমান্ নির্ম্মাল্যচন্দ্র নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণে শবদেহ অগ্নিকক্ষে অর্পণ করেন। পরদিন দেহাবশিষ্ট পবিত্র ভস্ম গৃহে আনীত হইলে, আত্মজনগণ সমবেত হইয়া গম্ভীরভাবে উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথের দ্বারাই উপাসনার কার্য্য সম্পাদিত হয়; ভাই অক্ষয়কুমার লঘ পাঠ ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ইহার পর প্রতিদিনই এক একজন করিয়া পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের লইয়া উপাসনা করেন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী, কমলকুটীরস্থ প্রাঙ্গণ-মণ্ডপে পবিত্র আদ্য-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। অনুষ্ঠানের অব্যবহিতপূর্ব্বে ভস্মাধার আনীত হইয়া নবদেবালয়ে রক্ষিত হয়। পরে নবসংহিতার বিধি অনুসারে সেখান হইতে "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" এই সংগীত করিতে করিতে ভস্মাধার প্রধান শোককারী দ্বারায় সমাধিস্থানে আনীত হয় এবং ভাই প্রিয়নাথ যথাবিহিত প্রার্থনা করিয়া তাহা সমাধিস্থ করেন। অতঃপর প্রধান শোককারীর সহিত বন্ধুগণ অনুষ্ঠানমণ্ডপে প্রবেশ করিলে সমাগত বন্ধুবান্ধবগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া সংবর্দ্ধনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের সহযোগিতায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন করেন। শাস্ত্র-পাঠান্তে ডাঃ সত্যানন্দ রায় ইংরাজীতে পরলোকগত ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের জীবনমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। শ্রীমান্ নির্ম্মাল্যচন্দ্র ইংরাজীতে শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানটী অতি গম্ভীরভাবে সম্পাদিত হয়। বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ইংরাজ, মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম নরনারী যোগদান করিয়া, পরলোকগত সর্ব্বজনপ্রিয় আত্মার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই মহিমচন্দ্র সেন।

আমরা শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে জানাইতেছি, আমাদের পরম ভক্তিভাজন পূর্ব্ববাঙ্গলা দাসমণ্ডলীর সভ্য, নববিধান-প্রচারক ভাই মহিমচন্দ্র সেন বিগত ৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৮—১০মিনিটের সময়, ৮৫ বৎসর ১০মাস বয়সে, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, চিরশান্তিদায়িনী বিধানজননীর কোলে স্থানলাভ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই ৮৬ বৎসরে উত্তীর্ণ হইয়া যেন নবপ্রেরণার নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। এই নবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াই, তিনি গত ভাদ্রমাসে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকমণ্ডলীর সমিতি আহ্বান করিয়া, নিজে দেখিয়া শুনিয়া তাহার সকল কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইদানীং তিনি প্রায় প্রতি রবিবারেই দিগ্‌বাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের গৃহে উপাসনা করিয়াছেন এবং প্রতি শনিবার সহরের বিভিন্ন স্থানে গৃহে গৃহে উপাসনা, নদীর পারে করোনেশন পার্কে কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি করিয়া প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে আমাদের মনে হইত, যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বর্গের একটি প্রস্ফুটিত ফুল ভগবানের বক্ষে প্রেম-রজ্জুতে বদ্ধ থাকিয়া মর্ত্তভূমিতে ভাসিয়া ভাসিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছেন। ভগবান্ তাঁহাকে প্রেম, পুণ্য, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও বিবেক-ধনে পূর্ণ মাত্রায় ধনী করিয়া, আমাদিগকে ঐ আদর্শ জীবন গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন; কিন্তু দিব্যদৃষ্টিহীন আমরা কেহই এই গৌরবমণ্ডিত জীবনের মূল্য বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যেন ভগবান্ তাঁহাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন।

তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সজ্ঞানে অক্লান্তভাবে মায়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন তিনি সামান্য সর্দ্দিতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েকদিন মাত্র দৈনিক উপাসনায় শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যোগ দিতে পারেন নাই। (শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় মহাশয় দেবালয়ে আসিতে পারেন না বলিয়া উপাসনা তাঁহার গৃহেই হইত।)

৮ই মাঘ, প্রাতে ৮টার সময় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দারের সঙ্গে বসিয়া, ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া, নিজ হাতে মহারাণীর নিকট টেলিগ্রাম লিখিয়াছিলেন। পরে তাহা ভারতের রাজপ্রতিনিধি মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ৯॥টার সময় শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়ের সঙ্গে দৈনিক উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। ১২টার সময় জামাতা উমাপ্রসন্ন ঘোষ ও কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি আসিয়া আহার করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে প্রতিদিন দুইবেলা আসিয়া আহার করাইয়া যাইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন বৈকালে কন্যা ক্ষীরোদমণি হঠাৎ জ্বর হওয়ায় আসিতে পারেন নাই। সেদিন সন্ধ্যায় মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে দিগ্‌বাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে নববিধান সম্বন্ধে আলোচনার কথা ছিল। জামাতা ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষকে বৈকালে গাড়ী লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ বোধ না হইলে নিজেই আলোচনার কার্য্য করিবেন বলিয়াছিলেন। বৈকালে জামাতা ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ আসিয়া, শরীর একটু অসুস্থ বোধ করিতেছেন জানিয়া, দিগ্‌বাজার লইয়া যাইতে আপত্তি প্রকাশ করেন। জামাতা তাঁহাকে লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, তাঁহাকে নববিধান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া দিগ্‌বাজার পাঠাইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৪॥টার সময় স্বহস্তে বাগানের গাছে জল দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা ৬—১৫মিনিটের সময় শয্যায় শুইয়া শুইয়া নিয়মিত রূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রথম গান—"মনপাখী চল যাই ঘরে।" দ্বিতীয় গান—"জীবনে মরণে তুমি নিকটে আছ শঙ্করী।" অপর গানগুলি কাজে ব্যস্ত থাকায় কেহ তেমন মনোযোগ দিয়া শুনেন নাই এবং বলিতে পারেন না। সন্ধ্যা ৭টার সময় তাঁহার প্রথম অগ্রজের পৌত্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন এবং পাঁচ মিনিট পরে তাহাকে ডাকিয়া বাইওকেমিক ঔষধ খাইয়াছেন।

৭—১৫মিনিটের সময় কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের পর পায়খানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রতিদিন মাতৃনাম জপ করিতেন। সেদিন পায়খানা হইতে ফিরিয়া, বাড়ীর ঝীকে ডাকিয়া, অগ্রজের পৌত্রটি রাত্রের আহার করিয়াছে কিনা খোঁজ লইয়াছেন। পরে ঝীকে একটু সরিষার তেল গরম করিয়া দিতে বলেন। গরম তেল আনিয়া ঝী মালিশ

করিতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করিয়া নিজ হাতে তেলের বাটী লইয়া, ঝীকে বাড়ী যাইতে আদেশ দেন। অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে ঝী বাড়ী যাইবার সময় বিছানার বহিঃস্থিত পাখাখানা মশারীর ভিতরে দিতে যাইয়া দেখিতে পাইল, তিনি তেলের বাটী বিছানায় নামাইয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার মস্তক বালিশ হইতে সরিয়া ঢলিয়া নীচে পড়িয়াছে। ঝীর চীৎকার শব্দে তাঁহার অগ্রজের পৌত্রটী এবং অন্যেরা চলিয়া আসেন। তখনই নিকটবর্ত্তী একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আসিয়া inj nction দেন। ইন্‌জেকসনের পর প্রথম ৫০ সেকেণ্ড এবং পরে ৪০ সেকেণ্ড নাড়ী পাওয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া আধ ঘণ্টার ভিতর জামাতা দিগম্বার হইতে চলিয়া আসেন। কন্যা আসিয়া পিতাকে আর জীবিত দেখিতে পান নাই। জামাতা ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ তিনটি ইন্‌জেক্‌সন দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার মনপাখী সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া ৮—১০মিনিটের সময় মায়ের ঘরে চলিয়া গেল।

মৃত্যুকালে তাঁহার জামাতা, প্রথম অগ্রজের পৌত্র, চতুর্থ অগ্রজের পৌত্র, পৌত্রবধূ, বাবু মতিলাল দাশ, অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র দাশ, পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি অনেকেই শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

বাবু রমেশচন্দ্র সমাদ্দার সমস্ত রাত্রি মৃতদেহের পার্শ্বে অন্যদের সঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমাজের খোলবাদক সংবাদ পাইয়া রাত্রি ১।টার সময় নদীর পরপার হইতে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই আহার নিদ্রা ভুলিয়া, স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রচারকের অমর আত্মার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। ভোর ৫।টার সময় সংক্ষেপে পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন উপাসনা করেন।

প্রাতে সংবাদ পাইয়া ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ বিভিন্ন সমাজের লোক স্বর্গগত আত্মার মৃতদেহের পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। ৯টার সময় মৃতদেহ নববস্ত্রে আবৃত করিয়া, প্রচুর পরিমাণে নানাপুষ্পে সুশোভিত করিয়া, বিধানপল্লীস্থ দেবালয়-প্রাঙ্গণে নীত হয়। ১০টার সময় শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। তৎপর আনুমানিক বেলা ১২টার সময় কীর্ত্তন সহযোগে প্রায় ৫মাইল দূরবর্ত্তী শ্মশানঘাট শ্যামপুর লইয়া যাওয়া হয়। নবসংহিতানুসারে একটি প্রার্থনার পর কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি ঘোষ মুখাগ্নির কার্য্য করেন। মৃতদেহ ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, আলোচনা, ধ্যান, ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থনা হইয়াছিল।

ভগবান্ এই বন্ধনমুক্ত আত্মাকে তাঁহার অমৃত বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। আমরা পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের শোকাভিভূত পরিবারের প্রতি হৃদয়ের সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র সমাদ্দার।

গত ২৮শে জানুয়ারী, কলিকাতায় নবদেবালয়ে, শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই চন্দ্রমোহন দাস, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মিলিত ভাবে অনুষ্ঠানের কার্য্য করেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী, ঢাকা জগন্নাথ হলে, নগরবাসিগণের আহ্বানে, ডাঃ আর, সি, মজুমদারের সভাপতিত্বে, তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ স্মৃতিসভা হয়। প্রারম্ভে কুমারী নীহারিকা দাস সংগীত করেন, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপর ডাক্তার শহিদুল্লাহ্, অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত, পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন, অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সভাপতি স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। শ্রীমান্ দিগিন্দ্রলাল সেন ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষের প্রেরিত লেখা পাঠ করেন। সকলেই তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, অদ্ভুত জ্ঞানপিপাসা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অক্লান্তপরিশ্রমশীলতা, দীন দুঃখী, এমন কি ইতর প্রাণীদের প্রতি দয়াপরায়ণতা, নববিধান প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টা, পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা, শোকে তাপে অদ্ভুত ধৈর্য্যশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উল্লেখ করেন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ঢাকাস্থ বিধানপল্লীতে দেবালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি ঘোষ পিতৃদেবের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারী যোগদান করিয়া পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিধানপল্লীস্থ বাসভবনের সমাধিচত্বরে তাঁহার পবিত্র দেহাবশিষ্ট ভস্ম সমাহিত হয়। "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" কীর্ত্তন করিতে করিতে পবিত্র ভস্মাধার সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া পবিত্র ভস্মাধার সমাধিতে রক্ষা করেন। তদনন্তর অনেকেই সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া শ্রদ্ধার্পণ করেন। তৎপর সভামণ্ডপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, গম্ভীরভাবে পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায় সুমিষ্ট উদ্বোধন ও আরাধনা করেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ পরলোক-সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের ও বিভিন্ন সাধু ভক্তের উক্তি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরলোকগত আত্মার সদ্‌গুণাবলী উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন। কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি ঘোষ পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া, নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ পৌরোহিত্য ও অনুষ্ঠানের শেষাংশ সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দার সংগীত করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

ঢাকা অনাথাশ্রম ৫৲, রামকৃষ্ণমিশন ২৲, মূকবধির বিদ্যালয় ৫৲, সেবাশ্রম ৪৲, মুসলমান অনাথাশ্রম ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

৫৲, নববিধান-প্রচারকল্পে ৫৲, নববিধান ব্রহ্মমন্দির ৫৲, দুটী দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে ১০৲, কাঁয়েতটুলী শিক্ষাসদন ৩৲; চট্টগ্রাম নববিধান ব্রহ্মমন্দির মেরামতের জন্য ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৩৲; ময়মনসিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲; কলিকাতা নববিধান মিশন ফণ্ড ১০৲, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার সাহায্যার্থে ৫৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ৫৲; টাঙ্গাইল নববিধান সমাজ ২৲, মুঙ্গের নববিধান আশ্রম নির্ম্মাণার্থে ৫৲, চেরাপুঞ্জি নববিধান মিশন (শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জি) ৫৲, গরিবদিগকে বিতরণের জন্য চাউল ৩মণ ও বস্ত্র ১১খানা। এতদ্ব্যতীত স্বর্গগত আত্মার উইল অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ১৬০০৲ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বাড়ীর অংশ বাবদ কন্যা হইতে প্রাপ্ত ৫০০৲ মোট ২১০০৲ স্থায়ী ফাণ্ডরূপে এবং তাঁহার রচিত পুস্তকাদির বিক্রয়লব্ধ টাকার অর্দ্ধেকাংশ পূর্ববাঙ্গলা দাসমণ্ডলীর হস্তে নববিধান-প্রচারোদ্দেশে দান করা হইয়াছে।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৪ই জানুয়ারী, ৬৮এ স্যার কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে, চট্টগ্রামের আশাকুটীরের জ্যেষ্ঠ সন্তান অবসরপ্রাপ্ত সাবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাশের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রকন্যাগণ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ ও ভৃত্যদের ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে জানুয়ারী, ৩৫।৩এ, পদ্মপুকুর রোডে, শ্রীমান্ অবনীমোহন গুহের যমজ কন্যাদ্বয়ের জন্মদিনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

শুভবিবাহ—গত ২৬শে পৌষ, (১১ই জানুয়ারী) পাটনায়, হাওড়া আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদারের প্রবাসভবনে, তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশালতার সহিত, পাটনা পত্তোলপ্রবাসী স্বর্গীয় ভোলানাথ কুণ্ডুর তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ডাঃ অশোককুমার কুণ্ডুর শুভবিবাহ নবসংহিতা-মতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন আরাধনা করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ ও পৌরোহিত্য করেন। ব্রাহ্ম রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার বিবাহ রেজিষ্ট্রী করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ৫ই জানুয়ারী, পাটনাতে, বিহারন্যাশন্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাস-ভবনে, হাওড়া আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশালতা নবসংহিতামতে দীক্ষিত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু আরাধনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পরলোকগমন—আমরা শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, হাওড়ায়, খুরুট রোড নিবাসী ভ্রাতা রামগতি রায় কতকটা আকস্মিক ভাবে গত ১৬ই জানুয়ারী দেহমুক্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব রাত্রে আহারান্তে উদরে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া কাতর হন। প্রথম হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হয়; কিন্তু তাহাতে যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। প্রাতে উঠিয়া বসিয়া উপাসনাদি করিবার পর হৃদ্‌রোগা-ক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমতা জেলার অন্তর্গত ঝিংরা গ্রামে প্রসিদ্ধ রায়বংশে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনের প্রারম্ভে অবস্থার উন্নতির জন্য বর্ম্মায় পলাইয়া যান। রেঙ্গুনে গিয়া স্বর্গগত পি, সি, সেন (ব্যারিষ্টার য়্যাট ল) মহাশয়ের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া জীবনের অনেক উন্নতি লাভ করেন। সেই খানেই তিনি একটি কায়স্থ কন্যার সহিত বিবাহিত হন। হাওড়ায় ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথের নিকট নবসংহিতা অনুসারে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন হইতে বৈষয়িক কর্ম্ম-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মসাধনে নিরত ছিলেন। তিনি সুন্দর গান করিতে পারিতেন এবং অতি হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন। শেষ জীবনে কর্ম্মকাজ না থাকাতে কিছু আর্থিক কষ্ট পাইয়াছেন। তথাপি শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস হারান নি। তিনি অবিবাহিতা একটী কন্যা, একটি পুত্র ও বিধবা পত্নীকে রাখিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। গত ৩১শে জানুয়ারী প্রাতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে: এই উপলক্ষে হাওড়া ব্রাহ্মসমাজ ২৲, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম ৪৲, অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডার ৪৲, অনাথাশ্রমে ২৲ টাকা এবং একটী ভোজ্য দান করা হইয়াছে। মা বিধানজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তি ক্রোড়ে নিত্য শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্তা বিধবা ও পুত্রকন্যাকে শান্তি দান করুন।

ষাণ্মাসিক উপাসনা—গত ১৭ই জানুয়ারী, কলুটোলায় শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণের ষাণ্মাসিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, ১নং আলিপুর নিউরোডে, ব্যারিষ্টার মিঃ এস, কে, সেনের গৃহে, তাঁহার শ্বশুর ও শাশুড়ী, চট্টগ্রামের আশাকুটীরের পিতামাতা স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাশ ও সাধ্বী ইচ্ছাময়ী দেবীর পুণ্যস্মৃতিতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। কন্যা-স্থানীয়া শ্রীমতী কুমুদিনী দাস এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ দীনেশ

রঞ্জন দাশ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের প্রার্থনাটী বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রইল। পুত্রকন্যাগণ ও আত্মজনগণ যোগদান করেন।

গত ২০শে জানুয়ারী, ৫নং পঞ্চানন ঘোষ লেনে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে উপেন্দ্রবাবু উপাসনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করেন।

দেরাদুন হইতে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ লিখিয়াছেন :—

গত ২২শে জানুয়ারী, আমাদের পূজনীয়া অগ্রজা ৺সরলা দেবী মজুমদারের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে তাঁহার পুণ্যস্মৃতিতে উপাসনা-মণ্ডপ-নির্ম্মাণার্থ স্থানীয় নারীশিল্পমন্দিরে ৫০০৲ টাকা নিবেদন করিয়াছি। শ্রীভগবান্ তাঁহার পূজা বন্দনার কার্য্যে সহায় হউন। স্বর্গীয় আত্মা সুখী হউন।

অদ্য এই উপলক্ষে কলিকাতায় ১নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে, জামাতা অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে দৌহিত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দাস মাঘোৎসবে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৯ই জানুয়ারী, ভাগলপুরে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন।

অদ্য কলিকাতায় ভ্রাতা হরিসুন্দর দাসের গৃহে, তাঁহার কন্যা এবং ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ স্বর্গীয়া আভাময়ীর পরলোকগমনদিনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন।

গত ৩০শে জানুয়ারী, ৮এ ল্যান্সডাউন রোডে, আলীপুরের ডিঃ জজ মিঃ এ, এন, সেনের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবী মিসেস পি, সি, সেনের প্রথম সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে সন্ধ্যায় ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

ঢাকার সংবাদ—ব্রহ্মানন্দের সাম্বৎসরিক—

বিগত ৮ই জানুয়ারী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, প্রাতে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় আর্ম্মাণীটোলায় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতি-সভা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন্ অধ্যাপক ডাক্তার জিতেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত এম এ, ডি এল, সভাপতি মনোনীত হন। সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাশ প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন বি এ, অধ্যাপক ডাক্তার সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ডি এস সি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাজী মোতাহের হোসেন এম এ, ও শ্রীযুক্ত অকিঞ্চনকুমার দাশগুপ্ত এম এ, বক্তৃতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সর্ব্বশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

পরলোকগমন—স্বর্গীয় ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের শ্বশ্রূমাতা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী গত ১লা জানুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাশ অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসর পর্য্যন্ত শোকসন্তপ্ত পরিবারে উপাসনাদি করেন। গত ১২ই জানুয়ারী স্বর্গীয় অতুলচন্দ্রের ঢাকা টিকাটুলীস্থ ভবনে আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৯৷৷০ ঘটিকার সময় বাটীর প্রাঙ্গণস্থ সমাধিমণ্ডপে সুগম্ভীরভাবে স্বর্গীয়া দেবীর দেহাবশেষভস্মস্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, ১০টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রায় দুইশত নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনা করেন। অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রপাঠ করেন। রাঁচি হইতে আগত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত করেন। মঙ্গলময়ী বিধান-জননী এই স্বর্গগত আত্মার চিরকল্যাণ করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে সান্ত্বনা দিন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, ঢাকা অনাথ আশ্রম ২৫৲, ঢাকা বিধবাশ্রম ২৫৲, ঢাকা অনাথ ব্রাহ্ম ধনভাণ্ডার ৫৲, কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয় ৫৲, কলিকাতা অনাথ আশ্রম ৫৲, মুঙ্গের প্রচারাশ্রম ৫৲, দেওঘর কুষ্ঠাশ্রম ৫৲, একটি দরিদ্র ছাত্র ৫৲, ডুরাণ্ডা রামকৃষ্ণ মিশন ৫৲, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন ৫৲, কোয়ারপুর বালিকা বিদ্যালয় ৫৲, শুশ্রূষাকারিণী দাই ১০৲, দরিদ্রদিগকে ১৫৲, ব্যক্তিগত দান ১৭৫৲, কম্বল ১৫৲, মোট ৩৮০৲ টাকা ও কয়েক খান বস্ত্র।

শোকসংবাদ—গত ২১শে জানুয়ারী রাত্রি ৮-২৫ মিঃ সময়ে ঢাকার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের একমাত্র সন্তান ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা সুজাতা সেন (ছবি) অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগত হইয়াছে। অবিনাশ বাবু গত ৮।৯ মাস হইতে নিজেই বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন। তাঁহার উপর এই নিদারুণ শোক পাইলেন। মঙ্গলময়ী বিধানজননী শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাশ প্রতিদিন শোক-সন্তপ্ত পরিবারে উপাসনাদি করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

নিবেদন—এবার স্থানাভাবে অনেকগুলি সংবাদ প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪২ সাল, ১৮৫৭ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ।
29th. February, 1936.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে স্বর্গীয় জীবনের, ধর্ম্মজীবনের অনন্ত উৎসব! তুমি আমাদিগকে স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত করিয়া, স্বর্গীয় সম্পদে ভূষিত করিয়া, এই সংসারে, এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই, আমাদের গৃহবাসের মধ্যেই, আমাদের জীবনকে দেবজীবনে, তোমার সন্তানত্বে পরিণত করিবে, ইহলোকেই আমাদের জীবনে ও গৃহ-পরিবারে স্বর্গের দৃশ্য দেখাইবে, স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার কৃপার অযাচিত সাক্ষ্য দান করিবে, এইজন্য জগতে তোমা দ্বারা স্বর্গের নব নব বিধানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, এইজন্য যুগে যুগে তোমার মনোনীত ও প্রেরিত বিশেষ বিশেষ সাধুভক্তদিগের আগমন, এই জন্যই তোমার কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থায় আমাদের জীবনে উপাসনাদির প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা, এই জন্যই তোমার মনোনীত পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে কত স্বর্গের উৎসব, মহোৎসব, কত সদনুষ্ঠান তোমারই অযাচিত কৃপাতে তোমা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, সুসম্পন্ন হয়। বাহিরে মানুষ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। পৃথিবীতে তুমি স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিবে, প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিজে সুখী হইবে, জগতের তোমার প্রিয় পুত্রকন্যাদিগকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালিনী করিবে, এই জন্য তোমার কি উৎসাহ, কি ব্যস্ততা, তোমার কি একনিষ্ঠ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। যদি ধর্ম্মক্ষেত্রে তোমার উৎসাহপূর্ণ ব্যস্ততা, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আমাদের ধর্ম্মজীবনে তোমার দেবালোকে প্রত্যক্ষ করিতাম, তাহা হইলে আমরাও তোমার ভাবের ভাবুক হইয়া এবং তোমার প্রেরিত সাধু ভক্তদিগের জীবনের সাধু দৃষ্টান্তে, এই নবধর্ম্মের পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে, আমাদের ব্যক্তিগত ও মিলিত ধর্ম্মজীবনে কত কর্ম্মব্যস্ততার, কত কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিতাম, তোমার আজ্ঞা উৎসাহের সহিত, অনুরাগের সহিত প্রতিপালনে কত সুন্দর, কত উচ্চ ধর্ম্মজীবনে গঠিত হইতাম, তোমার কৃপার বিশেষ দান উৎসব ও মহোৎসবাদিতে তোমার প্রদত্ত প্রচুর ধন রত্ন আদরে সঞ্চয় করিতাম, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য, অসময়ে, অভাব অনাটনে বিশেষ প্রয়োজন সাধন জন্য কত যত্নে সে সকল স্বর্গের ধন রত্ন জীবন-সিন্দুকে সাবধানে পূরিয়া রাখিতাম, এবং তোমারই শিক্ষা-গুণে সে সকলের সদ্ব্যবহার দ্বারা নিজের অভাব পূর্ণ করিতাম, গৃহ পরিবারের ও জগতের সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিতাম। কিন্তু হে সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্য্যামিন্! তুমি দেখিতেছ, এখনও আমাদের অনেকের জীবনেই সে দৃষ্টি খোলে নাই, যে দৃষ্টিতে, ধর্ম্মক্ষেত্রে ছোট বড় সকল ব্যাপারে, বিশেষ

ভাবে মহা মহোৎসবাদিতে তুমি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা রূপে কত ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করিতেছ, কত নবোৎসাহে নবানুরাগে তুমি আমাদের ব্যক্তিগত ও মিলিত জীবনে স্বর্গের লীলা বিস্তার করিতেছ, আমাদিগকে স্বর্গের জীবনে গঠিত করিবার জন্য, আমাদিগকে স্বর্গের সাজে সাজাইয়া পৃথিবীতে তোমার খাস দরবার, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কত ভাবে কার্য্য করিতেছ, তাহা আমরা ভাল করিয়া দেখিতে পারি, তাহার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। যখন এখনও সে দৃষ্টি আমাদের তেমন খোলে নাই, এখনও আলস্য জড়তা জীবনের তেমন ঘোচে নাই, তাই কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, সেই দৃষ্টি খুলিয়া দেও, যাহাতে তোমাকে ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মব্যস্ত দেখিয়া, আমরাও আলস্য জড়তা ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মব্যস্ত হই, জীবনে তোমার প্রদত্ত শিক্ষা-গুণে তোমার প্রদত্ত ধন সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হই। তোমার কৃপায় আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বিশ্বাস করিয়া, তব পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

উৎসবের সাফল্য।

উৎসব আইসে, উৎসব চলিয়া যায়। আমাদের দীর্ঘ জীবনের উপরিভাগ দিয়া কত মহা মহোৎসবের প্রবল স্রোত খরতর বেগে বহিয়া গেল, কত স্বর্গের পরিত্রাণপ্রদ বন্যা আমাদের জীবন-মরুভূমির উপর দিয়া ঢেউ খেলিতে খেলিতে চতুর্দ্দিক্ ভাসাইয়া আবার কোথায় আপনাকে বিলীন করিয়া ফেলিল, আমাদের স্মৃতি-পুস্তক পাঠ করিলে তাহার কি তেমন কোন পরিচয় পাই? আমাদের জীবন-পুস্তকে কি তাহার কোন বিবরণ সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি? আমরা কি সেই সকল স্বর্গের প্রবাহকে আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার বিন্দু বিন্দু আমাদের ধর্ম্মপিপাসার পরিতৃপ্তিকর বারিরূপে পান করিয়া, আমরা কি যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম্মজীবনে পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছি? আমাদের জীবন কি তাহার সন্তোষজনক কোন সাক্ষ্য দান করে? এ সকল প্রশ্ন সব সময়ে না হউক, জীবনের বিশেষ বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণে উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ যে বিষয় লইয়া কারবার করে, সে কারবারে লাভ ক্ষতি গণনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যে যে বিষয় লইয়া কারবার খুলুক না কেন, সেই বিষয়ের সদ্ব্যবহারের উপর, সে বিষয়ের উচ্চ নিয়োগের উপর, লাভালাভ নির্ভর করে। আমরা ধর্ম্মের কারবারে ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত। ধর্ম্মক্ষেত্রের উৎসব-সময় ধর্ম্মযাত্রীর পক্ষে বিশেষ কারবারের সময়। এখানকার সামগ্রীর সযত্ন সংগ্রহ, উচ্চ নিয়োগ ও সদ্ব্যবহারের উপর ধর্ম্মজীবনের সমূহ কল্যাণ নির্ভর করি।

মাঘোৎসবরূপ স্বর্গের মহা মহোৎসব সকল কতবার যথাসময়ে আসিতেছে, কতবার আমাদের এই সকল নগণ্য ক্ষুদ্র মলিন জীবনের উপর দিয়া তাহার বিচিত্র শোভা সৌন্দর্য্যময় স্বর্গের তরঙ্গরাজি উত্থিত করিতেছে, স্বর্গের কত ধন রত্ন উৎসবক্ষেত্রে ছড়াইয়া আমাদের বহিশ্চক্ষু ও অন্তশ্চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া, সময়ের অবিরাম গতির সঙ্গে আপনার তরঙ্গ মিলাইয়া সেই সময়ের সঙ্গে আবার মিশিয়া যাইতেছে। আমরা এ সকল পবিত্র উৎসবের ক্ষেত্রে স্বর্গের ছড়ান ধন রত্ন যত্নে যথাসাধ্য কুড়াইয়া লইয়া, জীবনের অসময়ের সম্বলরূপে কতদূর সে সকল স্বর্গের সামগ্রী জীবন-সিন্দুকে পূর্ণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, এ সময় কিছু কিছু সে বিষয় আলোচনা করিলে পরস্পরের কল্যাণের সম্ভাবনা; তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে বিষয় কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা নববিধানের পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারিবারিক ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া নববিধানকে জীবনে যথাসম্ভব জয়যুক্ত করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছি। পৃথিবীতে যতদিন আছি, জীবনদাতা হইতে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শারীরিক জীবনের আহারাদি যথেষ্টই পাইতেছি। শারীরিক জীবন অপেক্ষা আত্মিক জীবন যদি সমধিক মূল্যবান্ ও গৌরবের সামগ্রী হয়, তবে সে জীবনের পরিপোষণ জন্য স্বর্গের প্রচুর অন্নজল যোগাইতে জীবনদাতা পরম দেবতা যে অত্যধিক ব্যস্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। তিনি শারীরিক জীবন-রক্ষার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় আহার সামগ্রী যোগাইতেছেন, আবার সময় সময় পার্থিব অনুষ্ঠানমূলক উৎসবাদিযোগে শারীরিক ও মানসিক পোষণ ও পরিপুষ্টির উপযোগী রসনার তৃপ্তিকর রসাল প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করিয়া আমাদের এই

পার্থিব জীবনযাপন ব্যাপারে কত উৎসাহ ও আনন্দ দান করিতেছেন। সেই সকল প্রচুর আহার্য্য আমরা পরম দয়ালু পরম পিতা ঈশ্বরের অশেষ কৃপার দান বলিয়া যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে সে সকল পার্থিব বস্তু গ্রহণের যোগে অপার্থিব ধর্ম্ম-সম্পদ লাভ হয়, এবং তদ্দ্বারা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণই বর্দ্ধিত হয়। সে ক্ষেত্রে মানুষের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব সুধু দেখিলে, সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তেমনই ধর্ম্মক্ষেত্রে যে স্বর্গের মহামহোৎসব আমাদের আত্মিক জীবনে স্বর্গের প্রচুর অন্নজল-গ্রহণের সুযোগ দানের জন্য সেই পরম দয়ালু পরম পিতা কর্তৃক আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা যদি তাঁহার কৃপা-জনিত তাঁহারই শ্রীহস্তের দান জানিয়া, সেই জীবন্ত জাগ্রত দেবতার শ্রীহস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে আমরা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উৎসবের সুফল আমরা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। কিন্তু পবিত্র উৎসবক্ষেত্রের সকল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে তাঁহার শ্রীহস্তের প্রসাদ গ্রহণ করা সাধন ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। এ সাধনের অভ্যাস অন্য কিছু নহে, যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু ও দীন অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরের একান্ত কৃপার ভিখারী রূপে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া। সকল প্রকার মানবীয় আবরণ ভেদ করিয়া, সাক্ষাৎ স্বর্গের ধারায় ঈশ্বর হইতে প্রসাদলাভের আশায় তাঁহারই শরণাপন্ন থাকা।

স্বর্গের উৎসবক্ষেত্রেও মানবীয় আবরণ বেশ আছে। আমরা দেখিতে পাই, মানুষ কমিটি করিয়া উৎসবের সকল ব্যাপার নির্দ্ধারণ করে, কমিটি হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়া মানুষ উৎসবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে, অর্থ ব্যয় করে, বাহিরের সকল প্রকার আয়োজন করে। উৎসব কমিটি হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়া উৎসক্ষেত্রে কেহ সংগীত করেন, কেহ উপাসনার মন্ত্র উচ্চারণ করেন, কেহ পাঠ করেন, প্রসঙ্গ করেন, কেহ বক্তৃতা দান করেন। এখানে মানুষের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব অনেক সময় অনেককে জ্বালাতন করে সত্য, অনেকের মন ভগ্ন করে সত্য। বিচার-প্রধান ভাব লইয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে মানুষের কর্তৃত্ব নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি যায়, মানুষের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব যেন তাঁহাকে আঘাত করে, তাঁহার মনোভঙ্গ উপস্থিত করে। যাঁহারা উৎসবক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে কার্য্য করিতেছেন কিনা, তাহা দেখিবার অবসর তাঁদের আর প্রায় থাকে না। তাই সঙ্কট উপস্থিত হয়। উৎসবক্ষেত্রে বিচার-শূন্য হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। উৎসব স্বর্গের দান। উৎসবক্ষেত্রে যিনি যে কার্য্য করুন, তাঁহার যোগেই আমি স্বর্গের প্রসাদ গ্রহণ করিব, এই বিশ্বাস লইয়া, এই শ্রদ্ধা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে, উৎসবের প্রসাদ-গ্রহণ কখনও সম্ভব হয় না, উৎসবের সাফল্যও লাভ হয় না। উৎসবক্ষেত্রে সংগীত আরম্ভ হইল, যিনিই সংগীত করুন, আমি সে সংগীত-যোগে স্বর্গের প্রসাদ গ্রহণ করিতে দীন ভিখারী হইয়া ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হইব; যিনিই বেদীতে বসিয়া উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করুন, আমি সেই উপাসনা-যোগে দীন ভিখারী হইয়া স্বর্গের প্রসাদ লাভের জন্য ব্যাকুল হইব; যিনি পাঠ, প্রসঙ্গ, অথবা বক্তৃতা দান করুন, তাঁহারই যোগে স্বর্গের প্রসাদ সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর হইতে গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইব। কোন্ সঙ্গীতের কোন্ ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া, বেদী হইতে উচ্চারিত উপাসনার কোন্ মন্ত্রের ভিতর দিয়া, পাঠ প্রসঙ্গ বক্তৃতার কোন্ বিশেষ অংশের ভিতর দিয়া আমার কোন্ চেতনা, কোন্ শিক্ষা, কোন্ প্রবৃত্তি, কোন্ পূর্ণতা কখন লাভ হইবে, আমি কিছুই জানি না; যাঁহারা সেই কার্য্যে যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছেন, তাঁহারাও কিছু জানেন না; জানেন তিনি, যিনি অন্তর্যামী, সকলের হৃদয়ের পরম দেবতা। তিনি জানেন, উৎসবের কোন্ অঙ্গের ভিতর দিয়া আমাকে কোন্ প্রসাদ বিতরণ করিবেন।

সত্যই আমরা দীন ভিখারী হইয়া সকল অবস্থায় উৎসবক্ষেত্রে ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিলে, তিনি আমাদের অভাব বুঝিয়া, অধিকার বুঝিয়া, যাহা দিবার দেন; তাহা আমাদের জীবনকে কত বলীয়ান্ করে, কত রূপে আমাদের নব শিক্ষা, নব দীক্ষা দান করে, জীবনকে সরস করে, সুন্দর করে; আরও তাহা ভবিষ্যতের জন্য স্বর্গের ধন রত্নরূপে হৃদয়ের সিন্দুকে কতই সঞ্চয় করিয়া লই। আবার সাক্ষাৎ ভাবে যাহা প্রাণে, মনে, হৃদয়ে, আত্মার পূরিয়া না রাখিতে পারি, তাহা কাগজে নোট করিয়া স্মৃতি-মার্জ্জনা ও ভবিষ্যৎ সাধনের সম্বলরূপে গ্রহণ করি। এইরূপে উৎসবে সঞ্চিত ধন হয় আমাদের

পরবর্ত্তী বৎসরের প্রতিদিনের সম্বল, প্রতি মাসের সম্বল, সারা বৎসরের সম্বল, অনন্ত জীবনের সম্বল। এই হইলেই আমাদের জীবনে উৎসবের সাফল্য হয়।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

ঈশ্বরদর্শন।

নিরাকার বাতাসের ফলে, বাতাসের বলে, এই জীব-দেহ রক্ষিত হইতেছে। প্রাণকে তাই প্রাণ-বায়ু বলিয়া উক্ত হয়। এই বায়ুকে বাহিরের চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি। এই অনুভব-শক্তি দ্বারা যেমন বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, তেমনি নিরাকার ঈশ্বরকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায় না বটে, কিন্তু জ্ঞান-শক্তিবলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এই উপলব্ধিই ঈশ্বর-দর্শন।

—

বিশ্বাস।

এই পৃথিবী জড় পদার্থ। আমরা সাধারণতঃ জানি, কোন জড় পদার্থ শূন্যে থাকিতে পারে না। একটি মাটীর ঢিল শূন্যে ছাড়িয়া দাও, তাহা শূন্যে অধিকক্ষণ থাকিবে না, মাটীতে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমরা উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র সব জড় পদার্থ হইলেও আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমাদের এই পৃথিবীও তেমনই আকাশে ঘুরিতেছে। বিজ্ঞান বলেন, এক মাধ্যাকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে এই সব আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু পড়িয়া যাইতেছে না। এই শক্তির শক্তি যিনি, তিনিই আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি, তাঁরই অনির্ব্বচনীয় শক্তিবলে এই সকল চালিত এবং রক্ষিত হইতেছে। আমরাও তাঁহারই নিরাকারে কোলে সশরীরে রক্ষিত ও চালিত হইতেছি, এইটি প্রত্যক্ষ ধারণা করা ও উপলব্ধি করাই বিশ্বাস। নিঃশ্বাসে যেমন শরীর রক্ষা হয়, বিশ্বাসে তেমন জীবন রক্ষা হয়।

—

জীবনের বিধান নববিধান।

জড় বস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল। এই জন্য জড়ে যাহা নিবদ্ধ করিবে, তাহা অচিরে বিনষ্ট হইবেই হইবে। কিন্তু জড় পদার্থ হইতে রাসায়িক বিজ্ঞানে রসনির্য্যাস বাহির করিয়া রক্ষা করিলে স্থায়ী হয়। নববিধান বিজ্ঞানেও তেমনি সকল দেবদেবী ও মহাপুরুষগণের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক চরিত্র উদ্ভাবন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। তাই তাঁহারা নববিধানে চির জীবিত হইয়া আছেন। কেহই ক্ষণবিধ্বংসী মৃৎপুত্তলিকায় বা পুস্তকে নিবদ্ধ নন। যাঁরা মৃৎপুত্তলিকায় দেবদেবী গঠন করেন, তাঁহারা দুই একদিনে বিসর্জ্জন দেন। এইরূপ সংস্কার, মত বা বাহ্যানুষ্ঠানে যাঁহারা ধর্ম্ম নিবদ্ধ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসও ক্ষণস্থায়ী। তাহাতে তাঁহারা অনন্ত জীবনের সম্বল জীবন্ত ঈশ্বরকেও পান না, জীবন্ত সাধু-সঙ্গও লাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন উন্নতিবিহীন মৃতপ্রায় হয়।

বিশ্বাসের বল।

গল্প আছে, শিব গঙ্গার ঘাটে শব হইয়া পড়িয়া রহিলেন, দুর্গা সেই শবের নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, আমার এই স্বামীর শব-দেহের সৎকার কেহ বাবা করিয়া দাও। তবে ইনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, সে ভিন্ন যেন অন্য কেহ ইঁহার দেহস্পর্শ না করে। অনেক সাধু, শান্ত, নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘাটে স্নান করিতে আসেন, কেহই শবদেহ স্পর্শ করিতে সাহস করেন না। অবশেষে একজন দুশ্চরিত্র সুরাপায়ী আসিয়া বলিল, তার আর ভয় কি? গঙ্গায় স্নান করা মাত্র যে নিষ্পাপ হওয়া যায়; এক ডুব দেব, আর সব পাপ ধোব, এখনই শবদাহ করবো। কথিত আছে, সে ব্যক্তি সেই বিশ্বাসেই উদ্ধার হইল। সত্য এই ভাবে যদি আমরা বিশ্বাস করি, ব্রহ্মকৃপায় নিষ্পাপ হইয়া নবজীবন পাই।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মের শতবার্ষিকী।

ভক্তিভাজন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া এবং সম্বৎসর ধরিয়া সম্পাদিত হইবে। যাঁহারা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা এজন্য জগদ্ব্যাপী আন্দোলন ও উদ্যোগ আয়োজনে নিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম উৎসাহ ধন্য।

তাঁহারা পিতামাতা আত্মজন ত্যাগ করিয়া, গৃহধর্ম্ম পরিহার করিয়া, সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়া, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া, কতই অর্থাদিসংগ্রহ করিতেছেন। গুরুদেবের গুণ গরিমা কতই বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিয়া, তাঁহার পূজা-প্রবর্ত্তনে প্রয়াস করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেবীর এবং শিষ্য বিবেকানন্দ স্বামীরও মূর্ত্তি বা ছবি বিতরণ করিয়া, এই ত্রিমূর্ত্তিপূজার শিক্ষাদানে নিরত হইতেছেন। এবং এজন্য নাকি লক্ষ টাকার ব্যয়ে এক মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তাঁহাদের মত বলিয়া প্রচার করেন, এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ তাঁহাদের বিশ্বাস বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দুর কৃষ্ণ, বলরাম ও

অধিকার পরিবর্ত্তে, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদা দেবীর মূর্ত্তি-পূজাই প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে দেশহিতকর সেবা-সাধনের প্রতিষ্ঠান নানাস্থানে করিতেছেন, তাহা সত্যই অতিশয় প্রশংসনীয়। ইঁহাদের ধর্ম্মমতের সহিত আমাদের মতের না মিলিলেও, ইঁহারা যে অদম্য উৎসাহে সেবা-কর্ম্ম সাধন করিতেছেন, তাহা আমাদেরই বিধানান্তর্গত কার্য্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

নববিধান সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বিধান, যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় যে কোন ভাবে ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে বা জনহিতৈষণায় যে কোন কার্য্য করেন, তাহা একই আমাদের সেই পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া আমরা আদর ও প্রশংসা করিব। নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, ধর্ম্মের বহিরাবরণ যাহাই হউক, তাহার অন্তর্নিহিত আত্মিক ভাব যাহা, তাহা পবিত্রাত্মার ভাব বলিয়া আমরা আদর ও গ্রহণ করিব।

নববিধানাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত "সুলভ সমাচারের" লক্ষ্য মন্ত্র, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পার লুকান রতন।" সকল বহিরাবরণের ভিতর যেখানে যে সত্য রত্ন আত্মিক জীবনের উপাদান রহিয়াছে, তাহাই নববিধানে সমাদৃত।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে মৃৎমূর্ত্তিতে বা আলেখ্য পটে নিবদ্ধ করিয়া পূজা করা অপেক্ষা, তিনি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। মৃৎমূর্ত্তিতে যে সকল দেবদেবী পূজিত হন, তাহা পরে বিসর্জ্জিত হয়, ইহা কেনা এদেশে জানে? এ দেশে আরও কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তিনি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা কি সকলে বলেন না? শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সেই দলভুক্ত হন, তাহা আমরা সহিতে পারি না।

তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া, তাঁহার শ্রীমুখের দেবনিশ্বসিত বাণী স্বকর্ণে শুনিয়া, তাঁহার সঙ্গে নাচিয়া গাহিয়া স্বর্গীয় আনন্দ যাহা সম্ভোগ করিয়াছি, তাহাতে তিনি কেবল পুত্তলিকাবৎ পূজিত হইলে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করা হইল, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না; বরং ইহাতে তাঁহার অবমাননা করা হয়, আমরা বিশ্বাস করি।

তিনি নিজেও তাহা চান নাই, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব স্বয়ং আমাদের নিকটে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর নন এবং যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতে চান, তাঁহাদিগকে তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি পর্য্যন্ত দিয়াছেন।

বাস্তবিক তাঁর জীবন একটা জীবন্ত ঈশ্বর-ভক্তের জীবন। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা ও কৃচ্ছ্র, সাধ্য সাধনার আদর্শ চরিত্র, সরল ধর্ম্মাত্মা, শিশুভাবাপন্ন উন্মত্ত ভক্ত, ভাবে প্রেমে ডগমগ কেমন হইতে হয়, তাহার আদর্শ বলা যাইতে পারে; তাঁহাতে কোন রকম ধর্ম্মের ভাণ বা লোক দেখান ভাব ছিল না। তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন, সরল ভাবে নির্ভয়ে তিনি তাহা বলিতেন। যথার্থ ভক্তের লক্ষণ তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে শ্রী কালীমূর্ত্তির পূজা করিতেন; কিন্তু তাহা করিতে করিতে আশ্চর্য্যরূপে বিধাতার চক্রে বা প্রেরণায়, ধর্ম্মপিপাসায় পিপাসিত ও ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য পাগল হইয়াছিলেন। সেইজন্য নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকদিগের নিকট শিক্ষার্থীর ভাবে গমন করেন এবং তাহারি ফলে উদার ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব লাভ করেন।

এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি, হিন্দুর পৌত্তলিকতা সাধন করিতে করিতে কেমন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়সাধনায় মানুষ উপনীত হইতে পারে এবং চিন্ময় ঈশ্বরে ভক্তিযোগে সমাধিস্থ হওয়া যায়, তাহারি আদর্শ জীবন দেখাইবার জন্য তিনি বর্ত্তমান নববিধানের যুগে একজন ঈশ্বর-প্রেরিত প্রকৃত মহাত্মা বা সাধু ভক্ত। সুতরাং তাঁহার আদর্শ জীবন অনুসরণ করাই তাঁহার প্রতি যথার্থ সম্মাননা বা তাঁহার পূজা। নববিধানে তাঁহার এক বিশেষ স্থান আমরা উপলব্ধি করিতেছি।

যখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে কেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন তিনি প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, "ওগো বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর, সে কেমন আমাকে বলতে পার?" তাহার পর কেশবের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতররূপে আত্মিক ধর্ম্মমিলন হইলে পর, তিনি সাক্ষ্য দিয়া আমাদের নিকটে বলিলেন, "আমি যখনই কেশবের কাছে যাই, আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়"; ইহা অপেক্ষা নববিধানের সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের সাক্ষ্যদান আর কি হইতে পারে। তিনি নিজকে কেশবচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া কেশবকে ষ্টীমবোট এবং নিজেকে কলার মান্দাস, কেশবকে বটবৃক্ষ এবং নিজেকে রাঁড়াভাল গাছ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সরল দীনতার পরিচয় ভিন্ন আর কি বলিব? তাই তাঁহাকে কেশবচরিত্রের সংস্পর্শে যে জড়বিৎ হয় তাঁর সাক্ষী বলিয়া আমরা স্বীকার ও গ্রহণ করিব; তাঁহার অনুসরণে আমরাও জীবনে নববিধানে যদি এই সাক্ষ্য দান করিতে পারি, তবেই আমরা যথার্থ নববিধানবিশ্বাসী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিব।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, চরিত্রের বিধান; সুতরাং প্রত্যেক জীবনে যে সাধুতা এবং দেবচরিত্র প্রতিফলিত, তাহার আদর্শ অনুসণ করিয়া তদনুরূপ চরিত্রে চরিত্রবান্ হওয়াই নববিধানের ধর্ম্ম। এই ভাবে যেমন পূর্ব্ব যুগে বলা হইয়াছে, হরি অপেক্ষা হরির নাম বড়, তেমনি নববিধানে কোন সাধুকে মৃৎপুত্তলিকা বা বুদ্ধি-বিচারসিদ্ধ মতে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার পূজা বা প্রশংসা অপেক্ষা, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ এবং জীবনে তাহা প্রতিফলিত করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের শতবার্ষিকী দিনে প্রার্থনা, তিনি মৃত পুত্তলিকা না হইয়া আমাদের জীবনে জন্মলাভ করুন।

দীন সেবক।

ব্রহ্মদাস মহিমচন্দ্র সেন।

(শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত)

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে যাঁহার পুণ্যস্মৃতি লইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসিয়াছি, তাঁহার সুদীর্ঘ ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা আমার নাই; তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সাক্ষ্য তাঁহার বন্ধুরাই দিবেন। একাধারে পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু ও সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া, এই সুদীর্ঘকাল যাঁহার স্নেহ ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহারই শুধু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

পিতৃদেব ইং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে, ৭ই চৈত্র, টাঙ্গাইল সাবডিভিসনের অন্তর্গত অলোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আমার পিতামহ গঙ্গারাম সেন ধনী ছিলেন না। তিনি বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। তিনি স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা এমন ভাবে জীবন যাপন করিতেন যে, তদ্দর্শনে লোকের মনে হইত, তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃদেবের চারি বৎসর বয়সে, চূড়ামণি যোগ উপলক্ষে, গঙ্গাস্নান জন্য পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া পিতামহদেব মুরশিদাবাদ গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে দুই বৎসর কাল মধ্যেই পিতামহদেব তাঁহার হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ করান এবং মুখে মুখে কয়েকটী শ্লোক অভ্যাস করান। সেই অভ্যস্ত শ্লোক কখনও ভোলেন নাই। শৈশবে আমাদের মুখে মুখে সেই শ্লোক অভ্যাস করাইতেন, আবার এই বার্দ্ধক্যে তাঁহার চতুর্থ অগ্রজের প্রপৌত্রী ৩বৎসরের শিশু কন্যাকেও মুখে মুখে অভ্যাস করাইতে চেষ্টা করিতেন। শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট মিষ্ট উচ্চারণ শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন। শ্লোক দুটী এখানে উদ্ধৃত হইল :—

যদি কৃষ্ণপদে ভক্তির্মতিশ্চ পদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে নৈব কা চিন্তা মরণে রণে॥

বরমসি গারে তরুতলে বাসঃ
বরং মে ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরং মে ঘোরে নরকে মরণং
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণং॥

আমার পিতামহ ১৮৫৮ সনে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পর বৎসর পরলোক প্রাপ্ত হন। আমার পিতামহী রত্নমণি দেবী সৌভাগ্যবতী ছিলেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন। একাকিনী ছয়টি পুত্র ও দুইটী কন্যার প্রতিপালন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বাড়ী ঘর বাসন পত্র অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। গৃহে অতিথি অভ্যাগতের অভাব ছিল না; কুলগুরু, বৈষ্ণব, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব, এমন কি বিদেশীয় অপরিচিত লোক আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেও তিনি প্রফুল্লবদনে তাঁহাদের সেবা করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী ও ধন্য মনে করিতেন। পিতৃদেব ভ্রাতা ভগিনীগণের সর্ব্বকনিষ্ঠরূপে সকলের স্নেহ, দয়া ও ভালবাসা লাভ করেন।

পিতামহদেব বর্ত্তমান থাকিতেই পিতৃদেবের বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত না থাকাতে শিক্ষার স্রোত স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ছোট জ্যাঠা মহাশয় গ্রামস্থ পাঠশালাতে পড়িতেন। পাঠশালা উঠিয়া গেলে তিনি সন্তোষ পাঁচ আনির স্কুলে পড়িতে থাকেন। পিতৃদেব তাঁহার সহিত স্কুলে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, অল্প বয়স বলিয়া যাইতে পারেন নাই। কিছুদিন মধ্যে পাঁচ আনির স্কুলও ভাঙ্গিয়া গেল এবং ছোট জ্যাঠা মহাশয় কিছু দিনের জন্য তেরশ্রী রণুবাবুর বাড়ীর স্কুলে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু পিতৃদেবের বিদ্যাশিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইল না। অগত্যা অন্য দুই বালকের সঙ্গে ঘরেই লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বড় জ্যাঠা মহাশয় প্রধান শিক্ষক এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরু মহাশয়ের নিকট চিঠি পত্র পর্য্যন্ত লিখিলেই পড়াশুনা শেষ হইত। ইতিমধ্যে গ্রামস্থ সদাশয় ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার স্বর্গীয় হরনাথ রায় মহাশয় নিজ বাটীতে কিছুদিন পিতৃদেবের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং একটী বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পিতৃদেব ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইতে পারিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলটী উঠিয়া গেল এবং ক্রমে যাহা শিখিয়াছিলেন, চর্চ্চা না থাকাতে তাহাও ভুলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে বেড়াবুচিনা গ্রামে শিক্ষক চন্দ্রধর নিয়োগী এক বিদ্যালয় খুলিলেন; তখন তিনি সেখানে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক মাস মধ্যে উহাও উঠিয়া গেল। জাফরগঞ্জ থানার অনতিদূর প্রসিদ্ধ থলসী গ্রামে তাঁহার এক মাতুল ভ্রাতা পড়িতেছিলেন। তাঁহার মাতুলগৃহে বিনোদপুর গ্রামে থাকিয়া থলসী বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন এবং প্রতিদিন সুন্দররূপে পড়াশুনা চালাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ এবং দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় পরামর্শ করিয়া পিতৃদেবকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইবার জন্য বলিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়া দিলেন। উঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ করাতে, এইটী ঈশ্বরের কৃপাগুণে হইল, ইহাই অন্তরে বুঝিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শাঁকরাইল গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কালিদাস নিয়োগী মহাশয় নিজ বাটীতে একটী ইংরেজী বাংলা স্কুল স্থাপন করিলেন। পিতৃদেব বর্ষান্তে সেখানে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। দুই বৎসর মধ্যেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে সুবিধা পাইলেন। তখন পরীক্ষা দিবার কেন্দ্রস্থান ছিল ময়মনসিংহ। অসুস্থ হইয়া পড়াতে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল না বলিয়া,

মাণিকগঞ্জ গ্রাম স্কুল গৃহে যাইয়া পরীক্ষা দিলেন এবং ৪৲ টাকা বৃত্তি লইয়া পরীক্ষা পাশ করিলেন।

ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করাতে, পিতৃদেবের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহা স্থির হইয়া গেল। দুই বৎসর শাঁকরাইল কলিদাস বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়িলেন। এই সময় মধ্যেই জীবনে স্বাধীন ও নির্জ্জন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ ও দীননাথ সেন কৃত নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া, কিছু কিছু স্বাধীন ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য চিন্তা করিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ইহার সঙ্গে সেই সময়ে "ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা" এ তত্ত্বও জীবনে প্রমাণিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। বেড়াবুচিনা-নিবাসী বাবু হরিনাথ নিয়োগী শাঁকরাইল স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। বেড়াবুচিনা আমাদের অলোয়া গ্রামের দক্ষিণে সংলগ্ন গ্রাম। সুতরাং তাঁহার সহিত পরিচয় ক্রমে ভালবাসা ও বন্ধুতায় পরিণত হইল। হরিবাবু অমসাধু। হরিবাবুর সহিত একত্রে অনেক দিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে করিতে, তাঁহার চরিত্র ও জীবনের প্রভাব পিতৃদেবের উপর পতিত হয়। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে শনিবারে শনিবারে একটী সভা হইত। সেই সভায় চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা হইত। এই সময়ে সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধু টাঙ্গাইলের অন্যতম উকীল বাবু রাধানাথ ঘোষ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সময় সময় বক্তৃতা করিতেন। একবার সভার কতিপয় সভ্য গোপনে মিলিত হইয়া আলোচনা করিলেন, "ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের প্রয়োজন কি না।" এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু দীননাথ সেনের নিকট পত্র লেখা হইল। তিনি জানাইলেন, ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই সভার সভ্যদের মধ্যেও সময় সময় চরিত্রগঠন সম্বন্ধে আলোচনা হইত। প্রতিদিন যাহাতে চরিত্র পবিত্র রাখিতে পারা যায়, এরূপ কি কি করিবেন এবং কি কি করিবেন না, ইহা স্থির করিয়া ৫৩টি নিয়ম লিখিয়া লইলেন এবং প্রতিদিনই দৈনিক লিপি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পিতৃদেব বলিতেন, "যদিও এই সকল নৈতিক নিয়ম সম্যক প্রতিপালিত হইয়াছে, এ কথা কোন মতেই বলিতে পারি না, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য, এইগুলি রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা বৃথা হয় নাই; কেন না ভবিষ্যতে জীবনের গতি কোন্ দিকে হইবে, তাহা এই সকল নৈতিক নিয়মপালনের ঐকান্তিক যত্নই সেই যৌবনকালে আমাকে নিরূপণ করিয়া দিয়াছিল।"

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী হইতে পিতৃদেব ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মপ্রচারার্থ ময়মনসিংহে আসেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃদেব তাঁহার বৃত্তি ঢাকা পোগোজ স্কুলে স্থানান্তরিত করিয়া লইলেন। "কোন কল্পিত দেবদেবী প্রণাম করিব না, কোনও পূজার প্রসাদ খাইব না" এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্ব হইতেই প্রতিপালনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ঢাকা রওয়ানা হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সায়ংকালে ও নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানকালে কিছু কিছু প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন প্রার্থনা করিলেন— "প্রভু, এবার যেন সরস্বতীপূজার অঞ্জলি দিতে না হয়।" মনে ছিল, সরস্বতীপূজার দিনটা কোনও রকম কাটাইয়া দিতে পারিলে হয়। কেন না অগ্রজদিগকে, বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রজকে, অত্যন্ত ভয় করিতেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমাদের এক জ্ঞাতির মৃত্যু হইয়া অশৌচ হইয়াছে, সুতরাং সরস্বতীর অঞ্জলি দান হইতে রক্ষা পাইলেন। ঈশ্বর যে দীন জনের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, এ বিশ্বাস তাঁহার তখন স্থির হইল।

সরস্বতীপূজার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বারদোল পর্য্যন্ত বসন্তকালে ছুলি গান হইত। শ্রাবণ মাসে মনসা ভাসান গান হইত। কিন্তু এই সকল বিবিধ রকমের গানের মধ্যে, পিতৃদেবের বৈষ্ণবদিগের বাউলিয়া ও প্রেম-সংগীত শাক্তদিগের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত ও হরিসংকীর্ত্তন ভাল লাগিত। তিনি এই সকল বিবিধ রকমের সংগীত হইতে মনের মত সঙ্গীত বাছিয়া বাছিয়া লিখিয়া লইতেন ও মুখস্থ করিতেন। তাঁহার মনে যে শৈশব হইতেই বৈরাগ্য, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, সেই সংগীত হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

(ক্রমশঃ)

পুণ্য-স্মৃতি।

(১৪ই মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্বর্গগত রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাশ ও স্বর্গগতা সাধিকা ইচ্ছাময়ী দেবীর সাম্বৎসরিক পুণ্যস্মৃতিতে তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন দাশের প্রার্থনা)

হে পুণ্যময়ী জননী, আজ এই পুণ্যতিথিতে আমরা বিশেষ করিয়া তোমার শরণ লই। আজ সকল পুণ্যশ্লোক বিদেহী মহাত্মা সাধু ও সাধ্বীদের স্মরণ করি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করি, আমাদের স্বর্গস্থ আত্মীয় আত্মীয়া ও পরিজনবর্গকে স্মরণ করি; স্মরণ করি, যাঁরা আজ আমাদের সহিত উপস্থিত হইতে হইতে পারেন নাই তাঁহাদের। বিশেষ দুইটি দেহমুক্ত আত্মার আজ বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমরা তাঁহাদের জীবনের কাহিনী স্মরণ করি, আমাদের চিত্তকে আলোকিত করি, আমাদের জীবনকে শুদ্ধ এবং শক্তিশালী করি। আজ স্বর্গগত কৈলাশচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গিনী সাধ্বী ইচ্ছাময়ীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণও এই স্মৃতিতীর্থে উপস্থিত; তাহাদের সকলকে লইয়া আমরা এই দুইটি সাধু জীবন আলোচনা করি। সাধু জীবন স্মরণ, মনন ও আলোচনা করিয়া আমরা পুনরায় নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হই, হে পুণ্যময়ী জননী, ইহাই তুমি বিধান কর।

চট্টগ্রাম প্রদেশে কর্ম্মবীর কৈলাশচন্দ্রের কর্ম্মী ও সাধক জীবনের অবসান হয়। আরম্ভ ও শেষ একই স্থানে। কৈলাশ চন্দ্র অপূর্ব্ব ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। সাধারণতঃ লোকের সঙ্গে লোকের সাক্ষাৎ হইলে লোক নমস্কার বা অনুরূপ অভিবাদন দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করে; কৈলাশচন্দ্র কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র উৎফুল্ল অন্তরে বলিয়া উঠিতেন, "হরিনাম সত্য"—অপরপক্ষ বা অভ্যাগতকেও "হরিনাম সত্য" উচ্চারণে প্রত্যভিবাদন করিতে হইত। দুই বাহু প্রসারণ করিয়া কৈলাশচন্দ্র সকলকে বক্ষে আবদ্ধ করিয়া লইতেন। বয়স বা পদের কোনও বাধা ছিল না।

কৈলাশচন্দ্র অতি নিম্নপদ হইতে নিজ বুদ্ধি, মেধা ও কর্ম্ম-পটুতাগুণে চট্টগ্রামের সর্ব্বমাননীয় ব্যক্তিরূপে মানুষের প্রেম ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ডিপুটীর পদে থাকিয়া তিনি উনিশটি বিশাল জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। চট্টগ্রাম কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস তাঁহার বিশেষ কর্ম্মস্থল। যত সরকারী কর্ম্মচারী প্রথমে চট্টগ্রামে আসিতেন, কৈলাশচন্দ্রের নিকট তাঁহারা শিক্ষাগ্রহণ করিতেন। কৈলাশচন্দ্রের পরামর্শ তাঁহারা সকল কাজে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। বেসরকারী সকল কাজেও কৈলাশচন্দ্রের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যমান ছিল। চট্টগ্রাম নববিধান মন্দির স্থাপন ও নির্ম্মাণ কৈলাশচন্দ্রের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয়। বাংলার কোন্ এক অপরিজ্ঞাত পল্লীপ্রান্তে বসিয়া কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাসী মণ্ডলী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন বিশ্বাসী সাধু রাজেশ্বর গুপ্ত, দীন ভক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত কৈলাশচন্দ্রের সকল কর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্তভাবে সহায় ছিলেন। কৈলাশচন্দ্র নিজ ব্যয়ে জমী খরিদ করিয়া তথায় নববিধানপল্লী স্থাপন করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। সেই পল্লীতে তখন কালীচন্দ্র গুপ্ত, মতিলাল দাশ, গিরিশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই বাস করিতেন।

কৈলাশচন্দ্র নিজ বাসভবনের নাম রাখিয়াছিলেন, "আশা-কুটীর"। এই আশাকুটীরে দৈনিক উপাসনা ধ্যান কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনের জন্য, ভিন্ন একটী উপাসনা-গৃহ থাকিত। দেবী ইচ্ছাময়ী এই উপাসনা-গৃহের সেবিকা ও পূজারিণী ছিলেন। আশাকুটীরের প্রতি ধূলিকণা ভক্ত ও সাধু-সমাগমে পবিত্র। আশাকুটীরে নিত্য অতিথি, নিত্য সাধুসমাগম। আশাকুটীরের সন্তানদিগের উপর এই সকল অতিথি সজ্জনগণের সেবার ভার পড়িত। কৈলাশচন্দ্র নিজেও সর্ব্বদাই অতিথিদের সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। আশাকুটীরের পরিবার কেবল মাত্র কৈলাশচন্দ্রের সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়বর্গকে লইয়া ছিল না, আত্মিকভাবে যোগযুক্ত বহু সাধু আশাকুটীরের পরিবারভুক্ত হইয়াছিলেন। নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, অপরূপ রূপবান্ বিনয়াবনত গৃহী সাধক মহিমচন্দ্র দাশকে সপরিবারে আশাকুটীরে বাস করিতে। দেখিয়াছি, অপরিচিত বালক রমেশচন্দ্র সিংহকে কৈলাশচন্দ্রের প্রেমক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে। রমেশচন্দ্র বালক, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল। তেজোদ্দীপ্ত বালক নিজ বাসগৃহ পরিজন, ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কৈলাশচন্দ্র তাঁহার সহায় হইলেন। রমেশচন্দ্রকে তিনি সন্তান-স্নেহে পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। কৈলাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জন তখন বয়স্ক বালক। তবু রমেশচন্দ্রই আশাকুটীরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের সম্মান লাভ করিলেন। কত বাধা ও বিপদের মধ্যে রমেশচন্দ্রের জন্য কৈলাশচন্দ্রকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে; কিন্তু বালকবীরের অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাসের তেজোজ্জ্বল অনুরাগ দেখিয়া কৈলাশচন্দ্র আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। বালক রমেশ কৈলাশের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে সমাজে পরিচিত হইলেন এবং রমেশও কৈলাশচন্দ্রকে নিজ পিতারও অধিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় একান্ত আপন করিয়া লইলেন। সেই হইতে চট্টগ্রামে যেন এক নবযুগের সঞ্চার হইল। বিশেষ করিয়া কয়টি যুবক যেরূপ নববল ও আশা ভক্তি লইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তখন রমেশচন্দ্র, মহিমচন্দ্র দাশ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাশ, গিরীশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন যুবক কীর্ত্তনে, গানে, প্রার্থনায়, সভায়, সমিতিতে চট্টগ্রাম আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই আশাকুটীরের পিতা ও মাতার নিকট সন্তানবৎ স্নেহ ও পরিচর্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। পরে আসিলেন, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ, পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র দত্ত, যুবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দ, আরও কতজন। আসিলেন শ্রীশচন্দ্র দাশ, নাচিলেন দীন সেবক দীনাধমদীন ভক্ত কালীচন্দ্র, সাধক রাজেশ্বর নববিধান কণ্ঠে লইয়া প্রচার করিলেন—চট্টগ্রাম এক নবনদীয়ায় পরিণত হইল। সর্ব্ব পশ্চাতে কৈলাশচন্দ্র ভৃত্যসম মণ্ডলীর সেবার ভার মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া থাকিতেন।

নিজ বুদ্ধি ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রার্থনা করিয়া কৈলাশচন্দ্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহা সাধন করিতে তিনি কোনও বিপদ বা কাহাকেও ভয় করিতেন না। অকুতোভয়ে নির্ব্বিকার ভাবে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া, বিজয়ী বীরের ন্যায় সকল নিন্দা, তিরস্কারকে অগ্রাহ্য করিতেন। তাঁহার বিশাল দুই আঁখিতে কি যে এক জ্যোতি প্রতিভাত হইত, তাহা যে না সে চোখের সম্মুখে পড়িয়াছে, সে কখনও কল্পনা করিতে পারিবে না। সেই চোখের সরল কুণ্ঠাহীন দৃষ্টির সম্মুখে কৈলাশচন্দ্রের শত্রুরও মাথা নত হইয়া যাইত। শুনিয়াছি, তাঁহার কোনও পরিচারক কোনও কারণে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া, তরবারি দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদনের চেষ্টা করে। কৈলাশচন্দ্র কার্য্যে ব্যস্ত, পশ্চাতে তাঁহার সম্পূর্ণ

অগোচরে তাঁহার মাথার উপরে খড়্গ উঠিয়াছে, খড়্গের ছায়া পড়িল সম্মুখে; কৈলাশচন্দ্র পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন, ভীমকায় শত্রু উদ্যত অসি দ্বারা তাঁহার নিধনে কৃতসংকল্প! কৈলাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "কি, আমাকে খুন করতে চাও?" কৈলাশচন্দ্রের দৃষ্টির সম্মুখে আততায়ীর অসি হাত হইতে খসিয়া পড়িল, লোকটি অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলিল এবং নিজ সংকল্পের কথা বিবৃত করিল। কৈলাসচন্দ্র তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সেই হইতে সেই লোকটি কৈলাশচন্দ্রের বিশিষ্ট অনুচররূপে উন্নতি লাভ করিল।

এত বড় তেজস্বীপুরুষ, এত পরাক্রমশালী, সমগ্র চট্টগ্রাম যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মপ্রবণতায় কম্পিত, সেই পুরুষসিংহ সহধর্ম্মিণী ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বা অনুমোদন ভিন্ন কোনও কাজ করিতেন না। ইচ্ছাময়ীকে কৈলাশচন্দ্র "দেবী" সম্বোধন করিতেন। ভৃত্য বা কর্ম্মচারীদের অন্যায় বা ক্ষুদ্রতা দেখিলে কৈলাসচন্দ্র সহ্য করিতে পারিতেন না, আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেন, কঠিন তিরস্কারে অপরাধীর শাস্তি দিতেন; আবার পরক্ষণেই তাহাকে কাছে ডাকিয়া স্নেহ-বচনে সন্তুষ্ট করিতেন এবং হাতের কাছে অর্থ বা যাহা কিছু থাকিত, তাহা তাহাকে দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। তাই সকলে বলিত, "কর্ত্তা রাগ না করিলে ভাল লাগে না।" তাঁহাকে সকলে কর্ত্তা বলিত। একদিন তিনি এই কর্ত্তা সম্বোধন কি ভাবে নিজ অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বলিতেন, "আমি সকলের ভৃত্য কিনা, সকলের সেবার ভার আমার উপর, আমি কর্ম্ম করি, তাই সকলে আমাকে কর্ত্তা বলে। আমি ভৃত্যদিগের ভিতর বিশিষ্ট ভৃত্য।"

কর্ম্মগতপ্রাণ সাধক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিশ্বাসী কৈলাশচন্দ্র শেষ দিনও নিজ কাজ সমাধান করিয়া আফিসের কর্ম্মচারীদের ছুটি দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। আফিসের দিন লিপির খাতায় লিখিয়া আসিলেন, ভগবানের চরণে প্রার্থনা। সে প্রার্থনায় ভগবানের হাতে সমগ্র কর্ত্তব্যের ভার সমর্পণ করিয়া যেন চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলেন। তার তিনদিন পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

(ক্রমশঃ)

—•—

নূতন সঙ্গীত।

(৮ই জানুয়ারী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে রচিত)

(বিধানী সুর)

কেশব আমার কি ধন রে ভাই
জান্‌বি তোরা বল কেমনে?
সে যে দেছে প্রাণাহুতি,
বাঁচবো বলে আমি প্রাণে।
ব্রহ্মে মা বল্‌তে শিখেছি,
দেখা শুনার সন্ধান পেয়েছি,
(নব) বৃন্দাবনের পথ চিনেছি,
নয় কি কেশবেরই গুণে?
এ চণ্ডালেও ভাই বলে,
সে যে আমায় কোল দিলে,
হায় চিন্‌লাম না তাঁর মায় বলে
কেঁদে গেছে যাবার দিনে।
(সে যে) দিয়ে নববিধান ধন,
দিলে নিজ অঙ্গে স্থান,
(বল্লে) তাই আমি একজন,
(হায়!) ভুলি কেমনে এ ঋণে।
(হায়!) কেন লেখক হারাম হয়ে,
(তাঁর) অবিশ্বাস করিয়ে,
বেড়াই আমি আমায় করিয়ে
মরি পাপ প্রলোভনে।
আজ করি পাপের প্রায়শ্চিত্ত,
হই সদলে আজ সহমৃত,
লভি জীবন পরিবর্ত্তিত
সে আশা-চন্দ্র-গ্রহণে।

—•—

শান্তিবাচন।

হোক্ ধরা, শান্তিভরা, ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন।
হোক্ প্রেম-পরিবার, ভব নববৃন্দাবন।
এই নবদেবালয়—ভকতের শেষ দান,
সর্ব্বতীর্থসমন্বয়, তুমি তার রাখ মান!
শান্তিমন্ত্রে দাও দীক্ষা, শিরে ঢাল শান্তিজল,
দাও দিব্য দৃষ্টি, মাগো, স্বর্গ হোক্ ধরাতল!
ধর্ম্মগ্লানি যাক্ ঘুচে, হোক্ ধর্ম্মসমন্বয়,
জননী আনন্দময়ী, হউক সত্যের জয়!
পৃথিবী হউক ধন্য, ঘুচে যাক্ ভুল ভ্রান্তি,
সর্ব্বদেশে এক সুরে গাক্ সবে শান্তি, শান্তি!
তুমি কর আশীর্ব্বাদ, ভকতের রাখ মান,
তব পদে এই ভিক্ষা ভগবান—ভগবান!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

—•—

মাঘোৎসবের কার্য্যবিবরণী।

১লা মাঘ হইতে মহোৎসবের দ্বার বিশেষ ভাবে উদ্ঘাটিত হইল। নবদেবালয়ে প্রাতে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা

করেন। চিত্তশুদ্ধিলাভ ও আত্মসংযম-ব্রত-গ্রহণে ভাই প্রিয়নাথ নির্ব্বাকে যোগদান করেন। শ্রীনববারের ভাইদের বিশেষ অনুরোধে তাঁকেই সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মারতির অনুষ্ঠান ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অক্ষয়কুমারের সহযোগে সম্পাদন করিতে হয়। বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপায়, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের গভীর জীবন্ত আরতির প্রার্থনা-বাণী ভাইয়ের নিতান্ত ক্ষীণদৃষ্টি সত্ত্বেও সুগম্ভীর ভাবযোগে উচ্চারণ করেন। আরতির কীর্ত্তনোক্ত শব্দে শব্দে ব্রহ্মস্বরূপ সমুজ্জ্বলিতরূপে উপলব্ধ হয়। নিরাকার ব্রহ্মকে এমন সহজে যে দেখা যায়, ইহা কে জানিত। নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার আকারে দর্শন করা পৌত্তলিকতা; কিন্তু সাকার আলো সহযোগে দর্শন পৌত্তলিকতা নয়। অপৌত্তলিক নববিধানে এই ভাবে আধ্যাত্মিক উপাসনা বাহ্য উপাদানে সাধন এক আশ্চর্য্য সাধন। এই আরতির গাম্ভীর্য্য এবং মাহাত্ম্য অনেক সংশয়বাদী পৌত্তলিকতা বিরোধীর অন্তরেও ভাবযোগ সঞ্চার করিয়াছিল, ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টবাদী বন্ধু, এসলামবিশ্বাসিনী কন্যা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন ভগ্নীও সাক্ষ্য দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধন্য নববিধান।

২রা মাঘ, নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় আর্য্যনারীগণ নবদেবালয়ের রোয়াকে নববিধান নিশান প্রোথিত করিয়া, নিম্নে নানাপ্রকার আলপনা দিয়া নিশান-বরণ-অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। মহারাণী সুচারু দেবী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ভাব-প্রণোদিত চিত্তে এই বরণে নেতৃত্ব করেন। তিনি শ্রীমদাচার্য্যদেবের "বিজয় নিশান" বিষয়ক উপদেশ আবৃত্তি করেন। ভাবোচ্ছ্বাসে তাহা করিতে করিতে তাঁহার শরীর নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে; ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গাড়ীতে বাড়ী পাঠাইয়া দেন। উৎসবে এই দিন যোগ দিয়া যেন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আলিঙ্গন দিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।

নিশানবরণ যদিও একটী বাহ্যানুষ্ঠান, কিন্তু ইহাতে পৌত্তলিকতা কিছু নাই। নিশান নববিধানের বিজয়ের নিদর্শন, ঈশ্বরের প্রতিমা নয়। নববিধানে বিধাতা পবিত্রাত্মার বিধানে যাহাতে আমাদের গৃহ সংসার পরিচালিত হয়, ইহাই সাধনের উদ্দেশ্যে আড়ম্বর সহকারে সাধারণ মেয়েদের মনে একটা ধারণা উদ্দীপনের জন্য এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। কোন রাজা কোন দেশ বা রাজ্য যখন দখল করেন, সেই রাজ্যে তখন তিনি নিজ পতাকা নিখাত করেন; তেমনি বিশ্বরাজ আমাদের গৃহ সংসারও অধিকার করিবার জন্য এই তাঁর নিশান উড়াইয়া দিলেন। আমাদের সংসারও তাঁর হইল, সংসার আর বিষয়-বিলাসের স্থান রহিল না, ধর্ম্মের সংসার হইল, ইহাই নিশান-বরণের সাধন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী সুধা দেবী নূতন রচিত একটী সংগীত গান করেন।

৩রা মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন, এবং ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এইদিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় গোলদীঘির ধারে নববিধানের উৎসবে আহ্বানসূচক সভা হয়। একটী সংগীত করিয়া সভা আরম্ভ হয়। ভাই চন্দ্রমোহন প্রার্থনা করিলে ডাক্তার জগন্মোহন দাস একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সকলকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী সকলকে বলিতেছেন, আমার ধর্ম্ম লইতে হইবে, নতুবা পরিত্রাণ হইবে না। হিন্দু বলিতেছেন, এক হিন্দু ধর্ম্মে পরিত্রাণ, মুসলমানও তাই বলিতেছেন, খ্রীষ্টানও তাই বলিতেছেন। কিন্তু নববিধান আসিয়া বলিলেন, সকল ধর্ম্মেই পরিত্রাণ, ধর্ম্ম একই ধর্ম্ম, নামে মাত্র ভেদ, সকলকেই পরস্পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধর্ম্মে কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই।

তাহার পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই মর্ম্মে বলিলেন, উপরে বিস্তীর্ণ আকাশ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান সকলকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আকাশ তো শূন্য নয়, এই শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া মহাকাশরূপ স্বয়ং জীবন্ত জাগ্রত দেবতা এই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী উপস্থিত সকলকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস-চক্ষু খুলিলেই আমরা তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে পারি। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত হিংসা দ্বেষ, কত মারামারি, রক্তারক্তি, কত ধ্বংসলীলা! মানবমণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এমন হিংসা দ্বেষ, রক্তারক্তি, এমন ধ্বংসলীলায় কাহার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত? স্বয়ং ঈশ্বরের হৃদয়। এক ঈশ্বর সকলের পিতামাতা, সকলে তাঁহারই প্রিয় সন্তান। এক ঈশ্বর সকলের রাজা, সকল মানবমণ্ডলী তাঁহারই প্রিয় প্রজা, প্রিয় পরিবার। তাই তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা, মানুষের এইরূপ ধর্ম্ম লইয়া অন্ধ গোঁড়ামীমূলক হিংসা বিদ্বেষে। তাই এ যুগে তিনি স্বয়ং এই ধর্ম্মদ্বেষের মীমাংসা করিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সত্য মিলন সংস্থাপন করিয়া সকল মানবমণ্ডলী মধ্যে মহাসম্মিলন, মহা প্রেম মিলন সংস্থাপন করিতে অবতীর্ণ। প্রত্যেক মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া তিনি আছেন। আসুন, আমরা আপনার বুদ্ধির পথে, ভাব রুচির পথে না চলিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হই; আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি আমাদিগকে নিজে গুরু হইয়া শুভ বুদ্ধি যোগাইবেন, আমাদিগকে পরিচালন করিয়া মিলনের পথে অগ্রসর করিবেন, আমাদের সকলের মধ্যে, এই বিশ্ব মধ্যে মহামিলন সংস্থাপন করিবেন। তিনি স্বয়ং নবধর্ম্ম, মিলনের ধর্ম্ম নববিধান লইয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত। আমরা কেবল তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন থাকিব, অবশিষ্ট সকল কার্য্যই তিনি এই মহামিলনের ধর্ম্মক্ষেত্রে আমাদিগের দ্বারা করাইয়া লইবেন। পৃথিবীতে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেব-

মন্দিরে অন্য সম্প্রদায়ের লোক মুক্তভাবে আপনার মন্দির বলিয়া প্রবেশ করিতেও পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর এই নবধর্ম্ম নববিধানের মন্দিরকে সকল ধর্ম্মের লোকের জন্য প্রমুক্ত রাখিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্মমন্দির এই উৎসব-সময়ে আপনার দ্বার সকলের জন্য প্রমুক্ত করিয়া, সকলকে সেই পবিত্র দেব মন্দিরের উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমরা নববিধানের ঐ নিশান উড়াইয়া, সেই উৎসবক্ষেত্রে সকলকে যাইবার জন্য সেই আহ্বান-ধ্বনি ঘোষণা করিতেছি। আপনারা এখানে যতজন উপস্থিত, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের সৃষ্ট সন্তান। আপনাদের প্রতিজনের মুখশ্রীতে তাঁহারই শ্রী দর্শন করিয়া সকলকে প্রণাম করি।

শেষে ভাই প্রিয়নাথ বলেন, ভাই সকলে বল, "জয় মায়ের জয়, জয় নববিধানের জয়।" আমরা সকলে একই মার ছেলে। ঐ দেখছ, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করতে হলে সাহিত্য পড়তে হয়, ইতিহাস পড়তে হয়, অঙ্কশাস্ত্র পড়তে হয়, বিজ্ঞানশাস্ত্র পড়তে হয়, সব বিষয়ে শিক্ষালাভ না করলে পূর্ণ শিক্ষা হয় না; তেমনি সকল ধর্ম্ম সাধন ও শিক্ষা না করলে আমরা পূর্ণ মানুষ হতে পারি না। তাই এ নববিধান-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভর্ত্তি হয়েছি, এখানে সকল ধর্ম্মের শিক্ষার সমান আদর। আমরা যেন সর্ব্বধর্ম্ম শিক্ষা করে সেই এক মার সন্তান হতে পারি এবং মা যেমন আমাদের, আমরাও যেন তেমনি তাঁর হতে পারি।

এই দিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে চারটি আধুনিক শিক্ষিত ব্রাহ্ম যুবকের কথোপকথনরূপে একটি অতি সারগর্ভ সুচিন্তিত লেখা পাঠ করেন।

৪ঠা মাঘ, নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব হয়। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, মন্দিরে নীতিবিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাদিগকে লইয়া ডাক্তার সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভারসিটি ইন্‌সষ্টিটিউটে মহা সমারোহে পারিতোষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন এবং লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল এম্‌ দাশ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সভার নেতৃত্ব করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করেন। বালকবালিকাদিগের নৃত্য গীত অভিনয়াদি সুন্দর হইয়াছে।

৫ই মাঘ, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। নববিধান চির যৌবনের বিধান, বৃদ্ধত্ব এ বিধানে নাই; অতএব যাহাতে আমরা চির যৌবন লাভ করিয়া নববিধানের উপযুক্ত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা হয়। অপরাহ্ণে শান্তিকুটীরে নববিধানের যুবকদিগের উৎসব নূতন রকমে হয়। বর্ম্মার এডভোকেট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যুবকদিগকে প্রাণে বরণ করিয়া, তাঁহাদের মঙ্গলোদ্দেশে প্রাণের দু'চারিটী কথা লিখিয়া পাঠান। তাহা মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১লা ফেব্রুয়ারী, কলুটোলায় শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের একটী পুত্রের জন্মদিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনায় কার্য্য করেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীমান্‌ ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের পুত্র শ্রীমান্‌ কেশবচন্দ্রের শুভজন্ম দিন উপলক্ষে তাঁহার কল্যাণার্থ ভাই প্রিয়নাথ প্রাতঃকালীন উপাসনায় নবদেবালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করেন। মাতা সন্তানকে লইয়া উপাসনায় যোগ দেন।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, এণ্টনীবাগানে শ্রীমান্‌ দেবপ্রসাদ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, তিথি হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মদিনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নবদেবালয়ে প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই গোপালচন্দ্র সমযোগে উপাসনা করেন। রামকৃষ্ণের নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য ও প্রেমোন্মত্ততা অনুসরণ করিয়া যাহাতে শ্রীকেশবচন্দ্রের গৃহস্থবৈরাগ্যের জীবনলাভে আমরা নববিধানের পূর্ণ আদর্শ লাভ করিতে ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যায় বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও এই উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়াছেন।

আনন্দের সংবাদ—আমরা অতীব আনন্দের সহিত, কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে প্রেমময় শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, পূর্ণ তিন বৎসর পরে আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা দেশসেবক কর্ম্মবীর শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াছি। ভগবান্ তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন, এখন মুক্তপ্রাণে নববিধানের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিয়া তিনি ধন্য হউন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময়, চট্টগ্রামে, স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের অশীতিপর বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী অতি শান্তভাবে, অল্প সময়ের মধ্যে, "উনি (পতিদেবতা) নিতে এসেছেন" বলিয়া স্বর্গারোহণ করেন এবং পতিদেবতা ও প্রাণপ্রিয়জনদের সঙ্গে অমরলোকে মিলিত হন। শান্তিদায়িনী জননী অমর আত্মার কল্যাণ করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা ফেব্রুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। অদ্য স্বর্গীয় শশিভূষণ মল্লিকের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা দেবীর ও স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর কন্যা স্বর্গীয়া কুসুমকুমারীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ৬৩নং ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঙার উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গগত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সাম্বৎসরিক দিন নবদেবালয়ে উপাসনা হইয়া পরে সমাধিতে প্রার্থনাদি হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, সিঁতিনিবাসী, স্বর্গীয় কালীপদ দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র দাস প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, স্বর্গগত ভাই বিহারীলাল সেনের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে, নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। এই দিন তাঁহার পুত্র ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের কলিকাতাস্থ ২৫০নং পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া সমযোগে উপাসনাদি করেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাসের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে, নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। পরলোকগত ভাইয়ের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ সমাধিতলে পরিবারবর্গকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ সংক্ষেপে উপাসনা করেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, আলিপুরে, ২২নং নিউরোডে, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, ভগ্নীসমিতিতে ৫৲ এবং দুইটী অনাথ অসহায় বালককে ৫৲, কন্যা শ্রীমতী রমা যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ২০৲ এবং কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা পুণ্যাশ্রমে ৫৲ এবং ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবাড়ীতে, স্বর্গীয় রাখালদাস চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পত্নী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, প্রাতে ৮৫।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে, ডাঃ বিবেকমোহন সেনের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ এবং সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায়, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় এস্, কে, লাহিড়ীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া সুরমা দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে স্বামী শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ দত্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই মহেন্দ্রনাথের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, এণ্টনীবাগানে শ্রীমান্ দেবপ্রসাদের মাতামহের সাম্বৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, স্বর্গগত ভাই অমৃতলালের কনিষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের স্বর্গদিন উপলক্ষে ৫।১১ দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট ভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভগ্নী ভক্তিমতী ও চিত্তবিনোদিনী বিশেষ প্রার্থনা করেন। নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১৲ ও ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডস্থ গৃহে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্বশুর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচের পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী, প্রাতে ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গগত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে কথকতা হয়। সন্ধ্যায় ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন কিছু পাঠ করেন, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

অদ্য সন্ধ্যায়, বেলেঘাটায়, ৫৫নং ক্যানাল ঈষ্ট রোডে, বার্ড কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট ষ্টোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের গৃহে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া উমা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে স্বামী পত্নীর পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ১৫৲ ও ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ডে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ডি, এল রায় ষ্ট্রীটে ভ্রাতা অন্নদাচরণ সেনের গৃহে, তাঁর আত্মীয় স্বর্গীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের জামাতা এককড়ি সিংহ রায়ের ২য় সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত হরকুমার বসু পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রামকৃষ্ণপুর নিত্যধামে, ভ্রাতা লোকনাথ মল্লিকের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ মধ্যাহ্নে উপাসনা করেন।

কোচবিহার-সংবাদ—

কেশবাশ্রমে, গত ১লা জানুয়ারী, নববর্ষ উপলক্ষে, গত ৮ই জানুয়ারী, ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে কুচবিহারে তিনদিন ব্যাপী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

শান্তিপুর সংবাদ—গত ১৯শে নবেম্বর, ব্রহ্মানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, রামনগর বালিকা বিদ্যালয়ে ৯ই ডিসেম্বর সাধু অঘোরনাথের এবং ৮ই জানুয়ারী, ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণ দিনে স্মৃতিসভা হয়।

ভ্রম-সংশোধন—গতবারের "ধর্ম্মতত্ত্বে" "শ্রীকেশবাত্মজ নির্ম্মলচন্দ্র স্বর্গে" প্রবন্ধে যে লেখা হইয়াছে, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি পরে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা ভুল। পরে নয়, প্রথমেই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ ভুলটার জন্য আমরা দুঃখিত।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো মূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ৫ম সংখ্যা।	১লা চৈত্র, শনিবার, ১৩৪২ সাল, ১৮৫৭ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 14th. March, 1936.	অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা পবিত্রাত্মারূপিণী, তোমার নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান। এ বিধানে তোমার পবিত্রাত্মার অনুসরণ বিনা আমাদের গতি নাই। তাই নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "এ বিধানে হাজার ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া চীৎকার কর, কিংবা সাধুদের জুতা লইয়া টানাটানি কর, কিছুতেই হইবে না। পবিত্রাত্মা না আসিলে হইবে না।" মা, তিনি যে আরও প্রার্থনা করিলেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই পারিলেন না, একজন পারিবেন; পবিত্রাত্মানামধারী, আলোকময়, উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়রূপধারী, তুমি যদি এস, তবেই পরিত্রাণ হবে"। তাই আমরাও ডাকি, হে পবিত্রাত্মারূপিণী, তুমিই আমাদের নববিধানের পরিত্রাণ দাও। আমরা এখন সম্যক বুঝিতে পারিতেছিনা, এ বিধান কি বিধান? ইহা বুদ্ধি বিচারের দ্বারা বুঝিবার নয়, কিংবা পুরুষকার বা সাধ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ এ বিধানে হইবার নয়। তুমিই স্বয়ং মা সরস্বতীরূপে অন্তরে বিবেকবাণী ঝঙ্কার করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া না দিলে, কিম্বা জীবনে চরিত্রে অঙ্কিত না করিলে, আমরা ইহা ধারণাও করিতে পারি না, কিংবা এ বিধান সাধনও করিতে পারি না। এ বিধান আত্মার বিধান, তাই তুমি পবিত্র আত্মা হইয়া মানবাত্মাকে অধিকার করিয়া, স্বয়ং তোমার মনের মতন তাহাকে গঠিত করিবে; অন্যথা কেহই এ বিধানে তোমার মানুষ হইতে পারে না। তুমি যাঁহাকে এই বিধান-প্রবর্ত্তকরূপে প্রেরণ করিয়াছ, তাঁহাকে তুমিই স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠিত করিয়াছ। আমাদিগকেও তুমিই এই বিধানে আনিয়াছ এবং সেই অখণ্ড মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গাঁথিয়াছ। আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাহা যদি স্বীকার করি এবং আমাদের হাতে আমাদের ধর্ম্মজীবনের ভার না রাখিয়া, তোমারি চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে আমিত্ব বলি দান দিয়া যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলেই আমরা তোমার পবিত্রাত্মার প্রভাবে নববিধান-জীবনে গঠিত হইতে পারিব। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই বিশ্বাস এবং সেই আত্মসমর্পণ শিক্ষা দান কর।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

—০—

শ্রীকেশবচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসবের প্রস্তুতি

আমাদের প্রিয়তম আচার্য্যদেবের শুভ জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী আসিতেছে। এই মহা বৈজয়ন্তী আমরা কি করিয়া সম্পাদন করিব তাহার জন্য প্রস্তুত হই।

বাস্তবিক কেশবচন্দ্র কি ছিলেন, কে ছিলেন, তাহা যেন আমাদের সম্যক্ ধারণা এখনও হয় নাই। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কেবল বাহ্য প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানে কি হইবে?

তাই তিনি বলিলেন, "কে আমি, কি আমি, ইহাদিগকে বুঝাইয়া দাও। বুদ্ধির শুষ্ক ভূঁসতে আমাকে রেখো না। বুদ্ধি খাঁড়া দিয়া আমায় কেটো না: মিছামিছি একটা কেশব খাড়া করো না। জল মাছের আধার, জল শুদ্ধ আদত মাছ নাও। দাও, মা, স্থান, কোথায় আমি থাকিব। ভক্তের হৃদয়-সরোবরে এ মনী খেলা করিবে। বৃহৎ ভারতসাগরে, এসিয়া সাগরে, সমস্ত দেশের, সমস্ত ভাইয়ের, সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে, এই কর।" এই সকল উক্তির মর্ম্ম আমরা কি হৃদয়ঙ্গম করিব না?

তিনি বলিয়াছেন, "মা, বুঝাইয়া দাও, আমি কি।" তাই মার কাছেই আমরা বুঝিয়া লই, তিনি কে ছিলেন, কি ছিলেন। তাঁহাকে বুদ্ধি বিচার দ্বারা বুঝিতে গেলে বুঝিতে পারিব না। জলের মাছ অর্থাৎ জীবনের জীবন ঈশ্বরের বক্ষস্থ জীবন্ত কেশবজীবনকে জীবন-সরোবরে রাখিতে হইবে।

এই যে আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, যেন তিনি সাধু মহাপুরুষদিগের স্থানীয়; এই মনে করিয়া শাস্ত্রের মত তাঁহার প্রার্থনা পাঠ করি, ইহা ত তিনি চান নাই। তিনি চাহিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার সহিত সমযোগী সমভক্ত সমবিশ্বাসী হইব; তাই তিনি সাধুশ্রেণীস্থ বলিয়া আত্মপরিচয় না দিয়া, আমাদের ন্যায় "পাপীর সর্দ্দার" হইতে চাহিলেন। ইহার তাৎপর্য্যও আমাদের ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

তিনি ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে টাউন হলে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে একটি উপমা দেন। ত্রিত্ব একটি ত্রিভুজের রেখার ন্যায়। তাহার ঊর্দ্ধে ঈশ্বর। তাঁহা হইতে বাম ভুজ দিয়া সাধু মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ পৃথিবীর নিম্ন ভুজে, আবার পবিত্রাত্মা অন্য ভুজ দিয়া পৃথিবীর পাপী মানবকে উত্থাপিত করিয়া সেই ঊর্দ্ধলোকস্থ ঈশ্বরের সহিত পুনঃমিলিত করিতেছেন। তাই সাধু ভক্তগণ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ, আর কেশব পাপী মানবের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবী হইতে পুনরুত্থিত। এই জন্যই তিনি বলিলেন, "নারকী উদ্ধার হয়, ইহা যদি দেখিতে চাও, আমাকে নাও। আমার জীবন দেখ, নিরাশেরও আশা হইবে। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের আশাপ্রদ।" এই পরিবর্ত্তিত জীবনই কেশবচন্দ্র এবং এখানেই সাধু মহাপুরুষগণ হইতে তাঁহার পার্থক্য।

তিনি আত্মগোপন করিয়া আরো বলিয়াছিলেন, এক একটি সাধু এক এক বৃক্ষের ফুল, নববিধান সেই ফুলের তোড়া। এই তোড়া বাঁধার সূত্র যাহা, তাই আমি। শ্রীঈশার ফুট নোট আমি। ফুট নোট যেমন শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দেয়, ঈশা-জীবনের ব্যাখ্যান তেমনি কেশবজীবন।

দুইখানি ইস্টকখণ্ড গাঁথিতে হইলে যেমন মাঝে মসলা বা সিমেণ্ট লাগে, তেমনি ভাই ভাইয়ের একত্বের প্রেমের বাঁধন শ্রীকেশব। আরো একটা নূতন উপমা দিতে পারা যায়; এখন যেমন আমাদের শারীরিক কোন প্রকার রোগ হইলে সেই রোগের বীজাণু হইতে টিকা তৈয়ারী করিয়া সূচাগ্রে শরীরে প্রবেশ করাইয়া রোগ-নিবারণের ব্যবস্থা হয়, বিধাতাও যেন পাপপ্রবণ মানব-জীবন হইতে পাপ-রোগ দূর করিয়া পরিবর্ত্তিত জীবন সঞ্চার করিবার জন্য কেশবজীবন তৈয়ারী করিয়াছেন।

নববিধান জীবনের বিধান। রাসায়নিক বিজ্ঞানের ন্যায় নববিধানবিজ্ঞানে সকল ভক্তজীবনের সার নির্য্যাস লইয়া একখানি নববিধানমূর্ত্তিমান বা সর্ব্বধর্ম্মজীবন-গ্রহণের উপাদান রূপে বিধাতা এই জীবন প্রস্তুত করিয়াছেন।

তাই বলি, কেশব কেবল কেশব নন, তিনি একখানি জীবন, একখানি চরিত্র। সেই চরিত্র পরিধান করিয়া আমরা নববিধান-জীবনের নববিধান-চরিত্রে চরিত্রবান্ চরিত্রবতী হইব। এইভাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কেশবজীবন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে জীবনে জীবনে মূর্ত্ত করিতে পারিব।

আমার ব্যক্তিগত জীবন যেমন, দলগত জীবনও এই কেশবজীবন। শ্রীকেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ

সাক্ষ্যদানে যেমন বলিয়াছিলেন, "কেশবের কাছে আসিলে আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়", অর্থাৎ মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়, তেমনি বলেন, "কেশব একটা ষ্টীমবোট, নিজেও ঝক ঝক করে সংসারের উজান স্রোতে চলে যাচ্ছেন, আর কত গাদা বোটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন; আমি একটা কলার মান্দাস, কেউ আমার উপর চড়লে আমি টুপ করে ডুবে যাই।"

তিনি আরও বলেন, "কেশব ত বটগাছ, কত পাখ্ পক্ষী তাঁহার ডালপালায় বাসা করে আছে। আর কত জীব জন্তু তাঁর ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আরাম কচ্ছে। আর আমি একটা রাঁড়া তালগাছ কোন রকম করে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছি।"

একবার কেশবচন্দ্রের দল উত্তর পাড়ায় সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, আর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন; তিনি সেখান থেকে সংকীর্ত্তন শুনিতে পাইয়া বলিলেন, এ কেশবের দলের সংকীর্ত্তন। কেশব সেনের দল ভিন্ন এমন সংকীর্ত্তন আর কি কেউ কর্ত্তে পারে? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যাইলে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেশব সর্ব্বদাই সদল অখণ্ড। রামকৃষ্ণদেব একা একা বা নির্জ্জন সাধনেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সাধন "কোণে, মনে, বনে", কিন্তু কেশব সদাই দলগত সাধনে নিরত। তাই তিনিই বলিলেন, "সংবাদপত্রের সম্পাদকের ন্যায় 'আমি' সর্ব্বদাই 'আমরা'" "যে সদল অখণ্ড, তাকে কি কখনও বিদল করা যায়?" "এই দৃশ্যমান আমির পশ্চাতে অদৃশ্যমান 'আমরা' রহিয়াছে।"

এই সকল উক্তির অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করি, বুঝিব, কেশব মানে কেশবদল। কেশব কখনও একা নন, তাই বলিলেন, "এখানে আমি আমার থাকতে পারে না।" "স্বতন্ত্রতা ভিন্নতা আমি আমি যেখানে, সেখানে আমার বাপও থাকেন না, সে আমি ভূতের রাজ্যে আমিও থাকিতে চাই না।" কেন না, আমি আমি যেখানে, অহং সেখানে।

বাস্তবিক নববিধান পবিত্র আত্মার বিধান, ইহা আত্মায় আত্মায় মহামিলনের বিধান। আকাশের বাতাস যেমন অখণ্ড, এই আত্মার বিধানে সমস্ত আত্মলোকও অখণ্ড, ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে একা একা নির্জ্জন সাধনেরই প্রাধান্য ছিল। পবিত্র আত্মার নববিধানে দলগত সাধনই প্রবর্ত্তিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যযুগে গান উঠিয়াছিল, "একাকী যাইলে পথে নাই পরিত্রাণ রে"; নববিধানে তাহারই পূর্ণতা সংসাধিত হইয়াছে।

তাই বেদান্তের প্রার্থনা, "অসতো মা সদ্গময়" পরিবর্ত্তিত হইয়া হইল, "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও।" আমরা নির্জ্জনে বা সজনে সাধন করি না কেন, সর্ব্বদাই এই প্রার্থনাই করি। আমি "আমরা" হইয়া প্রার্থনা করি।

হারমনিয়াম বাজনা যেমন একটা রিডে বাজে না, সাতটা সুরের সমবায়ে ঝঙ্কারিত হয়; সংকীর্ত্তন যেমন দল ভিন্ন হয় না; ব্যাণ্ড বাজনা বাজাইতেও যেমন দল চাই চাই; তেমনি নববিধান-সাধনও দল ও পরিবারের সহযোগ ও সমযোগ বিনা হয় না।

যৌথ কারবারে যেমন কারবারের পক্ষ হইয়া এক এক জন কারবারের নামে চিঠি স্বাক্ষর করে, তেমনি যদি আমরা প্রত্যেকে "সদল অখণ্ড" বা "আমরা" হইতে পারি, তবেই আমরা নববিধানের লোক, নতুবা নয়। কেশবচন্দ্র তাই কখনই স্বতন্ত্র বা একা নন; "ভাই আমি এক", সকলে মিলে একজন, ইহাই কেশবচন্দ্র।

এইরূপে সবে মিলে একজন হইতে হইলে সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব-বিসর্জ্জিত হইতে হয়। শ্রীকেশব এই জন্যই প্রথম হইতে তাঁর আমিকে উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "কোথায় আমার আমি, সে আমি আর ফিরিবে না।" এইরূপে আমিত্ববিহীন হইয়াই বলিলেন, "সকল মানব আমাতে, আমি সকল মানবেতে" আমাদিগকেও একই দেহের অঙ্গ বলিয়া পরস্পরকে স্বীকার ও গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং আপনিও করিলেন।

"সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের পদানত হইয়া মিলিতে হইবে," ইহাই শিখাইলেন। একমত, এক ইচ্ছা, এক অভিন্ন-হৃদয় হইয়া যাহারা খায় হরিতে, বসে হরিতে, হরিতে পাগল হইয়াছে, এমন একটী দল তিনি চাহিলেন। সত্য সত্য এমন দল বিনা নববিধান হবে না, যাহা হইয়াছে তাহা তাঁহার মনের মত হয় নাই; এমন কি, তাঁর সঙ্গী দল সম্বন্ধেও বলিলেন, "ইহারা ব্রাহ্মসমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারিল, নববিধানের আরম্ভে আর পারিল না।"

এই সকল কথা যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া হৃদয়-

শ্রম না করি, আমরা কি করিয়া নববিধানের লোক বা কেশবদল বলিয়া পরিচয় দিব।

এই মানবজীবন চারিটী উপাদানে গঠিত—দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মা। আমাদের মনে হয়, জড় দেহ সম্বন্ধে আমাদের ভিন্নতা থাকিতে পারে। মনের চিন্তা বা মতেরও ভিন্নতা থাকিতে পারে; তাহা সত্ত্বেও যদি হৃদয়ের প্রেমে আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি এবং আত্মায় আত্মায় যোগ সমাধান করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা পবিত্রাত্মার প্রভাবে আধ্যাত্মিক মিলন সংস্থাপন করিতে পারিব। তদ্‌ভিন্ন নববিধানের দল হইব না এবং কেশবকেও যথার্থ গ্রহণ করা হইবে না।

কেশবই সেই মিলন, যাহাতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ চলিয়া যাইবে, ভারত ইংলণ্ডের ভেদাভেদ ঘুচিবে, পূর্ব্ব পশ্চিমে এবং সমগ্র জগতের মধ্যে মহা মিলন সংসাধিত হইবে। শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের শত-বার্ষিকী বৈজয়ন্তী উপলক্ষে যাহাতে ইহা হয়, তাহারই জন্য আমরা যেন প্রস্তুত হইতে পারি। সেই সদল অখণ্ড বিশ্বমানবকে জীবনে জীবনে এবং সদলে মূর্ত্ত করিতে পারিলেই প্রকৃত তাঁর জন্ম-বৈজয়ন্তী সংসাধিত হইবে।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

পবিত্রাত্মার সাধন।

রাসায়নিক বিজ্ঞান যেমন সকল ফল ফুলের নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়া চির রক্ষার উপায় করিয়াছে, পবিত্র আত্মা নববিধানও তেমনি সকল ভক্ত মহাজনদিগের জীবনের আদর্শ এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সার সত্য, পবিত্র আত্মার প্রভাবে উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং তাহা গ্রহণে বা সেবনে নব নব জীবন সঞ্চারের উপায়রূপে চির রক্ষা করিয়াছেন। তাই এ বিধান কোন সত্য বা কোন সাধু-জীবন উপেক্ষিত বা বিনষ্ট হইতে দেন নাই। ধ্বংসশীল মূর্ত্তিতে বা মানসিক মতেতে নিবদ্ধ রাখিলেই, সে সমুদায় সত্য বা জীবন শুষ্ক বা মৃত হইয়া থাকে। তাই জলে যেমন মাছ থাকিলে মৎস্য জীবিত থাকে, কিংবা আকাশে যেমন পক্ষী উড়িলে বাঁচিয়া থাকে, তেমনি আমাদের হৃদয়-সরোবরে কিংবা আত্মিক চিদাকাশে সাধু জীবন এবং সত্যধর্ম্মবিধান রাখিলেই তাহারা চিরজীবিত এবং নব নব জীবনপ্রদ হইয়া থাকে। নববিধান ইহাই আমাদিগকে সাধন করান।

—

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকেশবচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মের শতবার্ষিকী সাধিত হইল। শ্রীরাম-কৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিকী শ্রীকেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে কেন হইল? ইতিহাসে পবিত্রাত্মার লীলার ইহা এক নিদর্শন মনে হয়। শ্রীকেশবচন্দ্র যোগ-ভক্তি-শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন, নিবৃত্তি-যোগসাধন না হইলে প্রবৃত্তি-যোগ-সাধনের অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণদেবের সাধন কেবল নিবৃত্তি। তিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, সংসারত্যাগী, তাঁর বৈরাগী ছিলেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ সেই জন্য যদি প্রথমে করিতে পারি, তবেই শ্রীকেশবচন্দ্র সংসার-বৈরাগ্য বা নিবৃত্তির উপর প্রবৃত্তি-যোগের যে আদর্শ দেখাইলেন, তাহা লাভ করিতে পারিব। এবং তাহা না করিলে ত আমরা নববিধান-সাধনে সক্ষম হইব না। শ্রীকেশবচন্দ্র ঈশ্বর-প্রেরণায় প্রথমে নিবৃত্তি সাধন করিয়া, পরে প্রবৃত্তি যোগে সংসার-যোগী হইয়াছেন। তিনি কেবল নিবৃত্তিকেই পূর্ণ যোগ মনে করেন নাই। কেশবের সংস্পর্শেই রামকৃষ্ণের যেমন মৃন্ময়ী কালী চিন্ময়ী হলেন, রামকৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, তেমনি আমাদের জড়স্পৃহা বা বিষয়াসক্তি ত্যাগ না হইলে যথার্থ পবিত্রাত্মারূপিণী চিন্ময়ী মার পূজারও অধিকার হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল হিন্দু ভাবের উদারতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় জীবনে সাধন করিয়া তাহা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান নববিধান বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকেশবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি মাখমের মত গায়ে লেগে গেলে।" আমরা কি তাঁর আত্মায় তেমনি বিজড়িত হব না?

—

সামাজিক উপাসনায় আরাধনা।

একটী ইন্‌জেক্‌সন দিলে যেমন মরাটা বেঁচে উঠে, তেমনি সত্যম্ মন্ত্রে বেঁচে উঠলাম। জড় গ্রহনক্ষত্রগুলো কেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদেরও তুমি চিন্ময় করে নেবার জন্য আত্মপ্রকাশ করে রয়েছ। তোমাকে কে বলে দেখা যায় না? বাহিরের ও ভিতরের সঙ্গে মিলিয়ে চিন্ময় করে দিচ্ছ। আছ তুমি অন্তরে ও বাহিরে। আমি তোমার মুখের দিকে তাকাই না বলে তোমায় দেখতে পাই না। তুমি অনিমেষ-নয়নে তাকিয়ে রয়েছ। তাই আমি তাকাতে পারি না, লজ্জা পাই। দেখি, কত বড় তুমি, জানিনে, চিনিনে; তথাপি প্রাণ তোমার দিকে ধায়। ওদিকে যেমন অনন্ত, উর্দ্ধে যেমন অনন্ত, তেমনি এদিকেও তুমি অনন্ত! আমাকে তুমি আবেষ্টন করে রয়েছ, যেন পাছে তোমার কোল থেকে পড়ে না যাই। তোমার প্রাণটা উচ্ছ্বসিত হয়ে গেছে। আমি যে মহাপাপী। তোমার কোলে বসতে বসতে পড়ে যাই। বুঝেছি, তুমি আমাকে জয় করবেই। এই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ। তোমার একাধিপত্য

স্থাপন করবার জন্য তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে এসেছ। তুমি স্বর্গরাজ্য অধিকার করে বসেছ, কিন্তু তাতেও হল না। এবার সব রাজ্য তুমি এক করে নেবে। দুটো রাজ্য আর থাকবে না। সব তোমার হাতে। আর কি আমাদের হাতে ধর্ম্ম আছে? তুমি পাপীদিগকে জোর করে পরিবর্ত্তিত করে নেবে। এ যে পবিত্রাত্মার রাজ্য, নীতির রাজ্য। আমরা সাধ্য সাধনা করে যাহা পারিলাম না, তাহা মুহূর্ত্তে করে নিলে। সব চুরমার করে দিলে। এবারে আর কে কাঁদবে বল? তোমার আনন্দে ভরে দিবার জন্য আনন্দময়ী মা হয়ে এসেছ, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার আনন্দের দলও এসেছেন।

ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র সেন।

এই বিহার ভূমিতে ভাগীরথীর অববাহিকায় বসিয়া, ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের বিয়োগবার্ত্তা-শ্রবণে আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে শোকপ্রবাহ উত্থিত হইয়াছিল, সেই প্রবাহের সহিত আবার কোন্ স্রোত মিশিয়া গেল, আজ তাহা বলিতে সত্য সত্য আমাদের কণ্ঠরোধ হইতেছে। আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয়তম ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আর এ পৃথিবীতে নাই। এই তো সেদিন পার্ব্বত্য রাঁচি নগরে সুবর্ণ-রেখার বেলাভূমিতে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া, সেই নববিধানের নবীনা মীরার শেষ নিঃশ্বাস পড়িতে দেখিলাম! ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র কি যে ব্যস্ততা ও কাতরতার সঙ্গে সেই সমাহিত মীরামূর্ত্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সেই মীরা-ভস্ম কলিকাতায় বহন করিয়া লইয়া গেলেন, আজও তাঁহার সেই ব্যস্ততা ও কাতরতার ভাব হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সেই সময়ে তাঁহার বিশ্বাসপূর্ণ যে প্রেম ভক্তির ছবি দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়।

ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রকে যখন প্রথম কলিকাতার কমলকুটীরে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বয়স ১০।১১ বৎসরের অধিক ছিল না। তাহার পর যখন ১৯০৮ সালে আমরা মহারাণী সুনীতি দেবীর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সপরিবারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুচবিহার সুনীতি কলেজের ভার গ্রহণ করিলাম, তখন ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র কুচবিহার ষ্টেটের ভারার্পিত কার্য্য যেমন উৎসাহের সঙ্গে সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি তেমনি অদম্য ও অমোঘ উৎসাহের সঙ্গে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ভাগনা সুনীতি দেবী ও সাবিত্রী দেবী, কুমার সাহেব গজেন্দ্রনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া পরমোৎসাহে নববিধানের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা আরতির নামকরণ উপলক্ষে, আমাকেই রাজপ্রাসাদে উপাসনা কুটীরে উপাসনা করিতে আহ্বান করেন। তারপর যখন মহারাণী দেবী সুনীতি, মহারাণী দেবী সুচারু, মহারাজা রামচন্দ্রভঞ্জ দেও বাহাদুর এবং ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র ও ভগিনী মৃণালিনী দেবী সকলে সমবেত ভাবে দার্জ্জিলিং শৈলনিবাসে বাস করিতেছিলেন, তখন সেই শৈলনিবাসে ভাদ্রোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া আমাকেই উপাসনার্থ আহ্বান করেন। এই সময়ে এই অনুষ্ঠানে ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের যে অনন্ত উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা প্রাণে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

নববিধানের জন্য ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের একপ্রাণতা ভুলিবার নহে। তিনি সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ডে সরকারী কার্য্যবিশেষে ব্যাপৃত থাকিয়াও, ক্রমাগত আমাকে নববিধান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চিঠি পত্র লিখিয়াছেন।

তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মভাব ছিল এবং নববিধানের প্রতি ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি তিনি পোষণ করিতেন। আজ আমরা আমাদের এই প্রিয়তম ভক্তিমান নববিধানবিশ্বাসী ভ্রাতাকে অকালে হারাইলাম! তিনি এখন সেই অদৃশ্য নববিধানমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মানন্দদলে নিত্যোৎসবে মিলিত। বিধান-জননীর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তিনি সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা, ভাই বোন, আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

ভক্ত মহিমচন্দ্র।

নববিধানের নীলাকাশ হইতে আর একটী আশার চন্দ্র অস্তমিত হইলেন। ভক্ত প্রচারক মহিমচন্দ্র আর এ পৃথিবীতে নাই। ঢাকানিবাসী নববিধান-প্রচারক জ্যেষ্ঠ মহিমচন্দ্রের সঙ্গে কুচবিহারে অবস্থান কালে এক বিশেষ সন্নিকট সম্বন্ধ ও আধ্যাত্মিক যোগে মিলিত হইয়াছিলাম। এই সময়ে তিনি কুচবিহারে নববিধান-প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মজীবন আমাদের নিকট একটী শিক্ষার বস্তু হইয়াছিল। নববিধান-সাধনে তাঁহার ভিতরে বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও প্রেম পুণ্যের ভাব বিশেষ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জীবনের নিষ্ঠা, শিক্ষা, দীক্ষা ও তিতিক্ষার ভাব কেবল আমাদের নয়, সমগ্র কুচবিহারের নিকট একটা আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ্যে মহা অগ্নি-পরীক্ষার ভিতরে ভগবানের হুকুমের নিকট কিরূপে আত্মদান করিতে হয়, জ্যেষ্ঠ মহিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যুবক বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ ও তাহার পর একে একে তাঁহার দুইটী সন্তানের বিয়োগে তিনি যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরতা দেখাইয়াছেন, সে দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তিনি আমার জামাতা বিনয়কুমারের মৃত্যুতে যে ভাবে ও যে ভাষায় সেদিন পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও চিত্রের মত হৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে। আজ আমরা তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদামণিকে হৃদয়ের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

পুণ্য-স্মৃতি।

(১৪ই মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্বর্গগত রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাশ ও স্বর্গগতা সাধিকা ইচ্ছাময়ী দেবীর পুণ্যস্মৃতিতে তৃতীয় পুত্র দীনেশরঞ্জন দাশের প্রার্থনা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আশাকুটীরের জননী ইচ্ছাময়ী সত্যই মাতৃরূপা, বহু সন্তানের জননী ছিলেন। নিরাড়ম্বর, নীরব গৃহিণী নিজ কাজ অতি সংগোপনে সাধন করিতেন। প্রতিদিন প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে প্রার্থনা সংগীত তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। ভগবানের নামগ্রহণ না করিয়া ইচ্ছাময়ী কখনও দিবসের কাজ আরম্ভ করিতেন না। যদি কখনও এমন হইত যে, প্রত্যুষেই কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবার থাকিত, তাহা হইলে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, আগে উপাসনা সমাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজে যোগদান করিতেন। আশাকুটীরে প্রায় উৎসব লাগিয়াই থাকিত। ইচ্ছাময়ী সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া রাখিতেন। উৎসবের সময় মহিলাদিগের উৎসব তখনকার দিনে আশাকুটীরে কয়েক বার সম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনা ও সমবেত সকলের আহারের ব্যবস্থা ইচ্ছাময়ীর তত্ত্বাবধানে হইত। তিনি নিজ হস্তে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রন্ধনকার্য্য সারিয়া, আবার উপাসনার জন্য ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকিতেন। কোনও দিন বাহিরের কোনও কাজের জন্য তাঁহাকে উপাসনায় যোগ দিতে বিলম্ব করিতে দেখি নাই। যখন উপাসনার স্থানে আসিতেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্বপ্রভা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। দৃষ্টিতে এক সুপবিত্র কোমল গভীর আভা। সরল ঋজু দীর্ঘ দেহ গৈরিক বস্ত্রে আবৃত হইয়া এক অপরূপ সৌম্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। সংযত ধীর তাঁহার গতি ও বাক্য ছিল। সাধক মহিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাশ ইচ্ছাময়ীর প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। ইচ্ছাময়ীর সঙ্গে থাকিয়া কুমুদিনী গৃহকর্ম্ম ও সাধন ভজন শিক্ষালাভ করিতেন। কুমুদিনীই তখন আশা কুটীরের বড় বধূ ছিলেন। চট্টগ্রামে মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠা ইচ্ছাময়ীর আকুল ইচ্ছার পরিণতি। ভক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা আশালতা, গিরীশচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী, কালীচন্দ্রের স্ত্রী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয়ের স্ত্রী প্রভৃতি এবং আরও অনেক মহিলা এই সমিতির উদ্যোক্তা ও সভ্য ছিলেন। ইচ্ছাময়ীর নিজরচিত সঙ্গীতগুলি "আশা-পুষ্প" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইচ্ছাময়ীর অতি বালিকাবয়সে বিবাহ হয়। প্রায় নিরক্ষরাই ছিলেন। কিন্তু অতি গোপনে নিজ চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শেখেন। পরে তাঁহার স্বাধীন জীবনে অধ্যয়ন ও লেখার স্পৃহা পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। সম্পদ ও বৈভবের মধ্যে বাস করিয়া ইচ্ছাময়ী নিজে বৈরাগী ছিলেন। মাংস কখনও আহার করিতেন না। মাছও ভালবাসিতেন না, কেবল মাত্র আত্মীয় স্বজনের নানাপ্রকার অনুযোগে বাধ্য হইয়া সামান্য দুই এক রকমের মাছ খাইতেন। কৈলাশচন্দ্রের তিরোধানের পর পারিবারিক অবস্থা যখন অসচ্ছল হইয়া পড়ে, তখন ইচ্ছাময়ী কর্ত্তা বোধে সন্তানগণকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। অতি সুখ ঐশ্বর্য্য হইতে একেবারে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় আসিয়া পড়া মানুষের জীবনের একটি বিশেষ পরীক্ষার অবস্থা। কিন্তু ইচ্ছাময়ীকে সেজন্য কখনও কাতর বা চিন্তামগ্ন দেখি নাই। আমরা তিন ভাই ও তিন ভগ্নী তখন স্কুল কলেজে পড়ি। আমরা কোনও দিনের তরে বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের অভাব কি, বা দুঃখ কিসের। এমনই সংগোপনে তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন যে, আমাদের কখনও কোনও জিনিষের জন্য ভাবিতে হয় নাই। মেয়েরা যখন বড় হইলেন, আত্মীয়েরা বা পরিবারের শুভানুধ্যায়ীরা উহাদের বিবাহের চেষ্টা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাময়ীকে কখনও কখনও তিরস্কারও করিয়াছেন। ইচ্ছাময়ীকে বলিতে শুনিয়াছি, যিনি সকল ব্যবস্থার ভার লইয়াছেন, তিনিই মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থাও করিবেন। হইলও তাহাই। একে একে তিন কন্যারই ঈশ্বরানুগ্রহে বিশ্বাসী পরিবারে বিবাহ হইল। পরে মেজ পুত্রের বিবাহ দিয়া দেবী ইচ্ছাময়ী স্বর্গারোহণ করিলেন।

কলিকাতায় বাসকালে উপাসনা, কীর্ত্তন, কথকতা বা ঐরূপ কোনও ধর্মানুষ্ঠানে ইচ্ছাময়ী যেমন করিয়া পারেন, যোগ দিতে চেষ্টা করিতেন। কলিকাতাতে যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে আসিতেন, তাঁহারা ইচ্ছাময়ীর সাধু জীবনের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

আমরা এই পিতামাতার বংশধর, তাঁহাদেরই অংশ হিসাবে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের বিশ্বাস ও নির্ভরের পরম সম্পদ তাঁহারা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; আমরা যত তাঁহাদের জীবনের কথা স্মরণ করিব, আলোচনা করিব, ততই আমরা উপকৃত হইব। কৈলাশচন্দ্র বৈরাগী ছিলেন, নতুবা তিনি অর্থ সম্পদ বিত্ত অনেক কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তা না রাখিয়া আমাদের জন্য যে জীবনের সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পরম সম্বল হোক। আমরা তাঁহাদের ও অন্যান্য মহাত্মাদের জীবনের যাহা কিছু চিরস্থায়ী সম্পদ, তাহারই বলা কথা যদি সাধন করি, তবেই আমরা চরিতার্থতা ও আনন্দলাভ করিব। পুণ্যদায়িনী জননী আমাদের শক্তি ও নিষ্ঠা দান করুন, আমরা মৃত্যুর ভিতর দিয়া নবজীবনের সঞ্চার উপলব্ধি করি, আমরা দয়াময়ী জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অধিকারী অধিকারিণী হই, তাঁহাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে জীবনপথে চলিতে চলিতে জীবন হইতে নবজীবনে উপনীত হই।

বিশ্বাস ভক্তির সহিত কাতরহৃদয়ে, দয়াময়ী জননী, তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি, তুমি আমাদের সহায় হও, আমাদের আশা পূর্ণ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

ব্রহ্মদাস মহিমচন্দ্র সেন।

(শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে পিতৃদেব পোগোজ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ঢাকার উকীল বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ (সম্প্রতি পরলোক-প্রাপ্ত) তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, পিতৃদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সেই সময় নলগোলায় বাসা ছিল। সেখানে দুইজন কলেজের ছাত্র ছিলেন—বাবু আনন্দচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী। ইঁহারা প্রতি রবিবার সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপাসনাতে যোগদান করিতেন। ইঁহাদের সঙ্গে পিতৃদেবও ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে পটুয়াটুলীতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। আর্ম্মানিটোলাতে স্বর্গীয় ডেপুটী কালেক্টার ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের দ্বিতল গৃহে সাপ্তাহিক সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইত। ইহার কিছুদিন পরে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গবাবুপ্রমুখ কয়েকজন জিন্দাবাহারের গলিতে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া লইলেন, পিতৃদেবও তাঁহাদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে গিয়া স্থিতি করিতে লাগিলেন। যতদিন তাঁহারা এ বাড়ীতে ছিলেন, সাপ্তাহিক সঙ্গত-সভার অধিবেশন এইখানেই হইত। সঙ্গত-সভার যে সকল সভ্যের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয়, ক্রমে বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের মধ্যে ২।১জন ব্যতীত সকলেই এখন পরলোকে। সঙ্গতের নেতা ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গচন্দ্র রায়। সভ্য ছিলেন ভুবনমোহন সেন (প্রধান শিক্ষক), আদিনাথ দাস (উকীল), ঈশ্বরচন্দ্র সেন, ডাঃ পি, কে, রায়, স্যার কে, জি, গুপ্ত, পি, এম, গুপ্ত, (সিভিল সার্জ্জন), গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (ডিপুটী পানিবাবু), বৈকুণ্ঠনাথ সেন রায়, প্রসন্নচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার সেন (প্রফেসার), কৈলাসচন্দ্র নন্দী, রজনীকান্ত ঘোষ, শরচ্চন্দ্র দত্ত, গুরুদয়াল সিংহ, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কালীনারায়ণ রায়, মুন্সী জালালুদ্দিন, রাজনারায়ণ দত্ত, বিহারীলাল সেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বসু (টুকুবাবু), কামিনীকান্ত গুপ্ত।

বিশ্বাস ও সরলতা সঙ্গতসভার সভ্যদের প্রাণের প্রিয়তম ধন ছিল। সঙ্গতের কার্য্য সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত হইত। গ্রীষ্মাবকাশে পিতৃদেব বাড়ীতে গেলেন। পিতৃদেব যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই কে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে পৌঁছাইয়াছিল। সুতরাং অনেকের নিকট কিছু কিছু গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বড় জ্যেঠা মহাশয় বিশেষ কিছু বলিলেন না। একটী বৃদ্ধ আত্মীয় এ সংবাদে এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সংবাদ জানিয়াই পিতৃদেবকে ঢাকা হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহাকে বাড়ীতে পাইয়া যাহাতে আর ঢাকায় না আসিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্কুল পুনরায় খুলিলে জ্যেঠা মহাশয় পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন এবং সেখানে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃদেবের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কোন কোন বন্ধুর উত্তেজনাতে পিতৃদেব তাঁহার ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনের বিষয় তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজকে লিখিয়া জানান; তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তরে লেখেন, "বাড়ী আসিবার প্রয়োজন নাই, যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া যাও।" পিতৃদেব অত্যন্ত বেদনা পাইলেন বটে, কিন্তু সেই মনোবেদনার কারণ আপনার অভ্যন্তরেই দেখিয়া মাতৃচরণে গিয়া শরণ হইলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃদেব ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়, গোবিন্দপ্রসাদ রায় (ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক), বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মুন্সী জালালুদ্দিন, ডাঃ পি, এম, গুপ্ত ও কাশীপ্রসাদ গুহ ঠাকুরতা সহ কলিকাতা নগরে মাঘোৎসবে উপস্থিত হন। তৎকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহাকে বারম্বার ধ্যানস্থ হইতে দেখাতে ও তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বাক্য ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার ও ব্রহ্মসহবাসের অবস্থা ভাব তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। পিতৃদেবের মুখে এ কথা একাধিকবার শুনিয়াছি,—"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রাজপ্রাসাদ তুল্য এক ত্রিতল গৃহে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি এবং প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করি। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। তৎকালে যুগপৎ আমার নিজ বাটীর খড়ের ঘর এবং তাহাতে বসিবার সংসামান্য বিছানাদি এবং মহর্ষির ত্রিতল গৃহ ও তাঁহার জমকাল আসবাব স্মৃতিপথে ও দৃষ্টিপথে উদিত হওয়াতে এবং মহর্ষির মিষ্টালাপে ও বারম্বার তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হওয়াতে আমার মনে হইতেছিল, এই ত সশরীরে স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" এ যাত্রায় শান্তিপুরও যাওয়া হয়। তথায় ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও সাধু অঘোরনাথের ব্যবহার ও প্রসঙ্গে পিতৃদেবের হৃদয়কে আরও অনুরাগপূর্ণ করিয়া দেয়। শান্তিপুর দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈত এবং অনতিকাল পূর্ব্বে তথায় প্রদত্ত ভক্তি-বিষয়ক কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা প্রভৃতি অনেক বিষয় মনে উদিত হয়। এ সকল যে

অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় পিতৃদেবের জীবনে কার্য্য করিয়াছিল, তাহাই প্রদর্শন জন্য ইহার উল্লেখ করা গেল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে অগ্রহায়ণ পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ঢাকাতে আসিয়া উহা সম্পাদন করেন। এ সময় শ্রদ্ধাভাজন বঙ্গবাবুপ্রমুখ সঙ্গতের সভ্যগণ অনেকে কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎকালে পিতৃদেব বাড়ীতে নজরবন্দী ছিলেন। ১৮৭০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা নগরে বার্ষিক উৎসবের সময় পিতৃদেব অপর ৮জন সহ ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, অপর ৮জনের একজনও ব্রাহ্মসমাজে নাই।

১৮৭০ সালে পিতৃদেব পোগোজ স্কুলে ২য় শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন। পড়াশুনা সমানে চলে নাই। বাড়ীতে আবদ্ধ থাকাতে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, অথচ পর বৎসর আসিয়া দেখেন, প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে পড়া শুনা আরম্ভ করিয়া ২।৩মাস মধ্যে কলিকাতা চলিয়া যান এবং তথায় অনেক চেষ্টার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রবেশ করেন। কিন্তু পড়াশুনা ভাল না হওয়াতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। কলিকাতায় স্থিতিকালে নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া উপাসনাতে যোগদান করিতেন। এক রবিবার বিশেষ কারণে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এতদূর হইতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া গিয়া উপাসনাতে যোগদানপূর্ব্বক মনের তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া, বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমন্দির হইতে সেই রজনীতে বাহির হইয়া দুঃখ এবং অনুতাপে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, বারংবার মনে হইতেছিল, তাঁহার পক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী ময়লা জল-পরিপূর্ণ নর্দ্দমাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু যাঁহার জন্য তাঁহার আত্মা এত তৃষিত ও ব্যাকুল হইয়াছে, তিনি অন্তর্যামী রূপে তাহা জানিতেছিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলেন, ভূমা মহেশ্বর পরমেশ্বর আকাশ ও মেদিনী পরিব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রকাশ তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনে এক অভিনব অবস্থা আনয়ন করিয়াছিল।

পিতৃদেবের ইংরাজী শিক্ষা ভাল হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করাতে অভিভাবকগণ ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তৎপ্রতি বিরক্ত হন। কিন্তু তিনি জননীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পিতামহী দেবী তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ অশেষ স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ গৃহে অবস্থিতিকালে তাঁহাকে উপাসনা ও সঙ্গীতাদিতে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া এবং সদাশয় সচ্চরিত্র লোকদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও প্রসঙ্গাদি করিতেই যে তিনি ভালবাসেন ইহার প্রমাণ পাইয়া, গ্রামস্থ কেহ তাঁহাকে আদর করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ১৮৭১ সালেই সমাজচ্যুত হন, কিন্তু তথাপি কেহ তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। বার বার এ জন্য পড়ার ক্ষতি হইতেছিল। কিন্তু পূজনীয় বড় জ্যেঠা মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; সুতরাং আর কাহারও সহানুভূতি না থাকিলেও, তিনি ও পিতামহী দেবী তাঁহার পড়াশুনায় সাহায্য করিতেন।

১৮৭২ সালে ঢাকায় আসিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৭৩ সালে ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু পীড়িত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পড়া শুনা খরচ পত্রের অভাবে এবং শারীরিক পীড়া-নিবন্ধন এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু মনের ভিতরে যে অগ্নি একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই। ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না, পুনরায় কলিকাতায় যাইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু ৺দুর্গামোহন দাস, ৺রজনীনাথ রায় প্রভৃতি তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে মেয়েদের পড়াইতে বলিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্ত্তি হইতে বলিলেন। কিন্তু অন্তরে সায় না পাওয়াতে রাজী হইলেন না। তখন শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় নাই, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে পড়ান হইত। পিতৃদেবের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অনাথবন্ধু গুহ কলেজে প্রবেশের ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া আস্তে আস্তে শোধ করিলেই চলিবে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। পিতৃদেবের অগ্রজদিগের সহিত পরামর্শ করিতে গৃহে যাইবার কালে নৌকা ডুবিয়া প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে। এই ঘটনাতে তিনি মরিয়া বাঁচিলেন জানিয়া, অন্তরে অন্তরে ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! এ জীবন তোমার, ইহা তোমার সেবাতেই যেন নিয়োগ করি।" বাড়ীতে আসিয়া পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া পড়ার সুবিধা করিতে না পারিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে টাঙ্গাইল গ্রেহেম স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ পাইলেন। এই সময়ে সাবডিপুটীশিপ পরীক্ষা দিবার জন্য ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করিতে গিয়া, ঘোড়া হইতে পড়িয়া মৃতকল্প হন। তখন সঙ্গত-সভার বন্ধুদের জন্য তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইল। এইরূপ ন্যূনাধিক ৮ মাস কাজ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করেন। বিদায় না পাওয়াতে ত্যাগপত্র দিয়া ঢাকায় চলিয়া আসেন। সাব-ডিপুটী পরীক্ষার ক্লাসে প্রবেশ করিবার সময় চলিয়া যাওয়াতে, এফ,এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৩।৪মাস মাত্র পড়িয়া ১৮৭৪ সালে এফ,এ, পরীক্ষা দেন। সে সময় পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন ছিল, বিশেষতঃ অল্প কয়েক মাস মাত্র পড়াশুনা, সুতরাং উত্তীর্ণ হইবার আশা ছিল না। পরীক্ষার পরই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নোয়াখালীতে গমন করেন। (ক্রমশঃ)

মাঘোৎসবের কার্য্যবিবরণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬ই মাঘ, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ৬াটার সময় স্মৃতিসভা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহর্ষিদেবের ঋষিজীবন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা প্রাচীন ভারতের মহিমা এবং গৌরব। ব্রহ্মসাধনা ভারতের গৌরবমুকুট। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্মধ্যান ধারণার ভিতর দিয়া যে উচ্চ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের নাম উপনিষদ্। এখন ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই বেদ উপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানমূলক তত্ত্বপাঠে তাঁহারা ভারতের মহিমা গৌরব স্বীকার করিতেছেন। কালক্রমে এই ঋষিজীবনলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানমূলক সাধনা ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহা হইতেই ভারতের মহা অধঃপতন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাধনার জীবনে প্রাচীন ঋষিজীবনসিদ্ধ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানমূলক সাধনে আপনি সিদ্ধি লাভ করিলেন; এবং ঈশ্বরাদেশে তাহা এই নবযুগের আরম্ভে তিনি ব্যাখ্যা করিলেন, প্রচার করিলেন এবং তাঁহার সেই বিশেষ ব্যাখ্যা "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশের জন্য রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মব্যাখ্যানের গূঢ়তম এবং শ্রেষ্ঠতম বিষয়, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয় এবং আত্মার সঙ্গে পরমাত্মায় যোগ সমাধান। আমাদের নববিধানক্ষেত্রে ধর্ম্মের বিচিত্র সাধনার মধ্যে আত্মাতে পরমাত্মার যোগসাধন বিশেষ সাধন এবং শ্রেষ্ঠ সাধন। মানুষের আত্মা জীবাত্মা, ঈশ্বর পরমাত্মা। আমি কে? আমি জড়শরীররূপ খাঁচার মধ্যস্থ চৈতন্যময় পদার্থ আত্মা। আমি আত্মা, ঈশ্বর পরমাত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার কণা; বৈষ্ণবগণ আত্মাকে চিৎকণ বলেন। আত্মা পরমাত্মাতে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে স্থিতি করে। পরমাত্মাতে আত্মার শ্রেষ্ঠবিকাশ। পরমাত্মাতে আত্মার মহিমা, গৌরব, শোভা, সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত জীবন। আত্মার ভিতর দিয়াই আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি। শ্রীমন্মহর্ষিদেব তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের" প্রত্যেকটি উপদেশে বলিয়াছেন, তোমরা আত্মাতে পরমাত্মাকে অন্বেষণ কর, দর্শন কর, পরমাত্মাতেই স্থিতি কর, গতি কর এবং ক্রমাগত আত্মবিকাশ লাভ কর, অনন্ত জীবনে অগ্রসর হও। কিন্তু মনকে আত্মার দিকে অন্তর্মুখীন করা সহজ নহে। আমরা পৃথিবীতে আসিয়া এই বাহ্য পৃথিবীর সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, ইহাতে অনুরক্ত হই; সংসাররূপ রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় মনকে সংসার হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখীন করা ত সহজ নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপদেশ দিয়াছেন, "প্রথমে নিবৃত্তি-যোগ সাধন কর; 'নেতি', 'নেতি' বলিয়া, সংসার কিছু নয় বলিয়া, চিত্তকে পরমাত্মাতে সমাধান কর। তৎপর সেই পরমাত্মার বলে যখন আত্মা বলীয়ান্ হইবে, সকল প্রকার সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, স্বাধীন হইবে, তখন ব্রহ্মস্থ হইয়া সংসার করিবে, সংসার আর তোমাকে গ্রাস করিবে না।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নিবৃত্তি-যোগের সাধনে সহজেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তিনি এতবড় সংসারে বাস করিয়াও পরমাত্মার ধ্যানে জ্ঞানে, তাঁহার স্বর্গীয় আকর্ষণে সংসারের অতীত অবস্থায় বাস করিতেন। পৃথিবীর জীবনের যত অবসান হইতে লাগিল, তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল। তিনি এই নব যুগে ঋষি-জীবনের যে উচ্চ আদর্শ আমাদের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশের জন্য রাখিয়া গেলেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে ভক্তিভরে অদ্যকার এই পুণ্য দিনে তাঁহার চরণে প্রণত হই।

তাহার পর ভাই প্রিয়নাথ মহর্ষির নিকট পরিচিত হইয়া তাঁহার নিকট যে স্নেহ, উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন। যখন ভাই প্রিয়নাথ বিষয়-কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন—ঈশ্বর-প্রেরণায় মহর্ষির আশীর্ব্বাদ লইতে যান। সকালে ৯টার সময় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। মহর্ষি দেব যখন এই কথা শুনিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যাঁর আদেশ পালন করিবার জন্য তুমি এত কষ্ট করিয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছ, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে তাঁর ব্রতসাধনে সকলকাম করিবেন।" এই বলিয়া কতই তাঁহাকে আদর করিলেন ও উপদেশ দিলেন এবং অবাধে একাকী যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি মহর্ষিদেবের সহিত দেখা করিতে পারিবেন, এই অনুমতি দিলেন। একবার মহর্ষিদেব ভাই প্রিয়নাথকে একটি বেদানা দিয়ে বলেন, "যখন তুমি এই বেদানার রস খাবে, মনে করবে, সেই 'রসো বৈষঃ' যিনি, তিনি বেদানার ভিতরে রস হইয়া রহিয়াছেন এবং তাহা পান করিয়া তুমি আত্মায় পরিপুষ্ট হইবে। এইজন্য এই বেদানিটি তিনি স্বয়ং তোমার জন্য তৈয়ারী করিয়াছেন।" একবার ভাই প্রিয়নাথ মহর্ষিদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মদর্শন কেমন করিয়া হয়? মহর্ষি বলেন, আমি ঠিক বলিতে পারিব না, কিন্তু আমি ইহা বলিতে পারি, তুমি যদি তাঁহাকে চাও এবং তিনি যদি বোঝেন, ঠিক তুমি তাঁহাকেই চাও, তাহা হইলে তোমার যা প্রয়োজন তিনি তা দেবেন। তোমার দর্শন প্রয়োজন হয় তা

তো দেবেন, অদর্শন প্রয়োজন হয় তাও দেবে।" কি গভীর কথা। সর্ব্বক্ষণ যে আমরা ব্রহ্মদর্শন পাইব, তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি আমাদের অদর্শন দিয়াও আমাদের দর্শন-পিপাসা উদ্দীপন করেন।

আর একবার মহর্ষিদেব বলেন, "এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহা সত্যই নূতন বিধান। এই বিধানের প্রভাবে ক্রমে inter-racial, international marriages হবে এবং সেই বিবাহের ফলে এক নূতন জাতি সৃষ্ট হবে। এই বাংগালী জাতি এত intelligent কেন, জান? সেই যে কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণেরা এলেন, এদেশের লোকের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হল, এই সকল বিবাহের ফলে এমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাতি তৈয়ারী হয়েছে।" এইরূপ মাঝে মাঝে কতই উচ্চ উপদেশ দিতেন। তিনি সর্ব্বক্ষণই ধ্যানযোগেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেন না, কাণে ভাল শুনিতে পাইতেন না; কিন্তু ভাই প্রিয়নাথ যখনই তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন, তখনই চিনিতে পারিতেন এবং অগ্নিময় উৎসাহে কতই উপদেশ দিতেন এবং এক একটি গানের এক এক কলি ভাবের উচ্ছ্বাসে বার বার উচ্চারণ করিয়া গান করিতেন।

আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর কি নিগূঢ় আত্মিক যোগ ছিল, তার নিদর্শন যাহা ভাই প্রিয়নাথ দেখিয়াছেন, তাহাও বলেন। মহর্ষিদেব আচার্য্যদেবের শেষ অসুস্থতার সময় যখন তাঁহাকে দেখিতে আসেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আসেন। মহর্ষি দেবকে কমলকুটীরের ড্রয়িং রুমে বসান হইল। কেশবচন্দ্র তখন প্রায় শয্যাগত ছিলেন, কোন রকমে তিনি শয়ন কক্ষ হইতে ড্রয়িং রুমে আসিলেন; আসিবামাত্র মহর্ষিদেব কৌচ হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, দুই হাতে কেশবচন্দ্রকে ধরিয়া, "বাবা কেশব" বলিয়া দরদরধারে অশ্রুপাত করিলেন। কেশবচন্দ্র খুবই ভাবোচ্ছ্বসিত হইলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে যেন অশ্রু সংবরণ করিলেন। কি তাঁর সংযম! দুইজনে কতই প্রাণের কথা হইল। মহর্ষি বলিলেন, "বাবা তোমারই গুণে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রবাহিত হচ্ছে। তুমি আরো দীর্ঘজীবী হয়ে এ বিধান প্রচার কর।" আচার্য্য বলিলেন, এখনও ত অনেক বলবার, অনেক করবার আছে।

মহর্ষিদেবকে ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্মপিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং ব্রহ্মানন্দ নিজেকে আমাদের ধর্ম্মাগ্রজ বলিয়াছেন; এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া ভাই প্রিয়নাথ বক্তব্য শেষ করেন। পরে ডাঃ জগন্মোহন দাস মহর্ষির ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে এবং তিনি যে সত্যবাদিতার আদর্শ ও আর্য্য ঋষিদিগের আদর্শের অনুরূপ জীবন প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের জন্য সেই জীবনাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এই বিষয়ে সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ দেন।

৭ই মাঘ, মঙ্গলবাড়ীর উৎসব হইবার কথা ছিল। ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের আকস্মিক পরলোকগমন হেতু তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সকলে সেখানে গমন করেন। তাই উৎসব এক প্রকার স্থগিত হয়। কেবল ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রাতে নবদেবালয়ে উপাসনা করেন। এবং সন্ধ্যায় সেবিকা হেমন্তকুমারী আচার্য্যদেবের মঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক প্রার্থনা আবৃত্তি করেন।

৮ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে শ্রীদরবারের উৎসব হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উদ্বোধন করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আরাধনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন। ভাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীদরবারের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভে সম্রাটের পরলোকগমন হেতু শোক-প্রকাশক নির্দ্ধারণ এবং আচার্য্যপুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের পরলোকগমন হেতু শোক প্রকাশ করিয়া এবং সন্তপ্ত পরিবারের জন্য সান্ত্বনা ভিক্ষা করিয়া আর একটি নির্দ্ধারণ করা হয়।

৯ই মাঘ, দেশবন্ধু পার্কে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইবার কথা ছিল, তাহা হইতে পারে নাই। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতি রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্রাটের পরলোকগমন হেতু শোক-প্রকাশসূচক নির্দ্ধারণ ও শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের পরলোকগমনেও শোক প্রকাশ করিয়া আর একটী নির্দ্ধারণ উপস্থিত করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন। তৎপর সভার কার্য্য স্থগিত হয়।

১০ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকাসমাজ ও আর্য্যনারীসমাজের সমবেত উৎসব হয়। মহারাণী সুচারু দেবী নিতান্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও জলন্ত ভক্তির সহিত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীমতী মণিকা দেবী পাঠাদির সহায়তা করেন এবং শ্রীমতী সুধা দেবী ও শ্রীমতী মণিকা গুপ্তা প্রভৃতি সুন্দর সংগীত করেন। শান্তিকুটীরে প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে আরতি হয়।

১১ই মাঘ, প্রাতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে জমাট সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। (ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৫ই মার্চ, মঙ্গলবাড়ীতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের প্রথমা কন্যা কুমারী সবিতার জন্মদিন উপলক্ষে সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন।

শুভবিবাহ—গত ২৭শে ফাল্গুন, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দুলিয়ানগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুপ্রভার সহিত, মেটিয়াবুরুজ-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অজিত-

কুমার সেনের শুভবিবাহ কার্য্য নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র উপাচার্য্যের ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। গ্রামের অনেক স্ত্রী পুরুষ যোগদান করিয়াছিলেন। বিধান-জননী নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাসন্ত ও চৈতন্যোৎসব—গত ৮ই মার্চ্চ, বসন্তপূর্ণিমা ও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নবদেবালয়ে উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। আচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে পাঠাদি হয়।

পরলোকগমন—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি:—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, প্রাতে, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, সিটি কলেজিয়েটের হেডমাষ্টার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান, শান্তচিত্ত, সহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ, বিশ্বাসী, উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্ম ছিলেন। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপন হয়, সে বিষয়ে বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। ভাই প্রিয়নাথ দুইদিন শোকসন্তপ্ত পরিবারে সান্ত্বনা জন্য উপাসনা করিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভক্তিমান্ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসু, ৬৪ বৎসর বয়সে, উদরাময় রোগে কিছুকাল ভুগিয়া, গত ৮ই মার্চ্চ বাসন্তী পূর্ণিমা তিথিতে প্রাতঃকালে, কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে, শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, চিরবসন্তের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। বাসন্তীপূর্ণিমা তিথি তাঁর অতি প্রিয় ছিল; প্রতি বৎসর এই দিনে নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে উৎসব করিতেন। সেই উৎসব দিনেই নিত্যোৎসবের দেশে চলিয়া গেলেন। কয়দিন বড়ই রোগ-যাতনা সম্ভোগ করিতেছিলেন, অনন্ত স্নেহময়ী জননী তাই তাঁর সন্তানকে চিরশান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মঙ্গলময়ী মা তাঁর সন্তানের পক্ষে যা মঙ্গল, তাহাই বিধান করিয়াছেন, আরও মঙ্গল করুন। আর এখানকার শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১১ই মার্চ্চ, ৩।১ কৃষ্ণকুমার বসুর ষ্ট্রীটে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ভক্তি (শ্রীযুক্ত অমেলেন্দু বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী) পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠ ও অনুষ্ঠানাংশ সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে দলবলে কীর্ত্তন ও সংগীত করেন। শ্রীমতী ভক্তি নবসংহিতার প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে ৫৲ ও অনাথাশ্রমে ৫৲ এবং ভোজ্য ও তৈজসাদি দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—গত ২৩শে জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৬।টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে:—

"যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আমলে বিধাতার ইচ্ছায় ভারতে নববিধানের বিশ্বজনীন ধর্ম্মাদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই দৃশ্যমান প্রতীক জানিয়া এবং উহার বিরাট প্রজামণ্ডলীর সুখ সমৃদ্ধির জন্য ও জগতে শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহার আগ্রহশীলতা স্মরণ করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এই সভা, মাননীয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পরলোকগমনে, দেশ বিদেশের সমগ্র নববিধানবিশ্বাসিমণ্ডলীর পক্ষ হইতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং সম্রাজ্ঞী মেরী এবং সমগ্র রাজপরিবারের এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন, এবং ঈশ্বরের চরণে এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি স্বর্গগত সম্রাটকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন ও সকলের হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা মার্চ্চ, নবদেবালয়ে আচার্য্য-পত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবী ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভাই অক্ষয়কুমার লধের সহযোগিতায় উপাসনা করেন। শ্রীমতী মণিকা দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। আচার্য্যদেব যে দ এবং পরিবারের মিলন চাহিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে স্বর্গে সেই অধ্যাত্ম মিলন উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় বাগনান ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক করেন। এই দিন স্বর্গীয় সত্যভূষণ গুপ্তের পত্নী স্বর্গীয়া প্রমীলারও সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে প্রার্থনা হয়। অদ্য সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় ভাই অক্ষয়কুমার উপাধ্যায়ের জীবন বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা করেন।

গত ৮ই মার্চ্চ, ২১৭ রাসবিহারী এভেনিউতে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব শান্তসাধক স্বর্গীয় কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মনোমোহনবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইন্দিরা দে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই মার্চ্চ, ৪৬৭ রমেশ মিত্র রোডে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সুমতি দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পুত্র শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র সিংহ এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ৬ই মাঘ, অপরাহ্নে অশ্রুকুটীরে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ পরিমলকুমারের জন্মদিনে কেদারবাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্রের রেলওয়ে কোয়ার্টারে মহেশবাবু উপাসনা করেন। ১১ই মাঘ প্রাতে প্যাটার

নববিধান-মন্দিরে সংগীতের পর মহেশবাবু প্রার্থনা করেন; তৎপর ৯টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মহেশবাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে নববিধান মন্দিরে পাঠ, আলোচনা ও জমাট কীর্ত্তনের পর মহেশবাবু উপাসনা করেন। ১২ই মাঘ, কেশবাশ্রমে বেলা ১০॥টায় মহেশবাবু উপাসনা করেন। তৎপর প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে কেদারবাবু উপাসনা করেন। ১৩ই প্রাতে পবিত্র সমাধি-প্রান্তে উপাসনা হইয়া শান্তি-বাচন হয়। ১৪ই নববিধানমন্দিরে বেলা ১০টার সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া মহেশবাবু প্রার্থনা করেন। গত ২রা ফেব্রুয়ারী, প্রাতে ৯টায় কেশবাশ্রমস্থিত পবিত্র সমাধিপার্শ্বে শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন ও স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র সেনের পারলৌকিক অনুষ্ঠানের দিনে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া বিশেষ উপাসনা হয় এবং আত্মিক ভাবে ঢাকা ও কলিকাতায় তাঁদের আত্মীয়দের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া প্রার্থনাদি হয়। উপাসনাদি কেদারবাবুই করেন।

রেঙ্গুনের সংবাদ—ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার লিখিয়াছেন:—

নবেম্বর ও ডিসেম্বরের প্রত্যেক রবিবার এবং জানুয়ারী, ১ম ও ২য় রবিবার রেঙ্গুনব্রাহ্মসমাজে রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনা আমি করি। ৮ই জানুয়ারী, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে স্মৃতিসভা হয়; সভাপতির কার্য্য আমি করি। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার ও শ্রীমান্ কিশোর সমরেন্দ্র দত্ত রায় পরলোকগত মহাপুরুষের বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করিয়া আপনাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন। ২০শে জানুয়ারী মহর্ষির স্বর্গারোহণ দিনে এবং ২৫শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে আমি উপাসনা করি। ১১ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার মন্দিরে উপাসনা করেন। ১২ই মাঘ, প্রাতে আমার গৃহে শ্রীমান্ কিশোর সমরেন্দ্র দত্ত রায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, আমি উপাসনা করি ও দীক্ষা প্রদান করি। ১২ই মাঘ, বৈকালে ৩টার সময় বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। গান ও আবৃত্তির পরে শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বালক বালিকাদিগকে সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। আমিও কিছু বলি। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ও শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী হালদার বালকবালিকাদিগের জলযোগের ব্যয়ভার বহন করেন; এজন্য সেক্রেটারী তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার নেতৃত্ব করেন। শ্রীমান্ সংগ্রাম সিংহ, কিশোর সমরেন্দ্র, শ্রীমান্ রাজেন রায় এবং আরও কয়েকজন কীর্ত্তনে যোগদান করেন। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। ২৮শে জানুয়ারী, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের আত্মার কল্যাণের জন্য রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা আমি করি।

শান্তিপুরের সংবাদ—

গত ৮ই জানুয়ারী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে, প্রাতে রামনগর বালিকাবিদ্যালয়ে উপাসনা, ৯ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে উক্ত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্ন্যালের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। "শান্তিপুরে কেশবচন্দ্র" কবিতা পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী কামাল-উদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সান্ন্যাল, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস প্রভৃতি এবং সভাপতি ব্রহ্মানন্দের কার্য্যাবলী ও গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় হিন্দু, মুসলমান ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

পুস্তক-পরিচয়।

ব্রহ্মোপাসনা বা উপাসনাতত্ত্ব—স্বর্গগত ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ॥০ আনা। ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব-বিষয়ক এই অমূল্য পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। ঢাকা-প্রবাসী ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র দাসের আগ্রহে ও সাহায্যে এবারকার উৎসব উপলক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এ জন্য আমরা ভ্রাতাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। উপাসনাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এবং পিপাসু ব্যক্তিগণের এই পুস্তকখানি বিশেষ সহায় হইবে। আমাদের যুবক বন্ধুগণ ইহা মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিলে যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন। সাধক মাত্রেই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া, প্রার্থনা-যোগে অধ্যয়ন করেন, আমাদের একান্ত অনুরোধ।

সাধুসমাগম—নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র-বিবৃত, তৃতীয় সংস্করণ, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকখানিও অনেক দিন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। বর্দ্ধিত আকারে ইহার প্রথম অংশে আচার্য্যদেবের সাধু-সমাগম সম্বন্ধীয় প্রার্থনাদি এবং উত্তর অংশে সাধুসমাগম সাধন বিষয়ক উপদেশাদি উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকখানি পরিপুষ্ট করা হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে প্রকাশক শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন ও পূর্ব্বাভাস পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলন করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে মহাজন সম্পর্কে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ ও প্রার্থনাদির তালিকা দেওয়াতে সাধনের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৪২ সাল, ১৮৫৭ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 29th. March, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা।

হে মানবজীবনের ভাগ্যবিধাতা! তোমার সাক্ষাৎ পরিচালনের উপর এবং তোমার সাক্ষাৎ গঠনের উপর আমাদের প্রতি জীবনের, প্রতি পরিবারের ও সমগ্র জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ প্রকাশ ও পূর্ণ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমরা যে পরিমাণে তোমার পরিচালনে পরিচালিত হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হই, আমরা যে পরিমাণে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার স্বর্গীয় উপাদানে তোমার হাতে গঠিত হই, সেই পরিমাণে আমাদের জীবনের যথার্থ বিকাশ, প্রকাশ ও উচ্চ কর্ত্তব্য-সম্পাদন সম্ভবে এবং সেই পরিমাণেই আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যথার্থ কল্যাণ ও ক্রমোন্নতি ইহকালে ও পরকালে আমরা আশা করিতে পারি। আমরা পৃথিবীর বাহ্য শিক্ষা ও সভ্যতায়, বাহিরের জ্ঞানে ও গুণে যতই কেন ভূষিত হই না, আমরা আমাদের আত্মকর্তৃত্বে, আত্মনেতৃত্বে জীবন পরিচালন করিলে পদে পদে আমরা জীবনের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হই, পদে পদে আমরা অজ্ঞানতা ও মোহে জড়িত হই; সে পথে আমাদের আত্মিক জীবনের বিকাশ, প্রকাশ ও উন্নতি তো সম্ভবেই না, পার্থিব জীবনেরও যথার্থ কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। জীবনের পরীক্ষায় বুঝিলাম, পার্থিব, অপার্থিব, বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সকল বিভাগের উন্নতি, বিকাশ, প্রকাশ ও কল্যাণ একই পথে, তোমার সাক্ষাৎ পরিচালনে ও তোমার হাতের গঠনলাভেই সম্ভবে। কিন্তু তোমার পরিচালনের পথে, তোমার শ্রীহস্তের গঠন-পথে আমাদের অন্তরের শত্রু যেমন আমাদিগকে বাধা দান করে, আমাদের অন্তরের শত্রু যেমন সে পথে আমাদের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, এমন আর কে? নিজ বলে এই অন্তরের শত্রুকে আমরা পরাস্ত করিতে পারিতেছি না, বরং অনেক সময় নিজ বলে পরাস্ত করিতে যাইয়া পরাস্ত হইতেছি। সাধুমুখে শুনিয়াছি, কেবল দৈববলে, কেবল তোমা হইতে যে স্বর্গের বল লাভ হয়, সেই বলেই এ শত্রু পরাজিত হয়। সাধুগণ তোমাতে আত্মসর্পণ করিয়া তোমার বলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, জয়ী হইয়া মুক্তভাবে জীবনের পথে তোমা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, তোমার উপাদানে তোমার শ্রীহস্তে মুক্ত ভাবে গঠন লাভ করিয়াছেন। তাই কাতরপ্রাণে বিনীত-অন্তরে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। আমরা যেন আত্মবলে পার্থিব অপার্থিব কোন কাজে অগ্রসর না হই।

আমরা আমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল ও অসহায় জানিয়া, হে জীবনের পরম সহায়, পথের সম্বল, তোমাতেই পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ করি, আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার স্বর্গীয় উপাদানে তোমার শ্রীহস্তে গঠিত হই, তোমারই বলে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হই, এবং একমাত্র তোমা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তোমারই আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবনে ধন্য হই। কৃপা করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

অনন্তের পথে।

"অনন্তের টানে, অনন্তের সনে, চলেছি অনন্ত পথে"। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, কোথায় যাইব, এই গভীর প্রশ্ন কি আমাদের প্রতিজনের জীবনে, সময়ে অসময়ে উপস্থিত হইতেছে না? যে প্রশ্ন স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনি উপস্থিত হয়, একবার নয়, দুইবার নয়, কতবার উপস্থিত হইতেছে, সে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না পাইলে অন্তরপ্রকৃতি তৃপ্তি লাভ করিবে কেন? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের উপর জীবনের শান্তি, আরাম ও আনন্দ নির্ভর করিতেছে। এ গভীর প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? জীবনের এই জটিল পথে, সকল কঠিন সমস্যার সত্য সমাধানে আপনার বুদ্ধিবলে কে উপস্থিত হইতে পারে? অন্তরপ্রকৃতির মর্ম্মস্থান হইতে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, অন্তরপ্রকৃতিই পরম প্রকৃতির সহায়তায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, সত্য সমাধানে উপস্থিত হইতে পারে।

আমাদের আপাত দৃশ্যমান ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়া সময়চক্র ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্রুতবেগে অনবরত চলিতেছে। কত নূতন বৎসর আসিল, আবার পুরাতনে পরিণত হইল। নূতন বৎসরের আরম্ভের পর মাসের পর মাস চলিতে লাগিল, অবশেষে যখন বৎসরের শেষ চৈত্র মাস উপস্থিত হইল, তখন সে মাস বসন্তের রমণীয় মূর্ত্তিতে যতই কেন আমার মনের সাময়িক তৃপ্তি বর্দ্ধন করুক না কিন্তু চৈত্র মাস একটা বৎসরকে অন্ত করিয়া, অন্তরে বিষাদের বিষম স্মৃতি জাগরণ করিয়া যখন বলে, তোমার গণা দিনের একটী বৎসর চলিয়া গেল, তখন ঐ স্মৃতিতে শান্তি কোথায়? এইরূপ আমার দীর্ঘ জীবনের উপর দিয়া কত নব বৎসর পুরাতনে পরিণত হইল, পরিণত হইয়া সময়-সমুদ্র বিলীন হইয়া গেল; কত শীত, কত বসন্ত, কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শরৎ, কত হেমন্ত আমার জীবনের উপর দিয়া, তাহাদের বিচিত্র বিভূতি, মহিমা, মাধুর্য্য আমার জীবনের উপর ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হয়, সময়-সমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র বুদ্বুদের আকার ধরিয়া ইহারা আপনার খেলা খেলিতেছে, খেলা শেষ করিয়া মহা সময়-সমুদ্রে বিলীন হইতেছে, ইহাদের সঙ্গে আমার স্থায়ী সম্বন্ধ কোথায়? পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, কত সুখের পরিবারে স্থাপিত হইলাম; স্নেহ ভালবাসার দিব্যমূর্ত্তি পিতা, স্নেহ আদরের দিব্য আধার দেবী প্রতিমা মাতা, স্নেহ ভালবাসার পুতুল ভাই ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজন কত পাইলাম। সময়ে সে পরিবার-বন্ধনে কত ভাঙ্গাগড়া আরম্ভ হইল, সে পরিবার আর সে পরিবার রহিল না। তাঁহারাও ক্রমে আপনাপন পার্থিব সীমাবদ্ধ জীবনের অভিনয় শেষ করিয়া, ঐ জলবুদ্বুদের ন্যায় যেন আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনকে এক মহা জীবনসাগরে ডুবাইয়া দিলেন, এক মহা জীবন-সমুদ্রে যেন কোথায় বিলীন হইয়া গেলেন। মানবীয় বুদ্ধি ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইল না। এই জীবনের উপর দিয়া আশা ও উৎসাহের বাল্য ও যৌবন চলিয়া গেল, প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য মাধুর্য্য শেষ হইয়া আসিল, জীবন বার্দ্ধক্যের সাজ সজ্জা পরিধান করিয়া পার্থিব জীবনের সন্ধ্যার দিকে তাকাইতে লাগিল; মনে হইল, এ সকলই তো অন্তবিশিষ্ট, সকলই তো আজ আছে, কাল নাই। মানবজীবনে কি এক গূঢ় পিপাসা আছে, সে পিপাসা সীমাবদ্ধ কিছু লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; সে চায় স্থায়ী কিছু, নিত্য কিছু, অবিনাশী অনন্ত কিছু। তাই মানুষ অস্থায়ী ধন ঐশ্বর্য্যে যতই কেন বিভূষিত হউক না, তাহার জীবনের গূঢ় ক্রন্দন দূর হয় না। একজন পরম ধনী রাজা ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন হইয়াও তাহাতে শান্তি পাইলেন না। তিনি যখন পৃথিবীর দেহ, গেহ, ধন ঐশ্বর্য্য, জন পরিজন সব পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর হিসাবে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি অনন্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া বলিলেন, "Rest at last"—অবশেষে শান্তি; পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ী সকল বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদনে শান্তি, অনন্তের সহিত মিলনে শান্তি।

আমাদের স্রষ্টা পাতা ঈশ্বর অনন্ত। তাঁহার সন্ধান আমরা যথাসময়ে পাই, পাইয়া এই পরীক্ষাময় জীবনে, সুখদুঃখময় সংসারে তাঁহাকে শান্তি, আরাম ও আনন্দের অনন্ত উৎসরূপে আশ্রয় করি। সেই পথ প্রদর্শন করিতে, সেই পথে আমাদিগকে লইয়া যাইতে কত সাধু ভক্ত মহাজন সেই ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিলেন; কিন্তু মানব-সাধারণ সাধু ভক্ত মহাজনদিগের উক্তির যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। অনন্তকে না ধরিয়া সেই সকল সাধু মহাজনের এক এক জনকে এক এক সম্প্রদায় অনন্তের স্থানে বসাইয়া পূজা বন্দনা করিতে লাগিল; তাই ধর্ম্মপথেও সাধারণ মানবের বদ্ধাবস্থা, তাই পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কত বিচ্ছেদ, হিংসা, দ্বেষ, সংগ্রাম এবং তাহা হইতে কত অধর্ম্মের উৎপত্তি।

পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে, অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে ক্ষুদ্র মানবকুলের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কত ঋষিকুল আসিলেন, কত সাধু মহাজন যুগে যুগে আসিলেন; কিন্তু তাঁহাদের জীবনের অসাধারণ সাধনের ভাব সাধারণ মানুষ ধারণা করিতে পারিল না. তাঁহাদের উপদেশ ও উক্তির কদর্থ করিয়া মানুষ তাঁহাদের জীবনের কার্য্যকে পণ্ড করিয়া ফেলিল। তাই এই নব যুগে আবার একটী নব ধর্ম্ম নববিধানের আগমন। জগতের পিতা, পাতা, পরিত্রাতা যিনি, তিনি ভিন্ন কে আর স্বর্গের পরিত্রাণপ্রদ সত্য ধর্ম্মবিধান ধরাধামে আনিতে পারে? স্বয়ং অনন্ত ভূমা ঈশ্বর একটী নবধর্ম্ম-বিধান লইয়া তাঁহার রাজ্য স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ।

পৃথিবীর মাতার গর্ভস্থ সন্তান মাতার সঙ্গে নাড়ীর অকাট্য বন্ধনে সম্বদ্ধ থাকে। সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীর বন্ধন কর্ত্তিত হয়। আমরা নবধর্ম্মে, নব সাধনে, অনন্ত যিনি আমাদের উপাস্য, তাঁহারই সাক্ষাৎ আলোকে, তাঁহারই সাক্ষাৎ শিক্ষাগুণে প্রত্যক্ষ করিলাম, আমরা নিতান্ত কীটাণুকীট ক্ষুদ্র আত্মা হইলেও, আমাদের প্রতিজনেই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে গূঢ় অকাট্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ। সে যোগ, সে সম্বন্ধ আর ইহকালে, পরকালে কখন কর্ত্তিত হইবার নহে। আমাদের নিত্য উপাসনার উদ্দেশ্য, তাঁহার সঙ্গে নব নব ভাবে যোগ ও নৈকট্যের বৃদ্ধি, যোগ ও নৈকট্যের ঘনতা, গভীরতা মিষ্টতা লাভ। আমাদের নিত্য উপাসনা, ধ্যান ও ধারণার উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎ ফল সেই অনন্তে আমাদের জীবনের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি এবং ক্রমোন্নতি। সেই উপাসনার ভিতর দিয়া তিনি ক্রমাগত তাঁহার দিব্যালোক আমাদের জীবনে বিস্তার করিয়া, তাঁহার দিব্য জ্ঞান আমাদের অন্তরে সঞ্চার করিয়া প্রত্যক্ষ করাইতেছেন, সেই অনন্তই অন্তরে, সেই অনন্তই বাহিরে। বাহিরের আকাশে, বাতাসে, আলোকে, অন্ন জলে তিনিই শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের শারীরিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিতেছেন; তিনিই আবার আত্মাতে পরমাত্মা রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের আত্মাকে পরিপোষণ করিতেছেন। কিন্তু শরীরই বলি, সংসারের বিষয় বৈভবই বলি, বাহ্য যাহা কিছু তাহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শেষ হইবে, কিন্তু শেষ হইবে না সম্বন্ধ অনন্তের সঙ্গে। তিনি আমাদের অনন্তকালের সঙ্গী সহায়, তিনি অনন্তকালের পিতামাতা, সুহৃদ সম্বল, জীবনের একমাত্র খুঁটি, একমাত্র অবলম্বন। এক উপাসনা প্রার্থনা যোগেই আমাদের অন্তরে ক্রমে এ সকল জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, জীবনে এ সকল সম্বন্ধ প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এবার অনন্ত যিনি, তিনি হইলেন উপাস্য, তিনি হইলেন গুরু, তিনি হইলেন ধর্ম্মপথে, কর্ম্মপথে পরিচালক, তিনি হইলেন মানবাত্মাতে বিবেকের মধ্যে পরম বাণী। তিনি এই উপাসনা শিক্ষা-যোগে তাঁহার স্থান কি, প্রদর্শন করিলেন, সাধু মহাজনগণের স্থান কি, তাহাও প্রদর্শন করিলেন। সাধু মহাজনগণের সঙ্গে সত্য সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে স্থাপন করিলেন।

সাধু মহাজনগণ আমাদের সহ উপাসক, ধর্ম্মপথে শ্রেষ্ঠ সঙ্গী, উচ্চ দৃষ্টান্ত, কিন্তু কেহই পূর্ণাদর্শ নহেন। এক অনন্তই জীবনের পূর্ণ আদর্শ, একমাত্র গম্য স্থান। তিনি মানবীয় কৃত্রিম গণ্ডী সকল ভাঙ্গিয়া দিয়া, অনন্তের মুক্ত পথ নিত্যকালের জন্য আমাদের নিকট প্রসারণ করিলেন। তিনি দেখাইতেছেন, ছোট বড় সকলের মধ্যে এক অনন্তের খেলা, অনন্তের লীলা। তাই আমরা "অনন্তের টানে, অনন্তের সনে, চলেছি অনন্ত পথে।"

ধর্ম্মতত্ত্ব

পরিচয়।

আধুনিক কালে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত পরিচয় করিতে হইলে, যিনি উভয়কে চেনেন, তিনিই পরিচয় করাইয়া দেন। কোন সাধু মহাপুরুষের সহিত আমাদের পরিচয় করিতে হইলে, স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ যিনি, তিনি ভিন্ন কে পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন? কেন না, তিনিই কেবল উভয়কেই বিলক্ষণ চেনেন। আবার অনন্ত ঈশ্বরের সহিত পরিচয় করিতে হইলেও স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন কেহ সম্যক পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন না। অনন্ত ভিন্ন অনন্তকে কে চেনে বা চেনাইতে পারে? সাধু ভক্তেরা যিনি যতটুকু তাঁর পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন; কিন্তু তাঁর সম্যক পরিচয় তিনি ভিন্ন কেহ দিতে পারে না। তাঁর পবিত্রাত্মা কেবল তাঁর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন।

ধর্ম্মরক্ষক।

রাজা রাজসিংহাসনে বসিয়া যে রাজ্যশাসন করেন, তাহাতে তিনি পাপেরই শাসন করেন, তদ্দ্বারা যাহাতে প্রজার ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহারই ব্যবস্থা বিধান করেন; এই জন্য রাজার একটি অভিধান "ধর্ম্মরক্ষক" Defender of Faith। বাস্তবিক স্বয়ং ঈশ্বরও যেমন আমাদের পাপের শাস্তা, তেমনি আমাদের ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। আমরা যাহাতে পাপ করিতে না পারি এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করি, তাহাই তিনি বিধান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবিশ্বাসী মাত্রেই ইহার সাক্ষ্য দান করিবেন। আমরা নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় বার বার দেখিয়াছি, দুর্ব্বলতা ও প্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করিতে যাই, আর পাপ করিতে পারি না; মন ফিরিয়া যায়, অনুতাপে অনুতপ্ত হয়। এমনই করিয়া বিধাতা আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

পাপের উত্তাপ, স্বর্গীয় প্রেমের সমীরণ।

বালুকাময় ভূমি অগ্নিময় উত্তাপে উত্তপ্ত; কিন্তু অদূরস্থ মহা সাগরের সমীরণ এমনই আকাশ পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে যে, সে অগ্নির উত্তাপ কিছুই অনুভব হইতেছে না। স্নিগ্ধ সুশীতল সমীরণে সমুদয় উত্তাপ কোথায় চলিয়া যাইতেছে, সুখ-সমীরণে, ozone, oxigenএ, জীবনশক্তিসঞ্চারিণী বায়ুতে নব জীবন সঞ্চার করিতেছে। পৃথিবী যদিও পাপের উত্তাপে উত্তপ্ত, কিন্তু জীবন্ত মার অনন্ত প্রেমসমীরণ নিরন্তর চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি তাঁর প্রেমে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন; যাহাতে তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ পাপের উত্তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ না হয়, তাহার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। পাপের উত্তাপ অপেক্ষা অনন্ত প্রেমসমীরণের প্রভাব অনন্ত গুণে শান্তিপ্রদ ও স্নিগ্ধকর। ইহা নবজীবন সঞ্চার করে ও সকল প্রকার পাপ তাপ হইতে রক্ষা করে।

ব্রহ্মদাস মহিমচন্দ্র সেন।

(শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নোয়াখালীতে সেই সময়ে ঢাকার সঙ্গতসভার অন্যতম সভ্য ভুবনমোহন সেন মহাশয় হেডমাষ্টার ছিলেন; সেই স্কুলে শ্রদ্ধা-ভাজন দুর্গানাথ রায় মহাশয় তখন ১ম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। নোয়াখালীতে ইহার আগেই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উৎসাহী ব্রাহ্মের অভাবে নির্জ্জীব অবস্থায় ছিল। ভুবনবাবু যাওয়ার পর আবার উৎসাহ-সহকারে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। পিতৃদেব ৫ বৎসরের কিছু অধিককাল নোয়াখালীতে কার্য্য করেন। এ সময় তাঁহার কার্য্য তিন ভাগে ভাগ করা যায়:—

১। ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য।

২। বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকরূপে (সাব ইন্‌স্‌পেক্টার) কার্য্য।

৩। জেলা স্কুলের শিক্ষকরূপে কার্য্য।

সেই সময়ে কুচবিহারের বিবাহপ্রস্তাবের প্রতিবাদের জন্য বাবু দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির স্বাক্ষরিত পত্র নোয়াখালী সমাজে প্রেরিত হয়। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এক বিশেষ সভাতে সমবেত হন। এই সভাতে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের চরিত্র ও জীবন সম্বন্ধে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করা হয়—এই ব্যাপার তাঁহার জীবনের মহোচ্চ আদর্শের অনুযায়ী হয় নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া এই সভা এই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করেন।

এই প্রতিবাদের প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদনে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের অনুমোদনের বিরোধী ছিলেন পিতৃদেব এবং বেণীমাধব মজুমদার। ইহার অল্পকাল পরে উপাচার্য্য ভুবনমোহন সেন অন্যত্র বদলী হন। পিতৃদেবকেই উপাচার্য্যের কাজ করিতে হইত। ইহার কিছুকাল পরে বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, মিশন আফিস তখন তখন ৬নং কলেজ স্কোয়ারে ছিল। কিছুদিন তথায় অবস্থান করার পর নোয়াখালীতে প্রত্যাগমন করেন। তখনও কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনে তাঁহার মন নানা ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। প্রতিবাদকারী বন্ধুগণ প্রতিবাদ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেন। ব্রহ্মমন্দিরে যাঁহারা উপাসনার্থ যোগ দিতেন,

তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে প্রতিবাদেরই সমর্থন করিতেন। এ অবস্থায় অগতির গতি দীনবন্ধু সহায় হইয়া তাঁহাকে যেন হস্তে ধরিয়া জীবন-পথে লইয়া গেলেন। একদিন সায়ংকালে মন্দিরে যাইবার পথে চিদাকাশে হঠাৎ দৈববাণী হইল, "তুমি যদি প্রেম ভক্তি চাও, কেশবচন্দ্রের পশ্চাতে থাক।" এই বাণী চিরদিনের জন্য তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল।

নোয়াখালী থাকা কালেই তিনি স্কুলের সাব ইনস্পেক্টার হন। সাধন ভজনের ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া এ কাজ তাঁহার নিকট ভাল বোধ হয় নাই। অর্থাগমের পক্ষে এ চাকুরী বেশ ছিল, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনকে তিনি কখনই স্বীয় জীবনের কার্য্য মনে করেন নাই। এ কাজ তিন মাসের অধিক করিলেন না। নোয়াখালীর বিভিন্ন গ্রামের স্কুল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া নোয়াখালী পৌঁছিয়াই ত্যাগপত্র লিখিয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ ত্যাগপত্র গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বিশেষ বিবেচনার জন্য পুনরায় ফিরাইয়া দেন—তিনিও সপ্তাহকাল পরে পুনরায় ত্যাগপত্র প্রেরণ করেন।

তৎপর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। এই সময় আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় শ্রদ্ধাস্পদ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রদ্ধেয় দুর্গানাথ রায়, শ্রদ্ধেয় দীননাথ কর্ম্মকার, শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার প্রভৃতিকে লইয়া এখানে উৎসব করিতে আসেন। এই দলের সঙ্গে মিশিতে পাইয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। এই দলের সহিত বিশেষ ভাবে উপাসনা, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদিতে যোগ দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। জেলা স্কুলে শিক্ষকতাকালেই অধ্যয়ন, প্রচার, নির্জ্জন ও সজন সাধন করিতেন। উপাসনা-গৃহে অনেক সময় একতারা লইয়া একাকী নির্জ্জনে বসিতেন; তাহাতেও তৃপ্তি বোধ না করিয়া অনেক সময় নগর হইতে বহুদূরে ব্রহ্মপুত্রের ধারে আসিয়া বসিতেন। কখনও কখনও সায়ংকালে জঙ্গলে বসিয়া ধ্যান করিতেন।

এই ভাবে কিছু দিন কাটিলে পর, আপনাকে প্রভুর কাজে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিবার জন্য এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া, ১৮৮২ সনের শেষ ভাগে ঢাকায় আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের নিকট প্রচারব্রত গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

লোকে বিবাহ করিয়া সংসারী হয়, কিন্তু পিতৃদেব বিবাহ করিয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সংসারত্যাগী হইলেন। প্রচারক-জীবনে তিনি ১৩ বৎসর কাল 'ঈষ্ট' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ময়মনসিংহ থাকা কালে তিনি "শ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিনী" নামে পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার শিরোভাগে যে শ্লোক ছিল, তাহা তাঁহারই রচিত শ্লোকের ভাব লইয়া সেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং কবি ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোকটী এই:—

হরেঃ পদোত্থাং হরিভক্তিগঙ্গাং কমণ্ডলৌ ন্যস্য বিবেকবেধাঃ
তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সমুপাদিদেশ সাক্ষাৎ সদিচ্ছাখ্যভগীরথায়।
বিশ্বাসনামানমসৌ হিমাদ্রিমারুহ্য নানাবিধসাধনাভিঃ
ভাগীরথীং প্রাপ ভগীরথস্তাং মৌলীস্থিতাং শৌচময়স্য শম্ভোঃ।
তস্মাদ্ধিমাদ্রেঃ পরিতঃ পতন্তী পবিত্রয়ন্তী বিবিধপ্রদেশান্
সেয়ং হরিপ্রেমসমুদ্রমধ্যে তরঙ্গিনী সঙ্গতিমভ্যুপৈতি॥

ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি "নবাব স্যার আবদুল মণি রিলিফ ফণ্ডের" এক জন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়া ঢাকার গরিবদিগকে ঐ ফণ্ড হইতে সাহায্য করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই ফণ্ড হইতে গৃহহীনকে পুনরায় গৃহনির্ম্মাণের অর্থ দেওয়া হইত এবং দুর্ভিক্ষের সময় চাউল অন্যত্র হইতে আনাইয়া কম দরে দরিদ্রের নিকট বিক্রয় করাইতে হইত। এজন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু পরিশ্রমে তিনি কাতর ছিলেন না। সমস্তই প্রভুর কাজ—নিজেকে যেন প্রভুর কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল।

১৯০৮ সালে উপাচার্য্যের কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য কুচবিহারে গমন করেন এবং আড়াই বৎসর কাল তথায় অবস্থান করেন। তৎপর আরও দুই বৎসর কাল কলিকাতা প্রচারাশ্রমে থাকিয়া World and New Dispensation (বর্ত্তমানে Navavidhan) পত্রিকা পরিচালন, বেদান্তসমন্বয়ভাষ্যের শেষ অধ্যায়ের বাঙ্গলা অনুবাদ এবং অন্যান্য প্রকারের প্রচার আফিসের কার্য্য করেন।

তৎকালে শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের শ্রীমদ্গীতাসমন্বয়ভাষ্য প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করিতে ইচ্ছুক হন। সংস্কৃতে তাঁহার তেমন দখল ছিল না, কিন্তু "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"। তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর গীতাসমন্বয়ভাষ্য প্রভৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনেক বন্ধু অর্থ এবং পুস্তকাদি দ্বারা এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম বন্ধু রায় সাহেব বলরাম সেন মহাশয় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় প্রুফ ইত্যাদি দেখিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ যখন যন্ত্রস্থ ছিল, পিতৃদেব হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং ১৮ ঘণ্টা কাল অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। চিকিৎসকেরা নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু "রাখেন কৃষ্ণ মারে কে?" জ্ঞান হইবা মাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কটা বাজিয়াছে?' বেলা ৩টা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রুফ দিয়া গিয়াছে কি না? আমরা বিস্মিত হইলাম, তিনি যেন ঘুম হইতে উঠিয়া কথা কহিতেছেন।

বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবার পর গীতাসমন্বয়ভাষ্য হইতে "পারম হংস্যাদর্শ" অধ্যায় হিন্দী ও ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। হিন্দী ভাষা তাঁহার একেবারেই জানা ছিল না। হিন্দী বিশেষজ্ঞের সাহায্যলাভের জন্যও তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

পিতৃদেব সর্ব্বদা বলিতেন, "আমার জীবন অতি ক্ষুদ্র। আমি

আমা অপেক্ষা হেয় লোক দেখিতে পাই না। এই হেয় ক্ষুদ্র জীবনেও অনন্ত প্রেম পুণ্যের আধার পরমেশ্বরের লীলা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। এই জন্য আমাকে বারবারই বলিতে হয়, 'বেঁধেছ প্রেমের পাশে, ওহে প্রেমময়।' আর গাইতে হয়, 'মাগো, তুমি আমার, আমি তোমার, ছাড়বে বল কেমন করে (তোমায় ছাড়ব বল কেমন করে)।' নানা পরীক্ষা প্রলোভন, উত্থান পতন, শোক, রোগ, দারিদ্র্য, লজ্জা, অপমান, উৎপীড়ন, বন্ধুবিচ্ছেদাদি নানা অবস্থার ভিতর দিয়া মহা প্রভু আমাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দান করিয়াছেন। তাঁহার সেই শ্রীপদ-পল্লব সমুদয় বাসনা কামনার পরিসমাপ্তিকর; সুতরাং আশার নিবৃত্তি কি, তাহা বুঝিতে সুযোগ পাইয়াছি।"

পিতৃদেব চিরদিনই স্বাধীন প্রকৃতির হইলেও তিনি বলিতেন, তাঁহার চিত্ত দুর্ব্বল। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানকার অবস্থা ও শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেন; কিন্তু সকল অবস্থাতে ভগবানে নির্ভর রাখিতে পারিতে, মহাপ্রভুরই মঙ্গল সংকল্প পূর্ণ হইতে দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া ভগবানের বিশেষ কৃপার কথা বলিতেন।

তাহা এই, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করা। এ জন্য আত্মীয়গণ এবং জননী অনেকবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বেশী পীড়াপীড়ি করিলেই গৃহ হইতে কলিকাতা এবং ঢাকা চলিয়া যাইতেন। একবার এমন হইল যে, বাড়ী আসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর দাস্ত বমি হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বাড়ীতে একটী বৃহৎ পূজার ব্যাপার ছিল। তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া এ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে বাধা ছিল। সুতরাং আত্মীয়গণ চিন্তিত হইলেন। রুগ্ন অবস্থায় তাড়াইয়া দেওয়া অথবা তাঁহার আপনি চলিয়া যাওয়ার উপায় ছিল না। ছোট জেঠা মহাশয় অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অর্থ দ্বারা জমিদার-বর্গের অনুমতি গ্রহণ করিলেন, এবং পণ্ডিতদিগকেও অর্থ দ্বারা এমন ভাবে বশীভূত করিলেন যে, এক খণ্ড কাগজ মাত্র তাঁহাকে পড়িতে হইবে, আর কিছুই করিতে হইবে না। যথাসময়ে কাগজ তাঁহার হস্তে দিয়া পড়িতে বলা হইল। তিনি পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে, "ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনাং চান্দ্রায়ণং প্রায়শ্চিত্তং।" পড়িয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি অন্তরে অন্তরে প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, সত্য সত্যই ইঁহারা জানেন না, ইঁহারা কি করিতেছেন; তুমি ক্ষমা কর। আমাকে যদি এ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর, তাহা হইলে এ জীবনে যেন তোমারই মহিমা মহিমান্বিত হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।" এর হইতে সত্যের পথে থাকিবার জন্য পিতৃদেব দৃঢ়তররূপে কৃতসংকল্প হইলেন। হিন্দুসমাজে গৃহীত হইলেন, ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়াও ৫।৬মাস এ পীড়াতে ভুগিলেন। ভাল হইয়া পুনরায় স্বাধীন ভাবে সকলই করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "যদিও এ ঘটনায় আমার মনের দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে, তথাপি আমার দুর্ব্বল ক্ষীণ বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্যই ইহা হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা বিধাতার সেই অভিপ্রায়ই পূর্ণ হইয়াছে। আমি আপনার বলে নির্ভর করিয়া আছাড় খাইয়া আবার প্রভুর কৃপায় সবল ও দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহা প্রভুরই গৌরব।" (ক্রমশঃ)

—০—

নববিধান সমাজান্তর্গত বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

১৯৩৫।

(১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬, শিশুসম্মিলনীর উৎসবে পঠিত।)

জননীর উৎসব-মন্দিরে তাঁহার প্রসন্ন হাসিমুখ দেখিবার আজ আমাদিগের শুভ অবসর। তিনি করুণা করিয়া তাঁহার শিশুদিগের সহিত মিশিবার, তাঁহার নন্দনকাননে প্রবেশ করিবার যে সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহারই এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

নীতিবিদ্যালয় নামটী বড় শ্রুতিমধুর নহে, এবং যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারও ঠিক উপযোগী নহে। বিদ্যালয়ের পরিশ্রমক্লান্ত বালিকাদিগের মনের উপর আবার কতকগুলি কঠিন ধর্ম্মকথা ও নীতি-উপদেশের ভার চাপাইয়া ও বৎসরান্তে পরীক্ষা লইয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া নীতিবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ, তাহাতে যে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহাতে তাহাদের জীবনে কার্য্যকরী হয়, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রভৃতিকে জাগ্রত করে, তাহাদিগের প্রাণে দেবভক্তি ও জীব-প্রীতির প্রতিষ্ঠা করে, এরূপ ভাবে শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইহার স্থাপনা হইয়াছিল। এই ত্রিশ বৎসরের ভিতর ইহার পরিচালনায় কতবার কত বাধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিধাতার করুণায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটী আবার নূতন করিয়া বৎসরের কার্য্যভার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই বৎসরের (১৯৩৫) প্রথমেই ৯ই ফেব্রুয়ারী, শিক্ষয়িত্রী-দের একটী সাধারণ সভায় বৎসরের কার্য্যপ্রণালী ঠিক করিয়া শিক্ষার কার্য্যভার ভাগ করিয়া লওয়ায়, এ বৎসর কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী সুধা সেন প্রতি রবিবারে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ সময়েই প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার ভার লইয়াছেন। শ্রীমতী সুজাতা লাহিড়ী, শ্রীমতী মাধবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শান্তিসুধা বসু, শ্রীমতী সুধা দাস, শ্রীমতী নিপ্রাণিকা চক্রবর্ত্তী,

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন এবং সম্পাদিকা নিজে নিয়মিত ভাবে শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রতিভা রাউত, শ্রীমতী শান্তিবালা সেন, শ্রীমতী শোভা সেন, শ্রীমতী প্রতিভা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে দুই একদিন শিক্ষা দান করিয়া বালিকাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

বৎসরের প্রথমে ৭৪জন বালিকা লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। বৎসরের শেষেও ৭২ জন বালিকা ছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় উপস্থিত থাকিয়া বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীবুদ্ধের বাণী অবলম্বন করিয়া তিনি বালিকাদিগকে এরূপ ভাবে উপদেশ দেন, যাহাতে নীতি-বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহারা যথার্থ ভাবে জীবনে গ্রহণ করিতে পারে।

এ বৎসর সাধারণতঃ চারিটী বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালিকারা প্রথম বিভাগে শিক্ষালাভ করিত; কিন্তু বৎসরের শেষের দিকে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রবেশিকা শ্রেণীর বালিকারা আর আসিতে পারে নাই। দুইজন মুসলমান বালিকা দুই বৎসরাবধি নিম্নবিভাগে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিতেছে।

নিম্নলিখিত ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে :—

প্রথম বিভাগ ঃ—

মহাপণ্ডিত চাণক্যের জীবনী, শ্রীঈশার জীবন ও উপদেশ-বাণী, সক্রেটিসের জীবনী, ভারতীয় বিদুষীগণের জীবনী—গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী; মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী (সংক্ষেপে), ঋষি প্রতাপচন্দ্রের জীবন (সংক্ষেপে), সাধুসঙ্গ ও প্রেমের জয় (গল্প), ইংরাজী ও বাংলা কবিতা, দুটী সংস্কৃত শ্লোক এবং সংগীত।

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ—

গোপা, কিম্বা গোতমী ও তপস্বিনী রাবেয়ার জীবনী, শ্রীঈশার সংক্ষিপ্ত জীবনী, সদুপদেশমূলক গল্প, ইংরাজী ও বাংলা কবিতা, সঙ্গীত।

তৃতীয় বিভাগ ঃ—

ধ্রুবের উপাখ্যান, শ্রীবুদ্ধের কয়েকটী উপদেশ, গুরুভক্তি ও অন্যান্য উপদেশমূলক গল্প, বাংলা কবিতা ও সংগীত।

শিশু বিভাগ ঃ—

ধ্রুবের উপাখ্যান, ইব্রাহিমের গল্প, বাধ্যতা, সত্যবাদিতা ও লোভসম্বরণ সম্বন্ধে গল্প ও উপদেশ, ছোট ছোট কবিতা ও সংগীত।

ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ক্রীড়াদি করে; ক্রীড়ার ভিতর পরস্পরের বন্ধুত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষয়িত্রীর বাধ্যতা যাহাতে স্বীকার করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

নিম্ন বিভাগের বালিকাগণকে চরিত্র-পুস্তক দেওয়া হয়; তাহাতে অভিভাবকের স্বাক্ষরিত সপ্তাহের দিনলিপি লেখা থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাদিগের দোষ ত্রুটী স্বীকার করিয়া সংশোধন করিতে শিখিবে এবং এইরূপে ক্রমে তাহাদিগের রুচি, ব্যবহার, বাক্য শোভন ও সুন্দর হইবে। উচ্চ শ্রেণীর বালিকাগণকে চরিত্রপুস্তক দেওয়া হয় না, তাহারা নিজেরাই দিনলিপি লিখিয়া আনে।

প্রতি সপ্তাহের শিক্ষা বালিকাগণ বুঝিয়াছে এবং স্মরণ রাখিয়াছে কিনা জানিবার জন্য সে সকল তাহাদিগকে লিখিয়া আনিতে বলা হয় এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা বা শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে দেওয়া হয়। বালিকাগণের রচনা ও আবৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাদিগের মন্তব্য লিখিয়া রাখেন। বৎসরান্তে এই সকল দেখিয়া প্রতি বিভাগে তিন চারিটী পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত বাৎসরিক পরীক্ষা ও নিয়মিত উপস্থিতির জন্য পুরস্কার দিয়া বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়। এই সকল বিষয়ে আমরা অভিভাবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি; মনে হয়, বালিকাগণের উৎসাহ, উদ্যম তাঁহাদিগের সহায়তায় বর্দ্ধিত হইবে এবং শিক্ষয়িত্রীগণেরও সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেদিন মহরম পর্ব্ব থাকায় উহা স্থগিত করা হয়। আশা করা যায়, আগামী নববর্ষে উৎসবের কোনও ব্যাঘাত হইবে না।

২১শে এপ্রিল রবিবারে Easter Sunday ছিল। ঐ দিনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রেরিত একজন ভদ্রলোকে শ্রীঈশার জীবন (জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত) ছায়াচিত্র-সংযোগে বিবৃত করেন এবং Good Friday, Easter Sunday ও Monday'র অর্থ বুঝাইয়া দিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

গত ১৯শে জানুয়ারী, শনিবার বালকবালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভার কার্য্য এবং শিশুসম্মিলনীর উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী গীতা দেবী বালকবালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সে দিন উৎসব-গৃহে সমাগত সকল বালকবালিকার জলযোগের ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন। অতি মধুর সরল ভাষায় লিখিত একখানি করিয়া মুদ্রিত সভাপতির অভিভাষণ প্রত্যেক বালক বালিকাকে প্রদান করেন। কিন্তু উৎসবশেষে অনেকগুলি পুস্তিকা সভাগৃহে পতিত দেখিয়া বড়ই ক্লেশবোধ হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত বালকবালিকাদিগের অভিভাবকগণের প্রতিও আমাদিগের বিনীত নিবেদন, যেন তাঁহারা সন্তানদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, এখানে আসিবার উদ্দেশ্য শুধুই ক্রীড়া কৌতুক দেখিবার জন্য নহে। এখানেও কিছু গ্রহণ করিবার আছে, জীবনপথে কিছু পাথেয়-সঞ্চয়ের সুযোগ আছে।

বহু বৎসর যাবৎ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে এই উৎসব ও পুরস্কারবিতরণ সভার আয়োজন হইতেছে। ইন্‌ষ্টিটিউটের সাধারণ কর্ম্মসচিব ও অন্যান্য যাঁহাদিগের সাহায্যে গত বৎসরের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে ঋণী। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এই সভার নিমন্ত্রণ-পত্র, কার্য্যতালিকা ইত্যাদি মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয়ে ইহার কার্য্য চলিতেছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়গৃহ এবং গাড়ী ব্যবহার করিতে দিয়া অনেক সাহায্য করিতেছেন। মটরবাসের (Motor Bus) তৈলের জন্য আমাদিগের মাসিক ৩০৲ হিসাবে ব্যয় হয়; এইজন্য বালিকাগণের নিকট প্রতি মাসে চারি আনা করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ইহাতে সামান্যই পূরণ হয়। বন্ধুগণের নিকট প্রাপ্ত মাসিক ও এককালীন দানেই নীতিবিদ্যালয়ের মাসিক ও উৎসবাদির ব্যয় চলিতেছে। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গত বৎসর (১৯৩৫) ১৫ই ডিসেম্বর বালিকাগণকে শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে লইয়া যাওয়া হয়; দুইখানি বাস (Bus) রিজার্ভ করিয়া যাওয়া হইয়াছিল। যাইবার খরচ হিসাবে বালিকাগণ ও যে কয়েকজন বন্ধু এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, সকলেই কিছু চাঁদা দান করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ দিনের জলখাবারের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কেশব একাডেমী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ। উদ্যানের Curator শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার বাটী ও বাটী সংলগ্ন ময়দানটী আমাদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ ময়দানে বালিকাদিগের ভোজনের সময়েও তিনি সপরিবারে উপস্থিত থাকিয়া, আনন্দ-ভোজে যোগদান করিয়া, কৌতুক হাসিতে সকলকে অত্যন্ত সুখী করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের সহায়তায় এই সম্মিলনটী আনন্দোৎসবে পরিণত হইয়াছিল, সকলকেই ধন্যবাদ জানাইতেছি। উৎসবদায়িনী জননী সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইহলোকস্থ বন্ধুদিগকে আমরা প্রাণের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আজ সুযোগ পাইয়াছি। পরলোকে যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও আজ কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবার দিন। গত ২৮শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাস ও গ্রীষ্মাবকাশে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৭ই জুলাই, নীতিবিদ্যালয়ের প্রার্থনার পর এ কথা সকলকে জানানো হ এবং সকল বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীগণ দুই মিনিটকাল নীরব থাকিবার পর প্রণাম করিয়া স্বর্গগত বন্ধুদ্বয়ের আত্মার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গত ১৯৩৪ সনের এই উৎসবের আনন্দ স্মরণ করিয়া আজ প্রাণ শোকে আচ্ছন্ন হইতেছে। আমাদিগের পরম স্নেহাস্পদ নীতিবিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার দাস ঐ বৎসরে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া, সেদিন সভায় কি উৎসাহ ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন! সেই পরদুঃখকাতর প্রাণের আবেদনে বিহারের ভূমিকম্প-নিপীড়িত ভ্রাতা ভগ্নীগণের জন্য সেদিন সমবেত সকল নরনারী, বালকবালিকা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন; আজও সে ছবি চক্ষে ভাসিতেছে। গত বৎসরেও (১৯৩৫) তাঁহার সহায়-তায় এই উৎসবের কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছিল। ভগবানের রহস্যময় বিধান! অসময়ে সেই অক্লান্তকর্ম্মা প্রেম-আনন্দময় জীবনের অবসান হইল! তাঁহার অকাল তিরোধানে আমাদিগের নীতিবিদ্যালয়, আমাদিগের মণ্ডলী, দেশ একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারাইল। এ ক্ষতি, এ আঘাত যাঁহার হাতের দান, তাঁহারই হাতে আমরা সকল ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলি, তাঁহারই ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে, মণ্ডলীর জীবনে, জাতির জীবনে।

আয় ও ব্যয়।

(১৯৩৫ সনের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

আয় ঃ—

১৯৩৪ সনের হস্তেস্থিত ২২৯।৴৹, সমস্ত বৎসরে মাসিক চাঁদা ১৯৩।৹, এককালীন দান ৬৮৲, বালিকাদিগের নিকট বাসের ভাড়া হিসাবে ১১০৸৹, উদ্যানসম্মিলনের জন্য সংগৃহীত ৩৪॥৹, পারিতোষিকবিতরণ-সভার ফুলের জন্য প্রাপ্ত ৪৲। মোট আয় ৬৪০৴৹ আনা।

ব্যয় ঃ—

দ্বারবানের মাহিয়ানা ৫৬৲, দ্বারবানের বাসের ভাড়া ২॥৴৹, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়কে (বাসের ভাড়া হিসাবে) ২৭৫৶৫, গাড়ী ভাড়া ৩॥৴৹, ভৃত্যদিগের বক্‌শিশ ১০॥৹, ছাপা খরচ ১১।১০, ডাক খরচ ৮৸৴৹, পারিতোষিকবিতরণসভার জন্য হলের ভাড়া ২০৲, ঐ দিনে বৈদ্যুতিক আলোর খরচ ৩৲, পারিতোষিক ৫৯৸১৫, ঐ দিনে ফুল ৬৴৹, ঐ দিনে খুচরা খরচ ১৲; ডিসেম্বরে উদ্যানসম্মিলনীর খরচ ৪৩৲ টাকা। মোট খরচ ৪৮১।৴১০।

মোট আয়	৬৪০৴৹
মোট ব্যয়	৪৮১।৴১০
হস্তে স্থিত—	১৫৮॥৶১০

শ্রীশকুন্তলা দেবী
সম্পাদিকা।

"মাতৃদেবী"

(১৫ই মার্চ্চ, চট্টগ্রামে প্রসাদভবনে শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমান্ চিদানন্দ গুপ্ত কর্ত্তৃক পঠিত)

আজ উনিশ দিন হইল, আমাদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী অমরলোকে বাবার সহিত মিলিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ পূর্ণ হইয়া ৮৪ বৎসর চলিতেছিল।

মার নাম শ্রীযুক্তা ব্রহ্মময়ী গুপ্ত। তাঁহার পিতার নাম ৺কালিদাস সেন, তাঁহার মাতার নাম ৺সিদ্ধেশ্বরী সেন। মা সম্ভ্রান্ত "উচলী" বৈদ্যবংশীয়া ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত "কাঁচাদিয়া" গ্রামে। "কীর্ত্তি-নাশা" বিক্রমপুরের অনেক কীর্ত্তি, গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস করিয়াছে। মার ৮।৯ বৎসর বয়সের সময় "কাঁচাদিয়া"ও পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। মার বাবারা দুই ভাই ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম কালীকুমার সেন। মারা তিন ভাই ও দুই ভগ্নী। অন্য ভাই ভগ্নীরা সকলে বহু বৎসর হইল অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র মাই এতদিন জীবিতা ছিলেন। তেলিরবাগের সুপ্রসিদ্ধ দাশেরা তাঁহার মাতুলবংশ। মার পাঁচ মামা। মার বড় মামা ৺জগবন্ধু দাশ মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়াতে (বর্ত্তমান রাজসাহী) উকীল ছিলেন। দাদামহাশয় জগবন্ধু দাশ মহাশয়ের মোহরের ছিলেন। মা রামপুর বোয়ালিয়াতেই জন্ম গ্রহণ করেন।

"দেশবন্ধু" চিত্তরঞ্জনের পিতা ৺ভুবমোহন দাশ মহাশয় মার চতুর্থ মামা কালীশ্বর দাশ মহাশয়ের ঔরসজাত পুত্র ও বড়মামা জগবন্ধু দাশ মহাশয়ের পোষ্যপুত্র। জগবন্ধু দাশ মহাশয় আমাদের ঠাকুরমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাবা বাল্যকালে "তেলিরবাগে" তাঁহার মাসীর বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। সেখানে মার সঙ্গে অনেক সময়ে খেলা ধূলা ও খাওয়া দাওয়া করিতেন। মার সহিত বাবার বিবাহের সম্বন্ধ আমাদের আউটসাহীর জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা ৺হরমোহন গুপ্ত মহাশয় করেন। মার চৌদ্দ বৎসর ও বাবার উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় বাবার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বাবা তখন মাসিক ২০৲ বেতনে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে চাকুরী করিতেন। মা প্রথম দাদাকে (যোগেন্দ্রমোহনকে) এক বৎসরের লইয়া চট্টগ্রামে আসেন ও মাঝে মাঝে দেশে যাইতেন। পরে আমাদের ৺চিন্ময় দাদাকে দুই মাসের লইয়া বাং ১২৯১ সনের কার্ত্তিক মাসে চট্টগ্রামে শেষবার আসেন। সেই হইতেই তিনি আর দেশে যান নাই। বরাবর চট্টগ্রামেই ছিলেন। মা খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি ও জ্ঞাতি ভাই ৺কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মাতৃদেবীই আমাদের বংশের সেই সময়ের বৌদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন।

তিনি খুব মিতব্যয়ী, কর্ম্মঠ এবং গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার আগমনের পর হইতেই বাবার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ সচ্ছলতর হইতে থাকে। এইজন্য ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায় বাবাকে মার মুখরা প্রকৃতির জন্য কোনরূপ তিরস্কার না করিতে অনুরোধ করিয়া যান। বলিয়া যান—"আমার বৌ রাগী হইলেও খুব লক্ষ্মী, তাহাকে কিছু বলিস্ না। সে আসার পর হইতেই আমাদের সংসারের উন্নতি হইতেছে।" মা কোনরূপ দুর্নীতি দেখিতে ও সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং দুর্নীতি-পরায়ণ লোকদের খুব ঘৃণা করিতেন। তাহারাও তাঁহাকে যমের মত ডরাইত। দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের উপর তাঁহার এত আক্রোশ ছিল যে, আমাদের একজন আত্মীয়ের পানদোষ ছিল বলিয়া, তিনি সে নাম মুখেও আনিতেন না এবং আত্মীয়দের কাহারও ঐ নাম থাকিলে, তিনি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নামে ডাকিতেন। তিনি খুব স্পষ্টবক্তা ছিলেন ও যাহাকে যাহা বলিবার তাহার মুখের উপরই বলিতেন। তাঁহার এই স্বভাবের জন্য অনেকেই, এমন কি আমরা সন্তানেরাও তাঁহার উপর অনেক সময় বিরক্ত হইতাম ও রাগ করিতাম। লোকদের অপ্রিয় কথা বলিলেও তাহাদের প্রতি মার কখনও বাৎসল্য ও স্নেহের অভাব দেখা যাইত না। তিনি কখনও জিনিষ পত্রের অপচয় ও বিলাসিতা পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই সামান্য বসন ভূষণে সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি খুব স্নেহপরায়ণা ছিলেন। সন্তানদের প্রতি, আত্মীয়দের প্রতি ও প্রিয়জনদের প্রতি তাঁহার খুব বাৎসল্য ভাব ছিল। বাবার কয়েকজন ছাত্র আমাদের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তাঁহারা ও আরও অনেকে মার কাছে থাকিয়া মানুষ হইয়াছেন। বাবার স্কুলের ও কলেজের অনেক ছাত্র আমাদের মাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন, এবং নিজেদের মার মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই স্বহস্তে নিজ কাজ করিতেন। পরের হাতের কাজ পছন্দ করিতেন না, তাঁহার এই গর্ব্ব ও তেজ তিনি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রাত্রির শেষ আহারও নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাইয়াছিলেন। তিনি উনিশটি সন্তানের জননী হইয়াও শেষ দিন পর্য্যন্ত যেরূপ সুস্থ সবল দেহের, পরিশ্রমশীলতার এবং বিশ্রামবিমুখতার পরিচয় দিয়াছেন, এত বয়সে তাহা কাহারও পক্ষে সম্ভব কিনা জানিনা। শেষদিনও নিজহস্তে রান্না-বান্না, খাওয়াদাওয়া, বাসনমাজা, নিজ বিছানাপাতা, বাবার সমাধি পরিষ্কার করা ও তথায় উপাসনা করা প্রভৃতি যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ নিজ হস্তে করিয়াছিলেন। বাবা ইং ১৯২১ সালে ৪ঠা নবেম্বর পরলোক গমন করেন। মা এই চতুর্দ্দশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বৈধব্যব্রত কঠোর নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনে কত শোকতাপ, বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন; তবুও পিতৃদেবের সমাধিতে বসিয়া উপাসনা করা ও সমাধিমন্দির পরিষ্কার করা একদিনের তরেও বাদ যায়

নাই। মাঝে দুই একবার যখন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন ও অন্যত্র গিয়াছিলেন, মাত্র তখন বাদ গিয়াছে। বাবার ব্রাহ্ম হওয়ার পরে সমস্ত নির্য্যাতন তিনি বাবার সহিত নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন, কোনরূপ উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই।

আমাদের পূজনীয়া বৌঠানের—তাঁহার "প্রাণের বৌর" যখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার হরিঠাকুরের নিকট আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন তাঁহাকে আর কলঙ্ক না দেন, বৌঠানের পূর্ব্বে যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। ভগবান্ তাঁহার আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। যাঁহার জীবনের আশঙ্কায় আমরা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত আছি, তাঁহার পূর্ব্বেই মা আর নূতন কলঙ্কের ডালি না লইয়া, হঠাৎ সকলকে ফাঁকি দিয়া, তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীর উর্দ্ধকালের প্রিয়সখার আহ্বানে, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিতে বলিতে অমরলোকে চলিয়া গেলেন। দাদার বড় ছেলে শ্রীমান্ দেবপ্রসাদ তাঁহার খুব আদরের ছিল। তাহার মৃত্যুর পর হইতেই তিনি অমরলোকে যাইবার জন্য খুব আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

মার অসুখ বিসুখ খুব কমই হইত, বিশেষ ভাবে বাবার মৃত্যুর পরে তাঁহার তেমন কোন অসুখাদি হয় নাই। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাকালে খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় দাদার ছোট ছেলে "ছোটকন্" বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে জানিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার টাকা পয়সা কাহাকে কি দিতে হইবে বলিলেন * এবং বৌঠানকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার তৈজস পত্রাদি সম্বন্ধেও বলিয়া গেলেন। এইরূপে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় জিনিষ পত্রাদির আপন ইচ্ছামত বিলি ব্যবস্থা করিয়া, পার্থিব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অমরলোকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারপর বৌঠান ও প্রফুল্লদিদিকে বলিলেন, "এতদিন পরে তিনি তালাব করছেন। আজ আর রাত্রি পোহাইব না।" বৌঠানকে বলিলেন, "মা, তুই আমার কাছে থাক"। আর কোন কথা বলিলেন না। ডাক্তার আসিয়া ইন্‌জেকসন ও ঔষধাদি দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একবার বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" কয়েকবার জল চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সজ্ঞানে শান্ত সমাহিতচিত্তে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে তাঁর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। জীবনে মরণে তিনি যে বাবার চিরসঙ্গিনী ছিলেন, মৃত্যুকালেও তাহার আশ্চর্য্য প্রমাণ দিয়া গেলেন। জীবনে যেমন তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন, পরপারে যাইবার সময়েও যেন তাঁহারই হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন, এবং আত্মিক মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া সকলের প্রাণেও আশা ও আনন্দের বার্ত্তা প্রচার করিয়া গেলেন।

"ডেকেছেন প্রিয়তম", "থাকব না আর এ পাপরাজ্যে", "ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ", "কেন তোমায় ভুলি দয়াময়", "দয়াময়ী মাগো আমার, এসে লও গো দীনের পূজা উপহার", "হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হল", এই গান কয়টি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। ৩।৪ বৎসর যাবৎ উপাসনাতে তিনি সর্ব্বদাই ইহলোকস্থ সন্তানগণের ও প্রিয়জনদের এবং পরলোকস্থ প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের মঙ্গল কামনা করিতেন। বছর তিনেক তিনি উপাসনার সময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহাকে শীঘ্র পৃথিবী হইতে লইয়া যান। বাবার কথা বলিয়া বলিতেন, "গৃহের কর্ত্তা, তুমি চলিয়া গেলে আমাকে আর কতদিন কারাগারে রাখিবে, আমাকেও লইয়া যাও।" ভগবান বিশ্বাসীর প্রার্থনা এতদিন পর পূর্ণ করিলেন; আর কোন প্রিয়জন যেন তাঁহার আগে না যায়, ভগবান তাঁহার এই প্রার্থনাও পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের দুই দিন উপর্যুপরি দাদার বড় মেয়ে শ্রীমতী মাধুরীর কনিষ্ঠা ও দ্বিতীয়া কন্যা মারা যায়। সৌভাগ্যক্রমে সেই খবর মার মৃত্যুর পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বিজয়শ্রীর জাপান হইতে প্রেরিত প্রার্থনা :—

স্বর্গের দেবতা, তুমি আমাদের মাতৃদেবীকে পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্ট হতে মুক্ত করে তোমার কাছে নিয়ে গেলে। কত সময়ে অবুঝের মত আমরা তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি। আজ তুমি তাঁকে এই সকল কষ্ট হতে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে অশেষ সুখ শান্তি দিচ্ছ। তাঁহার জীবিত অবস্থায় আমরা তাঁকে কোনদিন উপযুক্ত সন্তানরূপে শ্রদ্ধা করি নাই এবং তাঁর আদর যত্নের মর্য্যাদা করতে অনেক ত্রুটি করেছি। আজ তাঁর অবর্ত্তমানে এই সব কথা আমাদের মনে পড়ছে। যদিও বা আমরা এখন অনেক-বয়স্ক, তবুও মার অভাব এখন অনেক বেশী উপলব্ধি করছি। তুমি আমাদের মাতৃদেবীকে তাঁর পার্থিব সকল অভাব হতে মুক্ত করে, আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের সঙ্গে ও স্বর্গস্থ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত কর। তাঁদের সকলের আশীর্ব্বাদ আজ আমাদের প্রত্যেকের মস্তকে বর্ষিত হউক। পিতৃমাতৃহীন হয়েও আমরা সকল সময়ে যেন তাঁদের সঙ্গে আত্মিকভাবে সংযুক্ত থাকতে পারি, তুমি তার উপায় করে দাও এবং সর্ব্বোপরি তোমার শুভ ইচ্ছা আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হউক। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* মা মৃত্যুর ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে তাঁহার পোষ্ট আফিস সেভিং ব্যাঙ্কের টাকা নিম্নলিখিত রূপে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়া গিয়াছেন :—

ছুটকীর মেয়েরা ১৫০৲, ছুটকী ৫০৲, টুনটুন ৫০৲, ছোটকন ৫০৲, বড়দিদি ২৫৲, সুশোভন ২৫৲, মন্টুর ছেলে ২৫৲, দিদির মেয়ে ২৫৲, বৌঠান ২৫৲, বঙ্ক ২৫৲ টাকা।

মাঘোৎসবের কার্য্যবিবরণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২ই মাঘ, নববিধান-ঘোষণার দিন। ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব হয়। যথারীতি প্রাতঃকাল ৭॥টা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ৮॥টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য পবিত্র আত্মার পরিচালনায় সম্পাদন করেন। উদ্বোধন ও আরাধনায় নববিধানের নবশিশু-জন্মলাভের ভাব প্রত্যেক স্বরূপে স্বরূপে উপলব্ধ হয়। সাধারণ প্রার্থনান্তে সমগ্র জগতের দেশে দেশে এবং জাতি ও জীবনে যে অশান্তি অকল্যাণ এবং দ্বেষ হিংসা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা, যাহাতে জগতের দুর্গতি হইতেছে এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে যে ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্নতা ও বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে, তাহা স্মরণ করিয়া সদ্ভাব ও শান্তিসংস্থাপনের জন্য এবং নববিধানের মহামিলনরাজ্য আনয়নের জন্য আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করা হয়। আচার্য্যদেবের নবশিশু-জন্মবিষয়ক গভীর সারগর্ভ উপদেশটী পঠিত হয় এবং সেই ভাবের অনুসরণে প্রার্থনা ও শান্তিবাচন করা হয়। মধ্যাহ্নে নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ে প্রীতিভোজন হয়। ৩টার পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, পরে পাঠ এবং আলোচনা হয়। ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস পাঠ করেন। ভাই প্রিয়নাথ, ভাই গোপালচন্দ্র, ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। ভাই চন্দ্রমোহন ধ্যানের উদ্বোধন করেন ও পরে ধ্যান হয়, তাহার পর জমাট কীর্ত্তন হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ সন্ধ্যায় উপাসনা করেন। প্রাতঃকালে আচার্য্যদেবের উপদেশে যে নব শিশুর জন্মের তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া এ বেলার উপাসনা, আরাধনা, উপদেশ ও প্রার্থনাদি সম্পাদিত হয়।

১৩ই মাঘ, নগরকীর্ত্তনের দিন প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ ভাবে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনার মর্ম্ম,— যাহা শুনেছি গোপনে, বলব বাজায়ে ভেরী। যাহা আমরা এবারকার মহোৎসবে লাভ করিলাম, তাহা প্রকাশ্যে আজ ঘোষণার দিন, সাক্ষ্য দেবার দিন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একবার কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে আহার করিয়া উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন, আমি কেশব সেনের বাড়ী খেয়েছি, আমার জাত গিয়েছে; তেমনি যদি আমরা লোককে ডাকিয়া বলিতে পারি, মা আমাদের, আমরা মায়ের হয়ে গেছি, আমরা নবশিশু-দল হয়েছি, আমরা কেশব সেনের দল হয়েছি, তোদের যা বলতে হয় বল, আমরা নববিধানের পাগল। এই ভাবে যদি আমরা সাক্ষ্য দান করতে পারি, তবেই আমরা ধন্য হব। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। আচার্য্যপুত্র সরলচন্দ্র সেন "নবসুরাদান" বিষয়ক আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাই চন্দ্রমোহনও প্রার্থনা করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তনের দল ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া, ঝামাপুকুর, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আসিলে, কেহ কেহ সেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগের সাদর আহ্বানে মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ জমাট কীর্ত্তন হয়। এবার আমাদের অনেকগুলি ভগ্নীও কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রগামিনী হইয়া সমস্ত পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীগণও সেই মন্দির হইতে আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ করেন। কীর্ত্তনের দল পরে স্যার কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, সুখিয়া ষ্ট্রীট, রামমোহন রায় রোড, দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, গড়পাড় রোড, অপার সার্কুলার রোড প্রভৃতি রাস্তা ভ্রমণ করিয়া কমলকুটীরে উপনীত হন এবং আচার্য্যদেব ও আচার্য্যপত্নীর সমাধি ঘিরিয়া কীর্ত্তন করেন। তাহার পর নবদেবালয়ের রকের উপর যে কীর্ত্তন হইল, তাহাতে ঠিক যেন উপলব্ধ হইল, নববিধানাচার্য্য সঙ্গীতাচার্য্যসহ সভাই সদলে আত্মিক ভাবে অবতীর্ণ হইয়া কীর্ত্তনকে এত জমাট করিয়া তুলিলেন। তিনি যে শেষ প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, "আমার বড় সাধ, ঐ রোয়াকে আমি ভক্ত-সঙ্গে নাচি। এ স্থান ছাড়িয়া আমি আর কোথায় যাব।" এই কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইল। সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শান্তিকুটীরে আনন্দ-ভোজন হয়। (ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

দীক্ষা—গত ২২শে মার্চ্চ, পুরী নবপর্ণকুটীরে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে সমাগত, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত এস, শঙ্করনারায়ণ নবসংহিতানুসারে নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুক্ত এ, গোপাল স্বামী নায়ডু যুবাকে উপস্থিত করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ ইংরাজীতে উপাসনা করিয়া দীক্ষা দান করেন। সেবিকা হেমন্তকুমারী ও শ্রীযুক্ত গোপাল স্বামী পুস্তক ও আসনাদি দান করিয়া দীক্ষার্থীকে আশীর্ব্বাদ করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৫ই মার্চ্চ, পূর্ব্বাহ্নে, ৩৬নং হ্যারিশন রোড গৃহে, ডাঃ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন দাসের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নামোহন দাসের হাইকোর্টে ওকালতি কার্য্যের আরম্ভ উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। পিতা ডাক্তার জে, এম, দাস লিখিত উপদেশ পাঠান্তে পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ডাঃ দাস প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—১৫ই মার্চ্চ, (২রা চৈত্র), রবিবার, চট্টগ্রামে প্রসাদভবনে, স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুহের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ভবময়ী গুহের আদ্যশ্রাদ্ধ সন্তানগণকর্ত্তৃক নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। যথারীতি পতিদেবতার সমাধিপার্শ্বে সহধর্ম্মিণীর পবিত্র ভস্মস্থাপনের পর উপাসনা আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ

কলিকাতা হইতে তথায় গিয়া উপাসনাদির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে পারলৌকিকতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শ্লোক ও প্রবচনাদি পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন গুপ্ত সরল সুন্দর একটী প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ চিদানন্দ গুপ্ত মাতৃজীবনী পাঠ করেন। তাহা স্থানান্তরে দেওয়া গেল। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত নবসংহিতা হইতে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। স্থানীয় অনেকেই শ্রদ্ধাপূতচিত্তে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া, স্বর্গস্থ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বিশেষ ভাবে সন্তানপ্রতিম শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত প্রাণহরি রক্ষিত প্রার্থনাদি-যোগে স্বর্গস্থ আত্মার সদ্‌গুণাবলি উল্লেখ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দান করেন। অনুষ্ঠানটী অতীব গাম্ভীর্য্যের সহিত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী আশালতা পট্টনায়েক ও ভ্রাতৃগণ নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করিয়াছেন :—

চট্টগ্রাম—নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের সংস্কারের জন্য ১৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, চিত্তরঞ্জন অনাথাশ্রম ২৲, এতিম খানা ২৲, প্রবর্ত্তকসঙ্ঘ ২৲, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ১৲, মূক বধির স্কুল ২৲, Roman Catholic Orphanage ২৲, বৌদ্ধ মন্দির ২৲, চট্টগ্রাম হাসপাতাল ৫৲, পাথরঘাটা বালিকা-বিদ্যালয় ২৲, অর্পণাচরণ বালিকাবিদ্যালয় ২৲; ঢাকা—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, অনাথাশ্রম ২৲; কলিকাতা—নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ ২৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ৪৲, Little Sisters of the poor ৩৲, পুণ্যাশ্রম ২৲ আউটশাহী—বালিকাবিদ্যালয় ৩৲, বাল্যসমিতি ২৲; কলমা—ভাই স্কুল ৩৲, বাসিন্দা প্রজাদের জন্য খাবার ২৲; কক্সবাজার ব্রহ্মমন্দির ২৲, দেওঘর রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম ৪৲, মুঙ্গের নববিধান সমাজ (আশ্রম-নির্ম্মাণার্থ) ২৲, পুরী নববিধান সমাজ ২৲, হাজারিবাগ নববিধান সমাজ ২৲, ভিখারী বিদায় ২০৲ টাকা।

জিনিষ পত্রাদি—আসন ৩খানা, কাপড় ৫জোড়া, করতাল এক জোড়া, কাঁসার গ্লাস ২টী, পাথরের গ্লাস ২টী, গৈরিক চাদর ২খানা, ভোজ্য ৬টী।

অদ্য এই উপলক্ষে কটকে জামাতা লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়েকের গৃহেও উপাসনাদি হয়। অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। কন্যা শ্রীমতী আশালতা পট্টনায়েক প্রার্থনা করেন। ভাইদের সঙ্গে দান ব্যতীত শ্রীমতী আশালতা কটক ব্রহ্মমন্দিরে ঘড়ীর জন্য ১২৲ টাকা দান করিয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ অনেকেই যোগদান করেন।

শোকে সান্ত্বনা—বিদেশে প্রবাসে বিশ্বাসী পরিবার লইয়া লীলাময় ভগবান জীবন মরণে যে কত লীলা করেন, তাহা দেখিয়া অবাক হই। ঢাকার ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পুণ্যকমল রায় ফরেষ্ট বিভাগে কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে বোম্বের নিকট বাস করিতেছেন। দুরন্ত বসন্তরোগে গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী উপর্য্যুপরি কনিষ্ঠা কন্যা ও দ্বিতীয়া কন্যা অমরলোকে প্রস্থান করে। আত্মীয়স্বজনবিহীন অবস্থায় এই নিদারুণ শোকে শান্তিদায়িনী জননী ভিন্ন কে সান্ত্বনা দিতে পারে? তাঁহারই আশ্চর্য্য করুণা-গুণে এই দারুণ শোকের সান্ত্বনারূপে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মাধুরী গত ১৬ই মার্চ্চ প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। জনমে মরণে এইরূপে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণ তাঁহারই চরণে প্রণত হই।

শোক-সংবাদ—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, স্বর্গগত শাস্ত্রসাধক ঋষি কেদারনাথ দের পৌত্র, স্বর্গগত মনোগতধন দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুহাস ১২।১৩ বৎসর বয়সে, পাটনায় ছোট পিসী মা, উচ্চ ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপাল কুমারী বনলতা দের গৃহে, ৫৫দিন টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া, গত ২৪শে মার্চ্চ, সকল রোগ-যন্ত্রণার অতীত চির আরামের স্থান পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছে। ওখানে ছোট পিসীমার কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। ছোট পিসীমাও পিতৃহীন সন্তানের সকল ভার গ্রহণ করিয়া সন্তানসম আদরে যত্নে প্রতিপালন করিতেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর মনের সৌন্দর্য্য বেশ বিকশিত হইয়া সকলেরই মনে আশা ও আনন্দ দিতেছিল। হঠাৎ বিধাতার এ বিধান কেন, হাসায়ে কাঁদালেন কেন, সন্তানের উপর দুঃখিনী মায়ের সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল করিলেন কেন, তিনিই জানেন। চিরমঙ্গলময় তিনি, যা করেন, তাই ভাল। তিনিই এখন সকল শোকদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই মার্চ্চ, পাটনায়, শ্রীমতী বনলতা দের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গগত শাস্ত্রসাধক ঋষি কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। সেবিকা হেমলতা প্রার্থনা করেন এবং তিনি কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, পাটনার ঋষি কেদারনাথ ধর্ম্মগ্রন্থাগারে ২৲ এবং Homeo Charity Fundএ ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২২শে মার্চ্চ, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, আর্টপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখার্জির সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার দত্ত উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নরেন্দ্রবাবু নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲, অনাথাশ্রমে ৫৲ ও অন্ধস্কুলে ৫৲ এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায় প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন—গত ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে, সাম্বৎসরিক সংবাদের শেষ সংবাদে, পঞ্চবিংশ পংক্তিতে "স্বর্গীয়া সুমতি দেবীর" পরিবর্ত্তে "স্বর্গীয়া সুখময়ী দেবী" হইবে। আমরা এ ভুলের জন্য দুঃখিত।

Edited on behalf of the Apostolic Durbes New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ৭ম সংখ্যা } ১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 14th. April, 1936. } অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, জীবন্ত জাগ্রত সত্যস্বরূপিণী তুমি। চিন্ময় রূপ ধারণ করিয়া মানবের মানস-গোচর হইয়াছ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে তোমার পূর্ণ দর্শনলাভ মানবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলিয়া এক প্রকার সিদ্ধান্তই হইয়াছিল। ক্বচিৎ কোন এক আধ জন যোগী ঋষি অনেক কষ্টে সাধ্য সাধনা করিয়া তোমার দর্শন পাইয়াছিলেন। কিম্বা যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ তোমার সঙ্গে দেখাশুনা করিয়াছিলেন। সাধারণ মানবের পক্ষে তুমি চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় বা "অবাঙ্‌মনসগোচর"ই ছিলে। তাই তোমার দর্শন বা তোমার পূজা কি কঠোর, কি বিকৃত, কি অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধনা-সাধ্য, কল্পনা-বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। হায়, তাই ধর্ম্মের সঙ্গে কতই অধর্ম্ম, কতই সত্য মিথ্যা বিজড়িত হইয়া, ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত ভেজাল মিশাল এক কিম্ভূত কিমাকার বস্তু করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মের এই গ্লানি দেখিয়া, মা, তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরথের সারথি হইয়া, পবিত্রাত্মাজাত ভক্তবাহনে তোমার পূর্ণ ধর্ম্মবিধান নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছ। তোমার সোণার ধর্ম্ম, খাঁটী ধর্ম্ম মানুষের হাতে পড়িয়া মলিন হইল দেখিয়া, তুমি স্বহস্তে তাহা বিধানের ও প্রবর্ত্তনের ভার লইয়াছ। তোমার দর্শন, তোমার বাণী-শ্রবণ, তোমার ধর্ম্মসাধন সহজ শিশু-সুলভ করিয়াছ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের আসল সার সত্য বজায় রাখিয়া, মানুষ তাহার ভিতর সে সব কল্পিত মত ও সাধ্য সাধনানুষ্ঠান চালাইয়া বিকৃত করিয়াছে, তাহা সমুদয় তুমি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দিয়া, সর্ব্বজন-সুলভ অতি সহজ নিখুঁত খাটি সত্য বিধান আনিয়াছ। টাটকা মাতৃ-স্তন্যে যেমন বাহিরের হাওয়া বা কুটামাটিও লাগিতে পারে না এবং তাহাতেই শিশুর পূর্ণ পরিপুষ্টি হয়, কোন প্রকার রোগের বীজাণু তার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি তেমনি আমাদের জন্য পূর্ণ ধর্ম্মবিধান আনিয়াছ। ইহা সেবনে, ইহা সাধনে সর্ব্বমানবশিশুর পূর্ণ মানবত্বের পুষ্টি লাভ হইবে। তবে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই বিধান জগতে জয়যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বমানব সঙ্গে পূর্ণ বিধানবিশ্বাসী মানুষ হইতে পারি, নিজ গুণে আমাদের জীবনকে এমন করিয়া গঠিত কর।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

—০—

মানুষ চাই, মানবত্ব চাই।

মানুষ চাই; নববিধান মনুষ্যত্ব-গঠনের বিধান। প্রকৃত মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেই নববিধান বিশেষ ভাবে প্রেরিত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহাতে দেবত্বেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মানবত্বের জন্য তাহাতে নিম্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নববিধান এই জন্য নববিধান—মানুষ যাহাতে প্রকৃত মানুষ হয়, বা পরিবর্ত্তিত নূতন মানুষ হয়, মানুষ মানুষ বলিয়া আদৃত হয় এবং সম্মানিত হয়, তাহারই জন্য নববিধান। প্রত্যেক মানুষ আত্মা এবং দেহে বিজড়িত। আত্মা পরমাত্মা হইতে জাত, দেহ তাঁহার ইচ্ছায় গঠিত। মানুষ এই দুই ধাতুতে নির্ম্মিত; তাই মানুষের আত্মাই প্রকৃত মানুষ এবং দেহটা নশ্বর ও ক্ষণিক বলিয়া, ইহাকে ছায়া মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মে চেষ্টা হইয়াছে।

প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দেখা যায়, কতই কল্পনা জল্পনা, কতই মিথ্যা সংস্কার ও সিদ্ধান্ত তাহাতে নিহিত বা প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যাহা হউক, মানুষের আত্মা যেমন পরমাত্মা-জাত, তেমনি দেহও পশুপ্রকৃতি-বিশিষ্ট। তাই যে সকল মানুষ আত্মিক জীবনে কিছু পরিমাণে সমুন্নত, তাঁহাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে দেবত্ব আরোপ করিয়া, ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ ব্যস্ত হইয়াছে। এবং তাঁহাদিগকে অলৌকিক অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া এতই বাড়ান হইয়াছে যে, তাঁদের সে উচ্চ জীবন লাভ করা মানবের সাধ্যাতীত; কাজেই তারা আপনাদিগকে দীনহীন এবং নীচপ্রকৃতি করিতে গিয়া, যেন মানবত্ববিহীন করিতেই প্রলুব্ধ হইয়াছে।

সত্যই প্রাচীন ধর্ম্ম সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত; হয় দেবতা, নয় রিপু-পরতন্ত্র পশুপ্রকৃতি-সম্পন্ন জীব। ধর্ম্মের প্রভাবে মানুষ এই পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের ভ্রান্ত সংস্কার এই জন্য যেন মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব উচ্ছেদ করিয়া, মানবত্বের মহিমা বিনাশ করিয়াছে।

প্রাচীন ধর্ম্মের ভিতর মনুষ্যত্বের মহিমা যে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু সে সকল কথা কার্য্যতঃ যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে, মনুষ্য-সমাজের ভ্রান্ত সংস্কার তাহা ভুলাইয়া দিয়াছে।

এমন কি, যে বাইবেলে "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমারূপে গঠিত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে বাইবেলে শ্রীঈশা নিজকে যেমন ঈশ্বর-তনয়, তেমনি মানবসন্তান বলিয়া পরিচয় দিলেন, সেই ধর্ম্মেও শ্রীঈশাকে ঈশ্বর-সন্তান বা ঈশ্বরাবতার বলিয়াই তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার আদর্শ মানবের পক্ষে অনুসরণের অতীত ভাবিয়া, তাঁর ধর্ম্ম সংসারী লোকের জন্য নয়, ইহাও বলা হইতেছে। এই সংস্কারে সে ধর্ম্মের নামেও কত রক্তপাত, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত পশুত্বের ভিতরে মানুষ পতিত হইতেছে; কতই মিথ্যা সংস্কার, কতই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, কতই কাল্পনিক মত খৃষ্ট ধর্ম্মের ভিতরও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম, বেদবেদান্তের ধর্ম্ম কত উচ্চ তত্ত্বই না প্রচার করিয়াছে। কথায় কথায় আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য, স্বামী, সাধু, ফকির, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কত উচ্চ শাস্ত্রই না উচ্চারণ করেন, ব্যাখ্যান করেন; কিন্তু জীবনে কার্য্যে কি দেখা যায়? ধর্ম্ম যেখানে, স্বয়ং ঈশ্বর সেখানে, এই সংস্কারে ধর্ম্মজীবনে যিনি সঞ্জীবিত, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কে, এই বলিয়া সংসারী ব্যক্তি ধর্ম্মকে অসাধ্য মনে করিয়া, যাহা খুসী মিথ্যা প্রবঞ্চনাও করিতে পারে, ইহা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিধির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আর ধর্ম্মটা যেন বাহিরের লোক দেখান বা ব্যবসায়ের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্ববিধধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্প বিস্তর এইভাব সঞ্চারিত; এইজন্য ধর্ম্মবিশ্বাসও মানব মন হইতে তিরোহিত হইতেছে। এবং ধর্ম্মবিহীন হইলে মানুষের যাহা হয়, মানুষ তাহাই হইয়া দাঁড়াইতেছে। পশুপ্রকৃতির প্রাধান্যই মানুষের মনুষ্যত্ব হইয়া পড়িয়াছে। যে যত পরশ্রীকাতর, নরঘাতক, সেই তত বীর; যে যত প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, সে তত মর্য্যাদা-সম্পন্ন; যে যত জ্ঞান ধর্ম্মের অবমাননা জীবনে চরিত্রে করিতে পারে, সেই তত মহা বড় লোক বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

মনুষ্যসমাজের এই হীনতা, ধর্ম্মের এই মহা গ্লানি নিবারণ করিবার জন্যই, বিধাতা বর্ত্তমান যুগে নববিধান আনয়ন করিয়াছেন। সহজ নিখুঁত খাঁটী স্বাভাবিক ভাবের সরল চরিত্র এবং মানবের প্রকৃত মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই বিধানের সাধন ও জীবন।

নববিধান-বিধাতা যাঁহাকে দিয়া এই বিধান প্রবর্ত্তন করিলেন, তাঁহাকে কেবল মানুষ করিয়া গড়িলেন এবং তিনিও নিজকে পাপী মানুষ বলিয়া পরিচয় দিলেন। মানুষ হইয়া, কেমন করিয়া পশু প্রকৃতি দমন করিয়া, দ্বিজত্ব বা পরিবর্ত্তিত মানবত্ব লাভ করা যায়, তাহাই তিনি জীবন দ্বারা দেখাইলেন। বলিলেন, "আমি সাধু হইতে চাই না; নারকী কেমন করিয়া উদ্ধার হয়, ইহাই দেখাইতে ও আশা দিতে চাই।"

বাস্তবিক 'মানুষ' কেমনে মানুষ হয়, তাহারই জন্য ধর্ম্মবিধান। সত্য যাহা, তাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যদি সত্যচ্যুত হয়, তাহার শক্তি থাকে না; আগুনের যদি দাহিকা শক্তি না থাকে, সে আগুনের অগ্নিত্ব কোথায়? ধর্ম্মের ভিতর তাই অধর্ম বা মিথ্যা প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে ধর্ম্মের তেজ চলিয়া গিয়াছে। চরিত্রেই প্রকৃত ধর্ম্ম, জীবন্ত ঈশ্বরে সত্য বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

ঈশ্বর যিনি, তিনিই ঈশ্বর। যাই ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে বা মানবে আরোপিত করা হইল, অমনি মিথ্যা হইল। তেমনি বেদবাণী, ধর্ম্মশাস্ত্র যাই কেবল মুখের বচন মাত্র হইল, কার্য্যত তাহা জীবনের সাধনের বিষয় না হইল, অমনি তাহা মিথ্যা বাক্য মাত্র হইল; তাহা যাই কেবল বাহিরের বিধি অনুষ্ঠান বা বুদ্ধিমিশ্রিত মতে নিবদ্ধ হইল, অমনি ধর্ম্ম উড়িয়া গেল। তাই ধর্ম্মের প্রকৃত সহজ সাধন প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সত্য ধর্ম্ম, সত্য বিধাতার বিধান।

বর্ত্তমান যুগে তাই বিধাতা স্বয়ং এই সহজ স্বাভাবিক সত্য ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনিই আমাদের এই প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদিগকে জন্ম দিয়া বাঁচাইতেছেন। আমরা যে পরমাত্মারই সন্তান, এই আত্মজ্ঞান তিনি দেন। এই জীবন আমাদের জীবনবেদ, তিনি নিজে বিবেকবাণী বলিয়া আমাদের শিক্ষা দেন। তিনিই নিত্য নব নব ভাবে আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। মা হইয়া প্রেম সহকারে আমাদিগকে মানুষ করিতেছেন। একমাত্র অদ্বিতীয় প্রাণেশ্বর হইয়া ন্যায়দণ্ড দিতেছেন ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং পাপ-তাপ-মুক্ত করিয়া যাহাতে আমরা সুখী হইয়া তাঁহাকে সুখী করি, এমনই সহজে আমাদের জীবনের সঙ্গে ঈশ্বর গাঁথা হইয়া রহিয়াছেন। শিশু যেমন কাঁদিলে মা তাহার অভাব বুঝিয়া, যা কিছু প্রয়োজন দেন এবং কান্না দ্বারাই সে পুষ্টিলাভ করে, তেমনিই তিনি আমাদিগকে সহজে স্বয়ং পুষ্টি বিধান করিতেছেন। মানবের ধর্ম্মসাধন মানবের হাতে নয়, স্বয়ং বিধাতার হাতে, এই সহজ বিশ্বাসে আমরা সকল পাপ হইতে মুক্ত, পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত মানবত্ব লাভ করিব, ইহাই শিক্ষা দিতে এই নববিধান। এবং এইজন্য নববিধানের নূতন মানুষ প্রেরিত। আমরা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেন মানুষ হই, নববিধানের মানুষ হই এবং সমগ্র বিশ্বমানবের সঙ্গে এক হইয়া মানবত্বের গৌরব রক্ষা করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব

একমেবাদ্বিতম্।

ঈশ্বর একমেবাদ্বিতম্। আমরা যদি তাঁহাকে চাই বা তাঁহার হইতে চাই, আমরা যদি তাঁহাকে ছাড়া আর দ্বিতীয় কাহারও কাছে যাই, তাঁহাকে পাই না। এই জন্য তাঁহাকে চাহিলে কেবল তাঁহাকেই চাহিতে হয়। আবার যদি তাঁহা ছাড়া আর কোন বস্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয় বা মনেও আর অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহাকে পাইনা। তাঁহাকে ছাড়িয়া আর যাহাই কিছু পাই না—ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, বিদ্যা, এমন কি ধর্ম্মপদ, তাহাও কিছুই নয়, তাহাও তাঁহাকে লাভের অন্তরায়। "চাই কেবল এক তোমাকে, চাই না আর অন্য কাকে" পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারিলে তাঁকেই পাই।

ধর্ম্মশক্তি।

ব্রহ্মশক্তি ধর্ম্মশক্তি, এই শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হওয়াই যথার্থ মানুষের বীর্য্য। এই সংসারে আমরা আসিয়াছি, এই বীর্য্য সঞ্চয় করিতে, এই শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন হইতে। একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাদ্বারে দ্বারা আমরা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মতেজ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হই। যত আমরা ব্রহ্মের নিকট বসিয়া তাঁর এক এক স্বরূপের প্রভাব প্রাণে গ্রহণ করি, তত আমরা ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হই। উপাসনা ছাড়িয়া আমরা যখন সংসারের বিষয়-কর্ম্মে বা নানা প্রকার প্রলোভন পরীক্ষায় পড়ি, তত আমাদের সেই শক্তি ব্যয় হয়, ক্ষয় হয়। রেলগাড়ী যেমন যে ষ্টীম জল কয়লা ও অগ্নি-সংযোগে গ্রহণ করে, দৌড়িতে দৌড়িতে তাহা ব্যয় হইয়া যায়, আমাদেরও তেমনি ব্যয় হয়। আবার উপাসনা প্রার্থনা দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইলে, আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি।

এক ঢিলে দুই পাখী।

উপাসনা যখন করি, তখন কেবল মাত্র ব্রহ্মশক্তি লাভ করি। কিন্তু আমরা যখন স্নান করি, তখন যদি স্নানের সঙ্গে অভিষেক-স্নান সাধন করি, এবং আহারের সঙ্গে যদি ভক্তার-ভোজন সাধন করি, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী ধরা যায়। তাহাতে শরীরেরও বল ও পুষ্টি লাভ হয়, আত্মারও শক্তি সঞ্চার হয়। এইরূপ সকল কর্ম্ম করিতে করিতে, তাহার ভিতর যদি একটু প্রার্থনা করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া লইতে পারি, আহার ও ঔষধ দুইই পাওয়া যায়, দুইই লাভ হয়।

—০—

ব্রহ্মদাস মহিমচন্দ্র সেন।

(শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পিতৃদেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল, ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করেন; কিন্তু বিধাতার কৌশলে তাহা ঘটে নাই। ইহাতেও তিনি বিধাতার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ক্রমে দুইবার বিবাহ স্থির করেন। দুইবারই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। একবার বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পাতরাইল গ্রামে রজনী যাপনপূর্ব্বক পত্র লিখিয়া পাঠান এবং পরদিন কেদারপুর হইয়া ঢাকা যান এবং তৎপর কর্ম্মস্থান নোয়াখালীতে যান। ইহা সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাঁহাকে ছাড়েন নাই। তিনি ময়মনসিং বদলী হইলে, তথা হইতে তাঁহাকে বিবাহার্থ বাড়ীতে আনিবার জন্য একটী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে পাঠান; কিন্তু তিনি বাড়ী যান নাই এবং বিবাহ হইবে না, এইরূপ লিখিয়া পাঠান। কিন্তু পিতৃদেব যেমন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহারাও পিতৃদেবের এ নিষেধ কথা শুনেন নাই। পূজার বন্ধের সময় বাড়ী গেলেই বিবাহের উদ্যোগ হইল। তিনি নিষেধ করাতে তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। বাড়ী হইতে কার্য্যস্থলে রওনা হইবার দিন পুনরায় এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। তিনি পরবর্ত্তী অন্য সময়ে আসিয়া এ ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন, এই বাক্যটী শুনিবার জন্য পিতামহী দেবী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কোনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইবে না, ইহাও তাঁহারা জানান। ফলতঃ বিবাহে যজ্ঞ হয় নাই এবং অন্যান্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠানও হয় নাই। মাত্র বাক্যদান ও সাতপাক হইয়াছিল। বিবাহান্তে জ্যেষ্ঠতাত পিতৃদেবকে বলিলেন, "এখন তুমি স্বাধীন ভাবে তোমার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পার"। এ কথা তিনি প্রচার-ব্রত-গ্রহণের অনুকূল পক্ষে গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল পরেই ১৮৮২ সালের শেষ ভাগে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের অনুগামী হইলেন এবং ঢাকায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নববিধান বিঘোষিত হওয়ার সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রকে পূর্ব্ব বঙ্গে নববিধানের প্রেরিতরূপে গ্রহণ করেন। পরম ভক্তিভাজন কৈলাসচন্দ্র নন্দী, ঈশানচন্দ্র সেন, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, দুর্গানাথ রায়, দীননাথ কর্ম্মকার এবং চন্দ্রমোহন দাস তাঁহার সহকারী রূপে গৃহীত হন এবং পূর্ব্ববঙ্গে নববিধান-সংস্থাপনে ব্যবহৃত হইবার জন্য ব্রহ্মানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। পূর্ব্ব বাংলাতে প্রেম-ভক্তি-বিস্তারের জন্য "দাসমণ্ডলী" নামে একটী দল সংস্থাপিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রচারক মহাশয়গণ দাসরূপে ব্যবহৃত হন। এই দল "ঈশ্বর দেখা" দল নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পিতৃদেব এই দলে "বিশ্বাসী" বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই ভগবদ্‌বিশ্বাস পিতৃদেবের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহাকে কখনও নিরাশ হইতে দেখি নাই—নিরাশাসূচক কোন কথা উচ্চারণ করিতে শুনি নাই।

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ;
তবু না ছাড়ে পাশ, তবে করি দাসের দাস।"

এই উক্তির যথার্থতা তাঁহার চরিত্রে প্রমাণিত হইয়াছিল। প্রভুর সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার অভিপ্রায়ে প্রচারকব্রতগ্রহণ, তৎসঙ্গে দারিদ্র্য-ক্লেশ, অসময়ে পত্নী-বিয়োগ, উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের অকাল মৃত্যু ঘটাইয়া ভগবান্ তাঁহার দাসের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিয়াছেন। "কোনও কারণে ব্যস্ত হবে না, ভগবানের উপর নির্ভর কর" এই একটী কথাতে বড়ই শান্তি অনুভব করিয়াছি। পিতৃদেবের সহিষ্ণুতা অসাধারণ ছিল—কেহ তাঁহাকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখে নাই। শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে, মুখে কোন প্রকার আক্ষেপোক্তি শোনা যায় নাই। কেবল গাহিয়াছেন—

"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী,
সকলি মঙ্গল মম যাহা কর তুমি,
ভাবিব না ফলাফল সুখ দুঃখ আমি।"

নিজে অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু পরমত-সহিষ্ণু ছিলেন। প্রত্যেকের মতামত ধৈর্য্যসহকারে শুনিতেন। কখনও কখনও কেহ আসিয়া তাঁহার মতের দোষ ত্রুটি ধরিয়াছেন, তখন তিনি এমন ভাবে উত্তর দিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মনে করিয়াছেন, তিনি তাঁহারই মতের সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যখন তাঁহাকে পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি ঐরূপ মতে সায় দিলেন কিরূপে, তিনি উত্তর দিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি বিষয়টী যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহার দিক দিয়া তিনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। এইরূপ উদার ভাবে তিনি সমস্ত গ্রহণ করিতেন।

জননী যেমন স্নেহে সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন, ঢাকার নববিধানমণ্ডলীকে তেমন করিয়া সুদীর্ঘকাল বুকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষ জীবনে মণ্ডলীর সহিত নববিধানের আদর্শ লইয়া মতভেদ হয় এবং কাহারও কাহারও অশিষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত মনোবেদনা পাইলেও নিরাশ হন নাই। কারণ জিজ্ঞাসা

করিয়া উত্তর পাইয়াছি—"সন্তান যদি মাতৃক্রোড়ে মূত্র ত্যাগ করে, মা কি সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ?"

আতিথেয়তা তাঁহার চরিত্রের আর একটী বিশেষ গুণ ছিল। দাসমণ্ডলীর দাসদের একটী ব্রত ছিল—"কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না"। এই জন্য দারিদ্র্য-ক্লেশও অনিবার্য্য ছিল। অসময়ে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—অতিথিসৎকার করিয়া জননী দেবীকে উপকরণাভাবে, কেবল মাত্র লেবু পাতা ও তেঁতুল লবণ দিয়া জল ঢালিয়া ভাত খাইয়াছেন, এমন প্রায়ই ঘটিয়াছে। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, দীন দরিদ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। পাঁচখানি পরিবার ধুতি থাকিলে একখানি দান করিয়া ফেলিতেন। নূতন জামা আসিলে পুরাতন খানা অব্যবহার্য্য না হইলে স্বহস্তে সেলাই করিয়া অভাবগ্রস্তকে দান করিয়াছেন। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে সমস্ত বস্ত্রাদি পাইয়াছেন, কখনও তাঁহাকে উহা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। উহা তখনই অপর দরিদ্রকে দান করিয়া ফেলিয়াছেন। সন্তানেরা বড় হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেই, মিশন ফাণ্ডের টাকা আর নিজের জন্য খরচ করেন নাই। অভাবগ্রস্তের অভাব-মোচনার্থ উহা ব্যয় হইয়াছে।

পিতৃদেব অত্যন্ত স্বাবলম্বী ছিলেন। কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। নিজের অন্ন নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতেন। আমরা বাধা দিলে শুনিতেন না। বিগত তিন বৎসর যাবৎ পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। কেহ আসিয়া "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিতেন—"ভাল আছি"। দুরন্ত ব্যাধিও তাঁহার মনের উৎসাহ কমাইতে পারে নাই। কোন বিষয় হইতেই তিনি নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। সর্ব্বদা কিছু লেখা, পাঠ অথবা কোন কাজে রত থাকিতেন। আর গাহিতেন, "ঠাকুর এক দণ্ড দেয় না বসিতে, নাকে দড়ি দিয়ে টানে মারে পিঠেতে।" তাঁহার প্রত্যেকটী কাজের সময় ঘড়ি ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। ইদানীং তিনি ব্রহ্মপদে লীন হইয়া থাকিতেন। সর্ব্বদা নামজপ এবং নাম-কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া থাকিতেন। আমরা হয়তো তাঁহার কাছে বসিয়া কোন বাজে কথা বলিতেছি, তাঁহার কাণে যাওয়াতে কষ্ট বোধ করিতেন এবং তখনি সংগীত ধরিয়া দিতেন ; আমরাও লজ্জিত হইয়া নীরব হইতাম, কিন্তু মুখে কখনও তিরস্কার করিতেন না।

৮৬ বৎসরে পড়িয়া চলচ্ছক্তি হীন, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইলেও মনের উৎসাহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। শিশুর ন্যায় মনে স্ফূর্ত্তি ছিল। অমিততেজে, অদম্য উৎসাহে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পিতৃদেব অনন্যমনা হইয়া শ্লোকসংগ্রহখানি পদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। এইরূপে তিনি শোক দুঃখকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে কেহ কেহ তাঁহাকে সন্তানের প্রতি স্নেহ সম্বন্ধে উদাসীন, এই ভাব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পুস্তকগুলি এখনও দপ্তরীর গৃহে রহিয়াছে, মাত্র ১০০খণ্ড বাঁধাই হইয়া আসিয়াছিল। গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে প্রবল শীত সত্ত্বেও প্রত্যেক শুক্রবার উয়ারীতে জামাতৃগৃহে এবং শনিবার সহরের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্ম-বন্ধুগৃহে এবং রবিবারে দিগ্‌বাজারস্থ ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন উপাসনা এবং সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়া আসিয়াছেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, স্বর্গগত ডাক্তার অতুল-চন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী সাধ্বী হরিপ্রিয়া দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা হইতে শরীর কিছু অসুস্থ বোধ করেন এবং সর্দ্দি কাশী এবং সামান্য জ্বর হয়। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় অচল হইয়া পড়াতে তাঁহাদের মিলিত দৈনিক উপাসনা দেবালয়ে না হইয়া শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের "পদছায়া" গৃহে হইত। পিতৃদেব শেষ ৪।৫দিন যোগ দিতে পারেন নাই। ৮ই মাঘ, "পদছায়া" গৃহে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে সম্রাজ্ঞী মেরীর প্রতি শোকসহানুভূতি জানাইয়া ভাইসরয়ের নিকট স্বহস্তে টেলিগ্রাম লিখিয়াছেন। বৈকালে প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিয়া খবর লইয়াছেন, স্বহস্তে গাছে জল দিয়াছেন এবং সন্ধ্যার পর সংগীত করিয়াছেন :—

"মন পাখী চল যাই ঘরে,
আর কি সুখ আছে থেকে দেহ-পিঞ্জরে।"

এই সংগীত করিতে করিতে, তাঁহার আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া, রাত্রি ৮ঘটিকাতে জননীর স্নেহবক্ষে আশ্রয় লইবার জন্য চিদাকাশে উড়িয়া গেল।

ধর্ম্মালোচনা *

(হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবে পরম-শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক বিবৃত)

(১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ ; ৭ই ফাল্গুন, ১৭৯২ শক)

১ম প্রশ্ন—জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, নির্ধন, সকল অবস্থার লোকেই কিরূপে ধর্ম্মসাধন করিতে পারে ?

* পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত প্রশ্ন সকলের উত্তর স্থলে যেরূপ সরল, সুমিষ্ট ও সুন্দর মৌখিক ব্যাখ্যা করেন, তাহা শুনিয়া সমাগত অসংখ্য আবালবৃদ্ধবনিতা চমৎকৃত ও যারপর নাই সন্তুষ্ট হন। আমরা তাহা সম্পূর্ণ ও অবিকল প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

মন্তব্য—এই আলোচনাটী আচার্য্যদেবের কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।—ধঃ সঃ।

উত্তর—কথিত আছে যে, "ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম।" ধর্ম্মসাধন করা অত্যন্ত কঠিন ধার্ম্মিক হওয়া, পাপ পথ পরিত্যাগ করা, সকল বিষয়ে আত্মাকে পবিত্র করা, কোন মতে সহজ নহে। একদিকে ধর্ম্ম যেমন কঠিন, তেমনি আর একদিকে দেখিলে ধর্ম্ম স্বাভাবিক, অতএব সহজ। নিরাকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আবার আমাদের মনের যে প্রকার স্বভাব, সেই স্বভাব অনুযায়ী চলিলে তাহা কঠিন নহে। যাহার শরীরে রোগ আছে, তাহার পক্ষে রোগ দূর করিয়া সুস্থ থাকা কঠিন, কিন্তু যাহাদের শরীর সুস্থ, সুস্থতা রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। তেমনি আত্মা। দেখ স্বভাবতঃ লোকে কেবল অন্যায় আচরণ করে, লোকের প্রতি নিষ্ঠুর হয়, কখন কখন প্রাণবধেও প্রবৃত্ত হয়, কেন না লোভ ছাড়িতে পারে না। পাপ মনুষ্যের প্রভু। দশ কিম্বা চল্লিশ বৎসর যদি মনুষ্য লোভের অধীন থাকে, তাহা হইলে একদিনে আপনা হইতে কখনই লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাহারা কু-অভ্যাসের দাস নহে, তাহাদের পক্ষে পাপের বশ না হওয়া কঠিন নহে। কিন্তু সংসারের লোকদের মনে কাহার সঙ্গে শত্রুতা আছে, কে আমার মন্দ করিবে, কাহাকে ঠকাইয়া বড় মানুষ হইব, এই ভাব সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে। সমস্ত দিন ধরিয়া যে কার্য্য ও চিন্তা করা যায়, উপাসনার সময় সেই কার্য্য ও চিন্তা মনে আইসে; যখন সন্ধ্যা-কালে ঈশ্বর-চিন্তা করি, তখনও সেই চিন্তা আইসে; এই সকল অভ্যাসের জন্য। অনেক লোকে মনুষ্য সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে। অনেক ধনী দরিদ্রদিগের উপর অত্যাচার করিয়া ধন সংগ্রহ করেন, অনেক সময় অকারণে দরিদ্রদিগের পীড়ন করেন, অনেকে মৎস্য ও পক্ষীদিগকে হত্যা করা সামান্য বোধ করে, এইরূপে অবশেষে তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। কিন্তু যদি পিতামাতা বাল্যকাল হইতে সন্তানকে সাধুপথে লইয়া যান, যদি অধিক বয়স হইলে সাধুমণ্ডলীতে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সকলেই ধর্ম্মোন্নতি করিতে পারেন ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় কঠিন ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম সাধন করা অতিশয় কঠিন। কোন প্রকার সাকার বস্তু উপাসনা করা হইবে না, কেবল অন্তরে নিরাকার ব্রহ্মের সাধন করা, ধ্যান ও ধারণা দ্বারা হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে গ্রথিত করা, এ সকল কঠিন উপায়। ইহাতে মনে হইতে পারে, যে যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা বৈদিক মতে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা এ ধর্ম্ম এক সময় সাধন করিতে পারেন, কিন্তু মূর্খেরা তাহা পারে না। কেহ মনে করেন যে, সন্ন্যাসী হইতে না পারিলে ইহার কিছুই সাধন করা যায় না! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, যেমন জল বায়ু প্রত্যেক লোকের পক্ষে আবশ্যক, তেমনি ধর্ম্মও প্রত্যেকের আবশ্যক। দেখ ঈশ্বরের কেমন করুণা! জল বায়ুতে ধনীদিগের যেমন অধিকার, দরিদ্রদিগেরও তেমনি অধিকার। তেমনি ধর্ম্ম ভিন্ন আত্মা বাঁচেনা। আত্মার পক্ষে ধর্ম্ম, যেমন শরীরের পক্ষে জল-বায়ু। নিগূঢ় সত্য সকল বুঝিতে লোকের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন, সেই সত্য সকল মূর্খেরা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে সকল সামান্য মূল সত্য, তাহাতে ধনী দরিদ্র সকলের সমান অধিকার। ঈশ্বর দেখিলেন, যে ধর্ম্মকে যদি কঠিন করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম দুই একজনের জন্য হইত। সাধারণের সম্পত্তি হওয়াতে ইহা জলবায়ুর ন্যায় সকলের উপকারী হইয়াছে। সচ্চরিত্র হওয়া, সত্য কথা কহা, পরকালে বিশ্বাস করা, আবশ্যক এই যে কয়েকটি সামান্য সত্য, সকলের জন্যে কর্ত্তব্য। ইহা না জানিলে সংসার চলে না। সকলেই যদি ধূর্ত্ত হয়, মিথ্যা কথা কয়, পরকালে অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে সংসারের বিপ্লব উপস্থিত হইত। এজন্য পরিত্রাণের যে পথ, তাহা পরমেশ্বর সকলের পক্ষে সুলভ করিয়া দিয়াছেন। আমরা যেমন স্বভাবতঃ মাতার স্তনের দুগ্ধ পান করি, পুস্তক পাঠ করিয়া স্তনপান করি না, এবং এই সংস্কার থাকাতেই আমাদের প্রাণরক্ষা হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় দমন করা, সরল হওয়া, ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যে আবশ্যক, তাহা আমরা সহজে শিক্ষা করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন একদিকে উচ্চ দেখা যায়, এই ধর্ম্মসাধন করাও অতিশয় কঠিন। কিন্তু যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের পত্তনভূমি, তাহা সাধন করিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সকলে জানিতে পারেন; আমরা যদি তাঁহার উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে ইহা সাধন করা কঠিন হইবে না। যেখানে আমরা দেখি, কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যে এত পাপ হইতেছে যে, ঈশ্বরকে এক সময়েও স্মরণ করা দুঃসাধ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা ত সন্তান। যদি সন্তান হই, তবে তাঁহাকে ভক্তি করা কেন কঠিন হইবে? তিনি আমাকে জীবন দেন, তিনি ধন দেন। তবে ধর্ম্মসাধন সহজ হয় না কেন? যেহেতু আমার অবস্থা স্বাভাবিক নহে। সন্ধ্যার সময় যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তাহারও অবসর হয় না; যদি হয়, তাহাও ঠিক মনে হয় না। অজ্ঞানে অভিভূত থাকিয়া প্রতিদিন সংসারের চিন্তা করিতেছি; এমন অবস্থায় কেমন করিয়া স্থিরচিত্তে ঈশ্বরকে চিন্তা করিব? এখানে অনন্যমনা হইয়া, বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একবার তাঁহাকে চিন্তা কর। এ সময়ে তাহা অভ্যাস করিলে অবশেষে সেই কঠিন ব্রত সহজ হইয়া যায়। একবার ইন্দ্রিয় দমন আরম্ভ করিলে অবশেষে তাহা সহজ হয়। এজন্য অরণ্যগামী হইতে হইবে না, আমরা সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারকে জয় করিতে পারিব, অসীম সুখ শান্তি লাভ করিব।

২য় প্রশ্ন—কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে?

উত্তর—প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হৃদয়ের কার্য্য, বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কোন বাহ্যিক বস্তু পরব্রহ্মকে সমর্পণ করি, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা নহে। একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে ধ্যান করি, এই উপাসনা। মনুষ্য যেন ঈশ্বরের সহিত যোগ রাখিয়া সংসারের সমুদায় কার্য্য করেন। সংসারে যোগ কি?

সংসারের সকল কার্য্যে সমুদায় ভক্তি, শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে।

মনে মনে শ্রদ্ধা-পুষ্প, ভক্তিচন্দন ঈশ্বরকে দান করিতে হইবে, ইহার উপায় কি? নিকৃষ্ট চিন্তা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আমরা যখন ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে বসি, তখন কত প্রকার কুচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং উপাসনা করিতে পারি না। অতএব মনকে স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায় কি? ধ্যান করা। তিনি সম্মুখে বর্ত্তমান, এইরূপ তাঁহার সত্তায় নিঃসংশয় বিশ্বাস করিতে হইবে। ভক্ত আপনার ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে বা ধরিতে পারেন। যেমন হস্তের দ্বারা কোন একটি বস্তু ধরিতে পারা, সেইরূপ মন স্থির করিয়া ঈশ্বর এখানে আছেন এইটি চিন্তা করা। যদি বল, চিন্তা করিবার আবশ্যকতা কি? যেমন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে মনুষ্য অভ্যাসের দাস। মনুষ্য ত সহজে সম্পদের সময় ডাকে না, যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, কিম্বা নৌকা জলমগ্ন হয়, তখন হয়ত ঈশ্বরকে ডাকে। কিন্তু একবার ডাকিলেই পাওয়া যায় না। অতএব চিন্তা করিতে হইবে। আকাশে ব্রহ্ম, অন্তরে ব্রহ্ম, তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা। তিনি ঊর্দ্ধে আছেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, এইরূপ যতই চিন্তা করিবে, ততই তাঁহাকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিতে পারিবে; যতই চিন্তা করিবে, ততই বলিবে, ঈশ্বরকে পাইয়াছি। প্রথম সোপান—সংসার হইতে মনকে নিবৃত্ত করা, দ্বিতীয়—ঈশ্বর আছেন, এইটী চিন্তা করা। এই দুই সোপান ধরার ফল পবিত্রতা ও শান্তি। পূর্ব্বে যেরূপ পাপী ছিলাম, এখনও যদি সেইরূপ থাকি, তাহা হইলে পরিত্রাণের আর কোন উপায় হয় না। মনকে নির্ম্মল করিতে হইবে, শান্তিও হইবে। এখন সংসারে যদি একদিন বিপদ আইসে, মন অস্থির হয়। একজনের যদি পুত্র-বিয়োগ হয়, এক বৎসর কাল তাহার মন ক্ষুব্ধ থাকে। এরূপ কাহাদের হয়? যাহারা সংসারী। যাহাদের আনন্দ সংসারে, সংসার পাইলে তাহাদের আনন্দ হইবেই হইবে এবং সংসারের দুঃখতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ। যাঁহাদের ব্রহ্মে আনন্দ, তাঁহারা সন্তান গেলে মনে করেন, যে তাঁহাদের সন্তান পরম পিতার কাছে গিয়াছে। যদি টাকা ক্ষতি হয়, বিষয়ী ক্রন্দন করে; কিন্তু সাধু বলেন, এই টাকার ক্ষতি সংসারের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু পর-কালের পক্ষে বিঘ্নজনক নহে—পরমার্থ সম্বন্ধে ইহার কিছুই মূল্য নাই। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, সাধু বলেন—সকল কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে নিজালয়ে যাইতেছি। বিষয়ী বলে—স্ত্রী পুত্র পড়িয়া রহিল, আমি একাকী শ্মশানের মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছি, কোন অপরিচিত বিদেশে নিরাশ্রয় হইয়া চলিলাম। সেই বিদেশ তাহার পক্ষে বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর যমালয় হয়। তাহার চক্ষু হইতে কেবল বিষাদের জল পড়ে। কিন্তু সাধু ব্যক্তি ব্যাকুল না হইয়া বলেন, এই আমার ঈশ্বর, ঈশ্বরের কাছে আমি, আমার বৃদ্ধ পিতা পরিবারকে তাঁহার হস্তে রাখিয়া যাইতেছি, আমার কাছে যমালয় যন্ত্রণালয় নহে, কিন্তু মুক্তির সোপান। এইরূপ সাধু সকলের কাছে বিদায় লইয়া অনায়াসে পরলোকে গমন করেন। দেখ উপাসনার কেমন ফল! কি জানি, কখন কি বিপদ আইসে, এই জন্ত উপাসনা পরম বন্ধু। ইহা ঈশ্বরের সহিত আত্মাকে সম্বন্ধ করিয়া রাখে এবং পবিত্রতা, শান্তি, পুণ্য ও আনন্দে মনকে চিরকাল উন্নতির পর উন্নতিতে লইয়া যায়।

৩য় প্রশ্ন—আমরা ধর্ম্ম না হইলে থাকিতে পারি না, জীবনের এরূপ অবস্থা কিরূপে হইতে পারে?

উত্তর—আমরা যতদিন সুস্থমনে থাকি, ততদিন ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। সকল মনুষ্য দিবানিশি সুখের জন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকে টাকা উপার্জ্জন করেন, বিদ্যা উপার্জ্জন করেন, কিসের জন্ত? না, সুখ পাইবেন। এই সুখ পাইবার ইচ্ছা সকলের। ধর্ম্মেরও সুখ আছে, কিন্তু ভিন্ন প্রকার। সংসারী লোকেরা সংসারে সুখলাভ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও পান, কিন্তু দুঃখ ভুলিয়া যান। কতকগুলি লোক দুঃখ পাইয়া ধর্ম্মলাভ করেন, কিন্তু তদুৎপাদ্য সুখ বিস্মৃত হন। কিন্তু ব্রাহ্মনাম ধারণ করিলেই যে সুখ পাই, তাহা নহে। অনেক সাধন আবশ্যক। অনেকে উপাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সংসারে ফিরিয়া আসেন কেন? তাঁহারা উপাসনার সময় চক্ষু মুদিয়া কিছুই দেখিতে পান না। কত লোক অস্থিরমনে ব্রাহ্ম হইয়া আবার সংসারী হয়। উপাসনা আরম্ভ করিবার সময় উচিত বলিয়া আরম্ভ করা হয়, কিন্তু অনাবশ্যক বলিয়া শেষ করা হয়। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্ম কতক্ষণ থাকিতে পারে? একজন উপাসনা করিতে যাইতেছেন, কেহ যদি বলে, তোমাকে একলক্ষ টাকা দিব, একটি মিথ্যা কথা কও। যদি তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব থাকে, তবে তিনি মনে করেন যে, অধর্ম্মের কার্য্য করিব না; কিন্তু যতই তিনি ভাবেন, ততই টাকার কথা মনে পড়ে, লোভ বাড়ে। আমি এই পাপ এখন করি, পরে ধার্ম্মিক হইব, এই ভাবিয়া তিনি মিথ্যাবাদী হইলেন। ইহার কারণ কি? কেবল সুখের জন্ত। যদি তিনি উপাসনায় সুখ পাইতেন, টাকার ভাবনা ভাবিতেন না। তিনি বলিতেন, এই যে কুড়ে ঘরে আমি বসিয়া আছি, ইহাতে আমি সুখ পাই। ব্রহ্মের কাছে আমি অনেক সুখ পাই। এমন অবস্থা হইলে কেহ মিথ্যা কহে না। এজন্ত আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত যে, ঈশ্বরেতে আমরা যেন সুখ পাই। যেমন পৃথিবীর কোন লোককে যদি আমরা ভাল-বাসি, এক মুহূর্ত্তে তিনি আর কোথায় যাইলে ব্যাকুল হই। যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ধর্ম্মকে এবং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরচিন্তা করিলে যদি সুখ পাই, তাহা হইলে কেন সংসারে যাইব? কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে উপাসনা হয়, তাহা নহে। ঈশ্বরকে এমনি নিকটে রাখিতে হইবে, যে আধ ঘণ্টার জন্ত তাঁহা হইতে দূরে যাইলে ব্যাকুল হইব। যদি একদিন কার্য্যালয়ে গিয়া একটু ধনহানি হয়, তাহা হইলে মন কত কাতর

হইয়া পড়ে। কিন্তু একদিন যদি ব্রহ্মের উপাসনা না করি, তাহা হইলে মনে কি দুঃখ হয়? সেটী না হইলে মনুষ্যের যথার্থ উপাসনা হয় না। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনে কষ্ট হইবে, এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। এরূপ অবস্থা হইলে মনুষ্য ব্রহ্মের অভয়পদ লাভ করিতে পারিবেন।

৪র্থ প্রশ্ন—ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অনান্য ধর্ম্মের কতদূর যোগ আছে ?

উত্তর—ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সকল ধর্ম্মের যোগ আছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অর্থ কি—না ঈশ্বরের ধর্ম্ম, অর্থাৎ সত্য। জ্ঞানেতে সত্য, ভাবেতে সত্য এবং কর্ম্মেতে সত্য। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে প্রত্যেক ধর্ম্মে কিছু কিছু পরিমাণে সত্য আছে। "সত্য কথা কহিতে হইবে", যে পুস্তকে কেন ইহা লেখা থাকুক না, অথবা যেই কেন উপদেশ দিউন না, এ দেশ হইতেই হউক, আর অন্য দেশ হইতেই হউক, এটি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য। বেদ, কোরাণ, বাইবেল সকলেতেই যে সত্য আছে, তাহার মর্য্যাদার ইতর বিশেষ হইতে পারে না। যদি একটি টাকা একজন গরীবের নিকট পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বলিব, এটীর দাম ১৪আনা, আর যদি সেই টাকা একজন ধনী লোকে দেন, তাহার দাম ১৭ আনা বলিব? যেটী টাকা, সেটী টাকা—ঠিক ১৬ আনা। আমাদের দেশের পুস্তকে পাই, আর অন্যদেশের পুস্তকে পাই, যেটী সত্য হইবে, তাহাকে অসত্য বলিতে পারি না, অনাদর করিতেও পারি না। তেমনি "নম্র হও", এটীও আমরা বলিব ব্রাহ্মধর্ম্মের। ধর্ম্মপথে থাকিলে পরলোকে সদ্গতি হয়, এটী ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য। "কাম ক্রোধ জয় কর" এটীও ব্রাহ্মধর্ম্মের। যাহা কিছু সত্য, সকলই ব্রাহ্মধর্ম্মের। সত্য যে ধর্ম্মে থাকিবে, তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ থাকিবেই থাকিবে। একজন সত্য কথা কহিয়াছে, তাহাকে কি বলিব, তুমি অসত্য কহিয়াছ, কারণ তুমি আর একদেশের লোক, অথবা আর এক ধর্ম্মের লোক! আমরা বলিব, তুমি যে হও, তোমাতে যত সত্য, সদ্গুণ ও সৎক্রিয়া, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত; যে গুলি কুসংস্কার, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের নহে। ব্রাহ্মে ও অন্যে প্রভেদ এই, যিনি ব্রাহ্ম, তিনি অন্যান্য ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখিতে পান, অন্যে অপরের সত্যকে অগ্রাহ্য করেন। যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে সত্য থাকিবে, আমরা তাহা গ্রহণ করিব। যাঁহার সাধু গুণ আছে, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করিব। সকল ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের এইরূপ সদ্ভাব এবং 'সত্যমেব জয়তে' সত্যেরই জয় হয়, কেবল এই বলিয়া একদিন সত্য ধর্ম্ম সমুদায় জগতে সংস্থাপিত হইবে। আমরা সত্যের সম্বন্ধে, এক ঈশ্বরের সম্বন্ধে সকল লোককে ভাই বলিয়া গ্রহণ করি। এটি অন্যান্য ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা বলেন—"আমাদের কয়েকটি বিশেষ মত আছে, এগুলি না হইলে পরিত্রাণ হইবে না। যাহারা আমাদের ধর্ম্ম মানে না তাহারা পতিত, নাস্তিক এবং অনন্তকাল নরকভোগ করিবে।" ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকেও ঘৃণা করেন না, সকল ধর্ম্মের লোককেই ধর্ম্মপথের পথিক জানিয়া সমাদর করেন। এবং যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সৎকার্য্য অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখেন, তাহার সহিত সদ্ভাবে বদ্ধ হন। একদিন সকল ধর্ম্মের সকল সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মে একত্র হইবে এবং ইহা মানবজাতির একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

৫ম প্রশ্ন—সংসারে চতুরতা ভিন্ন চলা যায় কি না ?

উত্তর—বিষয়ীদের ধর্ম্ম চতুরতা। তাঁহারা বলেন, একটু প্রবঞ্চনা না করিলে সংসারে চলা যায় না। সরল ভাবে কাজ করিলে লোকে ঠকাইবে এবং পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এ বিষয়ে পিতামাতারা আপনাদিগের সন্তানদিগকে ভাল মানুষ দেখিলে বলেন, "লেখাপড়া শিখিয়াছিস্, একটু চতুর হইসি না? তোর দ্বারা কোন কাজ চলিবে না।" এই মনে করিয়া অনেকে আপনার সন্তানের উপর বিরক্ত হন। ইহা উচিত নহে। মনে করা উচিত, সরলতা থাকিলে তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। সরল হইলে সংসারের নিকট অনেক সময় পরাস্ত হইতে হয়, তাহা বলিয়া সরলতা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে ঠিক সরল পথে চলে, তাহার টাকা অধিক হউক না হউক, কোন অমঙ্গল হয় না। সে লোকের নিকট সম্মান ও বিশ্বাসভাজন হয় এবং মনের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অনেক বুদ্ধি হইলে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়। চতুরতায় আশু লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা অধিক বৃদ্ধি হইলে ক্রমে অসাধুতাতে পরিণত হয়, একটী অসত্য হইতে দশটি, দশটি হইতে সহস্রটি, ক্রমে অসত্যের জালে জড়াইয়া প্রাণে মরিতে হয়। তাহাতে আপনার মনে অসহ্য গ্লানি, লোকের নিকট অপযশ এবং ন্যায়বান ঈশ্বরের নিকট দণ্ডভোগ করিতে হয়। আমাদিগের এই বিবেচনা, এই লক্ষ্য, যে সর্ব্বদা সাধু পথে থাকিব। সরল যদি মনে হয়, তাহাতেই আমাদিগকে রক্ষা করিবে, আমরাও সেই সরল মনকে রক্ষা করিব। কিরূপে আমরা বাঁচিব, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা বলিব, সত্যের পথে থাকিলে কখন অমঙ্গল হইবে না। আমরা চতুরতা করিয়া যে জয়লাভ করিতে পারিব, তাহা কখনও হইতে পারে না। কত জমিদার মনে করেন, একজন দুর্ব্বল প্রজাকে চতুরতা দ্বারা প্রবঞ্চনা করি। তাহার উপরে আবার প্রবল জমীদার আছে, তাহার কাছে উহার মৃত্যু হইবে। চতুরের মৃত্যু চতুরের হাতে। চতুর আপনার জালে আপনি জড়াইয়া মরে। অতএব কখনও মনে করিও না, যে "চতুরতা করিয়া সংসারের উপর জয়লাভ করিতে পারিবে।" সত্য দ্বারাই সংসারে জয়লাভ হয়, সত্য দ্বারাই জয়লাভ করিতে হইবে।

সংসারের চতুরতা অনিষ্টের কারণ; কিন্তু ধর্ম্মের চতুরতা আছে, তাহা যিনি দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান। ধর্ম্মে সুচতুর ব্যক্তিরা যাহাতে আত্মার লাভ হয়, তাহারই জন্য যত্ন করেন এবং যাহাতে আত্মার ক্ষতি হয়, সতর্ক হইয়া তাহা

নিবারণ করেন। মনে যদি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, সংসারে যদি প্রলোভন ও বাধা সকল চারিদিক হইতে আসিয়া ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত করে, তাঁহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। একটি সত্য পরিত্যাগ করিলে যদি লক্ষ টাকা লাভ হয়, সে লাভকে তাঁহারা দারুণ ক্ষতি বলিয়া বোধ করেন। আর যদি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, একটী সত্য উপার্জ্জনের জন্য সমুদায় বিষয় সম্পত্তি, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা তাঁহারা লাভের বিষয় বলিয়া মানেন। কেন না যত ধর্ম্মধন, ঈশ্বরধন অর্জ্জন করা যায়, তত পরকালের সম্বল করা হয়, ততই অনন্ত জীবন সুখে কাটাইবার উপায় হয়। এইরূপ ব্যক্তিদিগকেই সুচতুর বলিয়া প্রশংসা করা কর্ত্তব্য।

স্মৃতি-বাসর।

(২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬)

আজ এক পবিত্র স্মৃতিবাসর। আজ এ পবিত্র স্মৃতিমন্দিরে, ততোধিক পবিত্র স্মৃতিবাসরে, স্মৃতির মহাপূজায় যোগদান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আমি জানি, এই পবিত্র স্মৃতি-মন্দিরে শত স্মৃতির আবেষ্টনীতে এক রাজসন্ন্যাসিনী তপস্যায় নিযুক্ত আছেন।

এখানকার সবই স্মৃতিতে ভরা। এখানে পাখী কলকণ্ঠে সকরুণ সুরে স্মৃতির বন্দনা করে, সরোবরে স্মৃতির অশ্রান্ত হিল্লোল কত কি ইঙ্গিত করে, কাননে কুসুমনিচয় স্মৃতিমাখা সুগন্ধে সুদূর অতীতে কোন স্মৃতির দেশে নিয়ে যায়, সমীরণ মৃদুমর্ম্মরে স্মৃতির ঘুমপাড়ানিয়া গান গেয়ে প্রাণকে বিহ্বল করে। আর এ মন্দিরের পূজারিণী তিনি তাঁর প্রাণময় দেবতার স্মৃতির ধ্যানে চির নিমগ্না আছেন। শুনিয়াছি, জগতের অত্যাশ্চর্য্য "তাজমহল" স্মৃতির জীবন্ত ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। আর আমাদের এই সজীব প্রতিমাখানি কি তাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ?

বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে যে অম্লান ও অনাঘ্রাত কুমারী-হৃদয়ের প্রীতি-প্রস্রবণ তাঁর জীবন-সর্ব্বস্বের পাদমূল অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা পার্থিব ঘাত প্রতিঘাতে, ঘটনা-পরম্পরায় কোন দিন কি মন্দীভূত হইয়াছে ? যুগান্তের পরে যখন সাধনার ধন হস্তগত হইয়াছে, তখনও সেই সবেগোত্থিত নির্ম্মল-ধারা সতেজে বহিয়া চলিয়াছে।

তারপর,—তারপর বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে যখন সাজান বাগান প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সহসা শুখাইয়া গিয়াছে, "কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম পুরী" অমানিশার ঘনায়মান অন্ধকার গ্রাস করিয়াছে, মিলন-মন্দ্রের সাহানা রাগিণীতে রুদ্রের প্রলয় বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতী আকাশ আচম্বিতে বজ্রানল বিকীর্ণ করিয়াছে, তখন ? তখনও এই ধ্যানপরায়ণা যোগিনী দীর্ণা, রক্তাক্তহৃদয়ে ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া, সযত্নরচিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত মালাখানি শ্মশানের দেবপদে উৎসর্গ করিয়াছেন।

শ্রীরামপ্রিয়া জানকীর মতই, এই শ্রীরামপ্রিয়াও শিশু কুশী লবকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সুদীর্ঘ চতুর্বিংশ বর্ষাধিক কাল মহা তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। দারুণ রোগ-যন্ত্রণা, আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা তাঁহাকে এ মহাপূজায় নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

চিরপূজ্য, ভক্তিভাজন শ্রীকেশবের প্রিয়তমা আত্মজা ! সন্ন্যাসিনি ! একবার তোমার ওই যোগমগ্না, পূজানিরতা মূর্ত্তি-খানি লইয়া দাঁড়াও। আজিকার এই বিলাস ও স্বার্থপরতার যুগে, তোমার ওই তপস্যা-নিরত, মহিমা-মণ্ডিত, জীবন-প্রদীপের উজ্জ্বল আলোক-শিখা দেখিয়া, অনুকরণ করিয়া আমরা ধন্য হই।

জনৈক ভগ্নী।

সুহাসকুমার স্বর্গধামে।

কি চমৎকার ছবি! এ কি? এ কি পৃথিবীর ছবি? গৃহে প্রবেশ করেই আমি একেবারে চমকে উঠলাম, ছবিতে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেচে! সুহাস যেন স্বর্গের বাগান আলো করে হাসি হাসি মুখে বসে রয়েচে—যেন বল্‌চে, "কি সুখে রয়েচি ; তোমরা যতই যত্ন কর না কেন, এত আনন্দ কখনই দিতে পারতে না।" বহু দিনের কথা, একটী তিন বছরের ছেলে স্বর্গের বিষয় কি বলেছিল, আজ তাই মনে পড়ে গেল। একজন ব্রাহ্ম বন্ধু তাহাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা! স্বর্গ স্বর্গ যে বল, স্বর্গ কোথায় বল দেখি?" তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার স্পষ্টস্বরে শিশুর মুখে এই উত্তর ফুটে উঠেছিল, "কেন? যেখানে মা হাসে, ছেলে হাসে, হাসির বাজার বসেচে"। সেখানে উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া গেলেন। কি আশ্চর্য্য! এ উত্তর তাকে কে শিখিয়েছিল? গানে কথাটা শুনেছিল বটে, কিন্তু স্বর্গ যে এই রকম, এ কথা ত তাহাকে কেহ শেখায় নি। স্বয়ং ভগবান এ সত্য তার নিকট প্রকাশ করেছিলেন। শুনেছি ভাগলপুরের স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটী ছয় বৎসরের কন্যা আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, সে এদিক ওদিক ফিরিয়া জোড় হাতে প্রণাম করিতেছিল; সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কাকে নমস্কার কচ্চ?" কন্যা উত্তরে বলিল, "ঠাকুরকে, তোমরা দেখতে পাচ্চ না?" পবিত্র সরল শিশুর নিকট ঠাকুর যে আত্মপ্রকাশ করেন, ইহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? আমাদের সুহাস আজ আনন্দপুরে হাসির বাজারে পরমানন্দে রয়েচে, এ কথা কি আর অবিশ্বাস করতে পারি? বাল্যকাল উত্তীর্ণ হয়ে সে কৈশোরে পদার্পণ করেছিল। এই বার বৎসরের

জীবনে তাকে কখনও একটী কুকার্য্য করতে দেখিনি, একটী কুকথা বলতে শুনিনি। সর্ব্বদা সহাস্যবদনে সুহাস গুরুজনের আদেশ পালন করেচে—যেন বিনয় বাধ্যতার মূর্ত্ত প্রতীক! দুরন্ত টাইফয়েড রোগে সে চলিয়া গেল। শেষ সময়ে মস্তিষ্ক-বিকার-জনিত কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। তবু ইহলোকস্থ, পরলোকস্থ (বাবা, সেজ পিসীমা) সকলের নাম করে কথা বলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত "মা" "মা" বলে ডেকেছিল। আহা! দুঃখিনী মাকে আজ কে সান্ত্বনা দেবে! পিতৃবিয়োগের পর শিক্ষার জন্যে মা সুহাসকে ছোট পিসীমার হাতে সমর্পণ করে ছিলেন। আজ যে সেই ছোট পিসীমার প্রাণ একেবারে শূন্য করে দিয়ে সে চলে গেল। বড় পিসীমার পুরাতন শোক আজ এই নূতন শোকের আঘাতে উদ্বেল হয়ে উঠেচে। ওঁদের প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য ভবন আজ সুহাস-বিহনে অন্ধকার। দাসদাসী সকলেই অশ্রুভারাক্রান্ত। বলিতে কি, সমস্ত পাটনাই যে আজ শোকার্ত্ত। সুহাসের মধুর প্রকৃতি এবং প্রফুল্ল আনন সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। যাবার সময় অনেকেই পুষ্প উপহার আনিয়াছিলেন, অনেকে শবানুগমন করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনায় প্রতিদিন এমন গভীর বেদনান্তরে "সুহাস" নামটী উচ্চারণ করেন, যেন সুহাস তাঁরও প্রাণের অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল। এখন সে সুহাস কুমার আনন্দলোকে পরমমাতার কোলে কত সুখে রয়েছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়ে জননী সকলের প্রাণে আজ সান্ত্বনা দান করুন।

সেজ পিসী মা।

সুহাসের শেষ কৃত্য।

(জ্যেঠতাত শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের চিঠি হইতে উদ্ধৃত)

সমস্ত শেষ করে, চিতাভস্ম গঙ্গার জলে ভাসাইয়া এইমাত্র গৃহে ফিরিতেছি। এখন বেলা ১টা। ভোর থেকেই আবার লোকজন সমবেত হইলেন। সকলেই অনেক ফুল আনিলেন। বাড়ীর বাগানেও অপর্য্যাপ্ত ফুল। সকলে মিলিয়া সুন্দর করে সাজাইলেন। পরেশবাবু অতি মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। তিনি নিজে, পুত্রবধূ এবং পৌত্র, পৌত্রী দুটী কাল থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। করুণার তো কথাই নাই। পরেশবাবু, দেবেনবাবু, নিরঞ্জন প্রভৃতি অনেকেই শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং অনেক অনুরোধেও পরেশবাবু ফিরিতে স্বীকৃত হন নাই। এই অসময়-মৃত্যু তাঁহার প্রাণেও খুব আঘাত করিয়াছে। স্কুলের সমুদয় টিচারগণ এবং বোর্ডিং এর ছাত্রীরা কাল অনেক রাত্রি অবধি ছিল, আজ আবার ভোর থেকে যাত্রা পর্য্যন্ত ছিল। সহরের আরও অনেক লোক কাল এবং আজ আসিয়াছিলেন।

খুব আশ্চর্য্য সহাগুণ কিন্তু নবৌয়ের। এতদিন সমানে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিয়াছে। পরশু থেকে যখন বেশ বুঝিল মৃত্যু নিশ্চিত, আরাম অসম্ভব, বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত কাছ ছাড়া হয় নাই বা চিৎকার করে নাই।

দেহে একেবারে কিছুই ছিল না। প্রাণটী যে এতদিন দেহত্যাগ করে নাই, সে কেবল হার্ট ও লাঙ্‌স্ ভাল ছিল বলিয়া। মাথা তো প্রথম হইতেই খারাপ। বোধ হয় যে, অসুখের ৪।৫দিন পর থেকেই সে ঠিক সজ্ঞানে কথা একটীও বলে নাই। পাকস্থলী ও ইণ্টেষ্টাইন্‌স্ একেবারে পচিয়া গিয়া ছিল, বোধ হয়, অনেক দিন হইতেই। দাহের সময় সম্যক বোঝা গেল। সেডদোর ভয়ানক সেপ্‌টিক হইয়া উঠিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ গলিত রস প্রস্রাবদ্বারে আপনি নামিয়া আসিতেছিল কয়দিন ধরিয়া। আশ্চর্য্য, প্রথম হইতেই টাইফয়েডের ভয় সকলেই পাইয়াছিলেন, অথচ কিছুতেই রোগের গতি ফিরাইতে পারিলেন না। কার্য্যকালে ডাক্তারি বিজ্ঞান আর কতদূর অগ্রসর হইতে পারে? কোন সাহায্যেই আসে না। এলোপ্যাথী তবু হৈ চৈ তোড়জোড় করে মনটাকে ভুলিয়ে রাখে এবং সেবাকে একটিভ্ রাখে। হোমিওপ্যাথী সেটুকুও পারে না। তবু কাল সমস্তদিন ডাঃ চৌধুরী এবং নির্ম্মল ঘোষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে কত গুরুজন বয়োবৃদ্ধদের শব বহন করেছি, শ্মশান সঙ্গী হয়েছি, দেহ সংকার করেছি। এখন আর সামর্থ্য নাই। এখন তো কনিষ্ঠেরা, পুত্র পৌত্রেরা আমাদের দেহ বহন করিয়া লইয়া যাবে, এই তো উচিত। এ বড় অস্বাভাবিক বন্দোবস্ত, যে এই বৃদ্ধ বয়সের জীর্ণ দেহে কচি বালকদের শেষ পারলৌকিক ক্রিয়া করিতে হবে আমাদের। সুহাস আমার বৃদ্ধ বক্ষস্থল একবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছি না, তাহার এই অসময়ের মৃত্যু। কেমন দেহের ও মনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছিল দিন দিন এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত। শিক্ষা, স্বভাব, সৌজন্য, বিনয় কেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। আসিয়া পর্য্যন্ত বনলতার ও গৃহের শোভা ও অন্তরের সরসতা কত বৃদ্ধি পাইতেছিল। কি প্রয়োজনে, কি অজ্ঞাত মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সমুদয় ধ্বংস করিলেন, তিনিই জানেন। আমরা নিজেদের অজ্ঞান ও অশক্তিতে কেবল মস্তক নত করিয়া থাকি।

—০—

নূতন সঙ্গীত।

ইমন ভূপালী—তেতালা।

কর হৃদয়টী মোর ফুলের বাগান দেবতা আমার;
পূজিব তোমায় দিয়ে সরস প্রেমপুষ্পহার।
নানাভাবে নানা ছন্দে, মানব তোমায় সদা বন্দে,
আমি দিব মহানন্দে নির্ম্মাল্য পূজার।

ভাষা দিয়ে হয় না কভু তোমার অর্চ্চন,
ভাবে ভরা ভক্তি ডালি করহে গ্রহণ;
রাখব তোমায় হৃদ্-মন্দিরে, অরঘ দিব যতন করে,
থাকবে তুমি আলো করে হৃদয় মাঝার।
হবে আমার ধ্যানের কুসুম পদের অলঙ্কার,
দেবতা আমার।

শ্রীমতী সুধা দেবী।

সংবাদ।

উৎসব—গত ৫ই ফাল্গুন হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৬দিন অমরাগড়ীতে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছে। ৬ই ফাল্গুন, দুইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ৭ই ফাল্গুন, অপরাহ্নে নববিধান-সমাজান্তর্গত বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের ও পল্লীর বালক প্রায় ৭০জনের সম্মিলনোৎসবে বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সরলভাবে উপদেশ দেন। বালিকাগণ একটী সুন্দর বন্দনা করেন। ৯ই ফাল্গুন, জয়পুর ফকিরদাস হাই স্কুলের গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, প্রায় ১৫০শত বালক ও শিক্ষকগণের সম্মিলনসভায়, প্রধান শিক্ষক বাবু নিকুঞ্জবিহারী সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, ঐ বিদ্যালয়ের আদর্শ অতি উচ্চ, ফকিরদাসের জীবনের মার্কা যেন প্রতি ছাত্রের জীবনে পড়ে এই ভাবে উপদেশ দেন। ১০ই ফাল্গুন, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা ও শান্তিবাচন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, গত ৬ই ফাল্গুন লিখিয়াছিলেন, "মা আজকার বিশেষ দিন স্মরণ করাইয়া দিলেন, তাই প্রার্থনা করালেন, যেন তাঁর পশ্চিম বঙ্গে নববিধান জয়যুক্ত হয়। ফকিরের অকিঞ্চনা ভক্তির জয় হয়। সহ্য করে ভালবেসে, ব্রহ্মানন্দ-অঙ্গে মিসে, মার অঙ্গে হেসে হেসে সকলকে নিয়ে এক খানা হয়ে যাই। মার কৃপায় সে অসম্ভব সম্ভব হবেই" এই উৎসবে এবার ঘোরতর অগ্নিপরীক্ষায় ও জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আমরা কয়েকটী দীনাত্মা মা আনন্দময়ীর প্রসাদলাভে কৃতার্থ হইয়াছি।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ভাগলপুরে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বিসপ্ততিতম উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

২১শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা ৬৷টার সময়, আরতির সংগীত-যোগে উদ্বোধন ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা ৬৷টায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু ভক্ত দাদুর উক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রার্থনা করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব; প্রাতে ৯টায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে প্রীতিভোজন হয়, সন্ধ্যা ৬৷টায় ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, প্রাতে ১০টায় শ্রীযুক্তা দীনতারিণী মুখার্জ্জির গৃহে ব্রাহ্মিকা উৎসবে শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা বসু উপাসনা করেন। পরে উক্ত গৃহে প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যা ৬৷টায় ব্রহ্মমন্দিরে "বৈদিক ধারা" বিষয়ে ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু বক্তৃতা করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বৈকালে ৫টায় ব্রহ্মমন্দিরে বালকবালিকা-সম্মিলনে সঙ্গীত ও আবৃত্তি হইয়া পরে জলযোগ হয়; সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ শান্তিবাচন করেন।

নব উৎকলোৎসব—গত ১লা এপ্রিল, উড়িষ্যা একটী স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে পরিগণিত হওয়া উপলক্ষে, পুরী সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় নববিধান ভূমিতে, সন্ধ্যা ৫৷টার সময়, এক প্রার্থনা-সভা হয়। পুরী জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার, শিক্ষকগণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ভাই প্রিয়নাথ নব উৎকলের জন্য এবং সম্রাট ও রাজপ্রতিনিধি নব গবর্ণর স্যার হাবকের ও প্রজাবর্গের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন।

শোক-সংবাদ—গত ২৮শে মার্চ্চ, আমাদের মণ্ডলীর স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সরকার হঠাৎ হৃদ্পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। গত ১১ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় ভ্রাতাভগিনীগণ তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে, তাঁহাদের গৃহে ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল লেনে উপাসনার ব্যবস্থা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। বিধানজননী তাঁর সন্তানকে নিজের বক্ষে স্থান দান করুন। শোকার্ত্ত ভাই ভগিনী এবং আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—স্বর্গীয় মনোগতধন দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুহাসকুমারের পরলোকগমন উপলক্ষে, গত ৩১শে মার্চ্চ, পাটনাতে, শ্রীমতী বনলতা দের গৃহে, ডাঃ পরেশনাথ চাটার্জ্জি এবং কলিকাতায় ২১৭নং রাসবিহারী এভিনিউতে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। তৎপর মাতৃদেবী পাটনা থেকে ফিরে এলে, ৫ই এপ্রিল রবিবার, ৫।১ মাধব লেনে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মেজ পিসী অশোকলতা দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ফুলের জন্য ৫৲, প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং অনাথাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৬ই এপ্রিল, ৯নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, স্বর্গীয় ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে পুত্রগণ কর্ত্তৃক গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন ও আরাধনা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ করেন এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ অনুষ্ঠানের তৎপরবর্ত্তী অংশ সম্পন্ন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দীরেন্দ্রনাথ বসু পিতৃজীবনী ও নবসংহিতার প্রধান-

শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। তিনজন বন্ধু স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। সকলেই শ্রদ্ধাপূতচিত্তে যোগদান করিয়াছেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজ ২০৲ (Building Fund), নববিধান সমাজ ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২৲, সাধনাশ্রম ২৲, হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ ২৲, পুরী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, গিরিডি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ ২৲, রামকৃষ্ণ মিশন ৪৲, বিজয়কৃষ্ণ মঠ ৪৲, দশঘরা দাতব্য চিকিৎসালয় ৪৲, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল ৪৲। কলিকাতা অনাথাশ্রম ৪৲, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ৪৲, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী ৩৲, হরিসভা ২৲, দশঘরা স্কুল ৪৲, মোট ৭৫৲ টাকা।

সাম্বৎসরিক—বিগত ১লা ফাল্গুন, সন্ধ্যা ৬াটার সময়, ভাগলপুরে শ্রীযুক্তা অকিঞ্চনবালা বসুর গৃহে, স্বর্গীয় সাধু হরিসুন্দর বসুর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনা করেন। কন্যা তপস্বিনী সরকার পুত্রকন্যাসহ সংগীত করেন। স্থানীয় সকল ব্রাহ্মব্রাহ্মিক শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত উপাসনায় যোগদান করেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ, ভাই প্রিয়নাথের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কৃপার ও ভ্রাতা নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে পুরী নবপর্ণকুটীরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১২ই চৈত্র, ৫নং পঞ্চানন ঘোষ লেনে, শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, উপেন্দ্রবাবু উপাসনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করেন।

গত ৭ই এপ্রিল, ২৫০ নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের (I.M.S.) গৃহে স্বর্গীয় ডাঃ পরেশরঞ্জন রায়ের সাম্বৎসরিকে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী, কনিষ্ঠা কন্যা ও জামাতা এবং কলিকাতায় বন্ধুবান্ধবগণ যোগদান করেন।

গত ৮ই এপ্রিল, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের পুত্র শ্রীমান্ বিধানকুমারের স্বর্গদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৯ই এপ্রিল, ২৪নং তারক চাটার্জ্জি লেনে, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের শ্যালকপুত্র স্বর্গীয় প্রতুলকৃষ্ণ সিংহের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পূজনীয়া পিসিমাতার প্রার্থনা পঠিত হয়।

গত ১০ই এপ্রিল, আলীপুরে ২৮নং নিউরোডে, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের পূজনীয়া মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পাটনা হইতে জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের প্রেরিত প্রার্থনা পঠিত হয়।

কোচবিহার-সংবাদ—কোচবিহারের মাননীয় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতা-প্রাপ্তির শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করিবার জন্য, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ গত ৪ঠা এপ্রিল কলিকাতা হইতে কোচবিহার গমন করেন। ৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণে কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। ৬ই এপ্রিল রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতা-প্রাপ্তির শুভ অনুষ্ঠান দিন পূর্ব্বাহ্ণে ৮টায় কেশবাশ্রম-কুটীরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। এবং প্রার্থনায় মাননীয় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের উপর, রাজপরিবারের উপর ও সমগ্র কোচবিহার রাজ্যের উপর স্বর্গের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বর্গীয় মাননীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমাধিক্ষেত্রে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। পূর্ব্বদিন ৫ই রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে কোচবিহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ও সন্ধ্যার পর নববিধান সমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শুভানুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ভাবে উপাসনা করেন। ৯ই এপ্রিল, মাননীয় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ গ্রন্থাদি উপহার প্রদান উপলক্ষে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে ছিলেন। যে সকল গ্রন্থ উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইল, তাহার মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের গুরুত্ব বিষয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নব মহারাজের নিকট কিছু বলেন। সেই কথার ভাবে "True Faith" গ্রন্থখানি মহারাজা হাতে লইয়া তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া লন। নবধর্ম্ম নব-বিধানের নবালোক স্বর্গীয় মাননীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জীবন-যোগে ও মাননীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবন-যোগে কোচবিহারে প্রবেশ করিয়া কোচবিহারকে নব কোচবিহারে পরিণত করিয়াছে। মাননীয় মহারাজার নিকট ভাই গোপালচন্দ্র অল্প কয়েকটী কথায় তাহা উল্লেখ করেন এবং কেশবচন্দ্রের Lectures In India প্রথম খণ্ড হইতে "Behold the Light of Heaven in India" বক্তৃতাটী বাহির করিয়া তাহা বিশেষ ভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। কেদারবাবু কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে মহারাজকে একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা বিষয়ে প্রস্তাবটী মহারাজার নিকট উপস্থিত করেন। ১৮ই এপ্রিলের পর কোন সময়ে ঐ অভিনন্দন গ্রহণ করিতে মহারাজা সম্মত হন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ৮ম সংখ্যা।
১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ।
29th. April, 1936.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মানবমণ্ডলীর ভাগ্যবিধাতা পরম দেবতা! আমাদের জীবনকে শুধু শিক্ষাক্ষেত্র কর নাই, সাধনক্ষেত্রও করিয়াছ। পৃথিবীতে আনিয়া কত বিচিত্র ভাবে শিক্ষা দান করিয়াছ ও করিতেছ, কত বিচিত্র ভাবে সাধন-সন্ধান বলিয়া দিয়া নব নব সাধনে দীক্ষিত করিতেছ, সাধনের পথে, সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছ। আমাদের জীবন ক্ষুদ্র হইলেও অনন্ত উন্নতিশীল। তাই দেখি, আমাদের জীবনে শিক্ষার সীমা নাই, সাধনের সীমা নাই, সিদ্ধিরও সীমা নাই। শিক্ষার আয়োজনের সীমা নাই, সাধনের ও সিদ্ধির প্রচেষ্টারও অন্ত নাই। শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে অন্তর্জ্জগতেই বা কত আয়োজন, বহির্জ্জগতেই বা কত আয়োজন। সময় অনন্ত, সেই অনন্ত সময়কে আমাদেরই প্রয়োজনে খণ্ড খণ্ড করিয়া, দিন, মাস, ঋতু, বৎসরে পরিণত করিয়াছ। এই যে বৈশাখ মাস, প্রতি নূতন বৎসরের আরম্ভে পুণ্য সাজ পরিধান করিয়া ভারতের তোমার পুত্র কন্যাদিগের নিকট বিশেষ শিক্ষা ও সাধনের আয়োজন রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। নূতন বৎসরের আরম্ভে এই তো বৈশাখ মাসটি সেই পুণ্যের সাজ পরিধান করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। তোমার প্রেরিত নব ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বদেশের, বিদেশের কত প্রাচীন সাধন-পদ্ধতি ও সাধনের উপায়কে তোমারই ইঙ্গিতে ও তোমারই শিক্ষাধীনে নূতন ভাবে গ্রহণ করিয়া, লুপ্ত উপায় ও লুপ্ত সাধনকে নূতন ভাবে জাগাইয়া তুলিলেন, দেশে নূতন জীবনধারা প্রবাহিত করিয়া প্রাচীন ভারতকে নূতন ভারতে পরিণত করিলেন। আমরা তাঁহারই পথের পথিক। এই বৈশাখের প্রথম দিনে, তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ব্রত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে, তোমারই শুভব্যবস্থায়, ধর্ম্ম-পিতা মহর্ষিদেব কর্ত্তৃক বরিত হইলেন; সেই পুণ্য-ব্রত গ্রহণ দ্বারা এই বৈশাখ মাসকে জ্বলন্ত পুণ্য মাস রূপে নব বংশের নিকট জাগাইয়া তুলিলেন। আচার্য্য-ব্রত তপস্যার ব্রত। কেবল তপস্যা। পুণ্য সূর্য্য, অনন্ত পুণ্য-তেজ ব্রহ্ম হইতে পুণ্য উত্তাপ ক্রমাগত গ্রহণ করিয়া, সেই উত্তাপে জীবনকে অগ্নিময় করিয়া, সেই অগ্নি দলের জীবনে, দেশের জীবনে, বিশ্বের জীবনে কেবল বিতরণ করা আচার্য্য-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। নব বৎসরের সুপ্রভাতপ্রদ পুণ্য বৈশাখের প্রথম দিন, বৈশাখের সমগ্র পুণ্য মাস আমাদিগের সাধন-পথে আমাদিগকে কি নূতন ভাবে এ সময় উদ্বুদ্ধ করিবেনা? তপস্যাই তো আমাদের আত্মিক জীবন। কেবল ব্রহ্মের

উত্তাপ গ্রহণ ও ধারণ, ব্রহ্মের উত্তাপে জীবন গঠন এবং ব্রহ্মোত্তাপময় জীবন হইতে চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মোত্তাপ, ব্রহ্মাগ্নি ক্রমাগত উদ্গীরণ, ইহাই তো আমাদের উচ্চ কর্ত্তব্য। উত্তাপ-গ্রহণের আয়োজন তোমারই কৃপায় ক্রমাগত আমাদের নিকট উপস্থিত; কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ কৃপা ভিন্ন আমরা উদ্বুদ্ধ হই না, তোমার আদিষ্ট তপস্যার পথও গ্রহণ করি না। তাই তব পদে কাতর ভিক্ষা, আমাদিগকে জাতীয় ভাবে এই পুণ্য মাস বৈশাখ মাস সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ কর এবং এ সময়ে বাহিরের প্রবল সূর্য্যো-ত্তাপকে আমাদের তপস্যার আয়োজনরূপে গ্রহণ করিতে দিয়া, আমাদিগকে উচ্চ তপস্যায় নিযুক্ত কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস।

বিশ্বাসের মূল্য আমরা সকল সময় বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর পিতামাতা, গুরুজন যাঁহারা, তাঁহারা সন্তান সন্ততি হইতে বিশ্বাস ও বাধ্যতা বিশেষ ভাবে আশা করেন, আকাঙ্ক্ষা করেন। যে সকল পিতামাতা ও গুরুজন সন্তান সন্ততিগণ হইতে আশানুরূপ বিশ্বাস ও বাধ্যতা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের প্রাণের উচ্চ তৃপ্তি ও চিত্তের গভীর সন্তুষ্টির বর্ণনা সম্ভবে না। পৃথিবীর পিতামাতা তো বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা যিনি, তাঁহারই স্বভাবের গূঢ় প্রতি-কৃতি, যত সামান্য আকারই হউক না। পৃথিবীর পিতা মাতা যদি সন্তান হইতে বিশ্বাস বাধ্যতা আকাঙ্ক্ষা করেন, আশা করেন, তবে মহান্ স্বভাব পরমপ্রকৃতি বিশ্বপিতা-মাতা পরমেশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের নিকট যে পূর্ণ বিশ্বাস বাধ্যতা চাহিবেন, ইহা তো অতি স্বাভাবিক। তাই ধর্ম্মরাজ্যে বিশ্বাস ও বাধ্যতার এত আবশ্যকতা, এত আদর ও এত গৌরব। আমরা দেখিতে পাই, সন্তানগণ অল্প বয়সে, কচি মনে পিতামাতাতে সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত থাকিয়া, পিতামাতায় আত্মসমর্পণ করিয়া, পিতৃমাতৃসর্ব্বস্ব হইয়া থাকিতেই ভালবাসে, তাহাতেই তাহাদের আরাম ও আনন্দ। চেষ্টা করিয়া, সাধনা করিয়া পিতামাতাতে তাহাদের বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হইতে হয় না; স্বভাবের গূঢ় প্রেরণায় তাহারা সহজ ভাবে পিতামাতাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, পূর্ণ জীবন্ত বিশ্বাস প্রতি আচরণে প্রদর্শন করে। এইরূপে কচি কচি ছেলে মেয়েরা পিতামাতাতে পূর্ণ জীবন্ত জ্বলন্ত বিশ্বাস আপনাদের আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, বিশ্বাস ও নির্ভর বিষয়ে বয়স্কদিগকে, বৃদ্ধদিগকে শিক্ষা দান করে। ছোট ছোট কচি ছেলে মেয়েরা যেমন আপনাদের পিতা মাতাকে সর্ব্বস্ব করিয়া, জ্বলন্ত, জীবন্ত বিশ্বাসের জীবন্ত পরিচয় দান করে, এমন পরিচয় অতি অল্পসংখ্যক সাধকগণ আপনাদের উপাস্য দেবতা ঈশ্বর সম্বন্ধে দান করিয়া থাকেন; কেবল ঈশ্বর-প্রেরিত লোক-গুরু বিশেষ সাধু মহাজনগণই ঈশ্বরের কার্য্যে আপনাদের জীবন পণ করিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, বিশ্বাস, নির্ভর ও বাধ্যতার জ্বলন্ত পরিচয় মানব-কুলের জন্য রাখিয়া যান।

পাষণ্ড ও নাস্তিক শ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোক ভিন্ন জনসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ঈশ্বরকে অল্পাধিক স্বীকার করেন; একজন দণ্ডদাতা, পুরস্কর্ত্তা আছেন, বিশ্বাস করেন। সাধারণতঃ মানুষ কৈশোর বয়স পর্য্যন্ত পৃথিবীর পিতামাতাতে নির্ভরশীল থাকে। যৌবনের আরম্ভে ক্রমে মনুষ্যত্বের প্রকাশ, শক্তি, জ্ঞান ও হৃদয়ের ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর পিতামাতার প্রতি তাহার বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা কমিতে থাকে। ক্রমে একটু স্বাধীন হইয়া কার্য্যতঃ সে দেখিতে পায়, পদে পদে সে অবস্থার দাস হইয়া স্বাধীনতা হারাইতেছে, ক্রমে তাহাকে অন্য মানুষেরও দাসত্ব করিতে হইতেছে। সে দেখিতে পায়, আপনার বুদ্ধি, আপনার শক্তিবল, আপনার গুণ গরিমা আর জীবন-পরিচালনে যথেষ্ট হয় না; তখন সে একজন খানিকটা অজানিতশক্তি, অজানিত পুরুষকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তিনিই হইতেছেন বিশ্বরাজ, বিশ্বপতি, বিশ্বপিতামাতা, বিশ্বসুহৃদ পরমেশ্বর। পৃথি-বীর পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের প্রকৃতিগত যোগ, প্রকৃতি-গত সম্বন্ধ থাকে; বিশ্বপিতামাতা পরমেশ্বরের সঙ্গেও প্রতি মানবের প্রকৃতি ও স্বভাবগত সম্পর্ক থাকে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক মানুষের নিকট ততদূর এবং ততদিন অস্পষ্ট, অপরিস্ফুট থাকে, যতদূর এবং যতদিন মানুষ ঈশ্বরকে পৃথিবীর পিতামাতা ও সুহৃদ-রূপে সাক্ষাৎ দর্শন ও বাণী-শ্রবণের ভিতর দিয়া, আচার ও আচরণের ভিতর দিয়া বুঝিতে না পারে।

ঈশ্বর-সম্পর্কের গূঢ় অনুভূতি প্রত্যেক মানবের অন্তরে স্বভাবের নিয়মে অল্পাধিক রহিয়াছে। প্রথমে তাহা এক-

রূপ অস্ফুট, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। সংসারের পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ও পিতামাতাতে সন্তানের বিশ্বাস যেমন পিতামাতার আচার ও আচরণের মধ্য দিয়া জীবন্ত ভাব ধারণ করে, তদ্রূপ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক ও ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আচার ও আচরণে মধ্য দিয়া ক্রমে জীবন্ত ভাব ধারণ করে। এখন দেখি, কি প্রকারে ঈশ্বরের আচার ও আচরণ মানুষের নিকট জীবন্ত অনুভূতির বিষয় হয়। পৃথিবীতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন ক্রন্দন করে, তখন জানা যায়, সন্তান জীবিত, সেই ক্রন্দনকারী সন্তানকে মাতা স্তনদুগ্ধ দান করেন। পৃথিবীর হিসাবে ক্রন্দন জীবনের লক্ষণ, স্বর্গের হিসাবেও আধ্যাত্মিক রাজ্যে ক্রন্দনই জীবনের লক্ষণ। কথিত আছে, ঈশ্বর জীবিতদিগের, মৃতদিগের নহে। যাহারা পৃথিবীর হিসাবে জীবিত থাকিয়া বাহ্য ধনৈশ্বর্য্যের আকর্ষণে পড়িয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে, ঈশ্বরকে চায় না, তাহারা স্বর্গের হিসাবে মৃত। ঈশ্বর তো মৃতদিগের ঈশ্বর নহেন, অর্থাৎ যাহারা তাঁহাকে না চায়, তাহাদের নিকট তিনি অপ্রকাশিত থাকেন, কোন আত্মপরিচয় দেন না। যখনই কোন অভাবে পড়িয়া মানুষ তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন করে, সেই ক্রন্দনকারী আত্মার নিকট পরমাত্মা আপনাকে প্রকাশিত করেন, আপনার পরিচয় দান করেন। কখন দর্শন দিয়া, কখন অভয়বাণী শুনাইয়া, তিনি ক্রন্দনকারী সন্তানকে বল, শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেন। পৃথিবীর কোন পরমাত্মীয় যে সহায়তা করিতে না পারে, সেই সহায়তা যখন মানুষ ঈশ্বর হইতে জীবনের বিশেষ সঙ্কটের সময়, অভাবের সময়, বিপদ পরীক্ষার সময় পায়, তখন মানুষ ঈশ্বরের মূল্য বুঝিতে পারে। এইরূপে বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত মানুষ, সংসারে কর্ম্মব্যস্ত মানুষ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবস্থায়, সকল ঘটনায় যখন জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত হস্ত দর্শন করে, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত সহায়তা লাভ করে, তখন সে যখনই ক্রন্দন করে, যখনই প্রার্থনাশীল হইয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করে, তখনই ঈশ্বর সেই বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত সন্তানের জীবনে কখন শাসনকর্ত্তা প্রভুরূপে, কখন শিক্ষা-গুরুরূপে, কখন স্নেহময় পিতারূপে, কখন লীলাঘন শ্রীহরিরূপে, কখন স্নেহের দিব্য-প্রতিমা অথচ অনন্ত শক্তি ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের আধার পরম জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়তা ও স্নেহ ভালবাসা দিয়া সে সন্তানকে ক্রমে আপনার করিয়া লন, তখন সে সন্তান ঈশ্বরকে পিতার পিতা পরম পিতা, নিত্যকালের পিতা, মাতার মাতা পরম মাতা, নিত্য কালের মাতা, নিত্য কালের বন্ধু সুহৃদরূপে পাইয়া, সেইরূপে সম্বোধন করিয়া, ক্রমে তাঁহাকে জীবনে চরিত্রে ধারণ করিয়া, লাভ করিয়া ধন্য হইতে থাকে। এরূপে জীবন্ত ঈশ্বরে মানুষ ইহকাল পরকাল সম্পর্কে জীবনের সকল আশা ভরসা স্থাপন করে; ক্রমে এরূপ জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসী হইয়া আপনার জীবনে, গৃহ পরিবারে, বিস্তৃত মানব-মণ্ডলীতে, বাহ্য জগতের ছোট বড় যাহা কিছু সকলের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা, জীবন্ত ক্রিয়া দর্শন, সকল বিষয়ে, রোগে, শোকে, বিচ্ছেদে, এমন কি মরণেও তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় দর্শন করিয়া সে ধন্য হয়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস-মূলক গ্রন্থাদি ক্রমে পাঠ ও চর্চ্চা করিয়া নব নব জ্ঞান, নব নব শিক্ষা, নব নব তত্ত্ব যেমন মানুষ লাভ করে, তেমনই আপনার জীবনে, গৃহ পরিবারে, সমস্ত মানবমণ্ডলীতে, অতীতে ও বর্ত্তমানে সকল অবস্থায়, সকল ঘটনায় মানুষ ঈশ্বরের লীলা পাঠ করিয়া, আলোচনা করিয়া, তাঁহার স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহা হইতে দিব্য জ্ঞান ক্রমে লাভ করিয়া, শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় বিদ্বান্ হয়। তখন মানুষ প্রত্যক্ষ করে, পৃথিবীর ব্যাপার পাঠ আলোচনা করিয়া, পৃথিবীর সম্পর্কীয় সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস পাঠ করিয়া যে জ্ঞান, যে বিদ্যা লাভ হয়, সে জ্ঞান, সে বিদ্যা অপরা বিদ্যা; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরাবিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এইরূপে ক্রমে নানা শিক্ষার ভিতর দিয়া মানুষ জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসী হইতে আরম্ভ করে। বিশ্বাসও বর্দ্ধনশীল হয়। বিশ্বাস ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, বিশ্বাস ক্রমে অনুরাগ, প্রেম ও ভক্তিতে পরিণত হইয়া মনুষ্য-জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করে। জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস এক দিকে ঈশ্বরের কৃপা-সাপেক্ষ, অন্য দিকে মানুষের ক্রন্দন, ব্যাকুলতা ও সাধন-সাপেক্ষ। যে মানুষ একবার সংসার-বন্ধনে বান্ধা পড়িয়াছে, সে সহজে জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস লাভ করিতে ও রক্ষা করিতে পারে না। এখানেও কত উত্থান পতন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা অসীম। তাঁহার অসীম কৃপাতেই মানুষ জীবন-পথে নব নব চেতনা লাভ করে, নব নব বল লাভ করিয়া জীবন যুদ্ধে জয়ী

হয়। এইরূপে ক্রমে জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস মানুষের জীবনে চির প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসী সকল অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকেই তাকাইয়া থাকে। ঊর্দ্ধ হইতেই সকল প্রয়োজনীয় লাভ করে।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

ক্রুশ, বক্‌রি ইদ, চড়ক।

খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রুশোৎসব, এসলাম ধর্ম্মের বক্‌রি ইদ এবং হিন্দু শৈব ধর্ম্মের চড়ক প্রায় একই সময়ে সংসাধিত হয়। এই তিনটী অনুষ্ঠানের ভাব প্রায় একই। ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশা তাঁর ধর্ম্মবিরোধীদিগের দ্বারা ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইলেন, বিদ্ধ হইয়াও পাপী অপরাধীদিগের জন্য প্রার্থনা করিলেন; মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহার এই আত্মবলিদান। ইহার অর্থ নানা ভাবে খৃষ্টযাজকগণ করিলেও, মানবের পাপের জন্য আত্মবলিদানে মানবের পুনরুত্থান, ইহাই ইহার মূল তাৎপর্য্য। সাধু এব্রাহাম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিজ পুত্রকে বলিদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, পুত্রের বলিদান না লইয়া ঈশ্বর তাহার পরিবর্ত্তে পশুবলি গ্রহণ করিলেন। মনের মায়া বা সকল পশুভাবের বলিদানে ঈশ্বরের প্রীতিলাভ হয়, এই উদ্দেশ্যেই এসলাম ধর্ম্মের সাধকগণ মাসাধিককাল রোজা রাখিয়া বা আত্মসংযম সাধন করিয়া, পরে পশুবলিদানে বক্‌রি ইদ উৎসব করেন। শিবভক্তগণ একমাস ধরিয়া সন্ন্যাস লইয়া আত্মনিগ্রহ করিতে করিতে চড়ক কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া মহাদেবের প্রীতিলাভ করেন। এই অনুষ্ঠানগুলি যদিও কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, ইহাদের উচ্চ উদ্দেশ্য একই আত্মসংযম, আত্মবলিদান ও উজ্জীবনলাভ। অধ্যাত্মবিধান নববিধানে এই তিন অনুষ্ঠানেরই মুখ্য উদ্দেশ্য অধ্যাত্মভাবে সাধন করিলে, আমরা সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিতই আত্মিক সমযোগ লাভ করিতে পারি।

—

পুনরুত্থান।

শ্রীঈশার শিষ্যা তাঁহার দেহ ভিক্ষা লইয়া, ক্রুশ হইতে নামাইয়া কবরে প্রোথিত করিলেন। তিন দিন পরে আসিয়া দেখেন, কবরের আবরণ-প্রস্তর স্থানান্তরিত। কবরস্থ দেহ আর কবরে নাই। দেবদূতেরা বলিল, দেবনন্দন পুনরুত্থিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টমণ্ডলী এই ঘটনার ব্যাখ্যান নানা মতে দিয়া থাকেন। আমরা নবালোকে দেখি, মানবাত্মা ব্রহ্ম-সন্তান। তাহা পৃথিবীর নানা পরীক্ষা বিপদ অপমান লাঞ্ছনারূপ ক্রুশে আহত হইয়া যখন দৈহিক জীবনে নিহত হয়, তখন আর পৃথিবীর মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া বিনষ্ট হয় না, তাহা পুনরুত্থিত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করে এবং পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলিত হয়। আরো আমরা বিশ্বাস করি, ব্রহ্মনন্দনরূপ ঈশা-জীবন পরম দেবতা বিধাতা সুপরীক্ষিত বীজের ন্যায় এই পৃথিবীতে প্রোথিত করিয়াছেন; তাহা ক্রমে সমগ্র মানবজীবনে অঙ্কুরিত ও পুনরুত্থিত হইতেছে। তবে জ্ঞানবিচারের শুষ্ক উত্তাপ যেখানে, সেখানে সে বীজ তেমন অঙ্কুরিত বা প্রসারিত হইতেছে না; যেস্থান ভক্তি প্রেমের জলে সিক্ত, সেস্থানেই ইহা জীবনতরুরূপে উদ্গত ও ফলফুল-শোভিত হইবে বা হইতেছে। তবে ব্রহ্মনন্দন-বীজ অমোঘ বীজ, ইহা মরিবে না, গজাইবেই গজাইবে। নববিধানের বসন্ত কাল আসিলে সমগ্র মানব-দেহ লইয়া ইহা স্বর্গে পুনরুত্থান করিবে।

—

বৈবাহিক প্রেম ও শুদ্ধতা।

বৈবাহিক প্রেম শুদ্ধ প্রেম, স্বর্গীয় প্রেম, এক অদ্ভুত নূতন প্রেম। এক পিতামাতার সন্তান সন্ততি ভাই বোন পরস্পর পরস্পরকে যে ভালবাসায় ভালবাসেন, সে এক রকম, সেও অনেকটা পার্থিব শরীরের রক্তের সম্বন্ধজনিত প্রেম; কিন্তু এক পরিবারের ছেলে, আর এক পরিবারের মেয়ে পরস্পরের যাই বিবাহ হইল, পরস্পরকে কি এক স্বর্গীয় প্রেমচক্ষে দেখিল, তাহা ভাই বোনের পরস্পরের ভালবাসার চেয়েও অধিক, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসার চেয়েও অনেক নিগূঢ় ও গভীর। পরকে আপন করার সূত্রপাতও বৈবাহিক প্রেমে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে আত্মবৎ অপরকে ভালবাসিবে বিধি ছিল, নববিধান যে বলিলেন, আপনার চেয়েও অন্যকে অধিক ভালবাসিবে; সেই ভালবাসা এই বৈবাহিক ভালবাসাতেই সাধিত হয়। যে স্বামী স্ত্রী আপনার চেয়েও পরস্পরকে ভালবাসিতে না পারেন, তাঁহাদের ভালবাসাই হয় না। কিন্তু ইহা দৈববলে হইয়া থাকে, চেষ্টা করিতে হয় না; এই অহৈতুকী ভালবাসা কোথা হইতে আসিয়া থাকে? আবার ইহা কেবল শারীরিক মিলন হইতে উদ্গত নয়। শারীরিক মিলন বিশুদ্ধ পবিত্র ভাগবত মিলন আনিয়া দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করে। তাই এই উদ্বাহমিলন ধরায় বৈকুণ্ঠের পরিবার গঠন ও স্থাপনের জন্য বিহিত। বিধাতা স্বয়ং এই মিলন সংগ্রথিত করিয়া দেন; পৃথিবী যেন ইহা কলুষিত না করে।

—•—

স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসু।

(শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক পঠিত)

"তুলসী তুম যব জগমে আওয়ে
জগ হাসে তু রোয়ে।
এইস্যা করণি করকে চলওয়ে
যব তু হাসে জগ রোয়ে॥"

ভক্ত তুলসীদাসের এই গাথা তত স্পষ্ট কোনও দিনই হয়নি, যত হয়েছিল সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে, যেদিন পিতৃদেব আত্মী-

স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগের দরবিগলিত অশ্রুধারা ও "ওপরে আমার মন তারক ব্রহ্মনাম" এই কীর্ত্তনের মধ্যে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্য বৃহস্পতিবার, যে দিন তুমি ভক্ত সাধুদের নিয়ে শ্রীভগবানের নিকট কতই প্রার্থনা করিতে, তোমার সেই বন্ধুগণ তোমা বিহনে আকুল ক্রন্দনে যখন শ্রীভগবানের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে ছিলেন, তখন এই গাথা আমাদের মনে আরও স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছিল।

১২৭৮ সালের ১১ই মাঘ, হুগলী জেলার অন্তর্গত দশঘরা গ্রামে, আমাদের পিতৃদেব জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের পিতামহ ৺কৈলাসচন্দ্র বোসের দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের পিতৃদেবই সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। শুনিয়াছি, পিতৃদেবের জন্মের সময় আমাদের গ্রামে খুব হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল; তাই বোধ হয়, তিনি এমন মধুর কণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিনেও সেই হরিনাম করিতে করিতে তাঁর আত্মা অমর লোকে চলিয়া গেল। বাল্য জীবনে যখন তিনি সিটি স্কুলে পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁর মন ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রেরিত প্রচারকবর্গের জীবনের প্রভাব তাঁহাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তিনিও তাঁহার মধুর সঙ্গীতে তাঁহাদের সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

আমাদের পিতামহ অতি ধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, সেই জন্য পিতামাতার মানসিক ক্লেশের জন্য এই সময় তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যৌবনকাল হইতেই তিনি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া গিয়াছেন।

১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত চোপা গ্রামনিবাসী ৺মুকুন্দবল্লভ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবীকে বিবাহ করেন। আমাদের মাতামহ একজন ধর্ম্মপরায়ণ, একনিষ্ঠ ও নির্লোভী মহাপুরুষ ছিলেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। ৺কান্তিচন্দ্র মিত্র, শান্ত সাধক ৺কেদারনাথ দে, ৺উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রেরিত প্রচারকবর্গের সহিত তাঁহার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এই বিবাহের কিছুকাল পরে পিতৃদেব ই, আই, আর, আফিসে এক চাকুরী গ্রহণ করিয়া জামালপুরে গমন করেন। জামালপুরে অবস্থান কালে তিনি মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতেন ও তাঁহার সুললিত কণ্ঠে সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। জামালপুরে আসিবার কয়েক বৎসর পরেই ঐ আফিস কলিকাতায় উঠিয়া আসে এবং তিনিও কলিকাতায় বদলি হইয়া আসেন। এই সময় হইতে তিনি কলিকাতায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই পিতৃদেব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লইয়া আমাদের দেশের বাড়ীতে শারদীয়া পূজা দেখিতে যান; সেই সময়ে একদিন রাত্রে কোনও প্রকারে মশারীতে আগুন লাগিয়া আমাদের ভ্রাতার ৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। সেই দিন বৃহস্পতিবার ছিল, এবং সেই দিন হইতেই পিতৃদেব বৃহস্পতিবার পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ করেন। এই বৃহস্পতিবার তাঁহার জীবনে একটী বিশেষ দিন ছিল। সেই দিন তাঁহার ভক্ত বন্ধুগণ ও আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার সহিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। এই সাপ্তাহিক উপাসনা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কখনও কোনও অবস্থায় বন্ধ হইতে দেখি নাই। এই বৃহস্পতিবারের উপাসনা আমাদের পরিবারের একটী মস্ত বড় সম্পত্তি। এই উপাসনাতে যে কত লোক উপকৃত হইয়াছেন, কত সাধু ভক্তের সঙ্গ লাভ হইয়াছে, কত আত্মীয় বন্ধু লাভ হইয়াছে, তাহা আজ স্বীকার করিতেছি। আজ যে উপাসনাতে এত লোককে কাকা, জ্যেঠা, দাদা বলিয়া ডাকিতে পারিতেছি, তাহার মূল আমাদের বৃহস্পতিবারের উপাসনা। আজ যে শোকার্ত্ত হইয়াও এত লোকের সান্ত্বনা আশীর্ব্বাদ পাইতেছি, এত লোককে আপনার বলিয়া আশ্বস্ত হইতেছি, সে কেবল বৃহস্পতিবারের উপাসনার ফল। কত দিন দেখিয়াছি যে, বাবার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া বৃহস্পতিবারের উপাসনাতে কোনরূপ শৈথিল্য দেখি নাই।

১৩১৪ সালে তিনি চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ও তিন বৎসর পরে ঐ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ভবানীপুরে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

এই সময়ে তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে যোগদান করেন এবং আচার্য্য, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য, সম্পাদক ও শেষকালে ট্রাষ্টি হিসাবে ঐ সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী, ৺শশিভূষণ মজুমদার, ৺এস, আর, দাস, ৺গিরিশচন্দ্র দে ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুর নাম তাঁহার সহকর্ম্মী হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ধর্ম্মশীল আত্মারা প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আজ তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

প্রায় ২৫ বৎসর কাল তিনি খুব সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়াছিলেন এবং এই দীর্ঘ ২৫ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা একদিনও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার বিহনে তাঁহারা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন, নিজেদের কত অসহায় মনে করিতেছেন।

প্রায় তিন বৎসর আগে তাঁহার একটী চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি একে-

বারে নষ্ট হইয়া যায়, এই সময় হইতে তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ইহার পরে তাঁহার স্বাস্থ্যের আর কোনও উন্নতি হয় নাই। শেষে প্রায় ৩।৪মাস আগে উদরী নামক করাল ব্যাধি তাঁহার দেহে প্রবেশ করে এবং চিকিৎসকগণের বহু চেষ্টা ও পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর আপ্রাণ সেবা, কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাঁহার সেই অতি প্রিয় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর আত্মা অমরলোকে চলিয়া গেল।

১লা জানুয়ারী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা এই দুটি দিন তাঁর জীবনের বড় প্রিয় দিন ছিল। আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, দেখিয়াছি, বৎসরের প্রথম দিন তিনি পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব ও তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র সবাইকে লইয়া কোনও উদ্যানে কিম্বা রামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধিস্থান দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। সেখানে কি প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতেন ও কি ব্যাকুল ভাবে উপাসনা করিতেন। অনেক সময় মনে হইত, যেন ঠিক তিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা করিতেছেন। শেষে প্রায় গত ১৫ বৎসর হইতে এই উৎসবটী আমাদের বাটীতেই হইত; এই সময় নামকীর্ত্তন, ব্রহ্মো-পাসনা ও শেষে ভক্তদের সেবা করিয়া তিনি জীবনে যে কি অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা আজ এই সামান্য লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

বসু রামানন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক সময় তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। অনেক সময়, কি সাধারণ কথাবার্ত্তায়, কি পারিবারিক কোনও ক্রিয়া কর্ম্মের মধ্যে, তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, সর্ব্বদা মনে রেখ, কত বড় বংশে আমাদের জন্ম। এই বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি আমরা চলতে পারি, তা'হ'লে কোনও দিন কোনও পাপ আমাদের স্পর্শও করিতে পারিবে না। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় বসু রামানন্দকে বলিয়াছিলেন, এ বংশের সমস্ত ভার আমি নিলাম। এই জন্যই এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তাঁর কাছে এত প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, যে মহাপুরুষ আমাদের বংশের সমস্ত ভার লইয়াছিলেন, আজ তাঁর জন্মতিথি, সুতরাং এই তিথি আমাদের কাছে অতি পবিত্র দিন। তাই বোধ হয়, এই দিনকে আরও স্মরণীয় করিবার জন্য, এই শুভ তিথিতে, শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার আত্মা অমরলোকে চলিয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাব জীবনের শেষ দিকে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি বার বার বলিতেন যে, "নাম সাধন কর, ইহা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই।" ভগবানের কৃপা না হইলে কিছুই লাভ করা যায় না। তাঁহা কৃপা পাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিতে হইবে। সম্প্রদায়ের গণ্ডী তাঁহাকে আর আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই উৎসবে যোগদান করিলে সমাজের লোক কি মনে করিবে, এই সব চিন্তা তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারিত না। কোথায় গেলে এবং কি করিলে খাঁটী জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি সেইখানেই ছুটিতেন এবং সেই ভাবেই সাধন করিতেন।

যাও, যাও, হে দেব, সেই শান্তিময় রাজ্যে, যেখানে তোমার ঋষিতুল্য পিতৃদেব, পুণ্যবতী মাতৃদেবী, অগ্রজ, আদরের ভগিনীত্রয়, আর আর গুরুজন ও প্রাণপ্রিয়ধন রবীন্দ্র ও সরল, সকলের সহিত মিলিত হও। স্বর্গের দেবদেবীগণ তোমাকে শান্তি দান করুন। যে রাজ্যে অমরাত্মাগণ বাস করেন ও যে রাজ্যে তাঁহারা ভ্রমণ করেন, জগৎপ্রসবিতা তোমার আত্মাকে সেই স্থানে স্থাপন করুন। হে গোলোকাধিপতি! হে বিশ্বপতি! ইহলোক, পরলোক, এলোক, ওলোক, স্বর্গ ও মর্ত্ত সমস্ত একাকার করে আজ তুমি এই শ্রাদ্ধবাসর মহাতীর্থে এসেছ। করুণা করে, জননী, আজ আমাদের এই দৃষ্টি দাও, যেন আমরা তোমারই মধ্যে আমাদের পিতৃকুল, মাতৃকুল ও জগতের সমস্ত সাধু, সাধ্বী-দের সঙ্গে আমাদের পিতৃদেবকে দর্শন করিতে পারি। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যেন চিরদিনই অটুট থাকে এবং পিতৃধনে পুত্রদেরই অধিকার, তাঁর সেই ধর্ম্মজীবনলাভের ব্যাকুলতা যেন আমরা সবাই লাভ করি এবং তাঁর মত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে পারি।

সাধু হীরানন্দের জীবনী।

হীরানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ।

হীরানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ পাঞ্জাব হইতে আসিয়া হায়দ্রাবাদ জেলার খুদাবাদ বা খোদাবাদ নগরে সিন্ধুদেশীয় থালহোক রাজন্য-বর্গের কর্ম্মচারিরূপে বাস করিতেন। পাঞ্জাব প্রদেশের শিখ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু নানকের ধর্ম্মই, বোধ হয়, ইঁহাদের কুলধর্ম্ম ছিল।

হীরানন্দের পিতামাতা।

হীরানন্দের পিতার নাম দেওয়ান সথীরাম নন্দীরাম। তিনি তাঁহার জাতি মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত সম্প্রদায়ের দলপতি ছিলেন। আপনাদিগের কার্য্যধারানুসারে তাঁহার এই জাতির নাম ছিল ক্ষত্রী আমিল। কায়স্থ জাতির ন্যায় ইঁহাদের গভর্ণ-মেণ্ট চাকুরীই প্রধানতঃ ব্যবসায় ছিল। শ্রীগুরু নানকের ধর্ম্মই হীরানন্দের পিতার ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের তেজস্বিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার মুখশ্রীতে বিশেষ পরিলক্ষিত হইত। তিনি সেই প্রাচীন সমাজের সামাজিক জীবনের ভদ্রতা, শীলতার অতি সুন্দর আদর্শ ছিলেন। তিনি আচরণ ও ব্যবহারে একজন অত্যন্ত নিয়মতন্ত্রী ব্যক্তি ছিলেন। বাক্য ও কার্য্যে আপনাকে বিশেষ নিয়মাধীন রাখিতেন। পারসী অক্ষরে তাঁহার হাতের লেখা সুন্দর ছিল। দীর্ঘ দিন তিনি তালুক-রেভেনিউ অফিসারের ও ম্যাজিষ্ট্রেটের

কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আফিসের হিসাবাদির কাগজ পত্র এমন পরিষ্কাররূপে রক্ষিত হইয়াছিল যে, তাঁহার ঘোর শত্রুও এমন কথা মুখে আনিতে পারিত না যে, তিনি কখন উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যখন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে পুরা পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে সম্মানসূচক একটী উপাধি দেওয়া হয়। এবং তিনি হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপালিটীর একজন অগ্রগণ্য মেম্বররূপে কার্য্য করেন। ইহা ভিন্ন তিনি অবসরকালে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে সংস্কারকার্য্যে আপনার সময় ও শক্তি বিশেষভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে সমাজ মধ্যে বিবাহব্যয় কমাইতে ও নানা প্রকার অনিষ্টকর সামাজিক দুর্নীতি অনেক পরিমাণে দূর করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। পিতার এরূপ জীবন হিরানন্দের উত্তরাধিকারিত্বের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান সম্পদ ছিল।

হীরানন্দের মাতা স্নেহবতী রমণী ছিলেন। এবং তাঁহার সুকোমল স্বভাবগুণে তিনি অন্য হইতেও স্নেহ ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি সন্তানগণের নিকট স্নেহময়ী জননী এবং স্বামীর নিকট পতিপরায়ণা রমণী ছিলেন। হীরানন্দের জননী সহজ সাদা সিধে ভাবের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। সেকালের লোকের মত তিনি সংসারের কাজ কর্ম্মে প্রায়ই ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী ছিলেন বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর উদ্বেগের কারণ হয়েন নাই। তাঁহার অন্যান্য আত্মীয় আত্মীয়ার মত তিনিও গুরু নানকের শিষ্যা ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু গুরু নানকের ও গুরু অর্জ্জুনের আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ পদ্যগ্রন্থের অনেকটা তিনি মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিখধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে সারভূত সামগ্রী "জপজি" ও "সুখমণি" তাঁহার মুখস্থ করিতে বাধা বা কষ্টের কারণ হয় নাই। যখন তাঁহার জীবনে বিপদের পর বিপদ আসিয়া ঘনীভূত হইতে লাগিল, তাঁহার সরল সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস একবারও টলিল না। যে উদার প্রীতি ভালবাসা, স্ত্রীজাতি-সুলভ কোমলতা হীরানন্দের চরিত্রের একটা বিশেষ দিক ছিল, এবং যাহা হীরানন্দকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের নিকটও প্রিয় করিয়াছিল, তাঁহার সে চরিত্রের দিক তিনি তাঁহার গর্ভধারিণী জননী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজে সতীত্বের ও ত্যাগস্বীকারের, পতিভক্তির ও পতিপ্রাণতার উজ্জ্বল আদর্শ প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির জীবনকাহিনী গল্পের আকারে হীরানন্দের কুমারী কন্যাগণ তাহাদের পিতামহী হইতেই শুনিয়া উপকৃত হইয়াছিল ও তাঁহা হইতে বিশেষ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

হীরানন্দের ভ্রাতৃগণ।

হীরানন্দেরা চারি সহোদর ছিলেন। হীরানন্দের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দেওয়ান নেভেল রাও, দ্বিতীয় দেওয়ান তারাচান্দ, তৃতীয় দেওয়ান হীরানন্দ, চতুর্থ দেওয়ান মতিরাম। দেওয়ান নেভেল রাও পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, বিষয়কর্ম্ম ও সংসারপরিচালনে যেমন পিতার উপযুক্ত পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রই ছিলেন, তেমনই তিনি আপনার উচ্চ জীবনের উচ্চ আদর্শে কনিষ্ঠদিগের শিক্ষাদানে, স্কুল কলেজে উপযুক্ত শিক্ষালাভের সহায়তা-দানে, নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের উচ্চ আদর্শ আপনার জীবন দ্বারা তাঁহাদের নিকট প্রদর্শনকার্য্যে তাঁহাদিগের নিকট যথার্থই কর্ত্তব্যপরায়ণ আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

হীরানন্দের জীবনের প্রাথমিক বিকাশ ও সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূলে দেওয়ান নেভেল রাওয়ের জীবন। তাই হীরানন্দের জীবনকাহিনী আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নেভেল রাওয়ের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতেছে। তাহাতে হীরানন্দের জীবনের প্রাথমিক বিকাশ ও ভবিষ্যতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

দেওয়ান নেভেল রাও প্রথম বয়সে তাঁহার স্বদেশের একটী ইংরেজি স্কুলে রীতিমত ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন। কলেজে তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। তৎপর তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে সামান্য কেরাণীর পদে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও উচ্চ আদর্শ জীবনের গুণে সর্ব্বোচ্চ গ্রেডের ডিপুটী কলেক্টারের পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে যেমন পরিশ্রমী ছিলেন, অফিসের বাহিরে দেশের ও সমাজের বিবিধ সৎকার্য্যেও বিশেষ শ্রমশীল ছিলেন। তিনি তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের নিকট অনন্যসাধারণ বিশ্বাস ও সম্মান এবং প্রীতি ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশের পর তিনি আপনার পৈত্রিক ধর্ম্মের প্রতি মনোযোগী হইয়া শিখধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থসাহেব ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক তৎকালীন ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবনে আকৃষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন, এবং রীতিমত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। দেওয়ান নেভেল রাও প্রথম জীবনে নানা ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের ভিতর দিয়া যে উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, এই ব্রাহ্মসমাজে যোগদানে ও কেশব-চরিত্রের সহিত মিলনে বিশেষ ভাবে সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবন-গঠনে তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হয়।

দেওয়ান নেভেল রাওর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান তারাচান্দ। তিনি এ সময়ে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন, পরে ইনি সিন্ধুদেশস্থ হায়দ্রাবাদের ট্রেণিং কলেজের সহ-প্রধান কর্ম্মচারিরূপে উন্নীত হন। দেওয়ান তারাচান্দও এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৃতীয় হীরানন্দ, চতুর্থ দেওয়ান মতিরাম।

মতিরাম ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কিছুদিন পরে জেলার জজের পদে উন্নীত হন এবং সেই কর্ম্ম যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া পেন্‌সেন প্রাপ্ত হন।

হীরানন্দের জন্ম ও বাল্যকাল।

১৮৬৩ সালের ২৩শে মার্চ্চ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম সন্তান করুণাচন্দ্রের জন্মের তিন মাস পরে হীরানন্দ মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। সিন্ধুদেশস্থ হায়দ্রাবাদের জনৈক ব্রাহ্মণ হীরানন্দের ভূমিষ্ঠ হইবার ৬ দিন পরে হীরানন্দের কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। তিনি হীরানন্দের নাম "হীরকখণ্ড" "The Diamond of delight" রাখিয়াছিলেন। তিনি তো তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই ক্ষুদ্র শিশু সময়ে সুদূর বঙ্গদেশে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের এবং পরমহংস রামকৃষ্ণের অতি প্রিয় হইবে এবং ত্রিশ বৎসর মাত্র এই পৃথিবীর জল বায়ু সম্ভোগ করিয়া, বিহারের রাজধানী বাকিপুরে, পিতামাতার ও আত্মীয় স্বজনের সেই আদরের দেহ রক্ষা করিয়া, পরম মাতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবে! কিন্তু ইহা বিধাতার বিধি ছিল, বিধি যথা-কালে পূর্ণ হইয়াছে।

মাতার নিকট হীরা এবং মতি অতি মূল্যবান্, হীরক এবং মতিই ছিল, সন্দেহ নাই। অতি বাল্যকাল হইতেই হীরানন্দের বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই বালকের চাউনির ভিতর কি এক প্রকার কর্ম্মতৎপরতার ও তাহার চলা ফিরা আচরণের ভিতর সকলের চিত্তাকর্ষক বুদ্ধিমত্তার ভাব প্রকাশ পাইত। বালক হীরানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নেভেল রাওয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নেভেল রাও বালক হীরানন্দকে সঙ্গে করিয়া আপনার আফিসে লইয়া যাইতেন। বালক হীরানন্দ সেই অল্প বয়সেই নেভেল রাওয়ের মূল্যবান কথার মূল্য বুঝিয়া, তাহা আপনার ক্ষুদ্র জীবন-সিন্দুকে পুরিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সব আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতে যাইয়া, বালক হীরানন্দ জাতিভেদের অসারতা ও ব্রাহ্মণ বলিয়া কাহারও উচ্চ পদবীর যে মূল্য নাই, ফাঁকি, তাহা বুঝিয়াছিল।

দেশীয় ভাষা শিক্ষা।

১৮৭৩সনের ২৭শে জানুয়ারী তিনি সিন্ধু হায়দ্রাবাদের নর্ম্মাল স্কুলের প্রাথমিক লেখাপড়ার শিক্ষার শ্রেণীতে, অর্থাৎ সে দেশের প্রচলিত হাতে খড়ি দেওয়ার কার্য্য আরম্ভ হয় যে শ্রেণীতে, সেই শ্রেণীতে ফ্রী ভর্ত্তি হন। এই শিক্ষারম্ভের শ্রেণী হইতে হীরানন্দ ট্রেণিং স্কুলে ফ্রী (free) ছাত্র স্বরূপ প্রমোশন পাইলেন। যিনি শিক্ষকের সার্টিফিকেট অথবা প্রশংসাপত্রের জন্য লালায়িত নহেন, তাঁহাকে (free student) ফ্রী ছাত্র বলে। ১৮৭৪ সনের ডিসেম্বর মাসে সিন্ধের শিক্ষাবিভাগের ইন্‌সপেক্টার হীরানন্দের সিন্ধি, পার্সিয়ান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, এরিথ্‌মেটিক ও এলজাবরাতে পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং হীরানন্দ কৃতিত্বের সহিত এ সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েন।

যখন তিনি প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দেশীয় সামাজিক কুসংস্কারমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আচরণাদি করিয়া আপনার মনোবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেওয়ান করমল চান্দমলের বেশ স্মরণ আছে, সেই ছোট বালক একদিন মুসলমান ছাত্রগণের ব্যবহারের একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত জলপাত্রে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই উদ্দেশ্যে জল পান করিলেন যে, সকলে যেন দেখিতে পায় যে, তিনি জাতিভেদ গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, মুসলমান ছাত্রগণ নিজেরাও একটী জাতিরূপে দণ্ডায়মান। তিনি মনে করিয়া-ছিলেন, তিনি যে জাতিভেদের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগের ব্যবহারের মৃত্তিকাপাত্রে জলপান করিলেন, একার্য্য মুসলমান ছাত্রগণ অনুমোদন করিবে। কিন্তু তাঁহার ধারণার বিপরীত কার্য্য হইল। তিনি দেখিলেন, মুসলমান ছাত্রগণ হেড্ মাষ্টারের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা হেড্ মাষ্টারকে বলিল, হীরানন্দ তাহাদের জল পাত্র ব্যবহার করিয়া অশুদ্ধ করিয়াছে, অথবা ব্যবহারের অযোগ্য করিয়াছে। হেড মাষ্টার দেওয়ান করমল চান্দমল লিখিয়াছেন "আমি হীরা-নন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাতে সে বলিল, 'আমার হিন্দু সম-পাঠিগণ বলে, আমি মুসলমানদিগের পাত্রে জল পান করিয়া আমাকে অপবিত্র করিয়াছি, এবং মুসলমান সমপাঠিগণ বলেন, আমি তাহাদের জলপাত্রে জল পান করিয়া ঐ জলপাত্র অশুদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, তাহারা উভয় শ্রেণীই ভুল বুঝিয়াছে।' আমি হীরানন্দকে সতর্ক করিয়া দিলাম, ভবিষ্যতে যেন সে এমন কার্য্য আর কখন না করে। এবং আমি তাহাকে বলিলাম, যদি তোমার পিতা ইহা শুনেন, তোমার প্রতি তিনি রাগ করিবেন। এই কথা শুনিয়া হীরানন্দ একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, হীরানন্দ আর মুসলমান ছাত্রদের পাত্রে জলপান করে নাই।" বালক তাহার জ্যেষ্ঠের মত এ বিষয়ে জানিত, তজ্জন্যই তাহার ঐ হাসি।

দেওয়ান করমল চান্দমল হেড মাষ্টার আরও বলেন, হীরানন্দ যদিও সাধারণতঃ অত্যন্ত লাজুক ছিল, কিন্তু সেই অল্প বয়সেই সে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করি-য়াছে। যখন তাহার সঙ্গে কোন বিষয়ে যুক্তি তর্ক উপস্থিত করা হইত, অথবা তাহার ত্রুটি কি দোষ দেখান হইত, সে শুধু হাসিত এবং তদ্দারা যেন প্রকাশ করিত যে, সেইত ঠিক। তাহার প্রবল ইচ্ছা-শক্তিটী বংশানুগত সামগ্রী, অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামগ্রী। বিচারের স্বাধীনতা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দৃষ্টান্ত হইতে প্রাপ্ত।

যখন হীরানন্দ শিক্ষাবিভাগের ইন্‌সপেক্টরের নিকট বিভিন্ন

বিষয়ে ট্রেণিং স্কুলে পরীক্ষা দেয়, তখন তাহার বয়স ১২ বৎসর। সে এ বয়সে পিতামাতার নিকট যদিও তেমন বশ্যতা বা আনুগত্যের ভাবে চলিয়া জীবনে কোন সুগঠন পাইতে পারে নাই, কিন্তু সে সেই বাল্য জীবনেই তাহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে সত্যবাদিতা, সংযম (Temperence), সহজ ভাব এবং অন্যান্য সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

ব্যয়—

দাতব্য—শ্রীমতী বিভাবতী গুহ ২৪৲ (ঢাকা), শ্রীমতী সত্যবালা দেবী ১২৲, শ্রীমতী তিনকড়ি দেবী ১২৲, শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ১২৲, আরতি হালদার ৫৲, অন্য ছয়জন বিধবাকে ৭৲।

মণি অর্ডার ফি ও ট্রাম ভাড়া ৸৵৹, গাড়ীভাড়া ৮৷৹, বক্‌সিস ১৲, মোট ৮২৷৵৹।

শ্রীমণিকা দেবী
সম্পাদিকা

আর্য্যনারীসমাজ।

(১৯৩৬)

নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ দেব বঙ্গনারীর হিতৈষণাকল্পে ১৮৭৯ সালে আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহা এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গনারীর জীবনে স্বর্গীয় সাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনা ব্রহ্মকন্যাগণের জীবনে অলৌকিক ধর্ম্মবল সঞ্চারিত করিয়াছিল, যাহা দ্বারা তাঁহারা যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সামঞ্জস্যে নব নব ভাব লাভ করিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ আর্য্যনারীসমাজের ক্ষুদ্র কলেবর। তথাপি ইহার মধ্যে সেই স্বর্গীয় শক্তি বিদ্যমান। পরলোকগত সতী ব্রহ্মকন্যাদিগের শোণিত ইহার কলেবরে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্ব ও প্রভাব এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এই আর্য্যনারী সমাজের আদর্শ, সমস্ত নারীজাতির আদর্শ। এই আদর্শে যাঁহাদের জীবন গঠিত তাঁহারা চিরদিন নারীসমাজের আদর্শ বলিয়া চিহ্নিত থাকিবেন।

গত বৎসরে আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশনে শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী ও শ্রীমতী মণিকা দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। এই বৎসরে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও ব্রহ্মোপাসনা করিয়া সকলকে সুখী ও উৎসাহিত করেন।

গত বৎসরে জলপ্লাবনে আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণের নিকট হইতে ১৬৸৹ ও পুরাতন বস্ত্র বাঁকুড়াস্থ কেন্দ্রস্থলে প্রেরিত হইয়াছে।

আর্য্যনারীসমাজের গত বৎসরের আয় ব্যয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আয়—

সভ্যাদিগের চাঁদা ৬৲৸৹, শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর বিশেষ দান ৫৲, সম্পাদিকার হস্ত হইতে ১৬৸৵৹, মোট ৮২৷৵৹।

মাঘোৎসবের কার্য্যবিবরণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৪ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হইবার কথা ছিল। এই দিন প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই মহিমচন্দ্রের পরলোকগমন হেতু বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই গোপালচন্দ্র উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময় বিলাতে সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যদেবের রাজভক্তিসূচক ইংরাজী ও বাংলা প্রার্থনাদি আবৃত্তি করিয়া বিশেষ উপাসনা করেন।

১৫ই মাঘ, অনাথাশ্রমের উৎসব হয়। ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ পাঠাদি করেন এবং অনাথাশ্রমের বালকবালিকাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলেন, মা যে আমাদের অনাথজননী, কত জীবজন্তু এবং যারা দিন দুঃখী অনাথ, তাদের কত ভালবাসেন, তার পরিচয় দিবার জন্য স্বয়ং এই তীর্থ রচনা করিয়া বসিয়া আছেন। তীর্থে গেলে যেমন ঠাকুরকে দেখা যায়, তেমনি এখানে আমরা দেখতে এসেছি, যারা বলে, আমাদের বাপ মা নেই, তাদের বাপ মা হয়ে স্বয়ং তিনি কেমন আছেন এবং নিজ হাতে তাদের জন্য এমন অট্টালিকা করে দিয়েছেন, আর রোজ রোজ নিজে ভিক্ষে করে এনে তাদের রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, সেই মাকে ভাই তোমরা চেন, আর ভালবাসো। ভাই প্রিয়নাথ আর একটি গল্প বলিয়া বলেন, রাজা রাজড়াদের অপেক্ষাও দিন দুঃখী যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদিগকে তিনি অধিক আদর করেন। স্বর্গে দীনআদেরই অধিক আদর। সম্রাটেরও দয়া দাক্ষিণ্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বালকবালিকাদিগকে রাজভক্ত হইতে এবং যাঁরা যাঁরা তাদের উপকার করেন, তাঁদের উপকারে কৃতজ্ঞ হইতে অনুরোধ করেন।

১৬ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় প্রচারাশ্রমের উৎসব হয়। প্রথমে বৈষ্ণব গোপীনাথ বাবাজী মধুর কীর্ত্তন করেন। তৎপর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন এবং ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রার্থনা করেন।

উপাসনান্তে ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি, এন, মৈত্র একটী হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দান করেন। প্রীতিভোজনান্তে উৎসব শেষ হয়।

১৭ই মাঘ, প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ আচার্য দেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া শান্তিবাচনের প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ধ্যান ও কীর্ত্তনান্তে ভ্রাতা সরলচন্দ্র আচার্যাদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা যোগে বিধান-ভোগ ও শান্তিজল নিবেদন করিয়া সকলকার মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া উচ্চারণ করেন—

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শিশু সুহাসকুমার।

পাটনা নববিধানমণ্ডলীর ভিতর হইতে একটী শিশুরত্ন চলিয়া গেলেন। প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম কোরকেই শুকাইয়া গেল। নববিধানের প্রেরিত ঋষি কেদারনাথের পরিবার হইতে, আমাদের অত্যন্ত আদরের "সুহাসকুমার" গত ২৪শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫—২০মিনিটের সময়, জ্যেষ্ঠা পিতৃস্বসা দেবী হেমলতা, কনিষ্ঠা পিতৃস্বসা দেবী বনলতা ও তাঁহার স্নেহশীলা জননী সজলনয়নে উপবিষ্টা, আর তাঁহাদের সম্মুখ হইতে উদীয়মান তরুণ সূর্য্য অস্তমিত হইল। কনিষ্ঠা পিতৃস্বসা দেবী বনলতা এই পিতৃহীন শিশুর সমস্ত ভার লইয়া সযত্নে শিক্ষা বিধান করিতেছিলেন। আর আজ এই শিশু অকস্মাৎ বায়ু বিতাড়িত বৃক্ষপত্রের মত কোন অদৃশ্য স্থানে লুক্কায়িত হইলেন। বিধাতার লীলা কে বুঝিবে! এই শিশু আমাদের এখানে কনিষ্ঠা পিতৃস্বসার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে আসিতেন, আর আজ আমাদের সম্মুখ হইতে সেই সহাস্য মুখ কোথায় অন্তহিত হইল!

প্রিয় সুহাসকুমার! তোমাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কোন দেশে চলিয়া গেলে? তুমি যে সেই নববিধানের নীরব যোগী ঋষি কেদারনাথের গঠিত পরিবারে আসিয়াছিলে। তুমি যে তাঁহার পৌত্ররূপে বিকাশমান পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইতেছিলে! তাই আজ প্রাণের ভাবায় জিজ্ঞাসা করিতেছি :—

কোথায় বসিলে আজ বল না 'সুহাস',
আরত পাইনা মোরা তোমার আভাস।
সেই হাসি মুখ আজ লুকাল কোথায়,
এখানে কেহই আর সন্ধান না পায়।
ঋষিবংশে এসেছিলে হাসিয়া হাসিয়া,
তাই কি চলিয়া গেলে ঋষিত্ব পাইয়া?
ঋষি সনে ঋষি হয়ে ধ্রুবের মতন,
ভক্তি প্রেমে হলে তুমি তন্ময় মগন।
কি দিব তোমাকে আজ দিতেছি কেবল,
চক্ষু হতে বিগলিত শোক-অশ্রুজল।
ঋষি সনে ঋষি হয়ে তুমি কর বাস,
এসেছি বলিতে তাই তোমারে সুহাস।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

সংবাদ।

নববর্ষ—গত ১লা বৈশাখ, প্রাতে, নববর্ষোপলক্ষে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা বৈশাখ, হালখাতা উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দীর দোকানে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

জন্মদিন—গত ৮ই বৈশাখ, ভবানীপুরে ১৭৪নং হরিশ মুখার্জি রোডে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

নামকরণ—১৬৪এ ল্যানসডাউন রোডে, গত ১১ই এপ্রিল, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের পৌত্র, ডাঃ সন্তোষকুমার দাসের প্রথম সন্তান শিশু পুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন এবং শিশুকে প্রদীপকুমার নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতামহ প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩রা বৈশাখ, কাঁথিতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাসের ভবনে, তাঁহার দৌহিত্র, বরিশালের শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের পৌত্র, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষের শিশু পুত্রের শুভ নামকরণে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে জ্যোতিরিন্দ্রকুমার ও শক্তিকুমার দুইটী নাম প্রদান করেন। শিশুর মাতামহ ও পিতামহ প্রার্থনা করেন।

১১ই বৈশাখ, মধ্যাহ্নে ১২৯নং খুরুট রোডস্থ জগদ্বন্ধু পালের গৃহে, তাঁহার পৌত্র, শ্রীমান্ ভক্তদাস পালের শিশু পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। শিশু "আনন্দময়" নাম প্রাপ্ত হয়। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে দান ১৲টাকা।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা—গত ২রা বৈশাখ, বালেশ্বর, সিদ্ধিয়া গ্রামে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডার কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী মনোমোহিনী নবসংহিতা অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নববিধান-পরিবারভুক্ত হন। ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমযোগে অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। ঈশ্বর নবদীক্ষিতাকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

শুভবিবাহ—গত ২রা বৈশাখ, বালেশ্বর, সিদ্ধিয়া গ্রামে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডার কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী মনোমোহিনীর সহিত কটকানিবাসী স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সদানন্দ সিংহের শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই নগেন্দ্রনাথ সমযোগে শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন। বালেশ্বরের অনেকগুলি

গুলি গণ্যমান্য লোক যোগদান করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী হয়। নববিধানবিধাতা নবদম্পতিকে অজস্র আশীর্ব্বাদ দান করুন।

গুডফ্রাইডে—গত ১০ই এপ্রিল, গুডফ্রাইডে উপলক্ষে, শান্তিকুটীরে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

উৎসব—গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে ভাই অক্ষরকুমার লধ ভ্রাতা ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায়কে সঙ্গে করিয়া তথায় গিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কুচবিহার নববিধান সমাজের সুবর্ণ জুবিলী (পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক) উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

কেশব একাডেমী—কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। ইহা মণ্ডলীর একটী মাত্র উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। গত পঞ্চাশ বৎসর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ দক্ষতার সহিত ইহার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং কয়েক বৎসর যাবৎ ইহার জন্য একটী গৃহ অত্যন্ত আবশ্যকীয় বোধ হওয়ায়, তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। আজ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় পনর হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, প্রত্যেকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং ৫০০৲ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের হস্তে দান করিয়াছেন। বিধাতা এ দানকে সার্থক করুন। এই দৃষ্টান্তের সকলে যথাসাধ্য অনুসরণ করেন, ইহাও আমাদের বিনীত নিবেদন।

পারলৌকিক—গত ৫ই বৈশাখ, পূর্ব্বাহ্ণে, ২৪।৩নং বাহির মির্জ্জাপুর রোডস্থ শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহাদের মাতামহ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরলোকগমনে তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাদান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। নবসংহিতা হইতে শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করিয়া মাতামহের কৃতিত্বপূর্ণ জীবনকাহিনী আবেগপূর্ণহৃদয়ে বর্ণনা করেন। মাতামহ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নিম্ন আদালতের বিচারকের পদ হইতে কৃতত্ববলে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এবং সে পদে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া যথাসময়ে পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হন। দীর্ঘ দিন পেন্‌সন ভোগ করিয়া প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন তিনি যেমন সরকারী কার্য্যে কার্য্যকুশল ছিলেন, তেমন পারিবারিক সুদীর্ঘ জীবনে পুত্রকন্যা নাতী নাত্নী সকলের প্রতি স্নেহপ্রীতিমাখা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুগৃহস্থ-জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে তাঁহার পুত্রগণ ও পরিবারের অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শোক-সংবাদ—আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি :—

গত ২রা বৈশাখ, (১৫ই এপ্রিল) বুধবার, কলিকাতায়, ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের পুত্র, শ্রীযুক্ত প্রিয়ব্রত সরকার ইহধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে গত ৪ঠা বৈশাখের "আনন্দবাজার" পত্রিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করিলাম :—

"অধ্যাপক প্রিয়ব্রত সরকার গত বুধবার রাত্রি বারটার সময় অকস্মাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত ২৩ বৎসর ধরিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন। গত এক বৎসর হইতে তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। তিনি অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াও ছুটি লওয়াইতে পারা যায় নাই। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি ছুটি লইতে বাধ্য হন। তাহার পর হইতে তিনি ছুটিতেই ছিলেন। ১৬ই তারিখ তাঁহার কলেজের কার্য্যে পুনরায় যোগ দিবার কথা ছিল। কিন্তু ঐদিন সকালে ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ কলেজে লইয়া আসে। ছাত্র, অধ্যাপক ও বন্ধুবর্গের দ্বারা তাঁহার শবদেহ নিমতলা ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্‌টী অব সায়েন্স'এর একজন সদস্য এবং বি,এস,সি, পরীক্ষার রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র বাণীর সাধনায় নিজেকে বদ্ধ রাখেন নাই; বহু ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সহিতও জড়িত ছিলেন। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটীক্যাল ওয়ার্কসের সহিত প্রতিষ্ঠার সময় হইতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বহুদিন উহার 'রাসায়নিক' পরীক্ষক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিধবা স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।"

আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী কমলেকামিনী বসু (কামিনীদি), গত ৫ই বৈশাখ, জলপাইগুড়ীতে তাঁর একমাত্র কন্যা ও জামাতার গৃহে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া মাতৃদেবীর সহিত জ্যেষ্ঠভগ্নিপতি নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সিংহের গৃহে প্রতিপালিত, শিক্ষিত, বিবাহিত এবং শেষ পর্য্যন্ত মঙ্গলপাড়াতেই অবস্থান করিয়া জীবন যাপন করেন। বাল্যকাল হইতেই মহারাণী সুনীতি দেবীর সঙ্গিনী ছিলেন। মানিকগঞ্জ নিবাসী ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসুর সহিত বিবাহিত হন বিবাহিত হইলেও মঙ্গলপাড়াতেই অধিকাংশ

সময় আচার্য্যদেবের শিক্ষাধীনে থাকিয়া শিক্ষাদি করিতেন। তখন আচার্য্যপরিবার ও মঙ্গলপাড়ার প্রচারক মহাশয়দিগের পরিবারবর্গ যেন একই পরিবাররূপ বসবাস করিতেন। নবদেবালয়ের পরিচর্য্যার ভারও লইয়া বহু দিন ধরে তিনি তাহা অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁর বড় সাধ ছিল, শেষ-নিঃশ্বাসপাত পর্য্যন্ত মঙ্গলপাড়ায় থাকিয়া দেবালয়ের সেবাতেই জীবন পাত করেন।

পরমজননী পরলোকগত সন্তানদের স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১২ই এপ্রিল, আলীপুরে, ২৮নং নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সর্ব্বজনপ্রিয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এতদুপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। গত ১৪ই এপ্রিল, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে, হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় ডাঃ ডি, এন, মিত্রের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভায় ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ডবলিউ, এস, আরকুহার্ট প্রভৃতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন।

গত ১৩ই বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণে, ৮৫নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে স্বর্গগত প্রেরিত প্রচারক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী দেবীর স্বর্গারোহণদিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। "হার্ট-বিট্‌ন" ও "আশীষ' গ্রন্থ হইতে পত্নীর জীবন-বর্ণনা উপলক্ষে প্রতাপচন্দ্রের লেখা পঠিত হয়। প্রার্থনা কালে স্বর্গীয়া দেবীর পতিপ্রাণতা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়।

গত ২৭শে এপ্রিল, সোদামা ভাণ্ডার অবতার, প্রেরিত স্বর্গগত ভাই অমৃতলাল বসুর স্বর্গারোহণদিনে দেবালয়ে পরিবার ও মণ্ডলীর মিলিত উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা, ভাই গোপালচন্দ্র আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ২৮শে এপ্রিল, বাঁ্যাটরায়, সর্ব্বজনপ্রিয়, বৈমানিক স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। আমাদের মণ্ডলীর ভাই ভগ্নী ও আত্মীয়গণ ব্যতীত, স্থানীয় অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বন্ধুবান্ধব যোগ দান করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং ভাই অক্ষয়কুমার পাঠ করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান্‌ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন। অদ্য বাঁ্যাটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী বিদ্যালয়ে, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্তের (বার-য়্যাট-ল) সভাপতিত্বে স্মৃতিসভাও হইয়াছিল। অনেকে স্মৃতিতর্পণ করেন।

দান—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনের পুণ্য স্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পুরীর সংবাদ—পুরী নবপর্ণকুটীরে, গত ৬ই এপ্রিল, কাচবিহারের মহারাজা শ্রীমৎ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক দিন উপলক্ষে মহারাজার ও কোচবিহার রাজ্যের বিশেষ কল্যাণ কামনা করিয়া উপাসনা, ৭ই এপ্রিল, উড়িষ্যার নব গবর্ণর সারজন হাবক সাহেবের পুরীতে শুভাগমন হেতু সম্রাট ও সম্রাটের নব প্রতিনিধি গবর্ণরের কল্যাণ ও নব প্রদেশের প্রগতি প্রার্থনা করিয়া উপাসনা, গুডফ্রাইডের দিন সন্ধ্যায় কয়জন বন্ধু লইয়া বিশেষ উপাসনা, ১লা বৈশাখ, প্রাতে নববর্ষ দিন উপলক্ষে অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব লইয়া উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

নিবেদন।

উপাধ্যায়মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এখন আর সব খণ্ড পাওয়া যায় না। এই বইখানিতে কেবল মাত্র সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই বইখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে ও আমাদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ অপরাধ হইবে। সেজন্য এই পুস্তকখানির নূতন সংস্করণ একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গলাতে এবং সন শকাব্দে আছে। সেই সকলের ইংরাজি সন তারিখ ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার সূচী একটু বিশদ ভাবে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাও আছে। সেজন্য কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ছাপাইতে বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। সকলের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সমাধা করা সুকঠিন। সেই জন্য সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যাহাতে আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে, তাঁর স্মৃতি (যা খুব accurately historical) এই উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা জীবনীখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। টাকা কড়ি আমার নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা ;
এলাহবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট "নববিধান প্রেসে"
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১ম সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 15th. May, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

জীবন্ত জাগ্রতরূপিণী শ্রীকেশবজননী, ধন্য তুমি, যে তুমি আমার ন্যায়, আমাদের ন্যায় সকল পাপী তাপী নরনারীরও জননী হইয়াছ। শ্রীকেশব বিশ্বমানবের সঙ্গে এক শরীর হইতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্যি করে," "আমার মা বড্ড ভাল মা", "আমার মা তোদেরও মা" এই সকল কথার সাক্ষ্য কি, মা, আমরা দিতে পারিব না? শ্রীকেশবকে তুমিই ত মা হয়ে নিজে দেখা দিলে, তুমিই তাঁকে প্রার্থনা শিখালে এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে নববিধান দিয়া তোমারই নবশিশু, নূতন মানুষ, বিশ্বমানবাদর্শ করে' স্বয়ং গঠন করিলে। আমাদিগের প্রত্যেককেও ত তুমিই, কেমন করিয়া জানিনা, আগেকার প্রাচীন হিন্দু দেবদেবী-পূজার সংস্কার হইতে উদ্ধার করিয়া, নানা প্রকার কুশিক্ষা, কুনীতি, কুসঙ্গ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, শ্রীকেশবের সঙ্গে গাঁথিলে, নববিধানের নবধর্ম্মে দীক্ষা দিলে, জীবন্ত জাগ্রত রূপ ধারণ করিয়া তোমার প্রত্যক্ষ পূজা প্রার্থনা করিতে শিখাইলে। নানা পরীক্ষা, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িতে গড়িতে, তুমিই আমাদের জীবনকে তোমার নববিধানের মানুষের ছাঁচে ঢালাই করিয়া, নিত্য নূতন নূতন গঠন দান করিতে চাহিতেছ। কারিকর যেমন পাথর খুঁদে মানবমূর্ত্তি বাহির করে, তেমনি তুমি করিতে চাহিতেছ। তুমি যে জীবন্ত মা, তুমি যেমন শ্রীকেশবকে গড়িলে, তেমনি করিয়া প্রত্যেক মানুষকে নববিধানের নূতন মানুষ গড়িবে বলিয়াই তুমি এই নববিধানের কার-খানা খুলিয়াছ। তোমার উপাসনার ফলে তুমিই প্রতিদিন আমাদের গড়। আমাদের হাতে আমাদের সাধন ভজন জীবন নয়, তাই সেই আগেকার সাধ্য-সাধনা-সম্ভূত পুরুষকার দ্বারা আমরা নববিধানের মানুষ যে তৈয়ারী হব, এ ভ্রম, এ মিথ্যা সংস্কার ঘুচাইয়া দাও। যে মা কেশবের মা, যে মা কেশবকে গড়িলেন, সেই মা যে তুমি আমাদেরও মা, এইটীর সাক্ষ্য যাহাতে দিতে পারি, আর বলিতে পারি, হাঁ, কেশবের মা, আমরাও তোমাকে দেখিয়াছি, সত্যই মা তুমি বড় ভাল মা, এই যে আমার মত নারকীকেও উদ্ধার করে ভাল করিতেছ। মা, এখন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যে সবাই একই মার ছেলে মেয়ে, এক মা বই জানি না, সবাই আমরা একই মা হইতে জাত, এক মানবসন্তান, তোমার জীবন্ত প্রভাবে ও জীবন্ত উপাসনার ফলে যেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

মৃত ধর্ম্ম ও জীবন্ত নববিধান।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিলেন, "তিনি মৃতদিগের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদিগের ঈশ্বর, কারণ সকলেই তাঁহাতে জীবিত।" কিন্তু হায়, কোথায় কোন্ প্রাচীন ধর্ম্ম এখন আর সে জীবন্ত ঈশ্বরের পরিচয় দিতেছেন?

তাই নববিধানাচার্য্য কাঁদিয়া বলিলেন, "এখন আর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বলে না যে প্রত্যাদেশ পাই, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে। আমরা কয়জন কেবল এই শ্মশানে বসিয়া আছি। সজীব ধর্ম্মের বিধান আর নাই। কেবল এই একখানি। তবে চালাও এই রথ।"

আমরা এই উক্তির নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি। সত্যই যদি আমরা সমস্ত জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? সকল ধর্ম্মই কি মৃত কঙ্কালের মত কতকগুলি শাস্ত্রের বচন, কতকগুলি মৃত বাহ্যানুষ্ঠান বা মৃততন্ত্রমন্ত্র, মৌখিক কথা বক্তৃতা তর্ক যুক্তি কিম্বা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র নয়? সুধু যে কেবল তাই, তাহা নয়; যে সত্য ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই সত্যই ধর্ম্ম হইতে উড়িয়া গিয়াছে, কিম্বা তাহা মিথ্যার সহিত এমনই বিজড়িত হইয়াছে যে, সত্য মিথ্যার পার্থক্য করা দুরূহ। আবার ঈশ্বর যিনি ধর্ম্মের আবহ এবং ধর্ম্মের উপাস্য, তিনিও যেন তিরোহিত। তাঁহার স্থানে হয় মৃৎপুত্তলিকা, নয় মানুষ, নয় গুরু, নয় শাস্ত্র, নয় কোন বাহ্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতেছে।

প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্ম্মের যেন কোন সম্বন্ধই নাই। ঈশ্বর অজ্ঞেয় দুর্জ্জেয় বলিয়া, তাঁহাকে মৃতদিগের মধ্যে গণ্য করিয়া সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি যে সত্য সত্য নিত্য বিদ্যমান এবং সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব প্রাণে সত্যই আছেন, ইহা মতে মানা হইলেও কার্য্যতঃ কোন ধর্ম্মই যেন ইহা বিশ্বাস করে না। কাজেই ধর্ম্ম হইতে সত্য এবং ঈশ্বর যদি উড়িয়া যান, ধর্ম্মে আর কি থাকিবে। এই জন্যই ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের এমন দুরবস্থা এবং ধর্ম্মও এই জন্য মানবসমাজের কাছে সাধন বা শিক্ষার বিষয় হইতে এক প্রকার ক্রমে উচ্ছিন্ন হইতেছে।

সহজ সরল অবিমিশ্র সত্য কই কোথায় কোন ধর্ম্মে সাধিত ও অনুসৃত হইতেছে? ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর ত হইতেই পারে না, ইহা সনাতন সত্য; কিন্তু যাই মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করা হইল, অমনি কি তাহা মিথ্যা হইল না? ঈশ্বর পরম আত্মা, মানুষ তাঁহা হইতে সৃষ্ট বা জাত; তাই মূলতঃ এক হইলেও প্রকৃতিতে কত ভিন্ন। মতে বা বিচারে সৃষ্টি স্রষ্টা, সান্ত অনন্ত দুই এক করিতে যাওয়া মিথ্যা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

সাধু ভক্ত মহাপুরুষগণ, যাঁহাদিগের উপর তাঁহাদের শিষ্যেরা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাঁহারাও কেহই সম্পূর্ণরূপে মানবত্বের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করেন নাই। সাময়িক যোগের অবস্থায় মানবীয় অবস্থা বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও, নিত্য সে অবস্থা কেহই ত লাভ করেন নাই। তবে তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলা, স্বয়ং ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কি?

এইরূপে সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মাত্রেই জীবনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের এই গ্লানি দেখিয়াই জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং বর্ত্তমান যুগধর্ম্মরথের সারথি হইয়া বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তাই এই বিধানে জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং এই ধর্ম্মের মধ্য-বিন্দু, নেতা, নিয়ন্তা, উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও রক্ষক হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষের প্রত্যক্ষ-গোচর ও প্রাণের ঈশ্বর হইয়া অবস্থিত। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত পূজাই এই বিধানের সর্ব্বোচ্চ সহজ সাধন; কেন না জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত উপাসনা বিনা ধর্ম্মজীবনলাভের অন্য উপায় নাই। এবং সে উপাসনাও আবার তিনিই স্বয়ং পবিত্রাত্মা হইয়া করাইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে বিধাতাই স্বয়ং এই বিধান করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নরনারী প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার পূজা করিবে; এবং পূজা করিলেই, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিতে চাইলেই তাঁর দর্শন লাভ করিবে। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বা প্রাণ-মন্দিরে প্রাণেশ্বর হইয়া আছেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখা কাহারও কষ্টসাধ্য নয়। সহজ বিশ্বাসে তাঁর দিকে মন ফিরাইলেই তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার নিকট সরল অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁর বাণী বিবেকের ভিতর দিয়া শুনা যায়।

এই যে প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার উপাসনা করা, এমন সহজ সত্য আর এখন কোন

ধর্ম্মে নাই। প্রতিদিন এই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল নিত্য নবজীবন, নিত্য জীবনের প্রগতি ও উন্নতি। বৃক্ষ যেমন জলসিঞ্চন, উত্তাপ ও বাতাস পাইলে প্রতিদিন উদ্গত হয়, তেমনি প্রতিদিন ভক্তিসহকারে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহারই জীবন্ত উত্তাপে এবং প্রেমসমীরণে জীবন সমুন্নত ও নিত্য নব নব ভাবে বিকসিত হইবেই হইবে। ইহা সাধন-সিদ্ধ জীবনের অভিজ্ঞাত সত্য। উপাসনার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

এই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত উপাসনাই ধর্ম্মেরও জীবন, মানবেরও চিরজীবিত হইবার উপায়। নদী যদি চিরপ্রবাহে মহাসাগরের সহিত সঙ্গমিত হয়, সে নদীর জল আর কখনও শুকায় না; তেমনি জীবন্ত ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সঞ্জীবিত করেন অর্থাৎ ইহা যখন আমরা সজ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন তিনি যেমন অনন্ত জীবন, তেমনি তাঁহার সংযোগে আমাদের জীবনের প্রবাহ চির প্রবাহিত হইবে। ইহাই আমাদের উপাসনা-সাধনের অভিজ্ঞান।

নববিধানে আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এই জীবন্ত উপাসনা লাভ করিয়াছি; এই উপাসনা হইতেই জীবন, এই উপাসনা হইতেই আমাদের সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্মানুষ্ঠান। আমরা খাই পরি চলি বলি কাজ করি, কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করি, শিক্ষা করি, সাধন করি, আলোচনা ও পাঠ করি, প্রচার করি, যাহা কিছু করি, এই উপাসনাই তাহার নিয়ামক; এই উপাসনা হইতেই তাহার শক্তি ও বল, আলোক ও পরিচালনা।

তাই উপাসনা ছাড়িয়া আমরা যদি কিছু করি, তাহাতে মূল কাটিয়া ডালে জলসিঞ্চন করা হইবে। কারণ জীবন্ত ঈশ্বরের শক্তি বিনা আমরা কি করিতে পারি? এবং তাঁহারই রাজ্যবিস্তার বা ধর্ম্ম কর্ম্ম যদি তাঁহারই কার্য্য হয়, তবে তাঁহার বল, তাঁহার ইচ্ছা বিনা তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম কেমনে সাধিত হইবে? ধর্ম্মার্থে, ঈশ্বরের গৌরবার্থেই ত আমাদের সকল কর্ম্ম, সকল সংস্কার। এক মাত্র তাঁর উপাসনায় বল সঞ্চয় করিয়া যাহা কিছু করিব, তাহাই কেবল বিধাতার বিধানের কার্য্য হইবে।

ধর্ম্ম ছাড়িয়া কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার বা ধর্ম্মের আড়ম্বর রক্ষা করা এখন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কার্য্য হইয়াছে। বাহিরের ধর্ম্মের আড়ম্বরে লোকের মন ও প্রশংসা আকর্ষণ করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে কতদূর প্রকৃত ঈশ্বরের প্রীতি ও ইচ্ছা পালন হইতেছে, কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের ইচ্ছা না জানিয়া কর্ম্মসাধনে মানুষের সেই দশাই হয়, সীতার যেমন ধর্ম্মের গণ্ডী লঙ্ঘনে হইয়াছিল।

ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ঘৃণা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত যাহা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জগতে হইতেছে, তাহা কি ধর্ম্ম? এই সকলে মানবের নীচ পশু প্রকৃতিরই ত উত্তেজনা ও প্রশ্রয় দান করা হইতেছে। তাই ধর্ম্ম করিতে গিয়া যদি তাহাতে মানবীয় অহং বা অন্য কোন নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়, তাহাতে ধর্ম্ম কেমন করিয়া রক্ষা হইবে?

বাস্তবিক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা না জানিয়া বা তাঁর শ্রীমুখাৎ আদেশ না লইয়া আমরা যাহা কিছু করিব, তাহাতেই ধর্ম্ম হইবে না। এই জন্য জীবন্ত ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসের লক্ষণ যেমন তাঁহার জীবন্ত উপাসনা, তেমনি তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ লইয়া প্রত্যেক কার্য্য করা, এমন কি অতি সামান্য জীবনের কর্ম্ম আহার পান হইতে গৃহকর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সকল কর্ম্মই প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিয়া করাই যথার্থ ধর্ম্ম।

যদি বিশ্বাস করি, এই বিশ্বসংসার জীবন্ত ঈশ্বরেরই রাজ্য, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা পালন করাইত আমাদের ধর্ম্ম। তখন তাঁহার হুকুম না লইয়া, তাঁহার আদেশ না পাইয়া আমরা যাহা করিব, তাহাতে আমাদের নিজ স্বেচ্ছারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, তাঁহার কর্ম্ম অল্পই হইবে। কাহার দ্বারা কি করাইতে চান, তিনিই জানেন; তাই আমাদের প্রত্যেকের কাহার কি করিতে হইবে, তাঁহারই নিকট হইতে জানিয়া করিতে হইবে। তাঁর প্রত্যক্ষ ইচ্ছা না জানিয়া যাহা করি, তাহাতেই ব্যর্থ হইব।

এইরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালনের জন্যই তিনি আমাদিগকে তাঁহার দেহপুরে আনিয়াছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মবিধানের আশ্রয়ে স্থান দিয়াছেন। তবে আমরা আমাদের নিজ ইচ্ছা কেন চালাইব? প্রভু নিকটে থাকিতে যদি ভৃত্য নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করে, সে কি স্বেচ্ছাচারী বলিয়া দণ্ডিত হয় না? এই জন্য নববিধানে আদেশপালন নববিধানের একটি প্রধান নীতি। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ লইয়া আমরা জীবন যাপন করিব, ইহাই নববিধান। নববিধান মানুষকে মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। মানবের মানবত্বই মানুষের মহত্ত্ব। মানুষ পশুত্ব পরিহার করিয়া পূর্ণ মানবত্ব বা ঈশ্বরের সন্তানত্ব

লাভ করিবে, ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। প্রাচীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যাঁহাদিগকে ঈশ্বরত্ব দিয়াছেন, তাঁরা ঈশ্বর নন, তাঁহারাও মানুষ, মানুষের মত মানুষ, আদর্শ মানুষ, ইহাই নববিধান সাব্যস্ত করিয়াছেন; এবং সেই সকল মহা-মানুষের সমন্বিত জীবনেই বিধাতা নববিধানের মানুষ গড়িয়াছেন। এই মানুষ বিধাতারই স্বহস্তে গঠিত। নিজ পুরুষকার-সিদ্ধ নয়, তিনি নিজেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

সাধারণ মানুষ "আমার আমি" করিয়া মানব-জীবনকে পশুত্বে পরিণত করে। কিন্তু মানুষ নিজের নয়, "ঈশ্বরের আমি," ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর যেমন স্বহস্তে তাঁর সন্তানকে গড়িবেন, তেমনি সন্তানের জীবন গঠিত হইবে, আমি আমার নই, আমি ঈশ্বরের সন্তান, পূর্ণ ভাবে এই বিশ্বাস করিয়া যিনি নিজ জীবনভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি তাঁহারই হাতে গঠিত হন। নববিধানের মানুষ এই ভাবে গঠিত।

কোন রাজা যেমন কাহাকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে, তিনি যেমন তাহাকে শিক্ষিত দীক্ষিত ও গঠিত করেন, তেমনি প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর স্বয়ং স্বহস্তে গঠিত করিবার জন্য এবং তাঁহার পোষ্যপুত্র রাজপুত্র নববিধানের নবশিশু গঠন করিবার জন্য জীবন্তরূপে ভার লইয়াছেন। ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপর আত্মসমর্পণ করিলেই আমরা নববিধানের মানুষ হইব।

তিনি প্রত্যেক জীবিত বৃক্ষকে যেমন প্রতিদিন নব নব উন্নতি দান করিতেছেন, তেমনি তিনি আমাদিগকেও করিবেন। কেবল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইলেই নিত্য নব নব জীবন লাভ করিব।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানের আর এক বিশেষত্ব, সমগ্র বিশ্ব-মানবের সহিত প্রত্যেকে আমরা বিজড়িত; তাই ব্যক্তিগতভাবে যেমন, তেমনি পরিবারগত ও দলগত ভাবে বিধাতা আমাদিগকে তাঁর মানুষ করিতে আনিয়াছেন ও গঠন করিতেছেন। ইহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া সপরিবারে ও সদলে বিধাতার হস্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক গঠিত হইতে হইবে। সেইজন্য যাঁহাকে সদল অখণ্ড মানব করিয়া তিনি গঠন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সমযোগে পরস্পরের মিলনে গঠিত হইতে হইবে, ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে। এবং তাহা হইলেই নববিধান জীবনে সপ্রমাণ হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

নির্ব্বাণ ও নববিধান।

শ্রীবুদ্ধ দেখিলেন, কামনা বাসনার আগুনে সংসার দগ্ধ হইতেছে; সংসারের সর্ব্ব দুঃখের কারণ বাসনা, মহাবৈরাগ্য-বলে এই কামনা বাসনার আগুন নির্ব্বাণ করিলেন। তিনি সং-সারত্যাগী বৈরাগী নির্ব্বাণপন্থী জাতি সৃষ্টি করিলেন। নবযুগে নববিধানে শ্রীকেশব ব্রহ্মানন্দ অরণ্যবাস ও বৈরাগ্যের ভিত্তির উপরই নববিধানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। নিবৃত্তির উপর প্রবৃত্তি-যোগের বাণ হানিলেন। সেবকরূপে জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে সংসারের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া, গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন জানিয়া, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতনে বসিয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন। আসক্তি মোহজঞ্জাল বিষয়ের তমোজাল যোগবলে ছেদন করিয়া, সুখে দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত দেখিয়া গৃহযোগী হইলেন এবং ইহাই বিশ্বমানবধর্ম্ম ও বিধাতার নববিধান বলিয়া জীবন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সংসার মানবের রচিত নয়, ইহা জীবন্ত ঈশ্বরেরই স্বহস্ত-রচিত; সুতরাং নিষ্কাম হইয়া সংসার-সাধনই পূর্ণ ধর্ম্ম। নির্ব্বাণপন্থী গৃহী মানবজাতিই নববিধান-জাতি।

আমার আমি, না, ঈশ্বরের আমি?

যদি আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখি, দেখি, আমি আপনাপনি এই দেহপুরে আসি নাই, আমার প্রাণ আমার শক্তিতে বাঁচে না, আমার আত্মা আমার হাতে নয়। তবে এই যে 'আমার আমি' বলি বা মনে করি, ইহা আমার মনের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই কল্পনা বা ভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই, আমি এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি পশুবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িতেছি, অনেক কাজ কর্ম্মও করিতেছি। আত্ম-দৃষ্টিতে যদি এই ভুলটা বুঝিতে চাই, বুঝিতে পাই, সত্যই আমি আমার নই, আমার হাতে আমার জীবন নয়। তাই কে আমি, কার আমি, বুঝিয়া দেখিলেই দেখি, যিনি আমাকে আনিয়াছেন, আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাস প্রশ্বাস দিয়া বাঁচাইতেছেন, আমি যিনি তাঁরই। তাঁরই আমি, এই বিশ্বাস হইলেই, আমি আমার হাতে আর আমাকে না রাখিয়া, যাঁর আমি, তাঁর হাতে আমাকে সমর্পণ করি। আমার আমি ভাবিয়া, আমার আমিকে যে নীচ পশুবৃত্তির ও কুঅভ্যাসের অধীন করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা হইতে মুক্ত হইতে ব্যাকুল হই; তাহা হইলে জীবনদাতা পিতামাতা যেমন আপন সন্তানের ভার লইয়া লালন পালন ও গঠিত করেন, তেমনি তিনি করিবেন। যাঁর জিনিষ, তিনি যেমন তাঁর জিনিষের যত্ন করেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমনি করিবেন। যাঁহারা 'আমার আমি' না বলিয়া 'ঈশ্বরের আমি' বলেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ হন।

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

"সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আশীর্ব্বাদ এই যে, হে জীবন্ত সত্তা, জীবিতেশ, তুমি আমাকে এই মহার্ঘ মানবজীবন দিলে।" এই কথা লিখিয়া প্রতাপচন্দ্র আত্মজীবনী (আশীষ) আরম্ভ করিয়াছেন। যখন আমরা স্বর্গ ও ঈশ্বর দর্শন করি, তখনই জীবনের প্রকৃত মহত্ব জানিতে পারি। কেবল বিষয়-ভোগে জীবন অতিবাহিত করিলে, মনুষ্যের সকল শক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়, এবং সৃষ্টির মধ্যে যে দেবত্ব রহিয়াছে, তাহা আর দৃষ্টি-গোচর হয় না। যেমন প্রভাতে মধুর সূর্য্যালোকে পৃথিবীর সুন্দর মুখশ্রী প্রকাশিত হয়, নদী ও বন, পর্ব্বত ও প্রান্তর, সকলই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি মানুষের অন্তরে বিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হইলে সৃষ্টি নূতন আকার ধারণ করে এবং তন্মধ্যস্থ দৈবশক্তি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর পিতা এবং নরনারী পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী, এই জ্ঞানে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সুমিষ্ট ও উচ্চতর হয়, পক্ষী সকল নূতন স্বরে গান করে, প্রভাত বায়ু কোন প্রিয়জনের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনে, এবং সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র সিংহাসনারূঢ় অনুভূত হয়। ইহাই স্বর্গ; যিনি বিশ্বাসী, প্রেমিক ও নির্ম্মলহৃদয়, তিনি ইহা ও পরলোকে এই স্বর্গে বাস করেন। প্রতাপচন্দ্র এইরূপ লোক ছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় জীবন, মহৎ দৃষ্টান্ত ও উচ্চ শিক্ষা আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি। সেই সুন্দর চরিত্র ও দেবস্বভাব সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রতাপচন্দ্র ২রা অক্টোবর, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, হুগলীর নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার মাতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গরিফায় তাঁহার পৈতৃক ভবন ছিল। তাঁহার পিতামহ তারাচাঁদ মজুমদার গ্রামের একজন সম্পন্ন লোক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান। প্রতাপচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের প্রথম সন্তান। প্রথম পৌত্রের জন্মে তারাচাঁদের গৃহে মহা সমারোহ হয়, এবং সময়োচিত দানাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শৈশবে প্রতাপচন্দ্র স্বীয় গ্রামে লালিত পালিত হন।

বাল্যজীবনের ক্রীড়া ও আমোদ স্মরণ করিয়া প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যে মুহূর্ত্তে আমার মন খুব পবিত্র থাকে, তখন বাল্য কালের অনুভূতি সকল জাগিয়া উঠে; কিন্তু যখন আমি অধো-গামী হই, তখন তাহা হারাইয়া ফেলি। আমার এই বিশ্বাস যে, বাল্য জীবনের উজ্জ্বল আনন্দ, দোষহীনতা ও অভয়ভাব এখানে কিয়ৎ পরিমাণে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অন্য লোকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায়।"

বাল্যকালে প্রতাপচন্দ্র স্বীয় গ্রামে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কলিকাতায় প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ বালক ছিলেন। ক্লাসের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করিতেন। এ জন্য অবিবেচনার সহিত যথাসময়ের পূর্ব্বে তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীতে দুইবার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার শিক্ষার ক্রমোন্নতি বন্ধ হয়। ইংরাজী ভাষা ও অন্য অন্য বিষয়ে তিনি ক্লাসের অনুগামী হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু অঙ্কে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িলেন। এ সময়ে উপযুক্ত সাহায্য পাইলে তিনি সর্ব্ববিষয়ে ক্লাসের অনুগামী হইতে পারিতেন; তিনি বিদ্যালয়ে কিম্বা আপন গৃহে সে সাহায্য পান নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি দুই বৎসর পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালে তাঁহার পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিলেও, ভবিষ্যতে তাহা অনেক পরিমাণে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পর তাঁহার শিক্ষা পরিণতি লাভ করে। এখানে তিনি আপন জীবনের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক মহৎ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন। তিনি ভবিষ্যতে যাহা কিছু জানিয়াছিলেন, এবং যাহা হইয়াছিলেন, তাহার মূলে ধর্ম্ম।

অল্প বয়সে প্রতাপচন্দ্রের পিতার মৃত্যু তাঁহার উপযুক্তরূপ বিদ্যাশিক্ষালাভের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর, তখন তিনি পিতৃহীন হন। পিতাকে স্মরণ করিয়া প্রতাপচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন, "আমি দূর দুঃখপূর্ণ অন্ধকারময় ভূতকালের মধ্যে পিতার প্রশস্ত উদারতা ও প্রেমপূর্ণ মুখশ্রী দেখিতে পাই। হায়, তিনি আর কিছুকাল কেন পৃথিবীতে রহিলেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া আমি জানিতে পারিতাম! হায়, যিনি আমাকে যত্ন করিতে ও শিক্ষা দিতে পারিতেন, এমন কোন উপযুক্ত অভিভাবকের হস্তে রাখিয়া তিনি কেন চলিয়া গেলেন না! অল্প বয়সে অতিশীঘ্র তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না এবং আমার বয়স প্রায় নয় বৎসর ছিল। আমার মাতা অল্প বয়সে এই বিষম শোকভারে এতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আমি নিজে সন্তানহীন, সন্তানের নিকট কি আশা করিতে হয়, তাহা জানি না; কিন্তু আমি জানি তাঁহার সরল আত্মা আমার মধ্যে ভাবী মহত্ত্বের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন। তিনি যে মহত্ত্বের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, তাহা কি আমি লাভ করিতে পারিয়াছি?"

প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পিতামাতাকে অত্যন্ত ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেন। তাঁহার বয়স যখন উনিশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মাতার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিবাহিত হন; তাঁহার পত্নীর ঐকান্তিক সেবা ও ভালবাসায় অল্প বয়সে মাতৃপিতৃবিয়োগের ক্ষতি কিয়ৎ

পরিমাণে পূর্ণ হয়। "আশীষ" গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র স্বীয় সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "এই ব্রাহ্মসমাজ-মণ্ডলীর কোন প্রচারক সেবা করুন না করুন, সৌদামিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর উপকার সাধন করিলেন, এবং সেজন্য আমার প্রিয় বন্ধুদের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হইলেন।"

যৌবনের প্রারম্ভে দুইজন মহাত্মার প্রভাব প্রতাপের উপর বিশেষরূপে বিস্তারিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একজন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যজন। কেশবচন্দ্র তাঁহার বাল্য সুহৃদ, আত্মীয়, নেতা ও ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন; মহর্ষি তাঁহার দীক্ষা-গুরু ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের গভীর ধ্যান-পরায়ণতা ও ঋষিজীবন এই ব্যাকুল যুবার বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টির সম্মুখে একটী সুগঠিত আদর্শ হইয়া প্রতিভাত হইত; তিনি সেই চরিত্র ভালবাসিতেন, সম্মান করিতেন এবং যতদূর সম্ভব অনুকরণ করিতেন। আজীবন তিনি মহর্ষির প্রতি গভীর প্রণয় ও সম্মান পোষণ করিতেন। প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বহুকালাবধি আমার ধারণা, এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রের সঙ্গে আমার একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে।"

বিশ বৎসর বয়সে প্রতাপচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "আমি অশ্রুজলে অন্ধপ্রায়, উদ্বেগ ও ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া এই ধর্ম্মে আমার প্রাণগত বিশ্বাস স্বীকার করিলাম। আমি অল্পদর্শী, তখন জানিতাম না, আমার জন্য এই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মদীক্ষার মধ্যে কি অসীম মহান অর্থ নিহিত ছিল। এখন এই ধর্ম্মজীবনের অবিশ্রান্ত উন্নতিতে আমার দিব্য জীবন, দিব্য নীতি বিকশিত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মার্থী লোক যেন প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে নিজ বিশ্বাস স্বীকার করিতে ও ধর্ম্মদীক্ষা লইতে উদাসীন না হয়েন।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রতাপচন্দ্র কিছুদিন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করেন। অল্প দিন পরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য এক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং ইহাই তাঁহার বিধি-নিয়োজিত কর্ম্মস্থান ছিল। সে স্থান ব্রাহ্মসমাজ। তিনি এখন ব্রাহ্মসমাজের নানা দেশহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় সর্ব্বদা লিখিতেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকা প্রত্যহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন প্রতাপচন্দ্র ইহার সম্পাদক হইলেন। প্রথমে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, পরে ইংরাজী ভাষায়ও প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র অন্তরাত্মার প্রেরণায়, ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন। কেশবচন্দ্র প্রথমে তাঁহার সঙ্গীদিগকে এ দৃষ্টান্ত দেখান। প্রতাপ সাহসের সহিত তাঁহার নেতার অনুসরণ করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র প্রথম ইউরোপ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি ছয়মাস কাল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় ও বহুদর্শিতা লাভ করেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া অধিকতর উৎসাহ ও যোগ্যতার সহিত তিনি ব্রাহ্মসমাজের হিতকর কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন। ভারতের নানা স্থানে গিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারকরিতে লাগিলেন। লাহোর, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি নগরে তিনি অধিক দিন বাস করিয়া লোক সকলকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া ছিলেন। স্থানে স্থানে নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত এবং পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ সকলের উন্নতি হইল। তাঁহার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেক লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রতাপচন্দ্র দ্বিতীয় বার স্বদেশ হইতে বহির্গত হন। তিনি ইংলণ্ডে প্রচার করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁহার চরিত্র, বাগ্মিতা ও গভীর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। অল্পদিনের মধ্যে তিনি আমেরিকার একজন সুপরিচিত লোক হইলেন। এই সময়ে আমেরিকায় তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "Oriental Christ" গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমেরিকা হইতে তিনি জাপানে আগমন করেন। সেখানে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ৭ই জানুয়ারী (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি কলম্বোতে উপনীত হইলেন এবং সেই দিনই ঐ বন্দর ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। ৮ই জানুয়ারী যখন তিনি সাগর পার হইতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় নেতা ও আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র সেন কালসাগর পার হইয়া অনন্তধামে চলিয়া যান। ৯ই জানুয়ারী প্রতাপচন্দ্র আপন ডায়েরীতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

(অনুবাদিত) "গত রাত্রে ভোর ৪টা কি ৫টার সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সমুদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তরঙ্গমালা অবিরাম জাহাজের উপর আঘাত করিতেছিল, যেন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছিল। জলের যেন এক আশ্চর্য্য শব্দ হইতেছিল। কোন অনিশ্চিত ভয় কেন আমাকে আক্রমণ করিল? এত গভীর নিরাশ্রয়তা বোধ কি করিয়া আসিল? চির জাগ্রত জগন্মাতার বক্ষে, অনন্ত করুণা-ক্রোড়ে, যাহা আমার চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে তন্মধ্যে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

আচার্য্যের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি ঐ স্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"তখন কেন এমন হইয়াছিল, তাহা এখন বুঝিয়াছি, হে আমার অন্তঃকরণ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। প্রায় সেই সময় আমার প্রিয় আচার্য্যের আত্মা এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন এই অনিশ্চিত সঙ্কেত আসিয়াছিল। আমি বাহিরের সমুদ্র পার হইতেছিলাম, তিনি কালসাগর পার হইয়া

অনন্তে প্রবেশ করিতেছিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে স্পর্শ করিলেন। প্রিয় আত্মা, আমাকে সর্ব্বদা স্পর্শ করিও, জাগ্রত করিও, কারণ আমি বড়ই নিদ্রালু ও অলস। যখন আমার সময় আসিবে, তখন তুমি যে আলয়ে গিয়াছ, সেখানে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

—০—

দেবী সৌদামিনী মজুমদার।

(প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্রের Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

তোমার যে পরিচারিকাকে আমি পত্নীরূপে লাভ করিয়াছি, তাঁহার জন্য সকাতরে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। তিনি আমাকে খাইতে দেন, আমার সেবা যত্ন করেন এবং আমার জন্য দারিদ্র্যের গুরু ভার বহন করেন। বাহ্যিক বিষয়ে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিব, সে শক্তি তুমি আমার রাখ নাই। তাই সাশ্রুনেত্রে তোমার চরণে ভিক্ষা করিতেছি যে, তাঁহাকে সান্ত্বনা দাও ও রক্ষা কর এবং যদি তোমার ইচ্ছা হয়, সাংসারিক দুশ্চিন্তার পেষণ হইতে তাঁহাকে মুক্ত কর।

তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে তোমার অনেক সদ্গুণ আমি লক্ষ্য করিয়াছি। আত্মদান, কোমলতা এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমি তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাই। হে প্রভু, এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তিনি নিজের মধ্যে তোমার দর্শন লাভ করেন; অন্ততঃ আমি যেমন তোমাকে দেখিতেছি এবং ভক্তি করিতেছি, তিনিও যেন তোমাকে সেইরূপ দেখিতে পান ও ভক্তি করিতে সমর্থ হন। পৃথিবীর সুখ সৌভাগ্য তাঁহাকে দান করিব, এরূপ ক্ষমতা আমার নাই; কেমন করিয়া আমার অন্তরের ভাব তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত করিতে পারি, তাহাই আমাকে বলিয়া দাও।

প্রেমময় দেবতা, আমার অবসন্ন প্রাণ মথিত করিয়া আমার পত্নীর জন্য তোমার চরণে এই প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে। তাঁহার মধ্যে তুমি নিজে সেবারতা স্বর্গের দেবীরূপে বর্ত্তমান। তিনি কেন যে আমাকে এত ভালবাসেন, জানি না। আমি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে সুখে বাস করি, এবং সুশীতল মুক্ত বায়ু সেবন করি, আর তিনি এই অসহ্য গ্রীষ্মের মধ্যে রন্ধনশালায় ঘর্ম্মাক্ত-শরীরে আমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেন। তিনি আমাকে খাওয়ান, পরান, ঘুম পাড়ান এবং রাত্রে উঠিয়া উঠিয়া কতবার দেখেন যে, আমি ঘুমাইতেছি কিম্বা জাগিয়া আছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র গৃহ, আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যান, আর আমাদের যাহা কিছু আছে, তিনিই দেখেন শুনেন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রক্ষা করেন।......সংসার খরচের জন্য আমি তাঁহাকে কিছুই টাকাকড়ি দিতে পারি না। গভীর বেদনার সহিত কাতর-হৃদয়ে তোমারই কাছে ক্রন্দন করি। তোমার উপরে নির্ভর করা ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই। এই দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তে এখনও যতটুকু পারি, কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করি। বিশ্বাস এবং উৎসাহ দান করিয়া আমাকে দৃঢ় কর; যোগ এবং পবিত্রতা দান করিয়া আমাকে দৃঢ় কর। আমার জীবনের প্রত্যেক নিমেষকে তুমি বিশুদ্ধ কর, আমার দেহের প্রতি পরমাণুকে তুমি নির্ম্মল কর। এবং সর্ব্বোপরি এই প্রার্থনা যে, সময়ে সময়ে যে আলোক, যে শান্তি ও যে সান্ত্বনা দিয়া তুমি আমাকে কৃতার্থ কর, আমার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর অন্তরে সেই আলোক, সেই শান্তি ও সেই সান্ত্বনা প্রকাশিত কর। তাঁহারই সেবা যত্নে আমি বাঁচিয়া আছি, তাঁহার সহিত একত্রে তোমার আরাধনা করিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা-পীড়িত হৃদয়ের ভার যেন আমি একটু কমাইতে সমর্থ হই। আমরা বড় একাকী, অত্যন্ত একাকী, সংসারে আমাদের আপনার বলিবার আর কেহই নাই। এই কঠোর নিঃসঙ্গ অবস্থায় তুমি আমাদের সঙ্গে থাক।

হে আমার দীর্ঘ জীবনের সহচরী, আমার কণ্ঠস্বরের সহিত তোমারও কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়া ঈশ্বরের সিংহাসনতলে উত্থিত হইয়াছে। অরণ্যে, পর্ব্বতপৃষ্ঠে, সুদূর বিদেশে আমাদের দুজনের মস্তক একত্রে পিতার চরণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। আমার অশ্রুর সহিত তোমারও অশ্রু মিশিয়া এক স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। তুমি আমার শিষ্যা, তুমি আমার অনুগামিনী, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী। ভগবানের যে বচনাতীত আশীর্ব্বাদ আমার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, সেই আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে বর্ষিত হউক। তুমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। অনেক সঙ্কট সময়ে তোমার সুবুদ্ধি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। অনেক প্রলোভনে তুমি আমাকে সাবধান করিয়াছ, অনেক অবসাদে তুমি আমার অন্তরে বল সঞ্চার করিয়াছ। তোমার নিকট সাহায্য চাহিয়া কখনও বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু হে প্রিয়তম সহচরী, সংসারের দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার পীড়ন হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। ভগবান করুন, যেন আরও কিছু দিন তুমি আমার সঙ্গে পৃথিবীতে থাক। তথাপি সংসারে তোমাকে একাকী ফেলিয়া আমি আগে সেই অমৃতধামে চলিয়া যাই—এমন ইচ্ছা হয় না। বরং যেন তোমাকে হারাইয়া আমি একাকী থাকি, ভগবান এই বিধান করুন। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

—০—

প্রার্থনা

(স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের হাওড়ায় পঠিত প্রার্থনা)

ইচ্ছাময় ঠাকুর! আজ তুমি কোথায় আনিলে! তিনশত পঁয়ষট্টি দিন পরে তুমি কোন্ স্রোতে আনিয়া ফেলিলে? পূতসলিলা গঙ্গা হিমালয়ের একটী স্রোতে বাহির হইয়া শত স্রোতে আসিয়া সাগর-সঙ্গমে মিলিয়া গিয়াছে। আজ কি সেই মহাতীর্থ-সঙ্গমে আমাদিগকে আনিয়া ফেলিলে? আমাদিগের প্রেমিক সন্তান বিনয়কুমার অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ও তাঁহার নবদ্বীপ, বদরিকাশ্রম আজ কোন্ আশ্রমে ও কোন্ তীর্থে পরিণত হইল? আমাদের নববিধানাচার্য্য যে তাঁহার "নববৃন্দাবনে" সকল তীর্থের সমন্বয় দেখিয়াছিলেন। আজ কি আমরা তোমার প্রেমিক শিশু বিনয়কুমারকে লইয়া তোমার নিভৃত নববৃন্দাবন দেখিতে আসিয়াছি?

আজ আমরা বৎসরের পরে সেই 'নববৃন্দাবন' দেখিতে আসিলাম। আজ আমাদিগকে এ তত্ত্ব কে শিখাইবে? শিক্ষা-দাতা ও দীক্ষা-দাতা গুরু তুমি। তুমি আজ এ তত্ত্ব শেখাও। পাশ্চত্য ঋষি জিউমিসি তোমার ভিতরে তাঁহার মহা অনুভূতিতে বলিয়াছেন, "The secrets of the Most High." আজ কি ইহার ভিতরে সেই রহস্য? ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নববিধানে কপোত উড়াইয়াছিলেন। বিশ্বাস করিতেছি যে, তোমার প্রেমিক শিশু বিনয়কুমার তোমার নিকট এই সব দীক্ষা পাইয়া আমাদের নিকট দেখাইতে আসিয়াছিলেন। পাশ্চত্য ঋষি বলিয়াছেন— Come and see Him with the eyes of a vulture." আজ তুমি আমাদিগকে সেই চক্ষু দাও, আমরা তোমার ভিতরে তাহাই দেখি। ঠাকুর! তোমার প্রেমিকের প্রেমে সবই নূতন হয়। তোমার প্রেমিক শিশু বিগত বর্ষে তাঁহার নূতন ভবনে শ্রীঈশার শোণিতদানের দিনে তোমার নামে উৎসব করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে সেই দীক্ষাই পাইয়াছিলেন। উৎসবে যে মানুষ নূতন হয়। উৎসবে তোমার প্রেমিক ভক্তেরা নূতন হইয়া যান। উৎসবেই নবশিশুর জন্ম। এখন বুঝিতেছি যে, তোমার উৎসবে প্রেমিক বিনয়কুমার নবশিশুই হইয়াছিলেন। তোমার নববিধানে মানুষ নূতনই হয়। তোমার প্রেমিক ঈশা তোমার ভিতরে "Begotten son" হইয়াছিলেন। তোমার নববিধানে ব্রহ্মানন্দ "নবশিশু" হইয়াছিলেন। এখন বুঝিতেছি যে, আমাদের প্রেমিক সন্তান বিনয়কুমার তোমার ভিতরে এই সব নূতন দীক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নববিধানের এই সব তত্ত্ব পাইয়াছিলেন।

তাই আজ তোমার নিকটে বলিতে আসিলাম যে, এই দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তোমার প্রেমিক সন্তান বিগত ২৭শে এপ্রিল তারিখের রজনীশেষে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে এই ভাব লইয়া শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতরে যে নববিধানের নূতন ধমনীর আঘাত পড়িয়াছিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি বুঝিয়া সুঝিয়া হাসিতে হাসিতে, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জায়া ও কন্যাপুত্রদের সে আঘাত-তত্ত্ব না বলিয়া, তাঁহাদের সম্মুখ হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় তাঁহার বিশেষ আত্মীয়ের ভবনে আনন্দানুষ্ঠানের উপাসনায় যোগদান করিবার পূর্ব্বে বিমানপোত-নিবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই আত্মীয় ভবন হইতে যাইবার সময় "আসছি" এই কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার "আসছি" তখন বুঝিতে পারি নাই। তিনি সত্য সত্য সে কথা তোমার বিধানে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার সে "আসছি" আমাদের নিকট নহে, তাহা তোমারই নিকট। সেই যে সুবৃহৎ "টাইটানিক তরী" ডুবিবার সময় সাধক গান করিয়াছিলেন, "Nearer to God and nearer to Heaven." বিশ্বাস করিতেছি যে, তাঁহার ভিতরেও এই মহান জীবন-সঙ্গীত উত্থিত হইয়াছিল। প্রেমিক প্রেমেই আত্মদান করেন। তোমার রহস্য কে বুঝিবে! সেই বিমানপোত-নিবাসে যে ইউরোপীয় মহিলা বিমানপোতে উঠিবার জন্য তোমার প্রেমিক বিনয়কুমারকে অনুরোধ করিলেন, সেই প্রেমের অনুরোধ তাঁহার পক্ষে এড়ান সহজ নহে। তিনি তাঁহাকে লইয়া তাঁহার বিমানপোতে অদৃশ্য আকাশপথে পাখীর মত চলিয়া গেলেন। পাখী যে আর ফিরিবে না, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল? তোমার পাখী তাই উড়িলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সেই বিরল আকাশে বিরল প্রেমে আত্মদান করিলেন। ভিতরের কপোত বুঝি এইরূপই উড়িয়া যায়। প্রেমিক বিনয় তাঁহার প্রেমে পৃথিবীর আমি-পক্ষী এইরূপেই উড়াইয়া দিলেন।

ঠাকুর! আজ আর এই তীর্থে আসিয়া তোমাকে কি বলিব। আজ এই তীর্থে তোমার প্রেমিক শিশু বিনয়ও আসিয়াছেন এবং আমরাও আসিয়াছি। তোমার কাছে এলে মানুষ অনেকদূর আসিয়া পড়ে। হিমালয়ের পথে মানুষ অনেকদূর আসিয়া পড়িলে মানুষ অমরনাথেও আসিয়া পড়ে। এই পথে আসিয়া তোমার বিনয়কুমার "চন্দ্রবারিতে" আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তুমি আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁহার সম্মুখে এবং আমাদের সম্মুখে চিন্ময় 'অমরনাথ' এবং তোমার বাড়ী সেই অদৃশ্য 'চন্দ্রবারি' প্রকাশিত কর। তুমি আজ সকলের সম্মুখে আশার চন্দ্র হও।

আবার বলিতেছি, তোমার কাছে এলে মানুষ অনেক জিনিষ পেয়ে যায়। বিনয়কুমার তোমার কাছেই এসেছিলেন এবং অনেক স্বর্গের জিনিষ পেয়েছিলেন। বৎসরের শেষে তোমার উৎসব শেষ করিয়া, নববর্ষে বিচরণ করিতে করিতে, আরও নবীন উৎসব পেয়ে গেলেন। তাই তিনি তোমার ইঙ্গিতে সেই উৎসবে

আসিয়া পড়িলেন। পুণ্যপ্রদ বৈশাখের মাসে ভক্তিমতী হিন্দু মহিলা ফল ও জল দান করেন। তোমার বিনয়কুমার সেই ফলদানের ব্রত অবলম্বন করিয়া হিন্দু মহিলার মত সেই পাশ্চাত্য মহিলার সঙ্গে তোমার চরণে শোণিত দান করিলেন।

তাই তোমার নিকট এই ভিক্ষা যে, এই মহাতীর্থসঙ্গমে তোমার সেই নবশিশুর উপর এবং আমাদিগেরও উপর স্বর্গ হইতে শান্তিবারি 'showers of pentecost' বর্ষণ কর।

আজ আর তোমার নিকট কোন্ ভিক্ষা করিব? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

নূতন সঙ্গীত।

খয়রা—কীর্ত্তন।

(তোমায়) দূরে দূরে রেখে, কল্পনাতে এঁকে,
মনতো প্রবোধ মানে না।
(তুমি) জীবনের জীবন, সম্ভোগের ধন,
অনুমানে প্রাণ বাঁচে না॥
(নয়ন তোমায় দেখিতে চায়) (হৃদয় তোমায় ধরিতে চায়)
(তুমি) আছ জলে স্থলে, অনিলে অনলে,
বিশ্বরূপী ভগবান্।
যদি না পাই তোমারে, হৃদয় মাঝারে,
শূন্য হেরি ত্রিভুবন॥
শাস্ত্রে সাধুমুখে শুনি তব কথা,
কত না আনন্দ পাই।
নিজ দীন দশা হেরি, অপরাধ স্মরি,
মরমে মরিয়া যাই॥
আছ সুখ সম্পদে, দুঃখ বিপদে,
কাছে কাছে মোরে ঘেরি।
তবে কেন অন্ধ সনে, গোপনে গোপনে,
খেলিছ হে লুকোচুরী॥
(ভাল দেখায় না হে—অন্ধ সনে লুকোচুরী)
কবে হবে সখা, তোমা সনে দেখা,
মেশা মিশি মাখামাখি।
(আমি) সাধ মিটায়ে শ্রীপদ সেবিব,
যতনে হিয়াতে রাখি॥
(আর অযতন করবো না হে—যা'হবার তা হয়ে গেছে)

সংগৃহীত—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

স্বর্গীয় প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন গত জানুয়ারী মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। নববিধানের জীবন্ত সত্তা দ্বারা অধিকৃত হইয়া, অল্পকাল হইল, সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমি নববিধান-সমাজভুক্ত হইয়াছি। কয়েক বৎসর খাসিয়া পাহাড়ে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কলিকাতায় আসিলে, শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ বি, সি, ঘোষ মহাশয় ১৯২৪ সালে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারার্থ শ্রদ্ধেয় ভাই ৺মহিমচন্দ্র সেনের নিকট আমায় প্রেরণ করেন।

এ কারণ আমি তাঁর পবিত্র সহবাস-লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁর জীবনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সকলে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত হইবার সুযোগ পাই নাই। আমি কেবল তাঁর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁর ধর্ম্ম-জীবনের যতটুকু আভাস পাইয়াছি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব।

তাঁর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-সাধনায় খুব নিষ্ঠাবান্ বলিয়া মনে হইয়াছে। নিয়মমত তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিতেন। ইদানীং তিনি চক্ষে তেমন দেখিতে পাইতেন না, তথাচ তাঁর স্তোত্রাদি পাঠের পর লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতেন। ইহার পর তিনি দেবালয়ে গমন করিয়া সমসাধকবৃন্দের সহিত উপাসনায় প্রতিদিন নিযুক্ত হইতেন। কি দিবসে, কি রাত্রিকালে, তিনি যখনই বিশ্রাম করিতেন, তখনই তিনি ব্রহ্মনামগানে, ধ্যানে ও আবৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি লেখাপড়ায় নিবিষ্ট থাকিতেন। এই আশ্চর্য্য নিষ্ঠা তাঁর মধ্যে দর্শন করিয়াছি।

তিনি যে শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিলেন, সে বিষয় তিনি তাঁর স্বরচিত পুস্তকাদির মধ্য দিয়া শিক্ষিত সমাজে পরিচিত আছেন। সে বিষয় কিছু বলিব না। কিন্তু দেখিয়াছি যে, তিনি নববিধানের গভীর সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে পিতা হইয়া এবং নববিধানে তিনি আমাদিগের মধ্যে মাতা হইয়া আসিয়াছেন।

তাঁর আহার স্নান প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্য সকলই তাঁর নিকট আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হইয়াছিল। আহারের সময় তিনি প্রার্থনা করিতে করিতে বলিতেন, "এই যে ক্ষুধা-বোধ, এ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার ইঙ্গিত নহে; কিন্তু ইহা তোমার আদেশ"। এইরূপে তিনি ইহলোকে বাস করিয়াও আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এই নিদারুণ বার্দ্ধক্যেও সংসারের সকল সংবাদ লইতে ও সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তাঁর ত্রুটী ছিল না।

তাঁর মধ্যে সকল সময় একটা প্রশান্ত ভাব বিরাজ করিত, দেখিয়াছি। তাঁর ইচ্ছা নয় যে, এত শীঘ্র আমি কোথাও যাই।

কিন্তু আমি ময়মনসিংহে প্রচারের জন্য গমন করিলাম, মনে ভাবিলাম, তিনি বিরক্ত হইলেন; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তাঁর বিরক্তি কিছু মাত্রই হয় নাই। তাঁর স্থির প্রশান্তচিত্তই অবলোকন করিলাম। প্রচারকার্য্যে যাঁহারা নূতন প্রবেশ করিয়াছেন, তেমন অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই যাঁহাদের, তাঁহাদিগকে কিরূপে অগ্রসর করিয়া দিতে হয়, তাহা তিনি ভালরূপই জানিতেন।

আমি যখন খাসিয়া পাহাড়ে পুনরায় প্রচারার্থে ঢাকা হইতে যাত্রা করি, তখন তিনি প্রচারকের দৈনন্দিন করণীয় কার্য্য কিরূপ, তাহা আমাকে বিশেষ ভাবে জানাইয়া দেন। গমন করিবার পূর্ব্ব দিবস, তিনি দাসমণ্ডলীর অতিরিক্ত অধিবেশন যাহাতে হয়, সে জন্য মণ্ডলী আহ্বান করেন। সেই অধিবেশনে তিনি আমার জীবনের ঘটনা সকল এবং আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিতে বলেন।

তৎপর পাহাড়ে অবস্থানকালে, সেই বিদেশে ভিন্ন জাতিতে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সঙ্কটময় অবস্থায়, তিনি আমায় সকল প্রকারে সাহায্য করেন। কখনও অর্থসাহায্য করিয়া, কখনও উৎসাহ দিয়া, কখনও সংবাদ লইয়া, আবার কখনও বা গভীর উপদেশপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া আমার সাহায্য করেন। সে সকল পত্র নির্য্যাতনের মধ্যে বল, নিরাশার মধ্যে আশা আনয়ন করিয়াছে, এবং সমবেদনা ও সাহায্য প্রদান করিয়াছে। সে সময় অনিষ্ট-চেষ্টায় কেহ কেহ তাঁর নিকট আমার বিরুদ্ধে পত্র লিখিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি তাঁর নিকট সমভাবেই বিশ্বাসের পাত্র ছিলাম।

সে যাহা হউক, তাঁর মধ্যে আর একটী বিশেষ গুণ দেখিয়াছি, তাহা তাঁর সহ্যশক্তি। তিনি এই অতি বার্দ্ধক্যে শত অপমান, অপবাদ এবং নিন্দাতেও স্থির ধীর ও নীরব থাকিতেন। প্রতি পক্ষের প্রতি ব্যবহারে, কার্য্যে, ভাবে ও চিন্তায় তিনি সকল সময় হৃদয় মনের প্রসন্নতাই ব্যক্ত করিতেন। এই অমূল্য জীবন আমাদিগের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছে। সে জন্য ব্রাহ্মসমাজ আজ অতি ক্ষতিগ্রস্ত। বিশেষতঃ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানমণ্ডলী একজন প্রকৃত সরল বিশ্বাসী, জ্ঞানী সাধক ও সেবক হারাইয়াছেন। আজ সে জন্য হীনতা ও নিরাশা আমাদিগের মধ্যে না আসিয়া, আশা, গৌরব ও উদ্যম জাগিয়া উঠুক। বিধানজননী আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁর শত শত বিশ্বাসী সন্তান এই সমাজে উত্থিত হইয়া এই সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—০—

সংবাদ।

শুভবিবাহ—গত ২৮শে বৈশাখ, কলিকাতায়, সিটি কলেজ গৃহে, ঢাকার স্বর্গীয় কালীভৈরব রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়ের সহিত, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শোভনার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই শুভ অনুষ্ঠানে বরের মাতৃদেবী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

কৃতজ্ঞতা-দান—গত ২৫শে এপ্রিল, সন্ধ্যায় মাণিকতলানিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস বসাকের বাড়ীতে তাঁর কঠিন রোগ হইতে আরোগ্যলাভ হেতু ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা অর্পণপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গৃহপ্রবেশ—গত ৬ই মে, ১৮নং বালীগঞ্জ প্লেসে, শাস্ত্রসাধক ঋষি কেদারনাথ দের কনিষ্ঠ পুত্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বিমানবিহারী দের নবনির্ম্মিত সুন্দর গৃহে প্রবেশোপলক্ষে, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত নবসংহিতা হইতে "বাসভবন" বিষয়ের কতক অংশ পাঠ করিয়া সুন্দর একটী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান্ নবগৃহকে ও গৃহবাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীবুদ্ধ সমাগম—গত ৬ই মে, বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে, শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি ও মহাপ্রয়াণ স্মরণ করিয়া পুরী নবপর্ণকুটীরে প্রাতঃসন্ধ্যা বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। প্রাতে সেবিকা হেমন্তকুমারী ও সন্ধ্যায় ডাঃ কৃষ্ণদাস পাল শাক্য-সমাগম হইতে পাঠ করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২০শে বৈশাখ, (৩রা মে) ৪৪নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় প্রিয়ব্রত সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার প্রথমাংশ এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় শেষ প্রার্থনা করেন; ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। পুত্র শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ সরকার পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া নবসংহিতা হইতে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংগীত করেন। পবিত্র অনুষ্ঠানে অনেকে উপস্থিত হইয়া স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অঞ্জলি দান করেন। এই অনুষ্ঠানে নববিধানসমাজে ২০৲ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২০শে বৈশাখ (৩রা মে) জলপাইগুড়িতে, তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত মতিলাল বড়ুয়ার ভবনে, তাঁর শ্বশ্রূমাতা স্বর্গীয়া কমলেকামিনী বসুর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে কর।

শ্রীমতী নলিনীবালা বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। জামাতা মতিলালবাবু উপাসনা করেন। স্থানীয় সমবিশ্বাসিগণ এবং প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতা ভগ্নীগণ যোগদান করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে কলিকাতায় নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা, তিনজন প্রচারককে তিনখানা, পাঁচজন বিধবাকে ৫খানা এবং তিনজন গরিব দুঃখীকে তিনখানা বস্ত্র দান করা হইয়াছে; এবং গরিব দুঃখীদিগকে খাওয়ান হইয়াছে।

গত ১৪ই মে, (৩১শে বৈশাখ), ১৩নং বাদুরবাগান রো ভবনে, স্বর্গীয় রায় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের আদ্যশ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাধিপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভাই অক্ষয় কুমার লধ নবসংহিতার প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া পবিত্র ভস্ম স্থাপন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া পিতৃদেবের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের পূত চরিত্র-মহিমা বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও পিতৃদেবের সদ্‌গুণাবলী বর্ণনা করিয়া পিতৃতর্পণ করেন। অনেকে উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে পুত্রগণ নববিধান প্রচারভাণ্ডারে স্থায়ী ফাণ্ডরূপে ১০০৲ টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রচার বিভাগে স্থায়ী ফাণ্ডরূপে ১০০৲ টাকা এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ২০০৲ টাকা সর্ব্বসমেত ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন, এবং শোকার্ত্তজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—গত ১০ই মে, কলিকাতায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, স্বর্গীয়া কমলেকামিনী বসুর আত্মার স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা, ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা, ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, মর্ম্মাহত-চিত্তে উপর্য্যুপরি দুইটী শোক-সংবাদ প্রকাশ ক'রতেছি :—

গত ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ), মধ্য রাত্রে হাজারিবাগে, গৃহস্থ-বৈরাগী স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের মধ্যম পুত্র, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে, ৫৭ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হাজারিবাগে নূতন বাড়ী করিয়াছিলেন,; কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিবেন। ভগবান্ তাঁকে ইহলোক হইতে চিরতরে অবসর দিয়া নিত্যকালের সুন্দর বাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। তিনি বড় উৎসবপ্রিয়, উপাসনাশীল, শান্তস্বভাব, সর্ব্বজনপ্রিয়, উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে ওখানে, ভক্ত নালুদার সঙ্গে ও অন্যান্যের সঙ্গে গমন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইতেন। তিনি অল্প বয়সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া, কার্য্যদক্ষতাগুণে ক্রমে সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে বড় বাবু হইয়াছিলেন। তিনি যথাসাধ্য মণ্ডলীর সেবা করিতে পারিলে সুখী হইতেন। তিনি কিছুকাল আপন সুপরিচালনায় নববিধান প্রেসের সাহায্য করিয়াছিলেন। গত গুড-ফ্রাইডের সময় তিনি হাজারিবাগ উৎসবে গমন করেন; সেখানে গিয়া একটু অসুস্থ হন। তাঁহার পরিবার পূর্ব্ব হইতেই হাজারিবাগে ছিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য ডাক্তারের পরামর্শমতে ছুটী নিয়া ওখানে আরও কিছুদিন থাকার মনস্থ করিলেন। আর কলিকাতায় ফিরিলেন না; নিত্যোৎসবের ও চিরসুস্থতার দেশে চলিয়া গেলেন। মাতৃদেবী এই বৃদ্ধ বয়সে একে একে চারিটী পুত্র সন্তানের মধ্যে তিনটীকে হারাইলেন; সহধর্ম্মিণী অপগণ্ড কয়েকটী সন্তানকে লইয়া সংসারসমুদ্রে ভাসিলেন। বিধান জননীর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

গত ৯ই মে (২৬শে বৈশাখ) শনিবার, মধ্যাহ্ন সময়ে, ব্রহ্মানন্দের প্রিয় ও আত্মীয়, একনিষ্ঠ সাধক স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের তৃতীয় পুত্র, পরিবারের ও মণ্ডলীর কৃতিসন্তান, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন উদরীরোগে, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অল্পদিন মধ্যেই, চির বিশ্রামের দেশে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সাধু সাধ্বী পিতামাতার এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ পূতচরিত্র বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবনের আদর্শানুসরণে তিনি ধর্ম্মপ্রাণ, উপাসনাশীল, জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতচরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শান্ত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি বাঁকিপুরের বর্ষীয়ান সাধক শ্রদ্ধেয় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন কেশব একাডেমী স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটারী, নববিধান আশ্রম ট্রাষ্টের ও প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়েল ট্রাষ্টের অন্যতম ট্রাষ্টী এবং শ্রমজীবিবিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার পরিকল্পনায়, মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহার সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্যালকাটা কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মণ্ডলীর কত আশা ছিল, অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নানা বিষয়ে মণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিবেন। তাঁর অভাবে মণ্ডলীর যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার পরলোকগমনে ২১শে বৈশাখ 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শনিবার বেলা ১২টার সময় কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ৩০নং নিউ রোডস্থ বাস-ভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রখ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ (তৃতীয়) ভ্রাতা।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ কৃতিত্বের সহিত শেষ করিয়া, তিনি ১৯১০ সালে শিবপুর ইঞ্জি-

নিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ সময় শিবপুর কলেজে নূতন ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কেমিষ্ট্রির শিক্ষাদান আরম্ভ হয়; তিনি ঐ বিভাগে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক হন এবং পরে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। গত ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণের পর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র দাস ও বীরেন্দ্রকুমার মৈত্রের সহযোগে তিনি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করেন। ইদানীং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজেই বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রবৎসল, সদালাপী ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পত্নী, চার পুত্র, তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন বর্ত্তমান।"

ভগবান্ পরলোকগত দিব্য আত্মাদের শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে এপ্রিল, সায়ংকালে, কলিকাতায় ৭৬নং নিউথিয়েটার রোডে, ডাঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জির গৃহে, তাঁর স্বর্গস্থ পিতৃদেব ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন।

গত ২৮শে এপ্রিল, পাটনায় শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের ভবনে, বিমানবিহারী জামাতা বিনয়কুমারের প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে গৌরীবাবু উপাসনা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুমতি দেবী আচার্য্যদেবের "ব্রহ্মে বিলীন" প্রার্থনা পাঠ করিয়া, নিজেও প্রাণস্পর্শী ভাষায় একটী প্রার্থনা করেন।

গত ১৭ই বৈশাখ, বালীগঞ্জে ৬।২বি একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের পুত্রদের গৃহে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৭ই মে, ৮৫ সি শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে, ডাঃ বিবেকমোহন সেনের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিজয়মোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং ব্রহ্মমন্দিরের সংস্কারার্থ ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

—•—

কোরাণ শরিফ।

ভাই গিরীশচন্দ্র সেন "কোরাণ শরিফের" সর্ব্ব প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় গ্রন্থটীর তিনটী সংস্করণ হয়। প্রতি সংস্করণে ১০০০ কপি মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১৮৮১—১৮৮৬খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর ধরিয়া ছাপা হয়। প্রথমে সেরপুরের "চারুযন্ত্রালয়ে" ও পরে "বিধানপ্রেসে" খণ্ডাকারে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০২খ্রীষ্টাব্দে তিন বৎসরে "দেবযন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ ১৯০৮খ্রীষ্টাব্দে "মঙ্গলগঞ্জ মিশনপ্রেসে" দুই বৎসরে ছাপা হয়। প্রত্যেক সংস্করণই সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইদানীং কয়েক বৎসর এই বহুমূল্য পুস্তকখানি আর পাওয়া যায় না। সম্প্রতি ইহার চতুর্থ সংস্করণ "আর্ট প্রেসে" মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। আশা করা যায়, পূজার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থটী পূর্ব্বের মতই রহিল। এক হাজার কপি ছাপা হইতেছে। রয়েল সাইজ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র। যাঁহারা গ্রন্থটী ক্রয় করিতে চাহেন, এখন হইতে ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে প্রচারকার্য্যালয়ে, কিম্বা নববিধান পাব্লিকেশন কমিটীকে ৮৯নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট ঠিকানায় জানাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ
ম্যানেজার, প্রচারকার্য্যালয়।

—•—

পুরী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধান প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব।

(১৯৩০ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

আয়—

এককালীন ও সাময়িক দান সর্ব্ব মোট	৮৫০৲
ঋণ বা হাওলাত	১০৭৷৷০
মোট—	৯৫৭৷৷০

ব্যয়—

নবপর্ণকুটীর গৃহ নির্ম্মাণ ৩৯৩৶০, মজুর ৭১৸০, গরুরগাড়ী বহুনী খরচ ১৭৷৷৴১০, ভৃত্যদিগের বেতন ১৩১৶১০, পাথেয়াদি ১০৭৸১০, ডাক খরচ ৯৭৸৶১৫, ছাপা খরচ ও কাগজাদি ৩১৸০, বিবিধ ২৬৸৶১০, পুনঃসংস্কারাদি ১৫৴০, আসবাবাদি ৯৲, টিউবওয়েল ৩৬৷৷০, উৎসবের খরচ ১৪৷৷৶০। মোট—৯৫৭৷৷০।

হিসাবপরিদর্শক
স্বাক্ষর—কে, সি, সিংহ
,, বীরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক
সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 30th. May, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্য্যামী দেবতা! তুমি দেখিতেছ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেহধারী পৃথিবীবাসী তোমার অধিকাংশ পুত্রকন্যাদিগকে কত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে; তুমি জানিতেছ, সে সকল তাহাদের প্রাণে কত ভীতি, কত অশান্তি, কত চিন্তা ভাবনা, ঘোর শোকদুঃখজনিত কত দুর্ব্বিষহ মনোবেদনার সৃষ্টি করিতেছে। যতদিন মানুষ দেহে স্থিতি করিবে, ততদিন সে তো জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন থাকিবেই। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীনে থাকিয়াও, সে সকলের অতীত অবস্থায় সে বাস করিতে পারে। তজ্জনিত ভীতি, অশান্তি, ভাবনা চিন্তা, শোকদুঃখজনিত মনোবেদনা তাহার মনকে আর আন্দোলিত করিয়া দুঃখিত করিতে না পারে, তাহার একমাত্র উপায়স্বরূপ তোমার প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনগণ তোমার সত্যপূজা মানবমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই পূজা বন্দনা উপাসনা যোগে পৃথিবীর মানব সাধারণ সাক্ষাৎ ভাবে তোমার সহিত পরিচিত হইবে, সজ্ঞানে সচেতনে তোমাতে স্থিতি করিয়া, তোমা হইতে বল, শক্তি, অমৃপ্রাণন লাভ করিয়া, ধ্বংসশীল দেহে স্থিতিকালে চিন্ময় অক্ষয় দেহ লাভ করিবে। তুমি অক্ষয়, তোমাতে বাস করিয়া তোমা হইতে অক্ষয় উপাদানে গঠিত হইবে, এবং অক্ষয় জীবনে তোমার মধ্যে নিরাপদে বাস করিয়া উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন করিবে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু তো প্রকৃত পক্ষে ভয় ও আতঙ্কের বা কোন প্রকার ক্ষতির কারণ নহে; বরং তাহারা, যাহা ধ্বংসশীল, যাহা অনিত্য, তাহার সম্পর্কে সত্য চেতনা উপস্থিত করিয়া, যাহা অক্ষয় নিত্য, সেই দিকে আমাদের প্রগতির কারণ হইতেছে, এবং সেই পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া আমাদের জীবনের সহায়তাই করিতেছে, আমাদের বন্ধুর কার্য্য করিতেছে। তাই কোন ব্যক্তি ধ্বনি করিলেন, "Death is gain" মৃত্যু ক্ষতির বা ধ্বংসের প্রতিমূর্ত্তি নহে, মৃত্যু লাভের প্রতিমূর্ত্তি, অমৃতের সোপান।

নবযুগে নববিধানে সাক্ষাৎ ভাবে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে বাস করিয়া, তোমা হইতে সহজে সকলে যাহাতে অক্ষয় চিন্ময় জীবন লাভ করে এবং জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মধ্য দিয়া গমন করিয়াও, তাহারা যে ভয়ের বিষয় নহে, তাহাদিগকে অমৃতের পথে সহায়রূপে, মৃত্যুকে অমৃতের সোপানরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে পারে, এই জন্য এবার তোমার সত্য পূজা বন্দনার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছ। কিন্তু দেখ, এখনও এই বঙ্গ ভারতের এবং পৃথিবীর তোমার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণ সে সত্য উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেনা,

নানা প্রকার কল্পিত উপাসনার পথ আশ্রয় করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। আবার অল্পসংখ্যক যাঁহারা এই সত্য উপাসনা আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুবর্ত্তী আমরা অনেকে, তাঁহাদের বংশধর আমরা অনেকে, সেই উপাসনার সত্য সাধনা তোমার সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তনায় না করিয়া, উপাসনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, উপাসনার উচ্চ ফল হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এই জন্য তব চরণে কাতর প্রার্থনা, তুমি নিজগুণে এই সকল জরা ব্যাধি মৃত্যুকে উপায় করিয়া আমাদিগকে সচেতন কর এবং সত্য উপাসনা-সাধনে আমাদিগকে নব নব প্রবর্ত্তনা দিয়া, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে আমাদের সম্পর্কে অমৃতের সোপান করিয়া, আমাদিগকে ধন্য কর এবং পৃথিবীর সদ্‌গতির পথ পরিষ্কার কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

পরলোক-গৃহ।

এ সময় আমাদের মণ্ডলীর কত গুণী, জ্ঞানী, কত বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী, কত সাধক সাধিকা ক্রমাগত পৃথিবীর গৃহ শূন্য করিয়া, পৃথিবীর দেহকে জীর্ণ, শীর্ণ, পরিত্যক্তরূপে, অনাস্থ অনিত্যরূপে পৃথিবীতে রাখিয়া নিত্যধামে পরলোক গৃহে চলিয়া গেলেন; এখানকার বিধানপরিবারকে শূন্য করিয়া পরলোকে নিত্যধামে স্বর্গের বিধান-পরিবারকে পূর্ণ করিলেন। এ সময়ে আমরা যাহারা শুধু ইহকাল লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছি, মত্ত রহিয়াছি, ইহকালের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লইয়া পরলোক ভুলিয়া রহিয়াছি, তাহাদেরও অবস্থায় পড়িয়া পরলোক স্মরণ করিতে হইতেছে, পরলোকের সংবাদ লইতে হইতেছে। এ সময়ে আমরা ছোট ছোট বালক হই, বালিকা হই, যুবক হই, প্রৌঢ় হই, বৃদ্ধ হই, যে বয়সের, যে অবস্থার লোকই হই না কেন, সম্মুখে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতেছি, যিনি একটী গৃহের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যার ও পরিবারের যিনি একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন ছিলেন, যিনি সমাজ মধ্যে, মণ্ডলী মধ্যে জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে, ধর্ম্মে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহলোক হইতে চিরদিনের তরে অদৃশ্য হইলেন, এখানে অদৃশ্য হইয়া অদৃশ্য লোকে পরলোকে দৃশ্যমান হইতে চলিলেন, তখন কাহার চিন্তার বিষয় না হয়, প্রশ্নের বিষয় না হয়, যিনি চলিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন? সে রাজ্য কতদূরে, কত উর্দ্ধে, কোন্ উচ্চ লোকে? এই যে সময়, এ সময় পরলোক স্মরণ করিতে, পরলোক চিন্তা করিতে, পরলোকের আলোচনা করিতে আমাদিগকে বাধ্য করে। এ সময়, আমরা যাহারা পরলোক সম্বন্ধে কিছু জানি, বুঝি, এবং আমরা যাহারা পরলোক সম্বন্ধে তত ভাবি না, জানিনা, বুঝি না, সকলেই আমরা কত শ্লোকে, কত সঙ্গীতে, কত গাথায়, কত কথায় সেই পরলোক-গৃহের জীবন্ত, মধুর বর্ণনা শুনিলাম; সেই সকল সঙ্গীত ও গাথা পরলোককে চিত্রিত করিয়া, কত বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া, অদৃশ্য স্থানকে, অদৃশ্য গৃহকে কত দৃশ্যমান করিয়া, মূর্ত্তিমান করিয়া, এ সময় আমাদের মানসে, আমাদের মানসচক্ষের নিকট উপস্থিত করিতেছে। যখন শুনিতেছি, "সেই বাসস্থান, হেথা অবস্থান কেবল দুদিনের তরে" তখন তো আর পরলোক-গৃহ বিষয়ে উদাসীন থাকা চলেনা। মৃত্যুর পর মৃত্যু আসিয়া যতই আমাদের প্রাণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলুক না, সঙ্গীত, শ্লোক, গাথা, কথা, যতই পরলোকের বর্ণনা জীবন্ত ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করুক না, সাধু ভক্তগণ আপনাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া পরলোকের চিত্র যতই আমাদের প্রাণে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করুন না, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রকাশ অন্তরে লাভ ভিন্ন, ঈশ্বরের মধ্য দিয়া পরলোক দর্শন ভিন্ন, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় ও ঈশ্বরের বিশেষ শিক্ষায় পরলোকের সঙ্গে পরিচয় লাভ ও পরলোক সাধন ভিন্ন, পরলোকের বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের দর্শনের ভিতর দিয়া পরলোকের শোভা, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য দর্শন ভিন্ন পরলোকের প্রতি আমাদের যথার্থ অনুরাগ কিছুতেই জন্মিতে পারে না, পরলোকে আশা ও বিশ্বাস স্থায়ী হইতে পারে না। "সেই বাসস্থান, হেথা অবস্থান" কেবল কথার কথা আমাদের পক্ষে হইয়া থাকে।

ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর সাধন ভিন্ন পরলোকের জ্ঞান অসম্ভব কেন, আমরা সেই বিষয় প্রথমে আলোচনা করি। ঈশ্বর-সাধনে নিত্যানিত্যবিবেক আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে। ঈশ্বর-সাধন, ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপলব্ধি আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, ঈশ্বর আদি সত্য, ঈশ্বর নিত্য সত্য, ঈশ্বর অক্ষয়, অবিনাশী। ঈশ্বর-সাধন, ঈশ্বরের উজ্জ্বল

প্রকাশ আমাদিগকেও প্রকাশিত করে। আমাদের আত্মা অবিনাশী, নিত্য, সত্য, অক্ষয়, ঈশ্বরেরই কণা বা ক্ষুদ্রতম অংশ, এ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইতে উপস্থিত হয়। আমাদের শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল জগতের সকলই ধ্বংসশীল, ইহা ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগকে অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেয়। শরীরের মৃত্যু আসিয়া, বাহ্য জগতের ধ্বংস উপস্থিত হইয়া, এই নিত্যানিত্য-জ্ঞানকে সমর্থন করে; অনিত্যের ধ্বংসে নিত্য যাহা, তাহা আপনার মহিমা গৌরবে আপনাকে মানস-চক্ষে চির প্রতিষ্ঠিত করে।

মানুষের আত্মা যদি নিত্য হয়, অক্ষয় অবিনাশী হয়, আর শরীর যদি বিনাশশীল হয়, তবে অনিত্য শরীর নিত্য অবিনাশী আত্মার চিরবাসগৃহ হইতে পারে না। ইহা সহজজ্ঞানসিদ্ধ বিষয়। অনিত্য শরীরের ধ্বংসে, শরীর গৃহকে ত্যাগ করিয়া আত্মা কোন্ গৃহ আশ্রয় করে, এ প্রশ্ন সকলের প্রাণেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য অবিনাশী, সেই আত্মার নিত্য অবিনাশী গৃহ চাই। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ঈশ্বর-সাধনে আমরা প্রত্যক্ষ করি, ঈশ্বর নিত্য সত্য অবিনাশী, আর আমাদের আত্মা যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না, তাহাও নিত্য সত্য অবিনাশী। এবং শরীর হইতে বাহ্য জগতের সকলই ধ্বংসশীল। অতএব বাহ্য জগতের যাহা কিছু, তাহা তো আত্মার নিত্যকালের বাসগৃহ হইতে পারে না। শরীর ধ্বংস হইয়া শরীরই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে। অতএব একমাত্র আদি নিত্য সত্য ঈশ্বরই আত্মার নিত্য বাসগৃহ। ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের অনন্ত বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা সকল ইহকাল পরকালে প্রতি নিয়তই বাস করিতেছে। শরীর কি আত্মার সাময়িক বাসগৃহ? যতদিন শরীর বিদ্যমান থাকে, ততদিন আত্মা কি শরীরকে আপনার বাসগৃহ করিয়া শরীরে বাস করে?

এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "একদিকে শরীররূপ মন্দিরমধ্যে আত্মা, আর একদিকে ব্রহ্মরূপ মন্দিরমধ্যে আত্মা—একদিকে দেহগত আত্মা, অন্য দিকে ব্রহ্মগত আত্মা। এই আত্মা ব্রহ্ম এবং শরীর উভয়ের মধ্যে থাকিয়া দুইদিক হইতেই জীবনের প্রয়োজনীয় অন্ন জল গ্রহণ করে।" "যে আত্মা শরীরের মধ্যে, সেই আত্মাই পরমেশ্বরের মধ্যে। এই যোগ কেমন গূঢ় যোগ, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। একই আত্মা দুই প্রকার ব্রত পালন করিতেছে, দুই প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতেছে। একই মনুষ্য দুই জগতে বাস করিতেছে। যেমন শরীরের দ্বারা সংসারের যোগ, তেমনই আর এক দিকে বিশ্বাসের দ্বারা পরলোক এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। জীবাত্মা যখন ঈশ্বরে বাস করে, সেই অবস্থায়ই পরলোক।"

শরীর যত দিন আছে, আত্মা এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর জীবন যাপন করে, এবং পার্থিব যাহা কিছু সুখ দুঃখ ভোগ করে। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা শরীরধারী হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের যোগে পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পার্থিব যাহা কিছু ঈশ্বরের দান বলিয়া সম্ভোগ করে, এই পার্থিব ছোট বড় সকল ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের বিধি ব্যবস্থা দর্শন করেন, ঈশ্বরের লীলা তাঁহার শিক্ষাতে ও তাঁহার আলোকে পাঠ করেন, তাঁহারা এই শরীরকে সহায় করিয়া, এই বাহ্য পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া এখানেই স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। আর যাঁহারা ঈশ্বরবিহীন ভাবে শরীর ও শারীরিক ইন্দ্রিয়-যোগে পৃথিবীর বিষয় ভোগ করিতে যায়, তাহারা সংসারে পশুজীবন যাপন করে, সুখের অন্তরালে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এবং যখন শরীরের ধ্বংসে পৃথিবী পরিত্যাগ করে, তখন বলে, "এত দিন কার বেগারী ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।" তাই আমরা দেখিতে পাই, ঈশ্বর আমাদের শারীরিক জীবনে, পার্থিব সকল ব্যাপারে একমাত্র কল্যাণ-বিধাতা, এবং যথার্থই জীবনের কর্ণধার। অন্যথা শারীরিক জীবনে পার্থিব ব্যাপারে অশেষ দুর্গতি।

শরীর তো অনিত্য ধ্বংসশীল; শরীরের বিনাশে অবিনাশী আত্মার আশ্রয় কে, বাসগৃহ কে, অবলম্বন কি? একমাত্র নিত্য সত্য অনন্ত পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। তাই সময় থাকিতে, শক্তি থাকিতে, প্রত্যেক আত্মিক জীবের পক্ষে অনন্ত পরব্রহ্মকে আশ্রয় করা সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

যতদিন আমরা দেহে স্থিতি করি, তখনও আত্মার পোষণ ঈশ্বর হইতে, পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি ঈশ্বর হইতে। দেহের ধ্বংসে ঈশ্বরই আত্মার একমাত্র। বাসগৃহ, নিত্য কালের, অনন্ত কালের বাসগৃহ। ঈশ্বরই আত্মার পক্ষে শ্রেষ্ঠ লোক, ঈশ্বরই পরলোকগৃহ। পৃথিবীতে আসিয়া আমরা

ঈশ্বরদত্ত পার্থিব ভোগ, ঈশ্বরের সামগ্রী পাইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই। সাধু ভক্ত মহাজনগণ আসেন, ঈশ্বর-কর্তৃক প্রেরিত হন, সময় থাকিতে, সুযোগ থাকিতে, দেহে আমরা সুস্থ সবল থাকিতে, সেই নিত্যকালের আত্মার বাসগৃহ, আশ্রয় ও একমাত্র অবলম্বন ঈশ্বরকে শিক্ষা দিতে, ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে—দেহান্তে যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ গৃহ হইয়া নিত্যকাল আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, স্নেহময়ী জননী হইয়া যিনি তাঁহার স্নেহ-রূপ স্তনদুগ্ধে আমাদিগকে পোষণ করিবেন, পালন করিবেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই দেহে থাকিতে থাকিতে, বাহিরের ইট কাঠের গৃহে থাকিতে থাকিতে, পরলোক সাধন করেন, সজ্ঞানে সচেতনে পরলোকগৃহ ঈশ্বরে সুখে, আনন্দে বাস করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রাদ্ধ।

"পাঁচ জনের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ ছিল, তেমনই রহিল; মরিয়াছেন বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য হইলেন, আজ শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিয়া সমুদয় সম্বন্ধ শেষ হইল, এরূপ কখন মনে করিব না। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধ শেষ হইল বলিয়া স্বর্গীয় সম্বন্ধের শেষ হইল, তাহা নহে। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধের শেষ, স্বর্গীয় সম্বন্ধের আরম্ভ। আজ যাঁহার শ্রাদ্ধ করিলাম, স্বর্গে তিনি জীবিত হইলেন, এই কথা ভাবিব। এখন সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্পষ্টতর।"

(কেশব)

পরলোক কি দূরে ?

"মনে করিও না, পরলোক অনেক দূরে। পরলোক অতি নিকটে, তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে; তোমরা ভক্তি-প্রেম-হস্ত প্রসারণ করিলেই পরলোক ধারণ করিতে পাইবে। যে চক্ষে ব্রহ্মকে দেখি, সেই চক্ষে পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখিতে পাই।"

"বাল্যকালে মনে করিতাম, পরলোক বহুদূরে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসীর এক হস্তে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম এবং আর এক হস্তে পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাগণ। এক হস্তে ব্রহ্ম, অন্য হস্তে পরলোক।"

"যেমন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, তেমনই পরলোক প্রত্যক্ষ। পরলোক আমাদিগের আসলবাড়ী, পরলোক জীবের শান্তিনিকেতন। সেই নিকেতন নিত্যকালের আবাসস্থান।" —(কেশব)

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০ই জানুয়ারী, তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। নগরে গিয়া আপন আগমন-বার্ত্তা তারযোগে কেশবচন্দ্রকে জানাইবার জন্য তিনি টেলিগ্রাম অফিসে গমন করেন। সেখানকার কেরাণীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। একজন বাহিরে আসিয়া বলিল, "কেশবের মৃত্যু হইয়াছে"। হঠাৎ এই কথা শুনিয়া তিনি যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ১৫ই জানুয়ারী তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কেশববিহনে তিনি চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন।

জীবনের নানা ক্লেশ ঈশ্বরের প্রেরিত বিধান। "হে আমার ভ্রাতৃগণ, যখন তোমরা নানা পরীক্ষার মধ্যে পড়িবে, তখন আনন্দ করিবে; ইহা জানিও যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষার দ্বারা ধৈর্য্য উৎপন্ন হইবে। কিন্তু দেখিও, ধৈর্য্য যেন পূর্ণমাত্রায় তোমাদের স্বভাবমধ্যে আপনার কার্য্য করিতে পারে; তাহা হইলে তোমাদের স্বভাব পূর্ণ হইবে এবং কিছুরই অভাব থাকিবে না। (Epistle of James. Ch. 1—2—4)। যখন কোন দীন শোকার্ত্ত বিশ্বাসী সংসারের নিরাশার মধ্যে পড়িয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং একান্ত ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আপনার চরিত্রের পূর্ণতা-সাধনে চেষ্টা করেন ও বিধি-নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পথে অগ্রসর হন, তখনই আমরা দুঃখের মহৎ ফল দেখিতে পাই। মহৎ চরিত্র সকল এইরূপে গঠিত হয়। প্রেম, বিশ্বাস, বীরত্ব, পবিত্রতা এবং উচ্চ চিন্তা পৃথিবীকে সময়ে সময়ে প্লাবিত করিয়াছে; কিন্তু সে সকল নিঃশব্দে প্রেমিক শোকার্ত্তের হৃদয়ে প্রথমে উথলিয়া উঠিয়াছিল। যখন আমরা মনুষ্যজাতির এই সকল পরম উপকারী বন্ধুগণকে স্মরণ করি, তখন মনে হয় যে, তাঁহাদের জীবনে ক্লেশের অংশ অধিক না হইলে ভাল হইত। কিন্তু বিধাতার পথ গোপনীয়। শোণিত-প্লাবিত রণক্ষেত্রের উপর বিজয়নিশান উড্ডীন হয়। প্রথমে দুঃখ যন্ত্রণা হৃদয়কে বিদীর্ণ করিবে, পরে মনুষ্য আত্মা সকল ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হইয়া অনন্ত গৌরবে শোভিত হইবেন।

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর প্রতাপচন্দ্র গুরুতর পরীক্ষায় পতিত হন। সহযোগী প্রচারকগণের সহিত একযোগে কর্ম্ম করা, কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের কার্য্য করা, তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তিনি ঈশ্বরের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এখন হইতে প্রতাপচন্দ্র যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগ সকলের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপিত হয়, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা পাইতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Interpreter নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। ইহাতে যাহা মুদ্রিত হইত, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহার রচনা। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বন্ধুদের লেখাও থাকিত। তাঁহার জীবন ও উচ্চ চিন্তা এই সকল রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। যাহাতে সর্ব্বত্র শান্তি ও সদ্ভাব বিস্তার হয়, লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা তিনি সেই চেষ্টা পাইতেন। দেশের যুবকগণ তাঁহার আশার স্থল ছিল। তাহাদের নীতি ও জ্ঞান এবং চরিত্রের উন্নতি তাঁহার সর্ব্বদা চিন্তার বিষয় ছিল। তাহাদের উন্নতি-কল্পে তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গের গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত মিলিত হইয়া "Society for the Higher Tranining of Youngmen" স্থাপিত করেন। এখন এই সভা "The Calcutta University Institute" নামে আখ্যাত। যুবকদের নীতি-শিক্ষার সাহায্যার্থে তিনি গভর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া Aids to Moral Character গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নারীজাতির শিক্ষার প্রতি তাঁহার চিরদিন দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের চরিত্র-গঠনের সাহায্যার্থে তিনি "স্ত্রীচরিত্র" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত Life and Teachings of Keshub Chunder Sen মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ-রচনা তিনি আপন জীবনের একটী প্রধান কার্য্য মনে করিতেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে Parliament of Religions সভার অধিবেশন হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের প্রতিনিধিগণ এই সভায় আপন আপন ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করেন। প্রতাপচন্দ্র এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় প্রতাপচন্দ্র অনেকবার বক্তৃতা করেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমেরিকাবাসী সুপ্রসিদ্ধ Mr. Sunderland এইরূপ লিখিয়াছেন :—(অনুবাদিত) "এ কথা বলা বাহুল্য নয় যে, সেই মহাধর্ম্মসভায় আমেরিকা ও অন্যদেশবাসী যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে তাঁহার (প্রতাপচন্দ্রের) বক্তৃতা লোকে অধিকতর মনোযোগ এবং স্থির আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই মনোযোগ কেবল কৌতূহল নয়—যদি তাহা হইত, তাহা হইলে শীঘ্র ইহা শেষ হইয়া যাইত ; কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহার মুগ্ধকারী বাগ্মিতার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন ; এবং তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কথা এই, সকলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গম্ভীরতা ও যথার্থতা এবং তাঁহার বাণীর উদ্দীপন-কারিণী প্রবলা শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।" চিকাগো মহা-সভা ভঙ্গ হইলে প্রতাপচন্দ্র বোষ্টন নগরে গমন করেন। সেখানে লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া তাঁহাদের চিত্ত হরণ করেন। সে বৎসরের জন্য Lowell Lecturesএর ভার পাইয়া তিনি বোষ্টন নগরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি এবং তথাকার সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে চারিটী চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, সভাগৃহে সকলের স্থান কুলায় নাই। এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার এই সকল বক্তৃতা দান করেন। বোষ্টন হইতে প্রতাপচন্দ্র নিউইয়র্কে গমন করেন। সেখানে বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহার বন্ধু, Rev. Heber Newton বাস করিতেন। সেই সময় Newton সাহেবের আলয়ে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিল, "আমেরিকায় যে দিন দিন লোকের মনে সংসারাসক্তি প্রবল হইয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অমনোযোগী করিতেছে, ইহা নিবারণের উপায় কি?" সকলে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, প্রতাপচন্দ্র যদি নিউইয়র্ক নগরে কিছুকাল থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি লোকের মন ফিরাইতে পারেন। তাঁহারা এজন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সে সকলের সুবন্দোবস্ত করিতে—নূতন উপাসনালয় নির্ম্মাণ এবং তাঁহার সকল প্রকারের ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। প্রতাপচন্দ্র এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসাই স্থির করিলেন। যাহা হউক, এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমেরিকায় প্রধান প্রধান লোক সকলের মনে আপনার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমির সুসন্তানের ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে!

প্রতাপচন্দ্রের আমেরিকাস্থ বন্ধুরা তাঁহার কার্য্যের সাহায্য ও সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য "Mozoomdar Mission Fund" স্থাপন করেন। অনেক উদারধর্ম্মাবলম্বী লোক বৎসর বৎসর এই ফণ্ডে অর্থ দান করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহার বন্ধু মিষ্টার উইলিয়ম হাউয়েল রিড্ ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা স্ত্রীর চেষ্টা ও যত্নে দশ বৎসর কাল এই ফণ্ডের কার্য্য চলিয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র বলিতেন, "আমেরিকাবাসীরা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি ভারতবাসীর সেবা করিতেছেন।"

প্রতাপচন্দ্র ৯ই ডিসেম্বর আমেরিকা ছাড়িয়া ২৪শে জানুয়ারী (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় পঁহুছিলেন। তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুরা অত্যন্ত সমারোহে হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বদেশবাসীর সেবায় আপনাকে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। ভারতের নানা স্থানে তিনি সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন। কলিকাতা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, দার্জ্জিলিং, সিমলা, লক্ষ্ণৌ, গয়া, গাজিপুর, কাশী, লাহোর, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি নগরে তিনি মধ্যে মধ্যে বাস করিয়া যুগধর্ম্মবিধানের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মার্থিগণের ধর্ম্মপিপাসা বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রতাপচন্দ্র সিংহল দ্বীপে প্রচারার্থ গমন করেন। ঐ দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের

মতও বিশ্বাস প্রচার করেন। সিংহলবাসী অনেক লোক এই ধর্ম্মের সরল ও স্বাভাবিক মত শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীকে জানাইয়াছিলেন যে, এই দ্বীপে যুগধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, তথাকার লোকে শীঘ্র ইহা গ্রহণ করিবে। প্রায় পাঁচ সপ্তাহকাল তিনি তথায় থাকিয়া মান্দ্রাজে আসেন, এবং সেখানে দেড়মাস কাল অবস্থিতি করেন। তথায় বক্তৃতাদি দিয়া তিনি লোকের মনকে জাগ্রত করিয়া তোলেন; তাহাতে তাঁহারা, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সত্য, তাহা ভাল করিতে অনুভব করিতে সক্ষম হন। এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ব্যাঙ্গালোরে আসিয়া ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ সহরে সুন্দর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি ডিসেম্বর মাসের প্রথমে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র আমেরিকার Unitarians সম্প্রদায়ের সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ৪ঠা এপ্রিল তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, ১২ই মে আমেরিকায় পঁহুছিলেন। প্রায় পাঁচ সপ্তাহকাল সেখানে থাকিয়া তিনি ইংলণ্ডে আগমন করেন। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন। লণ্ডনের Imperial Institute Hallএ তিনি এক বক্তৃতা করেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক এই সভার সভাপতি হন।

প্রতাপচন্দ্র চারিবার ইংলণ্ডে ও তিনবার আমেরিকায় গমন করেন। আমেরিকায় তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ "Oriental Christ", "Heart Beats", "The Spirit of God" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। নববিধানের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। গ্রন্থ সকলের মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শনের ফল। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তিনি উভয় দেশের উদারমতাবলম্বী লোকদিগের নিকট সুপরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার আমেরিকাস্থ বন্ধু মিঃ উইলিয়ম রিড্ লেখককে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—(অনুবাদিত) "যাঁহারা মিষ্টার মজুমদারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রেম ও সম্মানের সহিত বহুকাল তাঁহাকে স্মরণ করিবেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মত লোক পৃথিবীতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; তাঁহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহবাসে থাকিয়া আপন আপন স্বভাবকে উন্নত করিয়াছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট বারজন শিষ্যের মধ্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে সুসমাচার জগতের নিকট বহন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা কেবল এই বলিতে পারি যে, প্রতাপচন্দ্র যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা স্থানে স্থানে কোন কোন অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়াছে ও সুফল উৎপন্ন করিয়াছে, এবং আশা করি, অনন্তজীবন এইরূপই করিবে।" ইংলণ্ডের পরম ধার্ম্মিক পণ্ডিত Dr. James Drummond লেখককে লিখিয়াছিলেন, যে তথায় (ইংলণ্ডে) যাঁহাদের নিকট তিনি সুপরিচিত, তাঁহারা সকলে অতি সম্মান ও ভালবাসার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য অনুভব করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

(৮ই জানুয়ারী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে কেশবস্মৃতিসভায় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের সভাপতিরূপে বক্তৃতার মর্ম্ম)

১১।১২ বৎসর বয়সে আমার এক জন জ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের (শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত) উপদেশসূত্রে আমি কেশবচন্দ্রের প্রভাবাধীনে আসি। উক্ত আত্মীয় যখন কলিকাতা হইতে আমাদের দেশস্থ ভবনে যাইতেন, তখন উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার মুখে কেশবের চরিত্র ও কার্য্যের কথা শুনিতাম। তিনি এক দিন আমাকে দুখানা মুদ্রিত কাগজ দেখাইলেন। সে দুখানা আদি ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী। সেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মহর্ষি বাঙ্গালায় এবং ব্রহ্মানন্দ ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতেন। প্রথম প্রশ্নাবলী তত্ত্ববিষয়ক এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত। আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে শুনিলাম, তাহাতে এমন সকল প্রশ্ন আছে, যাহা দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষায় প্রদত্ত হইবার উপযুক্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব দার্শনিক ভাবে শিক্ষা করিতে হয়, অন্য বিষয়ের ন্যায় তাহাতে পরীক্ষা দিতে হয়, এই কথা তখন হইতে আমার মনে মুদ্রিত হইল এবং পরজীবনে এই ধারণা ফলপ্রদ হইল। দ্বিতীয় প্রশ্নাবলী সাধনবিষয়ক। উহার প্রথম প্রশ্ন "তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?" এই প্রশ্নের অর্থ আমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "প্রত্যেক মানুষ সাধারণ কর্ত্তব্য ছাড়া কোন একটা বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য জগতে আসে। প্রার্থনা ও চিন্তাদ্বারা সেই কার্য্য, সেই উদ্দেশ্য জানিতে হয়।" এই কথাটিও আমার কাঁচা মনে মুদ্রিত হইল। বিষ্ণুশর্ম্মার উপমা মনে হয়,—"যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো ন'ন্যথা ভবেৎ"—যেমন নূতন মৃৎপাত্রে সংলগ্ন ছাপ নষ্ট হয় না। সৌভাগ্যক্রমে ১৩ বৎসর বয়সে ঢাকায় আসিয়া তথাকার সমাজের উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের দর্শন লাভ হইল এবং আমার কেশবভক্তি গাঢ়তর হইল। তখন (১৮৬৮ সাল) ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির আন্দোলন চলিতেছে। সমাজে প্রত্যহ প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস ও ক্রন্দনের রোল উঠিত। সব কথা বুঝি আর নাই বুঝি, সকলের সঙ্গে সঙ্গে না কাঁদিয়া থাকিতে

পারিতাম না। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে শ্রীহট্ট যাইয়া ভাবের উচ্ছ্বাস হারাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু তখন ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হইল এবং ব্রাহ্ম সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম। ১৬ বৎসরে কলিকাতায় আসিয়া কেশবের সাক্ষাৎ প্রভাবের ভিতরে পড়িলাম। তখন সমাজে একটী উৎসাহী যুবকমণ্ডলী ছিল, তাহাতে যোগ দিয়া প্রভূত উপকার লাভ করিলাম। কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় আমাদের সাধনের বিষয় ছিল। সেই সকল বিষয়ে কে কত দূর কৃতকার্য্য হইলাম, তাহা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতাম। একটী বিষয় ছিল—দুই বেলা সরস উপাসনা। মুখ বিষণ্ণ দেখিলে বন্ধুরা নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"আজ বুঝি তোমার উপাসনা সরস হয় নাই?" এখন কে কাহাকে এই প্রশ্ন করে? আমরা রবিবারের উপাসনা, সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, তত্ত্ববিদ্যাসভা প্রভৃতি সমাজের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতাম; কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ ছিল না। সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি আমাদের জন্য "ব্রাহ্মনিকেতন" স্থাপন করেন। সেখানে তিনি বা তাঁহার নিযুক্ত কোন প্রচারক আমাদিগকে লইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তখন সমাজে প্রচারোৎসাহ অতি প্রবল ছিল এবং প্রচারকগণ সাধারণ ব্রাহ্মদের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। উক্ত যুবকমণ্ডলীতে যোগ দিবার পরেই আমার সমসাধকগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?" আমি বলিলাম, আমি তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সকলেই (তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ১৫।১৬ জন) বলিলেন, —"ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার"। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ দুইজন মাত্র, —স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যারত্ন—প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির হইতে অনেক বৎসর লাগিল। তাহা স্থির করিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া অনেক চঞ্চলতা ও বিক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইলাম। বাল্য বয়সের শিক্ষিত আর একটী বিষয়—দার্শনিক প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা ও তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিয়া সেই শিক্ষার পরীক্ষা লওয়া,—কার্য্যে পরিণত করিতে আরো কয়েক বৎসর লাগিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই বিদ্যালয় বারো বৎসর চলে। ক্রমশঃ যাঁহারা সমাজের নেতৃস্থানীয় হইলেন, তন্মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি, যেমন স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস ও প্রতুলচন্দ্র সোম এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত গুহ, ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ ও অন্নদাচরণ সেন সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

সরস উপাসনার আদর্শ কেশবচন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলাম। এরূপ উপাসনার মূল—উজ্জ্বল ভাবে ঈশ্বরের সত্তা ও প্রেম উপলব্ধি। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা ও উপদেশে প্রধানতঃ এই দুটী বিষয়ই কেশবচন্দ্র নানা ভাবে উপাসকগণের হৃদয় মনে মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। মহোৎসব ও ভাদ্রোৎসবে মন্দিরে যে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস উঠিত, সে ভাবোচ্ছ্বাস উৎসবের পরেও অনেক দিন উপাসকদের জীবনে স্থায়ী হইত, তার গূঢ় কারণ এই উপলব্ধির শিক্ষা। প্রকৃতির সকল কার্য্যে, মানবশরীরে ও মানবজীবনের প্রতি বিভাগে, ঈশ্বর অতি জীবন্ত ও ঘনিষ্ঠ ভাবে বিদ্যমান, তিনি আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত, তিনি আমাদের প্রেমের ভিখারী, নানা উপায়ে, জীবনের নানা কার্য্যের ভিতর দিয়া, নানা সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া, তিনি আমাদের প্রেম লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এই সকল প্রাণমুগ্ধকর সত্য ব্রহ্মানন্দ এমন সরল, মধুর, কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বুঝাইতেন যে, অতি কঠিন হৃদয়ও তাহাতে গলিয়া যাইত। এক দিকে ঈশ্বরের ব্যস্ত প্রেম, অন্য দিকে আমাদের উপেক্ষা ও কৃতঘ্নতা, এই প্রভেদ উপলব্ধিমাত্রই শত শত প্রাণ ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিত। এই উপলব্ধিতে নিত্যযোগ ও গভীর ভক্তির আদর্শ আনে। এই আদর্শ যাঁহারা পান, তাঁহারা আর কেবল নৈতিক জীবন ও সমাজ-সংস্কারে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মসত্তায় চিত্ত মগ্ন হইয়া থাকিবে, ব্রহ্মপ্রেমে হৃদয় ভরপূর হইয়া থাকিবে, ইহাই তাঁহাদের আদর্শ হয়। এই আদর্শই জীবনের পরিচালক হইয়া আছে। এই আদর্শ দ্বারাই জীবনের সফলতা ও নিষ্ফলতার পরিমাণ করি। এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে কেশবের শিষ্যত্ব অনুভব করি। এই শিষ্যত্ব কোন ঘটনাতে ছিন্ন হইবার নহে। আমরা কোন বিশেষ সময়ে, বিশেষ ঘটনায়, কেশব হইতে পৃথক হইয়া এই সমাজরূপ নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার সঙ্গে আধ্যাত্মিক পিতা-সন্তানের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান সর্ব্বদাই পিতার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। ইংরেজ সন্তান বিবাহের পর পিতামাতা হইতে পৃথক হন। এদেশেও এখন এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের সমাজে কেশবচন্দ্রের আরব্ধ কার্য্যই চলিতেছে। এই সমাজ প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও মিঃ আনন্দমোহন বসু সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার সহিত কেশবশিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। আমার সামান্য জীবনে নানা সুযোগে আমি এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে এই সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা অগ্রসর, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে ধর্ম্মদর্শনের আলোচনা এবং উচ্চতর শাস্ত্রীয় গবেষণা (Higher Criticism) এই সমাজে বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে এবং তাহাতে একটী অভিনব ব্রাহ্মসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সাহিত্যসৃষ্টির কর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন ডাক্তার হীরালাল হালদার এবং অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ, কেশবের সাক্ষাৎ প্রভাব অনুভব করেন নাই, সত্য, কিন্তু তাঁহাদের অনুপ্রাণনও কেশবের শিক্ষা ও উক্তিসমূহ হইতেই প্রাপ্ত, ইংরাতে

সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই উন্নতি ও উৎকর্ষ কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শিষ্যগণ শিক্ষকের ভিতরেই আবদ্ধ থাকিবেন, অগ্রসর হইবেন না, এমন কথা নাই। তাঁহারা শিক্ষক হইতে অগ্রসর হইলে মূল শিক্ষার সজীবতা ও সবলতাই সপ্রমাণ হয়। ঈশ্বর কৃপা করুন, যেন ব্রহ্মানন্দের জীবন্ত ধর্ম্মানুরাগ ও সাধনের উচ্চাদর্শ আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। (১লা জ্যৈষ্ঠের "তত্ত্ব-কৌমুদী" হইতে গৃহীত)

—•—

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

অনন্ত জীবন

এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, ভগবান ও অনন্ত জীবন অধিকাংশ লোকের দৃষ্টির বহির্ভূত। কেবল যিনি অদৃশ্যের অনুরোধে দৃশ্যকে পরিহার করিবেন, তাঁহারই নিকটে অদৃশ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইবে। পৃথিবীর জীবন দেখা যায়, অনন্ত জীবন অদৃশ্য; মানুষ দেখা যায়, ভগবান অদৃশ্য। হে পরম গুরু, মানুষকে স্বার্থ-বিসর্জ্জনের দ্বারা দৃশ্য রাজ্যের অতীত অদৃশ্য রাজ্য দর্শনের চক্ষু দাও।

বিশ্বাসের বিষয়, তর্ক বিতর্কের বিষয় নহে। ইহার স্বপক্ষে তুমি যত পার যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত কর না কেন, যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদের সন্দেহ এক চুলও কমিবে না। কিম্বা ইহার বিরুদ্ধে তুমি যত পার আপত্তি উত্থাপিত কর না কেন, তোমার আপত্তিতে বিশ্বাসীর বিশ্বাস এক বিন্দুও টলিবে না। অনন্ত জীবন বিশ্বাসের বিষয় বটে, কিন্তু ততোধিক ধর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়। অনন্ত জীবন সম্বন্ধে যে কথা সত্য, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই কথা ঠিক সমান ভাবে সত্য।

অনন্ত জীবন সম্বন্ধে কেহ কেহ জল্পনা কল্পনা করে, কাহার কাহার নিকটে ইহা একটী সত্য মত, কেহ কেহ হৃদয়ের সহিত ইহাকে সত্য বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে; কিন্তু আমি অনন্ত জীবনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহা যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ইহা সন্দেহের অতীত। আমি বলিতে পারি—এই যে অনন্ত জীবন আমার অন্তরে। আমি জীবিত আছি, এ কথা যেমন সত্য, আমার যে মৃত্যু নাই, এ কথাও তেমনি সত্য। তথাপি এই আলোক কখনও বা উজ্জ্বল, কখনও বা ক্ষীণ। সময়ে সময়ে ইহা জলন্ত আগুনের মত সমুদয় পার্থিব মলিনতাকে দগ্ধ করে এবং আমাকে স্বর্গলোকে সমুত্থিত করে। আবার সময়ে সময়ে ইহা ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মত নিষ্প্রভ আকার ধারণ করে, তখন আমার বিশ্বাস যেন শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়।

অনন্ত জীবন কাহারও কাহারও নিকট বিশ্বাসের বিষয়, কাহারও কাহারও নিকট আত্মার অনুভূতির বিষয়। যাঁহাদের নিকটে ইহা বিশ্বাসের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, কেহ কেহ বা শাস্ত্রে আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, কেহ কেহ বা যুক্তি তর্কের উপরে নির্ভর করেন। কিন্তু অনুভূতি ব্যতীত অনন্ত জীবন সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব। আমি পরলোককে সত্য বলিয়া দেখিতেছি, কিন্তু সে কথা বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না।

প্রতিদিন অন্ততঃ কিছুক্ষণ সংসারকে ভুলিয়া ভগবানের সহিত যোগযুক্ত অবস্থায় বাস করিবার অভ্যাস সাধন কর; তবে পরলোক সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইবে। পরলোক সম্বন্ধে এই প্রমাণ পাইলে আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা থাকিবে না। ধর্ম্ম হইতে পতন, আর স্বর্গ হইতে পতন একই কথা। ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা মৃত্যুর পরপারে অনন্ত জীবনকে সত্য বলিয়া দেখা যায়। সংসারের চিন্তা ভুলিয়া ভগবানের মধ্যে অবস্থিতি করিতে অভ্যাস কর—মৃত্যু এবং অনন্ত জীবনের রহস্য তোমার নিকট উন্মুক্ত হইবে।

সাংসারিক পরীক্ষা এবং কাজ কর্ম্মের ঊর্দ্ধে প্রতিদিন উপাসনা-যোগে ভগবানের মধ্যে বাস করিবার অভ্যাসই অনন্ত জীবনের যথেষ্ট প্রমাণ। জ্ঞাতসারেই হোক, অজ্ঞাতসারেই হোক, ধর্ম্ম হইতে পতনই স্বর্গ হইতে পতন। প্রত্যেক বার যখনই আমরা রক্ত মাংসের উপরে জয়লাভ করি, তখনই বুঝি যে, মৃত্যুর পরে জীবন আছে। সংসারকে মন হইতে বিদায় করিয়া দাও, সজ্ঞানে ভগবানের সত্তার মধ্যে বাস কর, মৃত্যু এবং অনন্ত জীবনের রহস্য তোমার নিকট উন্মুক্ত হইবে।

যাহারা ইহকাল সম্বন্ধে মৃত, তাহারাই কেবল পরকালকে সত্য বলিয়া অনুভব করে। সংসারের বাসনা কামনার মৃত্যু হইলে অনন্ত জীবন দেখা যায়। ঐ যে পলকের মধ্যে মায়ার যবনিকা অপসৃত হইল এবং আমার আত্মার চিরবসতি আনন্দ-ময় বৈকুণ্ঠধাম আমার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। এখন আত্মাকেই সত্য বলিয়া দর্শন করিতেছি, সংসার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। মৃত্যুর বিভীষিকা আর নাই। আমার অশরীরী প্রিয়জন সকলকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। যে আবরণ মানুষের চক্ষু হইতে অনন্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সে আবরণ কত সূক্ষ্ম! কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও উহা স্বচ্ছ নহে। এই আবরণের পশ্চাতে কি আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টির অতীত। কখন কখন মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আরাধ্য দেবতা এই আবরণ উত্তোলন করেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার।

মৃত্যু-ভয় একটা কুসংস্কার মাত্র। আমি এই কুসংস্কার অতিক্রম করিয়াছি। মৃত্যু শান্তি, মৃত্যু মধুরতা, মৃত্যু পরম স্নেহময়ী অনন্ত জননীর বক্ষে বিশ্রাম।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেন।

(শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথের নিবেদন)

বাবা, তুমি কোন অজানা দেশেতে চলে গেছ, আমরা তো আর তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। কতদূরে আছ, বাবা, তুমি? সেখানে কি আমাদেরই চন্দ্র সূর্য্য উঠে, নাবে? আমাদেরই স্নিগ্ধ আলো বাতাস কি সব তাপ শ্রান্তি জুড়িয়ে আসে? কতদূর, বাবা, তোমার এ নূতন দেশটী? তুমি কি আমাদের দেখতে পাও? তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পাও, বাবা? কই, বাবা, আমরা যে এত করে ডাকছি, তুমি ত সাড়া দিচ্ছ না। কেন, বাবা, সেখান থেকে কি সাড়া দেওয়া যায় না? অবুঝ আমরা, কি হল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে, বাবা, কিছুতেই। কেন তুমি চলে গেলে? আমাদের কি আর ভাল লাগল না, বাবা? আমরা কত দোষ অপরাধ করেছি, জানি না—তোমার কত অবাধ্য হয়েছি—সে সব কি তুমি নীরবে সহ্য করেছিলে, একেবারে এ মহাশাস্তি দেবে বলেই? কেন, বাবা, তুমি যে ছিলে ক্ষমাশীল, তবু কেন আমাদের ক্ষমা করতে পারলে না? তুমি যে ছিলে দয়াবান্, বাবা, তবু কেন আমাদের উপর দয়া করলে না?

বাবা! আজ যে অন্তরে কেবল তোমার কথাই জেগে উঠছে। তোমার মধুর স্নেহ ছিল, ফল্গু নদীর ধারার মত। তাহার বাইরের চঞ্চল আবেগ উদ্বেগ আমরা ত কখনও দেখিনি। তোমার ধৈর্য্য ছিল অপরিসীম। আমাদের যখনই অসুখ করত, মা কি ভীষণ উতলা হয়ে উঠতেন; কিন্তু তুমি ধীর, সামামূর্ত্তি ধারণ করে আমাদের পাশে ব'সে থাকতে—তোমার চঞ্চল মূর্ত্তি আমাদের চোখে কখনও পড়েছে বলে মনে হয় না ত, বাবা। বাবা! কি মিষ্টি ভাবেই তুমি আমাদের শিক্ষা দিতে সকল কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়ে। খেতে বসে আমরা যখনই কোনো বিষয় আলোচনা করেছি, তার কি সুন্দর মীমাংসা করে তুমি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছ। বাবা! এই সেই দিনও তো তোমার প্রার্থনা ও অভয়বাণী নিয়ে আমরা পরীক্ষা দিতে গিয়ে'ছ। সন্ধ্যা বেলা ফিরে যেই তোমার কাছে যেতাম, তুমি জিজ্ঞেস করতে শুধু, "কি রকম প্রশ্ন এসেছিল?" তার ভেতর দিয়েই কি তুমি আমাদের ফলাফল জানতে পেরেছিলে, বাবা?

ভগবান! অজ্ঞেয় তোমার লীলা; আমাদের বাবা আমাদের কাছে ছিলেন, তাঁকে নেবার তোমার এত তাড়া কেন পড়ল? আমাদের ভাগ্য জেনে যাবার অধিকার থেকে তুমি কেন তাঁকে বঞ্চিত করলে?

বাবা! কৃষ্ণনগরে যখনই আমাদের পরীক্ষা শেষ হোত, তুমি নিজে কত ভাল ভাল বই এনে দিতে কলেজ থেকে। সারা বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত ১০।১১টা পর্য্যন্ত আমাদের নিয়ে মাঠে বসে কত খেলা, কত গল্প, কত আলোচনা করতে। কিন্তু, বাবা, এবার তো কিছুই করতে পারনি। শুধু একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলে, আর সন্ধ্যা বেলা ডেকে নিয়ে তোমার অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা নীরবে চেপে রেখে, আমাদের সঙ্গে গল্প খেলা করতে। আগের সন্ধ্যাটীতেও তো, বাবা, তা বাদ দাও নি। সেদিন রাতেও আমরা যখন খেতে যেতে দেরী করছিলাম, তুমি নিজে ডেকে আমাদের খেতে পাঠালে। বাবা! এখন আর তো তুমি খেতে ডাক না, আমরা তো আর শুনতে পাই না। বাবা! একবার দেখা দাও, একটী কথা বল, আমাদের এ মিলিত মিনতি রাখ, বাবা। বাবা! সারা বাড়ীময় তোমার স্মৃতি জড়ানো রয়েছে, শুধু তুমি নেই। কেন, বাবা, যদি স্মৃতি রইল, তো তুমি থাকলে না কেন? বল, বাবা, আমাদের কি দোষ দেখে তুমি এমনি করে চলে গেলে, বাবা? ফিরে এস, বাবা, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, সে দোষ আর কখনও করব না। আসবে, বাবা, ফিরে তাহ'লে?

ভগবান! যদি নিয়েই নেবে জানতে, তবে দিয়েছিলে কেন? এত কাছে যাঁকে পাই, তাঁকে যে ছাড়া যায় না, ভগবান, তুমি কি তা বোঝ না? এ কি নিষ্ঠুর স্নেহ তোমার? আমাদের অবস্থা কি একটুও বুঝলে না? বাবা তো কখনও একলা থাকেন নি; আমাদের মত তাঁর কাছে কাউকে দিয়ে দিও, ভগবান। যেখানে ঠাকুরদাদা, ঠাকুমা, বড় জ্যেঠামশাই আছেন, তাঁকে তাঁদের কাছেই রেখ, ভগবান। ভগবান্! তাঁর বাণী থেকে আমাদের চিরবঞ্চিত কোর না, ভগবান, এই মিনতি শুধু। তিনি যেন আমাদেরই থাকেন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেনের উদ্দেশে)

অনেককেই আমাদের জীবনে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা খ্যাতির জন্য চেষ্টা করেন না—যশের থেকে দূরেই সরে থাকেন, অথচ যাঁদের কাছে এলে সহজ স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাঁদের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি না—তাঁদের পরিচয় পেতেও সময় লাগে; কিন্তু একবার পরিচিত হলে তাঁদের বিচ্ছেদকে সহসা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠে। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র-জীবনে এঁদেরই একজনের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজ তার কিছুদিন আগে অসহযোগের বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উঠেছে। Disciplineর নিখাদে তার সুর বাঁধা। ছাত্রদের চঞ্চল মন এদিকে সেদিকে তাহাদের অভিব্যক্তি খুঁজছে। এমন সময় তারা এমন একজনকে পেল যে বর্ষার জলভরা মেঘের মত তাদের কাছে বৃষ্টির আশ্বাস নিয়ে এল—কৃষ্ণনগর কলেজের জীবন যেন নূতন হয়ে সুরু হল।

যিনি এলেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা জানতাম কম; এবং তাঁকে দেখে মনে হল, জানবার অবকাশও বড় কম। তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে মনে হল, আমাদের এই কোলাহল-মুখরিত উন্মত্ত জীবন-যাত্রার এ যেন এক ব্যতিক্রম। মনে হত, এই গতানুগতিকতার অনেক উপরে তিনি। তাঁর মনের সন্ধান পাওয়া আমাদের ক্ষমতার বাহিরে।

তাই প্রথম যখন তাঁকে দেখলুম খেলার মাঠে, যখন শুনলুম, তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিচ্ছেন ভাল খেলোয়াড় হতে—যখন বর্ষণ-মুখর অপরাহ্নে ফুটবলের প্রতিযোগিতায় তাঁকে আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে দেখেছিলুম, তখন কেমন খট্‌কা লাগল। তারপর ধীরে ধীরে আমরা তাঁকে অত্যন্ত কাছে পেলুম। এই সান্নিধ্য এল আমাদের মনের আগোচরে—কত দিনে ঠিক বলতে পারি না। অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, তিনি আমাদের অত্যন্ত নিকটে এসেছেন, আমেদেরই একজন হয়ে।

নবগঠিত কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিয়নের অনেক ভাঙ্গাগড়া চলছিল। ছাত্ররা একজন উৎসাহক পেয়ে তাদের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিল। আমরা প্রথমেই শুনলাম, এইবার ইউনিয়ন চলবে ছেলেদের দিয়ে। প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু যখন ইউনিয়নের কাজে অধ্যক্ষের নিয়ম-তান্ত্রিকতা একাধিকবার দেখা দিল, তখন আমরা প্রথম বুঝলাম, আদর্শ সমাজশাসন কাকে বলে। সভাপতির আসনে বসে অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রীজের স্বপ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত এই স্বপ্ন সফলতার সাধনায় তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে গেছেন।

ছাত্রদের জন্য তিনি যা করেছেন, তা এই কলেজ ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে। তিনিই প্রথম বুঝিয়েছিলেন, মানুষের জীবন গড়ে' উঠে সামাজিকতায়। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের তাঁর এই দান চিরস্মরণীয়। কলেজ ইউনিয়ন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর রাখতেন এবং ছাত্রদের সামাজিক জীবন যে তাদের বৃহত্তর জীবনের এক অঙ্গ, তা তিনি আমাদের উপলব্ধি করবার অবকাশ দিয়েছিলেন। প্রত্যেক কাজে ছাত্রদের পরামর্শ নেওয়াতে, ভুল ত্রুটির মধ্যেও তাদের নিজের পক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ দেওয়াতে, ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধ যে অনেকখানি বেড়ে উঠেছিল, তা তাঁর সময়ের কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিয়নের কার্য্য-বিবরণী হতে।

ইউনিয়নের সভাপতিরূপে তাঁর আর একটী দিক আমাদের চোখে পড়েছিল—সে তাঁর সত্যলিপ্সা। অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে, সত্যের সমর্থনে তাঁর নির্ভীকতাই আমাদের কাছে চমৎকার লাগত।

তাই আজ আমরা বুঝতে পেরেছি, তাঁর গাম্ভীর্য্যের স্বরূপ। লৌকিক জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের তিনি চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন ছিল সত্যদ্রষ্টার মন—লৌকিক জীবনের অনেক উপরে।

আজ তিনি নেই। তাঁর গভীর আত্মা গভীরতর পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। আজ বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই প্রশান্ত গম্ভীর চোখ দুটি দেখছি; সেই প্রশস্ত ললাট—

"যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা,
দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।"

মনে হচ্ছে, তিনি এখন আমাদেরই সামনে, আমাদের নীরব কর্ম্মের উপদেশ দিচ্ছেন। এখনও তাঁর শিক্ষা, তাঁর দীক্ষা, তাঁর তিতিক্ষা আমাদের কাজে অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে।

মনে হচ্ছে, আমাদের জীবনে তাঁর যা দিবার দিয়েছেন, নিজের জীবনে যা করবার করেছেন—এখন কর্ম্মক্লান্ত দেহকে তিনি দিচ্ছেন বিশ্রাম।

"Life's work well done,
Life's battle well won,
Now cometh rest."

তাঁর আত্মার অনন্ত শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

গুণমুগ্ধ ছাত্রবিশেষ

—•—

(২)

(স্বর্গীয় স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে)

তুমি যারে ভালবেসেছিলে;
মহিমায় গরিমায় তুমি যা'র ছিলে
পরম গৌরব;
তব পুণ্যজীবনের বিচিত্র সৌরভ
করিয়াছে যাহারে সুরভি,
পুত্রপ্রাণা স্নেহলোভী
এই সে ধরণী—বেদনায় আর্দ্র-আঁখি,
পুত্রশোকাতুরা, বিয়োগবিধুরা।
স্নেহপ্রাবী ব্যথাতুর মাতৃপ্রাণ তা'র
অপত্যরতনতরে করে হাহাকার।
হে অক্লান্ত কর্ম্মবীর!
সহস্র সঙ্কটমাঝে লক্ষ্য তব স্থির,
ধর্ম্ম তব ছিল অচঞ্চল।
হে লক্ষ্মীর বরপুত্র! বিত্ত তোমা' করেনি বিকল,
যশঃ মান করেনি উদ্ধত।
সেবা ছিল তোমার সাধনা, দান তব ব্রত;
সুদীর্ঘ জীবনে
সে সাধনা, সেই ব্রত পালন করেছ প্রাণপণে।
যে এসেছে কাছে,
তোমার দয়ার স্পর্শ সেই পাইয়াছে।

তাই আজি ভাসিতেছে সহস্রনয়ন
শোকাশ্রুসলিলে। বন্ধু, মিত্র, পরিজন, দাস, দাসী,
তব অনুগ্রহসিক্ত গ্রামবাসী, গ্রামান্তরবাসী
সকলেরি মুখে আজ ওঠে শুধু হায় হায় রব।
সবাকার তুমি ছিলে পরম গৌরব
পরম আশ্রয়।
আজ মনে হয়
তোমার স্নেহের দান অযাচিত প্রতি পদে পদে
পাইয়াছি কতবার। আপদে বিপদে
তোমার একান্ত স্নেহ, তব অনুগ্রহ অহরহ
আবরিয়া রেখেছিল মোদের জীবন।
হে রাজেন্দ্র! হে দেব!
অহৈতুকী অন্তহীন সে দয়ার ঋণ
কেউ কভু কোনোদিন
পারিবেনা বিন্দুমাত্র করিবারে শোধ।
আমরা অবোধ,
দেবতা গৃহেতে ছিল তবু বুঝি নাই,
অশ্রান্ত নয়ননীরে ভাসি আজি তাই।

—"টুটুল"
(মনোরঞ্জন চাটার্জি)

—•—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ২৫শে মে, (১১ই জ্যৈষ্ঠ). সোমবার, বালেশ্বরে, স্বর্গীয় ধ্রুবনাথ করের পৌত্র, শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ করের শিশুপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে, কলিকাতা হইতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ গিয়া উপাসনা করেন এবং শিশুকে "অমরনাথ" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাঁহার পিতামাতাকে শুভাশীষ দান করুন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১৲, অনাথ আশ্রমে ১৲, বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দীক্ষা—গত ২৭শে বৈশাখ, ভাগলপুরে, তত্রত্য পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মণিকা ঘোষ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন। মাতামহ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ দীক্ষা দান করেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র রায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু দীক্ষা দান করেন।

ভগবান্ নবদীক্ষার্থীদিগকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

শুভবিবাহ—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ, ভাগলপুরের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মণিকার সহিত, স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের শুভবিবাহ ক্ষিতীশবাবুর ভাগলপুরস্থ বাসভবনে নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু আচার্য্যের ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ২৩শে বৈশাখ, কটকে, রায় বাহাদুর ডাক্তার জয়ন্ত রাওর মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মনিকার সহিত, শ্রীহট্টনিবাসী ডাঃ মহিমচন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। কটক রাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ভগবান্ নব দম্পতিযুগলকে শুভাশীষ দান করুন।

পারিতোষিক বিতরণ—গত ১৭ই মে, বাগনান নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণোৎসব, স্থানীয় সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রারম্ভে দেশমান্য স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশসূচক নির্দ্ধারণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন। বালিকাদের সংগীত, আবৃত্তি, গীতাভিনয় ইত্যাদির পর নানা বিষয়ে পুরস্কার ও পদক প্রদত্ত হয়। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৭ই মে, আলীপুরে, ৩০নং নিউরোডে, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উদ্বোধন ও আরাধনা, ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি অনুষ্ঠানাংশ এবং শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস স্বর্গীয় আত্মার সুন্দর জীবনের কয়েকটী কথা বলিয়া প্রার্থনা করেন। পিতৃদেব সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিবেদন জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা, পাটনার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী সুমতি মজুমদারের প্রেরিত প্রার্থনা আর একটী কন্যা এবং প্রধান শোককারীর প্রার্থনা জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ পাঠ করেন। পবিত্র অনুষ্ঠানটী গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। অনেকেই উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় আত্মার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দান করিয়াছেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, নববিধান প্রচার আশ্রম ১০৲, ব্রাহ্ম-সম্মিলনসমাজ (বিল্ডিং ফণ্ড) ১০৲, কান্তিচন্দ্রস্মৃতিনিবাস ৫৲, ভগ্নিসমিতি ৫৲, ব্রাহ্মরিলিফ ফাণ্ড ১০৲, পুণ্যাশ্রম ৫৲, শ্রমজীবিবিদ্যালয় ২০৲, হিন্দু অনাথ আশ্রম ১০৲, মুসলমান অনাথ আশ্রম ৫৲, আতুর আশ্রম ৫৲, সঙ্কটত্রাণসমিতি ৫৲, রামকৃষ্ণ রিলিফ ফাণ্ড ৫৲, বালকদিগের নীতিবিদ্যালয় ৫৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ৫৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ৫৲, সুনীতিশিক্ষালয় ৫৲, অন্ধবিদ্যালয় ৫৲, মূক-বধির বিদ্যালয় ৫৲, Keshub Academy (Building Fund)

Rs. 500, Keshub Memorial Hall & Library Rs. 500, Calcutta Mental Hospital Rs. 10, Navavidhan Publication Committee Rs 10, Rescue work in Calcutta (L.M.S.) Rs. 5, Protap Chandra Memorial Hospital Rs. 10, Sj Sarat Chandra Das Rs. 50. কৃষ্ণনগর—ব্রহ্মমন্দির ১০৲, নৈশ বিদ্যালয় ৫৲, পাটনা—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, Charitable Dispensary Rs. 5. ঢাকা—নববিধান সমাজ ১০৲ ; গিরিধি—নববিধান সমাজ ১০৲ ; ভৃত্যগণ ২০৲। এতদ্ব্যতীত ভগ্নিগণ ভ্রাতার স্মরণার্থ শ্বেত পাথরের রেকাবী উৎসর্গ করিয়াছেন।

অদ্য পাটনায়, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, কলিকাতার সহিত যোগরক্ষা করিয়া উপাসনাদি হইয়াছে। গৌরীবাবু উপাসনা করেন, সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুমতি মজুমদার প্রার্থনা করেন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, শোক-সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে নিম্নলিখিত দুইটী শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে), কলিকাতায়, ৭নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীট ভবনে, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্বাবলম্বী, আত্মশক্তিসম্পন্ন, অধ্যবসায়শীল, স্বনামধন্য, কর্ম্মবীর সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রোগে প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে, ইহজীবনের অক্লান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অমরধামে পরমজননীর ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তিনি আজীবন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সভ্য ছিলেন এবং নানা বিষয়ে নববিধানমণ্ডলীর হিতসাধন করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায়, গৌরবে, কার্য্যকুশলতায় ও মহত্ত্বে পরম সর্ব্বজনমান্য হইলেও, তাঁহার হৃদয় অতি দীনভাবাপন্ন, পরসেবাপরায়ণ ও ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিল। তিনি গরিবের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাস, সততা ও সচ্চরিত্রতাই তাঁহার জীবনের সকল উন্নতির মূল। সরল অমায়িক সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহারে তিনি সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। তিনি উদারপ্রাণে সর্ব্ববিষয়ে, সকল দেশহিতকর অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশসেবার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গমাতা এই সুসন্তানকে হারাইয়া আজ বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত। আমরাও তাঁহার পরিবারের সহিত, দেশের ও দশের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

আমরা অশ্রুর আমাদের নববিধান-পরিবারের আর একটী কন্যা-রত্নকে অকালে হারাইলাম। গত ২৪শে মে, কলিকাতায়, আলীপুরে, ২২নং নিউরোডে, রেঙ্গুনের ভূতপূর্ব্ব অ্যাড-ভোকেট স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিনীতা টাইফয়েডে ভুগিয়া, ২৫ বৎসর বয়সে, অমরলোকে পিতামাতার সন্নিধানে চলিয়া গিয়াছেন। কন্যাটী এম,এ, অধ্যয়ন করিতে-ছিলেন। ফুটন্ত ফুলের মত অমর জননী আপন কোলে তুলিয়া লইলেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে আপনার প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—গত ২৩শে মে, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহাদের ভক্তি-ভাজন খুল্লপিতামহ সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-গমন উপলক্ষে, তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নরেনবাবু নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করিয়াছেন :—

ভাবলা স্কুলপ্রাঙ্গণে সার রাজেন্দ্র-স্মৃতি-স্তম্ভ ২০০৲, কেশব মেমোরিয়েল হল ১০০৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ২০৲, নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২০৲, ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ ২০৲, অনাথাশ্রম ২০৲, অন্ধ স্কুল ২০৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ১০৲, নীতি বিদ্যালয় ১০৲, গোখলে স্কুলে স্মৃতি-মেডেল ২০৲, ভাবলা ঔষধালয় ২০৲। ভোজ প্রভৃতি ২০৲, মোট ৫০০৲টাকা।

এই উপলক্ষে ৩০শে মে, ঐ গৃহে, বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সার রাজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন। রাজেন্দ্রনাথের পুত্রদ্বয় ও অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মমন্দির—গত ২৫শে মে, রবিবার, সন্ধ্যায়, ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনা সার রাজেন্দ্রনাথের পর-লোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ ও তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ সম্পাদিত হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৫ই মে, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা স্বর্গীয় মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার-ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৭ই মে, কমলকুটীরে, নবদেবালয়ে, স্বর্গগত ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১৮ই মে, ১৭৪নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিলের স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসু ও ডাঃ শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর গৃহে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ২৲, তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ১৲ ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দাস ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ২৭শে মে, শান্তিকুটীরে, প্রেরিত-প্রবর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিনে, কটক রাভেন্‌স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অধ্যাপক মন্মথনাথ বসুর সভা-পতিত্বে স্মৃতিসভা হয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১১শ সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ।
15th. June, 1936.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা! জীবন্ত জাগ্রত মা তুমি, তুমি ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সকল ধর্ম্মাবলম্বী মানুষই ইহা স্বীকার করেন, ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান; কিন্তু কাজে কর্ম্মে বল ত, মা, কয়জন ইহা মানেন? তাই তুমি কি, মা, মতে, শাস্ত্রে, কথায় চির নিবদ্ধ হয়ে থাকবে? তুমি সব জায়গায় আছ, ইহা মানিয়াও লোকে কাজে কর্ম্মে মানিতেছে, তুমি দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, অগম্য অপার। মা! মনুষ্যসমাজের এই ভ্রম ভ্রান্তি কবে দূর হইবে? তাহা দূর করিবার জন্যই ত তুমি বর্ত্তমান যুগে কলির জীবদিগের নিকট নূতন বিধানে মা হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। যে সহজে মা বলিয়া তোমাকে ডাকিবে, ছেলের সঙ্গে মার যেমন সহজ সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করিয়া তোমাকে দেখিবে ও তোমার কথা শুনিবে। আর শুধু তাই নয়, তুমি সত্য সত্য মা কিনা, স্নেহ তোমার অনন্ত; পৃথিবীর মা যেমন নিজ স্নেহগুণে শিশুসন্তানকে লালনপালন করিয়া স্বয়ং জীবনে পরিপুষ্টি বিধান করেন, তেমনি করিতে তুমি ব্যস্ত। আবার রোগা ছেলে, কাণা কালা ছেলের আদর মার কাছে বেশী; তাই পাপ-রোগে রুগ্ন যারা, অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাসে কাণা কালা যারা, তাদের তুমি বেশী আদর করিয়া, তাদের সে সমুদয় রোগ যাতে মুক্ত হয়, তুমি স্বয়ং তাহা কর। মানুষ যেমন ধর্ম্ম মানিয়াও, তুমি নিকটে থাকিতে তোমাকে অনেক দূরে মনে করে, তেমনি মনে করে, নিজের পুরুষকার সাধ্য সাধনা বিনা পাপ-রোগ থেকে মুক্ত হবার অন্য উপায় নাই। মানুষের রোগ হলে মানুষ কি কেবল নিজের চেষ্টায় রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে? চিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসকের ঔষধে রোগ হইতে মুক্ত হয়। তেমনি তুমি মা স্বয়ং আত্মার চিকিৎসক হইয়া এবং স্বয়ং মাতৃস্নেহগুণে রুগ্ন সন্তানের সেবা করিয়া সর্ব্বব্যাধি নিবারণ কর। তাই মা কাতরপ্রাণে ভিক্ষা চাই, যদি নূতন বিধানে জীবন্ত মা হইয়া প্রকট হইয়াছ, তবে এই বিধান সর্ব্বত্র বিস্তার কর এবং সকল মানুষের ভ্রম ভ্রান্তি নিবারণ করিয়া, সকলকে তোমাকে মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও ডাকিতে শেখাও। শিশুকে মাই নিজে স্তন্য দিয়া পান করিতে শেখান, শিশুকে মাই মা বলিয়া ডাকিতে শেখান; তেমনি সকল মানব-শিশুকে, তুমি যে জীবন্ত মা, জানিতে চিনিতে দাও, তোমাকে ডাকিতে শেখাও এবং তোমার বিধান-স্তন্য পান করিতে শিখাইয়া নবশিশু-জীবনে সঞ্জীবিত কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

বর্ত্তমান সমস্যা—আমাদের দায়িত্ব।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই পরলোক-যাত্রার সময় আসিল ; কাহাকে কোনদিন যাইতে হইবে, তাহার ঠিক কি ? শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "যাহারা আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, তাহাদিগকে আমরা কি দিয়া যাইব ? নরকের অভিসম্পাত, না স্বর্গের আশীর্ব্বাদ ? যাহা দিয়া যাইব, তাহাই থাকিবে। অতএব আমাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য ভাবিতে দাও।" আচার্য্যদেবের এই উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাদের এখনও কি ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিবার সময় আসে নাই ?

সত্যই যদি আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত সহমৃত হইয়া তখনই পরলোকে চলিয়া যাইতাম, কি সুখের সংবাদই আমরা সেখানে গিয়া দিতে পারিতাম। আমরা যে স্বচক্ষে ধরায় নববৃন্দাবন দেখিয়াছি। হায়, সেই কমল-কুটীরের ক্ষুদ্র দেবালয়ে শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরিবেষ্টিত সমস্ত প্রেরিতদলের সমবেত উপাসনা-যোগে নিত্য নিত্য নূতন নূতন অনুষ্ঠান, ত্রৈলোক্যনাথের নব নব সঙ্গীত এবং আচার্য্যদেবের নিত্য নব উপাসনা ও নব নব উৎসব, যাহা আমাদের এই অধম জীবনে সম্ভোগ করিবার অধিকার হইয়াছে, তখন আমরা তাহার সকল ভাব ধরিতে পারি আর না পারি, যথার্থই যে তাহাতে জীবনে স্বর্গ অনুভব করিয়াছি।

কমলকুটীরে প্রেরিত প্রচারকগণ এবং সাধকগণ নিজ নিজ দৈনিক কার্য্য সমাপন করিয়া, সন্ধ্যায় আচার্য্য সঙ্গে যে দৈনিক সম্মিলন, সৎপ্রসঙ্গ, সদালাপ, হাস্য কৌতুক বা নৃত্যগীত রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত করিতেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ীর কথা ভুলিয়া যাইতেন, সে দৃশ্য কি স্বর্গীয় নয়!

ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নব নব উপাসনা, নব নব অনুষ্ঠান, নব নব উপদেশ, যাহারা শুনিয়াছেন, সম্ভোগ করিয়াছেন, যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতারণা কি সম্ভোগ করেন নাই ? আবার আমাদের ও যুবকদলের সেই নলিনবিহারী সরকারের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা, কলুটোলার বাড়ীতে "ব্যাণ্ড-অফ-হোপের" কাগোদাম, কমলকুটীরের নিম্নতলে আচার্য্য-পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ ও সন্ধ্যায় ভাই করুণার ঘরে উন্মত্ত কীর্ত্তন এবং আমাদের অখণ্ড জমাট ভ্রাতৃপ্রেমের মিলন যখন স্মরণ করি, তখন প্রাণ তো উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিয়া উঠে, "এত দয়া মা গো তোমার, ভুলিব কোন প্রাণে আর।" সত্যই সশরীরে যে আমরা স্বর্গভোগ করিয়াছি, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

কিন্তু হায়, শ্রীকেশবের তিরোধানের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ক্রমাগত যে ভাঙ্গার দশায়, যেন শনির দশায় আমরা পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে চক্ষে জল আর ধরে না ! আজ সে নববৃন্দাবন কোথায় গেল এখন, সারা ধরা হেরি অন্ধকারময়।

এই জন্যই কি এতদিন বাঁচিয়া রহিলাম ? এই আক্ষেপ করিতে করিতে কি চলিয়া যাইতে হইবে ? যে নববিধান ধরায় স্বর্গস্থাপন করিবার জন্য আসিলেন, সে নববিধান কি আমাদের হাতে পড়িয়া ধরা হইতে পলায়ন করিলেন ?

এই নববিধানে যে স্বয়ং ব্রহ্ম জীবন্ত মাতৃরূপে প্রকট হইয়াছেন এবং তাঁহার মনোনীত নব ভক্তকে বাহকরূপে ধরিয়া তাঁহার জীবন্ত নববিধান, মহাপ্রেমের বিধান ঘোষণা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সেই বিধান-সাধনের উপ-যোগী জীবন্ত উপাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ পবিত্র আত্মা হইয়া তিনি স্বয়ং আমাদিগকে প্রতিদিন তাঁহার ভক্ত আত্মার সহিত একাত্মা করিয়া এই উপাসনা-সাধনে নিরত করিয়াছেন। এই উপাসনাই আমাদের শাস্ত্র, এই উপাসনাই আমাদের মন্ত্র, এই উপাসনা-সাধনে আমরা সশরীরে স্বর্গ সম্ভোগ করিতে পাই, এই উপাসনা-যোগে আমরা সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আত্মিক যোগ সমাধান করিতে সক্ষম হই ; প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ভাব ও চরিত্র যাহা, সকলই আমরা আস্বাদ করিতে ও জীবনে গ্রহণ করিতে সক্ষম হই এবং সকলের ভিতর যাহা কিছু বৈষম্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, তাহার রক্ষা করিয়াও আমরা অখণ্ড বিশ্বমানবজীবন লাভ করিতে পারি।

এই উপাসনার অর্থও নববিধানে বদলাইয়া গিয়াছে—উপাসনার অর্থ যদি এই হয়, সাধক ঈশ্বরের নিকট বসিবেন ; নববিধানে কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই মাতৃরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আপনি আপনার উপাসনা করাইয়া ধন্য করেন।

যাহা হউক, আমরা এমন মা, এমন বিধান, এমন

উপাসনা-সাধন পাইয়াও, যদি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় ধর্ম্মের অন্তর্নির্য্যাস শুষ্ক হইতে দেই, আমাদের দুর্গতির আর শেষ কি!

সকল ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখি, শাস্ত্রের বিচার, জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা, বাহ্যানুষ্ঠান বা পূজা পদ্ধতি, বিধি নিয়ম ইহাই ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য যে চরিত্রে নীতি, জীবনে বিশ্বাস এবং আত্মায় প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ ও নিত্য নব নব মানবত্বের বিকাশ, তাহা কোন ধর্ম্মের আর নাই। নববিধানেও যদি সেই উপাসনাবিহীনতা, শুষ্ক জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, ধর্ম্মহীন সাংসারিকতা, স্ব স্ব প্রাধান্য ও অপ্রেম আসে, নববিধানে তবে ধর্ম্ম আর কোথায়?

আর না, এখন এস দেখাই, যতদিন বাঁচিয়া আছি, আমাদের ঈশ্বর যে জীবন্ত, তিনি যে আমাদের প্রত্যক্ষ মা, আমরা তাঁহাকে প্রতিদিন দেখি শুনি এবং তাঁহাতেই আমরা নিত্য আনন্দিত, ইহা জীবনে সাধন করিব এবং সকলকে জীবনের দ্বারা দেখাইব। আমরা যে জীবন্ত উপাসনা লাভ করিয়াছি, তাহার সাধনায় আমরা স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব নিত্য নিত্য জীবনে জীবনে মিলিত হইয়া, এক মন, এক হৃদয়, এক আত্মা, এক ইচ্ছা হইতেছি এবং বৈরাগ্য প্রেম শুদ্ধতা এবং উদারতায় আমরা প্রত্যেকে নববিধানের আদর্শ জীবন লাভ করিতেছি, ইহা দেখাইব; এবং তদ্দ্বারায় আমরা আরো দেখাইব যে, বিশ্বমানব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে আদর্শ মনুষ্যত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার সহিত আমরা সকলে এক; এবং তিনি যে মাকে বড্ড ভাল মা বলিয়া দেখিলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া, তাঁহাতে পূর্ণ বিশ্বাস, নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস, প্রত্যাদেশে পূর্ণ বিশ্বাস, এবং বিশ্বমানবত্বের উৎকর্ষে পূর্ণ বিশ্বাস দিয়া, আমরা স্বর্গের উপযুক্ত হইতেছি। এবং তাহাই সাক্ষ্য দিয়া যেন আমরা পরলোকে যাইতে পারি।

ঈশ্বর যে এক এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং জীবন্ত, ইহা মতে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীই মানিতেছে; কিন্তু হায় কার্য্যতঃ ভাবিতেছে, সেই তিনি দুজ্ঞের্য়, কোথায় আছেন, কি নাই! জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বমানবের এই মহাভ্রম অপনোদন করিতে হইবে। এবং হিন্দুর পূর্ণ হিন্দুত্ব, খ্রীষ্টানের প্রকৃত খৃষ্টানত্ব, মুসলমানের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, বৈষ্ণবের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও প্রেম পূর্ণ মাত্রায় সাধন করিয়া এবং একেবারে জীবনে সমাধান করিয়া দেখাইতে হইবে, সর্ব্বধর্ম্মের রক্ষক আমরা, "সর্ব্বমানব আমাতে, আমি সর্ব্ব মানবে।"

ধর্ম্মতত্ত্ব

চারিটী নীতি।

(১) যখনই যা ভাবিব, আগে তোমায় ভাবিব।
(২) যখনই যা বলিব, নববিধি স্মরিব।
(৩) যখনই যা করিব, আগে বাণী শুনিব।
(৪) যখন যথা যাইব, নবভক্ত-সঙ্গ লইব।

প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বোবাকে কথা বলান, অন্ধকে চক্ষু দান, খঞ্জকে চলিতে শেখান, ইহাই প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। যখন শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে বোবাই থাকে; ক্রমে যখন বাক্য বলিতে শিখে, তখনই তাহার শিক্ষার আরম্ভ হয়। তাহার পর তাহাকে সত্য বলিতে, মিষ্ট বচন বলিতে এবং মা নাম করিতে শিখানই তাহার প্রকৃত শিক্ষা। তেমনি জ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং আপনাকে ও ঈশ্বরকে, মানুষকে চিনিতে শিখানই অন্ধকে চক্ষু দান। এমনই সত্যপথে, ধর্ম্মপথে চলিতে শিক্ষাই খঞ্জকে চলিতে শিখান। খঞ্জ যে, সে ত চলিতে গেলেই পড়িয়া যায়। যে সত্য পথে, ধর্ম্মপথে চলিতে শেখে, সে খঞ্জ হইলেও সত্যি চলিতে শিখিয়াছে, বলা যাইতে পারে। যে জীবনপথে যাইতে যাইতে পতিত হয়, সেই খঞ্জ।

সশরীরে স্বর্গ।

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "পরলোককে ঘরে আনিয়াছি।" বাস্তবিক ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা আমরা পরলোককে ঘরে আনিয়া থাকি। ব্রহ্মগত জীবনই আমাদের স্বর্গ, ব্রহ্মেই আমাদের পরলোক। যখন আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন আমরা শরীরে অবস্থিত থাকিলেও, আমাদের মন, আমাদের প্রাণ ব্রহ্মসঙ্গ সম্ভোগ করে এবং আমরা যে দেহে অবস্থিত, অন্ততঃ গভীর উপাসনাকালে বা যোগের অবস্থায় তাহা অনেকটা যেন ভুলিয়া যাই। যখন আমরা দেহমুক্ত হইয়া পরলোকে চলিয়া যাইব, তখনও ত সেই অবস্থাই আমাদের হইবে। তাই উপাসনা-সাধনই আমাদের পরলোকবাস। এই উপাসনা-যোগেই আমরা পরলোককে ঘরে আনিতে পারি এবং ব্রহ্মসঙ্গ-সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগত অমরাত্মাদিগেরও সঙ্গ সাধন হয়। ইহাই ত সশরীরে স্বর্গভোগ।

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি :—

লোকের মুখে শুনা ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াই তুমি বেশ সুখে আছ। আমি তাহাতে আর বহুদিন হইতে তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। অনেক দিন হইল, আমার সে অবস্থা অতীত হইয়াছে। লোকের নিকটে যাহা শুনা যায়, নিজের জীবনে তাহা দেখা প্রয়োজন। তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে, বুকের রক্ত দিতে হইবে—তবে তাহা আমার নিজের হইবে। যে সত্য নিজের জীবনে লাভ কর নাই, লোকের কথায় তাহা মানিয়া লওয়ার নাম ধর্ম্ম নহে। আবার ক্রুশ কাষ্ঠে আরোহণ করিতে হইবে। জীবনের মূল্য মৃত্যু। সামান্য মূল্যে জীবন ক্রয় করা যায় না। পূর্ব্বেও যে বিধি ছিল, এখনও সেই বিধি চলিতেছে—সংগ্রাম ব্যতীত ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। পূর্ব্বে লোকে যে পথ ধরিয়া স্বর্গে গমন করিতেন, এখনও সেই পথ ধরিয়াই যাইতে হইবে। সমস্ত পথ একাকী চলিয়া তাঁহার সিংহাসন সমীপে গিয়া অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতে হইবে। তখন তিনি তোমাকে গৌরব দান করিবেন।

অবিশ্বাস এবং পাপ :—

লোকে কথাটা বুঝুক বা নাই বুঝুক, কথাটা শুনিতে ভালই লাগুক বা মন্দই লাগুক, কিন্তু কথাটা সত্য—পাপ অপেক্ষাও অবিশ্বাস মহা পাপ। বিশ্বাস পাপের ঔষধ, কিন্তু অবিশ্বাসের ঔষধ কোথায় ?

অতীতের উপলব্ধি :—

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রাচীন ঋষি মহর্ষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিক তুমি আর কি বলিতে পার ? তাঁহার সম্বন্ধে কি নূতন তত্ত্ব তুমি আবিষ্কার করিতে সমর্থ ? অতীত কাল যাহা তোমার হস্তে প্রদান করিয়াছে, তাহাই (সাধনের দ্বারা) উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর। ইহাতে শুধু যে পুরাতন নূতন হইবে, তাহা নহে ; কিন্তু বিশ্বরহস্যকে দর্শন করিবার নব চক্ষু লাভ করিবে।.........তর্ক যুক্তি ও ভাবুকতা হইতে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে না। যদি তিনি তোমার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তোমার কোন অভাবই পূর্ণ হইতে বাকী নাই। পরমাত্মার সন্তানগণের ন্যায় তুমি তোমার উত্তরাধিকার সম্ভোগ কর। ইহাই নববৃন্দাবন।

মৌনভাব :—

কোথায় কথা বলা ভাল, আর কোথায় বা মৌনী থাকাই উত্তম, ইহা অতি কঠিন তত্ত্ব। কথা সামগ্রীটা এত নীরস যে, উহার উপরে সমুদ্র ঢালিলেও উহার শুষ্কতা ঘুচে না। যে গাছ পল্লবসর্ব্বস্ব, তাহার প্রয়োজন কি ? কিন্তু যখন উচ্চ চিন্তা ও সাধুভাব হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া কথার আকারে উথলিয়া উঠে, সে কথা যেন স্বর্গের বায়ু। শব্দ এবং অন্তরের নিঃশব্দ ভাব উভয়েই মানবের দেবজীবনের বক্ষঃস্পন্দন। তথাপি মৌনভাবই শ্রেষ্ঠতর বস্তু। বিচারে যখন যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, তখন তিনি একটীও কথা বলিলেন না, নীরব রহিলেন। তাঁহার সেই মৌনভাবই পৃথিবীকে জয় করিয়াছে। যদি বাক্যের শক্তি আকাঙ্ক্ষা কর, বিশেষরূপে মৌনভাব সাধন কর।

মহাপুরুষগণ :—

তোমার সঙ্গে ও মহাপুরুষদিগের সঙ্গে প্রভেদ কি ? ভগবান যে তোমার অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক নিকটে ছিলেন, এ কথা সত্য নহে। তাঁহার দয়া সকলের প্রতিই সমান। তাঁহাদের ও তোমার মধ্যে মহা প্রভেদ এই যে, ভগবান্ যে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, তাহা তুমি বিশ্বাস করিতে পার না ; কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। যদি ভগবানের সঙ্গে থাকিবার জন্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা না কর, তিনি যে তোমার সঙ্গে আছেন, এ কথা বুঝিতে পারিবে না। বাস্তবিক অবিশ্বাস পাপের নিত্য সহচর।

সাধুগণ :—

ঈশ্বরের সাধুসন্তানগণকে প্রধানতঃ দুটী শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর সাধুগণ কর্ম্মবীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধুগণ শান্তভাবে দুঃখ কষ্ট বহন করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধুগণ আমাদিগকে আপনাদের দৃষ্টান্তে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দান করেন। অতি অল্পলোকের জীবনে এই দুটী ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। যাঁহাদের মধ্যে এই উভয় ভাবের সমাবেশ দেখা যায়, তাঁহারাই মানবজাতিকে নূতন লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিতে সমর্থ। Mother Arnold একস্থানে বলিয়াছেন যে, সাধুরা যে কাজ করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের জীবনে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, এ কথা সত্য নহে। যীশুর দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। আমার মনে হয় যে, যিনি কর্ম্মই করুন বা লাঞ্ছিতই হৌন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, তিনিই সাধু। তিনি অশান্তির মধ্যে শান্ত। যিনি মৃত্যুকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়াও নীরব ও নির্ব্বিকার, তিনি নিজে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অত্যাচারীরও মঙ্গলকামনা করেন।

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রতাপচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কলিকাতায় বাসভবন "শান্তিকুটীর" এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে থার্সিয়াংএ "শৈলাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শুদ্ধ, উচ্চ, সংস্কৃত জীবন আপন আলয়েই সমুজ্জ্বল প্রকাশিত হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রতিদিনের জীবন ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার পারিবারিক জীবনের শান্তি, মধুরতা ও পবিত্রতা দেখিয়া সুখী হইয়াছেন। আপন জীবন ও কার্য্যে তিনি নববিধান ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতবাসীর মনে ধর্ম্মের সঙ্গে ছিন্ন ও রঞ্জিত বস্ত্র, নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন ও নির্জ্জন অরণ্যবাস এরূপ জড়িত রহিয়াছে যে, জনসমাজে বিষয়-ভোগের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের সাধন তাঁহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বৈরাগ্য-সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে প্রচলিত সংস্কার উল্লেখ করিয়া প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন—(অনুবাদ) "ইহা নিশ্চয় জানিও যে, উপবাস, ছিন্নবস্ত্রপরিধান ও কৃচ্ছ্র সাধন অপেক্ষা, আনন্দের সহিত ঈশ্বরের আদেশবহনে ও লোকে যাহাই করুক না কেন, সে সকল সত্ত্বেও তাহাকে ভালবাসায় অধিক সুন্দর বৈরাগ্য আছে। তুমি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অশুভ কামনা পোষণ করিও না, নানা প্রকার প্রতিবন্ধক থাকিলেও লোককে ভালবাস ও জনহিতকর কর্ম্ম কর; ইহা অপেক্ষা আর কিছুতেই অধিক আত্মনির্য্যাতন আবশ্যক হয় না। ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্ত যে সকল পরীক্ষা প্রেরণ করেন, তাহা নীরবে বিশ্বাসের সহিত বহন, যাহারা আমার উপর দোষারোপ করে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ এবং ঈশ্বরের গৌরবার্থে সুখ, সম্মান ও আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করাকে আমি বৈরাগ্য বলি।" এইরূপ একাগ্রতা ও ভগবৎ-প্রেম লইয়া তিনি সংসারে বাস করিতেন। জ্ঞানার্জ্জন তাঁহার অন্তরের বলবতী স্পৃহা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান। আত্মদর্শী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। তিনি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন, নগরে জনকোলাহলের মধ্যে নানা সৎকর্ম্মের মধ্যেই হউক, কিম্বা বিজন পর্ব্বতাবাসে শান্তিময় পাঠ, ধ্যান ও লিখনেই হউক, সর্ব্বত্র পরমাত্মার আত্মপ্রকাশ তাঁহার অন্তরকে আলোকিত করিত; এবং সংসারের সকল বস্তু ও ঘটনা তাঁহার আত্ম-দৃষ্টির সম্মুখে থাকিত। জগতের বিভিন্ন জাতির স্থিতি, বৃদ্ধি ও নানাকার্য্যের মধ্যে, প্রত্যেক লোকের জীবনের নানা পরীক্ষা ও কৃতকার্য্যতার মধ্যে, প্রকৃতির নানা সৌন্দর্য্য ও ঘটনার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের স্থিতি দর্শন করিতেন; আরও নিকটে, সেই পরম সত্তা তাঁহার আত্মাকে এমন অবাক্ত পবিত্রতা ও মধুরতায় পূর্ণ করিতেন যে, তাঁহার দৈনিক উপাসনার সময় ও সাংসারিক জীবনে আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইতাম। তাঁহার ঈশ্বরের আরাধনা স্বর্গের সংগীত ছিল। যখন তিনি কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন, তথাকার গাম্ভীর্য্য এখনও অনেকের স্মরণে আছে। সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি স্বর্গের সুসমাচার আনিয়া দিতেন। তৎকালীন তাঁহার গম্ভীর ও মহোচ্চ উপদেশ-বাণী অনেকে আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন।

নানারূপ পরীক্ষা ও নির্য্যাতনের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের সহিত প্রতাপচন্দ্রের সম্বন্ধ দিন দিন নিকটতর হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই কোন অজ্ঞাত উপায়ে তিনি যীশুর সহিত স্বীয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যীশুর জীবন ও মরণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিত ও আমার বড় মিষ্ট লাগিত।" প্রতাপচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনালোক না পাইলে, যীশু চরিত্রের সহিত সাদৃশ্য লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্রাহ্মসমাজের বল ও উন্নতির এক কারণ।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিনে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার ডায়েরীতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—(অনুবাদিত) "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদরূপ মুকুট মস্তকে পরিয়া নববর্ষে জীবন ধারণ কত সুখের! এই আশীর্ব্বাদের মূল্য আমি গৌরবের সহিত অনুভব করিতেছি। তিনি যে যে বস্তু আমাকে দিয়াছেন, তাহা আমি সম্ভোগ করিতেছি। তিনি যাহা দেন নাই, তাহা পাইবার জন্য আমি লোলুপ নই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান, পবিত্রতা ও আনন্দে বর্দ্ধিত হইতেছি। শরীরের পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি চিন্তিত নই; কিন্তু যথাসম্ভব আমি শরীর ও আত্মার প্রত্যেক নিয়ম পালন করিয়া চলিব। যখন উভয় নিয়মের সামঞ্জস্য হইবে, তখন আমি সন্তুষ্ট হইব; যখন তাহা না হইবে, তখন আমি শরীর ছাড়িয়া আত্মাকে অবলম্বন করিব। আমি সর্ব্বদা নিজের উপর দৃষ্টি রাখিব এবং আপনাকে সংযত করিব, এমন কি আমার ধর্ম্মজ্ঞানকেও সংযত করিব। সমস্ত শক্তির উপযুক্ত পরিমাণে একত্র মিলন আমার আদর্শ জীবন। পবিত্র পরমেশ্বরের বন্ধুতা ও সহানুভূতি আমার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি। প্রতি দিন এই সম্পত্তিকে অবলম্বন করিয়া আমি কাজ করিব, পাঠ করিব, আহার করিব, বেড়াইব, ঘুমাইব এবং আর আর সমস্ত কার্য্য করিব, যাহা ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান এই আনন্দ ও গৌরবময় জীবনে পালন করিতে পারেন। হে নববর্ষ, তোমাকে এইরূপে অভ্যর্থনা করি।" পর বৎসর তিনি কলিকাতা, ভাগলপুর, গাজিপুর ও থর্সিয়ংয়ে অতিবাহিত করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম তিন মাস প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় যথাবিধি মাঘোৎসব সম্পন্ন করেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি

ডায়েরীতে এইরূপ লিখিয়াছেন :—(অনুবাদিত) "এই বৃদ্ধ রণ-তুরঙ্গ এখনও রণভেরীর শব্দে নাচিয়া উঠে এবং দূর বা নিকটে হউক, প্রভু পরমেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য সিংহনাদ করে; কিন্তু বৃদ্ধ বয়স মুখে লাগাম হইয়া শীঘ্র গতিরোধ করে। সত্যই কি আমার পৃথিবীর গতি শেষ হইয়াছে এবং যুদ্ধ ফুরাইয়াছে? এক অর্থে 'হাঁ', অন্য অর্থে 'না'। কারণ যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন জীবন-সংগ্রাম চলিবে। আমি সংসার হইতে বিদায় লইয়াছি, এবং কোলাহলজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি। আমি নিঃশব্দে পূজা ধ্যান ও লোক-সেবায় রত থাকিতে চাই।"

১০ই এপ্রিল তিনি খর্সিয়াং গিয়া "শৈলাশ্রমে" বাস করেন। সে মাসে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। জ্বর, কাশি ও উদরাময় দেখা দেয়। প্রায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র প্রথম বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হন; তিনি শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া সর্ব্বদা চলিতে চেষ্টা করিতেন; এজন্য এরূপ কঠিন রোগ-সত্বেও এ পর্য্যন্ত তিনি সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। এখন বহুমূত্র-রোগের শেষা-বস্থায় যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। বন্ধুগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন (২১শে জুন)। তাঁহার বন্ধু ডাক্তার আর, এল, দত্ত অতি যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি কিয়ৎ পরি-মাণে সুস্থ হইয়া, ২৫শে জুলাই, বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত শিমুল তলায় গমন করেন। তথায় আমাদের স্বদেশবাসী খ্যাতনামা স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আপন সুন্দর আলয়ে প্রতাপচন্দ্রের বাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে তাঁহার শরীর ক্রমে সবল হইতে লাগিল। তিনি মুক্ত আকাশতলে বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন। এখানে আসিয়া অনেকদিন পরে তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন। দেড়মাস কাল এখানে অবস্থিতি করিয়া, তিনি ১৭ই সেপ্টেম্বর বাঁকিপুর গমন করেন। তথাকার বন্ধুরা অতি যত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দিন দিন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগীর বিশেষ ইচ্ছায় তাঁহাকে দেরাডুনে লইয়া যাওয়া হয় (২০শে অক্টোবর)। কিন্তু পীড়া অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। জীবনের অবশিষ্ট কয়েকমাস তিনি রুগ্ন অবস্থায় "শান্তি-কুটীরে" অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহার রচিত "আশীষ" গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ইহা তাঁহার আত্মজীবনী। নিজ জীবনের নানা অবস্থা ও পার্থিব সকল প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদ উপলব্ধি এ পুস্তকে সন্নিবেশিত। ইহার আদ্যোপান্ত গভীর চিন্তাপূর্ণ। ইহা ব্রাহ্মসমাজের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। প্রতাপচন্দ্র এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার কোন বন্ধু যেন পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

যিনি আজীবন লোকের সেবায় কালাতিপাত করিয়াছেন, এখন যুবা, বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার আমেরিকাস্থ বন্ধুরাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাহাতে তাঁহার অভাবমোচন হয়, এজন্য তথায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা পাঠাইয়াছিলেন। মার্চ্চ মাসে (১৯০৫) তিনি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, অবনতি ও ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এপ্রিল (১৯০৫) মাসের "East and West" পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। যেন পরলোকের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, তিনি সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীকে আপনার শেষ বক্তব্য বলিয়া গেলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বহস্তে লিখিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার কথা শুনিয়া লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়া লইয়াছিলেন। পরে তিনি সমস্ত প্রবন্ধ দেখিয়া দিয়াছিলেন। পীড়িত অবস্থায়ও তাঁহার রচনা-শক্তি বিশেষ খর্ব্ব হয় নাই।

পীড়িত অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস ও সাধনার চরমোন্নতি দেখাইয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকালের রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে একদিনও কেহ তাঁহার মুখে আপত্তিসূচক কোন কথা শুনেন নাই, নীরবে অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সকল কষ্ট তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনি অনেক সময় বুকের উপর দুই হস্ত রাখিয়া স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতেন, প্রায়ই কথা বলিতেন না। নিকটস্থ কোন বন্ধুকে তিনি একদিন বলিলেন, "যেন এ কথা না থাকে যে, ভীরুর মত, গোঁয়ারের মত মরেছে। তাই, যেন শেষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ চরিত্র থাকে। আমার এবারকার অসুখ বাহিরের অসুখ নয়। ভিতরের জীবন-প্রকাশের জন্য অসুখ।" উক্ত বন্ধু তাঁহার নিম্নলিখিত দুইটী প্রার্থনা লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন :—"আমি সাধনে তোমাকে পাইয়া কি করিতাম। বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনে, তোমাকে পাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে বসতি কর। বিনা চেষ্টায় শত রাজার ধন তোমাকে পেলাম।"

"হে জীবনের জীবন, এখন নূতন সম্বন্ধে, নূতন আলোকে তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। একটা দিন তুমি আমার ভিতরে বিরাজ কর, বিহার কর, এই পাপীর প্রার্থনা। আমি অগতি, হাতে ধরিয়া তুলিয়া লও; যেন বুঝিতে পারি, আর কাহারও নয়, তোমারই হাত আমাকে তুলিয়া লইতেছে।"

পীড়ার শেষ কয়েকমাস তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "মা, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।" ২৭শে মে বেলা ২—২৭মিনিটের সময় জগজ্জননী তাঁর প্রিয় সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। প্রতাপচন্দ্রের অমর আত্মা স্বধামে চলিয়া গেলেন। নশ্বর দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল। আমরা শত শত লোক, ধনী ও দরিদ্র, সেই দেহ সুগন্ধি ও পুষ্পমাল্যে শোভিত করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলাম ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলাম। তাঁহার সুন্দর শরীর রোগে শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সে দেহের ভস্মমাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই ভস্মের অল্প অংশ শান্তিকুটীরের উদ্যানে রক্ষিত এবং তাহার উপর সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। স্তম্ভের এক পার্শ্বে, প্রতাপচন্দ্র আমেরিকা হইতে এ দেশস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলীকে যে

পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নস্থ কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছে :—(অনুবাদিত) "যে কার্য্য আমাকে করিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করিয়াছি, যে ব্রত আমি লইয়াছিলাম তাহা রক্ষা করিয়াছি, যাহা আমার বক্তব্য ছিল, তাহা আমি অনেক পুরুষ ও নারীর নিকটে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার হৃদয় শান্তিতে পূর্ণ। সকল সুযোগ ও সুবিধার জন্য, আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার পথ আমার পথ নয়, তাঁহার অভিপ্রায় আমার অভিপ্রায় নয় ; কিন্তু তিনি আমার নিকট ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহার এই মহান্ ধর্ম্মবিধান একদিন নিশ্চয়ই মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম হইবে। চিরদিন তাঁহার নাম ধন্য হউক।"

স্তম্ভের অপর পার্শ্বে "আশীষ" গ্রন্থ হইতে এই বাক্যটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে :—"এই কীট জীবনে, এই সামান্য সাধনে আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম ; আরও অশেষ গুণে তোমাকে পাইবার পথে যাত্রা করিলাম।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

আত্মদৃষ্টি।

বিশ্বাস বিনা জ্ঞান, তাহার কোন মূল্য নাই ; বিশ্বাসরূপ দর্শনেতে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, জ্ঞান সুদৃঢ় হয়, এবং বিশ্বাসও যে সত্য, তাহা জ্ঞানাস্ত্রে সপ্রমাণিত হয়। আবার জ্ঞানবিহীন শুধু বিশ্বাস, তাহা কল্পনা ও কুসংস্কারে পরিণত হইয়া যায়। যেখানে কল্পনা ও কুসংস্কার, সেখানে পাপ, মায়া ও অবিদ্যা সকলই আসিবার সম্ভাবনা। জগতের সকল ধর্ম্মই ঠিক সত্যই রহিয়াছে, কেবল জ্ঞান ও বিশ্বাসের কোন একের অভাবে ধর্ম্ম মলিন ও মানবীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। বিশ্বাস ও জ্ঞানের সম্মিলনে স্বর্গের ধর্ম্ম ধরায় কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল, কিছু কালের জন্য ধরায় স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হইল ; কিন্তু আবার যোগের অভাবে উহা স্থায়ী হইল না। যেখানে যোগ সংযুক্ত হইল, তথায় ধর্ম্ম কিছু কালের জন্য যোগবলে (নিত্যদর্শনে) স্থায়ী হইল ; কিন্তু আবার প্রেম, ভক্তির অভাবে ধর্ম্ম চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করিল না। প্রেম, ভক্তি বিনা যোগবল ছিন্ন হয়। বিশ্বাসে যে দর্শন জাগ্রত হইল, জ্ঞানে তাহা বুঝা গেল, তাহার ধারণা হইল। যোগে অর্থাৎ নিত্য দর্শন দ্বারা তাহা স্থায়ী হইল। প্রেমে, হৃদয়ের সরসতা দ্বারা সেই স্থায়িত্ব-রক্ষার অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ দেখা দিল। তখন হৃদয়ের ভক্তি আবির্ভূত হইয়া প্রেম, অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে গৃহীত সেই নিত্যদর্শনের (যোগের) অবস্থাতে মাধুর্য্য (যাহা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর আকার ধারণ করে) উৎপন্ন হইল। অবস্থায় সাধকের হৃদয়ের ধর্ম্ম মিথ্যা, কুসংস্কার, পাপ, অননুরাগ, আকাঙ্ক্ষাবিহীনতা, অস্থায়িত্ব ও শুষ্কতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। ধর্ম্ম হইতে যেমনি বিশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়া যায়, অমনি তাহা কল্পনায় পরিণত হয়। ধর্ম্ম হইতে যেমনি জ্ঞান পরিত্যাগ করা যায়, অমনি উহা অবিদ্যা, পাপ ও কুসংস্কারে পরিণত হয়। ধর্ম্ম হইতে যোগ যেমনি পরিত্যাগ করা হয়, অমনি উহা অস্থায়ী হইয়া যায়। ধর্ম্ম হইতে যেমনি প্রেমকে বাদ দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ উহাকে স্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ চলিয়া যায়। আবার উহাকে ভক্তিবিহীন করিয়া রাখ, দেখিবে, উহাতে কোন রূপ সরসতা ও মাধুর্য্য নাই।

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন জীবনে এই সকলের কোন একের অভাব যখন অনুভূত হয়, তখন নিজেরই আলস্য উপেক্ষার ফলে ঘটিয়াছে বুঝিয়া, অপরাধের ভাব জাগ্রত হয়। বিশ্বাসীর জীবন-কাহিনী, কোন না কোন শাস্ত্র ও ঐ সকলের নিদর্শন সকলে যখন ব্যক্তিবিশেষে অথবা মানবসমাজে নিরুৎসাহ, অননুরাগ ও উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা সেই সমাজ ঈশ্বরের নিকট অপরাধিরূপে সাব্যস্ত হয়। আবার যখন ঐ সকলের প্রয়োজনীয়তার মূল্য দেওয়া না হয়, তখন ঐ ব্যক্তি, ঐ সমাজ দায়িত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। সমাজের ও দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সত্য। সাংসারিকতা ও বিলাসিতার দিকে দেশ চলিয়া পড়িতেছে, শুষ্ক জ্ঞানে দেশ পরিতৃপ্ত হইতেছে, নীতি-বিশ্বাস-যোগ-ভক্তিবিহীন জীবন যাপন করিতে সমাজ এখন মত্ত। দেশবাসীর প্রেম গভীরতায় পরিণত হইতেছে না, স্বর্গীয় আলোকে রঞ্জিত হইতেছে না, উহা এখন নায়কনায়িকার অভিনয়ে পরিণত হইয়াছে। এই সময়ে প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির সতর্ক হইবার ও এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। বিধানজননী করুন, যেন এ বিষয়ে আমরা সতর্ক ও মনোযোগী হইতে পারি।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—•—

আদরের সুহাসধন।

"সে গেছে চলে, তারি পশ্চাতে বিপুল সৌন্দর্য্য লুপ্ত তার ;
ভস্ম মুষ্টিমেয় মিশে মৃত্তিকাতে, চিহ্ন কিছু রহিল না আর।"

ব্রহ্মানন্দ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রদেবে প্রেরিত ঋষি কেদারনাথ দেব পৌত্র সুকুমার সুবোধ সুহাসকুমার, ২৮শে জুলাই, ১৯২৩খ্রীঃ, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করে। তার শুভ জন্মদিনে আত্মীয় স্বজনসহ সুখী পরিবারের সকলেই পরম আনন্দে প্রফুল্ল হয়েছিলেন। সে রাত্রে কোন্ শুভ নক্ষত্র গগনে উদিত হয়েছিল ? এই সর্ব্বপ্রিয় পবিত্র শিশুর শুভ আগমন মনে হলে, সেই দেব শিশু খ্রীষ্টের জন্ম মনে পড়ে। সুহাসও দেব শিশু ছিল।

তার পিতা শ্রীমনোগতংম দে শৈশবাবধি এই সুহাসকে সকলের মধ্যে যেন অধিক স্নেহ করতেন। যখন সুহাস তিন বছরের, সেই সময়—তার প্রিয় ছোট পিসিমার সেবার দূর ইংলণ্ড থেকে ফেরবার সময়ে, হাওড়া ষ্টেশনে তার বাবা তাকে সঙ্গে এনে, এক গাছি সুন্দর ফুলের মালা সুহাসের হাতে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন; একেবারে ঠিক সময়ে শিশু সুহাস তার ছোট পিসিমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। আমরা সবাই অবাক হয়ে রইলাম।

তারপর প্রথম বাড়ীতে আমাদের কাছে প্রথম ভাগ পড়েছিল। তারপর সুহাসের বড়দি ছোড়দির কাছে, মেজ পিসিমার যত্নে, ওঁদের দীপালিতে বড় উৎসাহের সহিত পড়তে যেতো। মাঝে মাঝে দেখা হলে সুহাসের বাবা আমাকে বলতো, সুহাসকে বনর কাছে রাখতে আমার বড় ইচ্ছা করে, তোমরা নিয়ে যাবে? আমি বলতাম, তোমরা কি সুহাসকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারবে? তখন মায়ের ও বাবার সে বড় প্রিয় ছিল। বাবা যা কিনে আনতেন, তার সব চেয়ে ভাল জিনিষটা সুহাস আগে খাবে। রোজ বাবা অফিস যাবার সময় কত জিনিষের ফরমাস করত, যা সন্ধ্যা বেলা ফেরবার সময় ভুলে গেলে আব্দারে খোকন আর রক্ষা রাখত না, সেইজন্য পিতাকে আনতেই হত। অর্দ্ধ পথে মনে পড়লে দৌড়ে ফিরতো। ওর সুহাসকুমার নাম না রেখেছিলেন, আদর করে বাড়ীর সকলে খোকন বলেই মিষ্টি সুরে ডাকত।

৮ বছর বয়সে সুহাসকুমার পিতৃহীন হয়েছিল। সেই সময়ে তার ছোট পিসিমা তাকে পাটনায় নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখলেন। এখানে থাকতে প্রথম থেকেই স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে প্রকৃতি এবং চরিত্রে, লেখা পড়াতেও অল্প অল্প করে উন্নতি লাভ করতে লাগল। অশেষ প্রকারে এবং প্রাণের যত্নে তার ছোট পিসিমা নিজ হাতে শত কাজ থাকলেও তার শিক্ষার ভার হাতে রাখতেন। প্রথম সে এখানে আসার পরে আমাকে পড়াতে বলেছিলেন, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যে বেলা নিজে আবার দেখা শোনা করতেন ও বিশেষ করে অঙ্ক শেখাতেন। কিছুদিন পরে মাষ্টার রেখে পড়াতেন, নিজেও দেখতেন। তার পর কলেজিয়েট স্কুলে পাস হয়ে এটুকু বয়সে ভর্ত্তি হল। আমাদের বড় ভয় হয়েছিল যে, পাস করতে পারবে না; কিন্তু ছোট পিসিমা এত করে খেটে সব শিখিয়ে পরীক্ষা দিতে পাঠালেন যে, কোন মতে পাস হয়ে গেল। এবার পাস হবে প্রমোশন পেয়ে আনন্দও হয়েছিল, দুঃখও করেছিল; বলেছিল, আগামীবারে আমি খুব ভাল পাস হবার চেষ্টা করব। সকলকে সঙ্গে করে খেলা করতে সে ভালবাসত।

তার প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি বড় ভাল গুণ ছিল। শান্ত শিষ্ট ছিল, বাধ্য ছিল। ছোট পিসিমা যা বলে দিতেন, প্রাণপণে পালন করতে চেষ্টা করতে ত্রুটী ছিল না। সে লোভী ছিল না। সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতো। পরকে আপনার করতে তাকে যেমন দেখেছি, বেশী এমন দেখা যায় না। তার মুখের হাসি দিয়ে পাটনার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। দেখেছি পথের লোক থেকে আরম্ভ করে, এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা সুহাসের প্রিয় ছিল।

ছোট পিসিমার কাছে এসে ও থেকেই তার বিশেষ ভাল করে শিক্ষা আরম্ভ হয়। সব বিষয়ের সফলতা অল্প দিনেই সুহাস তার ছোট পিসিমার কাছে পাচ্ছিল। ক্রমে ধর্ম্ম জ্ঞান নীতি স্নেহ ভক্তি সব ফুটতে আরম্ভ করছিল। এই স্ফুটনোন্মুখ প্রিয়দর্শন সুহাসধনকে কেন হারালাম? এখানে যেমন ছোট পিসিমার কত ছোট বড় কাজে দরকারে ছোট শিশু সুহাসকুমারের প্রয়োজন হচ্ছিল, তার চেয়ে কি কোন উচ্চ ও বিশেষ প্রয়োজনে, ওখানে আরও উচ্চতম আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, দেবলোকের মাতা দেবশিশুদের সঙ্গে মিলিয়ে, সুহাসের সুখ-নিকেতনের সুখের কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়ে দিলেন?

তার ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হল। এখানে মা, ছোট পিসিমা, জ্যাঠা কাকা, ভাই বোন, আত্মীয় বন্ধুগণ, ছোট পিসিমার স্কুল বোর্ডিং, বিপুল দাসদাসী পরিচারকেরা, তার প্রিয় সহপাঠী, আরও কত সবাই ছোট বালক সুহাসকে আহ্বান করেছে, আশীর্ব্বাদ করেছে। প্রাণের যত্ন দিয়ে হিতৈষী এখানকার ও কলিকাতার প্রধান চিকিৎসকগণ কত যত্ন চেষ্টা দিয়ে, দিন রাত এসে থেকে বসে চিকিৎসা করেও সফল হতে পারলেন না। বিশ্বাস করব, বিশ্বজননীর ইচ্ছায়, আমাদের বড় আশা আদরের সুহাসধন চলে গেল।

প্রার্থনা করি, তাঁরই পথে সেই অলোক আলোকের রাজ্যে অনন্ত সুখ দিন, তার কাজে সহায় সঙ্গী থাকুন।

জয় বিশ্বরাজ!
জয় পিতৃগণ!
জয় অমরাত্মা!

সন্ন্যাসিনী—বড় পিসিমা।

—•—

ভাই রাজেন্দ্রনাথ।

আজ কোন ভাব ও কোন উচ্ছ্বাস লইয়া লেখনী ধারণ করিলাম, জানি না। আজ এই ত্রাশীতিতম বর্ষে আসিয়া কোন্ অশ্রুতে এ চিত্র আঁকিব, তাহা বলিতে পারি না। কোনদিন ভাবিতে পারি নাই যে, এই চিত্র আঁকিবার জন্য আমাকে এই কম্পমান লেখনী ধারণ করিতে হইবে। যতই দিন চলিয়া যাইতেছে, ততই তাঁহার বিধানের বৈচিত্র্য অনুভব করিতেছি।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন পিতৃসম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় মধুসূদন এবং ভক্তিমতী মাতৃসমা দেবী মঙ্গলার রচিত নববিধানের আদর্শ পরিবারে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন শিশু রাজেন্দ্রনাথ মাতৃক্রোড়ে শায়িত ও পালিত। তিনি এ সময় ঘরের

ভিতরে হামা দিয়া বেড়াইতেন এবং অর্দ্ধস্ফুট ভাষা উচ্চারণ করিতেন। তখন তাঁহার সেই শিশুজীবনে ক্রমে ক্রমে একটা বিচিত্র ভাব ফুটিতে লাগিল। যখন একটু আধটু চলিবার শক্তি হইয়াছিল, তখন তাঁর ভিতরে একটা নারী-প্রকৃতির ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার অন্যান্য ভগিনীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাড়ী পরিধান করিয়া বেড়াইতেন। এমন কি, বাড়ীর রন্ধনকক্ষে প্রবেশ করিয়া মহিলার মত রন্ধন করিতেও যাইতেন। সত্য সত্য ভাই রাজেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অনেক সময়ে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া রন্ধন করিতেন।

রাজেন্দ্রনাথ ক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়া, ইংলণ্ডে লীড্‌স ইউনিভার্সিটি হইতে বিজ্ঞানের এক উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তাঁহার পিতৃদেব মধুসূদন দেহমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেই পিতৃশূন্য বাসভবনে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মাতৃদেবীকে সাশ্রুনয়নে নমস্কার করিলেন এবং সেইভাবে আমার নিকটেও আসিয়া মস্তক অবনত করিলেন। শিশু রাজেন্দ্রনাথের এইরূপ সরল শিশু-প্রকৃতি কোনদিন হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। যখন তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নিযুক্ত ছিলেন, তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে সেবার কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি নববিধানমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে মন্দিরের বেদীতে বসিয়াও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাহার পর যখন গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিনসিপ্যালের পদে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তখনও তিনি সেই স্থানে ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত ভাবে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া, সেখানকার নির্জ্জীব সমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথের জীবনের প্রভাব তাঁহার ভিতরে এইরূপে সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি উক্ত কলেজ হইতে অবসর-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আলিপুরস্থ বাস ভবনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অবসর-প্রাপ্তির পর এক বৎসরও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিলেন না।

আজ আমরা আমাদিগের এই সরল ও মধুরপ্রকৃতি ভাই রাজেন্দ্রনাথকে হারাইয়া হৃদয়ের কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিব, তাহা জানিনা। আমরা যখন সমস্তিপুরে অবস্থান করিতাম তখন এই নারীপ্রকৃতি ভ্রাতা আমাদিগকে দেখিবার জন্য সেই সুদূর প্রদেশেও আসিয়াছিলেন। এমন কি, এই সময়ে তিনি একবার আমার সহিত আমার জন্মভূমি ধাত্রিগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনে এই প্রথম পল্লীদৃশ্য ও পল্লীর সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া, যারপর নাই, আনন্দিত হইয়াছিলেন।

উপসংহারে ভাই রাজেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী ভগিনী সুজাতা দেবী ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এবং তাঁহার প্রিয়তম সহোদর ও সহোদরাগণের প্রতি হৃদয়ের পূর্ণসহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া, নিম্নলিখিত পদ্যে সেই ইচ্ছাময় ঠাকুরের চরণে অশ্রুজল নিবেদন করিতেছি :—

কি শুনিরে আজ হায়! দরিদ্র-কুটীরে,
সোদর 'রাজেন্দ্রনাথ' নাহিক ধরায়!
একি শুনি আজ ভাই—ভাসি অশ্রুনীরে,
সে মূর্ত্তি নাহিক আর—লুকাল কোথায়!
দেখেছিনু মাতৃক্রোড়ে সেই ক্ষুদ্র শিশু,
অর্দ্ধস্ফুট ভাষা তাঁর শুনেছি তখন!
'মঙ্গলা' মায়ের ক্রোড়ে যথা শিশু যীশু,
বল আজ সেই শিশু কোথায় এখন!
আজ সেই শান্ত শিশু কোথা গেল ভাই,
আর কি আমরা তাঁরে দেখিব না আজ!
আমাদের মাঝে আজ সেই মূর্ত্তি নাই,
বল না কোথায় আজ করেন বিরাজ!
বল ভাই কোন স্থানে নবীন বিধানে,
দেখিব আমরা তাঁরে দেখিব আবার!
নবশিশু হয়ে তিনি নবীন জীবনে
আরো শান্ত শান্তি-ক্রোড়ে নবীনা মাতার!
যাবে যদি চল ভাই দেখিব তাঁহারে,
সেই স্থানে যাই চল 'বিনয়' যথায়,
শান্ত সমাহিত পেয়ে নবীনা মাতারে;
চল ভাই চল তাঁরে দেখিব তথায়!
চল 'সত্য' চল ভাই 'দ্বিজেন' 'দেবেন',
'সুমতি' 'সরলা' চল 'হেমন্ত' 'প্রভাত'
চল 'শান্তি' চল আজ কনিষ্ঠ 'ধীরেন'
চলনা ভাইরে গিয়ে করি প্রণিপাত!
তোমারেও বলি আজ ভগিনী 'সুজাতা',
ঋষি স্বামী সহ তুমি ক'রেছ সাধন!
দেখ আজ ঋষি স্বামী দেখ গিয়ে তথা,
নবীন সাধন তাঁর কর দরশন!
সাধনের পথ আরো রয়েছে তোমার,
স্বামী আত্মা সহ মিলে কর না সাধন;
আরো উচ্চ দীক্ষা লয়ে বিধানে তাঁহার,
নবীন বিধানে কর নবীন জীবন!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার

—০—

কোথা গেলে?

(শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণে স্বর্গীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী রচিত; ৬ই মে, ১৯০৪খ্রীঃ)

কোথায় চলিয়া গেলে জীবন-সঙ্গিনী
এত ধন, এত সুখ, সব তেয়াগিয়া,

কোন পথে, কোন ধামে গেলে একাকিনী,
পৃথিবীর স্নেহমায়া সব কাটাইয়া।
অকালে চলিয়া ভাই কোথায় পালালে,
বল ভাই, বল তুমি, কোথায় চলে গেলে?
সমস্ত জগৎ যদি ঘুরিয়া বেড়াই,
তোমার সুন্দর মুখ দেখিবার তরে;
চির পরিচিত ছবি দেখিতে না পাই,
কথা বল, কাছে এস, ডাকি বারে বারে।
নয়ন-আনন্দ-কর তোমার সংসার,
স্বামী পুত্র কন্যা তব করে দিক আলো;
কিছুরই অভাবত ছিল না তোমার,
তবে কেন তাড়াতাড়ী চলে গেলে বল।
অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া সবে,
তুমি যে ভাই চলে যাবে ভাবে নাই কেহ;
দুই চারি দিন খেলা খেলিয়ে এ ভবে,
স্বর্গধামে চলিয়াছ ত্যজি সুন্দর দেহ।
তব শোকে কাঁদিতেছে আত্মীয়স্বজন,
অশ্রুজলে ভাসে তব পত্নীপ্রাণ পতি;
ছোট ছোট শিশুগুলি হ'য়ে মাতৃহীন,
কাঁদিতেছে দিবানিশি দেখিবারে মতি।
যোগী ঋষি ব্রহ্মানন্দ সকলের প্রিয়
দেখিতে তোমার সাধ অনন্তহিমানী;
ভুঞ্জিতে যোগীর সুখ গেলে হিমালয়,
ফিরিলে না আর হ'লে কৈলাসবাসিনী।
অমরধামে গিয়াছ আছ কত সুখে,
সীতা সতী দময়ন্তী সকলের সনে
মিলিয়াছ খেলিতেছ হাসি হাসি মুখে;
মনে রেখো ভাই এই হীন বন্ধু জনে।
সকলের প্রিয় তুমি বিধানের দাসী,
পরসেবা করি দেহ করিলে পতন
সাধ্বী সতী পতিব্রতা তুমি প্রিয়ভাষী,
বিকশিত পুষ্পতুল্য তোমার জীবন।
গিয়াছ প্রথমে তুমি করিবারে স্থান,
পরে সবে যাব মোরা সে অমৃতধাম।

নূতন সঙ্গীত।

(স্বর্গীয়া বিনীতার দেবীর পারলৌকিকে রচিত ও গীত)

ভৈরবী—একতালা

তোমার সাধের সুরভি-কুসুমে লহ তুলে লহ যতনে;
সৌরভ ছড়ায়ে গিয়াছে সেথায় শোভিতে তোমার চরণে।
দিয়ে কেন লও দু'দিনের তরে, সুন্দর মুকুল কেন ঝরে পড়ে,
ফুটিতে না পেরে এ মর জগতে, ফুটিল নন্দনকাননে।
হেথা শূন্যময় হাহাকার রব, দহিছে বিচ্ছেদ-দহনে,
চারিদিকে হায় স্মৃতি এনে দেয়, বেদনায় জল নয়নে;
তব রূপছায়া পড়েছিল মুখে, তাই বুঝি তুমি ধরিলে গো
বুকে,
দেখায়ে সে শোভা সবারে আ'জকে, ঢাল হে শান্তি পরাণে।
হারাধনগুলি আছে তব পায়, তবে কেন মরি কাঁদিয়া,
মোরা সবে পুনঃ মিলিব তোমাতে, প্রাণে প্রাণে সবে বাঁধিয়া;
শোকার্ত্তের সান্ত্বনা ওহে শান্তিময়,
রোগে শোকে দুঃখে হোক তব জয়,
এ ঘোর আঁধারে দেখাও তোমার মধুর হাসি প্রেমাননে।

শ্রীসুধা দেবী।

(২)

জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

গোপাল উড়ের সুর—একতালা

কাঁচা বাঁশের খাঁচার ভিতর—বাস করে দুই সোণার পাখী,
চোখোচোখী মুখোমুখী ভালবাসায় মাখামাখি।
একজনা আর জনারে, খাওয়ায় ফল যতন করে,
নিজে কিছু খায়নারে, শুধু খাওয়াইয়ে হয় সুখী।
আর জনা তাবে গলে, কলকণ্ঠে হরি বলে,
পড়ে সবার পদতলে, করে কত ডাকাডাকি;
কালে খাঁচা হ'লে ভঙ্গ, চলে যায় দু'বিহঙ্গ,
কেউ ছাড়ে না কারও সঙ্গ, এমন প্রেমের রঙ্গ দেখেছ কি!

সংগৃহীত—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৮ই জুন, বালীগঞ্জে, ৪৩নং ফার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশান্ত কুমারের শুভজন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং দিদিমা কল্যাণ ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী ধর্ম্মতত্ত্বের সাহায্যার্থ ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার সন্তানকে শুভাশীষ দান করুন।

সেবা—আমাদের প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু জামসেদপুরে অবস্থান করিয়া পারিবারিক উপাসনা ও স্থানে স্থানে নববিধান প্রচার করিতেছেন।

পারলৌকিক—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, আলিপুরে, ২২নং নিউ-রোডে, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া বিনীতা দেবীর পরলোকগমন উপলক্ষে তাঁহার আত্মার স্মরণার্থ ও

কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার প্রথমাংশ এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি ও অনুষ্ঠানের শেষাংশ সম্পন্ন করেন। ভগ্নী শ্রীমতী রমা দেবীর লিখিত বিনীতায় সুন্দর জীবনী ডাক্তার সত্যানন্দ রায় পাঠ করেন। ভগবান্ পরলোকগত দিব্য আত্মাকে শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, (৭ই জুন), গৃহস্থ-প্রচারক স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় স্বপ্রকাশচন্দ্র দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রকন্যাগণকর্ত্তৃক, ৭৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার প্রথমাংশ, ডাঃ সত্যানন্দ রায় পাঠ এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ অনুষ্ঠানের শেষাংশ সম্পন্ন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস মেজদাদার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলে, মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মালবিকা দাস পুত্র সচ্চিদানন্দ সহ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানটী গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী নববিধান প্রচারাশ্রমে ৪৲, নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, করাচি ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, হায়দ্রাবাদ ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, কেশব মেমোরিয়েল ফণ্ডে ৪৲, ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲ ও একটী ভোজ্য এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, নববিধান প্রচারাশ্রমে ৪৲, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, হাজারিবাগে ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲ এবং সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন, এবং শোকার্ত্তজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধানকরুন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত তিনটী শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, গিরিধিতে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় জনকচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ মস্তিষ্ক-প্রদাহ-রোগে (Meningitis) মায়ের কাছ থেকে পরমজননীর চিরশান্তিক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে এখন পতিদেব-দেবতার সঙ্গে ওখানে চিরসুখী হউন। মাতৃদেবী কন্যার পারলৌকিক অনুষ্ঠানে প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩রা জুন, প্রাতে ৮—৪৫মিনিটের সময়, ৫৬নং হ্যারিশন রোড ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়, ভক্তিমান্ অভিজ্ঞ ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য রক্তচাপাধিক্য রোগে, ৭৬ বৎসর বয়সে, ইহজীবনের ক্লান্ত দেহকে রাখিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি নানা বিষয়ে দেশের হিতকর কার্য্যে, গরিবের ও অনুন্নত জাতির সেবায় এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন), রবিবার, রাত্রি ১১টার পর, কলুটোলায় স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গগন-বিহারী সেনের ১৪ বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইলা দেবী নিউমোনিয়া রোগে পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

মাসিক স্মৃতি—গত ২৮শে মে, দার্জ্জিলিং শৈলস্থিত তাগদায়, স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের শৈলাশ্রমে, তাঁহার পরলোক-গমনের মাসিক স্মৃতিতে, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সেখানে সম্প্রতি স্বর্গীয় বিনয়কুমারের পিতৃদেব ও সহধর্ম্মিণী কন্যাগণসহ স্বাস্থ্যের জন্য বাস করিতেছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৯শে মে, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে ব্রহ্মানন্দানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

দান—আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী স্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০০৲ টাকা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে স্থায়ী ফাণ্ডরূপে দান করিয়াছেন। ইহার সুদ প্রতি বৎসর ব্রহ্মমন্দিরের মেরামত কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ভগবান্ এ দানকে সার্থক করুন এবং দাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ১৯শে মে, কোচবিহার রেল ষ্টেসনে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায়, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জামাতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক-গমনের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনাদি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মগণ ও বন্ধুবান্ধবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজিনী দাস মণির ঘাটে ঐ শ্মশানে গিয়া আকুল প্রার্থনার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন।

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির—গত ৬ই মে, বুদ্ধ-পূর্ণিমা-তিথিতে সিমলা শৈলস্থ হিমালয় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে একটী সভা আহূত হয়; অনেক গণ্যমান্য মহোদয় মন্দির পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেদিন শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় করুণা-চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া শ্রীমতী মোহিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁর সমাধিকুঞ্জে বিশেষ উপাসনা হয়; তাঁর অলৌকিক গুণাবলী বিবৃত করিয়া সেবিকা হেমলতা উপাসনা করেন।

গত ২২শে মে, সিমলায়, হিমালয়ব্রহ্মমন্দিরে রাজা রামমোহন রায়ের শুভজন্মদিনে সভা হয়। অন্যান্য কেহ কেহ বলার পর কুমারী বনলতা দেবী ইংরাজী ভাষায় রাজার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে সুন্দর বক্তৃতা করেন।

গত ২৭শে মে, আমাদের পরম পূজনীয় প্রেরিতপ্রবর

স্বর্গীয় ভাই প্রতাপচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে বেলা ১১টার সময় সকলে মিলিত হইয়া উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত গোপালদাস মাতভা উপাসনা করেন। পরে ৫৷০টার সময় একটী সভা হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার অমর গ্রন্থাদি হইতে কুমারী বনলতা দেবী পাঠ করেন এবং শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু কিছু বলেন। Mrs. Jagtiani সংগীত করিলে, সেবিকা হেমলতা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

—•—

নিবেদন।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এখন আর সব খণ্ড পাওয়া যায় না। এই বইখানিতে কেবল মাত্র সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই বইখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে ও আমাদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ অপরাধ হইবে। সেজন্য এই পুস্তক খানির নূতন সংস্করণ একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গালাতে এবং সন শকাব্দে আছে। সেই সকলের ইংরাজি সন তারিখ ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার সূচী একটু বিশদভাবে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাও আছে। সেজন্য কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ছাপাইতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। সকলের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সমাধা করা সুকঠিন। সেই জন্য সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যাহাতে আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে, তাঁর স্মৃতি (যা খুব accurately historical) এই উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা জীবনখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। টাকা কড়ি আমার নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

"জ্ঞানকুটীর", নিউ কাটরা ;
এলাহবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেরিত পত্র।

সমগ্র নববিধান-মণ্ডলী সমীপেষু

নিবেদন এই যে, আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সহর গাজীপুর জজকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, যুগধর্ম্মনববিধানের একনিষ্ঠ সাধক স্বর্গগত নিত্যগোপাল রায় মহাশয় নববিধানের আদর্শে গৃহস্থ জীবন যাপন করিয়া, প্রায় ২২ বৎসর অতীত হইতে চলিল, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী তিনকড়ি দেবী স্বর্গগত রায় মহাশয়ের গৃহদেবালয়, ব্রহ্মমন্দির ইত্যাদি সযত্নে অতিশয় নিষ্ঠার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎসবাদি করিতেন। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, তিনকড়ী দেবীও মহাপ্রস্থান করায়, গাজিপুরের মন্দির ও আশ্রমগৃহখানি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় রায় মহাশয় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নববিধান প্রচার ও তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা ও প্রতি বৎসর ব্রহ্মোৎসব করিবার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য নগদ ৮০০০৲ আট হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ১৫খানি শেয়ার ১৫০০৲ টাকার খরিদ করিয়া একটী উইল (শেষপত্র) দ্বারা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দুইজনের তিরোধানের পর বাসগৃহটী প্রচারক, সাধক ও নববিধানের কর্ম্মীদের আশ্রমে পরিণত হইবে, এই ব্যবস্থা করিয়া যান। তাহাতে পাঁচজন একজিকিউটার ছিলেন, তন্মধ্যে ক্রমে ক্রমে তিনজন একজিকিউটারের মৃত্যু হওয়ায়, শ্রীমতী তিনকড়ী দেবী ও ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত উইলের সর্ত্তানুসারে ডাঃ পি, কে সেন, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী, ডাঃ নবজীবন বন্দোপাধ্যায়কে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেন। রায় মহাশয়ের উইলের একজিকিউটার মধ্যে একমাত্র ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত আছেন। কামাখ্যাবাবু জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং উক্ত তিনজন ট্রাষ্টী গাজীপুর নববিধান আশ্রমের প্রধান নায়ক ও উক্ত নববিধান ট্রষ্ট ফণ্ডের সম্পূর্ণ মালিক। আমরা ইহাও অবগত হইয়াছি, কিছু দিন পূর্ব্বে উক্ত ট্রষ্টিগণ ডিষ্ট্রীক্ট জজ বাহাদুরের আদেশে রায় মহাশয়ের সম্পত্তির লভ্যাংশ ও টাকার সুদ প্রায় ৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বর্গীয় সাধক রায় মহাশয়ের পাকা বাড়ী ও তৎসংলগ্ন খোলার ঘরগুলি জীর্ণপ্রায় হইয়াছে এবং ব্রহ্মমন্দিরটীও জীর্ণ হইয়াছে। উক্ত আশ্রম গৃহখানি ও ব্রহ্মমন্দিরটীর সম্পূর্ণ মেরামত অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ট্রষ্টিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় নাই। অতএব, সমগ্র মণ্ডলী এই পুণ্যতীর্থের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলে ও ট্রষ্টিগণ আশু মনোযোগী হইলে, স্বর্গীয় সাধু ও সাধ্বীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ভরসা রাখি, বিধাতার বিধানে দাতার দান বিফল হইবে না। মা বিধানজননীর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র
সম্পাদক, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ।
30th. June, 1936.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবের গতিদাতা, মুক্তিদাতা, জীবন্ত জাগ্রত দেবতা! ধর্ম্মের নামে স্বদেশে বিদেশে কত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও চলিতেছে। এদেশে একটী মতবাদ বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—পরব্রহ্ম যিনি, সর্ব্বমূলাধার যিনি, তিনি অনন্তশয্যায় শায়িত বা নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বগুণের আধার হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। তাঁহার তিন শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; একজন স্রষ্টা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতেছেন, আর একজন প্রতিপালক হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, আর একজন ধ্বংসলীলার অভিনেতৃরূপে ধ্বংসের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। পশ্চিম দেশেও এই একটী মতবাদ প্রচলিত, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া, সৃষ্টিযন্ত্রের কল চালাইয়া দিয়া, সৃষ্টি হইতে দূরে রহিয়াছেন; সৃষ্ট জগৎ আপনার ভাবে চলিতেছে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভাবে সকল সময় সৃষ্টি-যন্ত্র পরিচালনা করেন না, বিশেষ অবস্থায় তিনি প্রয়োজন-বোধে জগতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই পরোক্ষবাদের সুযোগ পাইয়া, মানুষ যেমন সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে যথেষ্ট আমিত্ব, স্বামিত্ব, কর্ত্তৃত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া সংসারকে পুনঃ পুনঃ দেবালয়ের পরিবর্ত্তে দানবালয়ে পরিণত করিতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি মানুষ গুরু সাজিয়া, ধর্ম্মবিধির নামে, ধর্ম্মাচারের নামে, মানবসমাজে কত অধর্ম্ম-বিধি, অধর্ম্মাচার প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, সমাজকে কত কুসংস্কার ও অন্ধতা দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিজড়িত করিতেছে। এই নবযুগে, হে সর্ব্বমূলাধার, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালক, তুমি সকল কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রম, প্রমাদময় ধর্ম্মমতবাদ দূর করিয়া, এবার আপনি নিত্য ক্রিয়াশীল, এক অদ্বিতীয়, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপালক ও বিশ্ব নিয়ন্তারূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া, এক অনাদি ব্রহ্মবাদ প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতেছ। তুমি স্বয়ং প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিতেছ, প্রতিনিয়ত সকল সৃষ্টি-ব্যাপারের মধ্যে আপনি ক্রিয়াশীল, নিয়ন্তা হইয়া জাগ্রত রহিয়াছ, ধর্ম্মক্ষেত্রেও সদ্‌গুরু হইয়া সকলের শিক্ষা ও পরিচালনের ভার লইয়াছ, ইহাই নবযুগে তোমার নব-বিধানের বিশেষ শিক্ষা। এখন আমরা তোমার এই নব-যুগের জীবন্ত বিধানাশ্রিত হইয়াও যদি তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, আমাদের জীবনে, গৃহ পরিবারে ও মণ্ডলীতে তোমার কর্ত্তৃত্বের প্রাধান্য কার্য্যতঃ না দেই, তোমার কর্ত্তৃত্বের নামে আমাদের স্বেচ্ছা, রুচি, ভাব ও কর্ত্তৃত্বকে কার্য্যতঃ দাঁড় করাই, তাহা হইলে আমাদের

অপরাধের আর অবধি থাকে না। এখনও দেখিতেছি, আমরা আমাদের রুচি ভাব তোমার পদে বিসর্জ্জন দিয়া, তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তোমার দ্বারা পরিচালিত হইতে ও তোমার নিখুত আদিষ্ট কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হই নাই। তাই ভয়ে ভয়ে প্রার্থনা করি, আমাদের জীবনে, হে জীবন্ত গুরু, সেই অভ্যাস-যোগকে প্রতিষ্ঠিত কর, যে অভ্যাস-যোগের অবলম্বনে আমরা ক্রমে আমাদের ব্যক্তিগত রুচি ভাব তোমাতে বিসর্জ্জন দিয়া, একমাত্র তোমার কর্তৃত্বে পরিচালিত হই এবং তোমার কর্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া, তোমার আদিষ্ট কার্য্য করিয়া, জীবনে পরম মঙ্গল লাভ করিয়া, আপনার জীবন-প্রত্যক্ষ সত্য মণ্ডলীতে ও জগতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হই।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

ঈশ্বর আমাদিগের গুরু ও নেতা।

ঈশ্বর আত্মতৃপ্ত, নিষ্কাম। ঈশ্বর আপনাতেই আপনি তৃপ্ত। তিনি মানুষের ন্যায় কোন কামনা বাসনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন না, তাঁহার কার্য্যও নিষ্কাম। পণ্ডিতগণ, সাধুভক্তগণ তাঁহার সম্পর্কে এই কথাই বলেন।

আমরা সামান্য জীব, কীটাণুকীট, পৃথিবীতে আসিয়া অনন্তের খেলা, অনন্তের লীলা, অনন্তের বিধি ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া হাবু ডাবু খাইতেছি। আমরা কি জানি আমাদের সম্বন্ধে, কি জানি জগতের সম্বন্ধে, কি জানি আমাদের স্রষ্টা, জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর-সম্বন্ধে?

এই অজানিতের দেশে আমরা হইয়াছি স্বাধীন জীব। মনুষ্যেতর পশু, পাখী, জীব জন্তু স্বভাবের প্রেরণামূলক সীমার অধীন, Instinct এর অধীন। মানুষ কেবল স্বাধীন। এই স্বাধীনতাই মানুষের মহত্বের কারণ। কিন্তু মানুষ যখন আপনার জীবনের উচ্চ নিয়তি সম্পর্কে আপনি অজ্ঞ, সামাজিক জীবনের পরিণাম সম্পর্কে ও বিশ্বলীলার সম্পর্কে আরও অজ্ঞ, তখন সে স্বাধীন হইয়া পদে পদে ভুল করিবে, ভ্রান্তিতে পড়িবে, আপনি অসহায় হইয়া শ্রেষ্ঠজনের সহায়তা চাহিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসে ইহা নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও প্রমাণিত হইতেছে, ঈশ্বর ভিন্ন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রকৃত উপদেষ্টা ও গুরু হইতে পারেন না, তিনি যতই কেন জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ও সাধু না হউন। এ বিষয়ে বিশেষ কথা এই, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন বিশেষ দিক, বিশেষ বৈশিষ্ট্যর অঙ্কুর রহিয়াছে, যাহার ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশ ও উচ্চ পরিণতি একমাত্র সেই মানুষের স্রষ্টা ও বিধাতা যিনি, তাঁহার পরিচালনা, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহা হইতে সাক্ষাৎ সহায়তা ও পরিপোষণ-লাভ ভিন্ন হয় না।

যথার্থ মানুষ-গুরুর কাজ, শিষ্য বা অনুগত ব্যক্তির অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার করা, ঈশ্বরকে যথাসম্ভব চিনাইয়া জানাইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণের জন্য উপদেশ দেওয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা সহায়তা করা। ঈশ্বরকে জীবনের ভার দিলে, তিনি সে ভার গ্রহণ করিয়া, সে জীবন-সম্পর্কে যাহা কিছু করিবার, সবই করিবেন। ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ (Omniscient), ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্ব-শক্তিমান (Omnipotent)। তিনিই সকল জীবনের গূঢ় অভাব, অপূর্ণতা পূরণ করিয়া, তাঁহারই স্বর্গের উপাদানে নব নব গঠন দান করিয়া, পূর্ণতার পথে, উচ্চ পরিণতির পথে লইয়া যাইতে পারেন। স্বদেশের বিদেশের দর্শন বিজ্ঞান ইহার অকাট্য প্রমাণ দিতেছে; ধর্ম্মশাস্ত্র সকল এ বিষয়ে পরিষ্কার ব্যবস্থা দান করিতেছে। তথাপি এদেশে দেখিতেছি, সহরে নগরে গ্রামে পল্লীতে কত লোক নূতন নূতন গুরু সাজিয়া, অসংখ্য মানব মানবীর পরিত্রাণের ভার লইতেছেন, গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আপনাদের কৃতিত্বকে বাদপ্রতিবাদের অতীত ভূমিতে অক্ষুন্ন রাখিতে কৌশল বিস্তার করিতেছেন। সদোষ গুরুবাদ এ দেশকে আবার গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। "কত দীপ-মালা নগরে নগরে, তুমি যে আন্ধারে, তুমি সে আন্ধারে" ভারতবর্ষ, বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশ সম্পর্কে একথা এ সময় খুবই বলা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন গুরুর ভিন্ন ভিন্ন মত, সাধনেরও ভিন্ন ভিন্ন পথ। এ ক্ষেত্রে যত মত, তত পথ হইবেই। তাই বঙ্গ ভারতে এ সময় নব নব ভাবে, নব নব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গূঢ় অভ্যুদয়।

নবযুগ চায় মিলন, নবযুগ চায় খণ্ড খণ্ড দল ভাঙ্গিয়া এক অখণ্ড অভিন্ন দল; নব যুগ চায় সকল সাম্প্রদায়িকতার ধ্বংসে বিশ্বে এক অখণ্ড সম্প্রদায়, এক অখণ্ড

পরিবার। তাই আজ পূর্ব্ব পশ্চিমে, স্বদেশে বিদেশে উদারমনা উন্নতপ্রকৃতির ব্যক্তিদিগের মধ্যে সকল বিভাগে মিলনের প্রচেষ্টা। বিষয়কর্ম্মে, ব্যবসায় ব্যাণিজ্যে মিলনের বাণী, সামাজিক জীবনে মিলনের বাণী, রাষ্ট্রতন্ত্রে মিলনের বাণী, ধর্ম্মরাজ্যেও স্বর্গ হইতে মিলনের বাণী। ধর্ম্মক্ষেত্রে মিলন না হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে মিলন অসম্ভব; তাই মহামিলনের ধর্ম্ম নবযুগে নববিধানের অভ্যুদয়। নব ধর্ম্মের গোড়ার কথা, এক ঈশ্বর পিতামাতা, বিশ্বের সকল নরনারী একই ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরের ভাই ভগ্নী, সকল খণ্ড পরিবারের মিলনে ঈশ্বরের এক অখণ্ড পরিবার। এক ঈশ্বরের শিক্ষাধীনে, এক পরম গুরু ঈশ্বরের নেতৃত্বে ও পরিচালনে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামিলনে এক অখণ্ড ধর্ম্মসম্প্রদায়। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কত মন্ত্রে, কত গাথায় সম্মিলনের, অভিন্ন পরিবারের কত আশার বাণী রহিয়াছে; "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" ইনি বন্ধু, ইনি পর, ইহা ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিদিগের গণনা; কিন্তু উদারচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট বিশ্বের সকলেই আত্মীয়, সকলেই এক পরিবার। ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনেও পাইয়া থাকি। আমাদের মন যখন প্রকৃতিস্থ থাকে, তখন স্বদেশের বিদেশের সকলের সুখ দুঃখে আমাদের প্রাণে সহানুভূতি, সুখে আনন্দ, দুঃখে সমবেদনা উপস্থিত হয়। আজ আফ্রিকা দেশে আবিসিনিয়ার পতনে ছোট বড় সকলের প্রাণে কি সহানুভূতি ও সমবেদনা উপস্থিত হইতেছে না? এই সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখাইয়া দেয়, সে দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের গূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, মূলতঃ সকলে এক পরিবার। আবার কোন ক্ষুদ্র দেশ যদি স্বাধীনতার গৌরব-মুকুট পরিধান করিয়া দশের সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, সে দেশ যতই দূরে হউক না কেন, সে শুভসংবাদে আমাদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। কি একপ্রাণতা ও অখণ্ড পরিবারের সহজ স্বাভাবিক প্রমাণ। কিন্তু মানুষের জীবনে এই প্রকৃতিস্থতা, সরল সহজ ভাব অবস্থাভেদে রক্ষা পায় না। মানুষের জীবনে আত্মরুচি, আত্মভাব, আমিত্ব স্বামিত্বের যখন দৌরাত্ম্য উপস্থিত হয়, তখন বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রেও ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা হিংসা দ্বেষ, ধর্ম্মক্ষেত্রেও ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা, দলাদলি।

একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বাবস্থায় প্রকৃতিস্থ। তাঁহাতে কোন অবস্থায় বিকৃতি উপস্থিত হয় না। তিনি পূর্ণ মঙ্গল, পূর্ণ উদার, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, সর্ব্বশক্তিমান; তিনি সকলের আপনার, সকলে তাঁহার আপনার ও অতি প্রিয়। আমরা তাঁহার প্রকৃতি লাভ করিলে, প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারি; আমরা তাঁহার স্বভাব পাইলে, তাঁহার পুত্রকন্যারূপে এক অখণ্ড পরিবারের বন্ধনে বাস করিতে পারি, বাহ্যতঃ যতই কেন দূরে থাকি না।

পৃথিবীর সঙ্কটময় অবস্থা দেখিয়া, এবার পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বর জীবন্ত জাগ্রত দেবতারূপে, বান্ধব ঈশ্বররূপে, পরম পিতামাতারূপে, পরম গুরুরূপে, পরম পরিত্রাতারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন, তাঁহা হইতে শিক্ষালাভ ভিন্ন, তাঁহার পরিচালন ভিন্ন, আমরা আমাদের আত্মরুচি, আত্মভাব, আমাদের হীন আমিত্ব, স্বামিত্ব, আমাদের পাপ, মলিনতা দূর করিয়া তাঁহার সন্তানত্বের অধিকারী হইতে পারি না। তিনি যখন আমাদিগকে চান, আমরা তাঁহাকে চাই। কোন্ দূর তীর্থে তাঁহাকে খুঁজিতে যাইব? তিনি আমাদের হৃদয়তীর্থের দেবতা, হৃদয়তীর্থে অবতীর্ণ। আসুন দেশবাসী, বিদেশবাসী, সকলে তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া, তাঁহাকে জীবনের দেবতারূপে গ্রহণ করি; প্রথমে একটু কঠিন হইলেও, তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করি, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হই। তিনি তাঁহার নির্ম্মল স্বভাবে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহার সঙ্গে মিলাইবেন, জগতের সকলের সঙ্গে মিলাইবেন, মঙ্গলের পথে, শান্তির পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিবেন।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

রোগে যোগ।

রোগ কি? শারীরিক সুস্থতার বিয়োগ রোগ। সুস্থতা বা স্বাস্থ্যই শরীরের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবিধিলঙ্ঘনেই রোগের উৎপত্তি। কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার কৃপা-বিধি। রোগ দ্বারাই রোগের নিবৃত্তি হয়, শুধু তাই নয়, রোগাবস্থায় মনের পাপ নিবৃত্ত হয়, মন নিরাশ্রয় হইয়া বিধাতার শরণাপন্ন হয়, এবং স্বাস্থ্যধর্ম্মলাভের জন্য, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণদাতা ভগবানের কৃপালাভের জন্যও মন ব্যাকুল হয়। ভগবানেরও প্রাণ মার প্রাণ, তিনি রোগগ্রস্ত আর্ত্ত সন্তানের কাছে থাকিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করেন এবং প্রিয়জনগণ দ্বারাও কত সেবা শুশ্রূষা, কত সহানুভূতি ও শুভকামনা

করাইয়া রুগ্ন সন্তানকে ধন্য করেন। এই ত রোগে ব্রহ্মযোগ ও মানবযোগ উভয়ই সম্ভোগ হয়; নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশব তাই বলিলেন, "রোগে শোকে যোগে নিমজ্জিত হই।" "বিষম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে, মা, তুমি আমার আনন্দ সুধা, তুমি আমার সম্পদ ও সুস্থতা।"

ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ।

নববিধান-ঘোষণার পর হইতে পৃথিবীতে ধর্ম্মসমন্বয়ের একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ধর্ম্মসমন্বয়ের মহিমা গান করিতেছে। ইহা নববিধানেরই গৌরব সন্দেহ নাই। কিন্তু নববিধান কেবল ধর্ম্মসমন্বয়ের মত বা দর্শন-শাস্ত্র মাত্র নয়। মতে বা দর্শনতত্ত্বে ইহা মানা বা ঘোষণা করা সহজ, কিন্তু জীবনে সাধন ও চরিত্রে প্রদর্শন সামান্য কথা নয়। তাহা ছাড়া, ইহা যে জীবন্ত বিধাতার বিধান এবং বর্ত্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম। নববিধানপ্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্রই ইহা প্রথমে ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ধর্ম্মবিধানের বিশেষ ভাব সমন্বয় করিয়া জীবনে সাধন ও প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত হিন্দুত্ব মহাযোগ, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব পুত্রত্ব, পাপ-বোধ-নীতি ও সেবা, চৈতন্যধর্ম্মের বিশেষত্ব ভক্তির উন্মত্ততা ও প্রেম, এসলাম ধর্ম্মের বিশেষত্ব নিষ্ঠা ও একেশ্বরবিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব বাসনা-নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্য, শিখধর্ম্মের বিশেষত্ব শিষ্যত্ব, ইহুদী ধর্ম্মের বিশেষত্ব আদেশ শ্রবণ ও পালন, এই সমুদয়ই তিনি নিজ জীবনে আত্মস্থ করিয়া এক অখণ্ড মানবত্ব লাভ করিয়াছেন; এবং তদ্দ্বারা ইহাকে যুগধর্ম্ম মানবধর্ম্মবিধান বলিয়া সপ্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অথচ তিনি আপনাকে নববিধানের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। নিজকে কেবল অসাধারণ মানব মাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কারণ মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারিবে। এইজন্য তিনিই বর্ত্তমান যুগের মানবাদর্শ।

পাপ-রোগ।

পাপ মনের রোগ। মনের দৌর্ব্বল্য হইতেই পাপ-রোগের উৎপত্তি; মনের বিকৃতি হইতে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; তাহা হইতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা ও অহং ষড়রিপুর উত্তেজনা। এ সকল কেবল যে মনকেই বিকৃত করে, রুগ্ন করে, তাহা নয়, শরীরের রোগ উৎপন্ন করে। কাম ক্রোধ লোভ হইতে যে প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরের কত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা কেনা জানে? অতএব শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে, এই সকলের সংযম বা দমন বিশেষ আবশ্যক। এই সকল রোগের উত্তেজনা হইতে রক্ষা পাইবার মহৌষধ প্রার্থনা। জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বয়ং আত্মার চিকিৎসক হইয়া, সকল প্রকার মনের রোগ নিবারণ করেন। আবার তাঁর অনির্ব্বচনীয় বিধানে পাপ-রোগের উত্তেজনার পরেই মনে অনুতাপ উদ্দীপন হয় এবং তাহা হইতে প্রার্থনা বা আকুল ক্রন্দনের ফলে মনে ধর্ম্ম-বল লাভ হয় এবং মনঃসংযম ও পাপদমন হয়। মনের সুস্থতা ও শান্তিতে শরীরেও সুস্থতা ও সবলতা আসে।

—•—

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

মৃত্যু:—

হে মৃত্যু, তুমি ঈশ্বরের দূত। আমরা মোহবশতঃই তোমাকে ভয়ানক বলিয়া মনে করি। কত উত্তপ্ত ললাটে সুশীতল জলধারা সিঞ্চন করিয়া তুমি স্নিগ্ধ করিয়াছ, কত ব্যথিত প্রাণে তুমি বিশ্রামের শান্তি দান করিয়াছ, তাহা কে বলিতে পারে? লজ্জা এবং অপমান, দারিদ্র্য, অত্যাচার এবং সুদীর্ঘ রোগযন্ত্রণা হইতে ভগবানের সন্তানগণকে তুমি মুক্ত করিয়াছ। তুমি লাঞ্ছিতকে গৌরবের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছ। তুমি দীন-হীনকে সাধুর পদবী দান করিয়াছ, তুমি যীশুকে দেবত্বের মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছ। তুমি তাহারই নিকটে ভীষণ, যে ভগবানকে তুচ্ছ করে। আমাকে তুমি প্রত্যেক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে, প্রত্যেক শক্তির অনুসরণ করিতে, এবং অন্তহীন আনন্দ-ধামের জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করিতেছ। হে পার্থিব পরিসমাপ্তি, মেঘের অন্তরাল হইতে যখন তোমার প্রকাশ দর্শন করি, অনির্ব্বচনীয় আশা ও বিশ্বাসে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠে এবং শান্তি ও গৌরবের আমন্ত্রণ আমি শুনিতে পাই। তুমি দূরেও বট, আবার তুমি নিকটেও বট; কত নিকটে, তাহা কে বলিবে? হে মহাবল, ইতিমধ্যেই তুমি আমাকে তোমার আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়াছ।

বিশ্বাস:—

আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর। আকাশ ত শূন্য নহে, কিন্তু ঈশ্বরের সত্তাতে পরিপূর্ণ। যদি ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস কর, তবে নিঃসম্বল হইয়াও তোমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। যদি ঈশ্বর তোমার সহায় হন, তবে নিরাশ্রয় হইয়াও সাহায্যের চাও, সকলেই তোমার। যদি ঈশ্বর তোমার পক্ষে থাকেন, তবে যত লোকেই তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক না কেন, তোমার জয় হইবেই হইবে।

ঈশ্বরের নিকটতর:—

কখন কখন ঈশ্বর আমাকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করেন, আবার কখন কখন আমাকে দূর হইতে সুদূরে নিক্ষেপ করেন। যিনি অনন্ত প্রেম, তাঁহার সমীপস্থ হওয়ার ত শেষ নাই। অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিকটতর হইব। এই

নৈকট্যের অর্থ সাদৃশ্য—তাঁহারই মত হওয়া। তাঁহার মত হওয়া ত ফুরাইবার নহে; অনন্তকাল ধরিয়া আরও, আরও, আরও তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিব। যখন তাঁহার খুব নিকটে যাই, তখন তাঁহার মধ্যে অমরাত্মাদিগকে দর্শন করি। তাঁহারা ঈশ্বরের বক্ষে বাস করিতেছেন। আমার ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন, কি আমার স্বর্গ ঈশ্বরের মধ্যে, তাহা জানি না; কিন্তু স্বর্গ এবং ঈশ্বর আমাকে প্রতিদিনই আকর্ষণ করিতেছেন। আমি বুঝিতেছি যে, যাঁহাদের ভালবাসি, স্বর্গে ঈশ্বরের বক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব।

অধ্যাত্মজ্ঞান :—

আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের নিকটে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করে। তিনি যে সৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আমাদের নিকটে সেই বার্ত্তা ঘোষণা করে। আলোক এবং ছায়া, রূপ এবং বর্ণ চক্ষুর নিকটে সেই সত্যস্বরূপকেই দেখাইয়া দেয়। প্রকৃতির শব্দ এবং মানবের কণ্ঠধ্বনি—যাহারা মৃত এবং অতীতের গর্ভে বিলীন, যাহারা অজাত এবং ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন—তাহাদের নানা ভাষায় অসংখ্য কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী—গভীর নিশীথের প্রতিধ্বনি, উষা এবং সন্ধ্যার অস্ফুটরব, দিবসের হাস্য এবং কোলাহল—এই সমুদয় শব্দ সৃষ্টির প্রাক্কালে নিস্তব্ধতার মধ্যে লুকায়িত ছিল। ফুলের সৌরভ এবং চন্দন ও ধূপ ধূনার সুগন্ধের মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত আছে যে, হে বিশ্বদেব, তুমি এই বিশ্বমন্দির পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ। মলয়বায়ুর সুকোমল স্পর্শ, নির্ম্মল জলধারার সুশীতল অভিষেক, এবং সূর্য্যালোকের আলিঙ্গনের মধ্যে আমরা প্রকৃতির স্নেহহস্তের স্পর্শ অনুভব করি, এবং পাপনির্ম্মুক্ত মানবাত্মা কিরূপে ধ্যান সমাধিতে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায়, তাহার যেন অল্প অল্প আভাস পাই।

হে প্রভু, আমার আত্মাকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে, আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যেন পুরোহিতরূপে তোমার পূজা ও বন্দনা করে, সমুদয় বিশ্বকে যেন আমার অন্তরে আনয়ন করে, যেন স্বর্গ ও পৃথিবীকে এক বলিয়া ঘোষণা করে, যেন জড় ও চৈতন্যকে তোমারই ছায়া ও রূপ বলিয়া দেখাইয়া দেয়। ইহাই আমাদের ইন্দ্রিয়গণের পবিত্রতম উদ্দেশ্য, ইহাতেই তাহাদের শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা।

বিশ্বাস এবং অনুপ্রাণনা :—

বিশ্বাস এবং অনুপ্রাণনা সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ভাবে স্বর্গের সত্য দর্শন করিবে, এরূপ আশা করিও না। জ্যোতির্ম্ময় শুভক্ষণ অনেক দিন পরে পরে মানবজীবনে উদয় হয়। এইরূপ অনুপ্রাণনার সময়ে যাহা সত্য বলিয়া লাভ করিবে, বিশ্বাসের দ্বারা সেই সত্যকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিবে। যে পরিমাণে অনুপ্রাণনা, সেই পরিমাণে বিশ্বাসের প্রয়োজন। নতুবা অনুপ্রাণনা বন্ধ হইয়া যাইবে।

আত্মবৎ হও :—

প্রতিদিন উপাসনা-যোগে পরমাত্মার মধ্যে নবজন্ম লাভ কর। তুমি মানুষ হইলেও তোমার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহা ধ্যানযোগে দর্শন কর। তোমার আপনার উচ্চতম প্রকৃতিই তোমার জীবনের অন্ন পান হউক। মহাপুরুষদের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা কর। পবিত্রতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ কর, তোমার পশুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

সংসারে ব্রহ্মসাধন।*

এখানে যে জনসমাজ দেখিতেছি, এখানেও যে কোলাহলে কর্ণভেদ হয়, এখানে সাংসারিকতার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ, এখানে তপস্যার বাধা হইবার সম্ভাবনা, এই বলিয়া সংসারত্যাগী বনান্বেষী সাধক আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সম্মুখে নগর, তাহাও পশ্চাতে ফেলিয়া মনে করিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের সাধন করিব। প্রাচীন হিন্দুগণ সমুদয় ত্যাগ করিয়া, যেখানে লোকালয় আছে, কার্য্য আছে, বিষয়চিন্তা আছে, সমুদয় ত্যাগ করিতেন। দশ ক্রোশ, একশ ক্রোশ ক্রমাগত চলিলেন, সেখানেও লোকের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল; বলিলেন, এ স্থানও আমার জন্য নহে। সমুদয় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে লোকের সমাগম নাই। দেখিলেন, সেখানে আর পৃথিবীর কোলাহল ক্রোশ ক্রোশান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল না, পৃথিবী তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিলেও সেখানে গেল না, সংসারের শব্দ, সংসারের বস্তু সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, লব্ধ হয় না। যোগী উপযুক্ত স্থান পাইয়া মনের আনন্দে যোগারম্ভ করিলেন। যতক্ষণ সেই স্থান অন্বেষণ করিয়া পান নাই, এ দেশ ছাড়িয়া ও দেশ, এ নগর ছাড়িয়া ও নগর, এ পল্লী ছাড়িয়া ও পল্লী, এইরূপে এক মনুষ্যহীন নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। যাই সেইরূপ স্থান পাইলেন, অমনই তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাচীন রীতি এই ছিল; বর্ত্তমান রীতি কি? প্রাচীনকালে বনবাসী হইয়া সাধক ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতেন; বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর-সহবাস সম্ভোগের পদ্ধতি কি? যদি শতবার বল, সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উহা প্রথম পরিচ্ছেদ। বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া পরিশেষে

* (আচার্য্যের উপদেশ—রবিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক।)

অনেকের মনে নিরাশা অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিতে গিয়া মনুষ্য দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। হয় সংসার জয়ী হইবে, নয় সংসারত্যাগীর কল্পিত ধর্ম্ম লাভ করিবে; সংসার ঈশ্বর একত্র করিয়া কেহ সুখী হইতে পারিবে না। এ পুরাতন মত আর দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য বলি, ঈদৃশ মতকে ভ্রম বলিয়া বিদায় করিয়া দাও। তর্ক করিয়া এই মত স্থির রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সাধনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে, কি ভয়ানক রণক্ষেত্র, সংসার এবং ধর্ম্মে কি প্রবল বিবাদ! বিচার করিয়া, বহু চিন্তা করিয়া স্থির হইল, সংসার ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে বনবাসী হইয়া যোগাভ্যাস করিব। বনবাসী হইয়া তপস্যাচরণ, সেই পথ কি আমাদিগের অবলম্বনীয় নহে? বনবাসী ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারে না। এ দেশ ও দেশ করিয়া কি আমাদিগকে সেই বন অন্বেষণ করিতে হইবে? সে বন কোথায়? কোথায় গেলে বনবাসী ব্রাহ্ম হওয়া যায়? সংসারকে পদ দ্বারা বিদলিত না করিলে শান্তিলাভ করা যায় না, কিন্তু সে বন কোথায়? ভূগোল পাঠ করিয়া দেখ, ধর্ম্মরাজ্যের কোন্ দিকে গেলে সেই বন উপলব্ধি হইবে? প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গেলে উপদ্রব কমিয়া যায়, এই ভাবিয়া বনে গমন করিব। কিন্তু এই বন-গমনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কেতে গমন করিব। বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া যুক্তি দ্বারা মূল গ্রহণ করিব, অসার পরিত্যাগ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিব।

যদি বাহ্যে সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাও, এক সংসার ছাড়িয়া আর এক সংসারে গিয়া পড়িবে। বাহিরে সংসার পরিত্যাগ করিলেও যে রিপুগণের অতীত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা নহে। সেই জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সেখানেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সংসার ছাড়িয়া যে পথে যাও, দেখিতে পাইবে, সম্মুখে উহা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চল্লিশ বৎসর একজন ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অদ্যাপি যৌবনকালের সমুদয় ব্যাঘাত বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদূর আসিয়া বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখনও একটা না একটা লালসা লোভ দেখাইতেছে; মনের ভিতরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে। যত চলি, এ পথের অন্ত নাই, যোগ লাভ দূরের কথা। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বনের ভিতরে প্রবেশ না করিলে, ঈশ্বরের কাছে বসিবার উপায় নাই। সংসারলালসা যতদিন থাকিবে, দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতকাল থাকিবে, গভীর আনন্দ-সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। যথার্থ আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে সম্পূর্ণ বনবাসী হওয়া কর্ত্তব্য।

যথার্থ সাধক ক্রমাগত মনের ভিতরে চলিবেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের ভিতরে যে যে স্থানে প্রলোভন আছে, উহা ছাড়িয়া চলিবেন। সে চক্ষু এমনি নিপীড়ন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে, যেন সেখানে সংসারের একটি বস্তুও যাইতে না পারে। সেখানে গিয়া বিষয় অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভক্ত করিলে, তদপেক্ষা আরও একটী গভীর স্থানে গিয়া প্রবেশ কর। সেখানেও সংসারের অত্যাচার উত্তেজনা একবারে যায় না। অন্তরে এক স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গ, এইরূপ সপ্ত স্বর্গে উত্থিত হইলেও, একটী না একটী রিপুর আক্রমণ থাকিয়া যাইবে; মনের মধ্যেও বিঘ্নপূর্ণ প্রলোভনপূর্ণ এক একটী নগর প্রকাশিত হইবে। মনকে ভেদ করিয়া আরও গভীরতর মধ্যে বন অন্বেষণ কর। এমন করিয়া মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ চলিতে থাকিবে, উপাসনা গভীর ভাব ধারণ করিবে। এমন স্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে, যেখানে পৃথিবীর সংস্রব যাইতে পারে না। হিমালয়ের উপরে নহে, সাগরপারে নহে, মনের ভিতরে এমন স্থান আছে, যেখানে যোগী যোগ সাধন করেন, ভক্ত উপাসক উপাসনা করেন, সাধন করেন, ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করেন। উপাসনা করিতে করিতে, সাধন করিতে করিতে ভিতরে গিয়া একটী সুন্দর স্থান পাইবে। আজ যে স্থান পাইয়াছ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন চেষ্টার দ্বারা সেই স্থান লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন, যেন এ জীবন সেই স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষেপণ না হয়!

আমরা সংসার ছাড়িব না, ভিতরে গমন করিয়া বেশ একটী চমৎকার স্থান পাইব। সেখানকার ঘাসগুলি কেমন সুন্দর, কেমন অপূর্ব্ব পুষ্প সকল শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মনোহর পাখীগুলি ডাকিতেছে, এই সেই বন, চিরদিন যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম। এখানে বসিয়া যোগী হইয়া যোগারম্ভ করিব। এখানে স্তবস্তুতি করিয়া দেব দর্শন লাভ করিব, মনোহর ভাব উপার্জ্জন করিব। এ স্থান যতদিন না পাইতেছি, ধ্যান-ভঙ্গের পদে পদে সম্ভাবনা। যেমনই পাপ আসিয়া হৃদয়ে দেখা দিল, কোথায় গেল ধ্যান, কোথায় গেল তপস্যা, কোথায় গেল যোগীর যোগ, কোথায় গেল প্রেমিকের প্রেম। চন্দ্র ঘনমেঘে আবৃত হইল, ঝড় উঠিল, শক্ত গৃহ আন্দোলিত হইল, তপস্যার ঘর ভাঙ্গিয়া গেল, যত্নের ধন হারাইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই পাপ, চক্ষু খুলিলেও সেই পাপ। চল্লিশ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর সাধন করিলাম, কোথা হইতে কে আসিয়া সর্ব্বনাশ করিল। এইরূপে দিন যায়। যোগী নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সংসার ছাড়িলেন, সব ছাড়িলেন, প্রলোভন কিছু নাই, আবার নূতন প্রলোভন উপস্থিত হইল; দুষ্প্রবৃত্তি সকল লুক্কায়িত ছিল, নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল, আবার পুনরুদ্দীপিত হইল। চারিদিকে প্রবঞ্চনার জাল বিস্তারিত দেখিয়া যোগী আকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভু, বিপন্ন যোগীকে উদ্ধার কর। পঞ্চাশ বৎসর সংগ্রামে গেল, আবার কি এ জীবন সংগ্রামেই অতিবাহিত হইবে? ইহকালে আশা পূর্ণ হইল না, মৃত্যুর পর কি বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?" ভক্তবৎসল যোগীর প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়যন্ত্রে আঘাত করিলেন, সঙ্কেত দ্বারা স্বর্গীয় ভাবায়

বলিয়া দিলেন "উচ্চতর স্থানে যাও," যোগী অমনই চলিলেন, সেই উচ্চ স্থানে গিয়া প্রকৃত বন পাইলেন। নিরাপদ স্থান কাহাকে বলি, যেখানে সংসারের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে। সংসার ঋণীকে ধরিবে। ঋণ পরিশোধ করিয়া না গিয়া কোথাও আরাম নাই। ঋণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। যত দেনা পাওনা আছে, পরিশোধ করিয়া না গেলে কষ্ট পাইতে হইবে। তোমার মন বেশ সংযত হইল মনে করিলে, বিষয়-কামনা কিন্তু সঙ্গে রহিল, তার বস্তু সে অন্বেষণ করিয়া লইবেই। এজন্য বলি, রিপুগণকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিয়া, সংসারের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া বনে গমন কর। আর কেহ তোমায় সেখানে বিরক্ত করিবে না, সকলেই অনুকূল হইবে, যোগের পক্ষে সহায় হইবে। বন সেখানে, যেখানে বিষয়-চিন্তা নাই। এখানে উপাসনা আরাধনা একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। ঈশ্বরচিন্তা, ক্রমাগত ঈশ্বরচিন্তা, সেখানে আর বিষয়চিন্তা আসিতে পারে না। বনবাসী ব্রাহ্ম ব্রহ্মেতে মত্ত হন। অন্য কামনা আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে না। যে পরিমাণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়, সেই পরিমাণে সেই সাধক বনবাসী হন নাই। যে পরিমাণে একাগ্রতা, সেই পরিমাণে বনবাস। বনে সংসার-চিন্তা আসিয়া প্রাণকে ঈশ্বর হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, বনে পৃথিবীর মায়াজাল আসিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকলই বনের বাহিরে পড়িয়া রহিল, নিবিড় বনে সংসারের শব্দ গেল না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এই পৃথিবীতেই সুফল লাভ করিলেন, সংসারের ভিতরে থাকিয়াই বনের মধ্যে থাকিলেন, মনকে আর কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিল না, সংসারকে জয় করিলেন, একদিনের ধ্যানে পঞ্চাশ বৎ রের কাগা সমাধা হইল। বনের বাহিরে চলিলে ধ্যান ভঙ্গ হইল, যাই বনের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, একটী পাপচিন্তাও আর সেখানে আসিয়া উত্যক্ত করিতে পারিল না। সেখানে একটী তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই; ঈশ্বরের আরাধনা ধ্যান সুস্থ সুগভীর হইবে। এই প্রকার স্থান অন্বেষণ করিয়া, বনের মধ্যে বসিয়া সাধন কর, ঈশ্বর-সহবাসের প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

—•—

সর্ব্বত্যাগ।

(অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ)

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র মহামনা কচ নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন, যশ, মান, প্রতিষ্ঠায় ভূষিত হইলেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিচিত্র বিষয়ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার বিচারশীল চিত্ত প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই বিচারে প্রবৃত্ত হইত। তিনি বিচার করিতেন, এই সব বিষয় কি তাঁহাকে আত্যন্তিক পরিতৃপ্তি দিতে পারিবে? তিনি কি এই সকল দৈহিক ও মানসিক ভোগ সম্পৎ প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াও চিরশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন? এই সব বিদ্যা, এই সব যশ মান, এই সব ভোগ বিলাসের বিষয় কি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অভাবের উর্দ্ধে উন্নীত করিয়া দুঃখলেশবিহীন নিরাবিল আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করিবে? তাঁহার বিবেক বুদ্ধি সর্ব্বত্রই দোষ-দর্শন করিত। কিছুতেই তিনি নিরুদ্বেগ হইতে পারিলেন না। সর্ব্বপ্রকার অভাব, ভয় ও উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি লাভের কোন উপায়ই তিনি স্বীয় বিচারে আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

অবশেষে তিনি তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানী পিতার সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার প্রাণগত সমস্যার সম্যক্ সমাধানের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি সুপণ্ডিত পুত্রকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বত্যাগই সর্ব্বপ্রকার অভাব, উদ্বেগ ও ভয় হইতে মুক্তি এবং ঐকান্তিক শান্তিতে নিত্য স্থিতি লাভ করিবার একমাত্র উপায়; অতএব, হে পুত্র, তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া মুক্তি ও শান্তি লাভ কর। ব্যাকুলাত্মা কচ পিতার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভোগ সম্পৎ, কর্ম্মাড়ম্বর, যশ মান, পাণ্ডিত্য-বিলাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সংস্রব পরিহার-পূর্ব্বক বিজন অরণ্যে গমন করিলেন এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় শান্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত তাহাতেও শান্তি লাভ করিল না, ভিতরে বিক্ষেপের তরঙ্গ উপশম হইল না, বুদ্ধিগত সংশয়ের দ্বন্দ্ব নিবারিত হইল না।

তিনি বিচার দ্বারা নির্দ্ধারণ করিলেন যে, গুরুর বাক্য সম্যক্‌রূপে তিনি প্রতিপালন করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অশান্তি দূরীভূত হয় নাই। গুরুদেব তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে বলিয়াছেন; কিন্তু তিনিত সন্ন্যাসাশ্রমের উপযোগী দণ্ড, কমণ্ডলু, কন্থা, কম্বল, কৌপীন প্রভৃতি কতক কতক বিষয়ের সংস্রব রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই হেতুই তাঁহার শান্তিলাভ হইতেছে না। এই প্রকার বিচার করিয়া বৈরাগ্যের চরম কঠোরতা অবলম্বন করিলেন; কৌপীন কম্বল প্রভৃতি সবই ত্যাগ করিলেন, কেহ বিনা যাচ্ঞায় আহার প্রদান করিলে হাতে তাহা গ্রহণ করিতেন, পিপাসার্ত্ত হইলে নদীতে গিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিতেন, শুধু বাতাহারী হইয়াই অনেক দিন অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যার পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ধারণা হইতে লাগিল যে, তাঁহার সর্ব্বত্যাগ পূর্ণ মাত্রায়ই হইয়াছে এবং শীঘ্রই পরা শান্তি মিলিবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অতিবাহিত হইতে লাগিল, কঠোর তপস্যা চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে উদ্বেগশূন্য হইল না। তাঁহার শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইল বটে, কিন্তু প্রাণে আকাঙ্ক্ষিত নিরাবিল নির্ভীক নিশ্চিন্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইল না। অথচ তিনি ভাবিয়া পাইলেন না যে, তাঁহার সর্ব্বত্যাগের কি বাকী আছে। শান্তির জন্য ব্যাকুল সাধক তখন নিরুপায় হইয়া পুনরায় গুরুর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং কাতর প্রাণে নিজের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন—

তাত সর্ব্বং পরিত্যক্তং কন্থা বেণুলতাদ্যপি।
তথাপি নাস্তি বিশ্রান্তিঃ স্বপদে কিং করোম্যহম্॥

হে পিতঃ, আমি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন কি, কন্থা, দণ্ড প্রভৃতিও বর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু তথাপি স্বপদে বিশ্রান্তি লাভ হইতেছে না,—আত্মস্বরূপে নিশ্চলা স্থিতি ও পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এখন আমি কি উপায় অবলম্বন করিব?

দেবগুরু বলিলেন যে, বৎস, তোমার সর্ব্বত্যাগ হয় নাই, সেই হেতুই বিশ্রান্তি-লাভও হইতেছে না। কচ শুনিয়া অবাক। তাঁহার এমন কি আছে, যাহা তিনি ত্যাগ করেন নাই? কি ভোগ্য বিষয় তিনি লুকাইয়া ভোগ করিতেছেন? কোন্ সঞ্চিত অর্থ তাঁহার শান্তির পথে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে? তিনি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। পিতা তাঁহাকে চিন্তামগ্ন ও বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেখ, তুমি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগ ও বাহ্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছ, তাহা সত্য; কিন্তু সংসারে যাবতীয় কর্ম্ম ও ভোগ হইতে বিরত হইলেও সর্ব্বত্যাগ হয় না, যথার্থ সন্ন্যাস হয় না, পরাশান্তির অধিকার লাভ হয় না। তবে সর্ব্বত্যাগ কাহাকে বলে?

চিত্তং সর্ব্বমিতি প্রাহুস্তৎ ত্যক্ত্বা পুত্র রাজসে।
চিত্তত্যাগং বিদুঃ সর্ব্বত্যাগং সর্ব্ববিদোজনাঃ॥

যাঁহারা যথার্থ সর্ব্ববিৎ, তাঁহারা চিত্তকেই সর্ব্ব বলিয়া জানেন এবং চিত্তত্যাগ কই সর্ব্বত্যাগ বলিয়া উপদেশ করেন। হে পুত্র, তুমি চিত্তত্যাগ করিতে পারিলেই বস্তুতঃ সর্ব্বত্যাগী হইবে এবং পরমানন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকিবে। চিত্তই সংসারের মূল, সংসার চিত্তেরই বহির্বিকাশ মাত্র। নিজের চিত্তের স্থূল ও সূক্ষ্ম বাসনা দ্বারাই সংসার তৈয়ারী। চিত্তত্যাগ না হইলে, বাহ্য জগতের সহিত বাহ্যতঃ সংস্রবত্যাগ হইলেও, ভিতরে সংসারত্যাগ হয়না, নিজের সংসার নিজের সঙ্গেই থাকে; সুতরাং সংসারজনিত অশান্তিও থাকে। চিত্তত্যাগ হইলে, বহির্জ্জগতের সহিত বাহ্যতঃ যে কোন সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াও, সংসারত্যাগী ও উদ্বেগবিহীন হওয়া যায়।

তত্ত্বদর্শী গুরু এই উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন এবং শিষ্যও তীব্র পুরুষকারের সহিত চিত্তত্যাগের জন্য প্রযত্নশীল হইলেন। কিন্তু তিনি সাধনায় ব্রতী হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যাহাকে দেখা যায়, ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহাকে সহজে ত্যাগও করা যায়। কচ চিত্তের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়া; তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করেন, চিত্তকে কোন প্রকারেই ধরিতে, করায়ত্ত করিতে তিনি সমর্থ হন না। চিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে ধরা যায় না, এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা তাহাকে বর্জ্জনও করা যায় না। চিত্তকে চিন্তার বিষয়-রূপে উপস্থিত করাও কঠিন। কারণ চিন্তাব্যাপারের কর্ত্তারূপে সে সর্ব্বদা চিন্তনীয় বিষয়ের পশ্চাতেই বিদ্যমান থাকে, এবং যতই তীব্রতার সহিত চিন্তা করা যায়, চিত্ত ততই প্রবলভাবে কার্য্য করিতে ও চিন্তার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। চিন্তা দ্বারা, বিচার দ্বারা বা তপস্যার দ্বারা, যে ভাবেই চিত্তকে বর্জ্জন করিবার প্রচেষ্টা করা যাক না কেন, সেই প্রচেষ্টার ভিতরেই চিত্ত আপনার সত্তা ও শক্তির বিকাশ সাধন করে এবং বিক্ষেপ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে, কোন প্রকারেই তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে নিরস্ত বা দূরীভূত করা সম্ভব হয় না।

(১৩৪৩, জ্যৈষ্ঠের "ব্রহ্মবাদী" হইতে উদ্ধৃত)

(ক্রমশঃ)

ভগিনী সুজাতা।

আবার এসেছি আজ ভগিনী "সুজাতা",
এসেছি বলিতে আজ নূতন বারতা,
সাধক "পরেশ" পিতা, সাধ্বী "মহালক্ষ্মী" মাতা
পেয়েছ তাঁদের মন্ত্র শৈশব জীবনে,
সে দীক্ষা সাধন কর আজ একমনে।

(২)

তাঁহার আদেশে আজ নবদীক্ষা লয়ে,
চল তাঁর পথে আজ নূতন হৃদয়ে;
প্রেরিত "প্রতাপ" কত, বিধানের নবতত্ত্ব
দিয়েছেন তোমাদের নবীন হৃদয়ে,
আরও নূতন হও সেই শিক্ষা ল'য়ে।

(৩)

এখনো ভুলিনি ভগ্নি! সেদিনের কথা;
তোমরা দুইটী বোন "হামিদা" "সুজাতা"
ছাত্রীর মতন এসে, আমার নিকটে ব'সে
আগ্রহে পড়িতে কত—সেই সব কথা
ভুলিনি এখনো জেনো ভগিনী "সুজাতা"।

(৪)

ভগিনী "হামিদা" আজ তাঁহার বিধানে,
আরও নূতন দীক্ষা পাইয়া জীবনে,
মিলেছেন সেই স্থানে, মহাযোগে মহাধ্যানে;
এখানে সাধক স্বামী তাঁর সনে মিলে
"দেবেন্দ্র" দেবেন্দ্র আজ সেই যোগবলে।

(৫)

সেই পথে এসে আজ ভগিনী "সুজাতা",
নবীন বিধানে হও নবীন সুজাতা,
সেথানে "রাজেন্দ্র" ভাই, তুমিও বসিয়া তাই
রাজযোগে যুক্ত হও "রাজেন্দ্রের" সনে,
যোগেতে যোগিনী হও এ নববিধানে।

(৬)

আর কিছু নাই আজ মোর বলিবার,
"সুজাতা" হইয়া হও সুজাতা আবার,
তিনি যে জীবন-স্বামী, নবীন বিধানে তুমি
জীবনেতে সার কর সেই হরিধনে,
পুত্র কন্যা লয়ে তাঁরে ডাক একমনে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

নূতন সঙ্গীত।

রামপ্রসাদী।

আর কি যমের ভয় রেখেছি ?
(ও যে) মৃত্যুঞ্জয়কে মা পেয়েছি।
মৃত্যুটা যে মায়ার ফাঁকি বিলক্ষণ তা টের পেয়েছি,
(ঐ) প্রাণের প্রাণে প্রাণ পেয়েছি আর কেন বল্ মস্তে গেছি।
(আমি) তোর আসামী নইরে শমন, মার খাসের প্রজা হয়েছি,
এই খাসমহালে মায়ের কোলে,
(নব) শিশুদলে দেহঘর বেঁধেছি।
(আমার) আমিটাকে মাকে দিয়ে, ম'রে চিরতরে বেঁচেছি,
(কেশব) ভাইএর কপালে দিয়ে ফোঁটা,
যমের দ্বারে কাঁটা দিয়েছি।
(আর) বাবনা পাপ-যমের বাড়ী, মার নামে পাড়ী দিয়েছি,
(ঐ) এস্ পার ওস্ পার একই করে
নববিধানের সাঁকোয় চড়েছি।

ভজন।

জয় সত্য সারাৎসার, জ্ঞানের আধার, অনন্ত অসীম অপার হে,
জয় প্রেম-পারাবার, মহামহেশ্বর, পুণ্যের আগার,
আনন্দসাগর হে।
তব নামগানে, স্মরণে মননে, টুটে যায় মোহ-ঘুম ঘোর হে,
ওরূপ ধ্যানে, দর্শনে শ্রবণে, হয় মহাপাপী উদ্ধার হে।
হর পাপ হর, নাশ আমি আমার, কর তোমার কর হে,
নব জীবন সঞ্চার, ব্রহ্মস্বরূপে ভর, ব্রহ্মানন্দময় কর হে।

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

—•—

(১)

(পূজ্যপাদ মেজদাদা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের আদ্যশ্রাদ্ধের জন্য রচিত)

এ কেমন, ওগো, এ কেমন, ওগো, এ কেমন পরিচয়,
জীবনের মাঝে একি অকরুণ দেখালে মরণ-ভয় !
সহসা থামিল উৎসব হাসি,
কেন গো বাজালে মরণের বাঁশি,
ভীষণ মধুর, একি তোল সুর, গভীর বেদনাময় !

আমাদের ঘরে এতদিন ধরে যে ছিল মোদের জড়ায়ে,
তোমার আলয়ে তোমার মাঝারে পড়িল সে আজি ছড়ায়ে !
অন্তবিহীন জীবনের ধারা,
তবে কেন মোরা কেঁদে হই সারা,
যাহা চলে যায়, রাখ তত পায়, তুমি যে করুণাময় !

মোহ-ঘুম এই ভাঙিতে জীবের এযেগো কঠিন চেতনা,
মায়া-মরীচিকা ভেদিয়া, রুদ্র, তাই কিহে দিলে বেদনা !
এ-হাতে যা ছিল, ও-হাতে রাখিলে,
এ-পার হইতে ও-পারে টানিলে,
ধূলি হতে লয়ে বক্ষে ঢাকিলে, সুখে রেখো, প্রেমময় !

(২)

(ময়ূরভঞ্জের রাজর্ষি শ্রীশ্রীরামচন্দ্রভঞ্জ দেওর সাংবৎসরিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

বহুদিন গত দেহ গেহ ছাড়ি, গেছ গো অমরলোকে,
তবু অচপল জ্বলিছে সরল ওরূপ মনের চোখে !
রাজর্ষি তুমি ছিলে মহাপ্রাণ,
নির্ম্মল যেন দেবতার দান,
তপ্ত মরুতে গঙ্গার জল,
করুণা মর্ত্ত্যলোকে !
আছিলে দীনের তুমি পিতামাতা ক্ষীণের শরণ ঠাঁই,
বিলাসবিহীন সাধুর মতন তোমার তুলনা নাই !
বিত্তবিভব ক্ষণিক নশ্বর,
চিত্তবিভবে তুমি যে অমর,
স্মরিলে হৃদয় পুলকে শিহরে,
সান্ত্বনা পাই শোকে !
তাই বেদনায় বিরহব্যথায় পাইগো পরম শান্তি,
জীবনে বুঝিগো জীবের স্বরূপ, মরণের ভয়—ভ্রান্তি !
এলোক ওলোক হয় একাকার,
জীবন মরণ প্রীতি-পারাবার,
মন দিয়ে পাই, চোখে যা হারাই,
দেখি তা দিব্যালোকে !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

—•—

জ্ঞান ও বিশ্বাস।

পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানপন্থী ও বিশ্বাসিদলের মধ্যে ঘোর বিরোধ চলিয়াছে। এক শ্রেণীর জ্ঞানপন্থী বলেন, জ্ঞানের পথেই ঈশ্বর প্রাপ্য, বিশ্বাসিগণ যুক্তিবিচারবিহীন কুসংস্কারী। তাঁহারা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন, জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ব্রহ্মই কেবল আছেন, আর যাহা কিছু মায়া বিকার, অতএব মিথ্যা। প্রাণ, জীবন, আত্মা এ সবই তিনি। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাহা কিছু এই রূপ রসাদি প্রকাশিত, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। জীবাত্মাকে স্বীকার না করিয়া কেবল ব্রহ্মকে স্বীকার করিলে, আমাদের দোষ ত্রুটী ও সকল বিষয়ে খণ্ডতাবোধ, এ সকলই তাহা হইলে ব্রহ্মের হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় ও এই জগৎ সংসারের অস্তিত্ব কিছুই থাকে না। অদ্বৈতবাদের মধ্যে এই সকলের অস্বীকার, এই সকলের পার্থক্য বোধ না করা, এই মত ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে গভীর সত্য আছে, তাহা ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদী বুঝেন না। সে সত্য এই যে, যোগী ব্যক্তি ব্রহ্মযোগযুক্ত অবস্থায় যখন সব ব্রহ্মময় বলিয়া দেখেন, তখন তিনি আমি সেই, একথা বলেন না, কিন্তু সেইই আমি, এই কথা বলেন। তিনি দেখেন, সব তাঁর খণ্ড প্রকাশ, আর এই সব খণ্ড প্রকাশ তাঁতে মিলিত হয়ে অখণ্ড হয়ে উঠে; তাই তিনি কখনও নিজেকে নির্দ্দেশ করে, কখনও বা অন্যকে নির্দ্দেশ করে বলেন, এই তিনি। কিন্তু আর এক শ্রেণীর জ্ঞানবাদী আছেন, যাঁহারা ব্রহ্ম আর এই সকলের পার্থক্য স্বীকার করেন, কিন্তু জ্ঞান অগ্রে, বিশ্বাস পরে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা বলেন, জ্ঞানবলে যাহা কিছু জানা হ'ল, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। জ্ঞানবলে প্রকাশমান যাহা কিছু, তাহা জানা যায়। তাঁর স্বরূপ সকলের যাহা কিছু ভূত অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে নির্দ্দেশিত, তাহাও আমরা জেনে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু এই জানার মূল্য কি? এই জানাটা ধারণা করা (idea) মাত্র। ধারণা (idea) কি বিশ্বাসরূপে পরিণত হইতে পারে? আবার এই সকল প্রকাশ, অনুভূতি ও ধারণা-রাজ্যের অতীত স্থানে যেখানে বিশ্বের অথবা আত্মার মূল, তথায় সেই পরমপুরুষ, বিশ্বজননী, আমাদের বিধানজননী বিরাজিত; তাঁকে কেমন করে সত্য রূপে দেখিতে পারি? পার্থিব জ্ঞানবিজ্ঞান ও আলোচনা দ্বারা তাঁকে অল্পই বুঝা যায়। আর সে বুঝিবার অর্থ ধারণা idea), তাহাতে কি আমাদের কাছে তাঁর সত্য প্রকাশ হইতে পারে?

কিন্তু সেই জগৎপিতা, জগন্মাতা, আমাদের সকলের জননী, বিধানজননীর প্রতি ও তাঁর এই সব স্বরূপের (যাহা অতীত হইতে আজ পর্য্যন্ত ও অনন্ত ভবিষ্যতে) প্রকাশের প্রতি যখন তিনি কৃপা করে এক বিন্দু বিশ্বাস জাগ্রত করে সত্য করে দেন আমাদের কাছে, তখন তিনি ও তাঁর এই সব স্বরূপ আমাদের কাছে সত্য হয়; আর যখন তিনি ও তাঁহার এইসব স্বরূপ আমাদের কাছে সত্য হল, তখন তাহা জ্ঞানাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমরা জানিতে, বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারি। এ স্থলে জ্ঞানকে পরিত্যাগ একেবারেই করা হইতেছে না, বরং বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হয়ে জ্ঞানকে বরণ করা হইতেছে। অতএব জ্ঞান অগ্রে, বিশ্বাস পরে, তাহা নহে। কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানকে বরণ, ইহাই সত্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—•—

সংবাদ।

জন্মোৎসব—গত ২৩শে জুন, পুরী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধান-শ্রীক্ষেত্রে সম্রাটের জন্মোৎসব সম্পাদিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি সেবা করিব", ইহাই আমার জীবনের নীতি। এই সংকল্প তাঁহার সকল প্রতিনিধি এবং প্রজাবর্গের যেন হয়। সম্রাটের দীর্ঘ জীবন এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের শান্তি ও সদ্ভাব এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন আরো ঘনীভূত হউক, ইহাই প্রার্থনা হয়।

জন্মদিন—গত ১৬ই জুন, পাটনায় শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, কলিকাতা হইতে আগতা তাঁহার দ্বিতীয়া দৌহিত্রী শ্রীমতী পান্না দত্তের (শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ দত্তের কন্যা) জন্মদিন উপলক্ষে গৌরীবাবুই উপাসনা করেন। আরাধনান্তে পান্নার মাতামহী শ্রীমতী সুমতি দেবী আচার্য্যদেবের "জীবজন্ম" প্রার্থনা পাঠ করিয়া তৎপরে স্বয়ং একটী প্রার্থনা করেন। বিধানজননী তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গৃহ-প্রতিষ্ঠা—গত ১লা জুন, পুরীতে, ডাক্তার দিনকর রাওয়ের নূতন গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়। নবসংহিতা ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া সেবিকা হেমন্তকুমারী মল্লিক প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন।

ভিত্তিস্থাপন—গত ২১শে জুন, রবিবার, পুরী নববিধান নবশ্রীক্ষেত্রভূমিতে, কলিকাতার ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধা দেবীর অর্থসাহায্যে, তাঁহাদের প্রিয়তম ধ্রুব-প্রতিম দেবনন্দন শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথের স্মৃতি-মন্দির "প্রেমাশ্রমের" ভিত্তি-সংস্থাপন হইয়াছে। সেবিকা হেমন্তকুমারী মল্লিক শঙ্খধ্বনি সহকারে ভিত্তি স্থাপন করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। আশ্রমমন্দির-নির্ম্মাণের জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং ওভারসিয়ার বাবু অতুলকৃষ্ণ রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আশ্রম-নির্ম্মাণ-কার্য্যের পরিদর্শনাদির এবং ডাক্তার কৃষ্ণদাস পাল কোষাধ্যক্ষের ভার লইয়াছেন। স্থানীয় কমিটী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যাহাতে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে আশ্রমের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়, তজ্জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিবেন।

রোগ-শয্যায়—ভাই প্রিয়নাথ পুরীতে গিয়া কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়েন। এক দিন বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন ডাঃ কে, ডি, পালের চিকিৎসায় ও মার কৃপায় রোগ উপশম হইয়াছে। এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল!

পারলৌকিক—গত ২১শে জুন, কলুটোলায়, ৩৪নং রামকমল সেন লেনে, কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা কন্যা শ্রীমতী ইলার পরলোকগমনে, তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমজননী তাঁর প্রিয় কন্যাকে নিত্য স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন), ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভাইভগ্নীগণ প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, অনাথাশ্রমে ৫৲, অন্ধ স্কুলে ৫৲, প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ৫৲ এবং ভগিনীসমিতিতে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন), ১৭৪নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসু ও ডাঃ শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে দুই ভ্রাতা ২৲ টাকা করে ৪৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। তৎপর দিন, ঐ গৃহে, ইঁহাদের বড় ঠাকুরদা স্বর্গীয় দুর্গাদাস বসুর সাম্বৎসরিক দিনেও ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠতাতের পুণ্যস্মৃতিতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ২৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, আসানসোলে জামাতা শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গুহের গৃহেও শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন), ২৪।৩ বাহির মির্জাপুর রোডে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৪ঠা আষাঢ় (১৮ই জুন), ১৮নং বালীগঞ্জ প্লেসে, ডাঃ বিমানবিহারী দের নবনির্ম্মিত গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বর্গগত শান্ত সাধক ঋষি কেদারনাথ দের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মনোমোহন দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগ্নী সেবিকা হেমলতা চন্দ বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুণ্যস্মৃতিতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ২২শে জুন, পুরী নবপর্ণকুটীরে, ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবী স্বর্গীয়া নিত্যকালী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং সেবিকা হেমন্তকুমারী বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারক মহাশয়দের সেবার্থে সেবিকা হেমন্তকুমারী ১৲ দান করেন।

গত ২২শে জুন, ১—সি, প্রিয়নাথ বানার্জি ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় শরৎকুমার দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শরৎবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্ত এলাহাবাদ হইতে আসিয়া কলিকাতায় ঐ বাড়ীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন।

আনন্দের সংবাদ—আমরা অতীব আনন্দের সহিত কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" বৃহৎ পুস্তকের পুনর্মুদ্রণসংকল্পে যে আবেদনপত্র ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির অন্তর হইতে তাহার সাহায্যার্থ মুক্তদানের অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে। পিটাপুররাজকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রাও বাহাদুর ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও ১০০৲ টাকা এবং অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন্স্ জজ এলাহাবাদের আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবাবুই বইখানির পুনর্মুদ্রণের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন এবং শুধু পরিশ্রম বা যত্ন দিয়া নহে, যথাসাধ্য অর্থদানেও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শ মণ্ডলীর সকলে গ্রহণ করিলে, সহজেই বৃহৎ পুস্তকখানির জন্য অর্থাদি যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা অনায়াসেই সংগৃহীত হইবে, আশা করি। পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণে অন্যূন ৩০০০৲ টাকার প্রয়োজন।

ঋষি প্রতাপচন্দ্র—লক্ষ্ণৌ হইতে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন:—"ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যখন বিহার অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে যাইতেন, তখন 'আরা' নগরীতেও গমন করিতেন। সেখানে তাঁহার অনুগত বন্ধু আমাদের মণ্ডলীর স্মরণীয় অগ্রজ ভ্রাতা স্বর্গীয় সাধক ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র মহাশয় বাস করিতেন। তিনি মজুমদার মহাশয়ের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপযোগী আয়োজন করিয়া, প্রেরিত-প্রবরের থাকিবার জন্য উদ্যান-সংযুক্ত রাজপ্রাসাদতুল্য এক আলয় ও অন্য অন্য সর্ব্ব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। সেখানে সাধন, ভজন, ধর্ম্মালোচনা ও বক্তৃতা প্রসঙ্গাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইত।" এই বিষয়টী ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত "প্রেরিত-প্রবর ঋষি প্রতাপচন্দ্রের জীবনী" ভিতরে বাদ পড়িয়া গিয়াছিল।

দান-প্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

জানুয়ারী, ১৯২৬—শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার দাস পিতামহের সাম্বৎসরিকে ৪৲, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী দৌহিত্রীর নামকরণে ৫৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মাতৃ-সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র দত্তের শিশু পুত্র শ্রীমান্ সুধীরের জন্মদিনে মাতৃদেবী ১৲ এবং শিশুর মেজো পিসী শ্রীমতী শান্তিলতা রায় ১৲, অধ্যাপক পূর্ণেন্দ্রনাথ মজুমদার গত জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের মাসিকদান ৬৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমান্ অমিয়কুমার মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাসের জন্মদিনে পুত্রকন্যাগণ ২৲, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মধুসূদন রাওর সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধে পুত্রকন্যাগণ ১০৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন পত্নীর ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ২৲, কাপ্তান সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল মাতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, রায় ব্রাদার্স ৫৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পিতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৩৫৲, স্বর্গীয় দেবীদত্ত ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৪২৲, স্বর্গীয় জগদীশ গুপ্ত ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ১৭৷৷০, স্বর্গীয় কানাইলাল সেন ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৩৫৲, স্বর্গীয় চুকড়ি ঘোষ ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ১০৷৷০, স্বর্গীয় ভুবনমোহন ঘোষ ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৭৲, স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৭৲, স্বর্গীয়া নলিনীবালা বানার্জ্জি ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৫৲, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দত্ত ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ২৷৷০, স্বর্গীয়া সুষমা দত্ত ফণ্ডের বার্ষিক সুদ ৩৷৷০, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান দুইমাসের ২৲, শ্রীমতী সন্তোষিণী রায় পুত্রের শুভবিবাহে ৫৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বার্ষিকদান ৬৲ টাকা।

জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে, গত ১৮ই এপ্রিল, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুই বৎসরের জন্য গঠিত হইয়াছে :—শ্রীযুক্ত তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মুঙ্গের), ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার ঘোষ, সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাঃ পি, কে, সেন মহাশয় স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র (জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের জনৈক ট্রাষ্টী) সম্পাদক হইলেন এবং সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় পূর্ব্ববৎ সহকারী সম্পাদক রহিলেন।

মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ—গত ১৮ই এপ্রিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে এক বৎসরের জন্য মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক নিম্নরূপে গঠিত হইয়াছে—

শ্রীযুক্ত তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার ঘোষ, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র, ডাঃ সত্যানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ান রেওয়াচাঁদ মিরচান্দানি, সেবক অখিলচন্দ্র রায়, কুমারী বনলতা দে, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু, শ্রীমতী মৃণালিনী সেন, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ। এই মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাঃ পি, কে, সেন স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র সম্পাদক ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় পূর্ব্ববৎ সহকারী সম্পাদক এবং ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত সহযোগী সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন।

নিবেদন।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এখন আর সব খণ্ড পাওয়া যায় না। এই বইখানিতে কেবল মাত্র সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই বইখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে ও আমাদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ অপরাধ হইবে। সেজন্য এই পুস্তক খানির নূতন সংস্করণ একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গলাতে এবং সন শকাব্দে আছে। সেই সকলের ইংরাজি সন তারিখ ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার সূচী একটু বিশদভাবে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাও আছে। সেজন্য কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ছাপাইতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। সকলের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সমাধা করা সুকঠিন। সেই জন্য সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যাহাতে আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে, তাঁর স্মৃতি (যা খুব accurately historical) এই উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা জীবনখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। টাকা কড়ি আমার নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা ;
এলাহবাদ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা।
১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ।
17th. July, 1936.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

জীবন্ত জাগ্রতরূপিণী নববিধানবিধায়িনী মা জননী, আমরা তোমাকে ডাকি, তোমাকে দেখি, তোমারই পূজা করি। তুমি সত্য মা, প্রত্যক্ষ মা, জীবন্ত মা, তোমা ছাড়া আর জীবন্ত ঈশ্বর নাই। আর যাকে লোকে কল্পনা করিয়া, মূর্ত্তি গড়িয়া, বা বিচার বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া আন্দাজে ডাকিতেছে বা পূজা করিতেছে, সে আসল মা ত নয়। তাই তোমার নবভক্ত কেশব বলিলেন, "আমার মা সত্য মা; ভারতে জেগে আছেন যিনি। সকলে কল্পনার মাকে ফেলে দিয়ে এই আমার মাকে নাও। আমার সঙ্গে এক হয়ে, এক মাকে ডাকিলে সব মধুময় হইবে।" বাস্তবিক, মা, দেখ, মানুষের কি ভ্রম! তুমি সর্ব্বত্র আছ, সকলে বলিতেছে; অথচ কেহ হয় ত মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া না পূজিলে পূজা হয় না, এই ভাবিয়া মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িতেছে। কিন্তু পূজা করিবার সময় মন্ত্র পড়িয়া বলে, "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ", এইখানে এস, এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হও; কেন না তাহা বলিয়া মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিলে কেমনে তাহার পূজা হইবে। যদি মৃন্ময়ী মূর্ত্তির ভিতর ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রার্থনা না করিলে তাহার পূজা হয় না, তবে কেন, সর্ব্বত্রই তুমি আছ, এই বিশ্বাস করিয়া তোমাকে লোকে ডাকিতে শিখিল না? এমনই স্থাপিত মূর্ত্তিতে, গুরুতে, পুস্তকেতে ঈশ্বর আরোপ করিয়া পূজা করিতেছে; অথচ সহজে তোমাকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া তোমাকে পূজা করিতেছে না। মানব-সমাজের সাধকগণের এই ভ্রম তুমি, মা, দূর কর। সত্য মা, জীবন্ত মা, তোমার পূজা বিনা যে পূজা হয় না। তাহার প্রমাণ এই, এত ধর্ম্মের আড়ম্বর করিয়াও ত জীবনে ধর্ম্ম সঞ্চার হইতেছে না। তাই জীবন্ত মা, সত্য মা, তোমার পূজা বিনা যে জীবনে প্রকৃত ধর্ম্ম সঞ্চার হইবার নয়, ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। আমাদেরও মধ্যে এখনও এ সম্বন্ধে কিছু কল্পনার পূজা, বিচার বুদ্ধি যুক্তির দেবতার যে পূজা আছে; তাই জীবন্ত মার পূজায় যে জীবন লাভ হয়, তাহা হইতেছে না। এজন্য এক এক জনের এক এক রকম দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই কারণে পরস্পরের সহিত মিলনও হইতেছে না। অতএব শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত প্রার্থনা করি, "ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর হও।" এক মা, সত্য মা, নববিধানের হরি, শ্রীকেশবচন্দ্র যে মাকে মা বলিলেন, সেই তুমিই আমাদের সবার মা হও। সকলের পূজা এক তোমার শ্রীচরণে অর্পিত হউক, সবার দৃষ্টি এক তোমার মুখের দিকে পড়ুক। যে মাকে পূজা করিয়া

কেশব বিশ্বমানবাদর্শ মানুষ হইলেন, সেই মা যে তুমি, তোমার পূজা ভিন্ন আমরা কেমনে নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবন লাভ করিব এবং কেমনেই, মা, কেশবের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে এক হইব? আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা একই মা তোমাকে পূজা করি এবং কেশবের সহিত এক-হৃদয় এবং একাত্মা হইয়া পরস্পরের সহিত এক হই; তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া কাতরপ্রাণে এই প্রার্থনা করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

মানুষের আদর্শ মানুষ চাই।

"যাহা মানুষ করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারে।" ইহা চিরপ্রসিদ্ধ প্রবচন। এজন্য মানুষের আদর্শ মানুষ। স্বয়ং ঈশ্বর যদিও পূর্ণ আদর্শ সত্তা, কিন্তু তিনি মানুষের লক্ষ্য। এই জন্য তিনি আপন প্রতিকৃতিতে মানুষ গঠন করিয়াছেন এবং যুগে যুগে যুগধর্ম্মাদর্শরূপে এক একজন মানুষকেই তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে বৈদিক ঋষিগণ, বৌদ্ধ যুগে শ্রীবুদ্ধ, পৌরাণিক যুগে শ্রীকৃষ্ণ, শিব, শুক, জনক, পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, নানক কবীর এই ভারতে এবং পাশ্চাত্য দেশে ইহুদী বংশীয় ঋষি আব্রাহাম, মুষা, ঈশা এবং মোহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সকলেই এক এক ধর্ম্মাদর্শ লইয়া আসিয়াছিলেন।

তাঁহারা কেবল যে নিজ নিজ পুরুষকারবলে সাধ্য সাধনার দ্বারা আদর্শ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মের ইচ্ছা-প্রসূত বা পবিত্রাত্মজাত দ্বিজত্ব লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনাও ঈশ্বর-প্রণোদিত, ব্রহ্মকৃপাসিদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ গুরুভক্তির আতিশয্যবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উপরই ঈশ্বরাবতার-বোধে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-বোধে পূজা করিতেছেন।

তাঁহাদের মধ্যে কেহই নিজে কিন্তু এ পূজা চান নাই; কেহ কেহ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে একমাত্র মোহম্মদই এই প্রকার পূজা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সত্য বটে, তাঁহারা যোগাবস্থার এমন কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে ঈশ্বরের সহিত যোগে এক হইয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ পায়। যেমন শ্রীঈশা বলেন "আমি আমার পিতা এক," শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন, "মুই সেই", শ্রীকৃষ্ণও যোগের অবস্থায় গীতার উপদেশদানকালে ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু আবার অপর সময়ে সেই ঈশাই বলেন, "পিতা, পিতা, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিলে"? সেই গৌরাঙ্গই "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং আমার একবিন্দু ভক্তি হইল না বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গীতার কথা অন্য সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এখন আর বলিতে পারি না।"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হয়, তাঁহারা মানুষই ছিলেন, কেবল পরমাত্মার সহিত যোগাবস্থাতেই একত্ব অনুভব করিয়া যোগোক্তি বলেন। তাঁহারা কখনই একেবারে ঈশ্বরের সহিত এক নন, কিম্বা ঈশ্বর নন।

যেমন যখন চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ হয়, তখন পৃথিবীর ছায়া সময়ে সময়ে সূর্য্য চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলে; তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে, পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্রের সহিত একেবারে এক হইল। বিজ্ঞান বলিয়া দিবে, সূর্য্যচন্দ্র হইতে পৃথিবী কত তফাৎ, আবার ক্ষণমাত্র মিলনের পরই কেমন বিচ্ছেদ হয়। ঠিক তেমনি অনন্ত ঈশ্বর হইতে মানবাত্মা অনন্ত তফাৎ, তাহা হইলেও সময়ে সময়ে যোগে মিলন হয়, আবার বিয়োগও হয়। এই ভাবে কোন মানুষই ঈশ্বরের সহিত এক নন এবং এক হইতে পারেন না। সুতরাং মানুষ যতই বড় হউন, তিনি অনন্ত ঈশ্বর হইতে অনন্ত দূরে অবস্থিত।

এখনও মানুষকে ঈশ্বর করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা পৃথিবী হইতে যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণ রামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্যেক স্থানেই প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করা হইতেছে। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রবক্তা বলিয়াও প্রতিষ্ঠা করিবার অক্লান্ত আন্দোলন হইতেছে। সেই অজুহাতেই বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্যদেশের জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের নিকট তাঁহার পরিচয় ও আদর বাড়ান হইতেছে।

যাহা হউক, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা হইতে আমাদের বিশেষ শিক্ষা করিবার আছে। তাঁহারা যে ধর্ম্মসমন্বয়ের

মহিমা মহীয়ান্ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা নববিধানেরই গৌরব কতক পরিমাণে বাড়াইতেছেন, আমরা বলিতে পারি।

শ্রীকেশব যেমন একবার বলিয়াছিলেন, "They are myself reproduced. Those who profess to be my enemies are friends in disguise, for they are doing my work." তাঁহারা কার্য্যতঃ আমাকেই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন; যাঁহারা আমার বিরোধী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা আমার ছদ্মবেশী বন্ধু, কারণ তাঁহারা আমারই কার্য্য করিতেছেন।"

বাস্তবিক ইঁহারা নববিধানের নাম না লইয়া, নববিধানেরই কার্য্য করিতেছেন। তবে নববিধান কেবল দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম্মসমন্বয় প্রচার করিতে আসেন নাই। এই ধর্ম্মসমন্বয় যে বিধাতার নববিধান, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান, ইহা একমাত্র শ্রীকেশবচন্দ্রই ঈশ্বর-প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা করিতে এ পর্য্যন্ত আর কাহারও সাহস হয় নাই।

আবার কেশবচন্দ্রের নিকট এই ধর্ম্মসমন্বয় কেবল জ্ঞানবিচারসিদ্ধ তত্ত্ব নয়; সমুদয় ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া, তিনি নিজ জীবনে সাধন ও প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানবজীবনে তাহা সাধ্যায়ত্ত। কই, আর কে এমন যোগ ভক্তি ও সংসার বৈরাগ্যের সমন্বয় দেখাইতে পারিয়াছেন?

তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, চৈতন্য আমার হৃদয়, সক্রেটিস আমার মস্তক, হিন্দু ঋষিগণ আমার আত্মা এবং কর্ম্মী হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত। হিন্দু আমাকে হিন্দু বলেন, খৃষ্টান আমাকে খ্রীষ্টান বলেন, মুসলমান আমাকে মুসলমান বলেন, বৈষ্ণব আমাকে বৈষ্ণব বলেন ইত্যাদি। আমি সবার কাছে সব।"

আবার নববিধান কেবল নবযুগধর্ম্ম নয়, ইহা কেবল সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ও নয়, ইহা সর্ব্বধর্ম্মে নবজীবন দিবার জন্যও বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত; ইহা সকল ধর্ম্মবিধান, হিন্দু এসলাম খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ইত্যাদির মধ্যে নব জাগরণ দিতে আসিয়াছে। তাহাতেই ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের মিলন কেশব-জীবনে সাধিত হইয়াছিল।

কার্য্যতঃ জীবনে সাধন কে এমন করিয়াছেন? জীবনে কেই বা এমন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধানকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন? আবার সমুদয় প্রাচীন সাধুগণও নিজ নিজ আদর্শ জীবন লইয়া চির জীবিত হইয়াছেন। তাজা রক্তে যেমন মৃত বাঁচে, তেমনি তাঁহারা নববিধানে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন।

অথচ তিনি অহংকার করিয়া নিজেকে নববিধানের প্রবক্তা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, পাছে লোকে তাঁহাকে ভুল করে। তিনি আপনাকে কেবল অসাধারণ মানুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি আপনাকে পাপী নরনারীর সর্দ্দার, চির শিষ্য, চির শিশু বলিয়া, পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাই আশা দিয়াছেন।

তিনি অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিয়া, সংসারের ভিতর থাকিয়া, কামিনী কাঞ্চনের ভিতরও মাতৃরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া, সংসারে ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। নীতিতে ভক্তিতে, সংসারে ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও সেবায় এমন সমন্বয়জীবন কে লাভ করিয়াছেন? সুতরাং সংসারী লোকে সংসার করিতে করিতে যে উচ্চ ধর্ম্ম, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে পারে, তাহা কেশব ভিন্ন বর্ত্তমান যুগে কে দেখাইয়াছেন?

মুখে সা রে গা মা বলা এক, আর হাতে বাজান আর এক. মুখে ধর্ম্মসমন্বয় বলা এক, কার্য্যতঃ জীবনে দেখান আর এক। তাই আমরা নির্ভয়চিত্তে বলিতে পারি. একমাত্র কেশবচন্দ্রই এই সমন্বয়ের নববিধান জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আবার তিনি যে বলিয়াছেন, "বিশ্বমানব আমাতে, আমি বিশ্বমানবেতে। আমি সদল অখণ্ড. আমাকে কেহ বিদল করিতে পারে না। তাই আমি এক। আমি আমরা, আমরা সকলে মিলে এক শরীর।" এই সকল উক্তির দ্বারা তিনি বিশ্বমানবত্বেরও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের মনের কথা নয়, কেন না তিনি বলেন, "যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে ছুঁয়েছে, সে বলিতেছে, অবিশ্বাস করিও না। আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না. আমি সত্য বলি। আমার প্রত্যেক ইঞ্চ সত্য, ভয়ানক সত্য।" এমন কে বলিতে পারে?

আমরা নিতান্ত ভীরু, তাই সাহস করিয়া বিশ্বমানব কেশবচন্দ্রের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে পারি না। বাস্তবিক বর্ত্তমান যুগে যে মানবাদর্শ তিনিই দেখাইবার জন্য প্রেরিত এবং যাহা দেখাইয়াছেন. যাহা লোকের কাছে জোর করিয়া বলিতে সাহস করি না।

যুগে যুগে যুগাবতারগণ যেমন এক এক আদর্শ

তত্ত্বং যুগে দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে পূর্ণ বিশ্বমানবত্বের আদর্শ একমাত্র কেশবচন্দ্রই দেখাইয়াছেন, ইহা নির্ভয়ে বলিতে ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লোকে কুণ্ঠিত হইতেছে না! আর যিনি ঈশ্বরাবতারদিগকে মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন এবং মানুষকে ঈশ্বরাবতার করা যে নিতান্ত ভ্রান্তি, তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেন, পাছে তিনি কাহারও ভক্তির আতিশয্যে পূজিত হন, এই ভয়ে তাঁহার যথার্থ স্থান বিশ্বমানবমণ্ডলীতে নির্দ্দেশ করিতে আমরা ভয় পাইব, ইহা অপেক্ষা ভীরুতা ও অবিশ্বাস আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান যুগে নববিধানের মানুষ, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্বজাতীয় এক অখণ্ড মানুষ কেমন হইতে হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন শ্রীকেশব। তিনিই বিশ্বমানবাদর্শরূপে বিধাতার নববিধানে প্রেরিত এবং স্বয়ং বিধাতার স্বহস্তগঠিত। ইহা বিশ্বস্ততার সহিত স্বীকার করি এবং এই আদর্শে আমরাও যাহাতে বিধাতাকর্ত্তৃক গঠিত হই, ইহারই জন্ম জননীর চরণে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করি।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

চিন্তা।

চিন্তা দ্বারাই আমরা স্বর্গে উত্থান করি, আবার চিন্তা দ্বারাই আমরা নরকে গমন করি। অতএব চিন্তাকে সুনিয়ন্ত্রণ করা সাধক মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। সচ্চিন্তা দ্বারা দুশ্চিন্তাকে দূর করিতে হইবে। সুচিন্তা, চিন্তা-মণির চিন্তা দ্বারা মন সবল হয়; দুশ্চিন্তা, কুচিন্তা, পাপ চিন্তার দ্বারা মনের বল ক্ষয় হয়। দুর্ব্বলের বল যিনি, তাঁর একান্ত শরণাপন্ন হইলে, তিনি মন জানিয়া, দুশ্চিন্তা দূর করিবার বলবিধান করেন। তাঁর নিকট আকুল প্রার্থনাই চিন্তানিয়ন্ত্রণের মহৌষধ।

—

স্বামী আত্মা, স্ত্রী আত্মা।

স্ত্রী আত্মা— তুমি বর, আমি কনে,
তোমায় আমায় যোগাযোগ
কোণে মনে বনে?

স্বামী আত্মা— না, চাও যদি করতে যোগ নিত্য নিশি দিনে,
থাক না আমার সনে রই যখন যেখানে।

প্রাচীন বিধানে ভক্ত ভগবানের যোগ-সাধন কেবল কোণে মনে বনে ছিল; বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে কেবল কোণে মনে বনে নয়, কিন্তু ইচ্ছাযোগ, আত্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, সর্ব্ববিধ যোগে সমন্বিত।

—

রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা পৌরাণিক ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের এক মহা পর্ব্ব। দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু ভক্ত নর নারীগণ এই মহা মহোৎসব দর্শন করিতে সমবেত হন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে জগন্নাথকে শ্রীপুরীর মন্দিরস্থ রত্নবেদী হইতে সুভদ্রা ও বলরাম সঙ্গে রথে করিয়া গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যাওয়া হয় এবং সপ্তাহ কাল সেখানে রাখিয়া শ্রীপুরীধামে পুনর্যাত্রা করিয়া ফিরাইয়া আনা হয়। এই রথ ভক্তগণই টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের বিশ্বাস, রথরজ্জু ধরিয়া টানিলে এবং রথে জগন্নাথ দর্শন করিলে জীবনে মুক্তি লাভ হয়, আর মানবজন্ম গ্রহণ পুনরায় করিতে হয় না। বাস্তবিক বুদ্ধধর্ম্মের ত্রিত্ব—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই তিনকে হিন্দু জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম গড়িয়াছেন। ভগবান, ভক্ত ও বিধান এই ত্রিত্বের প্রক্রিয়াও এই তিন মূর্ত্তি। সুভদ্রারূপ বিধান ও বলরাম ভক্ত সহ ভগবান জগন্নাথের ধরায় অবতরণ ও ধরা হইতে স্বর্গপুরীতে পুনর্যাত্রা ইহারই অভিনয় বা অভিযান এই রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার অভিযান। বাইবেলেও আছে, ঈশ্বর সাতদিন ধরিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জগন্নাথও স্বর্গপুরী হইতে বাহির হইয়া সাতদিন সংসার বাড়ীতে থাকিয়া পুনর্যাত্রা করেন। ইহাই এই যাত্রার মর্ম্ম। ভগবানের রথ ভক্তিরজ্জুতে বাঁধিয়া ভক্তগণ টানেন। আধ্যাত্মিক ভাবে এই অনুষ্ঠানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা ইহাই উপলব্ধি করি, এই মানবজীবনই পরমাত্মা ভগবানের রথ। ভগবান এই জীবন-রথে অধিষ্ঠিত হইয়া, জগজ্জনকে আপনাকে দেখাইবার জন্য আসেন। আবার পৃথিবীতে সপ্তাহকাল সপ্তস্বরূপের লীলা দেখাইয়া স্বর্গে পুনর্যাত্রা করেন। অর্থাৎ আমরা সেই পরমাত্মাকে জগতে দেখাইবার জন্যই মানবজীবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ঈশা যেমন বলিলেন, যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে। সেইরূপ জীবনরথে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও দেখাইবার জন্যই এই পৃথিবীতে মানবের আগমন। তিনি স্বয়ং এই প্রাণের প্রাণ হইয়া পৃথিবীর সাত দিনের জীবনে সপ্তস্বরূপের সাধন করাইতে আসেন; আবার স্বর্গপুরীতে পুনর্যাত্রা করেন। ভক্তগণ ভক্তি-রজ্জুতে বাঁধিয়া, জগজ্জনও ভক্তি প্রেমে বাঁধিয়া এই জীবনরথ টানিতেছেন, তাঁদের টানেই এই রথ চলিতেছে। আর সেই অনন্ত দেব অমর জীবনদাতা যিনি, তিনি এই জীবনের জীবন, ইহা বিশ্বাসচক্ষে দেখিলে, আর এ জীবনের মৃত্যু কোথায়? পাপ জন্ম বা

জন্মান্তর আর হইবে কেন? রথযাত্রার ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনা। হায়, কবে রথযাত্রার বাহ্যাড়ম্বর হইতে এই অধ্যাত্ম সাধনা সাধকগণের প্রাণে সঞ্চারিত হইবে।

—•—

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ—

এখন ত আমি একটী কুৎসিত ও ঘৃণিত কীট মাত্র, অধ্যাত্ম জগতের তলদেশে অতি কষ্টে বুকে হাঁটিয়া চলিতেছি; কিন্তু একদিন আমি কি সুন্দর প্রজাপতির আকার ধারণ করিব এবং আমার প্রিয়তমের উদ্যানে কোন মন্দারকুসুমের মধু পান করিব, তাহা কে জানে? এখানে ত আমি একটী তুচ্ছ ডিম মাত্র, আমার গায়ে কত কাল কাল দাগ; কিন্তু একদিন এই ডিম ফুটিয়া কি বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গ বাহির হইবে এবং তাহার কণ্ঠ হইতে কি স্বর্গীয় সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হইবে, তাহা কে জানে? এখন ত আমি একটী ক্ষুদ্র বীজ ধূলির সহিত মিশিয়া আছি, কেহই আমার প্রতি দৃকপাতও করে না; আমাকে এইখানেই থাকিতে দাও। স্বর্গের শিশির আমাকে অভিষিক্ত করুক এবং আমার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি বহিয়া যাক; তখন আমার ভিতর হইতে ছোট একটী অঙ্কুর বাহির হইবে, আমার মূল ক্রমে মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিবে এবং আমার শাখা প্রশাখা উন্নত আকাশে প্রসারিত হইবে—ক্রমে আমি সুবিশাল বনস্পতিতে পরিণত হইব। আমার নাম অপূর্ণ, আমার বিকাশ ও আমার অভিব্যক্তি ভবিষ্যতে।

আত্ম-বিস্মৃতি—

সাধকের পক্ষে আত্মবিস্মৃতি অতি উচ্চ অবস্থা, কিন্তু এই সাধনে সিদ্ধি লাভ করা বড় কঠিন। প্রতি মুহূর্ত্তেই সংসার আমাদিগকে ক্ষতিলাভের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ও আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। অপর লোকে আমাদের যে অনিষ্ট করিয়াছে, আমরা সেই কথা চিন্তা করি; যদিও বেশ জানি যে, আমরা তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিব না। আমার ক্ষুদ্র ক্ষতিলাভ ইষ্টানিষ্ট ভুলিয়া, আমার ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হৃদয়কে তুচ্ছ করিয়া, যাহার সহিত আমার সাংসারিক জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারই চিন্তায় তাহারই অনুসরণে উন্মত্ত হওয়ার কি আনন্দ! হে আত্মন্, মহা মানবের যে বিশাল জীবনধারা তোমার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রবাহে আপনাকে ঢালিয়া দাও, তুমি শান্তির রাজ্যে উপনীত হইবে।

প্রত্যেক কর্ত্তব্য, যাহা তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে, আপনার সুবিধা অসুবিধা ও ক্ষতিলাভ তুচ্ছ করিয়া তাহাতেই একেবারে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। আত্মহারা উৎসাহের প্লাবনে আপনাকে ভাসাইয়া দাও। স্বার্থচিন্তার বিষাক্ত বায়ু যাহাতে তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, সে জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা কর। পাঠ কর বা প্রার্থনাই কর, বেড়াইতে যাও বা গল্পই কর, যাহাই কর, স্বার্থচিন্তাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া দাও।

অন্তর্দ্দৃষ্টি এবং যোগ—

যখন আপনার ভারে আপনাকে ক্লান্ত এবং অবসন্ন বলিয়া বোধ করিবে, তখন সেই ক্লান্তি এবং অবসাদ ভুলিবার দুটী পন্থা আছে। একটী তোমার বাহিরে, দ্বিতীয়টী তোমার অন্তরে। এই দৃশ্য জগতের আধ্যাত্মিকরূপ দর্শন কর, অচিরেই তাহার অসীমে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে। আবার অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে স্থিরভাবে অন্তশ্চক্ষে দৃষ্টিপাত কর, সকল ভয় ভাবনা বিস্মৃত হইয়া সেই সত্যধামের উপকূল প্রাপ্ত হইবে। উভয় পন্থার সহিত পরিচিত হও। আরও একটী উপায় আছে, সেটী এই যে, অপরের সুখ দুঃখে আপনার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে ডুবাইয়া আত্মহারা হইয়া যাও, এবং তোমার চারিদিকের পরমাশ্চর্য্য মানবমণ্ডলীর উন্নতি ও পূর্ণতা দেখিয়া নিজের অভাব ও অপূর্ণতা ভুলিয়া যাও।

ধর্ম্মবিধি—

এ কথা সত্য যে, একজন লোক যতই দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মবিধি পালন করুক না কেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ যে কি বস্তু, সে তাহার সন্ধান পাইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেকের ক্ষুদ্রতম আদেশও লঙ্ঘন করে, তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। ধর্ম্মবিধি অর্থাৎ নীতিই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি।

সমগ্র জীবনই ধর্ম্মবিধির অধীন। অর্থাৎ জীবনের ছোট খাট কাজ কর্ম্মের সঙ্গেও ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ন্যায় অন্যায়ের সম্বন্ধ আছে। একটা কাজ ন্যায়ও নয়, অন্যায়ও নয়, এরূপ হয় না। প্রত্যেক কাজই হয় ধর্ম্ম, না হয় অধর্ম্ম। প্রতি চিন্তা, প্রতি কথা, প্রতি কাজের কি গভীর দায়িত্ব! হে প্রভু, তুমি ভিন্ন এবং তোমার কৃপা ভিন্ন কে আর আমাকে কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে?

স্বাস্থ্য—

স্বাস্থ্য এবং দৈহিক শক্তিসমূহের সামঞ্জস্যের অভাবে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা এবং করুণা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এই জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা একটী পবিত্র কর্ত্তব্য। আহার নিদ্রা এবং অন্যান্য সকল প্রকার অভ্যাসে যে মিতাচার অবলম্বন করা ঈশ্বরের আদেশ, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু হে পরমাত্মন্, তুমি জ্ঞান, স্বাস্থ্য এবং জীবন অপেক্ষাও তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তোমাকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য আমি স্বাস্থ্য এবং জীবন উভয়ই উৎসর্গ করিয়াছি এবং আমার পূজার পবিত্র নৈবেদ্য বলিয়া তুমি তাহা গ্রহণ করিয়াছ।

আচার্য্যের উপদেশ।

(ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশত্রয়ের সারাংশ, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৪ শক—২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের "ধর্ম্মসাধন" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত ; এগুলি অন্যত্র কোথাও ছাপা হয় নাই)

১। বিগত উৎসবে ব্রহ্মরাজ্যের প্রতিকৃতি আমরা এই মন্দির মধ্যেই দর্শন করিয়াছি। এই রাজ্য কি কল্পনা? এই রাজ্য কি বাস্তব নয়? সম্মুখস্থ এই পদার্থ সকলের ন্যায় যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম না, তাহার অস্তিত্বের উপরে আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব? তাহার বাস্তবিকতা আমি কিরূপে স্বীকার করিব? কে বলে, ব্রহ্মরাজ্য এই আমার সম্মুখস্থ পদার্থ সকলের ন্যায় প্রত্যক্ষ নয়? আমরা এখানে কি দেখিতেছি? এই মন্দির মধ্যে আমরা যে দৃশ্য দর্শন করিতেছি, ইহা কি সেই ব্রহ্মরাজ্যের দৃশ্য নয়? আমরা এখানে কি জন্য আসিয়াছি? এখানে আসিলে কি ধন মান যশ প্রতিপত্তি লাভ করা যায়? না, এখানে আসিলে সংসারের নিকটে নিন্দিত ভর্ৎসিত ঘৃণিত এবং নির্য্যাতিত হইতে হয়? আমরা এখানে কি শুদ্ধ ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আসি নাই? এই মুহূর্ত্তে আমাদিগের হৃদয়ের স্বার্থপরতা কুপ্রবৃত্তি সকল কি অন্তর্হিত হয় নাই? এই মুহূর্ত্তকে যদি আমরা কালে বিস্তৃত করিয়া লইতে পারি, তবেই ব্রহ্মরাজ্য আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বলিও না, ব্রহ্মরাজ্য অসম্ভব। যাহা মুহূর্ত্তের জন্য সম্ভব, কে বলিল, তাহা আরো বিস্তৃত সময়ের জন্য সম্ভব নহে? এই সময়কে বিস্তৃত কর, দেখিবে, তোমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মরাজ্য নিয়ত বর্ত্তমান থাকিবে।

২। ব্রহ্মরাজ্য নিয়মশূন্য রাজ্য নহে। একটী রাজ্য থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নিয়মও থাকে। ব্রহ্মরাজ্যের প্রজা হইবার জন্য কোথায় সেই নিয়ম সকল পাঠ করিব? একবার বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সেখানে দেখিবে ব্রহ্মরাজ্যের নিয়ম সকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। অন্তরে প্রবেশ কর, সেখানেও সেই নিয়ম স্পষ্ট উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইবে। দেখ, এই রাজ্যের রাজার অনন্ত ভাণ্ডার যেমন সকলের নিকট প্রমুক্ত রহিয়াছে। এত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি নিজের জন্য কিছুই সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই, সকলই তাঁহার প্রজাদিগের নিমিত্ত সঞ্চিত। তাঁহার বায়ু, জল, আকাশ অগণ্য দান তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগের নিকট তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার নিয়ম কি বহন করিয়া আনিতেছে না? ইহারা কি বলিয়া দিতেছে না, দেখ, তোমাদিগের অধিপতি তাঁহার নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই, সকলই তোমাদিগের জন্য ব্যয় করিতেছেন? তোমরাও এইরূপ তোমাদিগের জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি অন্যের জন্য নিয়োগ কর, তোমাদিগের যাহার যাহা আছে, অপরের মঙ্গলার্থে প্রমুক্ত ভাবে ব্যয় কর; প্রাণগত পরিশ্রমে আপনার জন্য কিছু না রাখিয়া সকলই তাহাদিগের উপকারে দাও। তোমরা শুনিয়াছ "সূচীরন্ধ্রের মধ্য দিয়া উষ্ট্রের প্রবেশ সহজ, তথাপি ধনী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" এ কথা কাহার পক্ষে? যে আপনার সম্পত্তি সকল অপরের জন্য ব্যয়িত করিতে পারে না, ইহা কি তাহার পক্ষে নহে? তোমার আপনার বলিবার কিছু থাকিবে না, সকলই পরার্থে। তুমি প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া অর্জ্জন করিতেছ, কাহাদিগের জন্য? ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণের জন্য। তোমার যে আর কিছুই রহিল না। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি পরম উৎকৃষ্ট ধনও যদি এইরূপ অন্যের জন্য হয়, তবে কি তুমি আর অবিনয়ী অহংকারী হইতে পার?

বলিও না, আমি সাধারণ ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রতি অবস্থা বিশেষে কিরূপ ব্যবহার করিব, তাহার কিছুই জানি না। হে ব্রাহ্ম! তুমি কি এমনি দুর্ভাগা যে, সংসারে তোমার পরিবারের মধ্যে এমন কেহ প্রণয়ভাজন নাই, যাহার প্রতি তোমার প্রণয় অতি গাঢ়? যদি এমন কেহ থাকেন, অন্য ভ্রাতাভগিনীগণের প্রতি অবস্থা বিশেষে কিরূপ ব্যবহার করিবে, শিক্ষা করিবার জন্য, কল্পনা-পথে সেই প্রণয়ভাজনকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, সেই অবস্থা বিশেষে সেই ভ্রাতা বা ভগিনীর প্রতি তুমি কিরূপ ব্যবহার করিবে। এই জন্য বলিয়াছি, অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর, তোমার ভ্রাতাভগিনীগণের সঙ্গে তোমার কি প্রকার ব্যবহার করা ব্রহ্মরাজ্যের রাজার অভিপ্রেত, তাহা তোমার হৃদয়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিবে।

৩। আমরা ব্রাহ্ম; আমাদিগের ঈশ্বর গণিত বিজ্ঞানের স্বীকার্য্যের ন্যায় নহেন। তাঁহাকে স্বীকার করিয়া এককোণে রাখিলাম, জগৎ আপনা হইতে চলিতে লাগিল, ব্রাহ্ম হইয়া আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ হইতে এক কণা বালুকা পর্য্যন্ত তাঁহারই বর্ত্তমানতায় বর্ত্তমান, তাঁহারই শক্তিতে চালিত, তাঁহারই শক্তিতে অবস্থিত। একটী নবীন দূর্ব্বাদলে যে প্রাণের কার্য্য সন্দর্শন করি, উহা কি সেই প্রাণের প্রাণ ভিন্ন সংঘটিত হইতে পারে? বস্তুতঃ জড় জগতের সহিত ঈশ্বরের যেমন নিকট সম্বন্ধ, তেমনি প্রাণিজগতের সহিত, মনুষ্যমণ্ডলীর সহিত। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড়জগতের, মনুষ্যমণ্ডলীরও কার্য্যনির্ব্বাহক। অনেক সংশয়ী অবিশ্বাসী গ্রহগণের গতির সাময়িক চঞ্চলতা দর্শন করিয়া যেমন পদে পদে গ্রহগণের সংঘর্ষণ ও বিনাশ আশঙ্কা করিয়া ভীত হন, তেমনি অনেক সংশয়ী মনুষ্য-সমাজের সৎপথ হইতে অনেক সময় আপাত বিচ্যুতি দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করেন; কেন্দ্রাপসারিতা এবং গ্রহান্তরের গতিসূত্রে কেন্দ্রাভিমুখতার ক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিলেও যেমন উহা স্থিরতর থাকিয়া যায়, তেমনি মনুষ্যের স্বাধীনতার জন্য, প্রলোভনের অজেয় শক্তির জন্য বিপরীত গতি সত্ত্বেও জনসমাজ

অলক্ষিত ভাবে উন্নতির দিকে সম্মুখীন রহিয়াছে। যাহারা সংশয়ী, তাহারা পর্য্যন্ত একথায় অবিশ্বাস করে না; আমরা ব্রাহ্ম হইয়া কি একথায় অবিশ্বাস করিব? জড়জগতে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার ক্রিয়াশীলতা, মনুষ্যমণ্ডলীতেও তেমনি, এ কথায় কে সংশয় করিতে পারে? মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরের ক্রিয়া কিসের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়? স্বার্থপরতা, অসৎ কামনা দ্বারা। মনুষ্য নিজের বিষয়ে স্বার্থপরতা এবং অসৎ কামনাতে অন্ধ হয়; কিন্তু অনেক সময়ে কি আমরা দেখিতে পাই না, অন্যের সম্বন্ধে বিচার করিতে আমরা নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ হই?

আপনার সম্বন্ধে যে বিষয় স্থির করিতে গিয়া আমরা স্বার্থপরতায় অন্ধ হই এবং অন্যায় আচরণ করি, অন্যের সম্বন্ধে সে বিষয় বিচার করিতে আমরা নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ হই। যাহার সম্বন্ধে বিচার করি, তৎপতি কোন অসদ্ভাব না থাকিলে ইহা অপ্রতিহত থাকে। সভ্যসমাজে অধিকাংশের মত লইয়া এইজন্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ প্রতি ব্যক্তি নিজ সম্বন্ধে আত্মাতে ঈশ্বর-ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ করিলেও, সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীসমষ্টিতে ঈশ্বরের ক্রিয়া প্রতিরোধ করেন না। এইজন্য অনেক সময় আমি যখন আমার বিষয়ে অন্ধ, আমি অন্যের কথাতে দৃষ্টান্তে আমার নিজদোষ সংশোধন করিয়া লই। অতএব আমরা যেন মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের হস্তচিহ্ন দর্শন করিয়া আত্মাকে সর্ব্বদা সংশোধন করি।

আমরা একটী বিশেষ সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের মধ্যে কি জন্য আসিয়াছে? সমুদয় মনুষ্যমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ দোষ সংশোধন করিবার জন্য। আমাদিগের কি উদ্দেশ্য হওয়া চাই? যাহাতে আমাদিগের সেই বিশেষ বিশেষ দোষ সংশোধিত হইয়া আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়া অপ্রতিহতরূপে চলিতে থাকে, সেই বিষয়ে প্রাণগত যত্ন করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বত্যাগ।

(অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক চেষ্টা করিয়াও চিত্তকে আয়ত্ত ও বর্জ্জন করিতে না পারিয়া কচ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইলেন। আপনার পুরুষকারের সামর্থ্যের উপর আস্থা হারাইলেন, স্বকীয় শক্তিতে সর্ব্বত্যাগী হওয়ার ভরসা তাঁহার অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল, এবং তিনি পুনরায় অধিকতর দীনভাবে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন,—

স্বরূপং ব্রূহি চিত্তস্য যেন তৎ সন্ত্যজাম্যহম্।

চিত্তের স্বরূপ কি, তাহা দয়া করিয়া বলুন, যাহাতে আমি তাহা সম্যক ত্যাগ করিতে পারি। গুরু উপদেশ করিলেন—

চিত্তং নিজমহঙ্কারং বিদুশ্চিত্তবিদোজনাঃ।

অন্তর্য্যোঽয়মহম্ভাবো জন্তোস্তচ্চিত্তমুচ্যতে॥

—চিত্তবিদ্‌গণ নিজ অহঙ্কারকেই চিত্ত বলিয়া জানেন। জীবের অন্তরে যে অহং-ভাব (আমি বোধ) তাহাই চিত্তের স্বরূপ। আমি গ্রহণ করিব, আমি ত্যাগ করিব, আমি বদ্ধ হইয়া আছি, আমি চেষ্টা করিয়া মুক্তি লাভ করিব, আমার এই সকল বাহ্য বা অন্তর সম্পৎ আছে, আমি সেই সব বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইব,—এইরূপ সকল ব্যাপার, সকল চিন্তা ও কর্ম্ম, সকল যুক্তিবিচার ও যোগ তপস্যার ভিতরেই যে অহং-কর্ত্তৃত্বের একটা বোধ প্রবল বা ক্ষীণভাবে, স্ফুট বা অস্ফুটভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই অহঙ্কারই চিত্ত, সেই অহঙ্কারই সংসারের মূল, সেই অহঙ্কার হইতেই কর্ম্মভোগময় সংসার এবং যাবতীয় অভাব ও অভিযোগ, ভয় ও উদ্বেগ, জ্বালা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অহংত্যাগেই সর্ব্বত্যাগ ও মুক্তি।

অনেক তপস্বী অহংকে প্রবল করিয়া, অহংএর উপর ভর করিয়া, দেহেন্দ্রিয় মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রয়োজন সমূহের নিগ্রহ দ্বারা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে চেষ্টা করেন; সকল প্রকার বাহ্যিক কর্ম্ম ও ভোগ বর্জ্জন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে ও শান্তি লাভ করিতে প্রযত্নশীল হন। কিন্তু এইরূপ বাহ্যিক ত্যাগ দ্বারা যথার্থতঃ সংসারত্যাগ হয় না, সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ হয় না, রাগ দ্বেষের মূলোচ্ছেদ হয় না, অশান্তির কারণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। অহংকার যতদিন বিদ্যমান আছে, আমিকে কেন্দ্র করিয়া যতদিন জীবন-প্রবাহ পরিচালিত হইতে থাকে, ততদিন নূতন নূতন চিন্তা, নূতন নূতন বাসনা, নূতন কামনা, নূতন নূতন সংকল্প বিকল্প, নূতন নূতন অশান্তির কারণ উদ্ভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কোন বৃক্ষের মূল ঠিক রাখিয়া তাহার শাখা প্রশাখা সুনিপুণ ভাবে ছেদন করিলেও যেমন বৃক্ষের বিনাশ সাধন হয় না, আবার কালক্রমে সেই মূল হইতেই যেমন শাখা প্রশাখার বিস্তার হইয়া থাকে, তেমনি সংসার-বৃক্ষের মূলস্বরূপ অহংকারকে বিনষ্ট না করিয়া, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কামলোভাদি মনোবৃত্তির সংযমদ্বারা বাহ্যতঃ বিষয়-সম্পর্ক বর্জ্জন করিলেই সংসারের নাশ হয় না, তত্ত্বতঃ বিষয়ত্যাগ হয় না, আত্মা স্বপদে বিশ্রান্তি লাভ করে না। সেই অহংকারই অনুকূল অবস্থার যোগে আপনা হইতে সংসারমুখীন বিক্ষেপজনক মনোবৃত্তিসমূহ উৎপাদন করিয়া পুনরায় বিচিত্র কর্ম্ম, বিচিত্র ভোগ ও বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টি করে।

অহংকে বিনাশ করিতে পারিলেই সংসারের মূলোচ্ছেদ হয়, অশান্তির কারণ চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া তাহার শাখা প্রশাখায় প্রচুর বারি বর্ষণ করিলে যেমন সেই বৃক্ষ পুনরায় সজীব ও সতেজ হয় না, তেমনি যাবতীয় সংকল্প বিকল্প, রাগ-দ্বেষ, কর্ম্ম-প্রেরণা ও ভোগ-পিপাসার মূলীভূত

কারণ অহংকার বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, সংসারের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ও ভোগের সহিত বাহ্য সম্পর্ক রক্ষা করিলেও, পুনরায় সংসার-বন্ধনের সম্ভাবনা থাকে না; নূতন নূতন রাগদ্বেষ, সংকল্প বিকল্প প্রভৃতির উদ্ভব হয় না, ক্লেশ কর্ম্মবিপাক আশয় প্রভৃতি আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়, দুঃখ তাপ আর শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। সম্যকরূপে অভিমানশূন্য হইয়া এই স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে পারিলে, কোন অবস্থাতেই সর্ব্বত্যাগের হানি হয় না, শান্তির ব্যাঘাত হয় না। তখন—

নিগ্রন্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তো বিভাবনঃ।
অনির্ব্বাণোঽপি নির্ব্বাণশ্চিত্রদীপ ইব স্থিতঃ॥
অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥

সেই অভিমানশূন্য পুরুষের সমস্ত গ্রন্থি বা বন্ধন মূলতঃ ছিন্ন হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের জ্বালা প্রশমিত হয়, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তার লেশমাত্রও কারণ থাকে না, সংসারে জীবন ধারণ ও নানা বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিলেও তাঁহার সর্ব্ববন্ধনবিনির্ম্মুক্ত অবস্থাতেই স্থিতি হয়। চিত্রপটাঙ্কিত দীপশিখায় যেমন দীপশিখার আকার মাত্রই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন প্রকার জ্বালা, উত্তাপ বা ঔজ্জ্বল্য থাকে না, সেইরূপ অহংকারনির্ম্মুক্ত পুরুষ বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যবহারিক জগতে জীবভাবে বিচরণ করিলেও,—সাধারণ সংসারী মানুষের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্নজল গ্রহণ, ব্যাধিতে ঔষধ সেবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুযায়ী পারিবারিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহের যথাবিধি সম্পাদন, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহের সুখ দুঃখে সহানুভূতি ও সেবা প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়োজিত থাকিলেও,—তত্ত্বদৃষ্টিতে তাঁহার জীবত্বই থাকে না, তিনি সর্ব্বপ্রকার বিধি ও নিষেধের, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের, ভোগ ও ত্যাগের ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন; আহার ও অনাহার, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, মান ও অপমান, জীবন ও মরণ সবই তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টির সমীপে সমান হইয়া যায়। সিদ্ধি বা অসিদ্ধি, লাভ বা ক্ষতি, শ্রেয় বা প্রেয় বলিয়া তাঁহার নিকট কিছুই থাকে না। তিনি দেহস্থ থাকিয়াও নিত্য ব্রহ্মস্থ থাকেন। সাংসারিক হিসাবে, আকাশস্থ শূন্য কুম্ভের ন্যায় তাঁহার ভিতরেও শূন্য, বাহিরেও শূন্য;—রাগদ্বেষ, ভয়ভাবনা, অভিমান-মমতা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনোজগতের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য তাঁহার অন্তরে তিরোহিত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মাকারবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় তাঁহার অন্তর শূন্যায়িত হয়, এবং বহিঃস্থিত ইষ্টানিষ্টপ্রদ ঘাত-প্রতিঘাত-সমাকুল অশেষ বৈচিত্র্য-সমন্বিত জড়চেতনাত্মক জগৎও তাঁহার জ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হওয়ায় বাহিরও তাঁহার সমীপে শূন্যায়িত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, পারমার্থিক হিসাবে সমুদ্র-নিমজ্জিত কুম্ভের ন্যায় তাঁহার ভিতর বাহির সবই এক রসে পরিপূর্ণ,—অনাবৃত অখণ্ডিত অপরিচ্ছিন্ন চিদ্ঘন পরমানন্দে ভরপুর। তিনি নিজকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন; জগৎকেও ব্রহ্মময় বলিয়া উপলব্ধি করেন।

অতএব অহংত্যাগেই সর্ব্বত্যাগ ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, স্বপদে বিশ্রান্তিলাভ ও পরমপুরুষার্থের অধিগম হয়। মুমুক্ষু সাধক বৃহস্পতি-তনয় কচ এই মহান্ উপদেশ শ্রবণ করিয়া একদিকে যেমন একটা অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইলেন, সংসারত্যাগ ও পরমপুরুষার্থসিদ্ধির একটা নূতন রহস্য অবগত হইলেন, অপর দিকে কার্য্যতঃ এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করা তাঁহার বিচারে অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। 'অহং' সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও ত্যাগের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, অহংকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার সাধন ভজন, যোগ যাগ তপস্যা; বিশ্বজগৎ যেমন অহংএর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায় ও সুখ দুঃখাদির উৎপাদক হয়, তেমনি বিশ্বজগৎ ত্যাগ করিয়া স্বস্থ হইতে হইলেও, অহংকেই সাধন করিতে হয়, অহংএর পুরুষকার-প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

এই অহংএর ত্যাগ যে স্ববিরোধী বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে ত্যাগ করিবে, সেই ত অহং। অহং নিজকে নিজে কিরূপে ত্যাগ করিবে, নিজে কিরূপে নিজের বিনাশ সাধন করিবে? ত্যাগের বা বিনাশের চেষ্টার মধ্যেই ত অহং পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিবে। এইরূপ অসম্ভব উপদেশ গুরুদেব কিভাবে করিলেন, এই সন্দেহে দোদুল্যমান হইয়া কচ কাতরপ্রাণে গুরুর শরণাপন্ন হইলেন।

সদ্‌গুরু বৃহস্পতি শরণাগত শিষ্য ও পুত্রকে অভয়প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন—

অপি পুষ্পাবদলনাদপি লোচনমীলনাৎ।
সুকরোঽহংকৃতে স্ত্যাগো ন ক্লেশোঽত্র মনাগপি॥

পুষ্পচয়ন ও নেত্রনিমীলন অপেক্ষাও অহংকারত্যাগ সহজ-সাধ্য। ইহাতে বিন্দুমাত্রও আয়াস আবশ্যক হয় না। পুষ্পচয়ন করিতে বা চক্ষু উন্মীলন নিমীলনে যতটুকু আয়াসের প্রয়োজন হয়, অহংকারের বিনাশ সাধন করিতে ততটুকু আয়াসেরও আবশ্যকতা নাই। কারণ—

অজ্ঞানমাত্রসংসিদ্ধং বস্তু জ্ঞানেন নশ্যতি।
বস্তুতো নাস্ত্যহংকারঃ পুত্র মিথ্যাভ্রমো যথা॥

যে বস্তু অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই যাহার অস্তিত্ব প্রতীতিগোচর হয়, সেই বস্তুর বিনাশের জন্য কোন চেষ্টাই আবশ্যক হয় না। অজ্ঞানমাত্র সিদ্ধ বস্তু যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই বিনষ্ট হয়। যাহা বস্তুতঃ নাই, ভ্রান্তিবশতঃ আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র; যখনই জানা গেল যে, তাহা নাই, তখনই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। তাহার অস্তিত্ববিলোপের জন্য অন্য কোন রূপ প্রয়াসের আবশ্যকতা থাকে না। বস্তুতঃ অহংকারের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। সুতরাং তাহা বিনাশ

করিতে চেষ্টা দরকার হইবে কেন? কোন একটি রজ্জু যখন অজ্ঞানতাবশতঃ সর্পরূপে প্রতীয়মান হইয়া ভয় দুঃখ চাঞ্চল্য প্রভৃতি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করে, তখনো সেই সর্পের কোন বাস্তব সত্তা থাকে না; রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া না জানা ও সর্প বলিয়া ধারণা করার দরুণই সেই সব দুরবস্থার সৃষ্টি হয়; আবার রজ্জু যে রজ্জু, তাহা সর্প নয়, ইহা জানিয়াই দুরবস্থার নিবৃত্তি। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিত্যশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ আত্মার তেমনি অনাদি অবিদ্যাবশতঃ অনাত্মধর্ম্ম আরোপিত হইয়া অহং-বোধ উৎপাদনপূর্ব্বক বিচিত্র কামনা বাসনা ও কর্ম্মভোগাদি সৃষ্টি করে; তাহাতে অহংকারের কোন বাস্তব সত্তা হয় না। রজ্জু যেমন বস্তুতঃ সর্পে পরিণত হয় না, আত্মাও তেমনি বস্তুতঃ অহংকারে পরিণত হয় না। একটী মিথ্যাভ্রম নানা প্রকার ভ্রান্তি ও দুঃখদৈন্যের জনক হইলেও, তাহা মিথ্যাভ্রমই থাকে, সত্যবস্তু হয় না। যে সত্য বস্তুর অধিষ্ঠানে এই মিথ্যা প্রতীতি হয়, সেই সত্যবস্তুর যথার্থস্বরূপ জানা মাত্রই মিথ্যার প্রাতীতিক অস্তিত্ব তিরোহিত হয়। সুতরাং যে নির্ব্বিকার চৈতন্য-স্বরূপ আত্মায় অহংকারের প্রতীতি হয়, সে আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান হওয়া মাত্রই অহংকার তিরোহিত হয়। তাহার বিনাশের জন্য কোন আয়াসসাধ্য কর্ম্মাড়ম্বরের আবশ্যকতা নাই, এবং তাহাতে কোন ইষ্টসিদ্ধিও হয় না। একটী ছায়া-পুরুষকে ভীষণ শত্রুবোধে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে থাকিলেও সেই শত্রুর অঙ্গে বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগেনা, তাহার বিনাশ-সাধনও হয় না; কিন্তু তাহাকে ছায়া বলিয়া জানিলেই সেই শত্রুর বিনাশ আপনা আপনিই সংসাধিত হয়, আর সে ভয় বা ক্লেশের কারণ হয় না, তাহার আকৃতি, এমন কি, বিকট ভঙ্গীও আনন্দোল্লাসের সহিতই সম্ভোগ্য হয়। জ্ঞানের আলোক-পাত হইলেই ছায়ার সত্যত্ব ভ্রান্তি তিরোহিত হয়। যাহার ছায়া, তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলেই ছায়ার মিথ্যাত্ব ধরা পড়ে, তাহার বিনাশ সাধিত হয়। সেইরূপ আত্মার ছায়ারূপ অহংকারের বিনাশসাধনের নিমিত্ত যতই তাহাকে বিষয়রূপে ধরিতে ও তাহার প্রতি যাগতপস্যাদি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রযত্নশীল হওয়া যায়, তাহাতে তাহার বিনাশ হয় না, বরং অনেক সময় প্রবল হইতেও দেখা যায়। সুতরাং যে জাতীয় সাধনার কথা চিন্তা করিয়া অহংত্যাগকে স্বভাবতঃই অতিশয় কঠিন বা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, অহংত্যাগের সাধনা সে জাতীয়ই নয়। যে পরম অহং বা পরম আত্মার ছায়ারূপে এই মিথ্যা অহং-এর প্রকাশ হয়, সেই পরম-অহং-এর তত্ত্ব জানিলেই মিথ্যা-অহং তিরোহিত হইয়া যায়। তুমি অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া অনুভব করিতে থাক, যে,—

দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নং স্বচ্ছং নিত্যোদিতং ততম্।
সর্ব্বার্থময়মেকার্থচিন্মাত্রমমলং ভবান্॥

তুমি দিক্‌কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, নির্ম্মল, নিত্য স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বার্থময় চৈতন্যৈকরস, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, পরমানন্দ-ময় পরমাত্মা। এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই তোমারও পারমার্থিক স্বরূপ, এই বিশ্বজগতেরও পারমার্থিক স্বরূপ। উপলব্ধি কর যে, যিনি বিশ্বাত্মা, তিনিই তোমারও আত্মা।

সেই সর্ব্বভাবাতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই স্বকীয় অচিন্ত্য মহাশক্তির বিকাশে অনন্তভাবে আপনাকে আপনি প্রকটিত করিয়াছেন, অসংখ্য কর্ত্তা ও কার্য্যরূপে, ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে আত্মপ্রকট করিয়া নিত্যকাল তিনিই আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতেছেন। তিনি তোমারও 'আমি', আমারও 'আমি' সকলেরই তিনিই আসল 'আমি'। আমরা সকলেই তাঁহারই এক একটী বিশেষ প্রকাশ বা আভাস মাত্র। যাহা হইতেছে, যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে, সবই তাঁহার লীলা, সবই সেই আনন্দ-স্বরূপের আত্মাস্বাদন। যাহাকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু হউক না কেন, সবই বস্তুতঃ তাঁহার, —তাঁহারই স্বকীয় বিধানে, তাঁহারই স্বরূপগত আনন্দচিন্ময়-রসের বিচিত্ররূপে সম্ভোগ। ইহাতে তোমার বা আমার বা অন্য কাহারও পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব কোথায়? এক অদ্বিতীয় চৈতন্যানন্দময় পুরুষই সর্ব্বত্র কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা। আবার তাঁহার যাহা কিছু, সবই আমার, সবই তোমার, সবই সকলের। সুতরাং অহংকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না দেখিয়া, সেই নিত্য শুদ্ধ বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন দর্শন করিতে পারিলেই সত্য দর্শন হয়; সকল বৈষম্য, সকল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, সকল বিক্ষোভ ও অস্বস্তির কারণ তিরোহিত হয় এবং তাহা হইলেই স্বপদে বিশ্রান্তি লাভ হয়। এইরূপে সর্ব্বত্যাগে সর্ব্ব-সম্ভোগ হয়, অহংত্যাগে বিশ্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, পরবৈরাগ্যে পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়।

নববিধানের ভক্তিযোগ।

(২৯শে জুন, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক রবিবাসরীয় উপাসনায় নিবেদন)

এই যে ভক্তের প্রার্থনার ভেতর যোগ, ভক্তি, প্রেমের কথা শুনলাম এবং তার ভেতর প্রমত্ত হয়ে থাকার জন্য যে তিনি প্রার্থনা করলেন, আমরা ক'জন ব্রাহ্মসমাজে সেই মত্ততার জন্য প্রার্থনা করি? আমাদের ভক্তিতে মত্ত হতে হবে, প্রেমে মত্ত হতে হবে, যোগেতে মত্ত হতে হবে। ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগে কর্ম্মের ও জ্ঞানের মত্ততা প্রদর্শিত হয়েছিল, কিন্তু সে মত্ততা নীরস মত্ততা এবং অস্থায়ী মত্ততায় পরিণত হয়েছিল; কারণ তার ভিতর ভক্তির সমাবেশ ছিল না। শুষ্ক জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে তখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

কারণ ভক্তি ছাড়া, অনুরাগ ছাড়া, ব্রহ্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন না। জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে তাঁর আসা যাওয়া হয় বটে—তাঁর সঙ্গে ক্ষণিকের সঙ্গলাভ হয় বটে—কিন্তু প্রাণসখার অবিচ্ছেদ সহবাস ঘটাতে চাও যদি, তবে যোগ ভক্তি ছাড়া উপায় নেই। ব্রাহ্মসমাজে সেই ভক্তির প্রবর্ত্তন করেন—শুধু ব্রাহ্মসমাজে কেন, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও প্রত্যেক জ্ঞানী ও কর্ম্মীর জীবনে এই মধুর ভক্তির প্রবর্ত্তন শ্রীগৌরাঙ্গের পরে করেন—সেই নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবাচার্য্য, যাঁকে আমার প্রাণ আজ গুরু বলে অভিষেক করেছে। জীবনে জ্ঞান উপার্জ্জন করেছি এবং কর্ম্মও করেছি যথেষ্ট, কিন্তু প্রাণে আনন্দ শান্তি পাই নি—জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে দৈহিক অভাবমোচনের অবসর পেয়েছি বটে, কিন্তু প্রাণে আনন্দ শান্তি পাই নি—যখন জরা, মৃত্যু এসে রক্তমাংসের দেহকে ঘিরেছে, তখন জ্ঞানকে ডেকেছি, কর্ম্মকে ডেকেছি, কিন্তু তারা আমার কাতর ক্রন্দন শুনে উপহাসই করেছে, কোনো উপায় করতে পারে নি। আজ ভগবানের কৃপায় যখন ভক্তিদেবীকে ডাকলাম, তিনি সদয় হলেন, অভয়দান করলেন। তখন জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ক্লেশ, অভাব, অনটন সকলের মধ্যে তাঁর মঙ্গল হস্ত দেখতে শিখলাম। তখন 'শিবম্' মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রাণে শান্তি পেলাম, আনন্দ পেলাম।

ভক্তি যে শুধু আনন্দ, শান্তি দান করে, তা নয়—ভক্তিতে দেহমনে সাহস ও শক্তি আসে—কর্ম্ম জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যে শক্তি আসে, সে শক্তি অহঙ্কার-প্রসূত; কিন্তু ভক্তির ভিতর দিয়ে যে শক্তি আসে, সে শক্তি বিনয়প্রসূত। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যদি বলতে হয়, তা হ'লে বলব, যে যতদিন ভক্তি আমার জীবনে অধিকার করতে পারে নি, ততদিন অনেক বিষয় লজ্জা ভয় ছিল; কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় ভক্তির উন্মেষ যত হতে লাগল, তত নির্ভীকতা এল, শক্তি এল। এমন একদিন ছিল, যেদিন ব্রহ্মানন্দদেবকে শিক্ষক বা গুরু বলবার সাহস ও শক্তি আমার হৃদয়ে ছিল না; কিন্তু প্রাণে ভক্তির মত্ততা যত প্রবল হচ্ছে, তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করবার সাহস ও শক্তি তত বাড়ছে। আগে দু'পা হাঁটবার শক্তি ছিল না, অথচ মাছ খেতাম, মাংস খেতাম, ডিম খেতাম—আর এখন এ সব কিছু না খেয়ে, বাড়ী থেকে মন্দির ও মন্দির থেকে বাড়ী সাত মাইল অনায়াসে পদব্রজে যাতায়াত করি। গুরুদেবের জীবনে যে ভক্তিযুক্ত সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়েছি, তেমন আর কোনো মানুষের কিম্বা মহাপুরুষের জীবনে আমি পেলাম না—সমস্ত অনুচর শিষ্যদের পাদুকা একত্রিত করে তার উপর মুখ থুবড়ে ভক্তিভরে পড়ে থাকা, এ না ঈশার জীবনে, না মুষা, মহম্মদের জীবনে, না নানক গৌরের জীবনে পেলাম; তাইত তাঁকে গুরুর পদে বরণ করতে মন আমার দ্বিধা বোধ করে না। যে লোক নিজ শিষ্যদ্বয় বিজয়কৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁদের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করতে পারে, যে লোক আবার সেই বিজয়কৃষ্ণের গুরুত্যাগ ও অশ্রাব্য গুরুনিন্দা সত্ত্বেও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীদরবারের বিদ্রোহী শিষ্যের শূন্য আসন পেতে রাখতে পারে—যে লোক এই শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে এবং সেদিনকার বেদী গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেও প্রত্যাখ্যাত হল, এবং যে লোক তা সত্ত্বেও, রোগশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় যখন তার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়, উঠিয়া টলিতে টলিতে তাঁর চরণধূলি মাথায় নিতে পারে—যে লোক দীক্ষা-গুরু হয়ে প্রতিকূলতাকারীদের অমানুষিক বৈরনির্য্যাতন সত্ত্বেও তাঁদের শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে সাষ্টাঙ্গে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে পারে—তার চরণে আমার দেহমন প্রাণ যে নিজেই লুটিয়ে পড়ে, ও তাই, আমি গুরু-সম্বোধন না করে আর থাকতে পারি না। জয় গুরু! জয় গুরু!! জয় গুরু!!! এমন গুরুসঙ্গলাভে আমার ভক্তির উৎস যখন আরো উচ্ছ্বসিত হয়—তখন পরকে আপন মনে হয়, শত্রুকে মিত্র মনে হয়; তখন প্রতিকূলকে অনুকূল মনে হয়, অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে হয়; তখন অভাবকে মহাভাব মনে হয়, রিক্ততাকে সিক্ততা মনে হয়, তখন মানুষকে দেবতা মনে হয়, তোমাকে আমা মনে হয়, আমাকে তোমা মনে হয়।

আর একটি কথা—প্রকৃত ভক্তি মানুষকে পুণ্যবান্ করে—তার চরিত্রকে শুদ্ধ পবিত্র করে। যদি কেউ বলে, অমুক লোকটা খুব কীর্ত্তনে মাততে পারে, খুব চোখের জল ফেলতে পারে, অথচ তার চরিত্রে কিছু কিছু দোষ আছে, তাহলে বুঝতে হবে, তার একবিন্দু ভক্তি নেই, তার আছে কেবল সাময়িক ভাবুকতা; কারণ আমাদের এ কথা ভাল করে জেনে রাখা দরকার যে, অসচ্চরিত্র ব্যক্তি কখনও ভক্ত হতে পারে না। যেখানে ভক্তির মত্ততা, উচ্ছ্বাস কিম্বা উত্তেজনা থাকে, সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ তিষ্ঠিতে পারে না। ভক্তির বান ডাকলে সেই বানের স্রোতে সকল প্রকার আবর্জ্জনা বিদূরিত হয়। বহুকালের কালিমা যা আমাদের জীবনে সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং দেহ, মন, আত্মাকে কলঙ্কিত করে, সব এই ভক্তির জোয়ারে, ভক্তির আন্দোলনে বিধৌত হয়ে যায়। যখন সকল আবর্জ্জনা, সকল কালিমা পরিষ্কৃত হোল, তখন জীবন-নদী স্বচ্ছ হল। তাই যাঁরা ভক্ত, তাঁদের জীবন কাচের মত স্বচ্ছ হয়, অন্তর বাহির তাঁদের নির্ম্মল হয়, দেহের ওপর অন্তরের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তির উচ্ছ্বাস ও মত্ততা যত প্রবলতর আকার ধারণ করে, জীবননদী তত আন্দোলিত হয় এবং এই আন্দোলন হেতু জীবনের সকল পঙ্কিল মলিনতা বিকার চলে যায়। তাই বলি, ভক্তি যখন মানুষের জীবনকে অধিকার করে, তখন তার "মুখে হাসি, আর মনে গরল" থাকতে পারে না; তখন শঠতা, ভণ্ডামি তার জীবন হতে চিরদিনের জন্য বিদায় নেয়। তাই বলি, যদি প্রাণসখাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়, মন, প্রাণ ভক্তিগঙ্গাজলে বিশুদ্ধ কর। বল, বল, সাধক, সেই চিরসুন্দরকে, সেই হরিসুন্দরকে, কোন প্রাণে মলিন আসনে

বসতে দেবে? আজ আমাদের মণ্ডলীতে, দেশের জীবনে, জগতের জীবনে রিপুর প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—কাম ক্রোধের সেবায় যুবক যুবতীরা মত্ত হয়েছে—এস, এস, ভক্তিদেবী, তোমার প্রবল বন্যা নিয়ে এস, সব পাপ তাপ ভেসে যাক—আমার জীবনে যখন তোমার আগমনে বিবেকের বাঁশী বাজতে পারে, তখন আমার ভাইবোনদের জীবনে কেন বাজবে না? তোমার আগমনে যদি আমার ক্রোধ, রাগ অনুরাগে পরিবর্ত্তিত হতে পারে—যদি আমার সকল কামরস নামরসে ডুবে যেতে পারে—যদি আমার সকল লোভ বিচ্ছেদজনিত ক্ষোভে পরিবর্ত্তিত হতে পারে—যদি আমার সকল মোহ ভুবনমোহনের পাদপদ্মে বিলীন হতে পারে, তবে সব ছেলেমেয়েদের, সব নরনারীদের কেন হবে না?

আমাদের মণ্ডলীতে অনেক জ্ঞানী কর্ম্মীর মনে ভক্তির মত্ততা সম্বন্ধে বহু ভুল ভ্রান্তি আছে। তাঁরা ভক্তির মত্ততা, উচ্ছ্বাসকে "অসংযত" বলে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, এবং আপনাদের লেখনীর মুখে সেই অশ্রদ্ধার ভাবকে সঞ্জীবিত রাখতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, ভক্তি কোনো নাটকীয় ব্যাপার নয়, ইহা জীবনগত ব্যাপার। যিনি জীবনের জীবন, যিনি জীবনাকাশে পূর্ণ প্রেমচন্দ্ররূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন, সেই প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে জীবনের নদীতে ভক্তি-তরঙ্গ উত্থলিত হয়। ভক্তির উচ্ছ্বাস কিম্বা মত্ততা এই তরঙ্গ বই আর কিছু নয়। এই তরঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা তরঙ্গ নিজে নয় যে, তাকে বলবো, তুমি সংযত হয়ে উদ্বেলিত হও। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মালিক হলেন স্বয়ং পূর্ণপ্রেমচন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি। ভক্তের দেহ, মন, প্রাণ যে মত্ততায় উদ্বেলিত হয়, তার জন্য দায়ী, ওরে ভাই, সেই প্রাণসখার চন্দ্রমুখ এবং তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। এই ভক্তির মত্ততার জন্য, অসংযমের জন্য, যদি দোষ দিতে চাও, তাহলে ভক্তকে দোষ দিয়ো না, ভক্তসখাকে প্রাণভরে দোষ দাও—তিনি কেন ভক্তহৃদয়কে আকর্ষণ করেন—এই কারণেই ত ভক্তিকে অহেতুকী ও নিরবলম্ব বলা হয়। তাই বলি, হে জ্ঞানী, হে কর্ম্মী, ভক্তির জোয়ার যদি তোমার প্রাণকে সিক্ত না ক'রে থাকে, তবে ভক্তকে অমন কঠোর ভাবে পরোক্ষে নিন্দাবাদ ক'রে লোকচক্ষে হেয় করতে চেয়ো না। বরং এসো, সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে সেই ভক্তের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তাঁর কৃপাবারি-বরষণে আমাদের হৃদয়ভূমিতে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়—এবং তখন সেই ভক্তির উন্মেষ ও বিকাশের মধ্যে, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, ভক্তের জীবনে ভক্তির মত্ততা বুঝতে পারবো, উপলব্ধি করতে পারবো, শ্রদ্ধা করতে পারবো।

আজ তাই যেখানে নবযুগের নব গোরা ভক্ত ব্রাহ্মানন্দের অবমাননা দেখতে পাই, যিনি এই যুগে এই কলিকাতার রাজপথে গৌরমণিকে বুকে নিয়ে, ভক্তির অপূর্ব্ব অবতার হয়ে, নৃত্য করে, কীর্ত্তন করে হরিনাম বিলালেন—যিনি অজ্ঞানী ভক্ত ছিলেন না, বরং জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন, যিনি অকর্ম্মণ্য বৈরাগী ছিলেন না, বরং কর্ম্মঠ ভক্ত বৈরাগী ছিলেন—এ হেন ভক্ত-চূড়ামণিকে যখন আমরা সঙ্গীত কীর্ত্তন থেকে বাদ দিয়ে—যে যে কলিতে তাঁর নাম উল্লেখ আছে, সেই সব কলি বর্জ্জন করে ভক্তিতে মাতবার চেষ্টা করি, তখন মনে হয় ভক্তের ভগবানের সঙ্গে আমরা উপহাস করতে বসেছি—প্রাণকে তখন ধিক্কার দিই, অনুশোচনায় তখন প্রাণ কেঁদে ওঠে। এই কিছুদিন আগে এইরূপ আচরণ দ্বারা এক ধনীর আলয়ে গরীব কেশবকে নির্ম্মম বেত্রাঘাতে তিন তলার ঘর থেকে বিতাড়িত হতে দেখেছিলাম! হে ধনী! তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে, যে সেই প্রত্যেক কশাঘাত আমার দেহ, মন, প্রাণকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল? ওহে ধনী! কে তোমাকে ঈশা, মুষা, জন, গৌর আদি মহাজনের চরিত্র-দর্শনে ভগবানকে দেখতে শিখালে? সে কি সেই লোক নয়, যাঁকে শ্রী অঘোরনাথ প্রভু বল্লেন, আর আজ সেই পবিত্র অঘোরনাথের স্মৃতি বক্ষে ধরে আমি যাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছি? আজ যে আমি ঈশা, মুষা, মহম্মদ, গৌরকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারছি, তাঁদের বক্ষে নিয়ে ভক্তিতে মত্ত হতে পারছি, সেত সেই সমন্বয়কারী গুরু কেশবাচার্য্যের শিক্ষাবলে। তাই বলি, এস, সবে ভক্তিতে মত্ত হই, তাহ'লে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় যে সকল বস্তু ও মানুষ আছে, সে সকলকে শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্পণ করতে নিজেকে কুণ্ঠিত বোধ করব না। নূতন বিধানের ভক্তিতে যে আমাদের সকলের মুক্তি হবে—সাধু, অসাধু, ভক্ত অভক্ত, এঁদের সকলকে এই ভক্তির পথে গিয়ে গ্রহণ করতে হবে; তবেই মুক্তি, নচেৎ নয়। তুমি যদি মনে কর, গ্রহণ করে, কেবল ভগবান্‌কে সাধু ভক্তকে বর্জ্জন করে, মুক্তি লাভ করবে, সে আশা পূর্ণ হবে না। হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম! তুমি যদি নিজ জীবনে সকল সাধু মহাজনের মিলন ঘটাতে চাও, তবে সেই জীবনাদর্শ সম্মুখে রাখ, যার ভিতর সকল দেশের ও সকল কালের সাধু মহাজনের মিলন এই যুগে হয়েছে। সেই মিলনের আদর্শ চরিত্র শ্রীকেশবচরিত্র সম্মুখে রাখ, এবং ভক্তি অনুরাগের সহিত সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হও—ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ, অপার করুণা ও কৃপালাভে কৃতার্থ হবে, সুখী হবে, শুদ্ধ হবে।

যে সব ভক্তির কথা বল্লাম, আজ অকপটহৃদয়ে এই বেদী হইতে স্বীকার করছি যে, এ সকল ভক্তি-রত্ন গুরু-সন্নিধানে লাভ করেছি। অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে গুরুর পদতলে বসে শিক্ষা করি নি। জীবনে ভাল করে পরীক্ষা করে, বাজিয়ে নিয়ে, বিজ্ঞানের তৌলদণ্ডে ওজন করে, নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তারপর গ্রহণ করেছি। তাই আজ এইরূপ গ্রহণের ভিতরে অপার আনন্দ, শান্তি, সাহস, শক্তি বিবেক, পুণ্য, অনুরাগ, মত্ততা, প্রেম ও মিলনলাভে ধন্য হইতেছি। গুরুদেবের Spiritual anatomy, আধ্যাত্মিক জীবনের গঠন কিরূপ, যদি

জানতে চাও, বুঝতে চাও, দেখতে চাও, তাহলে তাঁর "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" পাঠ কর—ইহা এক অপূর্ব্ব যোগ-ভক্তি-রত্নের খনি—যে খনন করবে, সেই পাবে—আমি খনন করেছি, আর পেয়েছি—তাই তোমাদের সকলকে ডাকছি, রত্ন আহরণ করবার জন্য। এস, সকলে ভক্তি সম্পদে বড় লোক হয়ে যাই, হরিজন হয়ে যাই। শ্রীহরি কৃপা করুন।

—•—

জন্মদিনে জীবন-ভিক্ষা।

জন্মাবধি ভেবেছি যা পাপ চিন্তা মনে,
বলেছি অকথ্য কথা যা লোকের কাণে;
করেছি অকাজ জ্ঞানে অজ্ঞানে জীবনে,
দাও ধুয়ে সিন্ধুনীরে আজি জন্মদিনে।
করি পরিবর্ত্তন পুরাতন জীবনে,
দাও নবজনম তব নববিধানে।
গাঁথি শ্রীকেশব-অঙ্গে বিশ্বজন সনে,
করি নবশিশু প্রিয় রাখ মা চরণে।

(১৬ই জুলাই)

—•—

পুণ্য-স্মৃতি

(স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে)

তুমি ছিলে জন্ম সাধু সরল বিশ্বাসী,
চিত্ত আড়ম্বরহীন; গৈরিকবিলাসী
স্বামীজি, গুরুজি নও। কামিনীকাঞ্চন-
ত্যাগী বলে চাহ নাই খ্যাতি আস্ফালন।
নিজেরে চাহনি তুমি করিতে প্রকাশ,
চিরদিন ধরেছিলে কি অজ্ঞাতবাস!
তবু তব জীবনের সৌরভ গরিমা
নবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, তাহারি মহিমা
আত্মদানে, চিত্তজয়ে; করি নাক ভয়,
মৃতকল্প এ মণ্ডলী হরিবার নয়!
মঠে, ঘটে, পটে, আজো চলে ব্যবসায়,
কুণ্ডলী পাকায়ে ধর্ম্ম ফিরে পঙ্গু প্রায়!
নববিধানের সাধু বল—"নাহি ভয়,
সত্য যাহা, তার জয় হবে সুনিশ্চয়।"

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

—:—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২২শে আষাঢ়, ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবী শ্রীনিত্যকালী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পুরী নবপর্ণকুটীরে উপাসনা ও বাগনান নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীগণের উৎসব হয়।

দান—আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ সরকার, ১৩ই জুলাই, মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে জুন, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে প্রাতে শান্তিকুটীরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত ও প্রসঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ লিখিত "পুণ্যস্মৃতি" কবিতা পঠিত হইলে, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় নালুদার জীবন বিষয়ে সুন্দর প্রসঙ্গ করেন। কবিতাটী স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

গত ২রা জুলাই, ১৩২নং রাসবিহারী এভিনিউতে, ডাক্তার সত্যানন্দ রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বানার্জি উপাসনা করেন।

হাওড়ায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জির লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, গত ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে এবং ১০ই জুলাই সন্ধ্যায় তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই দুই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১০ই জুলাই রাত্রে, হাওড়ায়, ১৯নং কুচিল সরকার লেনে, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার ২৲, কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুপ্রভা ধর ১৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ১১ই জুলাই, ২৪।৩ বাহির মির্জাপুর রোডে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁদের পিতৃদেব স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিন ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই জুলাই, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে, স্বর্গীয় সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী বিশেষ প্রার্থনা এবং প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

পুরীর সংবাদ—গত ৩০শে জুন, ভাই প্রমথলাল সেনের সাম্বৎসরিক দিনে পুরী নবপর্ণকুটীরে দুই বেলা বিশেষ উপাসনা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষেও কয়দিন বিশেষ ভাবে পরলোকসাধন হয়।

কোচবিহার-সংবাদ—কুচবিহার হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

গত ১২ই জুন, আমাদের মাননীয়া মহারাজকুমারী ইলা দেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষে মহামান্যা মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী পুত্রকন্যাসহ ও মাননীয়া শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী পুত্রকন্যাসহ এখানে আসিয়াছিলেন। উঁহারা সমাধি ও মন্দির পরিদর্শন করেন। এবং গত ১৭ই জুন, প্রাতে মহামান্যা মহারাণী সুচারু দেবী স্থানীয় নববিধান মন্দিরে খুব হৃদয়গ্রাহী উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত দুইটী সুন্দর সংগীত করেন। আমি ব্যক্তিগত প্রার্থনা, নাম পাঠ, আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করি। মহারাণী দেবী ও মৃণালিনী দেবী স্থানীয় বিধবাশ্রমও পরিদর্শন করিয়া বেশ সুখী হইয়াছেন।"

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 1st. August, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে অসহায়ের সহায়, আমাদের মত অসহায় আর কে? যাঁহাদিগকে তুমি যুগে যুগে পৃথিবীতে ধর্ম্মের বাহকরূপে পাঠাইয়াছ, তাঁহাদিগ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণ লোক সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের জীবন-যোগে ধর্ম্মের কত সহায়তাই লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা আছে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়"; তাঁহারা আপনাদের জীবনে ধর্ম্মের আচরণ করিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে শিখাইয়াছেন। তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া সকলে অনেক শিখিয়াছে। নবযুগে যাঁহারা ধর্ম্মের আচরণ দ্বারা অন্যকে শিক্ষা দিতে, অন্যকে উদ্বুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের অনেক পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে সে শ্রেণীর ব্যক্তি আর খুঁজিয়া পাই না। তাই আমাদিগকে আমরা অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছি। কিন্তু শ্রীঈশা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাই, ইহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর; কেন না, আমি চলিয়া গেলে, পবিত্রাত্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে ধর্ম্মপথে শিক্ষা দিবেন, জানাইবেন, পরিচালন করিবেন।" তবে আমরা নবযুগের প্রেরিতদিগের সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে বর্ত্তমানে বঞ্চিত হইয়া যে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর; কেন না, আমরা অসহায় অবস্থায় পড়িয়া সাক্ষাৎ ভাবে, তুমি যে পবিত্রাত্মা-রূপী জীবন্ত দেবতা, তোমার সহায়তা পাইব। তুমি আমা-দিগকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিশেষ অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া, অসহায়ের সহায়রূপে তোমাকে আশ্রয় করিবার, একমাত্র তোমাকে সহায়রূপে গ্রহণ করিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ আমাদিগকে দিতেছ। কিন্তু দেখ, এখনও আমরা অসহায়ের সহায়রূপে সর্ব্বাবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হই নাই। এখনও তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়া অন্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে, অন্য হইতে সহায়তা পাইতে লোলুপ হইতেছি। ইহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা অকল্যাণকর, কেন না, তুমি সহায় না হইলে জীবনপথে পৃথিবীর কাহারও সহায়তা পাইতে পারি না; স্বর্গ লোকেরও কোন সাধু মহাজন, ভক্ত বিশ্বাসীর সহায়তা পাইতে পারি না। পবিত্রাত্মারূপী গুরু তুমি, শিক্ষক তুমি। তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনে জয়যুক্ত হইবে, এইজন্য তোমার এই বিশেষ ব্যবস্থা। অতএব আমাদিগকে প্রকৃত বিশ্বাসে বিশ্বাসী কর, তোমাতে খুব নির্ভরশীল কর, আমাদের দুর্ব্বল অন্তরে তুমি স্বর্গের বল

বিধান কর। সকল অবস্থায় অগ্রে তোমারই সহায়তা ভিক্ষা করি, তোমারই সহায়তা গ্রহণ করি; তোমাকেই পরম সহায়রূপে, গুরুরূপে, শিক্ষকরূপে, নেতারূপে গ্রহণ করিয়া তোমার নববিধানকে, পবিত্রাত্মার বিধানকে জয়যুক্ত করি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

নববিধান নূতন ধর্ম্ম। নূতনত্বেই ইহার বিশেষত্ব। এই নিত্য নূতনত্বের উৎস কে? উৎস স্বয়ং ঈশ্বর। অনন্ত ঈশ্বর হইতে ক্রমাগত বাহ্য জগতে নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে; অনন্ত ঈশ্বর হইতে ক্রমাগত অধ্যাত্মরাজ্যেও নূতন নূতন ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ হইতেছে, নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে, নূতন নূতন স্বর্গের বাণী সাধকজীবনে ধর্ম্মের সুসমাচাররূপে অবতীর্ণ হইতেছে, নূতন শিক্ষার দ্বার খুলিয়া যাইতেছে।

নববিধানের শিক্ষাক্ষেত্র বিচিত্র, নববিধানের শিক্ষাক্ষেত্র অনন্ত। এখানে শিক্ষক কে, গুরু কে? অনন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং এখানে শিক্ষক এবং গুরু। নববিধানের শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন্ত বেদ-বিদ্যালয় কোথায়? বেদ-বিদ্যালয় সাধকের জীবন-গৃহ। সাধকের জীবন-গৃহরূপ বেদ-বিদ্যালয়ে জীবন্ত ঈশ্বর গুরু হইয়া, শিক্ষক হইয়া—অনুগত আশ্রিত শিষ্যকে স্বর্গের টাট্‌কা ধর্ম্ম বিতরণ করেন, স্বর্গের নূতন বাণীতে শিক্ষাদান করেন। এই বিদ্যালয়ের যে কোন শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিলে বুঝিতে পারা যায়, স্বর্গের ধর্ম্মের সঙ্গে পৃথিবীর ধর্ম্মের তফাৎ কি? পৃথিবীর ধর্ম্মের তফাৎ কোথায়? পৃথিবীর ধর্ম্ম বলে, লিখিত পুস্তকাকারে আমার বেদ আছে, উপনিষদ আছে, আমার বাইবেল আছে, আমার কোরাণ আছে; ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা শিক্ষক, ধর্ম্মক্ষেত্রে গুরু, বিশেষ বিশেষ উপাধিধারী শাস্ত্রজ্ঞানে পরমজ্ঞানী, ধর্ম্মের বিশদব্যাখ্যাতা, সমাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত, অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত সুযোগ্য পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী, বিশপ, মলোয়ানা, মৌলবী আছেন। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় চিহ্নিত, শাস্ত্র ও মহাপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। শাস্ত্র ও মহাপুরুষের গণ্ডির বাহিরে তাঁহারা কিছু শুনিতেও চাহেন না, মানিতেও চাহেন না; শুনিতে চাহিলে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য আর থাকে না, মনে করেন। নববিধান বলেন, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই আমার বটে; পৃথিবীতে স্বীকৃত ভারতের ঋষি, যোগী, ভক্তকুল, অন্য দেশের এব্রাহাম, মুষা, ঈশা, মহম্মদ, সকল মহাপুরুষই আমার মান্য এবং আমা কর্ত্তৃক স্বীকৃত সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল বেদ বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল পাঠ করিয়া শুনায় কে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝায় কে? ঋষিকুল, যোগিকুল, ভক্তকুল, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, বুদ্ধ, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের ও অন্যান্য সাধুভক্তদিগের জীবন্ত জীবনবেদ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করে কে? ধর্ম্মের সকল ধারার শিক্ষা দেয় কে? নববিধান-ক্ষেত্রে উপাধিধারী গুরু নাই, শিক্ষক নাই। এখানে আদি গুরু, আদি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মব্যাখ্যাতা, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, সাধুজীবন-ব্যাখ্যাতা স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি একমাত্র পরম গুরু ও পরম শিক্ষক। নবধর্ম্ম নববিধানের সাধক-শিষ্য ধর্ম্মের ক, খ, হইতে আরম্ভ করিয়া সেই জীবন্ত গুরু ঈশ্বর হইতে পাঠ গ্রহণ করেন এবং তাঁহা হইতে ছোট বড় সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাঁহারই একমাত্র উপদেশ ও শিক্ষা অনুসরণ করেন। এখানে শিক্ষার আরম্ভ হইল, ইহার শেষ কোথায়? এই শিক্ষা ইহকাল পরকাল অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিবে।

এখানে বিশেষ কথা এই, এখানকার শিক্ষা, ব্যাখ্যা, এখানকার ধর্ম্মালোক ও ধর্ম্মতত্ত্ব কোন বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রে, কিম্বা কোন বিশেষ মহাপুরুষের জীবনে আবদ্ধ নহে। প্রমুক্ত ঈশ্বর, প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বীকৃত ও মান্য মহাপুরুষদিগের প্রতি কোনরূপ অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনার ভাবে, আপনার পদাশ্রিত ক্ষুদ্র শিষ্যের ক্ষুদ্র জীবনের প্রয়োজন বুঝিয়া ধর্ম্মের শিক্ষাদান ক, খ, হইতে আরম্ভ করেন; এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতম শ্রেণীর শিক্ষার দিকে, শিষ্যের প্রকৃতি ও উপযোগিতা বুঝিয়া তাহাকে অগ্রসর করেন। এখানকার শিক্ষায় সকল সত্য শাস্ত্রের সঙ্গে মিলন আছে, সকল শাস্ত্রের মান্য আছে, গ্রহণ আছে; সকল মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে গূঢ় যোগ আছে, তাঁহাদের মান্য আছে, তাঁহাদিগের গ্রহণ আছে; কিন্তু কোন শাস্ত্রে বা মহাপুরুষে সে শিক্ষা আবদ্ধ নহে। শিষ্য আপনার জীবনের বিশেষ

অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারেন, তাঁহার জীবন অতি সামান্য এবং ক্ষুদ্র হইলেও, সেই জীবনের ভিতরে স্রষ্টা ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা, অনন্ত শিক্ষা-পিপাসা, অনন্ত ধর্ম্মপিপাসার অঙ্কুর রোপণ করিয়া, সে জীবনে অনন্ত উন্নতির দ্বার প্রমুক্ত রাখিয়াছেন। সেই অনন্ত ঈশ্বরের সংস্পর্শে সে সকল জ্ঞান-পিপাসা, ধর্ম্ম-পিপাসা, শিক্ষা-পিপাসা জাগিয়া উঠে; সেই অনন্ত ঈশ্বর হইতেই সেই পিপাসার একমাত্র উচ্চ তৃপ্তি এবং সেই পিপাসার ক্রমিক তৃপ্তিতে মানবজীবনের মহতী উন্নতি ও উচ্চ পরিণতি।

সাধারণতঃ অধিকাংশ মানুষ অর্থাগমের উপযোগী সামান্য বা সীমাবদ্ধ শিক্ষা লাভ করিয়া, যেন জীবনের শিক্ষা শেষ করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের জীবনে জ্ঞানলাভের, শিক্ষা-লাভের অনন্ত পিপাসা জাগ্রত হয় না। তাঁহারা আপনাপন বিষয়ক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া, অবশিষ্ট মূল্যবান্ সময় খেলা ধূলা করিয়া বা বাজে গল্প গুজব করিয়াই কাটাইয়া দেন। পৃথিবীর সসীমের সঙ্গে তাঁহাদের শিক্ষার আরম্ভ, সসীমে তাঁহাদের শিক্ষার তৃপ্তি, সসীমে তাঁহাদের শিক্ষার শেষ পরিণতি। যে শিক্ষায় পৃথিবীর অর্থাগম, পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্যলাভই যে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, পার্থিব বিষয়-সম্ভূত, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন-বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ-পাঠই যে শিক্ষালাভের প্রধান উপায়, সে শিক্ষায় অন্তরস্থ অনন্ত জ্ঞানপিপাসা ধর্ম্মপিপাসা কি প্রকারে জাগিতে পারে? তাই সসীম শিক্ষা সসীমেই শেষ। সুধু তাহাই নহে; বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রও যদি কেবল মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-যোগে শিক্ষা করা যায়, তাহাতেও অনন্ত শিক্ষার দ্বার খুলিয়া যায় না, শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয় না। মুণ্ডকোপনিষদের একটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ প্রভৃতি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যদ্দ্বারা অবিনাশী অক্ষর পরম পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কি উপায়ে সেই পরম পুরুষকে জানা যায়? সেই পরম পুরুষ দ্বারাই পরম পুরুষকে জানা যায়। তিনি মানুষের অন্তরে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া, গুরু হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন, ব্রহ্মজ্ঞানের উৎস হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। ধর্ম্মপথে যথার্থ শিক্ষক, যথার্থ গুরু একমাত্র ঈশ্বর।

নব যুগে নববিধানে জীবন্ত ঈশ্বর গুরুর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। এখন শিষ্য চাই। নবযুগে একমাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সুশিষ্যের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের প্রকৃতি মধ্যে শিষ্যভাবের অভাব দেখিয়া ভীত হইতেছি। কবে অনুগত সুশিষ্য হইয়া পরম গুরুর নিকট অনন্ত জীবনপথে পরম শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইব?

ধর্ম্মতত্ত্ব

নববিধানে নূতন বিধি।

প্রাচীন বিধানে শরীর-নিগ্রহ, ভার্য্যা-পীড়ন, সংসার ছাড়িয়া অরণ্যগমন, গৈরিক-কমণ্ডলুধারণ বৈরাগ্যের লক্ষণ। নববিধানে আত্মার মন্দির-বোধে শরীরের প্রতি যত্ন ও অকুণ্ঠিত সেবা, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী জানিয়া তাঁহার সঙ্গ সহবাসে নীতিধর্ম্ম-পালন ও বৈধভাবে দৈহিক যাবতীয় কর্ত্তব্যসাধন, সংসারকে তীর্থ জানিয়া সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সাধন, ইহাই যথার্থ বৈরাগ্য। একমাত্র স্বার্থনাশই বৈরাগ্য।

নববিধান রাজরাজেশ্বরের বিধান।

সম্রাট রাজ্যের রাজা, যদি কোন বিধি বা বিধান করেন, তাহা প্রজাবর্গকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। যদি কোন প্রজা তাহা অবজ্ঞা করে কিম্বা পালন না করে, তাহাকে রাজ-দ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইতে হয়। নববিধানও তেমনি বর্ত্তমান যুগের রাজবিধি, রাজরাজেশ্বরের ইহা নবসংহিতা। এই নব-সংহিতা নববিধান যে না গ্রহণ করিবে বা পালন করিতে অবহেলা করিবে, তাহার স্বর্গরাজ্যে স্থান হইবে না, সংসার-কারায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহাকে বিধানদ্রোহী বলিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

চিন্তা-সংযম।

খাদ্য পরিপাক না হইলে নিদ্রার সময় স্বপ্ন-দর্শন হয়। তেমনি মনঃ-সংযম সাধন না হইলে, মনে নানা প্রকার অসার চিন্তা আসিয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন যেমন, জাগ্রত অবস্থায় অসার চিন্তা তেমন। আত্ম-সংযম ও প্রার্থনা অসার চিন্তা-নিবারণের উপায়।

জন্মোৎসব।

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "এ জীবন বেদ"। প্রত্যেকের জীবনে ভগবান তাঁহার ভাগবত রচনা করেন। বাস্তবিক এ

মানব-জন্ম সামান্য নয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই জন্মদিন বিশেষ স্মরণের দিন, সাধনের দিন। যে দিন বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপায় ও কৌশলে এই দেহে পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা আমাদিগের বিশেষ সম্ভজনীয় দিন, বিশেষ উৎসবের দিন। যদি এই দিনে মার চরণতলে বসিয়া আমাদের জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, বিধাতার স্বহস্তে লিখিত কত ঘটনাই আমরা পাঠ করিয়া ধন্য হই। কত বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি এই জীবন-ভাগবত রচনা করিয়াছেন, আমরা দেখিয়া অবাক হই। দুঃখ, বিপদ, রোগ, শোক, পরীক্ষা, পাপ, তাপ এই সকলের ভিতর দিয়া, বিধাতা পিতামাতা গুরু বন্ধু সখা সুহৃদ্ শাস্তা চিকিৎসক সেবক হইয়া, আমাদিগের মানবত্ব ফুটাইবার জন্য আমাদিগের এই জীবনগঠনে সহায় হইয়া রহিয়াছেন। সাধুদিগের দেব জীবন বিধাতার কৃপায় সিদ্ধ, কিন্তু সাধারণ মানবের জীবন সাধনসিদ্ধ করিয়া গঠনদানে যেন মানবত্বের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন। এই জন্যই তিনি যেন আমাদিগকে এত দুঃখ-দারিদ্র্য-পাপ-পরীক্ষা-সঙ্কুল অবস্থার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতেছেন। পঙ্কের ভিতর হইতে জাত পঙ্কজ পদ্ম যেমন সকল ফুল অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বরের চরণের সহিত তাহার তুলনা হয়, তেমনি এই মানবজীবনও পাপ-পঙ্ক হইতে পঙ্কজরূপে প্রস্ফুটিত হয়, ইহাই যেন আমাদের এই পাপ-জীবনে বিধাতার অভিপ্রায়। বিধাতা আমাদিগকে কত প্রিয় মনে করেন, ইহা স্মরণে যেন উৎসবানন্দে আনন্দিত হই।

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত)

বিশ্বের মহোৎসব—

বিশ্বের মহোৎসব হইতে যদি আমি সরিয়া দাঁড়াই ও তাহাতে যোগ না দিই, তবে সে মহোৎসবে আমার কি লাভ? হে আমার প্রিয়তম দেবতা, আমি অনন্তকাল ধরিয়া তোমার পূজা ও বন্দনা করিব, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। ভবিষ্যতের নরনারীগণ যদি আমাদের অপেক্ষা উত্তমরূপে তোমার সেবা করেন, তোমার নাম গান করেন, তোমার স্তব করেন ও তোমার নিকটে প্রার্থনা করেন—তাহাতেই বা আমার কি উপকার? হে আমার ঈশ্বর, আমার হৃদয় বর্ত্তমানেই সেই মহা ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া তোমার মহিমা-কীর্ত্তনের অভিলাষী। বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও ঐ পরমাশ্চর্য্য গগনমণ্ডল শান্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে, তখনও সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী আলোক ও আনন্দের বার্ত্তা বহন করিবে, তখনও ঐ শৈলমালা তুষারের পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণ করিবে, তখনও কুসুমরাশি বিকশিত হইবে—কিছুই ফুরাইবে না, কিছুরই অবসান হইবে না। তোমার সৃষ্টিকে তুমি অনন্তজীবন দান করিয়াছ, কেবল যে আমারই মৃত্যু ঘটিবে, ইহা কখনও সম্ভব নয়। আমি যে তোমার সন্তান, আমি যে তোমার সেবক, প্রকৃতির অমৃত-মন্দিরে আমি যে তোমার পুরোহিত। ঐ যে মহা গগনমণ্ডল, ঐ যে নক্ষত্রমালা, ঐ যে তুষাররাশি—বিশ্বের যে সৌন্দর্য্য আমি দেখিতেছি, যে সঙ্গীত আমি শুনিতেছি—এই সমুদয় কি আমার অন্তরে নয়? আমার আত্মা এই বিশ্বতীর্থে চিরযাত্রী হইয়া তোমারই অন্বেষণে ছুটিয়াছে। ঊর্দ্ধে এবং অধোতে এমন কোন্ স্থান আছে, যাহা আমার বিশ্বাস ও প্রেমের নিকটে সংগুপ্ত? যখন আমি সকল বস্তুর মধ্যে, সকল বস্তু আমার মধ্যে এবং সর্ব্বোপরি যখন তুমি আমার বাসগৃহ, তুমি আমার বিশ্রাম-ভবন এবং তুমিই আমার জীবন, তখন ত আমার মৃত্যু নাই। আমি যে ইহলোকে থাকিতে থাকিতেই অমৃতের অধিকারী হইয়াছি।

উপাসনায় বিহ্বলতা—

ভগবানকে দেখা, তাঁহাকে চিনিতে পারা, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ অনুভব করা, তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার সহিত যোগ—তাঁহাকে অন্বেষণ ও তাঁহাকে লাভ করার এইগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রম বা সোপান। আমি এই সোপানগুলিকে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আমার আত্মার সাক্ষ্য এই যে, এই সোপানমালার ঊর্দ্ধে আরও এক প্রকার দিব্য দর্শন আছে, যে দর্শনে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা ও আত্মপ্রকাশ মানুষকে অভিভূত করে। তখন মানুষ বিহ্বল হইয়া পড়ে, এমন কি, তখন মানুষের চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়।......বুঝি বা ইহলোকেই হোক, কিম্বা পরলোকেই হোক, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক দিন এই অবস্থা আসিবে। কাহার জীবনে ঠিক কি আকারে এই বিহ্বলতা আসিবে, তাহা ভগবানই জানেন। আমি এই অবস্থা পাইবার জন্য আশা ও বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা করিয়া আছি।

মৃত্যুচিন্তা—

মৃত্যুর কথা ভাবিও না। তোমার সমুদয় শক্তি সামর্থ্যের ব্যবহার কর, যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, দৃঢ়তার সহিত তাহা সম্পন্ন কর, একটী সুযোগকেও অবহেলা করিও না। এমন উদ্যমপূর্ণ থাকিবে যে, যেন জীবন ফুরাইবার নহে। ভগবান্ তোমার উপরে যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা বহন কর। তাঁহার পরে যে দিন ডাক আসিবে, ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরেরই হস্তে সমর্পণ করিয়া বিশ্রাম-ভবনে প্রবেশ কর—বুঝিবে যে, প্রভুর সেবাব্রত উদ্যাপন হইল।

প্রত্যেক মানুষই অদ্ভুত—

প্রত্যেকেই অপর সকল মানুষ হইতে স্বতন্ত্র। একব্যক্তি যে পরিমাণে সরল, সহজ, সত্যনিষ্ঠ এবং জীবনের উচ্চভূমিলাভের প্রয়াসী, ঠিক সেই পরিমাণে সে ব্যক্তি অদ্ভুত। আমাদের প্রত্যেককে নূতন পথ দিয়া ব্রহ্মের সমীপে যাইতে হইবে। সেই পরমাত্মা স্বয়ং আমাদের প্রত্যেকের পথপ্রদর্শক। আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের ভার, হে প্রভু, তুমিই অংশতঃ বহন করিয়া থাক।

হে সন্তান, তোমার ভাইদের বিপদ পরীক্ষাকে তুচ্ছ করিও না। তাহাদিগকে তোমার সহানুভূতি দেও, তাহাদিগকে মমতা ও স্নেহপ্রীতি দেও; এবং যদি পার, যে আগুনে তাহারা পুড়িতেছে, সেই আগুন হইতে একখণ্ড কাঠ টানিয়া সরাইয়া ফেল। ইহার অধিক আর পরস্পরের জন্য আমরা কি করিতে পারি? ভগবানের চরণে যাইবার পথ দীর্ঘ এবং দুর্গম, সে পথে নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী চলিতে হয়। আমার কণ্ঠ পিপাসায় শুষ্ক হইয়াছে, হে সন্তান, আমার মুখে একটু শীতল জল দান কর, ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

শ্রীকেশব-সঙ্গ-গ্রহণের পূর্ব্বকথা।

শ্রীকেশবচন্দ্রের একখানি ছবি দেখিয়া আমার মা আমোদ করিয়া বলিলেন, "এমন স্কুল খুলেছিলে, আমার সব ছেলের মাথা খেলে।"

কলিকাতায় প্রথম আসিয়া সংকল্প করিলাম, স্বাবলম্বী হইব। তখন এলবার্ট স্কুলের নাম ছিল কলিকাতা স্কুল। এই স্কুল শ্রীকেশবচন্দ্রই প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় এই স্কুলের রেক্টর ছিলেন মিঃ শ্রীনাথ দত্ত। ইনি বিলাত থেকে কৃষি-বিভাগের কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসেন। শ্রীকেশবানুজ কৃষ্ণ-বিহারী সেন তাঁকেই নিজ কার্য্যভার দিয়া, জয়পুররাজার অনু-রোধে সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ লইয়া যান।

অবৈতনিক ছাত্র-গ্রহণের জন্য স্কুলের পরীক্ষা হইবে শুনিয়া পরীক্ষা দিলাম, উত্তীর্ণ হইয়া আমি অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত হইলাম। রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় কতকগুলি ছাত্রকে খাইতে দিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া, তাঁহারই অনুগ্রহ-পত্র লইয়া রাজা দিগম্বরের সহিত পরিচিত হই এবং তাঁহার ছাত্র-ছত্রে স্থান পাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া পুস্তকাদির সাহায্য পাইলাম। তিনি অবস্থা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে," তা বেশ।

এই সময় মহর্ষিদেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠ-পোষিত National Paper পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ও তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য একটি ঘর দিলেন ও তাঁর পত্রের সহকারিরূপে গ্রহণ করিলেন। অনেক সময় আলোর অভাবে রাস্তার গ্যাসের আলোর বসিয়া পড়িতাম। জলখাবার অভাবে কলের জল খাইতাম।

আমি বাল্যকাল হইতে গোড়া হিন্দু, কিন্তু নবগোপালবাবুর প্রভাবাধীনে পড়িয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। অন্য সময়ে যত না হউক, ১১ই মাঘের উৎসবে না গেলে চলিত না। তখন সেই বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সুর করা বক্তৃতা, পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গম্ভীর মুখস্থ মন্ত্রোচ্চারণ ও গায়ক মহাশয়দিগের কালোয়াতী গান বড় ভত কিছুই বুঝিতাম না; তবে আদিসমাজের নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে মুখস্থ হইয়া আসিয়াছিল। বাড়ীতেও ব্রাহ্মধর্ম্ম বই পড়িতে শিখিলাম।

১১ই মাঘের উৎসবে তখন মহর্ষিদেবের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ছাদে যে মহাভোজ হইত, তাহাতে যোগ দান করা উৎসবের প্রধান অঙ্গ। নবগোপাল বাবুর আহ্বানে তাঁর সঙ্গে বসিয়া কি আনন্দেই সে ভূরি ভোজন হইত। সে রাধাবল্লবী লুচি, দরবেশী বড় বড় মেঠাই, ব্রাহ্মনন্দী প্রকাণ্ড গোল গোল জিলাপীর কথা কখনই ভুলিতে পারিব না। এমন জমাট উৎসব আর কোথায় হইবে।

এই প্রীতিভোজনের সময় "কেশব দলের" প্রতি একটু আধটু টিটকিরিও শুনিতাম। তাহা হইতেই কেশবদলের প্রতি বিদ্রূপ করিতেও শিক্ষা হইল।

তখনও মহর্ষিদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নাই। অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়। নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে একটু একটু পরিচয় হয়। পরে রাজনারায়ণবাবুর সহিত তাঁহার দেওঘর আবাসে গিয়া অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতা হয় ও পত্র-বিনিময় হয়।

নবগোপালবাবু জাতীয় মেলার অধ্যক্ষ ছিলেন, জাতীয় শিক্ষা ও ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিতেই উৎসাহী ছিলেন। এখন যেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির হইয়াছে, ঐ জায়গাটীতেই নব-গোপালবাবুর জাতীয় ব্যায়াম-শিক্ষার আখড়া ছিল। আমি ব্যায়াম করিতে পারিতাম না, তবে সকলকে খুব উৎসাহ দিতাম ও নীতিপূর্ণ উপদেশ দিতাম। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল নবগোপাল বাবুর প্রধান চেলা ছিলেন।

কলিকাতা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার কিছু দিন পর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বাবু আবার জয়পুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার লইলেন। স্কুলের ছাত্রদিগকে নিয়মিতরূপে সপ্তাহে একদিন করিয়া নীতিশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের শ্রেণীতে কৃষ্ণবিহারী বাবুই প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা দিতেন। স্বর্গীয় ভ্রাতা জানকীনাথ বসু আমার সহপাঠী ছিলেন। আমাদের শ্রেণীর সকল ছেলের অগ্রণী হয়ে আমি হিন্দুর গোঁড়ামি সমর্থন করে,

কৃষ্ণবিহারী বাবুর সহিত খুব নেআকদের মত তর্ক করিতাম। তর্কে হারিয়া যাইতাম, তথাপি গোঁড়ামি ছাড়িতাম না। এই রূপে কৃষ্ণবিহারীবাবুর সহিত বিশিষ্টভাবে পরিচিত হই ও তাঁহার বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে পড়ি। তিনি ভালবাসায় আমাকে পরাজিত করিলেন।

তখনও শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত আমার চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কলিকাতা স্কুল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী মহামতি আলবার্টের নামে "আলবার্ট স্কুল" নামে অভিহিত হইল; এবং সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র "আলবার্ট হল" স্থাপন করিলেন। তখন হইতে তিনি কিছুদিন নিয়মিতরূপে আলবার্ট হলের আফিস ঘরে চাপকান পরিয়া আসিয়া আফিস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি আলবার্ট হলের সেক্রেটারী ছিলেন।

একদিন আমি বিনা নামস্বাক্ষরে শ্রীকেশবচন্দ্রকে একখানি চিঠি দিই। তাতে লিখিলাম, "ঈশ্বরকে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী নামে কি ডাকা যায় না? দুর্গা মানে ত যিনি দুর্গতি হরণ করেন, কালী মানে ত যিনি কালভয় নিবারণ করেন। তবে এ সব নামে ঈশ্বরকে ডাকায় দোষ কি?"

সে পত্রের কোন উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার পর হইতেই ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে এক ও ত্রেতেশ কোটীর বিষয়ে এবং হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

দীন সেবক।

শোকার্ত্তের মর্ম্মব্যথা।

দয়াময় ভগবান্! তুমি আমাদের প্রাণের প্রিয়, পরম আদরের সোণার ভাইকে হঠাৎ অসময়ে আমাদের সবাইকে কাঁদাইয়া, অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া তোমার কোলে তুলিয়া লইয়াছ। এত শীঘ্র তিনি যে এমন করিয়া আমাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা ত কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, একটুও বুঝিতে পারা যায় নাই। আমরাও তেমন করিয়া দেখাশুনা, সেবা শুশ্রূষা কিছুই করিতে পারি নাই। মনে বড় আক্ষেপ রয়ে গেল; ভাই আমাদের বড় যাতনা পেয়ে, দুরন্ত ব্যথায় নিতান্ত অস্থির হয়ে, অভিমান করে চলে গেছেন। দয়াময়ী জননী, তুমি তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা দুঃখ জ্বালা থেকে মুক্ত করিয়া তোমার শান্তিক্রোড়ে স্থান দিয়েছ।

এখানে আনন্দময় সুন্দর সাজান সংসারের রাজা ছিলেন তিনি। জ্ঞান বিদ্যা ধনধান্য প্রেমপুষ্পে সুশোভিত উজ্জ্বলরত্ন, জগতের, সংসারের, সমাজের উন্নত কর্ম্মবীর, ধর্ম্মে ধীর, পবিত্র-চরিত্র কৃতী সন্তানকে তুমি এত শীঘ্র কেন, এই শত অভাবগ্রস্ত কর্ম্মস্থল থেকে ডেকে নিয়ে গেলে? এই কথাই কেবল তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। সেই অসংখ্য অগণ্য ঋষিতারা ও সাধু ভক্তে পরিপূর্ণ স্বর্গরাজ্যের সভাস্থলে কি এমন বিশেষ প্রয়োজন পড়িল, যে এমন অসময়ে আমাদের প্রাণের প্রিয়তম স্নেহের ধন, সমাজের ভূষণ, কর্ম্মী ভাইটিকে, সেখান থেকে সাদর নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে, মহা আহ্বান করিয়া তাড়াতাড়ী ডেকে নিয়ে গেলে? আমাদের হৃদয় ছিন্ন করিয়া, বক্ষের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া, জীবন অন্ধকার করিয়া তাহ চলিয়া গেলেন।

এখানে যে আমাদের ভাইয়ের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁর প্রাণের প্রিয়তম নববিধানাচার্য্যদেবের পুণ্যস্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন, যাহা তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় সমাধা করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, যে পবিত্র জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া ভগ্ন শরীরেও নবীন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া, উচ্চ কামনার মাথায় করিয়া সকলের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলী স্কন্ধে লইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা যে সবই অসমাপ্ত রহিয়া গেল। তাঁহার স্নেহের প্রতিমা, আদরের আনন্দময়ী রাজলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী, তাঁহার যে সকল সাধ অপূর্ণ রহিয়াছে; অসময়ে এই ভীষণ বজ্রাঘাতের তীব্র বেদনা তাঁর প্রাণে যে নিতান্ত অসহনীয়। তাঁহার সুন্দর সুন্দর ফুলের মত আদরের ছেলেমেয়েগুলি, তাদের জ্ঞান পুণ্যে নীতি ধর্ম্মে সুন্দর রূপে সুশিক্ষিত করে মানুষ করে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন; তার সবই যে বাকী রয়েছে। জীবনের সে সব কাজ ফেলে, তাড়াতাড়ী এত শীঘ্র কিসের আহ্বানে কোথায় ছুটিয়া গেলে, বল, ভাই? এ সব কাজের ভার কাহাকে দিয়ে গেলে? তোমার এ সব কাজ আর কেহ করিবে কি?

তোমার সেই প্রাণভরা সুন্দর সুমিষ্ট উপাসনা আর যে আমরা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইতে পাইব না। সবাই বলেছেন, তোমার অভাবে, তোমার জন্য আজ ব্রহ্মমন্দির কাঁদিতেছে। তোমার সেই মিষ্ট স্বভাব, সেই সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নহে। তোমাকে হারাইয়া তোমার অভাবে প্রাণের হাহাকার কিছুতেই কমিবেনা।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সমাজের কাজে, দেশের সেবায়, নীতি ধর্ম্মের উন্নতি-সাধনের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া সবে মাত্র কাজ আরম্ভ করিয়াছিলে; আর হঠাৎ আজ একি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, অভাগা পৃথিবীর মাথায় আজ অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল, সব কাজ এক নিমেষে ফুরাইয়া গেল যেন!

আমাদের বাবার বড় আদরের ধন গৌরচন্দ্র, সোণার গৌরাঙ্গ আজ স্বধামে নিজের বাড়ীতে গিয়া বাবা, মা, দাদার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বহুদিন পূর্ব্বে বাবা অসুস্থ শরীরে লক্ষ্ণৌতে চেঞ্জে গিয়া চিঠিতে কেবল লিখিতেন, আমার সোণার গৌরাঙ্গ গৌর-

চন্দ্র কেমন আছে। তাহা যেন এখনও চক্ষের সামনে ভাসিতেছে। আবার যখন বাবার পরপারে যাবার ডাক এসেছিল, ভাই আমাদের তখন উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য সাগরপারে বিলাতে ছিলেন। বাবা বললেন, রাজেনকে খবর দিওনা, সে বড় ভাববে, কষ্ট পাবে, পড়ার ক্ষতি হবে, তার অমঙ্গল হবে। পরে যখন কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসে, জাহাজ থেকে বাবাকে না দেখতে পেয়ে ভাই আমাদের বড়ই কাতর হয়ে কাঁদিতে লাগিলেন, বাবা কেন আমায় নিতে এলেন না। আজ সেই সোণার চন্দ্র আদরের দেবনন্দন স্বর্গধামে দেবতা পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরম পিতার কোলে আরও সুন্দর হয়ে শোভা পাইতেছেন, তাই দেখে যেন শোকসন্তপ্ত প্রাণের সকল দুঃখ জ্বালা নিবারণ হয়, কাতর প্রাণের এই ভিক্ষা। মেজদি।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্মমণ্ডলীর ঐক্যবন্ধন।

সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আত্মনিবেদন।

বিনীত অভিবাদন,

ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি আমাদিগের অসম্মিলন অসদ্ভাব নিবারণ করুন। সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদের মধ্যে একতা সংস্থাপন করুন।

রাজর্ষি রামমোহন যখন এই ব্রাহ্মসমাজের বীজ বপন করেন, তখন তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধনের জন্যই এই সমাজ গঠন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও আমাদের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন হয়, তাহার কত চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও তিন সমাজকেই এক মণ্ডলীর অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও তাহা রিপোর্টে লিখাইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মিলন প্রার্থনা করিয়াছেন। পরস্পরকে বিরোধী বলিয়া না মনে করি, তাহার জন্য বিশেষ সাধন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আশা দিয়া গিয়াছেন, পরিণামে মিলন হইবেই।

তাই বিনীত অন্তরে নিবেদন করি, আর কেন আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া থাকিব? চির প্রসিদ্ধ প্রবচন স্মরণ করি—United we stand and divided we fall."—মিলনেই আমরা দাঁড়াইতে পারি, অসম্মিলনে আমরা পতিত হই। সার্ব্বজনীন মিলন-বিধানে বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী হইয়া কেন আমরা আপনাদের ঘর গড়িতে পারিতেছি না?

ব্রাহ্মসমাজ এখন তিনটী শাখায় বিভক্ত। এই তিনের মধ্যে মত, বিশ্বাস, সাধন ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে সত্য। ইহা স্বীকার করিয়া, পরস্পরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া, কি আমরা মিলিতে পারি না?

পরস্পরকে না বুঝিবার দরুণও অনেকটা পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয়, ক্রমে পরস্পরে মিলিয়া আলোচনা ও প্রার্থনা করিতে করিতে এ পার্থক্য চলিয়া যাইতে পারে। সেই জন্য আমার প্রার্থনা, তিন সমাজের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া, কি কি বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে এবং কি কি বিষয়ে আমাদের ঐক্য আছে, নির্দ্ধারণ করুন।

যে সকল বিষয়ে ঐক্য আছে, সেই সকল বিষয়ে যাহাতে ঐক্য বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য কার্য্যতঃ যাহাতে মেলা মেশা করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করি।

যে সকল বিষয়ে অনৈক্য আছে, সে সম্বন্ধে পাঠ, আলোচনা ও প্রার্থনা-যোগে যাহাতে মিলন হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করি।

এজন্য আমাদের মধ্যে অবিলম্বে একটি "শান্তি-সংস্থাপক সভা" গঠন করা হউক।

যদি সম্ভব হয়, আগামী ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বেই, যাঁহারা এই শান্তি-সংস্থাপক সভার সভ্য হইতে চান, তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা হউক। এজন্য প্রথম তিনি সমাজের তিনজন প্রতিনিধি, এই নাম-সংগ্রহে কৃতসংকল্প হউন।

আগামী ৬ই ভাদ্র তিন সমাজের স্থায়ী মিলন সম্বন্ধে একটি সহবাবস্থান হয়, ইহা প্রার্থনীয়। ইঁহারা বিভিন্নতা-প্রতিপাদক বিষয় লইয়া আপাততঃ আলোচনা করিবেন না; কিন্তু প্রত্যেকের স্বাধীন মতের প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া, এবং নিজ নিজ বিশ্বাস খর্ব্ব না করিয়া কেবল ভ্রাতৃপ্রেম সহকারে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। একে অন্যের উপর নিজ মত চাপাইতে চেষ্টা না করিলে, এবং আমার বিশ্বাস ও মত কোন ভাই গ্রহণ না করিলে তিনি পতিত বা ঘৃণ্য, ইহা না মনে করিলে, নিশ্চয়ই মিলন অচিরে সংস্থাপন হইবে। "সত্যমেব জয়তে"—সত্যের জয় হইবেই হইবে,—এই বিশ্বাসে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে ভাই ভগ্নীগণ কে কি মনে করেন, আমার নিকট পত্র লিখিলে কৃতার্থ হইব।

নবপর্ণকুটীর, পুরী। { দীন সেবক
প্রিয়নাথ মল্লিক।

—•—

আমরা কোন্ দিকে যাইতেছি?

এতদিন পরে ত্রি-অশীতি বর্ষে আসিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে নববিধানমণ্ডলীর নিকট বলিতে আসিলাম যে, "আমরা কোন্ দিকে যাইতেছি?" একথা কোন দিন ভাবিতে পারি নাই যে, এতদিন পরে হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে এই প্রশ্ন উত্থিত হইবে। আমি যে বিধাতৃপ্রেরিত এই নববিধানে আসিয়া, এই মণ্ডলীর জীবনের অনেক অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম। আমাদিগের ভক্তিভাজন নববিধানাচার্য্য এই বিধানের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার ভিতর হইতে এই নব সমাচার সুমধুর বংশীধ্বনির মত নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, সেই সময়ে মণ্ডলীর ভিতর যে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, তাহার চিত্র এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে। বর্ত্তমান মণ্ডলী কি সে যুগের সে চিত্র ভুলিয়া যাইবেন? তখন কেবল প্রেরিতবর্গের নহে, সাধারণ বিশ্বাসিমণ্ডলীর ভিতরেও যেন একটা নবীন প্রাণের নবীন স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এই মণ্ডলীর ভিতর তখন যে দীনতা ও ত্যাগস্বীকারের মহাভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন সে ভাব কোথায়? প্রেরিত ভক্তমণ্ডলী কল্যকার চিন্তা পরিহার করিয়া যখন তাঁহাদের নবজীবন নূতন সাধনায় ও নূতন সংবাদ-প্রচারে জীবনের সকল উদ্যম ও উৎসাহ বিধাতার ইচ্ছার নিকট নিবেদন করিলেন; সে যুগের জীবন্ত আভাস এখনও আমার হৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে। সে দিন এখন কোথায় গেল? সেই দীনতা ও সেই ত্যাগস্বীকার পৃথিবীর কোন্ স্রোতে মিশিয়া গেল, তাহা জানি না। সেই যুগে এই নববিধানের জন্য বিশ্বাসিবর্গ কত নিপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, সে চিত্র এখনও ইতিহাসের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই দেখিতেছি যে, সেই পুরাতন যুগের জ্বলন্ত বিশ্বাসের ভাব নিদাঘ-তপন-তাপিত স্রোতের ন্যায় শুকাইয়া যাইতেছে! এখন দেখিতেছি যে, এ নববিধানে বিধাতার সে ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশের ভাব আমাদিগের পরিবারস্থ যুবক যুবতীর হৃদয়ে একটা কল্পনার মত আসিয়া পড়িতেছে। নববিধানবিশ্বাসী পরিবারে এক সময়ে প্রাত্যহিক পারিবারিক উপাসনার যে ভাব আসিয়াছিল, এখন সে ভাব পৃথিবীর কোন্ সুশীতল স্রোতে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল! এখন পরিবারের পিতামাতা এবং অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের লইয়া সে যুগের মত ভগবানের সমক্ষে উপস্থিত হইতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এখন কি আমাদের দেখিবার সময় আসে নাই, যে আমরা কোন্ দিকে চলিয়া যাইতেছি? এই নববিধানে নববিধানাচার্য্য যে "অগ্নিদীক্ষা" সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, আজ কি আমরা সে সংবাদ ভুলিয়া যাইব? তিনি তাঁহার জীবনে "অগ্নিদীক্ষার" সে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে কি পৃথিবীর মরীচিকায় বিলীন হইয়া যাইবে? বিধাতার আদেশে তাঁহার নিকট কুচ-বিহার বিবাহের নবসমাচার আসিয়াছিল এবং যাহাতে তিনি মানবীয় কল্পনা ও জল্পনা এবং নির্য্যাতন ও নিপীড়ন ভুলিয়া গিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলেন; এখন কি, সেই আদেশ-পালনের চিত্র আমাদের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে? দেখিতেছি যে, আমাদের বর্ত্তমান বংশ এ সব ভুলিয়া যাইতেছেন। বিশ্বাসের এই জীবন্ত প্রভাবের অভাবে অনেক পুরাতন ব্রাহ্ম পরিবার হইতে সন্তান সন্ততিগণ পৌত্তলিক হিন্দু পরিবারে ফিরিয়া যাইতেছেন। আবার দেখিতেছি যে, যাঁহারা নববিধানমণ্ডলী ও নববিধানপরিবারে এখনও অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা নববিধানের নির্দ্দেশ ভুলিয়া গিয়া পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগদান করিতেছেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধানের উৎসাহের যুগে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা কি এখন পরিত্যক্ত কাগজপত্রের ন্যায় হইবে? তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, "পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিও না।" সে যুগে নববিধানের প্রেরিতবর্গ, এমন কি, বিশ্বাসী পরিবারও বিধাতার এ নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

আমার এখনও মনে হইতেছে যে, আমাদিগের প্রেরিতবর্গ যখন ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে প্রচারাশ্রমে বাস করিতে-ছিলেন, সে সময়ে ঐ ষ্ট্রীটের কোন হিন্দু পরিবার হইতে বিবাহা-নুষ্ঠানে তাঁহারা আহূত হইয়াছিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, আমাদিগের কাকাবাবু ভক্ত কান্তিচন্দ্র সেই হিন্দু পরিবারের নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে সুকোমল ভাষায় তাঁহাদের বাধা বিঘ্ন সেই গৃহস্বামীকে জ্ঞাপন করিলেন। আমি সেদিনের কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাহার পর বলিতেছি, আমাদিগের ভক্তি-ভাজন আচার্য্য তাঁহার মহাপ্রস্থানের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে "নবসংহি-তার" যে Proof দেখিয়া গিয়াছেন, আজ কি তাঁহার সে দর্শন ও সে আকাঙ্ক্ষার মূল্য আমরা ভুলিয়া যাইব? আজ তাই বিশ্বাসী মণ্ডলীকে বলিতে আসিলাম যে, আমরা কোন্ দিকে চলিয়া যাইতেছি? আমাদের নববিধান কি আমাদের হস্তে বিনষ্ট হইবেন? আমাদের বিশ্বাস কি এই পৃথিবীর প্ররোচনায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁহার "True Faith" নামক পুস্তিকায় লিখিয়া গিয়াছেন, "Faith is uncompromising." পাশ্চাত্য ঋষি সাধু জিউমিসি বলিয়াছেন যে, "Faith is not a thing shaky as the aspen leaves." তিনি আরও বলিয়া-ছেন, "Truth is not a thing dead as Dodo." আমরা কি শ্রীব্রহ্মানন্দ এবং আর আর ঋষিদিগের উপদেশ ও নির্দ্দেশ ভুলিয়া যাইব? যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের সমক্ষে এক মহা অবিশ্বাসের আঁধার আসিতেছে। আমাদের মণ্ডলীর ও বিশ্বাসী পরিবারের একটা ভাবিবার ও দেখিবার দিন উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মিলন-মাল্য।

সংসারে দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণ সময়ে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, যদিও ইহা সত্য, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের ন্যায় সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্যসমাজ, যাহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধনের উপরেই নির্ভর করে, সেই আমরা একরূপ মূঢ় বলিলেই হয়। কেন না, বাল্যে আমাদের ঈশ্বরবিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ও জনসমাজ হইতেই লাভ করি। এমন কি, জগতের মহাপুরুষদিগকে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস কোন বিশেষ ঘটনা. কোন বিশেষ অবস্থা হইতে লাভ করিতে হয়। তাহার সাক্ষ্য, শ্রীবুদ্ধ জগতের দুঃখ, শোক, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি হইতে ধর্ম্মানুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। যিশু যে ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কালের ইহুদী ধর্ম্মযাজকগণের পাপ তাপ দর্শন করিয়াই। এমতাবস্থায় বুঝা যায় যে, মানবজাতি জন্মগ্রহণ করে, ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতা লইয়াই; কিন্তু ভগবান মানুষকে ধর্ম্ম দিবার জন্যই, মানবের অন্তরে ধর্ম্মবিশ্বাস জাগ্রত করিবার জন্যই, তাঁর স্পর্শ দিবার জন্যই এজগতে আনিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাহার কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন।

এ জগতে আমরা তাঁকে পেয়েই জীবন পেয়েছি, তাঁর জীবন-রক্ত আকর্ষণ করেই জীবিত থাকি, তাঁর প্রেমসুধা পান করেই আত্মাতে পুষ্ট হই। তিনি নিত্য গ্রহণ করেই আমাদের সতত আশ্রয় দিতেছেন, তিনি বিধানজননী হয়ে তাঁর মঙ্গল-বিধানের দ্বারা আমাদের উন্নত করছেন। তাঁর স্পর্শ দিয়ে আমাদিগকে পাপ-বিমুক্ত করছেন। তিনি তাঁর অজস্র দানের দ্বারা আমাদের পরিতুষ্ট করছেন, আনন্দিত করছেন। সতত কর্ম্মশক্তি ও আত্মবোধ জাগ্রত করে, আমাদের ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকারের সৃষ্টি করছেন। তাঁর সঙ্গ দান, চির সঙ্গ দান করে আমাদের শান্তি, চিরশান্তি বিধান করছেন। তাই আমাদের জীবন রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। আর আমরা যে এই সকল অধিকার পেয়েছি, তাঁর নিকট হতেই; তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেই আমাদের জীবন সফল বোধ করি।

কিন্তু আমরা যে অবোধ, বাল্যের অজ্ঞতাই তার প্রমাণ। তাই তিনি তাঁর বিষয় স্বয়ং আমাদের বুঝাইয়া দিতেছেন, বিশ্বাস জাগ্রত করে দিতেছেন। তথাপি আমাদের আলস্য হেতু, পাপে দুর্ম্মতি প্রযুক্ত, তাঁকে ভুলে থাকতে চাই, তাঁকে চাই না। তিনি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে স্পর্শ দেন, তথাপি আমরা তাঁকে তাড়াইয়া দিই। যিনি জীবনস্বামী, হৃদয়বল্লভ, রাজাধিরাজ, বিশ্বপতি, আমাদের বিধানজননী, তাঁকে আমরা আত্মদান করি না তাঁর ধর্ম্মকে, তাঁর সুসন্তানগণকে বিদ্রূপ করে, হাস্য কৌতুকের বিষয় করে, অহংভাবে মত্ত হয়ে কতবারই না অস্বীকার করি। আমরা সংসারের কাহারও জন্য সামান্য আত্মদান করিতে গিয়া, ত্যাগ স্বীকার করিতে গিয়া কি ক্লেশই না বোধ করি; কিন্তু তিনি আমাদের জন্য অক্লেশে আত্মদান করেছেন। তিনি বীর-হৃদয়, তাঁর ন্যায় বীর আর কেহ নাই। তিনি কিনা করলেন আমাদের জন্য! তাঁকে পেয়ে যে আমাদের জন্মলাভ হল এ জগতে, তা বোঝাবার জন্য তিনি প্রাণ দান করলেন। আমরা যে তাঁতেই কেবল জীবিত আছি, সে চেতনা দেবার জন্য এই বারিধারার অনন্ত প্রস্রবণ আমাদের জীবনের গ্রহণোপযোগী করে ছোটালেন। তাঁরই যে প্রেমসুধা পান করে আমরা পুষ্ট হই, তা জানাবার জন্য তিনি এই গৃহ পরিবার ও সমাজ সৃষ্টি করে, তার অজস্র প্রেমধারায় আমাদের সিঞ্চিত করিলেন। নিরাশ্রয় আমরা, আমাদের যে তিনি চরণাশ্রয় দিয়েছেন, তা দেখাবার জন্য এই ধরণী সৃজন করলেন। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন, মান, সৌন্দর্য্য ও শৌর্য্য বীর্য্য দান করে, ধর্ম্মে মতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস দান করে যে তিনি মঙ্গল বিধান করলেন এবং তাঁ হতেই যে আমাদের ঐহিক পারত্রিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তিনি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করে দিচ্ছেন। এই অনন্তকালকে সৃষ্টি করে, আর তার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে দিয়ে, আমরা যে অমৃতের সন্তান, সে বিশ্বাস তিনি দিতেছেন। মৃত্যু এনে দিয়ে অনন্ত উন্নতির দ্বার তিনি মুক্ত করলেন। ধন দিয়ে তিনি যে পরম ধন, সুখ দিয়ে তিনি যে পরম সুখ, এ সকল তিনি নিত্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন; আবার দুঃখ দিয়ে, শোক দিয়ে তিনি আত্মার জীবনে নব জন্ম দেন। অপমান দিয়ে, লাঞ্ছনা দিয়ে, তিনি আমাদের আত্মার জীবনকে গৌরবান্বিত করে তোলবার চেষ্টা করেন। এমন কি, দারিদ্র্য এনে দিয়ে সংসার হতে তিনি আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদের মুখ ফেরাতে বলেন। আরো সদ্‌গতি যাহাতে আমাদের লাভ হয়, সে জন্য বৈরাগ্য, সংযম, বিবেকবাণী আদেশ, যোগ, ভক্তি, সকল ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দিয়ে তিনি আমাদের একেবারে চিরদিনের তরে নিজের কোলে তুলে নিচ্ছেন, নিজের করে নিচ্ছেন।

স্বীকার করি, আমরা নরাধম; আমরা তাঁকে মূল্য না দিয়ে, তাঁকে বড় না করে জীবনে সংসারকে মূল্যদান করি, সংসারকে বড় করি। কিন্তু তাঁর যে প্রেম পরাস্ত হতে জানে না। তাঁর যে করুণা কোন রূপেই নিরাশ হয়ে ফিরতে জানে না। তাই তিনি জগতের সাধু ভক্ত হ'তে পাপীরও পর্য্যন্ত হৃদয়দ্বারে চিরদিন অপেক্ষা করেন; অবশেষে পাষাণ প্রাণ আমাদের বিগলিত করেন। এমনি করে তিনি হৃদয়ে আবির্ভূত হন, এমনি করে তিনি আমাদের হৃদয় অধিকার করেন; অবশেষে চিরদিনের তরে অধিকার করেন। হৃদয়দেবতা হয়ে তিনি আমাদের নিকট এই জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন; দেখি, প্রাণে, মনে, দেহে, আত্মায় তিনি জীবনের ভূষণ হয়ে, রত্নহার হয়ে রয়েছেন। কেবল কি জীবন অধিকার করেন? এই বিশ্ব-সংসার আমাদের, তাও একেবারে তিনি গ্রাস করে ফেলেন;

তখন দেখি, এই গৃহ পরিবারে, সমাজে ও এই প্রকৃতিরাজ্যে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। আমাদের, এই নীচদের কণ্ঠে তাঁর এই বিশ্বরূপ-মালা স্বহস্তে তিনি দান করেন।

তাঁর কেবল অপার কৃপাতেই তাঁর এই মালাগ্রহণের অধিকারী হই। বিধানজননীর এই অধমদের প্রতি ইহাই শ্রেষ্ঠ দান। যাঁরা এই দান পাবার জন্য তাঁর সেই মিলন-মন্দিরের যাত্রী হতে পেরেছেন, তাঁরা ধন্য! আর সেই মিলনমন্দিরে, যেখানে জড়ে চেতনে, রূপে অরূপে, আকারে নিরাকারে, সীমায় অসীমে, দৃশ্যে অদৃশ্যে, জীবনে জগতে, পিতা পুত্রে, সন্তানে জননীতে এবং অনাসক্ত পুরুষে ও পবিত্রাত্মায় মিলন হয়েছে, সেখানে যাঁরা প্রবেশ লাভ ক'রে, তাঁর হস্তের মাল্য কণ্ঠে পরবার অধিকার পেয়েছেন, তাঁরা আরো ধন্য! বিধানজননীর কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, যেন আমাদেরও জীবনে সেই শুভদিন আগত হয়, তাঁর মিলন-মাল্য কণ্ঠে পরবার।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—•—

নবভক্তি—নবপ্রেম।

(২১শে জুন, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, রবিবারের উপাসনায় শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের সাধারণ প্রার্থনা)

বিধানজননী, যে তোমার সত্যের ঝরণার তলে বসে তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেকি কখনও নর্দ্দমার জল স্পর্শ করে? যে তোমার চাঁদমুখ দেখে আত্মহারা হতে শিখেছে, সে কি সংসারের কাল হাঁড়ির মধ্যে বাস করতে পারে? যে তোমার অঙ্গবাসের সৌরভে নিজ জীবনকে সৌরভময় করতে শিখেছে, সে কি আর মড়ার গায়ের গন্ধের কাছে থাকতে চায়? ভক্তদের জীবনে তুমি "সত্যের ঝরণা", তুমি "চাঁদমুখ", তুমি মৃত-সঞ্জীবন সৌরভ হয়ে থাক; কিন্তু বল, নাথ, বল, যারা আমার মত অভক্ত, অপ্রেমিক, তাদের কি দশা হবে? তাদের পোড়া কপালে কি কেবল "নর্দ্দমার জল", "সংসারের কালো হাঁড়ি" আর "মড়ার গন্ধই" লেখা আছে? না, না, তুমি যখন অধম-তারণ, পতিতপাবন নাম ধরেছ, তখন তুমি এ ঘোর কলিযুগেও অভক্ত, অপ্রেমিকদের উদ্ধার করবার জন্য বিধি বিধান করে রেখেছ। সে কোন বিধি, বল, ঠাকুর! তুমি নিজে মুখে বলছ, "সে বিধি নূতন বিধি, নববিধান।" আগে ভক্তিতে মত্ত হলেই ভক্ত হওয়া যেতো, প্রেমাশ্রু বর্ষণ করলেই প্রেমিক হওয়া যেতো; কিন্তু এখন নূতন বিধি অনুসারে কেবল চখের জলে আর মত্ততায় "ভক্ত" "প্রেমিক" নাম কেনা যায় না। যে নববিধানে সকল সত্যের সম্মিলনে যে মহান জলপ্রপাতের সৃষ্টি তুমি করেছ,—সকল আলোর সংমিশ্রনে যে দাবানলের সৃষ্টি তুমি করেছ,—সর্ব্বপ্রকার গরল-মন্থনে যে বিশাল অমৃতসিন্ধু উৎপাদন করেছ—সেই সকল সত্য, সেই সকল আলোক, সেই সকল অমৃত বস্তুকে গ্রহণ না করিলে, হাজারো কাঁদি, হাজারের মত্ত হই না কেন, নববিধানের ভক্ত প্রেমিক হতে পারবো না। তবে তো, হে নাথ, এ ভক্তি নব, এ প্রেম নব—এই নব ভক্তি, নব প্রেমের আস্বাদন তুমি আমাদের সকলকে করতে বলছ—এ ছাড়া আমাদের এ যুগে মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই—তাই তো তুমি বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ। তুমি তোমার নব ভক্ত, নব প্রেমিক শ্রীকেশবকে এই নবভক্তি, নব-প্রেমের আদর্শ করে পাঠালে, এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বললে, এই জীবনের আদর্শ-গ্রহণের ভেতর দিয়ে যেন আমরা ভক্ত ও প্রেমিক হই। বিধানজননী, তোমার ইচ্ছা কতদূর পালিত হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, আমাদের মণ্ডলীগত জীবনে, আমাদের দেশের জীবনে, এ বিশ্বের জীবনে, তা তো তুমি দেখতে পাচ্ছ। দয়া করে এই অবোধ সন্তানদের, আমাদের যারা এখনও তোমার সমন্বিত ভক্তি, সমন্বিত প্রেম—নব অশ্রু, নব মত্ততার কথা বোঝেনি, তাদের বোঝাও। আমাকে বোঝাও, মণ্ডলীর সকলকে বোঝাও, দেশের প্রত্যেক লোককে বোঝাও, জগদ্বাসী যে যেখানে আছে, সকলকে বোঝাও। এই বিশ্বগ্রাসী ভক্তিতেই যে জগতের মুক্তি, আমাদের সকলের মুক্তি, তা তুমি বজ্রনিনাদে ঘোষিত কর। তোমার কৃপার উপর আমরা সকলে নির্ভর করি।

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্!

—•—

সংবাদ।

আরোগ্য—গত ১৯শে জুলাই, রবিবার, ২৪।১সি গড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চাটার্জ্জির সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ উপলক্ষে ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতাদানসূচক বিশেষ উপাসনা হয়। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সতীকুমার চাটার্জি প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাসিক উপাসনা—গত ২৮শে জুলাই, হাওড়ায় ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের মাসিক স্মৃতিতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩২শে আষাঢ়, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, রাজাবাগে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীরের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃ-দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের কন্যা স্বর্গীয়া প্রেমলতা দেবের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে রাঁচিতে সকালে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও সেবিকা হেমলতা চন্দ উপাসনা করেন। সংকীর্ত্তন, সংগীত, প্রার্থনা ও শাস্ত্রাদি পাঠ

সেবিকা করেন এবং সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ২৲ টাকা দান করেন। অদ্য কলিকাতায় ভগ্নী শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে, ২১৪নং লোয়ার রেঞ্জে উপাসনা হয়। পাটনায় কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা দের গৃহে ডাঃ পরেশনাথ চাটার্জ্জি উপাসনা করেন। ভগ্নী বনলতা ৫৲ এবং জনৈক ভ্রাতা ২৲ প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

৮ই শ্রাবণ, ১২।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, অনাথাশ্রমে, স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী আশ্রমের মাতৃস্বরূপিণী স্বর্গীয়া ক্ষান্তমণি দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার উপাসনা করেন।

গত ২৪শে জুলাই (৮ঠা শ্রাবণ), কমলকুটীরে নবদেবালয়ে, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল ব্যানার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে জুলাই, কলিকাতায়, ৪০।১এ মনোহর পুকুর ফার্ষ্ট লেনে, ভক্তিভাজন ভাই দুর্গানাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের প্রিয়তম সন্তান স্বর্গীয় মনোজিতের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস এবং রাত্রে ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মনোজিতের মাতৃদেবী শ্রীমতী স্নেহলতা রায় স্থায়ী ফণ্ডরূপে পূর্ব্বপ্রদত্ত একশত টাকার সঙ্গে এবারও ২৫৲ টাকা স্থায়ী ফণ্ড রূপে প্রচারভাণ্ডারে দান করেন।

গত ৩০শে জুলাই, কমলকুটীরে নবদেবালয়ে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী মল্লিকা দেবী প্রার্থনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

অদ্য স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

পুরীর সংবাদ—গত ১৬ই জুলাই, ভাই প্রিয়নাথের অষ্ট-সপ্ততিতম জন্মদিনে পুরী নবপর্ণকুটীরে দুই বেলাই উপাসনা হয়। নিজেই উপাসনা করেন। প্রাতে সেবিকা হেমন্তকুমারী আচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইতে "দেবসন্তানত্ব" আবৃত্তি করিয়া প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কয়েকটি বন্ধু উপাসনায় যোগ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ও ভাইয়ের সঙ্গে একান্নবর্ত্তী হইয়া পরমান্ন ভোজন করেন।

নামনিদর্শনস্থাপন—গত ১৬ই জুলাই, বিশেষ প্রার্থনা-যোগে পুরী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধানের "নবশ্রীক্ষেত্র" নামনিদর্শন প্রকাশ্য রাজপথের নিকট স্থাপন করা হয়। এই স্থান যেন নব-শ্রীক্ষেত্ররূপে চির চিহ্নিত হয় এবং নববিধানের নবজগন্নাথ-দর্শনে যেন বিশ্বজনে ধন্য হয়।

সুধাকূপপ্রতিষ্ঠা—গত ১৬ই জুলাই, নবশ্রীক্ষেত্র-ভূমিতে "সুধাকূপ" নামে কূপ প্রার্থনা-যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রেমাশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী সুধা দেবীর নামে কূপটীর নামকরণ হইল।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে জুলাই, গৃহস্থ বৈরাগী স্বর্গীয় রাজ-মোহন বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ক্ষেমঙ্করী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে পুরী নবপর্ণকুটীরে দুই বেলাই উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও সেবিকা হেমন্তকুমারী মাতৃ-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করেন। আচার্য্য-দেবের প্রার্থনা "পরলোকগৃহ" আবৃত্তি করেন। কটকেও মধুভবনে এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

সম্রাটের জীবনরক্ষা হেতু কৃতজ্ঞতা-সূচক প্রার্থনা—সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের জীবনহানির যে চেষ্টা হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় সে আক্রমণ হইতে তাঁহার জীবনরক্ষা হেতু, গত ১৮ই জুলাই, পুরী নবপর্ণকুটীরে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধান প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সভ্য মিলিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা করেন এবং রাজপ্রতিনিধিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সেবা—টাঙ্গাইলে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নিম্নলিখিতরূপে সেবার কার্য্য সাধন করেন। গত ২৬শে মে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ কলিকাতা হইতে টাঙ্গাইল রওয়ানা হন। টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রায় দেড়মাস কাল বাস করিয়া, গত ১০ই জুলাই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। টাঙ্গাইল স্থিতিকালে অধিকাংশ রবিবার টাঙ্গাইল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। ৬ই জুন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে সেই সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। ১৪ই জুন, রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। ১৫ই জুন, ১লা আষাঢ়, টাঙ্গাইলের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য স্বর্গীয় দুর্গাদাস বসুর সাম্বৎসরিক দিনে নববিধান ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। ২৩শে জুন, টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রাধানাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী ও শ্রীমান্ ভজাসিংহ ঘোষ ও শ্রীমান্ প্রেমাদিত্য ঘোষ এবং শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষের মাতা স্বর্গীয়া বিদ্যুল্লতা দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে উক্ত শ্রীমানদিগের টাঙ্গাইল গৃহে উপাসনা করেন। শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ বিশেষ প্রার্থনা করেন। ৩০শে জুন, স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ঐ গৃহে উপাসনা করেন। শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনা করেন। গত ১লা জুলাই, ঐগৃহে স্বর্গীয় সাধক ললিত-মোহন রায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে উপাসনা করেন। শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান্ প্রেমাদিত্য ঘোষ বিশেষ প্রার্থনা করেন। কয়েকটী দিন সন্ধ্যার পর শ্রীমান্ প্রেমাদিত্য ঘোষের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সংক্ষেপে উপাসনা, প্রার্থনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন।

ঢাকার সংবাদ—শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস প্রায় দুই বৎসর পরে গত মে মাসে ঢাকায় আসিয়া মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। তিনি কয়েক রবিবারই পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা করেন ও কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ দেন।

গত ২৪শে জুন, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পরিবারবর্গের সহিত যোগযুক্ত করিয়া তদীয়া ভগিনী শ্রীমতী সুশীলা মজুমদারের ঢাকাস্থ প্রবাস-ভবনে ২৬শে জুন বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভগিনীর পুণ্যস্মৃতিতে সুশীলা দেবী পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাধু প্রমথলালের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দেবালয়ে, গত ৩০শে জুন প্রাতে, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন।

দান-প্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬—শ্রীমতী ক্ষীরোদমণি ঘোষ পিতৃশ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী মাতৃশ্রাদ্ধে ৫৲, শ্রীযুক্ত পাণ্ডবনাথ সিংহ পালিতা কন্যার পারলৌকিকে ২৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী চারুবালা বানার্জ্জি স্বামীর সাম্বৎসরিকে ৫৲, স্বর্গীয় রামগতি রায়ের শ্রাদ্ধে সন্তানগণ ৪৲, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান ২৲, রায় বাহাদুর ললিত-মোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মুখার্জ্জি মাসিক দান দুইমাসের ২৲, শ্রীমতী প্রেমদায়িনী চক্রবর্ত্তী স্বামীর সাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲ ও পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান দুই মাসের ২৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন পতির সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র দাস পিতার সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ দত্ত স্বর্গীয়া পত্নী সুরমা দেবীর সাম্বৎসরিকে ২৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ স্বামীর সাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত পত্নীর সাম্বৎসরিকে ১৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কুমুদিনী দাস পিতৃসাম্বৎ-সরিকে ২৲টাকা।

মার্চ্চ, ১৯৩৬—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানী মাসিকদান ২৫৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী ইন্দিরা দে শ্বশুরের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (আই,এম,এস,) মাসিকদান ২৲, শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র সিংহ মাতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, স্বর্গীয় ডাঃ কৃপাসুন্দর বসুর আদ্যশ্রাদ্ধে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ১০৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুইমাসের ৪৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, ডাঃ জগন্মোহন দাস জ্যেষ্ঠপুত্রের হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ উপলক্ষে ২৲, জনৈক বন্ধু মাতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীমতী মনোরমা চাটার্জ্জি পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিকে ২৲ টাকা।

নিবেদন।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এখন আর সব খণ্ড পাওয়া যায় না। এই বইখানিতে কেবল মাত্র সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই বইখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে ও আমাদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ অপরাধ হইবে। সেজন্য এই পুস্তক খানির নূতন সংস্করণ একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গলাতে এবং সন শকাব্দে আছে। সেই সকলের ইংরাজি সন তারিখ ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার সূচী একটু বিশদভাবে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাও আছে। সেজন্য কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ছাপাইতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। সকলের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সমাধা করা সুকঠিন। সেই জন্য সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যাহাতে আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে, তাঁর স্মৃতি (যা খুব accurately historical) এই উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা জীবনখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। টাকা কড়ি আমার নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা ;
এলাহাবাদ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 17th. August, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

মা, তোমার ত আকার নাই, রূপ নাই, নামও নাই। তুমি নিরাকার, অরূপ, অনাম। মানুষ তোমার যদি আকার গড়ে, তা মিথ্যা; তোমার যদি রূপ বর্ণনা করে, তাহা কল্পনা; কিন্তু তোমার যদি নামকরণ করে, তাহা পূর্ণ, তাহা তোমার ঠিক নাম না হইলেও, মানুষের ভক্তি-সাধনের জন্য, যে যে নামেই ডাকুক না কেন, তুমি তাহাতে সায় দাও। এই জন্য ভক্তেরা তোমাকে তেত্রিশ কোটী নাম দিয়াছেন। কিন্তু সকল নামের মধ্যে তোমার মা নামটী শ্রেষ্ঠ। কেন না, মানুষ হইতে পশু পক্ষী, এমন কি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত, যাহার কোন শব্দ উচ্চারণ করিবার শক্তি আছে, তারই মুখে মা নাম শুনিতে পাই। নববিধানে বিশেষভাবে তুমি স্বয়ং তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছ। মা বলিয়া তোমাকে ডাকা সব চেয়ে সহজ। ইহাতে বড় ছোটর তারতম্য নাই, পণ্ডিত মূর্খের ভেদাভেদ নাই, এ দেশ-বাসীর ও দেশবাসীর পার্থক্য নাই, সবাই নিজ নিজ ভাষায় মা বলিয়া ডাকে। তাই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বিধানে এই মা নাম সর্ব্বধর্ম্মসঙ্গত নাম। আবার মা বলিয়া ডাকিলে, তার সঙ্গে আর একটী ভাব সংযুক্ত। যিনি সন্তান-প্রসবিনী, তিনিই মা; নারীর সন্তান না হইলে তিনি মা হন না। মা, তুমি নববিধানমূর্ত্তিমান এক নব শিশু প্রসব করিয়া, স্বয়ং তাহাকে যে তোমারই নবশিশু করিয়া গঠন করিয়াছ, তাই তোমাকে নবশিশুজননী কেশবজননী বলিয়া আমরা ডাকি। আমরা বিশ্বাস করি, তুমিই শ্রীকেশবচন্দ্রকে এক নব সাধন উপাসনা শিক্ষা দিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি যে বিশ্বমানবজীবন, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়জীবন প্রাপ্ত হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত সেই উপাসনাপ্রণালী অনুসরণ ও অবলম্বন করিয়া, তোমার ইচ্ছানুরূপ নববিধানজীবনলাভে কৃতসংকল্প ও কৃতকার্য্য হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। এই উপাসনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনোপলক্ষেই তুমি নব-বিধানে ভাদ্রোৎসবের বিধান করিয়াছ। আবার যদি সেই উৎসবসাধনের জন্য তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তবে যেন আমরা তোমার নববিধানের নবভক্ত শ্রীকেশবের সঙ্গে এই নব উপাসনা যথাযথ ভাবে সাধন করিতে শিক্ষা করি এবং এ সম্বন্ধে আমাদিগের যে দোষ অপরাধ হইয়াছে, তাহা আর না করি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এমন সংকল্প দান কর। তোমার কৃপাগুণে তোমার পবিত্র উৎসব-সাধনায় আমাদিগকে সক্ষম কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ভাদ্রোৎসব।

আবার ভাদ্রোৎসব আসিল। উৎসবদায়িনী জননীকে প্রণাম করিয়া, সকল সাধু ভক্ত মহাপুরুষ এবং যুগে যুগে যত বিধান আসিয়াছে, সকলকে স্মরণ করি। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রেরিত প্রচারক, সাধক, ধর্ম্মযাজক এবং বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী, রাজা রাণী, কর্ম্মী জ্ঞানী, শিক্ষক শিষ্য, নরনারী, বালকবালিকা এবং শিশুদিগকে অভিবাদন করি।

বিশেষভাবে পরলোকস্থ নববিধান-প্রবর্ত্তক, প্রেরিত, সাধক সাধিকা ও প্রিয়জন আত্মজনদিগকে স্মরণ করিয়া, বরণ করিয়া এবং পরিবারস্থ ও দলস্থ বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীদিগের সহিত সমযোগে আমরা এই উৎসব-সাধনায় প্রবৃত্ত হই। ইহ পরলোকে যে যেখানে আছেন, সবার আত্মিক সমযোগ বিনা আমাদিগের উৎসবসাধনা হয় না; তাই আমরা এই উৎসবের উদ্বোধনে গাই—

"কে কোথায় আছ ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই;
ইহপরলোকে ভেদাভেদ কিছু নাই,
নরামর আত্মপর মিলে যাই এক ঠাঁই।"

বাস্তবিক এই গানে আমরা যাহা গাই, অধ্যাত্মভাবে ইহপর আত্মপর সবার সঙ্গে আত্মায় আত্মায় সমযোগ সমাধান করিতে না পারিলে, আমাদের যথার্থ উৎসব করা হয় না। তাই কাহাকেও ছাড়িয়া আমাদের উৎসব হয় না। কেন না, আমাদের উৎসবদায়িনী মা, সন্তানবৎসলা মা যেমন বড় ছোট, ভাল মন্দ, সুন্দর কদাকার কোন ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তেমনি কাহাকেও ছাড়িতে পারেন না। আমরা যদি কাহাকেও ছাড়িয়া তাঁহার উৎসব করিতে যাই, তাহাতে তাঁহার মন উঠে না। তাই কাহাকেও ছাড়িয়া আমরা উৎসব করিতে পারি, ইহা যেন আমরা না মনে করি।

এই ভাদ্রোৎসব আমাদের বিশেষ সাধনের উৎসব; নববিধান-সাধনে প্রধান উপাদান ব্রহ্মের উপাসনা। এই উপাসনা বিশেষভাবে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই উপলক্ষ্য করিয়া এই ভাদ্রোৎসব প্রবর্ত্তিত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে, কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যে উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনারই ভাব নিহিত। নববিধানে যে উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন; এমন উপাসনা-প্রণালী আর কোথাও নাই। একাধারে সকল ধর্ম্মভাবের সাধনার সমাবেশ এই উপাসনায় হইয়াছে; এবং সর্ব্বমানবমণ্ডলীর সমযোগে একাত্মতা-সাধনের জন্য এই প্রণালী নির্দ্দিষ্ট। এখানে কেবল ব্যক্তিগত সাধনার স্থান নাই। সজন সাধনা, সমবেত সাধনার জন্য এই উপাসনা। আমরা একা একা উপাসনা করিলেও, এই উপাসনার অনুসরণে আমরা সমগ্র পরিবার, দল বা বিশ্বমানবের সহিত সমযোগে উপাসনা করিতে প্রণোদিত হই। তাই এই উপাসনা করিতে হইলে, আমরা কাহাকেও ছাড়িয়া, একা একা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থপর ভাবে সাধন করিতে পারি না।

অদ্ভুত এই উপাসনাপ্রণালী; সত্যই এক অখণ্ড বিশ্বমানবত্ব সাধনের উপাসনা আর কোথাও নাই। বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপায় আমরা এই উপাসনা পাইয়াছি।

ধন্য বিশ্বমানব শ্রীকেশবচন্দ্র! নববিধান-বিধাতার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশে, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-সমাধানসূচক এবং মানবত্বের পূর্ণগঠনপ্রণালীসূচক এই উপাসনা স্বয়ং সাধন করিয়া, নববিধানবিশ্বাসীদিগের জন্য এবং সমস্ত বিশ্বমানবের জন্য ইহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা যেন তাঁহার সহিত সমযোগে, সস্ত্রীক, সপরিবারে, সদলে এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর সহিত এই উপাসনা সাধন করিয়া, নিত্য নিত্য নববিধানের নব নব জীবন লাভ করিয়া, বিশ্বমানবত্ব প্রাপ্ত হই। এবারকার ভাদ্রোৎসব-সাধনায় ইহাই যেন আমাদের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা হয়। এই উপাসনা-সাধন সম্বন্ধে আমাদের যে দোষ ত্রুটী, শুষ্কতা ও অপরাধ হইয়াছে, তাহাও যেন অপনোদন করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সেবা-ব্রত।

আমাদের মহামান্য সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড রাজসিংহাসনে অধিরোহণকালে বলেন, As Prince of Wales I bore the device with the ancient Motto "I serve." As King I shall hold this in constant remembrance. For a King can perform no higher function than that

service."—"যখন আমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্স (যুবরাজ) ছিলাম, তখন আমি সেই প্রাচীন নীতি অঙ্কিত নিদর্শন বহন করিয়াছি—"আমি সেবক"। রাজা হইয়াও আমি ইহাই সর্ব্বদা স্মরণে রাখিব। কারণ রাজার পক্ষে সেবা অপেক্ষা উচ্চ ব্রত, আরও উচ্চতর ব্রত কিছুই হইতে পারে না।" কি সুন্দর কথা! নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রও "আচার্য্য" নামের স্থানে "সেবক" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজরাজেশ্বর হইয়া যিনি, সেবকব্রত উচ্চ বলিয়া তাহা অনুসরণ করিতে চাহিলেন, তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ। তাঁহার সকল রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের প্রাণে এই বাণী ঝঙ্কারিত ও প্রতিধ্বনিত হউক। আমরা সকলেই যে সেবা করিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছে, ইহা মনে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া, যেন পরস্পরের সেবাই করিয়া ধন্য হই।

উপাসনা—হরিভোগ।

নববিধানে উপাসনাই আমাদের জীবনের অন্নপান। কিন্তু বর্ত্তমানে উপাসনা সম্বন্ধে বড়ই শৈথিল্য ও অনাস্থা উপস্থিত হইতেছে। সমস্ত সময় নানা বিষয় কাজে, বাজে কথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিব, আর দশ মিনিটের উপর পনের মিনিট উপাসনা কেহ করিলেই যেন অন্যের পক্ষে যোগদান করা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, উপাসনা আমাদের সম্ভোগের বিষয় হয় নাই। বিষয়-ভোগে, সংসারের সুখ-ভোগে আমাদের মন যত মত্ত হয়, উপাসনা-ভোগে তেমন হয় নাই; তাই ইহা একটা কর্ম্মভোগ মনে হয়, আর সকল কর্ম্মভোগগুলো সুখ-ভোগ্য বোধ হয়। নববিধান-বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীদিগের এখন বিশেষ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রথম হইতে ছেলে মেয়েদের লইয়া সস্ত্রীক দৈনিক উপাসনা সাধন করি নাই বলিয়াই, আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে উপাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে। সংসার-ভোগও যেমন অভ্যাস দ্বারা হইয়াছে, তেমনি উপাসনা ভোগ করিতে বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিলে ইহা উপভোগের বিষয় হইবে।

উপাসনা। *

(রবিবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক; ৮ই আগষ্ট, ১৮৭৫খ্রীঃ)

ব্রহ্মরাজ্যের পথে উপাসনা-ব্রত, ব্রহ্মরাজ্যের নিকটে উপাসনা সুধা। ব্রত এইজন্য যে, উপাসনা করিতে করিতে সেই রাজ্যে উপনীত হইব। যতদিন এই বিশ্বাস থাকে যে, উপাসনা কেবল ব্রত, ততদিন প্রতিদিনের নিয়মিত উপাসনা সমাপ্ত হইলেই আমাদের ব্রত পালন হইল, মনে করি; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে যখন উপাসনাতে আত্মার রুচি জন্মে, তখন দেখিতে পাই, উপাসনা কেবল ব্রত নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে আমাদিগকে বাঁধিবার জন্য ইহা একটী স্বর্গীয় কল। পাপ-ভারাক্রান্ত দুঃখী সন্তানদিগকে স্বর্গে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নির্লিপ্ত ঈশ্বর কি করেন? কতকগুলি জাল বিস্তার করেন। সন্তানেরা ঐ সকল ধর্ম্মজাল, প্রেমজাল, অথবা উপাসনা কলে পড়িল, আর মধ্য বিন্দু-স্থিত পরমেশ্বর ক্রমাগত তাঁহাদিগকে টানিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মনুষ্য স্বর্গের সুধা খাইতে চাহে না, কারণ তখন সংসারের সুখভোগেই সে প্রমত্ত, অতএব কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ঔষধ-সেবনের ন্যায় সেই মলিন সুখোন্মত্ত মনুষ্য প্রথমতঃ উপাসনা-ব্রত পালন করিতে থাকে; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে পূর্ব্বে যাহা ব্রত ছিল, সাধকের নিকটে তাহা সুধার পাত্র হইল। গুরু বন্ধু হইলেন, উপাসনার ভাবান্তর হইল। প্রথম অবস্থায় ভাল লাগুক আর না লাগুক, ঈশ্বরের দেখা পাও আর না পাও, নিয়ম বলিয়া ব্রত বলিয়া উপাসনা করিতেই হইবে। কিন্তু যেখানে পৌঁছিলে উপাসনার রসাস্বাদ পাওয়া যায়, সেখানে পড়িলে উপাসনাকে সুধা বলিয়া বর্ণনা করি। সেই আরাধনা, সেই ধ্যান, সেই প্রার্থনা, সেই সঙ্গীত; যখন উপাসনা ব্রত ছিল, তখন তাহাদের প্রতি টান ছিল না, ব্রত টানিতে পারে না; কিন্তু যখন উপাসনা-রাজ্যের গভীরতর স্থানে নিমগ্ন হইলাম, তখন উপাসনা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আগে মনে হইত, উপাসনা সাঙ্গ হইলেই সেই দিনের কাজ শেষ হইল, কিন্তু যখন উপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে অধিকার পাইলাম, তখন দেখি, যখন উপাসনা সমাপ্ত হইল বলিলাম, তখন সেই সুধা-পান আরম্ভ হইল মাত্র; সমস্ত দিন, সমস্ত সপ্তাহ, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর এবং অনন্ত জীবনেও তাহা শেষ হইবে না। প্রথমাবস্থায় প্রাতঃকালে ব্রত বলিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম, ব্রত বলিয়া তাহা শেষ করিলাম। পরে যখন সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, উপাসনা যে করিয়াছিলাম, প্রাণের মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না।

যতদিন উপাসনাতে প্রাণ মজিয়া না যায়, ততদিন এই দুরবস্থা থাকে; কিন্তু যখন মাদকদ্রব্য-সেবনের ন্যায় উপাসনা দ্বারা নেশা আরম্ভ হয়, তখন উপাসনা সমাপ্ত হইলেই সেই দিনের কার্য্য শেষ হয় না; কিন্তু সেই উপাসনার ফল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। উপাসনা শেষ হইল, কিন্তু তাহার ফল সমস্ত দিন ভোগ করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক যতদিন উপাসনা কেবল ব্রত থাকে, ততদিন প্রাতঃকালের উপাসনার সময় যেমন ঈশ্বরের ভাবে উপাসনা আমাদের জীবনময় সুধারূপে পরিণত হয় নাই, তাই উপাসনা কঠোর ব্রতের মত রহিয়াছে; তাই উপাসনার প্রতি অনাদর, ব্রহ্মমন্দিরের প্রতি অনাদর। ভগবান্ উপাসনার প্রতি সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। (সং)

* ভাদ্রোৎসব সমাগত। ভাদ্রোৎসব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার উৎসব। ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে আচার্য্যদেব এই উপদেশটী দিয়াছিলেন। এই উপদেশটীর প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই ইহা উদ্ধৃত হইল।

মন পূর্ণ থাকে, সমস্তদিন তেমন আর সেই ভাবটী থাকে না। এই অবস্থায় উপাসনার অব্যবহিত পরেই সংসার সেই দুর্ব্বল প্রাণকে আক্রমণ করে, এবং সেই দুর্ব্বল আত্মা প্রলোভনে পড়িয়া পাপের দিকেও চলিয়া যায়। এই অবস্থাতেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে বলেন, উপাসনার ভাব সমস্ত দিন থাকে না। যাঁহারা বাঁচিয়া যাইতে চাহেন, এই উপাসনা লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই ভাবের উপাসনা তাঁহাদের আবশ্যক, যাহা দ্বারা আত্মার ভিতরে একটী স্বর্গীয় নূতন জীবন আসিয়া, পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে এবং যখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, আমার ভিতরে আর আমি নাই। এই অবস্থায় সাধকের নিকট প্রলোভন পাপ সকলই মিথ্যা, কিছুতেই তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে না। যে প্রাণ পাপের সুখে মত্ত হইত, সেই প্রাণ ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন। প্রলোভন আর বিচলিত করিবে কাহাকে? কিন্তু যতদিন প্রাণ এইভাবে ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত না হয়, ততদিন মনুষ্য হয় ত তাহার মনোমত খুব ভাল উপাসনা করিল; কিন্তু উপাসনান্তে যাই কার্য্য করিতে গেল, আবার সেই গুপ্ত পাপগুলি দেখা দিল। অতএব ইহা সত্য কথা নহে যে, ভাল উপাসনা হইলেই সমস্ত দিন ভাল যায়। যদি সমস্ত দিন ভাল থাকিতে চাও, তবে সেখানে যাও, যেখানে সুরার দোকান; তাঁহার নিকটে যাও যিনি সুরা ঢালিয়া দেন; একবার প্রাণ ভরিয়া সেই সুরা পান করিয়া লও, দেখিবে, পান করিতে করিতে নেশা আরম্ভ হইল! সুরাপান সমাপ্ত হইল, তথাপি সেই নেশা আর যায় না, তাহা আরও বাড়িতে লাগিল; আর সুরাপান করিতেছ না, কিন্তু সুরাপানের ফল মত্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমস্ত দিন উপাসনা করি না; কিন্তু প্রাতঃকালে একবার যে সেই প্রেম-মদিরা পান করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণ মন কেমন মত্ত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত দিন বুঝিতেছি, যেন ঈশ্বর চারিদিকে; যে দিকে দেখি, সেই দিকে তিনি; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে পারি না। দেখি, এক প্রমত্ততার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই নেশা আর যায় না।

ভক্ত জানেন, নেশা কি বস্তু। নির্ব্বোধ ভক্ত, তুমি কি জান না, প্রেম-সুরার কত বল? ভক্ত একবার সেই সুরা পান করিলেন, আবার বলিলেন, প্রেমময়, আর একবার ঐ অমৃত ঢালিয়া দাও। ঈশ্বর আরও অমৃত ঢালিতে লাগিলেন, ভক্ত পান করিতে করিতে একেবারে অচেতন বিহ্বল হইলেন। তাঁহার ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থনা সকলই মিথ্যা, সকলই তাঁহার চাতুরী, সুরাপান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ধ্যান, উপাসনা এবং ইহকাল পরকাল সকলই কেবল সুরাপান; সকল প্রকারে স্বর্গের সুধাস্বাদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। লোকে বলে, আজ অমুক ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা অমুক ব্যক্তির শুষ্ক প্রাণে জীবে দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত ভক্তকে চেনে, ভক্ত জানে যে, পবিত্রতা, দয়া এ সকল কিছুই নহে, আসল কথা সুরাপান করিয়া মত্ত হওয়া। ভক্ত সেই যে একবার সুরাপান করিয়া লইল, তাহাতেই সমস্ত দিন প্রেম-সাগরে মত্ত থাকিবে। সংসার শত সহস্র প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিবে, লোকে তাঁহার নিকট টাকা রূপা সোণা আনিবে, কিন্তু ভক্ত সে সকল দেখিয়া উপহাস করিবে। মাতাল হইয়াছে যে ঈশ্বরের প্রেমসুধাপানে, সংসার তাহাকে কি সুখ দেখাইয়া ভুলাইবে? বিপদ যাহার কাছে সম্পদ, মৃত্যু বিভীষিকা তাহার কি করিতে পারে? সাধক! তুমি যদি এই সুধাপানে উন্মত্ত হইতে পার, আর তোমার ভয় নাই। যাঁহারা এই সুধাপানে মত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অভয়পদ পাইয়াছেন; এই সুধার এমনই গুণ যে, ইহা পান করিলেই মানুষ পাগল হয়। ইহার স্বভাবই মত্ত করা, এই দ্রব্যের গুণেই মত্ততা হয়। তবে যে আমরা দেখি, পাঁচ ঘণ্টা উপাসনা করিলেও কাহার মন মত্ত হয় না, আবার উপাসনা আরম্ভ করিবামাত্র কাহারও প্রাণ প্রেমরসে মজিয়া যায়; তাহার কারণ এই, একজন সুধাপান করিতে জানে না, আর একজন সহজেই এই সুধাপান করিতে সক্ষম হয়।

বাস্তবিক উপাসনা করিতে করিতে সেই যে স্বর্গীয় মত্ততা হয়, তাহাই প্রকৃত উপাসনা। সেই মত্ততার ব্যাপার উপাসনার পরেও ভিতরে ভিতরে প্রাণকে একেবারে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। এই প্রমত্ততাই কেবল সংসার এবং ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করে। আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি, এই প্রমত্ততা ভিন্ন কেহই সংসার এবং ধর্ম্মকে এক করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম-সহবাস-সুখ কি সুখ, ভক্তেরা অন্তরে অন্তরে তাহা জানে, তাই চতুরের ন্যায় জগৎকে ফাঁকি দিয়া তাহারা দিবানিশি সেই আমোদ সম্ভোগ করে। জগৎ দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ইহারা ভক্ত হইয়াছে, ইহারাও খায়, কার্য্যালয়ে যায় যথার্থ; কিন্তু ইহাদের প্রাণ ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আমার মত্ততা হয় ত এক ঘণ্টা, নয় পাঁচ ঘণ্টা থাকে; কিন্তু যে ভক্ত অভয়পদ পাইয়াছেন, তাঁহার মত্ততা এক উপাসনা হইতে অন্য উপাসনা পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্বর্গের সুরা পান করিয়া ভক্তের এমনই নেশা হয় যে, আর তিনি সংসারের কোলাহল শুনিতে পান না। ধন, মান, সুখ্যাতি, টাকা কড়ি, সুখ, সম্পদ ইত্যাদি পৃথিবী লইয়া, কিন্তু তাঁহার কাণের কাছে চীৎকার কর, তিনি শুনিতে পাইবেন না; কেন না তিনি প্রেমে মাতাল হইয়া ভিতরে ভিতরে এমনই ডুবিয়া রহিয়াছেন যে, বাহিরের কিছুই আর গ্রাহ্য হয় না। তাঁহার শরীর মাতালের শরীরের ন্যায় পড়িয়া আছে; কিন্তু ভক্ত অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন? পৃথিবী বুঝিল না। পৃথিবী কাণের কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উঠ, টাকা আনিয়াছি, সুখ আনিয়াছি; কিন্তু কে শুনিবে? ভক্ত যে, সে ঘরে নাই। সেই ঘরের দ্বারে আঘাত করিলে কি হইবে? শুনিবে যে, সে যে মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার প্রমত্ত বৈরাগী

ভক্ত যিনি, তিনি এই বাহিরের ঘর ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই ঘরটী কিন্তু সংসারে থাকে। ইহা কর্ম্মচারী, যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনার কাজ করে। শরীরটা পৃথিবীতে আপনার কাজ করিতেছে, কিন্তু আসল আত্মা ভক্ত যিনি, তিনি ঘরে নাই, পৃথিবী তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে ধরিতে পারে না, তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্ত পদ পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে পৃথিবীর কোন সুখের স্পৃহা নাই, কোন লালসা নাই। যে প্রাণ ব্রহ্মসুরাপানে মত্ত, পৃথিবী কি আর তাহা ছুঁইতে পারে? যতই উপাসনা করেন, ততই ভক্তের প্রাণ প্রমত্ত হয়। মত্তত্বার উপাসনার পর আবার উপাসনা করিলেন, ভক্ত দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ এবার আরও দশ হাত গভীরতর প্রেমহ্রদে মত্ততাহ্রদে নিমগ্ন হইল। যদি ভক্তের জীবন ধারণ করিতে চাও, তবে এইরূপে দিন দিন প্রমত্ততা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই প্রমত্ততা ভিন্ন ভক্তের আর কিছুই ভাল লাগে না; কিন্তু এই সুরারাজ্যে, এই প্রমত্ততার অবস্থায় প্রমত্ত ভক্তের কেবল একটী বিষয় ভাল লাগে। তাহা এই যে, আরও কতকগুলি লোক এই সুধারসপানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের প্রমত্ততা বৃদ্ধি করুন। এস, উপাসনা করিতে করিতে আমরা সেই মত্ততা সঞ্চয় করি। দেখিব, আমাদের মাথার উপর দিয়া মাস বৎসর চলিয়া গেল; কিন্তু আমাদের প্রমত্ততা ফুরায় না। এস, সকলে মিলিয়া সুরার দোকানে সুরা ক্রয় করি, এই সুরা পান করিয়া সকলে বিহ্বল হই। সমস্ত দিন এই সুরা ভিন্ন আর কোন সামগ্রী ভাল লাগিবে না। উপাসনাকে আর কঠোর ব্রত মনে করিও না, উপাসনাকে সুধা কর, এবং সেই সুধা-পানে সকলে প্রমত্ত হও।

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

Different Gifts—

সুকোমল ভক্তি ধর্ম্মজীবনের একটী উপাদান বটে, কিন্তু একমাত্র ভক্তিতেই ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা নহে। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যোগ দিলে মনে হয় যে, ব্রাহ্মেরা যেন শুধু ভক্তিকেই ধর্ম্মজীবন বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। কঠোর পবিত্রতা, গভীর জ্ঞান, নির্ম্মল ঋষিদৃষ্টি, তর্কবিতর্কের অতীত সাক্ষাৎ ধ্যানলব্ধ বিশ্বাস, অগ্নিময় উৎসাহ এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অবিশ্রান্ত আত্মহারা কর্ম্মনিষ্ঠা—এগুলিও ধর্ম্মজীবনের উপাদান। মানবদেহ শুধু মাংসময় নহে, কিন্তু মাংসের নীচে যেমন হাড় আছে, তেমনি ধর্ম্মজীবনের জন্য শুধু কোমলতা ও মধুরতা যথেষ্ট নহে, কিন্তু কোমলতা ও মধুরতার সহিত দৃঢ়তা ও কঠোরতাকে মিলাইতে হইবে।

Rest—

সাধুর অন্তরে যে শান্তি বিরাজ করে, তাহা ভগবানের শ্রেষ্ঠতম আশীর্ব্বাদ। এই শান্তিই তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি। উচ্ছ্বসিত প্রেম, পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ের পবিত্রতা—এই তিনটী শান্তিতরুর মূল।

Lowliness—

দীনতা ও বিনয় ত দুর্ব্বলতা নয়, এবং দাম্ভিকতা ও মহত্ত্ব এক বস্তু নয়। যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম পুরুষ, তাঁহারাই দীনতম। যথার্থ বিনয় এমন একটী সুদৃঢ় দুর্গ যে, লাঞ্ছনা ও অপমানের সাধ্য নাই, সে দুর্গ অধিকার করিবে। ভগবানের করুণা যে শান্তির নির্ঝর, সেই করুণা মানুষকে সকল বেদনা বহন করিবার শক্তি দেয়। যাহারা দাম্ভিক, লাঞ্ছনা ও অপমানের পেষণে তাহারাই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

Love of Man—

মানব-প্রেম আমার অন্তরে দিন দিন প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। অপরের দুঃখ কষ্ট, পাপ তাপ, সাধুতা এবং মহত্ত্ব যেন আমার নিজের বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। শিশু-বৃদ্ধনির্ব্বিশেষে আমি সকলকে ভালবাসি—সকল পুরুষ, সকল স্ত্রীলোক, সমুদয় বালকবালিকাকে আমি ভালবাসি। আমি সকলের জন্য খাটিয়াছি এবং সকলের সেবা করিতে করিতে আমি ইহলোক হইতে বিদায় লইব—এই কথা মনে করিয়া আমার আনন্দ হয়। মানবের অন্তরে যে ভগবান বাস করেন, ইহা সাক্ষাৎ সত্য। আমি সেই সত্যে আত্মহারা হইয়া যাইব। আমার দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার চলিয়া যাইবে, এ কথা মনে করিলে যে আনন্দ হয়, তাহা বাক্যের অতীত।

Sacrifice—

ভক্তের পক্ষে বিষয়-সুখ ত্যাগ করার জন্য এবং মানবের সেবায় কঠিন পরিশ্রম করার জন্য কোন প্রশংসা নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে সহজ। ইহা না করিয়া থাকাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। প্রেমের নিকট যে ত্যাগ ও সেবা সহজ, সংসারের মলিন প্রেমও তাহার সাক্ষী।

Reconciled to God—

জীবনে দুঃখ কষ্ট পাইয়া অনেক সময়ে ভগবান্‌কে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে, তুমি যাহার উপযুক্ত, তাঁহার হস্ত হইতে ঠিক তাহাই তুমি লাভ করিতেছ। তিনি শুধু ন্যায়বান নহেন, কিন্তু করুণাময়। তোমার অপরাধের তুলনায় তুমি যতখানি ক্ষমা পাইবার উপযুক্ত, তাহার অপেক্ষা তিনি তোমাকে অনেক অধিক ক্ষমা করিতেছেন, এ কথা স্মরণ করিয়া যদি তোমার আনন্দ না হয়, প্রতি পদক্ষেপে তোমার

মস্তকে পাষাণের আঘাত লাগিবে। তোমার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে কিছু মাত্র অন্যায় হয় নাই, এ কথা তুমি যখন বুঝিবে, সংসারের নিকট হইতে যে লাঞ্ছনা ও অপমান প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি তাহার উপযুক্ত, এ কথা যখন স্বীকার করিবে, সকল বস্তু এবং সকল ব্যক্তির সহিত তোমার কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে যখন দৃঢ় নিশ্চিত হইবে—তখন পরম পিতার গৃহে তোমার জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তাহার সন্ধান পাইতে পার।

Learn Forgiveness—

যাহাদের মত অধম, নীচ ও ক্ষুদ্রাশয় আর নাই, দেখ, ভগবান্ তাহাদিগকেও কত ভালবাসেন। সংসারে দুষ্ট লোকদের কত উন্নতি হইতেছে, অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা কত সুখে আছে, উদ্ধত ও নির্লজ্জ পাপীদের স্বাধীনতাও তিনি হরণ করেন না—ইহা লক্ষ্য কর। কাহাকেও ঘৃণা করিও না। দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারীকেও ঘৃণা করিও না, কিন্তু তাহাকে ভয়ও করিও না। অত্যাচার সহ্য কর, কিন্তু অত্যাচারের প্রশ্রয় দিও না। দুষ্ট লোকেরা ঘৃণা করে করুক, লাঞ্ছনা দেয় দিক। নির্ভয় অন্তরে সকলকে ভালবাস। দৃঢ়তার সহিত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হও। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন।

Keep Quiet—

নিজের ধন সম্পদের গর্ব্ব করা যেমন নীচতার প্রমাণ, নিজের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা লোককে বলিয়া বেড়ানও প্রায় সমানরূপেই নীচতার প্রমাণ। কেহ কেহ নিজের রোগের কথা লোকের কাছে দিবারাত্রি বলিয়া হা হুতাশ করে; কেহ কেহ আপনার দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের অহঙ্কারেই স্ফীত। লোককে বলা বৃথা। তুমি যে বাস্তবিক কি প্রকারের মানুষ, তাহা না বলিলেও লোকে আশ্চর্য্যরূপে বুঝিয়া লয়। আমি যে কত পবিত্র, সে কথা কত সময়ে আমি বন্ধুদের বলিয়াছি; কিন্তু বলা বৃথা। আমাকে দেখিয়া লোকে আমার অবস্থা বেশ সচ্ছল বলিয়া মনে করে। আমার বাহিরে ধনীর সাজ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি অত্যন্ত নিঃস্ব। কখন কখন আমি বাহিরে বাহিরে নিঃস্ব, কিন্তু অন্তরে রাজা মহারাজা বলিয়া আপনাকে অনুভব করি। কি মহা ভ্রান্তি! নিজের কথা অপর কাহাকেও বলিও না। যাঁহারা বুদ্ধিমান ও যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহারা তোমার সত্য পরিচয় জানিতে পারিবেন।

—০—

নবভক্তির ত্রিধারা।

নববিধানভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের হৃদয়-কন্দর হইতে নব ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইলে, সেই ভক্তির মধুর ঝঙ্কার চিরজীবের কণ্ঠে নিনাদিত হওয়া মাত্র, নববিধানের প্রেরিত ভক্তদল মাতিয়া উঠিলেন; সেই ভক্তিসুধা বিলাইতে ভক্ত অমৃতলাল নগরের পল্লিতে পল্লিতে সদলে গাহিলেন, "তোরা আয়রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন; তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন। ঐ দেখ! সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন।" এই মধুর আহ্বানে সে সময় আমাদের মত চঞ্চলমতি যুবকদল মাতিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুভয়ে ভীত, শোকে, দুঃখে, অভাবে, রোগে জর্জ্জরিত প্রাণ লইয়া যখনই শুনিলাম, "চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন," তখনই মৃত প্রাণ জাগিয়া উঠিল। "ঐ দেখ! সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন" ভক্তের মধুর আহ্বানে, ঊর্দ্ধ বাহুর নির্দ্দেশে নিরাকার স্বরূপের ঐ মোহনরূপ দেখিতে প্রাণ আকুল হইল। মৃত্যু আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না, আমরা ডঙ্কা মেরে ভবপারে চলে যাবো, এই আশায় যুবক, বালক ও বৃদ্ধের দল যোগ দিয়া আশাভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ দলের মধ্যে মিশিলেন সরল ভক্ত নন্দলাল, অকিঞ্চন ভক্ত ফকিরদাস; অমৃতলালের উৎসাহ, নন্দলালের সরলতা ও বাল্যভাব, ফকিরদাসের অকিঞ্চনা ভক্তি—যেন একটীর সহিত আর দুটী ভক্তির স্রোত মিলিয়া, মধুর ব্রহ্মনাম, প্রাণারাম হরিনামের মধুর রসে পল্লিবাসীদের প্রাণকে সবেগে ব্রহ্মচরণের দিকে আকৃষ্ট করিল। তখন মনে হইত, যেন বিলাসমত্ত, ধনবিদ্যাভিমানে মোহান্ধ নরনারীকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একদল স্বর্গের দূত ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এই তিনটী প্রেরিত বিধানভক্ত যখন যেখানে যাইতেন, সেই দেশে হরিনামের নূতন ভক্তি-স্রোত বহিয়া যাইত। কলিকাতার সিমলা, কাঁসারীপাড়া প্রভৃতি স্থানে এইরূপ জমাট কীর্ত্তন হইত। পল্লিগ্রামের কোন কোন পল্লিতে সরল ভক্ত নন্দলাল ফকিরদাসের সহযোগে যখন গাহিতেন, "এস করিহে হরিনামসংকীর্ত্তন; নাম পরম রতন, নামে হইবে সকল দুঃখ বিমোচন"। কীর্ত্তনের অধিকারী নন্দলাল কীর্ত্তনের আরম্ভেই কাঁদিয়া ফেলিতেন; তাঁর অশ্রুবিগলিত কণ্ঠস্বর আমাদের মত ক্ষুদ্র হৃদয়কে আকুল করিত। সেই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফকিরদাস গাহিতেন, "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপ আনন্দঘন; ওরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন......ওরূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে"। এই মধুর প্রাণজুড়ান কীর্ত্তনানন্দে, যুবক দল সত্যই মজিতেন, ডুবিতেন, পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেন। তাই মনে হয়, মহামিলনের এই নববিধান মানবকে অমূল্য ভক্তি-রত্ন দিবার জন্যই এ ধরায় অবতীর্ণ; যেখানে মিলন, যোগ ও অভেদ ভাব, সেইখানেই নবভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস। শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের নিকট বিদায় লইয়া, নবসন্ন্যাস-ব্রত লইবার জন্য, ভক্ত অমৃতলাল নন্দলালকে সঙ্গে লইয়া, ভাগীরথীর তীরে তীরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সদলে নবদ্বীপ যাত্রা করেন; নবদ্বীপধামে অমৃতলালের নব সন্ন্যাসীর বেশ ও অশ্রু-বিগলিত ভাব দেখিয়া নন্দলাল গাহিয়াছিলেন, "জীবের দুঃখে কাতর হয়ে দণ্ড লয়ে ওহে নবীন ব্রহ্মচারী, বলি, বলি, যাচ্ছ

কোথায়, নেবাও আমার, আমি তোমার পায়ে ধরি।" এই হইতেই উভয় ভক্তের মধ্যে একটী স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধন হইয়াছিল, চির-দিনই তাঁদের এই বন্ধন থাকিবে।

নব সন্ন্যাসব্রত লইয়া ভক্ত অমৃতলাল যখন সর্ব্বপ্রথম এই অমরাগড়ীতে আগমন করেন, সেই সঙ্গে ভক্ত নন্দলাল ছিলেন। ভক্তসিংহ যেদিন এই ক্ষুদ্র পল্লিতে আসিলেন, সেই দিনই বৈকালে নিকটস্থ ভদ্রপল্লী ঝিঁখিরাতে ফকিরদাসের দল লইয়া কীর্ত্তন ও প্রচারে গমন করেন; খুব দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, ঝিঁখিরা-বাসী যুবকদল সুরামত্ত ইতর লোকদের লইয়া ভক্তদলকে, যারপর নাই, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাঁরা ভক্ত-বৎসল শ্রীহরির নাম শুনিলেন না। এইরূপ ভক্তাবমাননায়, হরি-ভক্তির ইতিহাসের মধ্যে প্রাণাধিক প্রভু নিত্যানন্দ ও ভক্ত হরি-দাসকে যেরূপ পাষণ্ড জগাই মাধাই নির্য্যাতন করিয়াছিল, ভদ্রপল্লি ঝিঁখিরাবাসী তৎকালের যুবকেরা ধনমদে, জাত্যভিমানে এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহারই পুনরভি-নয় করিয়া, নূতন বিধানের নব ভক্তির ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের কলঙ্ক-কালিমা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ভক্ত অমৃত-লালের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, পরদিন তিনি মা বিধানজননীর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া পশ্চিমাঞ্চলের জন্য একটী সেবকদল ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ফকিরের দলকে নিজের প্রাণের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্থান দিয়াছিলেন। এই তিনটী ভক্তের মধ্যে ফকিরদাস প্রথমেই দেহত্যাগ করেন; ফকির-বিরহে আকুল হইয়া ভক্ত অমৃতলাল এই সেবককে লিখিয়াছিলেন "বাবা অখিলচন্দ্র! পুত্র-শোকের যে কি ভীষণ যাতনা, তাহা এতদিনে ভোগ করিলাম; ফকিরের দেহত্যাগে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে"। ফকিরদাসও অমৃতলালের সহিত ভক্তিযোগে ঐরূপ উচ্চ ও স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন। এই তিনটী ভক্তের স্বর্গীয় যোগ বাস্তবিকই অতি রমণীয়। মনে হয়, প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দরূপ গোমুখী হইতে যে নবভক্তির ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ন্যায় অমৃতলাল, নন্দলাল ও ফকিরদাসের হৃদয় দিয়া ভক্তির ত্রিধারা বেগে ধাবিত হইয়া, এই নব যুগে নূতন ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া কত শত শত নরনারীর তাপিত প্রাণকে শীতল করিয়াছে। ধন্য মা বিধান জননী! তিনি যে ভক্ত-রত্নহার নিজ হস্তে আমাদের গলায় পরাইয়া দিয়াছেন, আজীবন মরণান্তেও যেন সেই ভক্তদলের পদপ্রান্তে বসিয়া, মোহন মূরতি দেখিতে দেখিতে অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হই, তিনি কৃপা করে সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

আমরা কি নববিধান বুঝিয়াছি?

আমরা কি নববিধান বুঝিয়াছি ও গ্রহণ করিয়াছি? এ প্রশ্ন চিরদিন আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হইতে থাকিবে। নববিধান শব্দাত্মক অথবা নামাত্মক নহে। ইহা এক প্রাণগত সাধনাসম্ভূত নূতন বস্তু। ইহা এখনও নূতন ও পরেও নূতন। বিধাতা নিত্য নূতন ভাবে যে বস্তু দান করেন, তাহাই নববিধান। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সাধনার পথে নিত্য যাহা লাভ করিলেন, তাহাই তাঁহার প্রতিদিনের নববিধান। নববিধানের মানুষ নিত্য নূতন হইতে থাকেন। তিনি কাল যাহা ছিলেন, আজ আর তাহা নহেন। শিশু নিত্য নূতন শিক্ষালাভ করে। শিশু প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়। কাল যাহা ছিল, আজ আর তাহা নহে। সর্ষপ-কণা সদৃশ বীজ হইতে আকাশভেদী বটবৃক্ষ ক্রমোন্নতির পথে নিত্য নূতন ভাবে উত্থিত হইতে থাকে। সাধকের জীবনও সেইরূপ। আমরা কি 'নব' শব্দের জীবনগত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি? এই শব্দ সাধক ব্রহ্মানন্দের সাধনা-সম্ভূত। অনেক স্তব স্তুতিতে যাহা আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহাই নব। এই শব্দ 'নু' ধাতু হইতে উৎপন্ন, এই ধাতুর অর্থ স্তব স্তুতি করা। স্তব স্তুতিই নববিধানের সাধনা।

আমরা তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিতেছি। প্রাচীন ঋষি ভক্তেরাই তাঁহাকে 'ব্রহ্ম'-নামে ডাকিয়াছেন। আমরাও তাঁহাকে সেই নামে ও সেই ভাবে চিনিতে আসিয়াছি। ঋষি তাঁহার 'জ্যোতিরূপ' দর্শন করিলেন এবং সেই দর্শন হইতে তাঁহাকে 'ব্রহ্মরূপ' বলিয়া চিনিলেন। এই ব্রহ্ম শব্দ বৃন্হ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুর অর্থ আলোক দান করা। যিনি আমবাত্মার ভিতরে আলোক দান করিতেছেন, তিনিই 'ব্রহ্ম'। এই আলোকের প্রতিমাস্বরূপ খৃষ্টীয় জগতে "Paschal light" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইসলাম জগতেও মসজিদে প্রজ্বলিত আলোক "দামা" নামে আখ্যাত। অনেক হিন্দু দেবালয়েও রাত্রিদিন দীপালোক জ্বলিতেছে। হিন্দু দেবালয়ে প্রতিদিন পঞ্চ প্রদীপে আরতি চলিতেছে। তিনি যে আলোকরূপী দেবতা, দেবালয়ে প্রজ্বলিত আলোক তাহাই শিক্ষা দিতেছে। শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধানের পূজাক্ষেত্রে এই শিক্ষার মানচিত্রস্বরূপ আরতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। "পঞ্চপ্রদীপ" কি এই শিক্ষা বিধান করিতেছেনা? বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য ধর্ম্মসাধনের মূল ভিত্তি। এই পাঁচটীর ভাবব্যঞ্জক-রূপে পঞ্চপ্রদীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শনের এই মান-চিত্রকে কুসংস্কারের আবরণে আবৃত করাই কুসংস্কার। পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'বেকন' বলিয়াছেন, "To advoid a superstition is itself a superstition." যাহা আমরা কুসংস্কার ভাবি, তাহাও আমাদের চিন্তা-সাপেক্ষ।

আমরা নববিধানে যে নূতন অনুভূতি লাভ করিবার জন্য আসিয়াছি। হিন্দু ঋষিও তাঁহার স্তব স্তুতির ভিতর দিয়া তাঁহার

নবদেবতার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভিতরেও নব-দুর্গার অনুভূতি আসিয়াছিল। সাধনার পথে সব নবীন হইয়া যায়। "The Mulberrey leaves become Satin." গুটি পোকার ভিতর দিয়া অনেক প্রস্তুতির ফলস্বরূপ নূতন ও সুন্দর রেশমের উৎপত্তি। এই স্থানে আরও একটু বলিতেছি যে, সাধকের সাধনায় নূতনত্বের অনুভূতি একটী স্বাভাবিক বস্তু। হিন্দু সাধকও এই নূতনত্বের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের সাধনায় যে "প্রণব" সাধনার নূতন পথ দেখিয়াছিলেন, তাহাও আর কিছু নহে, কেবল ভগবানের নূতনত্বের অনুভূতি। এই শব্দের অর্থ, স্তব স্তুতির ভিতর দিয়া প্রকৃষ্ট ভাবে নূতনত্বের সাধনা। পাশ্চাত্য ঋষিও "From the oldness of things to the newness of spirit" এই মহা অনুভূতিতে আসিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি 'নব' শব্দ আভিধানিক নহে, ইহা ভাবাত্মক।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে যে "সমাজ" শব্দ ব্যবহার করিতেছি, ইহারও অর্থ সম্পূর্ণ ভাবাত্মক। এই শব্দ "সমপূর্ব্বক জন্" ধাতু হইতে উৎপন্ন। জন ধাতুর অর্থ জন্মগ্রহণ করা। সাধকমণ্ডলী যখন ভগবানের উপাসনায় সমভাবে নবজাত শিশুর মত এক ভাবে ও এক আত্মায় মিলিত হন, তখনই প্রকৃত সমাজের আদর্শ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। শ্রীবুদ্ধ যে তাঁহার অনুগামী ভক্তবৃন্দের মধ্যে 'সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে সঙ্ঘ সহজ বস্তু নহে। এই শব্দ সমপূর্ব্বক হন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাঁহারা পৃথিবীর সমুদয় বাসনা সংহার করিয়া সংহতের মত মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই সঙ্ঘের প্রকৃত গৌরব রক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের নববিধানেও নূতন মীরা দেবী সুনীতি এইরূপ একটী দলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছিল, তাহা সহজ বস্তু নহে। তিনি রাজেশ্বরী ও মহারাণী হইয়াও তাঁহার জীবনে এই সঙ্ঘ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে অগ্নিপরীক্ষার ভিতরে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্ঘের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অন্যান্য ধর্ম্মসমাজে যেমন উৎসব হয়, ব্রাহ্মসমাজেও সেই উৎসব চলিতেছে। উৎসব শব্দের অর্থও ভাষাগত নহে, ইহা একটী প্রাণগত বস্তু। এই শব্দ উৎ পূর্ব্বক সূ ধাতু হইতে উৎপন্ন। সূ ধাতুর অর্থে প্রসূত হওয়া অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করা। শিশু যেমন অনেক প্রস্তুতির পর মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হন, সাধকও সেইরূপ অনেক প্রস্তুতির পর ভগবানের উৎসবে নবশিশুর মত জন্ম গ্রহণ করিয়া একটা নবজন্ম লাভ করেন। উৎসব শব্দের অর্থ উচ্চজীবন। শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁহার উৎসবে প্রস্তুতির মধ্যে এই নবজন্মের সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নবশিশুর মত উৎসবানন্দে নৃত্যও করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের নববিধানে এই সব অবস্থা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। তাই ভগিনীগণ! আমরা এই নববিধানে নবীন না হইলে, এই বিধানের সাধনা সম্ভব হইবে না। আজ এ দাসের মণ্ডলীর নিকট এই নিবেদন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—:—

সমালোচনা।

১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখের "সোণার বাঙ্গলা" নামক পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার "রামকৃষ্ণ ও বিশ্বসভ্যতার বাঙ্গালী যুগ" প্রবন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা আমাদের আলোচনার বিষয়রূপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"রামকৃষ্ণকে অবতাররূপে পূজা করিয়া অথবা ভগবানের আসন দিয়া আমরা মনে করি যে, বুঝি আমরা রামকৃষ্ণের চরম গৌরব করিলাম। রামকৃষ্ণকে এই আসনের চেয়েও মহত্তর আসন দেওয়া সম্ভব। সে দিকেও বাঙ্গলার নরনারীর নজর ফেলা আবশ্যক। রামকৃষ্ণ বিশ্ব-সভ্যতার বাঙ্গালী যুগের প্রবর্ত্তক।......পৃথিবীর ইতিহাসে হয়ত এতদিনে একটা বাঙ্গালীর যুগ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই বাঙ্গালী যুগের আসল স্রষ্টা বিবেকানন্দ। আর সেই বিবেকানন্দ যে ব্যক্তির নিকট নিজ কৃতিত্বের কর্ম্মরাশির ও কীর্ত্তির জন্য খোলাখুলী কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যক্তির নাম রামকৃষ্ণ। কাজেই বিংশ শতাব্দীতে জগতের সভ্যতায় বাঙ্গলার নরনারী যে সকল দুনিয়ার শ্রদ্ধাযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইতে ছুটিয়াছে, সেই সকল কৃতিত্বের গোড়ায় যিনি বসিয়াছেন, সেই রামকৃষ্ণ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ভগবানের চেয়েও মহত্তর।"

আমরা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি সাধু আত্মা বা মহাজনশ্রেণীর ব্যক্তিগণ যুগাবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন, ভগবানের আসনে বসাইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করা হইয়াছে; কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও ভগবানের অপেক্ষা বড় করা হয় নাই।

রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ঈশা, চৈতন্য, স্বদেশের, বিদেশের কোন সাধু মহাজনদিগকে ভগবানের আসনে বসাইয়া, ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজা করা যাইতে পারে না; তাঁহারা সকলে উপাসকের দৃষ্টান্ত দেখাইতে জগতে আসিয়াছেন। কেহ বা পুত্রের, কেহ বা ভক্তের দৃষ্টান্ত দেখাইতেই জগতে আসিয়াছেন; "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়" তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা উক্ত হইয়াছে। উপাস্য এক মাত্র ঈশ্বর; সাধু মহাজনেরা আমাদের সহ উপাসক, আমাদের ধর্ম্মাগ্রজ, মানবকুলের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা। নবযুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে এই সত্য জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। ঈশ্বরের পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্বয়ং ঈশ্বরই। তাঁহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য জগতে আর কাহারও আসা প্রয়োজন হয় না। উপাসকের দৃষ্টান্ত, সাধুর

দৃষ্টান্ত, ভক্তের দৃষ্টান্ত, জগতে পুনঃ পুনঃ দেখাইবার প্রয়োজন আছে ; তাই যুগে যুগে সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্ম সাধু ভক্তের আগমন প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানময় সার্ব্বভৌমিক সত্য কেশবচন্দ্র জগতে প্রচার করিলেন, অনেকের জীবনে এই সত্য ইতিমধ্যে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা সার্ব্বভৌমিক সত্য, তাহা ক্রমে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। গূঢ় সত্য, উচ্চ সত্য, প্রতিষ্ঠিত হইতে চিরদিনই সময় লাগিয়াছে, সময় লাগিবে। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া সাধু মহাজনদিগকে উড়াইয়া দেন নাই, তাঁহাদের স্থান তাঁহাদিগকে দিয়া জগতে মীমাংসার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যদিও এখনও বঙ্গে ভারতে এবং অন্য দেশেও সম্ভব হইতে পারে, অনেকে পূর্ব্ববৎ সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতেছেন ; কিন্তু অতীতে বা বর্ত্তমানে কোথায়ও কেহ কোন সাধু মহাজনকে ভগবান হইতে বড় করিয়াছেন, শুনি নাই। ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাঁহা হইতে আর কে বড় হইবেন ? কেবল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের চেয়েও মহত্তররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক বর্ণনা, প্রতিবাদ-যোগ্য বর্ণনা, অপরাধ-যোগ্য বর্ণনা আর কি হইতে পারে ? কোন ধর্ম্মশাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান, দর্শন এরূপ বর্ণনার সমর্থন করেনা। পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক অযথা কথা বলিয়াছেন, আমরা এবারে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের চেয়েও মহত্তর করিলেন, তিনি বিবেকানন্দকে বাঙ্গালী নবযুগের আসল স্রষ্টা বলিবেন, তাহা কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা নববিধানের লোক, আমরা প্রত্যেক সাধুকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব, গ্রহণ করিব, তাঁহার চরণে প্রণত হইব ; কাহাকেও উপেক্ষা করা আমাদের ব্রত নহে। সাধুদিগকে যথাযথ গ্রহণ করিতে আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। কিন্তু একজনকে উপেক্ষা করিয়া অপর একজনকে যদি বাড়ান হয়, অথবা অযথা সম্মান দেওয়া হয়, তবে আমরা সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।

ভারতের পক্ষেই বলি, আর বাঙ্গলার পক্ষেই বলি, নবযুগের সৃষ্টি কোন্ সামগ্রী লইয়া? নব সভ্যতার সৃষ্টি কোন্ সামগ্রী লইয়া ? বাঙ্গলার নবযুগের সৃষ্টি, নব সভ্যতার সৃষ্টি—নবযুগধর্ম্ম, নব শিক্ষা, রাজনীতির ও সমাজনীতির উচ্চ সংস্কার এই সকল লইয়া। বঙ্গ ভারতের নবযুগের সুপ্রভাত—ধর্ম্মসংস্কার, রাজনীতির সংস্কার, সমাজনীতির সংস্কার, কর্ম্মনীতির সংস্কার এই সকল সংস্কার লইয়া মহাত্মা রাজা রামমোহনের জীবনে। তাই তাঁহাকে Father of the age বলা হইয়া থাকে। নব যুগের স্রষ্টা, নবযুগের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি যে সকল ব্যক্তির যোগে, জীবন-যোগে এই মহাব্যাপারের সংসাধন করিতেছেন, নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিলেই সত্য রক্ষা হয়, ঈশ্বরের কীর্ত্তি যথাযথ ভাবে বর্ণনা করা হয়। আমাদের স্থান অল্প, তাই অল্প কথায় আমাদের বক্তব্য বিষয় সমর্থন ভিন্ন উপায় নাই।

বিবেকানন্দ তাঁহার অগ্রজ রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির প্রভাব দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত—এ বিষয়ে এখানে স্বয়ং বিবেকানন্দের আপনার কথা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। বিবেকানন্দ নিজেই ভগিনী নিবেদিতাকে রামমোহনের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"রামমোহন বেদান্তের সত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন; তিনি একই ভালবাসার সহিত হিন্দু মুসলমানকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই তিন বিষয়ে তিনি দূরদৃষ্টি ও উদারতা দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছি।" Vide "Notes of some wanderings with swami Vivekananda" by Sister Nivedita. বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অনেকটা গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি সামাজিক সংস্কার-বিষয়ে, নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলের জীবনে শিক্ষা-সংস্কারবিষয়ে, রাজনৈতিক সংস্কারবিষয়ে, নবযুগরচনাবিষয়ে রামমোহনের স্থান ও কেশবচন্দ্রের স্থান তর্কের অতীত ভাবে কি এ যুগে বিশেষ নহে ? এবং রামমোহন ও কেশবচন্দ্র কি বিবেকানন্দের অগ্রজ নহেন ? তবে ধর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের যে স্থান, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না ; তিনি ছিলেন প্রমত্ত আত্মভোলা ভক্ত সাধক। তিনি বাহ্যশিক্ষা সভ্যতার ধার ধারিতেন না, নবযুগের শিক্ষা সভ্যতা শিক্ষা দিতেও আসেন নি। ধর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবযুগে বিবেকানন্দের স্থানও আমরা অস্বীকার করিব না। ঈশ্বর যাঁহাকে দিয়া এই যুগে যে পরিমাণ কার্য্য করাইয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণেই আমরা স্বীকার করিব। ইহাই আমাদের লক্ষ্য।

একটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "Behold the light of Heaven in India" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানে সংক্ষেপে এই বলিব যে, সেই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র ঘোষণা করিলেন—"বঙ্গভারত বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের জীবন্ত যুগলীলার ভিতর দিয়া চলিতেছে। ভারতের চতুর্দ্দিকেই নবধর্ম্মবিধান—New Dispensationএর লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।" এ সময়ে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ উদ্যমশীল ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মান্দোলনের ফলে, সামাজিক সংস্কারের ফলে, শিক্ষা-বিস্তার ও কর্ম্মোদ্যমের ফলে, বঙ্গভারত নবধর্ম্ম-জ্যোতিতে, শিক্ষা সভ্যতার নবালোকে নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। রামমোহন-জীবনে যে নবযুগধর্ম্মের, যে নবশিক্ষা, সভ্যতা ও নবকর্ম্মোদ্যমের প্রাথমিক আলোক শত বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়া, ভারত ও বঙ্গের বক্ষে বিকীর্ণ হইয়াছিল, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সে নবযুগধর্ম্ম, নবযুগের শিক্ষা সভ্যতা, সমাজসংস্কার ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মোদ্যম এত প্রবল বেগ ধারণ

করিয়াছিল যে, তাহার বেগ বঙ্গ ভারত অতিক্রম করিয়া সুদূর ইউরোপ, আমেরিকাকেও বিকম্পিত করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মুখ হইতে এমন সার্ব্বভৌমিক, বিশ্বপ্রাণমুগ্ধকর মহাবাণী, মহা সত্য সকল ঘোষিত হইতে লাগিল যে, কথা উঠিল—When Keshub speaks the world listens. এ সময় নবযুগের, নূতন ধর্ম্মের, নূতন সভ্যতার পূর্ণ যৌবন; যৌবনের নব নব বিকাশ, নব নব প্রকাশ। এই ১৮৭৫ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস সাধারণ মধ্যে অপরিচিত, অপ্রকাশিত। আর বিবেকানন্দ তখন দুগ্ধপোষ্য বালক কিনা, জানি না। ইহার মাত্র ৫ বৎসর পরে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের নবধর্ম্মকে নববিধান নামে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রমত্ত বিদেশী সুধীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মোক্ষমূলার ব্রাহ্মসমাজের এই নবধর্ম্ম আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"The religion of the Brahmo Somaj will be the future religion of India, perhaps of the whole world." নবযুগধর্ম্ম ও নবশিক্ষা সভ্যতার যখন প্রবল পরাক্রম, পূর্ণ যৌবন, তখন বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবনের আরম্ভই হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের নামে, নূতন শিক্ষা, সভ্যতা ও সেবা-ধর্ম্মের বিস্তারের নামে কত কৌশলে পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবনকে ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকে বঙ্গভারতে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু যেখানে কৌশল, যেখানে অতিরঞ্জন, সেখানে সত্য কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? শুদ্ধতা কোথায়? এরূপ চেষ্টায়, এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে, আবার ধর্ম্মের নামে ঘোর মোহমেঘ ও কুসংস্কাররূপ কুজ্ঝটিকা ধীরে ধীরে বঙ্গ ভারতের মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

—•—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ১২ই আগষ্ট, মধ্যাহ্নে, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর পুত্র ডাঃ শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর প্রথমা কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শিশু কন্যা "অনুপমা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অনুষ্ঠানটী কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীলের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১৬ই শ্রাবণ, কলিকাতায়, ১৩নং ফারডাইস্ লেনে, বাবল-নিবাসী স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর পৌত্র, স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন বসুর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নিরঞ্জন বসুর সহিত, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুরগ্রামনিবাসী স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পালের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী পারুলরাণীর শুভবিবাহ নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। ভগবান নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

উৎসব—গত ২৪শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত ময়ূরভঞ্জে বারিপদা নববিধানমণ্ডলীর সাম্বৎসরিক উৎসব জমাট-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পুরী হইতে ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক এবং কলিকাতা হইতে ভ্রাতা ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় বিশেষভাবে আহূত হইয়া উৎসবে ব্যবহৃত হন। ২৪শে স্বর্গীয় ভক্ত ভাই নন্দলালের সাম্বৎসরিক স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয় ও রাত্রে মন্দিরে উৎসবের আরতি হয়। ২৫শে পূর্ণচন্দ্রপুর পাঠশালায় উৎসব ও মন্দিরে সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন, ২৬শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব ও ২৭শে নগরসংকীর্ত্তন হয়। রাজপথে বক্তৃতা, রাজবাড়ীতে প্রার্থনা হয় এবং ২৮শে শান্তিবাচন হয়। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাইলে প্রকাশ করা যাইবে।

গত ৩১শে জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক আসিয়া উৎসব-কার্য্য সম্পাদন করেন। ৩১শে প্রাতে বিশেষ ভাবে পরলোক-তীর্থে সাধন হয়। এই দিনে নববিধানের নবপ্রহ্লাদপ্রতিম শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথের দিন স্মরণে শ্রীপ্রেমেন্দ্র-তীর্থ সাধন হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের উপাচার্য্য ফকিরদাস রায়ের আত্মার সমাগম সাধন হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-দেবালয়ে আরতি হয়। ১লা আগষ্ট প্রাতঃ সন্ধ্যা উৎসবের উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয় এবং অপরাহ্ণে শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথের স্মরণার্থ শিশুসম্মিলন হয়। শতাধিক শিশু সমবেত হইয়া সঙ্গীত করে। তাহার পর ছোট একটী প্রার্থনা করিয়া শ্রীপ্রেমেন্দ্রের ও শ্রীপ্রমোদের আদর্শ জীবনকাহিনী বলিয়া তাহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় একটী সুগায়ক সঙ্গীত করেন। ২রা প্রাতে উৎসবের শান্তিবাচন হয়। সেবিকা হেমন্তকুমারী পাঠাদি করেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন।

বিশেষ অনুষ্ঠান—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিয়াছেন:—

এবারকার ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে একদিন, অন্ততঃ ৬ই ভাদ্র, তিনটী ব্রাহ্মসমাজের মিলন-সাধন-বিষয়ে আলোচনাদি করা হয়, এই প্রস্তাব করিয়া কেহ কেহ পত্র লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নেতাদিগকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি। নববিধান-পরিবারস্থ যুবকগণও এই উপলক্ষে মিলিত ভাবে উৎসব-দিনে দীক্ষা-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলে ভাল হয়। পিতামাতা সকলে এ বিষয়ে উৎসাহী হন, এই প্রার্থনা।

উপাধি-দান—ময়ূরভঞ্জ নববিধানমণ্ডলীর উৎসবে বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা অতি দক্ষতার সহিত সংকীর্ত্তনে উপাসনা ও নগরসংকীর্ত্তনে নেতৃত্ব করিয়া সকলকে উন্মত্ত করেন। এ কারণ সেখানকার মণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁকে "নব উৎকল বাঁশরী" উপাধিতে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। মার আশীর্ব্বাদ ভ্রাতার মস্তকে বর্ষিত হউক।

স্থায়ী ফণ্ড—কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত স্বীকার

করিতেছি যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে স্থায়ী ফাণ্ডরূপে তাঁহার পুত্রগণ ৩॥০টাকার সুদের ১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। তাহার সুদ প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং স্বর্গগত আত্মা তৃপ্ত হউন।

ভ্রম-সংশোধন—১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬৩ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় কলম, ৩৩।৩৪ লাইনে "স্বর্গীয় সাধক ললিতমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক" স্থলে "স্বর্গীয় সাধক ললিতমোহন রায়ের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক" হইবে।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই জুলাই, ৩৪নং রামকমল সেন লেনে, কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে গগনবাবু প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩১শে জুলাই, ৭৬নং নিউথিয়েটার রোডে, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বানার্জ্জির গৃহে, তাঁহাদের একমাত্র প্রিয়তম পুত্র "প্রেমেন্দ্রের" পুণ্যস্মৃতিতে উপাসনাদি হইয়াছে। প্রেমেন্দ্রের প্রেমপূর্ণ মধুময় সুন্দর জীবন মণ্ডলীর সন্তানগণের জীবনে সঞ্চারিত হউক।

দান-প্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

এপ্রিল, ১৯৩৬—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মাতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, রায় সাহেব বলরাম সেন বিশেষ দান ৩৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মুখার্জ্জি মাসিক দান দুইমাসের ২৲, স্বর্গীয় মনোগতধন দের সহধর্ম্মিণী স্নেহের পুত্র "সুদাসের" পারলৌকিকে ২৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর আদ্যশ্রাদ্ধে পুত্রগণ ২৲ ও কন্যা শ্রীমতী ভক্তিমতী বিশ্বাস ৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন মাতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীমতী আশালতা পটুনায়েক মাতৃশ্রাদ্ধে ৪৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস পৌত্রের নামকরণে ৫৲, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু পাল পৌত্রের নামকরণে ১৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত মাতৃসাম্বৎসরিকে ৩৲টাকা।

মে, ১৯৩৬—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানী মাসিকদান ২৫৲, স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের সাম্বৎসরিকে ভ্রাতৃগণ ৫৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (আই,এম,এস,) মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন জ্যেষ্ঠপুত্রের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী নলিনী বড়ুয়া মাতৃশ্রাদ্ধে ৫৲, স্বর্গীয় প্রিয়ব্রত সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধে সহধর্ম্মিণী ১০৲, স্বর্গীয় কালীভৈরব রায়ের সহধর্ম্মিণী কনিষ্ঠ পুত্রের শুভবিবাহে ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মেজো ভ্রাতার সাম্বৎসরিকে ১০৲ এবং প্রপিতামহ স্বর্গীয় সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির পারলৌকিকে ২০৲, নববিধান ট্রষ্ট হইতে স্বর্গীয় প্রশান্তকুমার খাস্তগীরের সাম্বৎসরিক স্মৃতিতে ৫৲, শ্রীমতী সরলা ভড় ঠাকুরমার পুণ্যস্মৃতিতে ২৲, স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সাম্বৎসরিকে পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ২৲ ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲ এবং কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দাস ২৲, শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲ এবং স্বর্গীয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পুণ্যস্মৃতিতে ২৲, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ কর শিশুপুত্রের নামকরণে ১৲, স্বর্গীয় রামলাল ভড়ের সাম্বৎসরিকে পুত্রগণ ৪৲, শ্রীযুক্ত অশোক সেন পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে ভ্রাতা ডাক্তার বিমানবিহারী দের নবগৃহে প্রবেশোপলক্ষে ২৲ টাকা।

—০—

নূতন পুস্তক।

বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন, ২য় খণ্ড।

নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ধর্ম্মতত্ত্ব নামক পাক্ষিক পত্রিকায় বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথনচ্ছলে নানাবিষয়ে দর্শনবিজ্ঞানসম্মত যে সকল সুগভীর তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা করিয়াছেন, প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত অংশের পরবর্ত্তী ১৮২৪ শকের ১লা মাঘ হইতে ১৮২৭ শকের ১৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত বিষয়গুলি সংগৃহীত হইয়া এবার দ্বিতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইল। ডিমাই ৮পেজি ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বা প্রচারকার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দ
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এখন আর সব খণ্ড পাওয়া যায় না। এই বইখানিতে কেবল মাত্র সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই বইখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে ও আমাদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ অপরাধ হইবে। সেজন্য এই পুস্তক খানির নূতন সংস্করণ একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গলাতে এবং সন শকাব্দে আছে। সেই সকলের ইংরাজি সন তারিখ ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার সূচী একটু বিশদভাবে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাও আছে। সেজন্য কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ছাপাইতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। সকলের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সমাধা করা সুকঠিন। সেই জন্য সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যাহাতে আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে, তাঁর স্মৃতি (যা খুব accurately historical) এই উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা জীবনখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। টাকা কড়ি আমার নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণকল্পে অন্যূন ৩০০০৲ টাকার প্রয়োজন। অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পিঠাপুর রাজকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রাও সাহেব ডাঃ ভি, রামকৃষ্ণ রাও এতদর্থে ১০০৲ টাকা অর্থসাহায্য দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারীও এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সাহায্য ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি ও বিশ্বাস করি, মণ্ডলীর সকলে এতৎসম্বন্ধে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনুভব করিয়া অর্থসাহায্য দান করিতে প্রস্তুত হইলে অনায়াসেই এই পুস্তক-খানির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইবে।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা ;
এলাহাবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী নিম্নলিখিত প্রণালী-মতে সপ্তষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; এবং সপরিবারে ও সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৩; ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৬; শনিবার—ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; প্রাতে ৮টায় কমলকুটীরস্থ "নবদেবালয়ে" (৭৮বি, অপার সার্কুলার রোডে) উপাসনা।

৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট, সোমবার—শ্রীমৎ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৮টায় কমলকুটীরস্থ "নবদেবালয়ে" উপাসনা।

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; প্রাতে ৮টায় কমলকুটীরস্থ "নবদেবালয়ে" উপাসনা, এবং সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের প্রার্থনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি।

৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট, শুক্রবার—ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; প্রাতে ৮টায় "কমলকুটীরস্থ" নবদেবালয়ে উপাসনা এবং সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

৬ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার—রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক; সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা।

৭ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তা-হিক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে **সমস্তদিনব্যাপী উৎসব**; প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন, ৮॥টায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৩টায় উপাসনা, তৎপর পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা এবং ৬টায় কীর্ত্তন; সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

১১ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; প্রাতে ৮টায় কমলকুটীরস্থ "নবদেবালয়ে" উপাসনা।

দ্রষ্টব্য:—উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অঞ্জলিরূপে যিনি যাহা দিবেন, তাহা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধের নামে, অথবা ১০৫সি পার্ক ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

৭ই ভাদ্র দুইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
৭ই আগষ্ট, ১৯৩৬। } শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 1st. September, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে কাঙ্গালের ঠাকুর! গরিবের সহায়! অত বড় বিশ্বের দেবতা হয়ে কাঙ্গাল গরিব, দীন দুঃখীদিগের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে কেন? ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় ধর্ম্মরথী যাঁহারা, তাঁহাদের লইয়া তোমার কারবার শোভা পায়; কিন্তু পথের ভিখারী, কাঙ্গাল গরিব, এমন কি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, ঘৃণ্য অস্পৃশ্য যাহারা, তাহাদের লইয়া তোমার কারবার তো শোভা পায় না। যখন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, ঘৃণ্য অস্পৃশ্যদিগকে লইয়া তোমার কারবার দেখি, তখন তোমার এ ব্যবহারের রহস্য আমাদের বুদ্ধি মনের অগোচর হইয়া পড়ে, ভাবিয়া ইহার রহস্যভেদ করিতে পারি না। যাহাদের জন্য কেহ ভাবে না, তাহাদের জন্য তুমি ভাব, যাহাদের মুখপানে কেহ তাকায় না, তাহাদের প্রতি দয়াতে উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগকে তুমি কোলে তুলিয়া লও, ইহাতে তোমার অপার করুণাই প্রকাশ পায়। তুমি যেমন অনন্ত বলধারী, তেমনই তুমি অসীম করুণারও আধার। গরিব, কাঙ্গাল, পতিতের প্রতি তোমার প্রেমের ব্যবহার, তোমার অসীম করুণারই সাক্ষ্য দান করে। তাই বুঝি, এবার তোমার এই অসীম করুণা-প্রকাশক নবযুগের নবধর্ম্মের মূলমন্ত্র, আশার শাস্ত্র "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্"। দয়ার ঠাকুর! এবার এই নবধর্ম্মের গোড়ার মন্ত্র "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলমের" তত্ত্ব তুমি নিজ মুখে ব্যাখ্যা কর, ব্যক্ত কর। পৃথিবীর সমস্ত সাধুভক্তদিগকে আমাদের ধর্ম্মপথে সঙ্গী, সাথী, সহায় ও আদর্শ করিলে, ইহা তোমার কত কৃপার সাক্ষ্যদান; পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে আমাদের অবলম্বনের বিষয় করিলে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র করিলে, ইহা তোমার কৃপার কত সাক্ষ্যদান; তুমি অনন্ত দেব, আমাদের মত নগণ্য অনধিকারীদের সাক্ষাৎ উপাস্য হইলে, ইহা অপেক্ষা তোমার কৃপার সাক্ষ্যদান আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়, তথাপি তোমার একমাত্র কৃপার উপর বিপদ পরীক্ষার অবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না! তুমি এ সময় কৃপার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, কৃপায় সিদ্ধি দান করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর, কাতরপ্রাণে তব চরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ভাদ্রোৎসবের নবজাগরণ।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা পারিবারিক ধর্ম্মজীবন সমধিক জটিলতাপূর্ণ ও পরীক্ষাময়; কিন্তু সমধিক শিক্ষাপ্রদ, শক্তিপ্রদ, সৌভাগ্যপ্রদ, আনন্দপ্রদ এবং গৌরবমণ্ডিত। পারিবারিক ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা, সামাজিক বা মণ্ডলীগত ধর্ম্মজীবন ততোধিক জটিলতাপূর্ণ এবং পরীক্ষাসঙ্কুল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ, শক্তিপ্রদ, সৌভাগ্যপ্রদ, আনন্দপ্রদ এবং সর্ব্বোপরি গৌরব-মণ্ডিত! ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টিতেই পরিবার, পরিবারের সমষ্টিতেই সমাজ। ধর্ম্মপথে ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়াই ইতিপূর্ব্বে পারিবারিক ধর্ম্মজীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে; এবং একথা বলা বাহুল্য যে, এইরূপ কতকগুলি পারিবারিক ধর্ম্মজীবনের সমষ্টিতে মণ্ডলী বা সমাজ গঠিত, পরিপুষ্ট ও রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু নবযুগে, নববিধানে ইহা কি স্বীকার করিব না যে, সামাজিক বা মণ্ডলীগত জীবনের সহায়তায় আমাদের ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছে, পরিপুষ্ট হইয়াছে ও ক্রমোন্নতির পথ চলিয়াছে, এবং ক্রমে সেই সূত্র হইতেই ধর্ম্মপরিবারের পত্তন হইয়াছে, পারিবারিক জীবন গঠিত, পরিপুস্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে? নববিধানে তবে মণ্ডলীগত জীবন, মিলিত ধর্ম্মজীবন ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন-গঠনের বিশেষ সহায় ও অপরিহার্য্য আয়োজন এবং এই মণ্ডলীগত জীবন হইতেই পারিবারিক জীবনের পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতি। আপাততঃ শুনিতে বিসদৃশ বোধ হইলেও এই ধারাতেই এখন কার্য্য চলিতেছে।

ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসব বিশেষ ভাবে মণ্ডলীগত ধর্ম্মজীবনের বা সামাজিক ধর্ম্মজীবনের উৎসব। ভাদ্রোৎসব আবার বিশেষ ভাবে সাধনের উৎসব। এ উৎসবে বাহিরের আড়ম্বর তত নাই, বাহিরের লোক-সমাগমও অল্প। এ উৎসবে বিশেষ দৃষ্টি অল্প স্থানে, আত্মার উন্নতি ও আত্মিক জীবনের উন্নতি ও আত্মিক জীবনের প্রসঙ্গের দিকে। উপাসনার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই উৎসব, উপাসনাকে বিশেষ ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া এ উৎসব, পার্থিব ব্যাপার ভুলিয়া স্বর্গ ও স্বর্গীয় ব্যাপার লইয়া এই উৎসব। তাই উৎসবদায়িনী পরমজননী এ উৎসবের উদ্বোধনে আয়োজনরূপে, উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানরূপে কয়েকটী পারলৌকিক অনুষ্ঠান আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পারলৌকিক অনুষ্ঠান-গুলি যোগে আমরা পরলোকস্থ নির্দ্দিষ্ট দুই একটি আত্মার সঙ্গে নয়, কিন্তু দুই একটি আত্মার সঙ্গে মিলনের উপলক্ষে আমরা অদৃশ্য দেবমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হই। দুই একটি আত্মার সঙ্গে মিলিত হইতে যাইয়া আমাদের আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও ধর্ম্ম-জীবন-পথের সঙ্গী সহায় এ যুগে যিনি ও যাঁহারা, তাঁহার ও তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হই। এইরূপে অদৃশ্য মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইতে যাইয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, যদিও আমাদের দৃশ্য জগতের মণ্ডলী বহু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন, সংখ্যায় অল্প, আশা উৎসাহে খর্ব্ব, কিন্তু আমাদের যথার্থ মণ্ডলী ইহলোক, পরলোক লইয়া যে অখণ্ড মণ্ডলী, তাহা বিরাট, বিপুল, তাহার শক্তি অসাধারণ এবং সে মণ্ডলী আশা উৎসাহে পূর্ণ, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। এই মণ্ডলী আমাদের বাসগৃহ, এই মণ্ডলী আমাদের মাতৃ-ক্রোড়, এই মণ্ডলী হইতে আমাদের কত পরিপোষণ, কত পরিপুষ্টি, কত শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনের কত প্রকাশ ও প্রসারণ।

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে আমরা আমাদের দৃশ্য মণ্ডলীর সঙ্গে অদৃশ্য মণ্ডলীর ঘনিষ্ঠ যোগ দর্শন করি, সাধন করি, এবং দৃশ্যাদৃশ্য লইয়া অখণ্ড মণ্ডলীর জ্ঞান লাভ করি। দৃশ্য মণ্ডলীকে অনেক সময়ই বিচ্ছিন্ন ভাবে দর্শন করি, সে মণ্ডলীর সকলকে সকল সময় আপনার অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলিয়াও নিকটে পাই না; কিন্তু দেখি, অদৃশ্য মণ্ডলীর সকলেই আমার অতি নিকটে, প্রাণের মধ্যে আপনার হইতে আপনার হইয়া, সহায় হইয়া, ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। অন্তরে স্বয়ং পবিত্রাত্মা স্বর্গলোকের সকলকে, অদৃশ্য লোকের সকলকে দৃশ্যমান করিয়া, অন্তরের বিশেষ উপলব্ধির বিষয় করিয়া প্রকাশিত করেন। এ সময় আমরা নবযুগের প্রেরিত-দিগের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিশেষ স্থান বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ করি, তাঁহার সম্পর্কে নবজাগরণ লাভ হয়। এ সময় ধর্ম্মপিতামহ রামমোহনের স্থান, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের স্থানও আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাঁহাদের সম্পর্কে নব জাগরণ উপস্থিত হয়। এ সময়ে ব্রহ্মানন্দের সহপ্রেরিতদিগের জীবনের মূল্য, জীবনের বিশেষত্বও আমাদের নিকট প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; তাঁহাদের সম্পর্কেও নব জাগরণ লাভ করি। এ সময়ে

বিদেশী সাধু মহা সেবক জেনারেল বুথের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের জ্ঞান নবভাবে লাভ করিয়া, আমাদের মণ্ডলীতে শ্রীঈশার স্থান বিশেষভাবে স্বীকার করি। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ দিকও আমাদের নিকট প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

ভাদ্রোৎসব উপাসনা-প্রতিষ্ঠার উৎসব, নবযুগধর্ম্ম-সাধনের নব উপাসনা-প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসব। রাজর্ষি রামমোহনের জীবনে যে উপাসনা আরম্ভ হয়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে সেই উপাসনার সর্ব্বোচ্চ সাধনা ও সিদ্ধি দর্শন করিয়া এবং অন্যান্য প্রেরিতদিগের জীবনে এই উপাসনার আশ্চর্য্য ফল দর্শন করিয়া, আমাদের মন আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনে এই উপাসনার সাধন ও সিদ্ধি নিতান্ত সামান্যই হইয়াছে; কিন্তু যখন দেখি, আমাদের ধর্ম্মজীবন যতই কেন নিম্নস্তরে স্থিতি করুক না, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধর্ম্মধারা যতই কেন ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হউক না, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের উত্তাল তরঙ্গময় মহা ধর্ম্মধারা সকলের সঙ্গে একই পথে, একই লক্ষ্যে, একই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতেছে, তখন আমাদের প্রাণের আশা এবং আনন্দের আর অবধি থাকে না। দুই দিন আগে হউক, পরে হউক, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনলব্ধ ও তাঁহার সহপ্রেরিতদিগের জীবনলব্ধ এই নব প্রতিষ্ঠিত উপাসনা-সাধনের ফল আমরা পাইবই পাইব। আমাদের ধর্ম্মজীবনের আশা, ভরসা, বিশ্বাস ও আনন্দ আমাদের জীবনলব্ধ ফলের উপর সুধু নহে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মাগ্রজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহপ্রেরিতদিগের জীবনলব্ধ, উপাসনালব্ধ, উচ্চ ফলের উপরে সংস্থাপিত; কেন না সেই উচ্চ ধর্ম্ম-সম্পদ একদিন আমাদের লাভ হইবেই হইবে। সেই উচ্চধনে আমরা একদিন ধনী হইবই হইব। স্নেহময় বিশ্বপিতা, স্নেহময়ী বিশ্বজননী আমাদের মত বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের জন্যই সেই জীবনাদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

উৎসবের প্রসাদ।

কোন তীর্থে যাঁহারা যান, তীর্থ হইতে তাঁহারা দেবতার প্রসাদ লইয়া পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে বিতরণ করেন। উৎসব আমাদের মহাতীর্থ। আমরা এবার এই তীর্থ হইতে কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া ঘরে আসিলাম কি না? যাঁহারা তীর্থে যান নাই, তাঁহারা জানিতে চান, আমরা কে কি প্রসাদ লইয়া ঘরে ফিরিলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, আমাদের পরিজন এবং প্রতিবেশীদিগকে দেবার উপযুক্ত কিছু প্রসাদ উৎসব-তীর্থ হইতে আনিতে পারিলাম কি না। অনন্ত ব্রহ্মের নিকট হইতে যে নূতন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বাবয়বপূর্ণ সাধন ও সরল সহজ উপাসনা আমরা পাইয়াছি, এতদিন সে সম্বন্ধে যাহা অপরাধ করিয়াছি, তাহা যদি আর না করি এবং বিধানপ্রবর্ত্তককে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিয়া আমরা যদি তাঁহার সহযোগে সপরিবারে এবং সদলে পূর্ণ উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে প্রতিদিন করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলেই আমাদের প্রচুর প্রসাদ লাভ হইবে।

চোরের উপদ্রব হইতে রক্ষার উপায়।

মানুষ সজাগ থাকিলে আর বাড়ীতে চোর ঢুকিতে পারে না। যখন লোকে ঘুমায়, তখনই চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া, যাহা কিছু সঞ্চিত ধন থাকে, তাহা চুরি করিয়া লইয়া যায়। বাস্তবিক যখন আমরা সজাগ না থাকিয়া মোহনিদ্রায় ঘুমাইয়া থাকি, তখনই আমাদের অন্তঃপুরে কাম ক্রোধাদি রিপু প্রবেশ করিয়া, আমাদের যাহা কিছু ধর্ম্মধন সঞ্চিত থাকে, তাহা অনায়াসে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বাড়ীকে সজাগ করিয়া রাখিবার জন্য যদি কোন চৌকিদার থাকে, তাহা হইলে আর চোর প্রবেশ করিতে পারে না; তদ্রূপ যাঁহাদের অন্তরে বিবেকরূপ চৌকিদার চির জাগ্রত থাকে, তাঁহাদের বাড়ীতে কখনই চুরি হয় না। যদি তুমন্ চোরের হাত এড়াইতে চাও, বিবেক চৌকিদার রাখ।

নববিধানের উপাসনা কি?

শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব বলিলেন, "কোনও উপাসনা আমরা করি, কোনও উপাসনা ঈশ্বর আমাদিগকে করান।" উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের কাছে উপবেশন করা, বসা। যাঁহাকে দেখা যায় না, তাঁহার কাছে কেমন করে বসা যায়? যদিও আমরা ঈশ্বরকে বাহিরের চক্ষে দেখিতে পাই না, কিন্তু বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের কাছে আছেন বা বসিয়া আছেন। এই যে তিনি আমাদের কাছে বসিয়া আছেন, এইটী বিশ্বাস করিলেই

আমরাও তাঁহার কাছে বসিতে পারি। যিনি আমার কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহার কাছে আমিও ত বসিয়া আছি। যাহাতে আমরা এই বিশ্বাসটি জাগাইয়া রাখিতে পারি, তাহার চেষ্টা করারই নাম উপাসনা করা। আমরা এই উপাসনা করিতে চাহিলে, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে উপাসনা করান। বাস্তবিক নববিধানে উপাসনা অতি সহজ হইয়াছে, যখন আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি; যেমন শিশু কাঁদিলেই মা আপনি তাঁহাকে কোলে বসাইয়া স্তন্য পান করান, তেমনি মা আমাদিগকে নিজে স্নেহগুণে, আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিলে, তাঁহার স্বরূপস্তন্য পান করাইয়া আমাদিগের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করান। রোগা শিশুকে মা ঔষধ দিয়া, স্তন্য দিয়া, খাওইয়া দোয়াইয়া, পরিষ্কার করিয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া, নানা প্রকারে পরিপুষ্টি দান করেন; এবং মানুষ করেন তেমনি পরম জননী স্বয়ং আমাদিগকে তাঁহার মনের মত মানুষ করিবার জন্য, তাঁহার কাছে বসাইয়া নিত্য তাঁহার উপাসনা করান। ইহা যত পরিমাণে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, ততই আমরা জীবনে উন্নতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিব। ছোট ছেলে যেমন দিন দিন তিল তিল সুপুষ্ট হয়, যথার্থ উপাসনা করিলে আমরাও নিত্য নিত্য নব নব জীবন লাভ করিতে পারিব। ঐভাবে নিত্য নিত্য নব নব জীবন-লাভই নববিধানের উপাসনা। উপাসনা যে আপনি করে, অহংকারে সে যায় মরে; উপাসনা মা করায় যারে, সেই কেবল যায় তরে।

—•—

প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের উক্তি।

(Heart-Beats হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

ভগবান্ কোথায় ?

যে স্থান এবং যাহা কিছু তোমার অত্যন্ত নিকটে, তাহারই মধ্যে ভগবানের উজ্জ্বলতম প্রকাশ দর্শন করিতে চেষ্টা কর।

আকাঙ্ক্ষা—

.........জীবনে যে উচ্চ অবস্থা লাভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার জন্যও প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ করিও না; কিন্তু সাবধান, যেন তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থবুদ্ধি না থাকে।......

আমাদের আচার্য্য—

যীশু স্বার্থবিসর্জ্জনের আদর্শ, সেন্টপল হৃদয়-পরিবর্ত্তন বা নবজীবনের আদর্শ, শাক্যমুনি আত্মজয়ের আদর্শ, চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তির আদর্শ। এই সমুদয় উপাদানের মিলনে যে স্বর্গীয় মনুষ্যত্ব গঠিত হইয়াছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেশব প্রচুর পরিমাণে সেই স্বর্গীয় মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন।

মিলিত হও—

সকলের সঙ্গে মিলিত হও। যেখানেই সম্ভব হইবে, যতদূর সম্ভব হইবে এবং যখনই সম্ভব হইবে—লোকের সঙ্গে মিলিত হও, সকলকেই ভালবাস, সকলকেই শ্রদ্ধা কর, সকলকেই সাহায্য কর। তোমার বিবেক যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভগবানের পুত্রকন্যাগণকে ভালবাসিয়াছ। তাহাদের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, তোমার প্রতি তাহাদের মনের ভাব যেরূপই হোক না কেন, সে কথা ধরিবে না। সকল প্রকার বিশ্বাসকে সম্মান করিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান করিবে। মানবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরকে এবং সাধুতাকে পূজা করিবে।

লাঞ্ছিত নিরপরাধ ব্যক্তি—

নিরপরাধ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হইয়া ভগবানের সন্তানত্ব লাভ করেন। যীশুর শোণিত তাঁহার অন্তরের অবশিষ্ট প্রচ্ছন্ন পাপকে ধৌত করে এবং তাঁহার অন্তরে স্বর্গীয় বল সঞ্চার করে। যিনি লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, তিনিই যীশুর লাঞ্ছনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ এবং লাঞ্ছনার সুগভীর রহস্য বুঝিবার অধিকারী। যিনি নিজের ইচ্ছাকে অন্তর হইতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল তিনিই ব্রহ্মসন্তানের শক্তি দ্বারা পূর্ণ হইবেন।

বিশ্বাস ও বিজ্ঞান—

বিশ্বাস কি চিরদিনই বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া উপেক্ষা করিবে এবং বিজ্ঞান কি চিরদিনই বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিয়া তুচ্ছ করিবে? লোকে বিশ্বাসের বলে রোগমুক্ত হয়, শক্তি লাভ করে, নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করে, লোকের উৎপীড়ন অতিক্রম করে, এবং সত্যের জন্য লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াও সত্যেরই জয় প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম্মবিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেহ আলোচনা করেন না এবং বিজ্ঞানকেও বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বলিয়া স্বীকার করেন না। সত্য ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব কি কেহই আমাদের নিকট প্রকাশ করিবেন না?

কেশবচন্দ্র—

হে আমার ভক্তিভাজন আচার্য্য, আমি জানি যে, তুমি স্বর্গে সাধুমণ্ডলীকে লইয়া ঈশ্বরের পূজা ও উপাসনা করিতেছ। তোমার আরাধনা কখনও ফুরাইবার নহে। যখন তুমি দেহে অবস্থিতি করিতেছিলে, তখন তোমার উপাসনার স্থলে আমি ধীর-ভাবে ও বিনীত অন্তরে গিয়া যোগ দিতাম, সেইরূপে আবার তোমার উপাসনায় যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। আমি বড় শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ভগবানের নাম ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি পাই না। কিন্তু আর কেহই তোমার মত ভগবানের নাম করিতে জানে না। তাঁহার নাম করিতে কেবল তুমিই জানিতে। তোমার মুখে সেই নাম আবার কবে শুনিব?

আমি বিশ্বাস করি যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত ব্যক্তি

ছিলেন। তাঁহার দোষ ত্রুটি অপূর্ণতার দিক আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার দেবত্বই আমাকে অসীম আনন্দ ও অসীম সাহায্য দান করে। পরমাত্মা স্বয়ং আমার জীবনের আদর্শ। যীশুর দৃষ্টান্ত সেই আদর্শকে আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছে। অন্যান্য সাধু ভক্তগণকেও আমি যীশুর মধ্যে দর্শন করি। কেশব আমার আচার্য্য। মানুষ কিরূপে যীশুর মত হইতে পারে, তাহা কেশবই আমাকে দেখাইয়াছেন। আমি যীশুকে যতই কেন ভক্তি করি না কেন, কেশবের জীবন না দেখিলে আমি কিছুতেই যীশুর মত হইতে পারিতাম না। তথাপি কেশবও পূর্ণভাবে সে পথ দেখাইতে পারেন নাই। তিনি যে পথ দেখাইয়াছিলেন, অন্তর্য্যামী ভগবান্ সেই পথ আরও সুস্পষ্টরূপে আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। যীশু ভিন্ন আমার চলে না, কেশব ভিন্নও আমার চলে না। কিন্তু ভগবানের নিকট হইতেই আমি উভয়কেই লাভ করিয়াছি। সর্ব্বময় তিনি, সকলই তিনি, তিনি আমার সর্ব্বস্ব। জয় জয়, তাঁহারই জয়!

—০—

ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্রের স্মৃতিসূচক।

("ভৃত্যের আত্মপরিচয়" নামে কান্তিচন্দ্রের আত্মজীবনী হইতে সঙ্কলিত)

যখন সত্য সত্যই বিধান আসিলেন, তখন এ বিধানে পাপীর পরিত্রাণ হইয়াছে, এমন জীবন দেখাইতে হইবে। আমি অন্যের কথা বলিব না, কেবল নিজ জীবনে যাহা পাইয়াছি, যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহাই সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। বিধানপ্রবর্ত্তক আচার্য্যদেব স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে এবং তাঁহারই সাহায্যে অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। আমার ন্যায় নিকৃষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব জীবনকাহিনী আপনারা শুনিলেন; এমন জীবন কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল? এক সেই দেবসহবাসই ইহার মূল কারণ। সাধন-ভজনহীন আমি, জানিতাম না ভগবানকে, বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করিতাম না ঈশ্বরকে; সংসারের মলিন স্থানে বাস করিয়া যে জীবন নষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে আঁস্তাকুড় হইতে তুলিয়া আনিয়া কি করিয়া যে এখানে বসাইলেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। এক এক বার যখন পূর্ব্ব জীবনকাহিনী স্মৃতিতে আসে, তখন কেবল নীরবে বসিয়া কাঁদিয়া বলি, প্রভু, একি তোমার অদ্ভুত লীলা! "পাপী জনে কেন এত দয়া হয়।" "আমি ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, আনিলে উদ্ধার করে কেশেতে ধরে, দিলে পিতা বলে করিতে সম্বোধন।" এই সব সঙ্গীতই বার বার মনে উদয় হয়।

বাস্তবিকই এখন আমি সে আমি নই, এখন পাপ-স্মরণে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পাছে বা পতিত হই, পাছে বা সেই ধনে বঞ্চিত হই, সেই ভয়ে আকুল হইয়া পড়ি। বন্ধুগণ, মাতৃগণ, আমার এই পরিবর্ত্তনের মূল কোথায় এবং কে? বিধাতা তাঁহার মানবসন্তানগণকে পরিত্রাণ প্রদান করেন; কিন্তু তাঁহার এই পরিত্রাণের ব্যবস্থা শত প্রকার, কাহাকে কোন সময় কি করিয়া ধরেন, সে রহস্য তিনি ভিন্ন আর কেহই জানে না। অন্যের কথা থাক, আমাকে তিনি যে উপায়ে পরিত্রাণের পথে আনিয়াছেন, আমি তাই বলি। আগেই বলেছি, আমার যখন সব গেল, আমি যখন পথের ভিখারী হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতেছিলাম, তখন এমন এক জনের আশ্রয় পাইলাম, যেখানে আসিয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল, সকল অভাব পূর্ণ হইল, যাঁহার পবিত্র স্পর্শে আমি নবজীবন, নব আলোক প্রাপ্ত হইলাম। স্ত্রীপুত্রহীন, দুঃখী কাঙ্গাল যে, সে একটী উচ্চ পরিবারের একজন হইয়া গেল। সেই প্রেরিত মহাপুরুষ আমার প্রতি কেন কৃপাদৃষ্টি করিলেন, এ প্রশ্ন আমি কাহাকে করিব? কেই বা ইহার প্রকৃত উত্তর দিবেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর সেই পরম দয়ালু পরমপিতার বিশেষ করুণা লুক্কায়িত ছিল। আমি একজনকে পেয়ে, পিতা মাতা ভাই বন্ধুর অভাব ভুলিয়া গেলাম। কি সুমিষ্ট ব্যবহার, কি মধুর কথা, কি প্রেমের দৃষ্টি, কি পুণ্যময় সহবাস! সত্যই আমার জীবনে ইহার পূর্ব্বে এরূপ আনন্দ সুখ আমি আর কখনও পাই নাই। আমার প্রাণ গ'লে গেল, মন ভুলে গেল, ইচ্ছা হইল, এ সহবাস হইতে আর আমি কোথাও যাইব না। সত্যই বিধাতা আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ভক্তসহবাসে থাকিয়া আমি যে শুনিয়াছি, প্রেরিত মহাজনেরা আসেন, সিদ্ধিলাভের পথ দেখাইতে। তাঁহারা যেরূপ কঠোর তপস্যা ও সাধন দ্বারায় সিদ্ধ হন, আমার মত লোকেরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেই তপস্যা ও সাধন সহজে করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধির ফল যে আমি বিনা সাধনে ও বিনা তপস্যায় প্রাপ্ত হইব, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বিধাতার নিয়ম সব সময়ে সব দেশে চির অখণ্ড। পরিত্রাণার্থী ব্যক্তি ভগবানের বিশেষ কৃপায় সাধুসহবাসে পরিত্রাণের বিশেষ পন্থা অবগত হইল বটে, কিন্তু প্রতিজন পরিত্রাণার্থীকে, প্রেরিত মহাজনেরা যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছেন, সেই সেই উপায় অবলম্বন দ্বারায় সাধন ও তপস্যার কঠোর ব্রত পালন করিতে হইবে। সত্য বটে সম্প্রদায় বিশেষ বিশ্বাস করেন, সম্প্রদায়ের যিনি প্রবর্ত্তক, তিনি যখন কষ্ট দুঃখ ক্রুশভার বহন করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে মানিলে কিংবা বিশ্বাস করিলেই অনায়াসে প্রবর্ত্তকের উপার্জ্জিত পুণ্যধনের অধিকারী হইতে পারা যায়। তাঁহাদিগকে আর পাপ-পরিত্যাগের জন্য

স্বতন্ত্র কষ্ট করিতে হইবে না বা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে না। নববিধান কিন্তু এ মত বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরের সহিত প্রতি ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রতিজনকেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজকৃত কার্য্যের জবাব দিতে হইবে। নববিধানের এই বিশেষ মত ও শিক্ষা। আচার্য্যদেবের জীবনবেদ গ্রন্থে এ সমস্ত সত্য বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বিনা সাধনে পাপ যায় না, অনুতাপ ভিন্ন অন্তরের ময়লা ধৌত হয় না, এই উপদেশ।

আরও কত শত উচ্চ নীতি ও আদর্শ বিধানে প্রকাশিত হইয়াছে; সে সমস্ত উচ্চ নীতি ও আদর্শের সহিত যখন আমার জীবনকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, তখন দেখি, সেকালের জগাই অপেক্ষা এ কালের আমি শতগুণে নিন্দনীয় অবস্থায় অবস্থিত। জগাই একবার হরিনাম শুনিলেন, একবার শ্রীচৈতন্যের আলিঙ্গন পাইলেন, আর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভক্তের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমাভিক্ষা চাহিলেন। তিনি রাস্তার ধূলার সঙ্গে এক হইয়া কি বিনীতভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন! ভাই জগাই, দয়া করিয়া তোমার এই অধম দাসকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি পাপী হইয়াও যে ভক্তের কত আলিঙ্গন-স্পর্শ লাভ করিলাম, আমি যে কতবার শ্রীহরির পবিত্র নাম রসনায় উচ্চারণ করিলাম, তবু কেন আমি তোমার ন্যায় অনুতপ্ত হইয়া ভক্তের এবং মণ্ডলীর ও বাহিরের সকল বন্ধু বান্ধবের পদধূলি লইয়া ক্ষমা চাহিতে পারিলাম না। সত্যই আমি দেখিতেছি, আমি কত নরাধম পাতকী। আমি ভগবান্ দ্বারায় ভক্তের নিকট আনীত হইলাম, ভক্তবৃন্দের কত অনুগ্রহ ভালবাসা লাভ করিলাম; যা হ'বার নয় তা হ'ল, যা দেখবার নয় তা দেখলাম, যা শুনবার নয় তা শুনলাম। হায়! তবু কেন আমার মন মজিল না? কেন পাষাণ হৃদয় গল্‌ল না? আমি পেয়ে নিধি হারালাম! এ দুঃখ আর কত দিন সহ্য করিব?

দুঃখের কথা অনেক বলিলাম, যা হওয়া আমার উচিত ছিল, তাহা হইতে পারি নাই বলিয়া মনে আক্ষেপও অনেক; কিন্তু আশার কথাও বলি। দয়াল প্রভু নিজ কৌশলে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের এই নব ভক্তকে দিয়াই আমার উদ্ধারের পথ করিতেছেন। এখন আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও নবভক্তের বিশেষ অনুগ্রহে ঈশ্বরকে অল্পে অল্পে জানিতেছি, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা ধ্যান ধারণায় আমার মতি গতি ফিরিয়াছে, প্রাণ ভরিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না। পাপ স্মরণ হইবা মাত্র মার দোহাই দিয়া বলি, "দূর হ সয়তান," অমান সয়তান আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। এখন দয়া ক্ষমা সহিষ্ণুতা লাভের জন্য, অন্যের সেবার জন্য প্রাণ সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল। এখন ইচ্ছা হয়েছে, ভক্ত যেমন একতন্ত্রী হস্তে লইয়া মা মা বলিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেন, আমিও সেইরূপ করি। অন্য কথা বলিতে কিংবা শুনিতে আর প্রাণ চায় না।

বন্ধুগণ, এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিয়াও প্রাণের গভীর বেদনা এই যে, আমি ভক্ত কর্ত্তৃক এবং ভক্তবৎসল কর্ত্তৃক যেরূপ সৌভাগ্যবান্ হয়েছি, আমি আজও ভক্তকে ও ভক্তবৎসলকে কিন্তু সেরূপ করিয়া ভালবাসিতে শিখিলাম না। আমার চঞ্চল মন এখনও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভুলে থাকে, তাঁহাদের পুণ্যময় সহবাস হ'তে দূরে থাকে। হায়! আমি এ দুর্গতি হইতে কবে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পাইব? আপনারা আমার ভক্ত বিশ্বাসী বন্ধু ও আত্মীয়, পরিত্রাণ-পথের সহায়। দয়া করিয়া আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি যেন যতদিন দেহে থাকি, তত দিন ভক্ত ও ভক্তবৎসলের পবিত্র সঙ্গ হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত না হই; এবং সেই জীবনের শেষ দিনে, যখন বাহিরের ইন্দ্রিয় সব বিকল হইয়া যাইবে, বাক্যোচ্চারণের আর শক্তি থাকিবেনা, এই দেহ পর্য্যন্ত বিলয় হইয়া যাইবে, সেই সময়ে সেই অমরধামে অমর আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তবৎসল ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের পদাশ্রয় লাভ করিতে পারি। বিনীতভাবে সকলের চরণে বার বার প্রণাম করি।

হে নিত্য লীলারসময় শ্রীহরি, নরাধম মহাপাপীকে সত্যই আঁস্তাকুড় হইতে তুলিয়া আনিয়া বিধানের কত অভিনয় দেখাইলে, ভক্তসঙ্গে মিলাইয়া কি অপূর্ব্ব লীলা সকল করিলে! ঠাকুর, তোমার দিক হইতে যা হবার তা তো হয়েছে, এখন আমার শেষ রক্ষা যাহাতে হয়, তাহার কি করিতেছ, আমার মন তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল। যাঁহাকে এবং যাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আমাকে দিয়া সৌভাগ্যবান্ করেছ, আমি কি অনন্ত জীবনে সেই সৌভাগ্য ভোগ করিয়া, তোমার পুণ্যময় সহবাসে নিত্যকাল উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব? এত দিয়েছ, তবু যে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; আমার পাপসম্ভাবনা যে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়ে নাই। হে মাতঃ অভয়া, তোমার পবিত্র শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তোমাকে বার বার ডাকিতেছি, আমার সকল ভয় দুঃখ নিবারণ কর, ঐ অভয় চরণ আমার বক্ষে স্থাপন কর। আমি জেনেছি, ঐ চরণেই আমার সকল ভয় দূর হইয়া যাইবে। দেবদেব মহাদেব, দিও তাঁহাকে, দিও তাঁহাদের সকলকে, আমি ভক্তিভরে তোমার পবিত্র চরণে প্রণাম করি। জয় জয় তোমারই জয়!

—৽—

স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় ভাই কৈলাসচন্দ্র নন্দী।

[১০ই ভাদ্র, ১৩৪২, ৮৮তম জন্মদিনে পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দীর শ্রদ্ধাঞ্জলি]

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয় পিতা নন্দদুলালের

ঔরসে ও মাতা করুণাময়ীর গর্ভে, ১০ই ভাদ্র, ১২৫৫ বাং সনে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে একজন ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় পারদর্শী গৃহশিক্ষকের নিকট নিজ বাড়ীতেই লেখা পড়া শিক্ষা করেন; ১২৬৯ বাং সনে কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন এবং ১২৭২ বাং সনে মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি নিয়া এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তৎপর ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল; ডাঃ ৺প্রসন্নকুমার রায় (P. K. Roy), ৺সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (K. G Gupta), ৺রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

১৮৬৯খ্রীষ্টাব্দে, ২২শে অগ্রহায়ণ, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হবার সময়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় আগমন ও বক্তৃতাদি করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রবল ধর্ম্মোৎসাহের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন; সেই দিন কৈলাসচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র ও অন্যান্য সর্ব্বসমেত ৪০জন কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১৮৭০খ্রীঃ, আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বঙ্গচন্দ্র রায়, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু সহ কালীকচ্ছ গ্রামে আসিয়া তাঁহাদের পৈতৃক দুর্গামন্দিরে ব্রহ্মোৎসব করিয়াছিলেন। সেই দুর্গামন্দির এখন ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত। প্রতি বৎসর শারদীয় ব্রহ্মোৎসবের সময় ব্রাহ্ম প্রচারকগণ আসিয়া ব্রহ্মোৎসব করিতেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন, বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মগণ কালীকচ্ছ আগমন করিয়া ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে কৈলাসচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। সময় সময় স্বগ্রামে থাকিয়া সন্নিকটস্থ হাটে বাজারে ও স্কুলগৃহে বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কালীকচ্ছ হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নয় মাইল ঘোড়ায় যাইয়া রবিবারে প্রচার করিতেন। গ্রামে একটী সার্ব্বজনীন সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সভার তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ১৮৭০খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকা এবং ১৮৭৫খৃঃ "হিন্দু" পত্রিকা (৺কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে এক যোগে) বাহির করেন। ১৮৭৬খৃঃ ১৩ই নবেম্বর তারিখে, সোনাগদন পরিবার নামে খ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী পরিবারের কনিষ্ঠা কুমারী কন্যা বগলাসুন্দরীকে ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। (৺সুদক্ষিণা সেন [মিসেস এ, সি, সেন] ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন) ১৮৭৭খৃঃ অব্দে ঢাকাতে "ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস", ১৮৭৮খৃঃ অব্দে "নিউপ্রেস' স্থাপন করেন। ১৮৮০খৃষ্টাব্দে The Pilgrim's Journal (পিলগ্রিমস জারনেল) নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। ঐ সনে (১৮০২ শকে ১২ই মাঘ) কলিকাতা মিসনরী কনফারেন্সে স্থির হইল যে, কৈলাসচন্দ্রও একজন নববিধান-প্রচারকরূপে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহিত নববিধান প্রচার করিবেন।

তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি বেশ ছিল, হিন্দু পত্রিকা সম্পাদনকালে সম্পাদকরূপে ঢাকাতে বড়লাটের দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া, একমাত্র তিনিই ধুতি চাদর পরিধান করিয়া, অন্যান্য দরবারি পোষাক পরিহিতদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। সুদর্শন ছিলেন বলিয়া সকলে তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

১৮৮৪খ্রীষ্টাব্দে, ৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯১বাং, তিনি পরলোক গমন করেন। সংবাদ পাইয়া ঢাকা হইতে "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকা, মঙ্গলবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৯১ বাং তারিখে যাহা প্রকাশ করিয়াছে:—

১। আমরা এ বৎসর শোকজনক ঘটনার তরঙ্গে বার বার নিপতিত হইতেছি। ৭ই অগ্রহায়ণ রজনী প্রায় ১১টার সময়, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী প্রায় ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক মারাত্মক রোগাক্রান্ত হইয়া ৫।৬ বৎসর বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন, ক্রমে তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসে। গত পূজার সময় তিনি সপরিবারে বাড়ী যান। এখানে আসিবেন আসিবেন করিয়া আর আসিতে পারিলেন না। ৩রা অগ্রহায়ণ ভাই অন্নদাপ্রসন্নের নিকট এক পত্র লিখেন, তাহাতে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—"যাহা হউক, ঢাকাই বা কি, আর কালীকচ্ছই বা কি, যেখানেই থাকি, তোমরাই আমার প্রাণের ধন। আমি রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার আশা করি না, কিন্তু যে কিছুকাল বাঁচিয়া থাকি, সেই কাল যাহাতে নিশ্চিন্তভাবে পরলোক সাধন করিতে পারি, তাহাই চাই। এখন রাত্রিতে নিদ্রা কম হয়। সুতরাং অনেক সময় বসিয়া বসিয়া মার আশ্চর্য্য সংসর্গানুভব ক'রিয়া সুখ পাওয়া যায়। অথচ কোন কোন সময় রোগের ভিতর দিয়া মা যে শাস্তি দান ও ভৎ'সনা করেন, তাহা বুঝিয়া কষ্ট পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা রামপ্রসাদবাবু (৺অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পিতা) চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রুগ্নাবস্থায় দেবভাব ও দেবানুগত্য যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বড় উৎসাহজনক।" ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ভাই কৈলাসচন্দ্রের শরীর ভগ্নপ্রায় হওয়া সত্বেও তাঁহার মনের দৃঢ়তা, তাঁহার বিশ্বাসের অটলতা, পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুতির জন্য ব্যাকুলতা সুন্দর ছিল। এই ত্রিবিধ সূত্র ধরিয়া স্নেহময়ী জননী স্নেহের ভাইকে পরলোকগমনকালে বিশেষ ভাবে তাঁহার দিকে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই আমাদের সান্ত্বনা, ইহাই আমাদের শোকনিবারণের হেতু।

২। ভাই কৈলাসচন্দ্র প্রায় ১৮।১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ঢাকা সঙ্গতে যোগদান করেন। সেই হইতে তিনি দৃঢ়তার সহিত উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, নববিধানের ভাব যখন সুন্দর মতন প্রকাশিত হয়, তখনও দণ্ডায়মান থাকেন। আমরা প্রথম হইতে ইঁহার বিশ্বাস অটল, ইঁহার উৎসাহ উদ্যম প্রবল দেখিয়াছি। ইনিই "বঙ্গবন্ধুর" জন্মদাতা, ইনিই পূর্ব্ব-

বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের সংস্থাপয়িতা। ইনি স্নেহের ভ্রাতা শ্রীমান্ কালীনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইষ্টপত্রিকা সংরক্ষণের ভার-গ্রহণপূর্ব্বক অনেক অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম স্বীকার করেন। আজ বঙ্গবন্ধু শোকাকুল ও সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার পরলোকবার্ত্তা বহন করিতেছে।

৩। ভাই কৈলাসচন্দ্র স্বর্গীয় আচার্য্যদেবকে এবং তাঁহার বন্ধুদিগকে খুব ভক্তি করিতেন। ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবও তাঁহাকে বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন। এখন আমাদের ভ্রাতার আত্মা যাহাতে সেই স্নেহ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহাই আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-ব্রতে যদাপিও আমাদের ভ্রাতা বিধিমত ব্রতী হইয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য যারপর নাই ব্যগ্র হন। সেই উদ্দেশ্যে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবং ঢাকাস্থ অন্যান্য বন্ধু-দিগকে লইয়া দুর্গাপূজার সময় কালীকচ্ছগ্রামস্থ দেওয়ান ভবনে যারপর নাই উৎসাহের সহিত ব্রহ্মোৎসব করেন। তাহাতে এই উৎসবের সময় কালীকচ্ছ গ্রামে মহাব্যাপার সংঘটিত হয়। ভাই কৈলাসচন্দ্র এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় ও অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে ভয়ানক পরীক্ষাতে নিপতিত হইতে হয়। সেই সময় হইতেই নিয়মিত মত দেওয়ান বাড়ীতে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হয়। তদুপলক্ষে ভাই কৈলাসচন্দ্রের আগ্রহে কয়েক বৎসর প্রচারক এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ তথায় যাইয়া আনন্দোৎসব সম্ভোগ করেন। পীড়িতাবস্থায়ও ভ্রাতা নিয়মিত মত সপরিবারে বাড়ীতে যাইয়া এই উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রচারক ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রচারেও বাহির হইতেন। তিনি স্বাধীনভাবে অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অবশেষে ইষ্ট পত্রিকার সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, "নিউপ্রেস" নামক মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক "Pilgrim's Journal" নামক একখানা ধর্ম্ম-বিষয়ক ক্ষুদ্র ইংরেজী পত্রিকা বাহির করেন। তাহা পাঠ করিয়া ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব তাঁহার "নববিধান" পত্রিকায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। রোগের আক্রমণে দুর্ব্বলকায় হইয়াও ভাই কৈলাসচন্দ্র যুবক এবং বালকদিগকে লইয়া প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এমন কি, বক্তোপলক্ষে কতিপয় যুবককে লইয়া নিকটস্থ পল্লিগ্রামে প্রচারার্থ গমন করিতেন। অবশেষে বিধানপল্লিতে সপরিবারে বাস করিয়া, দৈনিক উপা-সনাতে যোগদানপূর্ব্বক বক্রী জীবন যাপন করিবার মানসে, একটী পুরাতন ক্ষুদ্র দালানসহ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন এবং নিজে দেখিয়া শুনিয়া গৃহটীকে দোতালা করিয়া বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে গৃহের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। বিধান-পল্লিতে যে কয়দিন বাস্তব্য করিয়া গিয়াছেন, এসময়ে প্রায় প্রত্যহ অল্পবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে প্রার্থনাদি করিতেন এবং প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে বালকদিগকে নিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ভাই কৈলাসচন্দ্র একটী পুত্র ও একটী কন্যাসহ তাঁহার যুবতী ভার্য্যাকে এখানে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়া-ছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণীও বর্ত্তমান আছেন। ভাই কৈলাসচন্দ্র প্রাকৃতদেহ-বিমুক্ত হইয়া এখন পরলোকে আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়েই অবস্থিতি করিতেছেন। এই বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছুতেই শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দান করিতে পারে না। শান্তিদায়িনী জননী সমুদয় শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

৫। ভাই কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে নানা পরীক্ষাতে এবং চরমে দীর্ঘকালব্যাপী ভয়ানক রোগের অবস্থাতেও বিশেষ কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মা আনন্দময়ী প্রিয় ভ্রাতার আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে স্থানদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

—•—

নূতন সঙ্গীত।

ভিখারী

কীর্ত্তন—ঠুংরী।

[আশীষ কর মোরে—সুর]

আজি ডাকিছে ভিখারী, ফুকারি ফুকারি
খোল প্রভু খোল গো দুয়ার।
শুনি গো দয়াল স্বামী, বড়ই কাঙাল আমি
কিছুই নাহিক আমার ॥
(আমার কেহ নাই, কিছু নাই)
ঘুরিনু অনেক দ্বারে, যাচিনু যারে তারে
দীনে দয়া হ'লোনা কাহার;
তারা শুনাইল কটুকথা, পাইনু মরমে ব্যথা
কোথা ঠাঁই আছে জুড়াবার ॥
(তোমার দুয়ার ছেড়ে)
যত ক্ষুধিত তৃষিতে, প্রেম অন্ন বিতরিতে
শুনি নাকি খুলেছ ভাণ্ডার।
(প্রেম ভাণ্ডার)
আমি বিন্দু প্রেম মাগি খাব, হাসিমুখে চলে যাব,
গাব জয়গান তোমার ॥
(জয় জয় দয়াময়)

সংগৃহীত—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

—•—

ভাদ্রোৎসবের কার্য্যবিবরণী।

"চল ভাই যাই সবে, মহামহোৎসবে, অমরধামে যোগবলে।" ইহাই আমাদের উদ্বোধনের গান। বিধাতার আশ্চর্য্যবিধানে পরলোক-সাধন দ্বারা আমাদের ভাদ্রোৎসব-সাধনের উদ্বোধন হইয়াছে।

১৫ই আগষ্ট, ভক্তিভাজন ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিনিধি শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক দিন। নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করিয়া প্রেরিত-প্রবর গিরিশচন্দ্রের প্রীতি-তর্পণ করেন।

১৬ই আগষ্ট, সন্ধ্যায়, ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ জগন্মোহন দাস উপাসনা করেন।

১৭ই আগষ্ট, প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন।

২০শে আগষ্ট, মুক্তিফৌজদলের জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ রায় প্রাতে নবদেবালয়ে উপাসনা করেন। "মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য" সম্বন্ধে আচার্য্যের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। ভাই গোপালচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের সমাগম ও অভ্যর্থনা করা হয়। ভ্রাতা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ইংরাজীতে প্রার্থনা ও সুন্দর অভিভাষণ-যোগে মুক্তিফৌজের দলকে অভিনন্দিত করেন। আচার্য্যদেবের মুক্তিফৌজদলের প্রতি ইংরাজী অভিনন্দন হইতেও ভ্রাতা জ্ঞানাঞ্জন কিছু অংশ পাঠ করেন। মুক্তিফৌজের একজন সেনানায়ক প্রার্থনা করিয়া বলেন, নববিধানের নেতা ও বিশ্বাসিগণ মুক্তিফৌজের প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যেমন আদর অভ্যর্থনা করিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। ইহার পর জেনারেল বুথের জীবন ও আত্মজীবন বিষয়ে কয়টী কথা বলিয়া সঙ্গীত প্রার্থনাদি সদলে করেন। আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্ত সদলে সুন্দর সংগীতাদি করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দিত করেন।

২১শে আগষ্ট, প্রেরিত অভিভাবক শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং ভাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা ও পাঠাদি করিয়া কান্তিচন্দ্র ও বলদেবনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "দাসামুক্তি" ও "ভৃত্যের আত্মপরিচয়" হইতে অংশ বিশেষ পঠিত হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভগ্নী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনার শেষ অংশে ভাই প্রিয়নাথ স্বর্গগত প্রেরিত আত্মাদ্বয়ের স্মৃতিতর্পণ করিয়া শান্তিবাচন করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে এই উপলক্ষে ভ্রাতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিশেষ উপাসনা করেন।

২২শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, রাজর্ষি রামমোহন কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক দিন। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। বালেশ্বরের ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা "নব উৎকল বাঁশরী" সঙ্গীতাদি করেন ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "প্রাচীন ঈশ্বর" আবৃত্তি করেন। সেবিকা হেমন্তকুমারী আদর্শ চরিত পাঠ করেন। অপরাহ্নে কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শনী দেখিয়া আসেন ও নেতাদিগের সহিত প্রীতি-বিনিময় করেন। ব্রহ্মমন্দিরে কয়েকটী ভক্ত বিশ্বাসী মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মিলন সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন এবং অনন্তের উপাসনা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন।

২৩শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টার সময় বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের যোগে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ভাই প্রিয়নাথের দ্বারা মা উৎসববিধায়িনী উৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনা করান। উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ ও আত্মনিবেদনাদিতে, ভাদ্রোৎসবের বিশেষ সাধনা সমাজগত উপাসনাই যে নববিধান-সাধনার উপাদান ও অন্নপান, ইহাই উপভোগ হয়। ভ্রাতা ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় পাঠাদি করেন। আদর্শ চরিত, আচার্য্যের "নিগূঢ় উপাসনা" সম্বন্ধে উপদেশ এবং বিধান-প্রবর্ত্তকের প্রার্থনা আবৃত্তি করা হয়। বেলা ৩টার সময় চন্দননগরের ভ্রাতা পঞ্চানন ঘোষ মাধ্যাহ্নিক উপাসনা করেন। শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের "নবমত্ততা" প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া বিশেষ কীর্ত্তনাদি করেন। অপরাহ্নে আচার্য্যের উপদেশ হইতে ভ্রাতা ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় "প্রমত্ত অবস্থা" বিষয়ে উপদেশ পাঠ করেন। তাহার পর প্রসঙ্গাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ রায়, ভ্রাতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভ্রাতা রাজকুমার দাস প্রভৃতি প্রসঙ্গ করেন। সন্ধ্যায় ভ্রাতা বিধানমুরলীর নেতৃত্বে জমাট কীর্ত্তন হয়। ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সন্ধ্যায় বেদীর কার্য্য করেন এবং অনন্তের উপাসনার অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দান করেন। সন্ধ্যার সঙ্গীতাদি ভ্রাতা হরিসুখ গুপ্ত তাঁহার কয়েকটি খৃষ্টীয় যুবক ছাত্রদিগকে লইয়া করেন।

২৭শে আগষ্ট, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্যদেবকৃত "মৃত্যুঞ্জয়নামসাধন" প্রার্থনা পাঠ করেন। পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী পিতৃদেবের জীবন উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন, এবং প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

এইরূপে ভাদ্রোৎসবের কার্য্যপ্রণালী বিধানজননীর কৃপায় সম্পন্ন হয় এবং তাঁহার অযাচিত কৃপার প্রসাদ লাভ করিয়া সকলে ধন্য হন।

সংবাদ।

জন্মদিন—হাওড়ার জনপ্রিয় স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের প্রিয়তমা কন্যা "অর্চ্চনার" ২২শে আগষ্ট জন্মদিন উপলক্ষে, মাতৃদেবী শ্রীমতী শান্তিদায়িনী দাস প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মাতামহ শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের প্রার্থনার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল :—

ইচ্ছাময় ঠাকুর! আজ তোমার প্রেরিতা কন্যার জন্মদিন। আমাদের চক্ষের জল পড়িতেছে। তুমি বিনা কেই বা শোকতাপের ভিতর শান্তির জল ঢালিয়া দেয়? বিদ্যুৎ ও বজ্রপূর্ণ মেঘের ভিতর হইতে কে শীতল জল ঢালিয়া দেয়? তুমিত সিন্ধুতলেও বাড়বানল রেখেছ। তোমার বিধানে তাই শোকতাপের ভিতরেও শান্তিসলিল রেখেছ। একই পাহাড়ের এক দিকে শীতল প্রস্রবণ, অপর দিকে উষ্ণ জলের ধারা। মানুষের ভিতরেও শোকতাপ ও শান্তি সব এক সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। তোমার কাছে দুঃখের উৎসবও আছে, আবার সুখের উৎসবও আছে। তাই আজ জন্মোৎসবের সুযোগ দিলে। তোমার কন্যা "অর্চ্চনা" সেই অর্চ্চনা-পরায়ণ পিতার সাধের ধন। তাঁহার অর্চ্চনা ও সাধনার এই বস্তু তোমার নিকট হইতে আসিয়াছে। তুমি আমাদের সাধের কন্যা শান্তিদায়িনীর ভিতরেও তোমার কৌশল প্রকাশ করিতেছ। গুটীপোকা নিভৃত আবরণের ভিতর বসিয়া কোন্ কৌশলে ও অদ্ভুত বিধানে মূল্যবান বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা কোন্ কৌশলে অন্ধকারের ভিতর আপনার অভ্যন্তরস্থ ক্ষীণালোক জ্বালিয়া আপনার পথ দেখিয়া লইতেছে! দুগ্ধ অনেক আলোড়নের পর নবনীতে পরিণত হয়; এবং পুষ্প তরুকে কাটিয়া দিলে তাহা হইতে বড় বড় ফুল উৎপন্ন হয়। আজ তাই বলিতেছি যে, তুমি আমাদের ক্ষুদ্র কন্যা "শান্তিদায়িনীর" ভিতরেও সেইরূপ কর। কন্যা আপনার ভিতরে সেই পবিত্র বস্তু রচনা করুন, এবং আপনার ভিতরে সেই আলোক জ্বালিয়া তোমার পথ অন্বেষণ করুন। তুমি আকাশ হইতে সকলের উপর শান্তিবারি বর্ষণ কর। ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

দীক্ষা—গত ৩০শে আগষ্ট, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, সন্ধ্যার উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। এই উপাসনা-যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী দুইটী হিন্দু সমাজের যুবক শ্রীমান্ শশিমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান্ মদনমোহন চক্রবর্ত্তী (দুই সহোদর ভ্রাতা) পবিত্র নবসংহিতার বিধিমতে নববিধানের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ দীক্ষার্থীদিগকে উপস্থিত করেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ মণ্ডলীর পক্ষ হইয়া দীক্ষার্থীদিগকে আসন ও গ্রন্থাদি উপহার দিয়া আলিঙ্গন করেন। বিধানজননী নব দীক্ষিতদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে দীক্ষার্থিদ্বয় প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আশীর্ব্বাদ—গত ২২শে আগষ্ট, কলিকাতার, ৪৩নং নিউ থিয়েটার রোডে, চট্টগ্রামনিবাসী ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দত্তের সহিত, কিশোরগঞ্জ-নিবাসী স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাসের (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুবিমল দাসের শুভবিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে রুগ্ন ভগ্ন শরীর নিয়া শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপর ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা, প্রার্থনা করিলে, আশীর্ব্বাদানন্তর অনুষ্ঠান শেষ হয়। ভগবান্ তাঁহার পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন। কামাখ্যাবাবুর প্রার্থনা নিম্নে দেওয়া গেল :—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে, যিনি তরুলতা উদ্ভিদ, যিনি জীবজগতে এবং যিনি মানবাত্মায় বিরাজ করিতেছেন, সেই ভুবনেশ্বরকে আমরা নমস্কার করি।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! এই শুভ অনুষ্ঠানে তোমারই আশীর্ব্বাদ আমরা ভিক্ষা করি; এবং পিতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতা, মাতামহ, মাতামহী যে সকল গুরুজন পৃথিবীতে যে পথের অনুসরণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন, এই সন্তান দুটি সেই পথের যাত্রী, এজন্য তাঁহাদিগেরও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। জীব অপূর্ণ, হে বিধাতা, তুমি তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করিবার জন্য আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে। তোমার পৌরুষভাবের আধার করিয়া পুরুষ সৃষ্টি করিলে এবং তোমার কোমলা প্রকৃতির আধার করিয়া নারী সৃষ্টি করিলে। এই দুটি প্রকৃতিকে মিলিত করিবার জন্য মানবসমাজে বিবাহানুষ্ঠান বিধান করিলে। পুরুষের ভিতর যে সকল সৎসাহস, বীর্য্য, পুণ্য, জ্ঞান, গৃহসম্পদ প্রচ্ছন্ন আছে এবং নারীর ভিতর যে সকল স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য ও মাতৃত্বের মহিমা প্রচ্ছন্ন আছে, সেই সকলকে মিলিত করিয়া তুমি পূর্ণ মানবাত্মা সৃষ্টি কর। অন্যাকার এই মিলন সেই পূর্ণ জীবনের প্রস্তুতি মাত্র। এই জন্য আমরা তোমার সহায়তা ভিক্ষা করি; এবং পিতামাতা সকল গুরুজন-দিগের শুভ কামনা এই দুটী সন্তানকে কল্যাণের পথে লইয়া যাউক। ইঁহাদের জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার কৃপায় ইঁহারা সুখে ও শান্তিতে তোমারই নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করুন। এই আমাদিগের কাতর প্রার্থনা।

হে সন্তানগণ! বিবাহ একটী ধর্ম্মব্রত ও অপার্থিব বস্তু। বিবাহিত জীবনে গুরুতর দায়িত্ব ও কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া শ্রীভগবান্ মানবের উচ্চতর ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করেন।

বিধাতার কৃপা তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউক। তোমরাও যেন বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতে পার। তোমাদের মধ্যে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হউক।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত দুইটী পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি—

ঢাকা জিলার অন্তর্গত গ্রামআমতা নিবাসী আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চক্রধর সাহা কলিকাতায় গত ৭ই ভাদ্র, পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নববিধানে দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন, নববিধানমণ্ডলীর সহিত বিশেষ যোগ রক্ষা করিতেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ময়মনসিংহে, তত্রত্য নববিধান সমাজের সম্পাদক, শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে বিশিষ্ট কর্ম্মী, লোকপ্রিয়, প্রাচীনতম ডাঃ বৈদ্যনাথ রায় ৮১ বৎসর বয়সে, ইহলোকের কর্ম্মসমাপনান্তে পরলোকে আনন্দময়ী মার ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস এবং সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাগণের প্রতি হৃদয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে উন্নত লোকে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আরোগ্য—শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের কন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার সুব্রতানন্দ সেন সম্প্রতি উভয়েই ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভক্ত-জননীর বিশেষ কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া নব জীবন লাভ করিয়াছেন। এজন্য ২৭শে আগষ্ট, সায়ংকালে, রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা-দানসূচক উপাসনা সম্পন্ন হয়। মহারাণী নিজেও প্রার্থনা করেন ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "বিশেষ দয়া" আবৃত্তি করেন। বিধান-জননীর মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহার জীবনে পূর্ণ হোক।

বিশেষ উপাসনা—গত ২৪শে আগষ্ট, পরলোকগত ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাসের ভবনে তাঁহার মাতৃদেবী, সহধর্ম্মিণী ও সন্তান সন্ততি পরিজনবর্গকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক বিশেষ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে আগষ্ট, মধ্যাহ্নে, নববিধান-প্রেরিত ভক্ত শ্রীঅমৃতলাল বসুর পত্নী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন-স্মরণে, ৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা উপাসনা সম্পাদিত হয়। কন্যা শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবী ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী দেবী মাতৃদেবীর আত্মায় তর্পণ করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ভগ্নীদ্বয় প্রচার ভাণ্ডারে ১৲, পুরী নবপর্ণকুটীরে ১৲ টাকা দান করেন।

দান-প্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

জুন, ১৯৩৬—শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ মাসী শাশুড়ীর পরলোকগমনে ২৲, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগের সহধর্ম্মিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহের পরলোকগমনে ৩৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র-মোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানি মাসিক দান ২৫৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মুখার্জ্জি মাসিক দান ১৲ ও পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও ভ্রাতা ভগ্নীগণ মাতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু মাতৃ-সাম্বৎসরিকে ২৲, ডাঃ বীরেন্দ্রভূষণ বসু মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲ শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত বিনয়-ভূষণ বসু জ্যেষ্ঠতাতের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু জ্যেষ্ঠতাতের সাম্বৎসরিক ২৲, শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ মাতৃসাম্বৎ-সরিকে ২৲, স্বর্গীয় স্বপ্রকাশচন্দ্র দাসের শ্রাদ্ধে সহধর্ম্মিণী ৪৲, ভক্ত গগনবিহারী সেন কন্যা ইলার পারলৌকিকে ৫৲ টাকা।

ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

কার্য্যপ্রণালী

(আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

৩০শে আগষ্ট, ১৯৩৬; ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩; রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় উদ্বোধন। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়।

৩১শে আগষ্ট, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় দিগ্‌বাজার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ী উপাসনা। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস।

১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷৷ টায় মাহুতটুলী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দারের বাড়ী উপাসনা। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস।

২রা সেপ্টেম্বর, বুধবার—সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় বিধানপল্লী শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসন্ন সেনের বাড়ী উপাসনা। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়।

৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় ফরাসগঞ্জ স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র দাসের বাড়ী উপাসনা। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় মালাকারটোলা

স্বর্গীয় অধরচন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপাসনা। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস।

৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় উয়ারী ডাঃ শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন ঘোষের বাড়ী উপাসনা ও প্রীতি-সম্মিলন। শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসন্ন সেন।

৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলা-উৎসব, অপরাহ্ণে ৫টায় ব্রহ্মমন্দিরে বালকবালিকা-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৭৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে সমাজিক উপাসনা। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস।

৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার—অপরাহ্ণে নারায়ণগঞ্জে প্রচার-যাত্রা।

৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে আরতি ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ।

৯ই সেপ্টেম্বর, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণে ৮টায় বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে দাসমণ্ডলীর উৎসব। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়। সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গত সভা। ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ।

১০ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে যুবকদের উৎসব। শ্রীযুক্ত পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১১ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১২ই সেপ্টেম্বর, শনিবার—অপরাহ্ণে ৫টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রবন্ধ-পাঠ। ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ। সন্ধ্যা ৭টায় স্বর্গগত ভাই মহিমচন্দ্র সেনের বাড়ী উপাসনা। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়।

১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবার—পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন, ৯টায় উপাসনা—শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়। অপরাহ্ণে ২টায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দার। ৩টা হইতে ৫টা পাঠ ও আলোচনা—ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ। ৫টা হইতে ৬টা ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা। ৬টায় কীর্ত্তন ও ৬৷৹টায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ।

১৪ই সেপ্টেম্বর, সোমবার—৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে শান্তি-বাচন—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যে দিন পূর্ব্বাহ্ণে অন্যত্র কোন কাজ নাই, সে দিন পল্লীস্থ দেবালয়ে সকালে ৭টায় উপাসনা হইবে।

শ্রীক্ষিতীচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক।

—০—

নিবেদন।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এখন আর সব খণ্ড পাওয়া যায় না। এই বইখানিতে কেবল মাত্র সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলেও, যদি এই বইখানি রাখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকদিগের বিশেষ উপকার করা হইবে ও আমাদেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে বিশেষ অপরাধ হইবে। সেজন্য এই পুস্তক খানির নূতন সংস্করণ একান্ত আবশ্যক।

ইহাতে অধিকাংশ স্থলে তারিখ বাঙ্গলাতে এবং সন শকাব্দে আছে। সেই সকলের ইংরাজি সন তারিখ ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার সূচী একটু বিশদভাবে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাও আছে। সেজন্য কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ছাপাইতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। সকলের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সমাধা করা সুকঠিন। সেই জন্য সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যাহাতে আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বে, তাঁর স্মৃতি (যা খুব accurately historical) এই উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা জীবনখানির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে পারি, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। টাকা কড়ি আমার নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণকল্পে অন্যূন ৩০০০৲ টাকার প্রয়োজন। অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পিঠাপুর রাজকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রাও সাহেব ডাঃ ভি, রামকৃষ্ণ রাও এতদর্থে ১০০৲ টাকা অর্থসাহায্য দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারীও এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সাহায্য ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি ও বিশ্বাস করি, মণ্ডলীর সকলে এতৎসম্বন্ধে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনুভব করিয়া অর্থসাহায্য দান করিতে প্রস্তুত হইলে অনায়াসেই এই পুস্তক-খানির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইবে।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা; এলাহবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 17th. September, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা নববিধানেশ্বরী, জগতের সকল নরনারীর হইয়া প্রার্থনা করি, অবিশ্বাসের অস্ত্রাঘাতে এখনও কেন তোমাকে বধ করি? কেন তুমি নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই? আবার কেনই বা তোমার সন্তানকে ক্রুশাহত করিতে এত উদ্যত হই? তুমি ত আমাদের জন্মদায়িনী জননী। তোমার সন্তান ত আমাদের অগ্রজ ভাই। তুমিই ত আমাদিগকে এই মানব-জন্ম দিয়াছ; তাই আমরা মানুষ নাম পাইয়াছি। তুমি তোমারই সন্তানের সহিত একই রক্ত মাংসের শরীরে এক শরীর করিয়া গড়িয়াছ। তাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্র সকল মানুষকে একই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং আমাদের সকলকেই তাঁহার দিব্য অঙ্গে গাঁথিয়া লইয়া বলিলেন, আমরা সকলেই এক শরীর। এই জন্য তুমি যে আমাদের জীবনের জীবন এবং শ্রীকেশবের সঙ্গে আমরা একই শরীর, নববিধানে তুমি ইহাই শিক্ষা দিয়াছ। কিন্তু কই আমরা এ বিধান মানিলাম? কই এ শিক্ষা অনুসরণ করিলাম? আমরা এখনও যে তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি বা 'তুমি নাই' বলিতেছি। এখনও যে আমরা তোমার নব ভক্তকে অকৃতজ্ঞতা-ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিতেছি, আর অহংকারে স্বতন্ত্র হইয়া তোমাকেও উড়াইয়া দিতেছি। বল বল, যদি কেউ আপন মাতৃহত্যা করে, আপন ভ্রাতৃহত্যা করে, সে কি দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়? সে কি খুনের দায়ে দায়ী হয় না? আবার সুধু তা নয়, তোমার ধন দৌলত ও তোমার সন্তানের আভরণ এ সকলই আমরা আত্মসাৎ বা চুরি করিয়া নিজস্ব বলিয়া বড়াই করিতেছি। স্ত্রী সন্তানদিগকেও সেই বিষ পান করাইয়া সংসারমদে মত্ত করিতেছি। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? খুনে ডাকাতদের জন্য পৃথিবীর বিচারালয়ে প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তরদণ্ড দেওয়া হয়। সত্যি, মা, আমাদের ন্যায় খুনে ডাকাতদের প্রতি সেই দণ্ড বিধান করিবে না? 'তুমি নাই' বলিলে, আমিও যে মৃত হই। ভাইকে অস্বীকার করিলেই আমি যে তোমার বিধান হইতে অপচ্যুত হইয়া পতিত হই ও নরকগামী হই। মা, তুমি যে মহাপাপীর মা; তাই কাতর প্রাণে ভিক্ষা চাই, এ মহাপাপীকে মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা এবং চুরি ডাকাতির মহাপাপ হইতে উদ্ধার কি করিবে না, রক্ষা কি করিবে না? মা, তুমি প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তোমার নববিধানের জেলে আমাদিগকে রাখ, কিংবা যদি ইচ্ছা হয়, আমাদের প্রত্যেকের আমিকে একেবারে নিহত কর, কিম্বা যদি এ

সংসার হইতে দ্বীপান্তরিত বা রূপান্তরিত করিয়া আমাদিগকে সদলে সপরিবারে উদ্ধার কর, রক্ষা কর; তবেই আমরা বাঁচিয়া যাই।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

"যত মত, তত পথ"—না, "ঐক্যমত এক পথ"।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণ ঢাক ঢোল বাজাইয়া জগতে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের গুরুদেব এক মহান্ উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, "যত মত, তত পথ।" এই মত কি সত্য ধর্ম্মমত? এ মত কি বিশেষ কোন নূতন মত?

"বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" এই শ্লোক, এই উক্তি ত বহুকাল প্রসিদ্ধ, ইহা কে না জানেন? তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত যে এক বিশেষ নূতন মত বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উদার মত, তাহা কেমন করিয়া বলিব? বাস্তবিক এই মত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, ইহা অতি সাধারণ মানবীয় ধর্ম্মমত। নববিধানের আলোকে দেখি, ইহা অতি নিকৃষ্ট মত।

প্রাচীন পুরুষকারধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ ইহাকে অতি উচ্চ উদার মত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন; কিন্তু মানুষের নিকট যাহা উচ্চ, ঈশ্বরের নিকট তাহা তুচ্ছ। তাই "যত মত, তত পথ" ইহা হইতে পারে মানুষের কল্পিত উচ্চ মত; কিন্তু ইহা বিধাতার বিধান নহে, এ কথা আমরা নির্ভয়ে এবং সত্যকে সাক্ষী করিয়া ঘোষণা করিব।

পল্লীগ্রামে আমরা দেখিতে পাই, যখন শস্যক্ষেত্রে ধান্য না থাকে, মাঠের উপর দিয়া যে যেখান দিয়া পারে, পায়ে হাঁটিয়া গমনাগমন করে; পরে রাজপথ ধরিয়া গম্য স্থানে গমন করিতে চেষ্টা করে। ক্ষেত্রে শস্য থাকিলে এক রাজপথ বিনা ষ্টেসনে যাইবার অন্য পথ নাই।

তেমনি মানুষ পুরুষকারবলে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া নিজ নিজ মত, নিজ নিজ পথ, নিজ নিজ মনঃকল্পনা অনুসারে রচনা করিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা সত্য পথ, সত্য মত নহে। পল্লীগ্রামে মাঠের পথে যাইতে হইলে কখন উত্তরে, কখন দক্ষিণে, কখন কণ্টক বনের ভিতর দিয়া, কখন জলাশয়ে ডুবিয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়া আপন পথ ধরিতে হয়, কিম্বা গম্যস্থানে যাইতে হয়। সেইজন্য নববিধানে আবিষ্কার হইয়াছে যে, এক বিধাতার মতই মত, এক বিধাতার পথই পথ। বিশ্ববিধাতা যেমন এক বই দুই নন, তেমনি তাঁহার মত বই মত নাই, তাঁহার পথ বই আর পথ নাই।

আমরা আমাদের মতে কিম্বা নিজ নিজ পথে যদি চলি, আমরা নিশ্চয়ই ভ্রম ভ্রান্তিতে পড়িব; কিম্বা ভিন্নতা স্বতন্ত্রতার পথে গিয়া, হয় ধর্ম্মের অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইব, নতুবা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া মিথ্যা ধর্ম্মের অন্ধতায় অন্ধ হইয়া বিভ্রান্ত হইব।

এক রাজপথ পৃথিবীতে যেমন সোজা পথ, এমন আর অন্য পথ নয়। রেলপথও সহজ সরল পথ, রেলে উঠিলে আর পায়ে হাঁটা পথে চলিতে হয় না, নিজের মতে চলা যায় না; ঠিক তেমনি নববিধান ঘোষণা করিয়াছেন, প্রকৃত ধর্ম্মমত সবার "ঐক্যমত," এক বিধানের পথই সকলকার পক্ষে সোজা রাজপথ।

বাস্তবিক বিধাতার বিধান পুরুষকার বা মানুষের ব্যক্তিগত মত বা পথের বিধান নয়। বিধান-বিশ্বাসী যে, প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী সে; তার ত আর নিজের মত, নিজের পথ নাই। ঈশ্বরের মত বা ঈশ্বরের ইচ্ছাই তার মত; ঈশ্বর যে পথে লইয়া যান, তাহাই তাহার পথ। নববিধানের রেলগাড়ীতে এখন চড়িয়া, আমরা বিধাতার ইচ্ছামত তাঁহারি এক নববৃন্দাবনের পথে যাইব। আমাদের আর যত মত, তত পথে গিয়া বিভ্রান্ত হইতে হইবে না। বিধাতার মতে ঐক্যমতই আমাদের মত, বিধাতার এক পথই আমাদের পথ। ঈশ্বরের মতে সবার মিলন হইয়া যে ঐক্যমত, ইহাই এক পথ। প্রকৃত ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদমত নাই।

"যত মত, তত পথ" ছিল মানুষের যখন পায় হাঁটা পথ। ডুবতো উঠতো পড়তো কাদায়, খুঁজতে গিয়ে গ্রাম্যপথ।

নামলো যখন ধরায় নববিধানের বিধানরথ, খুললো তখন স্বর্গরাজ্যের সহজ সোজা রাজপথ।

এক মার মতই ছেলের মত, মার পথই ছেলের পথ; তাই শ্রীকেশব কল্লেন জাহির, "ঐক্যমত এক পথ।"

আকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠে যেতে আর নাই যত মত, তত পথ। নববৃন্দাবনে যাবার সবার চাই ঐক্যমত এক পথ।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

নববিধানের নব লক্ষণ।

১। বিশ্বাস বা প্রার্থনা। ২। বিবেক বা আদেশ-শ্রবণ। ৩। বৈরাগ্য বা আত্মত্যাগ। ৪। আমিত্বহীনতা। ৫। পাপ-বোধ বা সুনীতি শুদ্ধতা। ৬। স্বাধীনতা। ৭। শিষ্যত্ব। ৮। শিশুত্ব। ৯। উন্মত্ততা বা উদারতা। নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান লক্ষণ এই নয়টী। নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবন লাভ করিতে হইলে, এই নয়টী লক্ষণ থাকা চাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র নিজকে "পাপীর সর্দ্দার" কেন বলিলেন ?

"পাপীর সর্দ্দার" কেন বলিলেন ? অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়। কেশবচন্দ্র কি সত্য সত্যই কোনও পাপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ? যাঁহাদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় হয়, জীবনবেদের পাপ-বোধ অধ্যায় পাঠ করিলে তাঁহাদিগের সমুদয় সংশয় দূর হইবে। শ্রীকেশবচন্দ্রের অভিধানে পাপের অর্থ, পাপের সম্ভাবনা। তিনি বলেন, "ঈশা কি এখানে ? যাই একথা মনে হইল, অমনি পাপ হইল।" এই ভাবেই তিনি আপনাকে পাপী বলিয়াছেন। আবার পাপী নারকী আমাদের ন্যায় যাহারা, তাহাদিগকে আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য নিজকে আমাদেরও পাপে "পাপী বোধ করিয়া" পাপীর সর্দ্দার বলিয়াছেন।

নববিধানে পরিত্রাণ।

নববিধানে নূতন পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। নববিধানের ঈশ্বর মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মা যিনি, তিনি স্নেহবাৎসল্যে পূর্ণ। স্নেহে সন্তানপালন মাতৃত্বের প্রধান লক্ষণ। সন্তান যদি রুগ্ন হয়, মার স্নেহ সে সন্তানের প্রতি অধিকতর উচ্ছ্বসিত হয়। নববিধানের মতে পাপ রোগ। তাই ছেলে অপেক্ষা ছেলের রোগ-নিবারণের জন্য মা যেমন ব্যস্ত হন, এমন আর কে ? এজন্য আমাদের পাপ-রোগ নিবারণ করিতে মাইত আমাদের জন্য অধিক ব্যস্ত। আবার নববিধানের নবভক্ত আমাদিগকে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গর্ভস্থ শিশুর অসুখ হইলে, মা স্বয়ং ঔষধ সেবন করিয়া তাহার রোগ আরোগ্য করেন; তেমনি ভাই কেশবও আমাদিগকে তাঁহার নিজ অঙ্গস্থ জানিয়া, আমাদের লইয়া প্রার্থনারূপ ঔষধ সেবন করিতেছেন ও তাঁর মার পুণ্যবল সঞ্চার করিতেছেন। যদি আমরা প্রকৃত নববিধান-বিশ্বাসী হই, আমরা বিশ্বাস করিব যে, মা আমাদের পাপ-রোগ নিবারণের জন্য ব্যস্ত, এবং ভাই কেশবও, আমরা তাঁর অঙ্গ বলিয়া, নিজ পুণ্যশক্তি-সঞ্চারের জন্য ব্যাকুল। নববিধানে পরিত্রাণ এই জন্য কি সহজ।

পিতৃ-তর্পণ

[গত ২১শে ভাদ্র, ময়মনসিংহে, স্বর্গগত ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত]

জন্ম—বাং ১২৬২ সন, ১লা বৈশাখ।
মৃত্যু—বাং ১৩৪৩ সন, ১১ই ভাদ্র।

আজ যাঁর স্মৃতি-তর্পণের জন্য এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি আমাদের আট জন ভ্রাতা ভগ্নীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান উপলক্ষে, তাঁর জীবনের দুই চারিটী কথা আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিতেছি। তিনি যেমন আমাদের পিতা হইয়া পরমাত্মীয় ছিলেন, তেমনি অপর সকল লোকেরও বন্ধু, প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কাহারও সঙ্গে তাঁর জীবনে বৈরীভাব ছিল না, বাস্তবিক কাহাকেও তিনি পর ভাবিতে জানিতেন না। তাঁর কোমল অথচ বিশাল হৃদয়ে প্রেম ভিন্ন অপ্রেমের স্থান ছিল না, কোনও প্রকার সংকীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে তাঁহার চিত্ত আবদ্ধ ছিল না। ভালবাসায় ও প্রেমে তাঁহার প্রয়াস পাইতে হয় নাই, ইহা তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার বাহিরের জীবন, ইতিহাসের দুই চারিটী কথা ভাষায় আলোচনা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার অন্তর-জীবনের নিগূঢ় ভাব সকল প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা পাওয়া কঠিন। কেন পরের জন্য খাটিতেন নিঃস্বার্থভাবে, কেনই বা অভাব সত্ত্বেও বিনামূল্যে লোককে ঔষধ দিতেন ও রোগীর গৃহে গিয়া তাকে দেখিতেন, কেনই বা কাহাকেও কিছু দিয়া সাহায্য করিতে চাহিতেন, এবং কেনই লোককে এত খাওয়াইতে, আদর যত্ন করিতে ব্যস্ত হইতেন এবং তাহা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাহা বলা সুকঠিন। ধর্ম্মপ্রবন্ধ-রচনায়, ধর্ম্মগ্রন্থাদিপাঠে ও আলোচনায়, ধর্ম্মসঙ্গীতগানে এবং কীর্ত্তনে কেনই বা আবিষ্ট হইতেন, প্রমত্ত ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন, সে গূঢ় ভাবের তাৎপর্য্য ভাষায় গ্রাহ্য হয় না। স্বর্গগত পিতৃদেবের জীবনে এই দুই ভাবেরই অধিক অভিব্যক্তি হইয়াছিল। বাহিরে তিনি প্রেমিক, সেবক, চিকিৎসক, সকলের প্রতি সহানুভূতিতে ও প্রেমে পূর্ণ; অন্তরে ভক্তি ও প্রেমরসে সিক্ত, প্রমত্ত ভক্ত, হরিনামগুণগানে মগ্ন ও উল্লসিত। বাহিরে তাঁর কর্ম্মজীবনে নিঃস্বার্থ সেবা ও সকলের প্রতি প্রেম, অন্তরের গভীরতম প্রদেশে তিনি সেই প্রেমময় দেবতার, প্রেমময়ী বিশ্বজননীর ভক্ত ও সন্তান। এই বাহির ও অন্তরের ভাব, তাঁহার বাহিক ও আধ্যাত্মিক, অথবা

সংসারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ জীবনের মধ্যে মিলন ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিল। তাই তিনি সরল বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁর মুখের হাসি সংসারের পীড়নে এবং মরণেও ম্লান হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে রচিত সংগীতে যে দুইটী চরণ গাহিয়াছেন, তাহা আমাদের পিতৃদেব-সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য :—

"কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আস ;
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো,
ধরায় আস।"

কোন্ অজানা প্রেমের দেশের বর্ত্তিকাহস্তে তাঁর আত্মা দেহধারী হয়ে সংসারে বিচরণ করিত, আমরা তার সন্ধান পাই নাই; কোন্ প্রেমের প্রচ্ছন্ন স্পর্শ সর্ব্বদা তাঁর হৃদয়কে পরমানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত করিত, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তিনি পারস্য কবি হাফেজের প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন। সেই পারস্য কবির ভাষায় তিনি সদাই এই মরজগতের এত বিষাদ ও নিরাশার মধ্যে নূতন জীবন ও নব বসন্তের গান গাহিতেন। তাই কবি হাফেজের জীবনী-রচনায় ও মূল পারস্য হইতে কবির গজল বা গানগুলির বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়া, কবির একখানি সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশের জন্য, বিগত ২০ বৎসর কাল অবসরকালে অনেক সময় ক্ষেপণ ও প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত "হাফেজ" বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

আমাদের পিতার জীবন মূলতঃ সরস ও মধুর ভাবে পূর্ণ ছিল, কিন্তু তৎসঙ্গে পবিত্রতার সৌগন্ধ মিশ্রিত ছিল। তাঁর প্রেমভাবের মধ্যে আবিলতা বা কলুষ ছিল না, এ যেন নির্ম্মল পদ্মপুষ্প, বিমল সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ! এ যেন মাঘের প্রভাতে শিশিরধৌত সবুজ তৃণকে আচ্ছাদন করিয়া নির্ম্মল শুভ্র সুগন্ধযুক্ত স্বর্ণ-কিরণে আলোকিত সেফালির অমল সৌন্দর্য্য! তাঁর জীবনের পবিত্রভাব, যখন তিনি উপাসনায় মগ্ন হইয়াছেন, তখন, যেন হিমাদ্রির চূড়ায় সূর্য্যকিরণপাতে যে অতি গম্ভীর মহান ভাব উদ্রেক করে, তেমনি এক দৃশ্যের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীয় হইত। আর ঐ ভাবের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে নামিয়া আসিয়া যখন নিত্য নিয়মিত কার্য্যে সংসারে আমাদের সকলের জন্য খাটিয়াছেন, তখনও তিনি উচ্চস্তরেরই মানুষের মত কাজ করিতেন ; কখনও সংসারের ধূলি কাদায় আপনাকে মলিন করিয়া তোলেন নাই। সত্যের, ন্যায়ের, প্রেমের পথ ছাড়িয়া তিনি সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন নাই এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত বা লালায়িত হন নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ের লালসা অথবা অর্থোপার্জ্জনে নীচতা তিনি জানিতেন না, বুঝিতেন না। অর্থের অর্থ তাঁহার নিকট একটু ভিন্ন রকমের ছিল, তাহা যাঁহারা তাঁর সংসর্গে আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানিয়াছেন। আজকাল অর্থগৃধ্নুতার তীব্র বিষে মানুষের জীবন তিক্ত বিষাক্ত হইয়া সংসারকে ভীষণ স্থান করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার জীবন তাহা হইতে দূরে ছিল। শত অভাবের মধ্যে তিনি এই বিষাক্ত বাষ্পের স্পর্শ হইতে দূরে রহিয়াছেন। এ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মভাবেরই ফল।

তিনি সংসারী ছিলেন, গৃহীর কর্ত্তব্যপালনে তৎপর ও ব্যস্ত ছিলেন। কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন এবং মেডিকেল স্কুল হইতে বাহির হইবার বৎসরে মাতৃহীন হন। ডাক্তার হইয়া বাহির হইয়া প্রথম জীবনে দুইধর্ম্মপ্রচারক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় স্বগ্রামে থাকিয়া, বার বৎসর কাল শক্তি ও অর্থ ব্যয় করেন। দেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, চিকিৎসকরূপে জনসাধারণের সেবা করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন তখন বন্যার স্রোতের ন্যায় বাংলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কোথায় জঙ্গলবাড়ী, ভাটিতে ইটনা গ্রাম, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আর কোথায় কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বিক্রমপুর ও বরিশাল সর্ব্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া, ব্রাহ্মগণ পরস্পরযোগে আকৃষ্ট ও বদ্ধ হইতে লাগিলেন। আমাদের পিতা যখন অবিবাহিত, সে সময় হইতেই বহু ব্রাহ্ম আমাদের গৃহে আসিয়া উৎসবাদিতে যোগদান করিতে লাগিলেন এবং অনেক সময় দীর্ঘদিন অবস্থান করিতেন। গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কিশোরগঞ্জ হইতে স্বর্গীয় জগমোহন রায় মহাশয় ও বিহারীলাল সেন মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। গ্রামের কেহ কেহ সহানুভূতি করিতেন, অনেকে বিরুদ্ধাচারীও ছিলেন। বাবা সেই সময়েই উপাসনার প্রার্থনার ভাবের সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন নূতন সংগীত রচনা করিয়া গান করিতেন। সেই সংগীতগুলি পরে "কুসুমাঞ্জলী" নামে গুজাদিয়ার জমিদার অভয়বাবু মহাশয়ের উৎসাহে প্রকাশিত হয়। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবগণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি ও আমাদের পরিবারের প্রতিও অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং সেজন্য হয়বৎনগর, বৌলাই প্রভৃতি সমুদয় মুসলমান জমিদার গৃহেরই তিনি চিকিৎসক হইয়াছিলেন। কিছুকাল মধ্যে চিকিৎসক হিসাবে কিশোরগঞ্জ মহকুমায় সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত হন ও খ্যাতিলাভ করেন।

ময়মনসিংহ নগরে আসিয়া ডাক্তারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া কিছু কাল আপনাকে নিঃসহায় মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমে বন্ধুবান্ধবের সহায়তা লাভ করিলেন। ১৮৯২ সনে একটী ডাক্তারখানা স্থাপন করিলেন, ক্রমে তাঁহার পশার বৃদ্ধির সহিত ডাক্তারখানারও উন্নতি হইতে লাগিল এবং "ভিক্টোরিয়া মেডিকেল হল" নামে উহা সহরের সর্ব্বপ্রধান ঔষধালয় হইয়া উঠিল। ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু তৎকালীন সিভিল সার্জ্জনরূপে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দাঁড়াইলেন। তৎপর আরও অনেকানেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী সিভিল-সার্জ্জন তাঁহার সহিত একত্র হইয়া

চিকিৎসা কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাঃ কালভার্টের নাম নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ কালভার্ট তিন বৎসরকাল এখানে ছিলেন এবং আমার পিতার সহিত একত্রে বহু রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমার তৃতীয় ভ্রাতা সুধীন্দ্রনাথ যখন শিশুকালে উদরাময়-রোগে আক্রান্ত হইয়া, অন্যান্য চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্বেও প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়, পিতাঠাকুর তখন ডাঃ কালভার্টকে গিয়া জানাইলে, উক্ত ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে একটু ভৎর্সনার ভাবে পূর্ব্বে না বলার জন্য অনুযোগ দিয়া, তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুচিকিৎসার গুণে শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। ২০ বৎসর পরে যখন ডাক্তার কালভার্ট মেডিকেল কলেজের Principal হইলেন, পিতৃদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, দুই চারটী কথার পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "How is that baby now"? বাবা উত্তর করিলেন, "That boy is now a youngman and has passed his B.A. Examination". ডাঃ Calvert আমার পিতার প্রতি এতকাল পরেও এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, অপর ভ্রাতা রায় সাহেব শ্রীমান্ সুবিন্দ্রনাথের মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সময়ে কেরাণী মহাশয়ের সকল প্রকার আপত্তি সত্বেও, যখন Calvert সাহেব Register আনাইয়া নিজ হস্তে জোর পূর্ব্বক তাহার নাম লিখিয়া লইলেন, তখন সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ডাক্তার ও আফিসের লোক বলাবলি করিতে লাগিল, এ ডাক্তারটী কে? ল্যাপ্টেন্যান্ট কর্ণেল ইউ, এন্ মুখার্জ্জি এখানে সিভিলসার্জ্জনরূপে পিতার সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিতেন এবং নিজ গৃহের চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে দিয়া করিতেন। মেজর জেনারেল ডাঃ ডি, পি, গয়েল (Surgeon General) পিতাকে কেবল ডাক্তাররূপে নয়, কিন্তু একজন উন্নতচরিত্র ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরূপে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। মেজর গ্রিপ প্রভৃতি সিভিল সার্জ্জন পিতাকে অযাচিতরূপে প্রশংসাপত্রাদি প্রদান করিয়াছেন। ১৮৭৮সনে মেডিকেল স্কুল হইতে বাহির হইয়া ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত তিনি চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার প্রায় ২৫।৩০ বৎসর কাল তাঁহার পসার খুব বিস্তৃত ছিল। এই সহরের এমন শিক্ষিত গৃহ ছিল না, যেখানে তিনি আহূত না হইতেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সকল প্রবীণ উকিলদের তিনি গৃহচিকিৎসক ছিলেন। স্বর্গীয় কালীশঙ্কর গুহ মহাশয় পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। স্বর্গীয় অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের গৃহচিকিৎসকরূপে পিতার সহিত তাঁহার পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ও পিতার প্রতি সশ্রদ্ধ স্নেহের ব্যবহার করিতেন। স্বর্গীয় কামিনীকমল সেনের সহিতও তাঁহার সৌহৃদ্য ছিল। স্বর্গীয় গঙ্গাদাস গুহ ও চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের প্রশংসাবাদও পিতার মুখে শুনিয়াছি। স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত পিতার একজন বন্ধু ব্যক্তি ছিলেন। রায় বাহাদুর নিশিকান্ত ঘোষ পিতার প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন। পিতৃদেব বহু সম্মানিত জমিদার-গৃহে চিকিৎসক ছিলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, সুসঙ্গের মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ ও রাজা জংবাহাদুর ও ভবানীপুরের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও একজন।

তিনি এ নগরে কলেজ স্থাপনের দিবস হইতে ইহার সহিত যুক্ত হন। পূর্ব্বতন সিটি কলেজ ব্রাঞ্চ স্থাপন হইতে তিনি ইহার হোষ্টেলের ডাক্তার হন এবং পূর্ব্বে বহু বৎসর কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বতন কলেজের অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এম,এ, পিতার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পরবর্ত্তী আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পি, চাটার্জ্জি এবং পরে ডাঃ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ মহাশয় পিতৃদেবকে অত্যন্ত আদর ও সম্মান দেখাইতেন। হোষ্টেলের শত শত ছাত্র সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছে। তিনি বালকের ন্যায় স্বাভাবিক সরলতার সহিত তাহাদের সহিত সর্ব্বদাই মিশিয়াছেন। কলেজের অপরাপর অধ্যাপকগণ এবং বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয়ও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন। এ সকলের মূলে কেবল ছিল পিতার চরিত্র-মাহাত্ম্য, যাহা অলক্ষ্যে মানুষকে শ্রদ্ধান্বিত করে। উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে মিঃ ব্লাক্‌উড ও মিঃ স্প্রাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ মিঃ স্প্রাই (Spry) তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিতেন এবং তাঁহার অনেক কার্য্যে সহানুভূতি করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট জজরূপে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন সপরিবারে এখানে তিন বৎসর কাল ছিলেন এবং আমাদের পরিবারের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। সেন মহাশয় সে সময়ের Statutory Civil Service এ ছিলেন এবং সে সময়ের একজন প্রতিভাবান ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সেন সাহেব প্রতি রবিবার আমাদের গৃহে আসিতেন, দুই তিন ঘণ্টাকাল উপাসনা করিতেন, আহারাদি করিতেন ও তৎপর ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিতেন। স্বর্গীয় ডাঃ পি, এম, গুপ্ত, স্যার কে, জি, গুপ্তের সহোদর, তদানীন্তন সিভিল সার্জ্জনও পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই আমাদের গৃহে সপরিবারে আসিতেন। এ সকল আত্মীয়তা, বন্ধুতা ও সহৃদয়তার মূলে ছিল আমাদের পিতৃদেবের চরিত্রের আকর্ষণী-শক্তি, নির্ম্মলতা ও আন্তরিক ধর্ম্মানুরাগ। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস, এক সময়ে চিকিৎসায় তাঁহার কিরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিবার সময় হইবে না। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমার ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও

বিলাতে গিয়া ডাক্তারীর নূতন নূতন বিষয় ও উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা শিক্ষা করি। আমি নিশ্চয়ই যাইতে পারিলে Successful হইতাম।" তাঁহার চিত্তের যে দৃঢ়তা ছিল, যে একনিষ্ঠা তাঁহার জীবনের উন্নতির মূলে ছিল, তাহাতে তিনি যে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি গ্রাম্য স্কুল হইতে মাইনার পরীক্ষায় প্রথম হইয়া দেওয়ান সোবান্দাদ খাঁ প্রদত্ত রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়া, নিজ চেষ্টায় ঢাকায় গিয়া নবাব গণিমিঞা সাহেবের free ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, তখনকার Entrance পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্দেশ্যে ; ইহা হইতেই তাঁহার পাঠানুরক্তি বা উন্নতির অভিলাষ কতদূর ছিল, বলা বাহুল্য। যখন ঢাকা মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইল, তিনি সেই প্রথম দিবসের ছাত্রদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এবং তিন বৎসর কাল তপস্যা-সাধনের ন্যায় সে স্কুলের শিক্ষা সমাপন করেন। কিন্তু তাঁহার তখন দাঁড়াইবার স্থল বা সাহায্য করিবার বড় কেহ ছিল না। বলিতেন, "এ বেলা খাইলে অন্য বেলায় কি খাইব, তাহা জানিতাম না, বই কিনিয়া পড়িতে পারি নাই। লেকচার notes লিখিয়া লইতাম। লেকচারের intervalএ অন্যের বইখানি তাড়াতাড়ি পড়িয়া লইতাম। খুব ভাল স্মৃতিশক্তি ছিল, সব স্মরণ থাকিত ; দুই একখানি মাত্র বই কিনিতে পারিয়াছিলাম, কারণ ডাক্তারী বইয়ের দাম খুব বেশী ছিল।" এ মাসের স্কুলের তিন টাকা মাহিয়ানা কোন রকমে জোগাড় হইলে, তাহার পরবর্ত্তী মাসের মাহিয়ানার জন্য চিন্তিত হইতেন। ফাইনেল পরীক্ষার সময় চিন্তিত হইয়া এক বন্ধু ব্যক্তিকে পত্র লিখিলেন এবং তিনি ১০৲ ফিস পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সে সময়ে যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রায়ই বলিতেন। মেডিকেল স্কুলে তিনি ভাল ছাত্রদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ফাইনেল পরীক্ষায় কোনও বিষয়ে এমন উত্তর দিয়াছিলেন যে, সে সময়ের সাহেব পরীক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিক্ষককে বলিলেন, "এই ছাত্র এ সব কবে পড়িয়াছে, জিজ্ঞাসা করুন।" বাবা উত্তর করিলেন যে, তিনি গত ছ' মাসের মধ্যে এসব পড়েন নাই। এমনই তাঁর মেধাশক্তি ছিল! শেষ বয়সেও তাঁর আশ্চর্য্য স্মৃতি ও মেধার পরিচয় আমি সর্ব্বদাই পাইয়াছি। তিনি আরও সুযোগ পাইলে চিকিৎসা-জগতেও যে প্রথিতনামা ব্যক্তি হইতেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার অধ্যক্ষ ক্রম্বি (Crombie) এক সময়ে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতা শতমুখে সেই সুপণ্ডিত চিকিৎসকের প্রশংসা করিতেন। ৺কালীনারায়ণ রায় মহাশয় পিতার অভিভাবকস্বরূপে দেওয়ান সাহেবের ঢাকাস্থ হাবেলিতে থাকিতেন এবং তখনকার East পত্রিকা লিখিতেন। ঢাকা সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। সেখানে সে সময়ে যাঁহাদের সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তিনি পিতৃদেবের কেবল শিক্ষক ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু সন্তানবৎ স্নেহে তাঁহাকে দেখিতেন এবং সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতেন। তাঁহার পরিবার-বর্গের সহিত আমাদের সেই হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এসম্পর্কে পূজনীয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন; কারণ তাঁহার জীবনের প্রভাবও আমাদের পিতার জীবনে কার্য্যকারী হইয়াছিল। রায় মহাশয় আমাদের পরিবারের পরম বন্ধু ও উপদেষ্টা ছিলেন এবং আমার ন্যায় অযোগ্যের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ কত ছিল, তাহা ভাবিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করি। ঢাকার স্বর্গীয় গোপীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের সহিত আমাদের পরিবারের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ঢাকার ভাদ্রোৎসব তখনকার বিশেষ ঘটনা ছিল এবং বাবা প্রায়ই ময়মনসিংহ হইতে যাইয়া তাহা দুই একদিন হইলেও উপভোগ করিতেন। কাওরাইদে শ্রীযুক্ত স্যার কে, জি, গুপ্ত মহাশয়দের বাৎসরিক উৎসবেও প্রতি বৎসরই যাইতেন, এবং গুপ্ত পরিবারের সকলের সহিত সেকাল হইতে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল ; বিশেষতঃ স্বর্গগত পালি গুপ্ত মহাশয়ের পরিবারের সহিত।

(ক্রমশঃ)

নববিধানের উপাসনা—বিধান-প্রবর্ত্তককে গ্রহণ।

(৭ই ভাদ্র, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী ভাদ্রোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের আত্মনিবেদন।)

এই ব্রহ্মমন্দিরে যে দিন নববিধানের নব উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই সাম্বৎসরিক দিন অদ্যকার দিন। ইতিপূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি অনুসারে আমরা মুখস্থ উপাসনা করিতেছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক নূতন উপাসনা-প্রণালী আজ হইতে প্রবর্ত্তিত হইল। নববিধান যেমন সম্পূর্ণ এক নূতন বিধান, তাহার উপাসনা-সাধন প্রণালীও সম্পূর্ণ নূতন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনেরই উপাসনা ছিল। নববিধান পরিবারগত দলগত ভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীকে লইয়া ধর্ম্মসাধনের বিধান। এই জন্য নববিধানের উপাসনা-প্রণালীও দলগত সাধন-প্রণালী। তাই এই উপাসনার প্রণালীর ভিতর ধর্ম্মসাধনের সকল ভাব, সকল উপাদান একাধারে একত্রে সমাবিষ্ট করিয়া এই উপাসনা-প্রণালী রচিত হইয়াছে।

হিন্দু, খ্রীষ্ট, এসলাম, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শিখ ইত্যাদি সকল ধর্ম্মের, সকল সাধন, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ফকীরি,

শাস্ত্রপাঠ, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন সমুদয় এক সূত্রে গাঁথিয়া, সমন্বিত করিয়া, এই উপাসনা-প্রণালী স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা-প্রণালী আর কোথাও নাই।

নববিধান-সাধনের প্রধান উপায় উপাসনা। আচার্য্য যেমন বলিলেন, "এই উপাসনা আমরা করি না, ঈশ্বর আমাদিগকে করান" মা যেমন স্বয়ং শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া পরিপুষ্ট করেন, তেমনি স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপাসনা করান। উপাসনা মানে মার কোলে শিশুর উপবেশন, শিশুকে স্তন্য দিয়া মানুষ করানো, ইহাই যথার্থ উপাসনা।

যেমন পূর্ব্বে বলা হইল, নববিধানের উপাসনা যথার্থ সমবেত সমযোগে উপাসনা। এই উপাসনাকে সংকীর্ত্তনের উপাসনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংকীর্ত্তন যেমন একাকী হয় না, তেমনি আমাদের এই নববিধানের উপাসনাও স্বার্থপর ভাবে একাকী হয় না।

সে দিন যেমন প্রিয় ভ্রাতা বিধানমুরলী আবদার করিয়া বলিলেন, "তোমরা কেউ যোগ দেবে না, আর আমি একা চেচাইয়া মরিব, তা হবে না; একা কি সংকীর্ত্তনের উপাসনা হয়?" ঠিক কথা।

আমার শ্রীকেশবও বলিলেন, "ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারিল, নববিধানের আরম্ভে আর পারিল না। আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তাহারা কিসে আছে?"

বাস্তবিক সকলে সমবেত হইয়া সমভক্তিতে সমবিশ্বাসে, ভাবে প্রেমে ঐক্য হইয়া এই উপাসনা না করিলে, এ উপাসনাই হয় না। একজন উপাসনা করিতেছেন, আর উপাসকগণের কেহ কেহ অন্যমনস্ক হইয়া রহিয়াছেন। কেহ বা গল্প গাছা করিতেছেন, কেহ বা সংসারের ভাবনা ভাবিতেছেন, কিম্বা তুচ্ছ বিষয় লইয়া পরস্পরে বাগ্‌বিতণ্ডা বা বিচার করিতেছেন, কিম্বা ভগ্নীগণ বেশ ভূষার কথা লইয়া জল্পনা করিতেছেন। তাহাতে উপাসনার যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়, সংকীর্ত্তনের তাল কাটিয়া যায়। তাই আমাদের উপাসনা জমাট হয় না, ভাল লাগে না।

আবার পরিবার মধ্যে স্বামী হয়ত উপাসনা করিতেছেন, গৃহিণী রান্নাবাড়া সংসারের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, স্বামীর সহিত একত্রে উপাসনার সময় সুযোগই হয় না ছেলে মেয়েরাও নিজেদের খেলা ধূলা বা পড়াশুনা লইয়াই থাকে, উপাসনার ধার ধারে না। এরূপ হইলে কি নববিধানের পরিবার গঠন হয়? কিম্বা বৎসরে একদিন সপরিবারে মন্দিরে আসিলে কি উপাসনায় যোগ হয়? আবার যিনি বেদীতে উপাসনা করেন, তিনি যদি সমস্ত সপ্তাহ সপরিবারে ও সদলে উপাসনা সাধন না করেন, তিনিই বা কেমন করিয়া সেই উপাসনা করিবেন, যাহাতে সকলের সহিত মণ্ডলীগত সমযোগে উপাসনা হইবে?

এই সকল বিষয়ে আমাদের বিশেষ চিন্তা করা উচিত এবং এ সম্বন্ধে আমাদের যে অপরাধ হইতেছে, তাহার জন্য বিশেষ অনুতাপ করিয়া আমরা আজ সকলে প্রায়শ্চিত্ত করি। এই উপাসনাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনসাধনের একমাত্র উপায়। আমরা পাঠই করি, প্রসঙ্গই করি, বক্তৃতাই করি, প্রচারই করি, তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে; কিন্তু পরিবারগত ও মণ্ডলীগত একত্ব-সমাধানের একমাত্র উপায় এই নববিধানের সমবেত উপাসনা।

এই উপাসনার স্বরূপের মন্ত্র এবং সমবেত প্রার্থনা যেমন আমরা সমস্বরে উচ্চারণ করি, কিম্বা সুরে সুর মিলাইয়া সংগীত সংকীর্ত্তন করি, তেমনি উপাসনার সকল অঙ্গ, যিনি বেদীর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার সহিত শব্দে ও ভাবে এক হইয়া সাধন করিলে, তবে আমাদের যথার্থ উপাসনা সাধন হইবে। আমরা তাহা করিতেছি না বলিয়াই, আমাদিগের মধ্যে ভাবে ঐক্য হইতেছে না, আমাদের মণ্ডলীগত জীবনে জমাট বাঁধিতেছে না। যদি আমরা নিষ্ঠা ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত এই উপাসনা সাধন করি, আমরা নির্জ্জনে থাকি বা সজনেই থাকি, আর সংসারের কাজকর্ম্মেই থাকি, আমরা সমস্ত দিনই এই উপাসনা-সাধনে নিরত থাকিতে পারি।

নববিধানের উপাসনা-সাধন যেমন পরিবার এবং দলের সমযোগ সাধন বিনা হয় না, তেমনি নববিধানের প্রবর্ত্তক যিনি, তাঁহার সহিত সমযোগ বিনাও ইহা পূর্ণরূপে সাধন হইবার নয়। পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, নববিধানের উপাসনা সংকীর্ত্তনোপাসনা; সঙ্গীত এবং সংকীর্ত্তন করিতে হইলে যেমন পরস্পরের সুরে সুর মিলা প্রয়োজন, তেমনি হারমনিয়ামাদি যন্ত্রেরও সহায়তা আবশ্যক। বাস্তবিক নববিধান-প্রবর্ত্তককে বিধাতা মূর্ত্তিমান উপাসনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এই উপাসনা কেবল সুবুদ্ধি-রচিত নহে, ইহা শাস্ত্রবিচার-সিদ্ধও নয়; নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্র নিজ জীবনে সাধন করিয়া, আত্মচরিত্রগত করিয়া ইহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

হারমনিয়াম যন্ত্রে যেমন সাতটী সুর বাঁধা, তেমনি বিধাতা কেশবজীবনে এই উপাসনা বাঁধিয়া দিয়া, যেন মূর্ত্তিমান হারমনিয়ামরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া, তাঁহার সহিত সমযোগে, সমভক্তিতে ও সমবিশ্বাসে এই উপাসনা সাধন করিলেই, আমাদের ঠিক উপাসনা সাধন হইবে, অন্যথা হইবে না। কেন না, ইহাই বিধাতার বিধান।

বিধান মানিতে হইলে যেমন বিধাতাকে মানিতে হয়, তেমনি বিধান-প্রবর্ত্তককেও মানিতে হইবে। কেন না, বিধাতা বিধান-প্রবর্ত্তককেই বিধানের আদর্শরূপে বিধান-মূর্ত্তিমান করিয়া প্রেরণ করেন।

যুগে যুগে যখনি যে বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে, তখনি বিধাতা

সেই বিধানের বাহক করিয়া, এক এক জন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন; সেই সেই বিধানে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সাধনা, যাহা কিছু ধর্ম্মভাব, সকলই সেই এক ব্যক্তিতে মূর্ত্তিমান করিয়া বিধাতা পাঠাইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যেমন, এ বিধানেও তেমনি এক ব্যক্তিতে বিধান মূর্ত্ত হইয়াছে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

তবে তফাত এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যাঁহারা বিধান-প্রবর্ত্তক-রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শিষ্য প্রশিষ্যগণ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ ও পূজা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিধান যেমন নূতন বিধান, তেমনি বিধান-প্রবর্ত্তককেও নবভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান যেমন উপাসনা-সাধনের অঙ্গ, তেমনি ভক্তসাধন নববিধানের এক বিশেষ নূতন সাধন।

বর্ত্তমান নববিধানের প্রবর্ত্তক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান-প্রবর্ত্তক-দিগকে যেমন মানবজাতির আদর্শ মানুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন এবং নিজ জীবনে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ চরিত্র একাধারে সমন্বিত করিয়া আত্মস্থ করিয়াছেন, তেমনি আমাদিগকেও তাহা করিতে হইবে, ইহা শিখাইয়াছেন। আবার আর একদিকে মহাপাপী নারকী মানুষদিগের সহিত সহানুভূতি-যোগে এক হইয়া, পাপীদিগের সমজাতীয় মানুষ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

তাই শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, সক্রেটিস আমার মস্তক, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষিগণ আমার আত্মা, হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" আবার বলিলেন, "সমস্ত মানুষ আমাতে, আমি সকল মানুষেতে। আমি একজন পাপীর সর্দ্দার।" এইরূপে তাঁহাকে পাপী মানুষের আদর্শরূপেই বিধাতা নববিধানের মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাই বলিলেন, "এদের একটা দৃষ্টান্ত চাই। আমি কালো ছেলে মার কাছে দৌড়ে যাচ্ছি।"

এই জন্য নববিধানের মানুষ যদি আমরা হইতে চাই, তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাঁহাকে ছাড়িলে হইবে না। তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আমাদিগের কোনই আশঙ্কা করিবার নাই; তাঁহাকে মানুষ ছাড়া ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কেহই পূজা করিতে পারিবে না। তাহার পথ তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; অথচ বলিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িলেও চলিবে না, নব-বিধান-সাধনই হইবে না। যাঁহাকে যাহা দেয়, তাঁহাকে তাহা কেন না দিব?

এই জন্য তিনি জোর করিয়া বলিলেন, "আমাকে ছাড়ুক, শুখাইয়া যাইবে। যে সদল অখণ্ড, তাহাকে কি কেহ বিদল করিতে পারে? নারকী উদ্ধার হইতে পারে, ইহা যদি দেখিতে চাও, এই ভাইকে নাও, সঙ্গে রাখ।"

এই সকল উক্তির মর্ম্ম আজ আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলে আমরা যে শুখাইয়া যাইব, তাহার প্রমাণ কি আমরা হাতে হাতে পাইতেছি না? তবে কেন এখনও স্বাধীন স্বতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছাচারী হই?

নববিধান সদল অখণ্ড মানবত্বের বিধান। যিনি এই অখণ্ড মানবরূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িলে কেমন করিয়া আমরা অখণ্ড মানবত্ব লাভ করিব?

যিনি পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করিয়া, নারকী যে উদ্ধার হয়, তাহার আশা দিলেন এবং তাঁহাকেই আদর্শ দেখাইলেন, তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে আমরা নারকী কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব? আমাদিগকে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াই ত তিনি আপনাকে নারকীর শ্রেণীভুক্ত বলিলেন; তবে আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে না রাখিয়া বাঁচিব?

শ্রীকেশবচন্দ্র যে তাঁহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া সকল মানুষকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা একটী বিশেষ সাধন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বলে, যদি কাহারও রক্তহীনতা হয়, কোন সবল ব্যক্তি তাঁহার শরীরের রক্ত সঞ্চার করিলে সে সবল ও সুস্থ হয়। পূর্ব্ব যুগে ব্রহ্মপুত্র ঈশা তাঁহার পুণ্যময় রক্ত সঞ্চার করিয়া পাপ-রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীকেশবচন্দ্র কেবল তাঁহার শুদ্ধ রক্ত আমাদের পাপরুগ্ন শরীরে সঞ্চার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; কেন না, তাহাতে স্বতন্ত্রতা থাকে। মা যেমন গর্ভস্থ শিশুকে রোগ-মুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ঔষধ সেবন করেন, তেমনি শ্রীকেশব পাপরুগ্ন আমাদিগকে সুস্থ করিয়া পরিবর্ত্তিত জীবন সঞ্চারের জন্য, একেবারে তাঁহার সমযুক্ত এক অঙ্গ করিয়াছেন। ইহা সামান্য কথা নয়।

শুনিতে পাই, এক কাফ্রির কাল চামড়া কোন শ্বেতকায়ায় সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরে সেই কাল চামড়া সাদা হইয়া যায়। কাচ পোকা যেমন তেলা পোকার সহিত মিলনে, তেলা পোকা কাচপোকা হইয়া যায়, তেমনি কেশবের অঙ্গে গাঁথা হইয়া আমরা এক অখণ্ড কেশব বা নববিধানের মানুষ হইয়া যাইব, ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়। আমরা কি ইহা বিশ্বাস করিব না?

সহজ উপাসনা-সাধন-সম্বন্ধে যেমন, নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবগ্রহণ-সম্বন্ধেও আমরা যাহা অপরাধ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি এবং তাঁহার অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া, আমরা সদল অখণ্ড একখানা নববিধানের মানুষ হই। অদ্যকার উৎসবে মা আমাদিগকে ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

—•—

নববিধান পাব্লিকেশন কমিটী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে "নববিধান পাব্লিকেশন কমিটী" প্রতিষ্ঠিত হয়। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের এবং অন্যান্য প্রেরিত প্রচারক ও কর্ম্মীদের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা, বিক্রয় করা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করাই কমিটীর উদ্দেশ্য।

প্রথম বৎসরে মণ্ডলীর অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি কমিটীর সভ্যরূপে মনোনীত হন। ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ ও শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কমিটীর যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং বিগত ছয় বৎসর তাঁহারাই এই পদে নিযুক্ত আছেন। প্রতিবৎসর মণ্ডলীর বাৎসরিক সভায় নূতন করিয়া কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

কমিটী যখন গঠিত হয়, তখন তাঁহাদের হস্তে কোন অর্থ কিম্বা কমিটীর স্বত্বসম্বলিত কোন গ্রন্থ ছিল না।

ভগবানের অসীম দয়ায় গত ছয় বৎসরের মধ্যে কমিটী নিম্নলিখিত পুস্তিকা ও গ্রন্থাবলীর মুদ্রণের ও প্রকাশের অনুমতি লাভ করেন এবং প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। বর্ত্তমানে কমিটীর হস্তে প্রায় ১০০০০৲ মূল্যের নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুচবিহারের পরলোকগতা মহারাণী সুনীতি দেবী প্রায় ৫০০০৲ মূল্যের আচার্য্যদেবের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী কমিটীকে বিক্রয়ার্থ দান করিয়া যান। এই সমস্ত পুস্তকাবলী, আলমারী ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সম্পত্তি। এই পুস্তকাবলী বিক্রয়ের আদায় পত্র নববিধান গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্য ব্যয় করা হইবে।

মণ্ডলীর যুবকদিগের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ফলে গত ছয় বৎসরে কমিটী প্রায় ২২৭৭৲ মূল্যের পুস্তক নগদ বিক্রয় করিয়াছেন। *

পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং বিভিন্ন ফণ্ডের ও মণ্ডলীর কোন কোন মহাত্মা দাতার সাহায্যে কমিটী পুস্তকাদি মুদ্রণের, পত্রিকাদিতে বিজ্ঞাপনের, সহকারীদের মাহিনা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ সমস্তই শোধ করিয়াছেন; এবং সুখের বিষয় যে, এত গুলি পুস্তক ছাপাইয়াও কমিটীর কোন দেনা নাই।

কৃপাময়ের কাছে কাতর প্রার্থনা, "কমিটী" উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী বংশ দলে দলে আসুন—তাঁহারা নববিধান-সাহিত্য পাঠ করুন। তাঁহারা এই সব অমূল্য গ্রন্থাবলী স্কন্ধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ফেরী করুন এবং সমস্ত জগতে প্রচার করুন।

* সর্ব্বশুদ্ধ বিক্রয় ৪১৮৯৲; ইহার ভিতর কিছু আদায় হইয়াছে, বাকীর কতক আদায় হইবে, এবং কতক কমিশনাদি বাবদ বাদ যাইবে।

কমিটীর প্রকাশিত পুস্তিকা ও গ্রন্থাবলীর তালিকা—

১৯৩০খৃঃ—

(১) বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ (আচার্য্য কেশবচন্দ্রের একটী অপ্রকাশিত উপদেশ)

১৯৩১খৃঃ—

(২) Life and Teachings of Keshub Chunder Sen by P. C. Mozoomdar (Remaining copies of 2nd Edn. which were purchased by us along with the copy-right).
(৩) Language of the New Dispensation (a chapter from the Faith and Progress of the Brahmo Somaj by P. C. Mozoomdar).
(৪) Jottings (From the Minister's writings).
(৫) Greetings (From the Minister's writings).
(৬) কেশব-চরিত—চিরঞ্জীব শর্ম্মা (৩য় সংস্করণ)

১৯৩২খৃঃ—

(৭) Classified list of Navavidhan Publications and Price list.
(৮) Complete list of the works of Rev. P. C. Mozoomdar.
(৯) To Young men of India (an unpublished lecture of Rev. P. C. Mozoomdar).

১৯৩৩খৃঃ—

(১০) True Faith (Perhaps the 15th Edn).—Sri Keshub Ch. Sen.
(১১) Oriental Christ (2nd Edn).—P. C. Mozoomdar.
(১২) ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন (দ্বাদশ সংস্করণ)
(১৩) Songs of Tomorrow by Lalit mohan Chatterji.
(১৪) The Lawgiver of Modern India (an unpublished lecture of Promotho Loll Sen.
১৫ Social Reformation in India (an unpublished lecture of Keshub Chunder Sen).
(১৬) নামমালা—মণিকা দেবী (collection of the names of God used by the minister).
(১৭) Complete price list of the works of Keshub Chunder Sen.
(১৮) Complete price list of the Works of Bhai Giris Chandra Sen.

১৯৩৪খৃঃ—

(১৯) Tri-colour Portrait of Minister Keshub Chunder Sen.
(২০) Spiritual Progress (Keshub Chunder Sen) —Sujata Devi.
(২১) গীতা অধ্যয়ন—অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের অপ্রকাশিত বক্তৃতা।
(২২) Faith and Progress of the Brahmo Somaj (2nd Edn.)—P. C. Mozoomdar.

(২৩) Selections from Gandhi—Nirmal Kumar Bose.
(২৪) Immaculate conception—Satyendra Ray.
(২৫) জীবনবেদ (৭ম সংস্করণ)

১৯৩৫খৃঃ—
(২৬) Heart-Beats (2nd Edn.).—P. C Mozoomdar.
(২৭) Brahmo Pocket Diary.
(২৮) Conscience and Renunciation (a translation of the minister's Sermon by J. K. Koar)
(২৯) Maharshi and Brahmananda (a translation of two documents by J. K. Koar)

১৯৩৬খৃঃ—
(৩০) স্ত্রীচরিত্র (৩য় সংস্করণ)—ভাই প্রতাপচন্দ্র
(৩১) সাধুসমাগম (৩য় সংস্করণ)—আচার্য্য কেশবচন্দ্র
(৩২) Brahmo Pocket Diary.
(৩৩) Catalogue of the Navavidhan Library and Free Reading Room.
(৩৪) কেশব-পরিচয়—অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যন্ত্রস্থ :—
(৩৬) সঙ্গত, ২য় ভাগ (অপ্রকাশিত আলোচনা)।
(৩৭) কোর্-আন্ শরীফ (৪র্থ সংস্করণ) ভাই গিরীশচন্দ্র সেনে কর্ত্তৃক মূল আরবী হইতে অনুবাদ।
(৩৭) Tour Round the World—P. C. Mozoomdar (2nd Edn.).
(৩৮) Lectures in England by K. C. Sen (4th Edn.).
(৩৯) আচার্য্য কেশবচন্দ্র (১২ খণ্ড)—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত (২য় সং)।

—o—

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ভবানীপুরে, ৫।১ মাধব লেনে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র সিংহের প্রথমসন্তান নবজাত শিশুকন্যার জাতকর্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৯ই আগষ্ট (২৪শে শ্রাবণ), রবিবার, জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

তীর্থ-সেবা—গত ২৬শে আগষ্ট, ভাই প্রিয়নাথ, ভ্রাতা ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের সহযোগে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে গিয়া মধ্যাহ্নে উপাসনাদি করেন, এবং ব্রহ্মানন্দতীর্থসমাগম সাধন করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও পাঠাদি করেন।

বিলাত-যাত্রা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, টাঙ্গুর (ব্রহ্মদেশ) য়্যাডভোকেট স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির তৃতীয়া কন্যা বহরমপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী রমা ব্যানার্জি (B.A.,B.T.) লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ট্রেণিং বিষয়ে M.Ed. ডিগ্রীলাভের জন্য, গত ২২শে আগষ্ট, বোম্বে হইতে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। গত ১৯শে আগষ্ট, কলিকাতায় ২২নং নিউরোডে শুভযাত্রার পূর্ব্বে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। তিনি এই শুভযাত্রাকালে স্বর্গীয়া ভগ্নী বিনীতার স্মরণার্থ পুরী প্রেমাশ্রম ফণ্ডে ১০৲ এবং স্বর্গীয় পিতৃদেবের জন্মদিনের পুণ্যস্মৃতিতে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমজননী তাঁহার প্রিয়তম কন্যাকে বিদেশে প্রবাসে মঙ্গল কল্যাণে রক্ষা করিয়া, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া, দেশে নিরাপদে প্রত্যানয়ন করুন।

উদার দান—আমাদের নিষ্ঠাবতী আদরের কন্যা শ্রীমতী বিভা মুখার্জি তাঁহার পরলোকগত স্বামী শ্রীমান্ কাপ্তান কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতিকল্পে প্রায় তাঁর সর্ব্বস্ব এককালীন ২৩০০০৲ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ে দান করিয়াছেন। শ্রীমান্ কল্যাণকুমার গত ইউরোপীয় ভীষণ যুদ্ধকালে সৈনিক বিভাগে চিকিৎসকপদে গমন করিয়া শত্রু কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হন এবং সেখানেই প্রাণ দান করেন। বীর স্বামীর প্রতি ভক্তিনিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিণীর এ সহৃদয় দানশীলতা আমাদের নববিধান-পরিবারের মুখ যথার্থই উজ্জ্বল করিয়াছে। ইনি আমাদের প্রিয়তম আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা সতী সাবিত্রী দেবীর ও কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যমা কন্যা। মা বিধানজননীর অজস্র আশীর্ব্বাদ তাঁহার কন্যার মস্তকে বর্ষিত হউক।

আরোগ্য—গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ১নং ফেডারেশন রোডে, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী দীপ্তিমা সেনের কঠিন রোগ হইতে আরোগ্যলাভ উপলক্ষে, ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতাদানসূচক উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার স্নেহের কন্যাকে নূতন জীবন দান করুন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ২৩শে জুলাই, মহারাজকুমারী স্বর্গীয়া প্রতিভাসুন্দরীর সাম্বৎসরিক দিনে, প্রাতে সমাধিপার্শ্বে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ঐ স্থলে দরিদ্র বিদায় হয়। ২৯শে জুলাই, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় করুণাকুমারের সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনাদি হয়। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা, ১৬ই মধ্যাহ্নে কেশবাশ্রমে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ১৭ই প্রাতে কেশবাশ্রমে উপাসনা হইয়া শান্তিবাচন হয়। মহেশ বাবুই এ সকল উপাসনা করেন।

কেশব একাডেমী বিল্ডিং ফণ্ড—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, প্রিয় ভ্রাতা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ

সেনের পুত্রগণ তাঁহার ইচ্ছানুসারে "কেশব একাডেমী বিল্ডিং ফণ্ডে" ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কৃপাময় হরি এ দান সার্থক করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, ময়মনসিংহে, ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ গম্ভীরভাবে, অথচ বিশেষ সমারোহের সহিত পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে পবিত্র ভস্ম-স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" সঙ্গীত করিতে করিতে ভস্মাধারহস্তে জ্যেষ্ঠপুত্র সহ সকলে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ নবসংহিতার প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে ভস্মাধার স্থাপন করেন। তৎপর সভাস্থলে উপস্থিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। বৈদ্যনাথ বাবু সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর কাল তথায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়াছেন। তত্রত্য সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহার বরাবর সম্প্রীতি ছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কাহারও সঙ্গে তাঁহার কোন মনোমালিন্য বা বিরোধ হয় নাই, সকলেই তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্যে এবং ধর্ম্ম কর্ম্মের উদারতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। অনেকেই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন এবং পিতৃতর্পণোদ্দেশে পুত্রকন্যাগণের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোকভার বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তভাবে আরাধনা ও শেষ প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উদ্বোধন ও অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন, ঢাকার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস শাস্ত্রীয় শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। পুত্র কন্যাগণ মধুর সংগীত করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ রায় পিতৃজীবনী পাঠ করিয়া নবসংহিতা হইতে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের লিখিত পিতৃজীবনীর কিয়দংশ এবার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বিপদভঞ্জনী তাঁর বিশ্বাসী কর্ম্মী পুত্রকে নিত্যস্নেহক্রোড়ে স্থানদান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—গত ৬ই সেপ্টেম্বর, পূর্ব্বাহ্নে ৯৯।১এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ হরিসুন্দর দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃব্য স্বর্গীয় ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধের দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ হরিসুন্দর দাস প্রার্থনা করেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত ও শোকসহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে নিম্নস্থ দুটী পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, জামসেদপুরে, পৌত্রের কর্ম্মস্থলে, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী মানম বোস ইহলোকের রোগযন্ত্রণা ও শোকতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমজননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের ভিতর থাকিয়া গভীর নিষ্ঠার সহিত নববিধান ধর্ম্ম সাধন করা, একে একে সব সন্তানদিগকে বিদায় দিয়া অম্লানবদনে সে শোকভার বহন করা, বার্দ্ধক্য ও রোগজনিত কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করা, গরিব দুঃখীর উপকার করা, কে কোথায় শোকেতাপে মুহ্যমান, তাঁদের খোঁজ খবর লওয়া এবং উপাসনা ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া তাঁদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়া তাঁর জীবনের বিশেষত্ব ছিল। ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রভৃতির সহিত তাঁহার জীবনের বিশেষ যোগ ছিল; এখন স্বর্গধামে তাঁদের সহিত মিলিত হইয়া এবং তাঁর সব প্রাণের হারানধনগুলিকে পাইয়া কতই না আনন্দিত।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার প্রাতে, কলিকাতায় পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত অশীতিপর সুদীর্ঘ জীবনে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে চরিত্রের মাধুর্য্য ও সৌগন্ধ বিস্তার করিয়া অনন্তধামে আনন্দময়ী মার ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

পরমজননী পরলোকগত আত্মাদের নিত্যস্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

মাসিক স্মৃতি—স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের মাসিক স্মৃতি উপলক্ষে, গত ২৮শে আগষ্ট, হাওড়ায় তাঁদের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৪শে আগষ্ট, স্বর্গগত শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, কলিকাতায় ২৩।১ডি ফার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত মনোরথ ধন দের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মনোরথ বাবু ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করেন। অদ্য বাঁকিপুরেও উপাসনাদি হইয়াছে। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমলতা চন্দ এই উপলক্ষে বাঁকিপুর অঘোরনারী সমিতিতে ॥০ আনা ও নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসবে ॥০ আনা, কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসবে ২৲ ও সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে আগষ্ট, গৃহস্থবৈরাগী স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বসন্তকুমারীর পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন ও ভাই প্রিয়নাথ পরলোকগতা ভগ্নীর আত্মার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৫শে আগষ্ট, পরলোকগত ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, ৪০।১এ মনোহর পুকুর ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতার (স্বর্গীয় সতীশ-

চন্দ্র দত্তের সহধর্ম্মিণীর) সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর, হাওড়ায়, ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোডে, স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করা হইয়াছে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভাই প্রিয়নাথের স্বর্গীয় পিতৃদেব গঙ্গানারায়ণ দেব মল্লিকের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, পুরী নব-পর্ণকুটীরে দুইবেলা বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, সেবিকা হেমন্তকুমারী পাঠাদি করেন এবং ভ্রাতা ভগবৎ সিংহ সঙ্গীত করেন। শ্বশুরদেবের স্মৃতিতর্পণে সেবিকা হেমন্তকুমারী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৩২নং রাসবিহারী এভিনিউতে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের গৃহে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবীর (শ্রীমান্ সুনন্দন রায়ের মাতৃদেবী) সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে প্রাতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

দান-প্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

জুলাই, ১৯৩৬—নববিধান ট্রাষ্ট সরলা খাস্তগীর স্মৃতিভাণ্ডার হইতে সাম্বৎসরিক স্মৃতিতে ৪৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখিরাম আদভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার দাস মা ও ঠাকুমার সাম্বৎসরিকে ৫৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস মেজো ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধে ৪৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ সরকার এককালীন দান ২৲ ও মাতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীমান সন্তোষ-কুমার দাস পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী সুধাংশুবালা ধর পিতৃ-সাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ১৭৷৹, স্বর্গীয় দেবী দত্ত ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ২১৲, স্বর্গীয় জগদীশ গুপ্ত ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ৮৶৹, স্বর্গীয় কানাইলাল সেন ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ১৭৷৹, স্বর্গীয় তুকড়ি ঘোষ ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ৫।৹, স্বর্গীয় ভুবনমোহন ঘোষ ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ৩৷৹, স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ৩৷৹, স্বর্গীয় নলিনীবালা বানার্জ্জি ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ২৷৹, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দত্ত ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ১৶৹, স্বর্গীয় সুরমা দত্ত ফণ্ডের ষাণ্মাসিক সুদ ১৶৹, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী স্বামীর সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত অনিয়কুমার মুখার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীর মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান দুইমাসের ২৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেন পত্নীর দ্বিতীয় সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মাতৃদেবীর আরোগ্যলাভে ৫৲, শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মিত্র পিতৃশ্রাদ্ধে ৫৲, শ্রীমতী স্নেহলতা রায় স্বর্গীয় পুত্র মনোজিতের প্রথম সাম্বৎসরিকে স্থায়ী ফণ্ডরূপে ২৫৲, শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে স্বর্গীয়া ভগ্নী প্রেমলতা দেবের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ স্বর্গীয় ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী বনলতা দে স্বর্গীয়া ভগ্নী প্রেমলতা দেবের সাম্বৎসরিক ৫৲ টাকা।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ জন্য এ পর্য্যন্ত যে টাকা হস্তগত হইয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছি :—

রায় সাহেব ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও (মসলিপটম্)—১০০৲, জনৈক ভদ্রমহিলা—২০৲, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম দফায়) ৫০৲, Lt. Col. জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) (প্রথম দফায়) ২০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০৲।

নিম্নলিখিত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে :—

মিঃ প্রবোধচন্দ্র দত্ত ৩০০৲।

মিঃ প্রবোধচন্দ্র দত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে সুন্দর চিঠি লিখেছেন, তার অবিকল নকল নিয়ে দেওয়া গেল :—

63 Northampton Road
Croydon (Surrey), England.
24 July, 1936.

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'নববিধান' পত্রিকায় উপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নূতন সংস্করণের নিবেদন পড়লাম। আপনার এই অশ্রান্ত উদ্যম ও উৎসাহ দেখে আশ্চর্য্য হই। ভগবান আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রম সফল করুন, এই হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা। আমাদের অনেকেরই জীবন, উপাধ্যায় মহাশয়, গিরিশবাবু, ঠাকুরদাদা ও অন্যান্য পূজনীয় মহাজনদের পুণ্যস্মৃতিতে আজও জড়িত রয়েছে; তাই তাঁদের কথা মনে করে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপনার এই মহৎ উদ্দেশে আমি ৩০০৲ ছাপানর হিসাবে দিতে চাই। অনুগ্রহ করে জানালেই আমি টাকা পাঠিয়ে দেবো।

আপনাদের স্নেহের
প্রবোধ

"জ্ঞান কুটীর", নিউকাটরা; এলাহাবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪৩সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd. October, 1936. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে অদ্ভুতকর্ম্মা পরম দেবতা! বাহ্য জগৎ তোমার অদ্ভুত কর্ম্মের ভূরি ভূরি পরিচয় দান করে। বাহ্য জগতের সকলই কিন্তু সীমাতে আবদ্ধ। অন্তর্জ্জগতের, আত্মিক রাজ্যের সকলই অসীম। আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপারে তোমার যে কি অদ্ভুত লীলা, তাহার আদি অন্ত কেহই খুঁজিয়া পায় না। সঙ্গীতে শুনি, "হরি, তোমার লীলা বুঝা ভার"—সত্যই তোমার লীলা বুঝা ভার। বর্ত্তমান যুগ বাহ্যভাবে কত শিক্ষা সভ্যতা ও জ্ঞান-কৌশলের যুগ। এ যুগ কত নব নব আবিষ্কারের যুগ, কত উদ্ভাবনের যুগ। বাহিরের শিক্ষা সভ্যতা, নব নব আবিষ্কার, নব নব উদ্ভাবনী শক্তিতো এ যুগকে অদ্ভুত নবযুগ করিয়াছে, অদ্ভুত কর্ম্মের যুগ, বাহ্য জগতে অদ্ভুত লীলার যুগ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক জগতে এ যুগ যে নব নব আবিষ্কারের যুগ, নব নব উদ্ভাবনের যুগ হইবে, তাহাতো অতি স্বাভাবিক। নব যুগে নবধর্ম্ম নববিধান আত্মিক রাজ্যে কি নব নব আবিষ্কারের যুগ, নব নব উদ্ভাবনের যুগ নহে? এই নব-যুগ ধর্ম্মে শাস্ত্রগ্রন্থের ভিতর দিয়া নহে, কেবল প্রার্থনা, উপাসনাদি-যোগে তোমার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ভিতর দিয়া, তোমার শিক্ষা ও পরিচালনের ভিতর দিয়া, কত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, কত নব নব সাধন উদ্ভাসিত হইল, অতীতের সকল সাধনা, সকল শাস্ত্রের সম্মিলনে এক মহা ধর্ম্মসাধনার পথ খুলিয়া গেল। সকলই সম্ভব হইয়াছে তোমার কৃপাগুণে, সকলই সম্ভব হইবে তোমার কৃপাবলে। কিন্তু কৃপার পথ যে বিশ্বাসের পথ, সরল সহজ, স্বাভাবিক ভাবের পথ। আমরা নব যুগে নব শিক্ষা সভ্যতার অধীন হইয়া, ভিতরে ভিতরে কত ক্ষীণ বিশ্বাসী, কত অবিশ্বাসী হইয়াছি, কত তর্কতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছি, কত কুটিলতা, জটিলতা আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করিয়াছে। জীবনের এই গঠন লইয়া, হে ধর্ম্মরাজ্যের অভিভাবক, গুরু ও পরিচালক! বল আমরা কিরূপে সরল সহজ বিশ্বাসে ব্রহ্মকৃপার পথ আশ্রয় করিব? আমাদের অন্তর প্রকৃতির প্রতিকূলতা জন্য কিছুতেই যেন ব্রহ্মকৃপার মহিমা গৌরব বুঝিতেছি না, ব্রহ্মকৃপার অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি, তুমি যখন আমাদের গুরু এবং পরিচালক, তখন তোমার পরিচালনে আমাদের জীবনে অসম্ভব সম্ভব হইবেই হইবে। তোমার কৃপাতেই তোমার কৃপা সম্ভূত এই অদ্ভুত বিরাট নববিধান ধর্ম্মের আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তোমার কৃপাতেই সাক্ষাৎ তোমার সং-

শোধনে আমাদের অন্তর প্রকৃতি অনুকূল হইবে, তোমার কৃপাতেই আমরা সরল বিশ্বাসের পথে ব্রহ্মকৃপার অধীন হইয়া, কেবল ব্রহ্মকৃপাবলে, আমরা অদ্ভুত নববিধান সাধন করিয়া ধন্য হইব, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাই তব পদে কাতর প্রার্থনা, তুমি আমাদিগকে সংশোধন করিয়া, সরল সহজ বিশ্বাসের জীবন দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মকৃপাপথের উপযুক্ত করিয়া লও। ব্রহ্মকৃপায় আমাদের জীবনে তোমার অদ্ভুত নববিধানের ধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক। তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হউক। নিজ কৃপাগুণে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রথম স্তরে তিনটী মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলী কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্"। গত ভাদ্রোৎসবের দিনব্যাপী উৎসবদিনের সন্ধ্যায় উপাসনাকালে "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই দুইটী মহাবাক্যের ব্যাখ্যা নববিধানের আলোকে যেরূপ তখন প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এই মহা বাক্যের ব্যাখ্যা সেদিন আমাদের তেমন করিয়া শুনিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তখনই প্রাণে এই মহাবাক্য সম্পর্কে বিশেষ ঝঙ্কার উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপর হইতে ঐ মহাবাক্য আমাদের স্মরণ মননের বিষয় হইয়াছে। পবিত্রাত্মার আলোকে "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এই মহাবাক্যের স্ফুরণ আমাদের অন্তরে যেরূপ হইতেছে, আমরা যথাসাধ্য তাহা পত্রস্থ করিয়া, প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলাম।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই দুই মহাবাক্যের যেমন বিশেষ ও ব্যাপক প্রয়োগ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছি, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এই মহাবাক্যের বিশেষ ও ব্যাপক প্রয়োগের আলোক এ সময়ে আমাদের অন্তরে যেরূপ উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহাতে আমরা আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইতেছি।

প্রকাণ্ড নবধর্ম্ম আমরা পাইয়াছি, কিন্তু আমাদের এই ধর্ম্মের সাধকমণ্ডলী এখনও মুষ্টিমেয়। বর্ত্তমানে আমাদের মণ্ডলী সেই অল্পসংখ্যকের মধ্যেও অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থিত; বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে ঐ অবস্থায় প্রাণে নিরাশা, অবসাদ সহজেই উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মসমাজের বাহিরের অবস্থা কি কখন কোন সমাজকে আশা বিশ্বাসে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে? ধর্ম্মসমাজের বাহিরের লোকসংখ্যা কি কোন ধর্ম্মসমাজে প্রকৃত বল, প্রকৃত গৌরবরূপে পরিণত হইয়াছে? কখনই নয়। অল্পসংখ্যক প্রকৃত সাধকের জীবনে যে ধর্ম্মের উচ্চ প্রকাশ, বিকাশ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি, তাহার উপরই প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজের গুরুত্ব এবং গৌরব।

সাধকের জীবনে প্রকৃত আশা এবং বিশ্বাসের ভূমি কোথায়? সাধক যতই কেন নগণ্য হউন না, কিন্তু তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কৃপালব্ধ আলোকই সম্বল ও সম্পদ; তাহাই কি তাঁহার জীবনের আশা বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমি ও উৎস নহে? প্রেমময় ঈশ্বর তাঁহার আশ্রিত সাধকদিগকে ধীরে ধীরে তাঁহার আপনার স্নেহ-বক্ষে টানিয়া লন; তাঁহার স্নেহ করুণা প্রদর্শন করিয়া, তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের আপনার, তাহা আপনার আচরণে প্রতিপন্ন করেন। এইরূপে তাঁহার কৃপা যে প্রত্যেক সাধকের একমাত্র সম্বল, তাহা তিনিই বুঝিতে দেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ব্রাহ্ম, ধর্ম্মের যে কোন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করি, সকলেরই সম্বল ঈশ্বর-কৃপা।

কিন্তু ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস এবং বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, অতীতে এবং বর্ত্তমানে অনেক সাধক ঈশ্বর-কৃপার পথ আশ্রয় করিয়া চলেন নাই ও চলেন না। ধর্ম্মপথে প্রাচীন কালে কত কৌশলের পথ, কত মানবীয় বুদ্ধির পথ অবলম্বন করিয়া লোক সকল সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভবেনা; তবে কুম্ভক, প্রাণায়াম, পাতঞ্জললিখিত ত্রাটক যোগ প্রভৃতি এবং কৃচ্ছ্র সাধনমূলক ঊর্দ্ধবাহু, হেটমুণ্ড অবস্থার সাধনা প্রভৃতি সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য। অন্য দেশের কথা দূরে থাক, শুধু ভারতের বিশেষ বিশেষ প্রাচীন সম্প্রদায়ের কথা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, বিশেষ ভাবে এখনও হিন্দুসমাজে যেরূপ মূর্ত্তিযোগে পূজা পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে, তাহা তো ব্রহ্ম-

কৃপার পথ নহে, কৌশলের পথ। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" সাধকের হিতের জন্য, সাধকদিগকে কৌশলের পথ শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া মূর্ত্তিযোগে পূজা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় যদি প্রকৃত বিশ্বাস থাকিত, ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভরই পরিত্রাণের একমাত্র পথ, মঙ্গলের একমাত্র উপায়, এ ধারণা যদি প্রবল থাকিত, তবে কল্পনার পথ আশ্রয় করা কখনই হইত না। ধর্ম্মের পথে মানুষ যতই কেন মানবীয় বুদ্ধি কৌশল অবলম্বন করুক না, সে পরিণামে দেখিতে পায়, প্রকৃত পরিত্রাণপ্রদ, মুক্তিপদ ধর্ম্মের পথ, স্বয়ং ঈশ্বরের প্রবর্ত্তিত পথ। মানবীয় কৌশলের পথে, বুদ্ধির পথে, পরিত্রাণের ধর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম সাধন হয় না। পরিণামে সকলের পক্ষেই ব্রহ্মকৃপার পথই একমাত্র পথ। মানুষ ধর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি কৌশল আশ্রয় করিয়া নব নব সাধন-পথ উদ্ভাবন করিয়াছে, অনেকে বুজরুগির পথ উদ্ভাবন করিয়া লোকের মন হরণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু পরিমাণে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, যথার্থ পরিত্রাণের পথ, আত্মার সদ্গতির পথ স্বর্গের স্বয়ং ঈশ্বর-প্রদর্শিত পথ।

সাধু মহাজনগণ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া একমাত্র তাঁহার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিয়াছেন, জগৎকে সেই পথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর-কৃপাই একমাত্র সম্বলের বিষয় ছিল।

নববিধানে ব্রহ্মকৃপার বিশেষত্ব কি? অতীতের বিশেষ বিশেষ সাধু মহাজন-প্রদর্শিত এক একটী পথও ব্রহ্মকৃপার পথ। ব্রহ্মকৃপা অনুসরণ করিয়া জীবনব্যাপী সাধন দ্বারা সাধক সেই একটী পথে যাহা কিছু প্রার্থনীয় পাইয়াছেন। নব যুগধর্ম্মপথে আমরা অতীতের সকল ধর্ম্মপথের সমন্বয়সাধনে সকল ধর্ম্মের ফল জীবনে লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইব; অতীতে একটী মহাজনের জীবন অনুসরণ করিয়া, একটি মহাজনের জীবনের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া, মানুষ আপনাকে কত কৃতার্থ মনে করিত; এখন একজন নয়, দুইজন নয়, ঈশ্বর-প্রেরিত অতীতের বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের সাধু মহাজন যাঁহারা আসিয়াছেন ও আসিবেন, সকলকে জীবনে গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইব, ইহাই নববিধানের বিশেষ লক্ষ্য। "অনন্তের মহাপূজা অনন্ত আয়োজন, নিরখিয়ে ভরে মন সফল কর জীবন।"

নবযুগধর্ম্মে অতীতের বিভিন্ন ধর্ম্মধারার সমন্বয়-সাধনার কথা শুনিয়া, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সময়ের সকল সাধু ভক্তদিগের জীবন একাধারে গ্রহণের কথা শুনিয়া, তার্কিক জগৎ, সন্দেহ অবিশ্বাসে ক্লিষ্ট জগৎ বলে, এরূপ সাধনার পথ আকাশ-কুসুমের পথ; অল্পায়ুঃ মানবজীবনে, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর জীবনে কি এরূপ জটিল ধর্ম্মসাধন, এরূপ অসাধ্য সাধন সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু বিশ্বাসের পথে, ব্রহ্মকৃপার পথে অসম্ভব সম্ভব হয়। প্রাচীনকালে পরিত্রাণের বিধানগুলি ঈশ্বর-কৃপার বিধান হইলেও, অতীতে ব্রহ্মকৃপা মহাজনদিগের জীবনে যেমন অনুসরণের বিষয় হইয়াছিল, গুরুবাদের প্রাবল্যবশতঃ সাধারণ সাধক-শ্রেণীতে একমাত্র ব্রহ্মকৃপা তেমন অনুসরণের ও গ্রহণের বিষয় হয় নাই; তাই অতীতে বিশেষ সাধু মহাজনকে, বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থকে গণ্ডি করিয়া, ব্রহ্মকৃপা-সম্ভূত ধর্ম্মবিধানকেও গণ্ডিতে আবদ্ধ করা হইত। নববিধানে গুরুবাদের প্রাবল্য নাই, কোন মহাজনে বা সাধু ভক্তে ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ নহে, কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ একমাত্র অবলম্বনীয় নহে। সাধুভক্তদিগের সহায়তা আছে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর একমাত্র গুরু ও পরিচালক। ব্রহ্মকৃপা একমাত্র সম্বল। তাই নবযুগে ব্রহ্মকৃপার রাজ্য, ব্রহ্মকৃপার অদ্ভুত কার্য্য। ব্রহ্মকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতেছে; যাহা আকাশকুসুম, তাহা ধর্ম্মজীবনের সত্য জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানুষের প্রাণকে বিস্ময়ে পূর্ণ করিতেছে। ঈশ্বর অনন্ত, ব্রহ্মকৃপার ফলও অনন্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সশরীরে স্বর্গে যাওয়া।

"সশরীরে স্বর্গে যাওয়া, ইহার অর্থ কি? ইহা নহে যে, শরীর ব্রহ্ম-ভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে মুগ্ধ হইবে; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, শরীর থাকিতে থাকিতেই সেই আত্মা সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত থাকিবে। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকিবে; কিন্তু আত্মা সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস করিবে এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত থাকিবে।"

যথার্থ স্বর্গ কি ?

"যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে, যেখানে ভক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত হয়, এবং সহজেই সাধকের মন ঈশ্বরের নামগানে উন্মত্ত হয়, সেখানেই আমাদের দয়াময় পিতার স্বর্গ। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা এবং অনন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, যেখানে প্রেম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, যেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ। অতএব কেহই বহির্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না ; কিন্তু সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে।"

স্বর্গের সৌন্দর্য্য।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রসাদে এখন আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত নূতন রাজ্যের দিকে যাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই নূতন রাজ্যের প্রতি আমাদিগের তেমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল না। পথিকেরা যতই গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই সেই রাজ্য উজ্জ্বলতর দেখা যাইতেছে। দর্শন এবং শ্রবণ দ্বারা আমরা সেই রাজ্যের প্রমাণ পাইতেছি। দূর হইতে সেই দেশ দৃষ্ট হইতেছে এবং সেই দেশের শব্দগুলি ক্রমে ক্রমে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। যতই সেখানকার সুমধুর প্রেমধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ততই প্রতীত হইতেছে যে, আনন্দধামের নিকটে আসিতেছি। যাত্রীদিগের পক্ষে সেই সুখধাম, সেই প্রেমরাজ্য নিকট হইল। ব্রাহ্মসাধকদিগের পক্ষে মহাত্মাদিগের সহবাস মিষ্টতর হইতেছে, পরলোকের শোভা অধিকতর মনোহর হইতেছে এবং স্বর্গের প্রেমফুলের সৌরভ সাধকদিগকে আমোদিত করিতেছে। আগে কখনও কখনও দুই একজন সাধু আমাদিগের নয়ন-গোচর হইতেন, এখন কত যোগী ঋষিদিগের আশ্রমে, কত প্রেমিক ভক্তদিগের কুটীরে আমরা প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে স্বর্গরাজ্যের শোভা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইত, নয়ন সাক্ষ্য দান করিতে পারিত না, এখন প্রত্যক্ষরূপে স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতেছি। এখন স্পষ্টতররূপে ব্রহ্মদর্শন হইতেছে। ব্রহ্মসহবাস, সাধু-সহবাস মিষ্টতর হইতেছে।"

(কেশব)

পিতৃ-তর্পণ।

[গত ২১শে ভাদ্র, ময়মনসিংহে, স্বর্গগত ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের পিতৃদেব স্বভাবতঃ সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। সঙ্গীতাভিজ্ঞ ও সুরতানলয়বোধযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল। সঙ্গীত-রচনায় যেমন তাঁহার ক্ষমতা ছিল, তেমনি সুর-সংযোগে ও গান গাহিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রথম বয়সে তাঁর কণ্ঠস্বর নাকি অতি মিষ্ট ও উচ্চ ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা যখন তাহা শুনিয়াছি, তখনও তাঁর সঙ্গীত তালমানযুক্ত এবং কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও উচ্চ, এবং ভাবাবেশে তাহা চিত্তকে স্পর্শ করিত। ময়মনসিংহ নগরের রাস্তায় তাঁহার স্বরচিত কত কীর্ত্তন তিনি দলবল সহ নিজে প্রমত্তভাবে নৃত্য করিয়া গাহিয়াছেন, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বশতঃ অনেক প্রবন্ধাদি তিনি নানা বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর শেষ জীবনের লিখিত "হাফেজ" পুস্তক। পারস্য ভাষার প্রতি অনুরাগ তাঁহার চিরদিনই ছিল। প্রথম জীবনে দেখিয়াছি, তিনি বাইবেলের বিভিন্ন Edition সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। স্থানীয় ইংরেজ মিসনারীগণের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠভাব ছিল এবং তাঁহাদের সহিত বাইবেল পাঠ ও আলোচনা করিতেন। খ্রীষ্টানদিগের তিনি গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন, স্থানীয় খৃষ্টান মিশন বালিকা স্কুলের বোর্ডিংএর চিকিৎসক ছিলেন; তিনি ইহাদিগের নিকট হইতে যেমন, ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতেও কোনও ভিজিট কখনও লইতেন না। বাইবেল সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি বহু ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বড় বড় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের লিখিত পুস্তক তাঁহাকেই ক্রয় করিতে দেখিয়াছি। অন্যদিকে গীতার নূতন নূতন সংস্করণ তিনি প্রায়ই সুযোগমত কিনিতেন। তাঁহার পাঠলিপ্সা, বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ লিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন এবং তাঁহার কাব্য-প্রতিভাকে সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেন। পিতৃদেবের স্বরচিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে বহু সঙ্গীতের ভাষা ও ভাব উচ্চ কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে উপাসনার সময় রচিত একটী সঙ্গীতের চরণ এইরূপ সরলবিশ্বাস-প্রণোদিত :—

মন আমার হরিধামে যাবে যদি,
চলরে চলরে—
আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতনে রে—

যদি যাবেরে মন করেছ কামনা,

তবে ছাড় ছাড় সব অসার বাসনা,

বাসনা থাকিতে পাবে না হরি-দরশন রে।

আজ সব বাসনা-মুক্ত হইয়া সেই হরিধামে গিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন। তাঁর আত্মা সেই অমৃত ও শান্তি লাভ করুন, ইহাই ভগবানের চরণে প্রার্থনা ও দীনের নিবেদন। প্রায়ই ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতেন, সেই চিরপরিচিত গান—

"মনপাখী চল যাই ঘরে,

আর কি সুখ আছে থেকে দেহ-পিঞ্জরে।"

আজ সে পাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়াছে, সেই শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় পাবার উদ্দেশ্যে। আর একটী সঙ্গীতে আছে—

মাতাও মা প্রেমমদে।

প্রেমমদিরা-গন্ধে যে হয় হৃদয়—

চিদানন্দময়; সুরগণ সুধাবসে

সুধাসাগরে ভাসে, সেই বাসনা কাঙ্গালের—

প্রাণে উদয়। (সুধা-সাগরে সাঁতার দিতে গো)

কর মা পাগলপারা, যেন প্রাণ থাকিতে

হই সারা, (ওমা) ভবতারা তোমা ছাড়া নাহি হই।

মৃত্যুকালে পিতৃদেবের বয়স ৮২ বৎসর চলিতেছিল। কিন্তু তিনি নিয়মনিষ্ঠাগুণে এ যাবৎকাল সুস্থদেহেই ছিলেন। তিনি সদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও স্বভাবের আরও কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। তিনি যেমন একদিকে নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন, যাহা সাধারণতঃ একজন উচ্চ শিক্ষিত খাঁটী ইংরেজের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তেমনি তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর স্নানাদি আহার সম্বন্ধে শুচি ও বিশুদ্ধাচারী ছিলেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, পরিষ্কাররূপে স্নানাদি সমাপন এবং তৎপর ঈশ্বরোপসনার উপবেশন করা প্রাত্যহিক প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। তৎপর কিছু জলযোগ করিয়া কোট্, পেণ্ট, টুপি পরিহিত হইয়া সাইকেল-যোগে কার্য্যে বাহির হইতেন এবং প্রায়ই ২টার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিবার সময় পাইতেন না। এভাবে প্রায় ২০।২৫ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন। প্রভূত অর্থ পাইয়াছেন, অর্থলোভী না হইয়া। তাঁহার আহার সাধারণতঃ নিরামিষ ও অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার ছিল। তেমনভাবে আহার করিতে অল্প লোকেই জানে। তেমন তৃপ্তিবোধ করিবার ক্ষমতাও অনেকের জন্মে না। দধি আহার তাঁহার নিত্যনিয়মের মধ্যে ছিল, এবং দধিপ্রিয় এবং দধি-ব্যবস্থাপক ডাক্তার বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দ মহাশয়ের পত্নী স্বহস্তে দধি প্রস্তুত করিয়া ভগ্নীর ন্যায় স্নেহে পিতাকে প্রতি বৎসর একদিন দধি খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। পিতার ভদ্রতা ও সৌজন্য বাহিরের জিনিষ ছিল না; স্বভাবের ও প্রাণের জিনিষ ছিল। কেবল বাহিরের লোকের প্রতি ভদ্রতা নহে—পরিবারের সকলের প্রতি, এমন কি সন্তানসন্ততির প্রতিও ভদ্র-ব্যবহারের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। রোগশয্যায় অর্দ্ধজ্ঞানে ডাক্তারদের বলিয়াছেন কবির ভাষায়, "আপনারা জীবনদাতা"। জ্ঞান তখন প্রায় নাই। বন্ধু কোনও ব্যক্তিকে উঠিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "Thank you very much"। কেহ আসিলে ক্ষীণ হস্ত তুলিয়া নমস্কার, যাওয়ার সময় আবার নমস্কার। "বসুন" জ্ঞানহীন যখন, তখনও কেমন করিয়া কোন্ সৌজন্যের মূর্ত্তি—তিনি, যিনি বলিলেন। "ওঁদের চা দেও"—বলিবার শক্তি নাই, তবুও বলিতেন। যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্নেহময় পিতার স্নেহে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি, তিনি আমাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য আমাদিগকে বহু ব্যয় করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ উন্নতি বা সাফল্য-লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই, ইহা আমাদের গভীর পরিতাপের বিষয়। তিনি যে কেবল পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে—কিন্তু আমার ভগ্নীদিগকেও তিনি উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। আমার ভগ্নী সুপ্রভাকে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ববঙ্গের বালিকাদিগের মধ্যে মেমদিগের পরিচালিত কলিকাতার Diocesan কলেজে ভর্ত্তি করিয়া, অন্যান্য ব্রাহ্ম ও হিন্দু মেয়েদের সেখানে প্রবেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সুপ্রভার বিলাতে গিয়া পাঠের সম্বন্ধে তিনিই বেশী উৎসাহী ছিলেন। তাহার অকাল বৈধব্যে পিতৃদেব মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। আমার অপর তিন ভগ্নীকে কলেজের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর কত উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল এবং তাহারাও কেহ বি, এ, পাশ, কেহ বা বি, এ, পর্য্যন্ত এবং আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। আমার পিতা যে সময়ে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তখন অত্যল্প লোকই সে বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিল। স্থানীয় বিদ্যাময়ী স্কুলের পূর্ব্বতন স্কুল আলেকজেণ্ডার বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি একজন সভ্য ছিলেন; বর্ত্তমানকালে রাধাসুন্দরী বালিকা স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, এবং আনন্দমোহন কলেজে মেয়েদের কলেজ ক্লাস খুলিবার দরখাস্তখানি তিনি টাইপ করাইয়া সকলের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া নিজে পেশ করেন। আজ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি ও স্বীকার করি যে, আমাদের শিক্ষার ও উন্নতির মূলে আমাদের পিতার আগ্রহ ও শিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি সাধারণের শিক্ষালাভের পক্ষপাতী ছিলেন। আমার ক্ষুদ্র জীবনের যাহা কিছু একটু শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের চেষ্টা, তাহার একমাত্র কারণ আমার পিতৃদেব। শিক্ষার জন্য তিনি যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তও অতি বিরল। প্রায়ই বলিতেন, আমার সময়ের ডাক্তার-

গণ প্রায় সকলেই লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছু রাখিতে পারি নাই। এ সম্পর্কে তিনি ডিব্রুগড় মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ডাঃ কালীমোহন সেন, ঢাকার নবাববাড়ীর ডাক্তার যোগেশচন্দ্র ঘোষ, মুন্সীগঞ্জের ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন মেডিকেল স্কুলে থাকাকালীন পিতার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। ডিব্রুগড়ের ব্রাহ্মসঙ্গত সভায় একদিন ডাঃ সেন বলিয়াছেন যে—আমার ঢাকায় পঠদ্দশায় একটী সমপাঠী যুবকের দৃষ্টান্তে আমার মন ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়, তিনি এখন ময়মনসিংহের ডাক্তার; তাঁর নাম বৈদ্যনাথ। শুনিয়াছি, মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণ সকলেই বাবার প্রতি সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিত। একথা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাবা ধন রাখিয়া যান নাই, কিন্তু যাহা অমূল্য, তাহাই রাখিয়া গিয়াছেন। দুই মাস পূর্ব্বে প্রথম রোগাক্রান্ত হন, তখনও তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। চিকিৎসকগণের চেষ্টা ও সেবা শুশ্রূষায় তিনি ঈশ্বরানুগ্রহে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু আবার হঠাৎ রোগাক্রান্ত হন।

পিতৃদেব কয়েকদিন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রহিলেন, ক্রমে তাহা গভীর সংজ্ঞাহীনতায় পরিণত হইল। চিকিৎসকগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। জ্বর বৃদ্ধি পাইয়া যেন হঠাৎ শেষমুহূর্ত্ত আসিল; আমরা তেমন প্রস্তুত ছিলাম না। কিছু বলিতে পারিলেন না, বলিবার চেষ্টা যদিও মাঝে মাঝে করিয়াছেন। পিতা! তোমার অব্যক্ত কথা আমাদের শুনতে দাও, এই অযোগ্যদিগের প্রতি তোমার স্নেহ কি শেষ হইয়া গেল? আজ তোমার আত্মিক বাণী শুনাইয়া, আত্মিক স্পর্শ দিয়া আমাদের প্রাণ শীতল কর। তোমার অযোগ্য সন্তানদের ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ্য অদেহী হইয়া গ্রহণ কর, এই বাসনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যৌবনের স্বপ্ন।

আমি নিষ্ঠাবান্ শাক্ত ব্রাহ্মণপরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বৈষ্ণব সমাজের প্রতি শাক্ত পরিবারের প্রকৃতিগত বিদ্বেষ দেখা যায়। জানিনা, কেমন করিয়া আমার মন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি চলিয়া পড়িল। তাঁহার চরিত্রবিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। যত অধ্যয়ন করি, ভক্তি ততই দৃঢ় হইতে থাকে। একদিন একটী পুস্তকে তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। একদিন তাঁহার ভক্তিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সেই পুস্তকটি লইয়া আমি আমার পিতৃদেবের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "বাবা! আশ্চর্য্য ভক্তি-স্রোতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে। আপনি একবার এই পংক্তিগুলি দর্শন করুন ও পাঠ করুন। তিনি বলিলেন, "কিসের ভক্তি?" আমি বলিলাম, "এরূপ ভক্তি আর কাহার হইতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যতীত।" তচ্ছ্রবণে পিতৃদেব আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, "শচীপিসির বেটার কথা আমার কাছে বলিস নে।" তাঁহার মনে যে এমন বিদ্বেষ ছিল, তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। তিনি পুস্তকের দিকে একবার তাকাইলেন না এবং আমাকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি করিতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নদীর স্রোত বাধা পাইলে যেমন দ্বিগুণ প্রবল হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিতে থাকে, আমার ভক্তি ও এই বাধা পাইয়া দ্বিগুণ প্রবল হইল; এবং সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমি ভক্তির পথে যাত্রা করিলাম। পিতৃদেবের যাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ছিল, আমি তাঁহাকেই ইষ্ট দেবতারূপে গ্রহণ করিলাম। মনে হইল, পুস্তক পড়িয়া যদি এরূপ ভক্তির অবস্থা হয়, তবে যেখানে লীলা করিয়াছেন, সেখানে না জানি কতই শিখিবার আছে। তখনও আমার বয়স কম। একটী বাল্য বন্ধুকে লইয়া আমি নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম। সেখানে তাঁহার কোথায় কি লীলার কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুস্তকের মধ্যে দিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেখানে চাক্ষুষ ভাবে সব দেখিয়া আমার মনে নিরাশা উপস্থিত হইল। আমি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম। উৎসবের সময় ব্রাহ্মসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইলাম। একদিন মাঘোৎসবের সময় আচার্য্যদেব বিডনপার্কে বক্তৃতা করিতে থাকেন। দেখিলাম, তিনি নগ্নপদে এক খণ্ড মাত্র গৈরিক ধারণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাভাবে মগ্ন হইলেন এবং নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সকলের অগ্রে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মধুরকণ্ঠে সুন্দর সঙ্গীত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলে তাঁহার অনুসরণে নৃত্য আরম্ভ করিল। শ্রীকেশবচন্দ্রের সেই মহাভাবের উচ্ছ্বাস দেখিয়া সত্য সত্য আমার মনে হইল যে, বঙ্গদেশে আবার শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি নবদ্বীপ যাইয়া যাহা দেখিতে পাইলাম না, শ্রীকেশবচন্দ্রের নৃত্যে তাহা দর্শন করিলাম। উৎসবের সময় সাধক কুঞ্জবিহারী দেব কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইতেন, এবং ভাবের সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিতেন। যাহারা সঙ্গে থাকিত, তাহারা সকলেই নৃত্যে যোগ দান করিত। সে সকল দৃশ্য দেখিয়া মনে হইত, যেন ধরাতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই সংগীত করিতে করিতে নৃত্য করিতেন।

একদিন সাধক রাজমোহন বসু মহাশয় নন্দবাবুর কোমর

ধরিয়া এমন ভাবের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সংগীত করিতে লাগিলেন, যাহা দেখিয়া সকলের মনে এক পবিত্রভাবের সঞ্চার হইল। একবার গাজীপুরে উৎসবের সময় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয় এমন নৃত্য আরম্ভ করিলেন, যাহা দেখিয়া আমাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া একবার একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন, আপনার হার্নিয়া আছে, নাচিতে নাচিতে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। ভাই অমৃতলাল উত্তর করিলেন, "আমারই মৃত্যু হইতে পারে, আর তোমাদের হইতে পারে না"। এই বলিয়া আবার নৃত্যে মগ্ন হইলেন। সাধু মৃত্যুগোপালও নৃত্য করিতেন। তাঁহার নৃত্য বড় গম্ভীর ও মিষ্ট ছিল। তাহা দেখিবার বস্তু। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে যুগ ব্রাহ্মসমাজের নৃত্যের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছেলে, বুড়ো, যুবা সকলেই নাচিত। এখন ব্রাহ্মসমাজের শুষ্ক অবস্থা হইয়াছে। উৎসবের সময় কীর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু সেই ভাবোন্মত্ততা এবং ভাবের সেরূপ মাদকতা আর দেখা যায় না। আমার বাল্য প্রকৃতিতে এই নৃত্যের ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। আমিও নদীর কলোচ্ছাস শুনিয়া নৃত্য করিতাম, গাছের ফুল দেখিয়া আমার নৃত্যের ভাব উদয় হইত। মানুষের মন নাচে, শরীর মনের অনুগমন করে; যাহাদের মন নাচে না, অথচ নৃত্য করে, সে নৃত্য দেখিয়া লোকের ভাবোদয় হয় না।

একদিন রাত্রি ১২টার সময় শ্রীকেশবচন্দ্র কয়েকটি সাধকের সঙ্গে মিলিত হইয়া "আমায় দে মা পাগল করে" এই সঙ্গীত করিতে প্রমত্ত হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরের অধিক; কমল-কুটীরের বাহিরে রাস্তা হইতে একটী লোক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আর তোমাকে কি পাগল করিবে? তুমি বড় মানুষের ছেলে, একটী কৌপীন মাত্র পরিয়া ভাবের ঘোরে পাগল হইয়াছ; এর চেয়ে আর কি পাগল করিবে? ভাই উমানাথও কীর্ত্তনের সময় ভাবে মাতিয়া উঠিতেন। এ শুষ্কতার যুগে সে ভাবের বিকাশ দেখা যায় না। প্রাচীন ভাবকে আবার পুন-র্জীবিত করিতে হইলে, সাধকের কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ভক্তিও জ্ঞানের মত উপার্জ্জনীয় বস্তু, কয়েকটি বিশেষ উপায় ভক্তি-সাধনের জন্য অবলম্বন করা ভাল; যথা—(১) সাধুসঙ্গ, (২) ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ, (৩) ভক্তচরিত্র চিন্তা, (৪) নামসংকীর্ত্তন, (৫) আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম্ম সকল বিষয়ে শুদ্ধতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সকল উপায় ভক্তিসাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

দিনের পর দিন চলে যায়, কত প্রাণের প্রিয়জন কোন অজানার অন্তরালে লুকিয়ে পড়েন, তাঁদের সুন্দর দেহ ভস্ম হয়ে ধূলায় মিশিয়া যায়, তখন থাকে কি? থাকে কেবল স্মৃতি এবং ভালবাসা। সেই স্মৃতি ও ভালবাসা টুকু প্রাণের মধ্যে লইয়া যতটুকু শান্তি সুখ পাওয়া যায়। যখন আমাদের দেশে সহমরণের প্রথা ছিল, তখন নারীজীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল পতিসেবা। পতিব্রতা সতী অনায়াসে নিজেদের নশ্বর দেহ স্বামীর চিতায় ভস্ম করে ফেলিতেন। ইহাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত উদ্যাপন। কি সুখের মিলন! কেবল পৃথিবীতে নয়, কিন্তু অনন্ত মিলনে মিলিত হয়ে সেই বিশ্বনাথের চরণে স্থান পাইতেন।

হরিদ্বার কনখালে দক্ষরাজপ্রাসাদের পার্শ্বে কত সতীদাহের উপর সমাধি স্থাপিত হয়েছে, স্রোতস্বতী যমুনা কল কল শব্দে তাঁদের পদধূলি লয়ে ছুটিয়া চলেছে। সে মনোহর দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, সতী আত্মাগুলি পতিদের সহিত অনন্ত মিলনে মিলিত হয়ে, সেই পরম পতির ধ্যানে মগ্ন। সেই এক দৃশ্য, আর নব-দেবালয়ে সতী সাবিত্রী এবং কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের যে একত্রে মিলিত সমাধি, ইহা তাঁদের যুগল-সাধনব্রত উদ্যাপনের ছবি পৃথিবীর কাছে ধরেছেন। সতী সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মানন্দের আদরের কন্যা ছিলেন। তিনি পিতার আদেশ সাধ্যমত জীবনে পালন করেছিলেন। নবসংহিতা পূর্ণমাত্রায় পালন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি ধর্ম্মের সকল কাজে, নববিধান-বিশ্বাসী স্বামীর সাহায্য পাইয়াছেন। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের নিষ্ঠা, চরিত্র, ধর্ম্ম, নীতি ইত্যাদি সাবিত্রী দেবীর জীবনে, ব্রহ্মানন্দের ইচ্ছা-পালনে সহায়তা করেছিল। সংসারে কত রকম পরীক্ষা আসিয়া যখন সে জীবন দুটীকে ঘিরেছিল, তখন কেবল বিপদ্ভঞ্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে জীবনপথে চলে-ছিলেন। আসক্তি বিলাসিতা তাঁদের জীবন স্পর্শ করিতে পারে নাই বলেই, তাঁরা সকল পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হতে পেরে-ছিলেন।

জীবনের ব্রত পালন করে, তাহা উদ্যাপন করে, আজ অনন্ত শান্তিতে সমাধি-যোগে মগ্ন রয়েছেন। তাঁদের "মিলিত-সমাধি" তীর্থে দাঁড়িয়ে এই কথাই মনে হয়, যখন স্বর্ণাক্ষরে লেখা দেখি—"শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্মা দুইটির যোগ হইল"।

"শ্রীকেশব"

শ্রীমতী সুধা দেবী।

—•—

আমরা কি নববিধান বুঝিয়াছি ?

(২)

বিগত ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের উপরোক্ত-শীর্ষক প্রসঙ্গে যাহা কিছু নিবেদন করিয়াছি, সেই নিবেদিত বিষয়ে আরো কিছু নিবেদন করিতে আসিলাম। আমাদিগের ভিতরে যেমন "সমাজ" শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ "সমিতি" "সঙ্গত" "সভা" প্রভৃতি শব্দ সেই সৌসাদৃশ্য লইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। সমিতি শব্দ সম্ পূর্ব্বক ই ধাতু ও সঙ্গত শব্দ সম্ পূর্ব্বক গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উভয় ধাতুরই অর্থ গমন করা। যাঁহারা সমভাব লইয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গে মিলিত হয়েন, তাঁহারাই এই মিলনের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করেন। সভা শব্দ ঐভাবে সহপূর্ব্বক ভা ধাতু হইতে উৎপন্ন। ভা ধাতুর অর্থ দীপ্তি দেওয়া। যাঁহারা একটা ভগবৎ-প্রেরিত আলোক লইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েন, তাঁহাদের দ্বারাই সভা রচিত হয়। এ স্থান তর্ক বিতর্কের স্থান নহে। যদি কোন নূতন বিষয় আসিয়া পড়ে, তখন সেই সভাস্থলে সম্মিলিত ব্যক্তিদিগের বিধাতার আলোকানুযায়ী চিন্তার বিষয় আসিয়া পড়ে। চিত্তের স্থির অথবা শান্ত ভাব না আসিলে, কোন নূতন অথবা গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসিতে পারে না। তত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল দার্শনিক অনেক নীরব চিন্তার পর আনন্দের সহিত "ureka" অর্থাৎ আমি পাইয়াছি, এই উৎসাহে ও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত Channing বলিয়াছেন, "It is no vice of intellect if our attitude towards a new thing be one of redress and attentive response instead of running into the counter fires of controversies." মৌনী না হইলে মুনির ভাব আসে না। চিত্তের সমাধান না হইলে কিছুরই মীমাংসা হয় না। এই অবসরে আজ বলি, আমাদের সেই সমাধিমগ্না সন্ন্যাসিনী সত্ত্বভাবোল্লাসিনী নববিধানের নবীনা মীরা মহারাণী সুনীতি দেবী সেই কুচবিহারের মাননীয় মাহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মহাসমাধির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার প্রাণস্পর্শী প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর চিত্তের সমাধান আনিয়া দাও। ভিতরে চিতাগ্নি না জ্বলিলে বাহিরের বস্তু দগ্ধ হইবে না। চিতা না হইলে চিত্তের সমাধান হয় না ও পৃথিবীর তর্কের মীমাংসা হইবেনা।" গৈরিক বসনধারিণী মহারাণী অনেক পরীক্ষার ভিতরে চিত্তের এই সমাধান সাধন করিয়াছিলেন। তিনি এই ভাব লইয়া পার্থিব জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নববিধানের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভিতরে এই মহা সাধন এত উজ্জ্বল ভাবে বিভাসিত হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্নদেহ লইয়া সেই সুদূর সুবর্ণরেখার বেলাভূমিতে তাঁহার প্রবাস-ভবনে উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্যের একটি প্রার্থনা পাঠ তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। তিনি ১৯৩১ সনের ১০ই নবেম্বরে সেই বেলাভূমিতে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং ঐদিন আচার্য্যদেবের কোন প্রার্থনা পাঠ করিবেন, তাহা পূর্ব্বদিন নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দিন আমাদিগের ভাই নির্ম্মলচন্দ্র সেই চিরসমাহিতা ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনার ভিতরে সেই প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, চিত্তের সমাধান না হইলে পৃথিবীর অনেক তর্ক বিতর্ক আসিয়া পড়ে।

তাহার পর "সমন্বয়" শব্দ ধর্ম্মজগতে অত্যন্ত মিলনাত্মক। সত্যের সঙ্গে সত্যের মিলন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জলের সঙ্গে জল স্বাভাবিক নিয়মে মিলিয়া যায়। গঙ্গা ও জর্ডানের জল এক পাত্রে এক বস্তু হইয়া যায়। নানাজাতীয় ও নানা বর্ণের পুষ্প হইতে মক্ষিকার সংগৃহীত পুষ্পরস মধুচক্রে আসিয়া এক বস্তু হইয়া যায়। নানা বর্ণের গাভী হইতে সংগৃহীত দুগ্ধ কখন বিভিন্ন রং ধারণ করেনা। গুণে ও বর্ণে একই হইয়া যায়। ভাষাতেও সমন্বয় স্বাভাবিক। এক পদের সহিত আর এক পদ স্বাভাবিক নিয়মে অন্বিত, নচেৎ তাহাদের ভাবার্থ সম্ভব হয় না। বিধাতার প্রেরিত ধর্ম্মবিধানেও সেইরূপ অন্বয় আছে। পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় সাধক William Law বলিয়াছেন, "When a Dispensation comes it comes to befit other Dispensation". আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের আমার উদার নৈতিক খৃষ্টীয় বন্ধু ও তত্রত্য Words of Faith পত্রের সম্পাদক Mccalla আমাকে লিখিয়াছিলেন, "I know no east and no west, and no north and no south. All are one in the universal family of God. Both India and America are so spiritually knitted together. All are so one in the silken bond of love, faith and purity."

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও ধর্ম্মের এই সমন্বয় অনুভব করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত বলেন, "ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ। অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম॥" নববিধানেও নববিধানাচার্য্য ভক্ত কেশব বলিলেন, "All religions are true. Gather ye the harvest of east and west." সাধনের পথে সাধক এইরূপই মিলন দেখেন। হিমালয়ের পথিক যখন উচ্চতম এভারেষ্ট শৃঙ্গে উঠিয়া যান, তখন তিনি নিম্নস্থ নানা বিভাগে বিভক্ত দেশ সমূহ ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে এক চক্ষে ও এক মিলিত অবস্থায় দেখিতে থাকেন। সমন্বয়-সাধক ও ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত বিধাতার প্রেরিত সমন্বয়ধর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে না। সাধনের পথে সমস্ত সত্যের সঙ্গে এক অখণ্ড যোগ অনুভূত হয়।

তাহার পর নববিধানে নবসংহিতার কথাও একটু নিবেদন করিতে আসিলাম। ধর্ম্মজগতে "সংহিতা" যুগে যুগে

আসিতেছে। প্রাচীন ভারতে মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগধর্ম্ম ও স্বাভাবিক সামাজিক বিধানানুসারে যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সেইরূপ সংহিতা আসিয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত গদাধর শিরোমণি ঊনবিংশতি সংহিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এ বস্তু মানুষের স্ব-কপোল-কল্পিত বস্তু নহে। যুগের বিধানে সমাগত সত্যের ভিতরে সাধকের জীবনে যে প্রত্যাদেশ আসে, সেই প্রত্যাদেশের নির্দ্দেশে সাধক তাহা লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দ নববিধানের নূতন প্রত্যাদেশে নবসংহিতা লিপিবদ্ধ করিলেন। তিনি নিজে কিছু বলেন নাই। তিনি ভগবানের শ্রুতিধররূপে সংহিতা লিখিলেন। সংহিতা বস্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ন ধর্ম্মসমাজও নবসংহিতার আদর্শে সমাজের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণবিধানে এক সংহিতা রচনা করিয়াছেন। ভগবান স্বয়ং সংহিতা-কারক। তাঁহার সূর্য্য কোন দিন পশ্চিম গগনে উদিত হইল না। কমল কোন দিন মরুভূমিতে ফুটিল না। শেফালিকা শারদ ঋতু ব্যতীত অন্য ঋতুতে বিকশিত হইল না। পৃথিবীর বড় বড় কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজন-নিবদ্ধ Routine ব্যতীত কার্য্যের শৃঙ্খলা হয় না। সংহিতা শব্দ সম্ পূর্ব্বক ধা ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই, যাহা মানুষকে ভগবানের বিধানে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই সংহিতা। ইহা মৌখিক শব্দ নহে, ইহা ভগবানের বাণী। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বিভাগে "সংহিতা" শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া পদ্ধতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই দুয়ের পার্থক্য-ভাব ভ্রমাত্মক, এই দুই শব্দই একভাবাপন্ন। পদ্ধতি শব্দ পদ্ শব্দের উত্তর হন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। এখানে পদ শব্দের অর্থ মানুষের স্বাধীনভাবে বিচরণ, এবং হন্ ধাতুর অর্থ বধ করা। যে বিধিতে মানুষের স্বাধীন ভাবে অথবা স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করার ভাব বিনাশ করে, তাহাকেই পদ্ধতি বলে। এই দুয়ের সাম্যবোধ না আসিলে, ভিতরে স্বতঃই বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে।

তাহার পর ভগবানের আদেশ ও আজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিতে আসিলাম। এই দুয়ের আভিধানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও অনেকেই অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া আছেন। শব্দার্থ দিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় না। আদেশ শব্দ—আ পূর্ব্বক দিশ ধাতু হইতে উৎপন্ন। দিশ ধাতুর অর্থ মানুষের গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেওয়া। আর "আজ্ঞা" শব্দ—আ পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহা মুখের শব্দ নহে। নিরাকার ব্রহ্ম ভিতরে যাহা নির্দ্দেশ অথবা জ্ঞাপন করেন, তাহাই আজ্ঞা। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ শব্দব্রহ্ম স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়াছেন। যখন তাঁহারা তাঁহাকে বাগীশ্বর, বাগ্দেবী ও গৌরী বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা ভিতরে নিরাকার ব্রহ্মের শব্দও শ্রবণ করিয়াছেন। গৌরী শব্দ—গুহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুর অর্থ কথা কওয়া ও বেষ্টন করা। যিনি মানবাত্মার ভিতরে কথা কন এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনিই গৌরী। পুরাতন বাইবেলও বিধাতার বাণী ও আজ্ঞা বিশ্বাস করিয়াছেন। পুরাতন বাইবেল তাহার উপ-ক্রমণিকায় তাহার উল্লেখ করিলেন, "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর।" প্রত্যাদিষ্ট মুষা সেনাই শিখরে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নববিধানের নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ বিধাতার বাণী—আদেশ ও আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার জীবনের উপক্রমণিকাতেই প্রমাণ হইয়াছে। যখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মের মুখ হইতে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই বাণী শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি মানব গুরু-ও-গ্রন্থবিহীন হইয়া নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী সেই এক ব্রহ্মের প্রার্থনায় উপবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মের এই শব্দ তাঁহার ভিতরে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ব্রহ্মের আজ্ঞা তাঁহার ভিতরে যতই পরিপক্ক অবস্থায় আসিতে লাগিল, তখন তিনি নিজেই আর বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, কোথায় চলিয়াছেন। যে অবস্থায় ইস্রায়েল পিতা এব্রাহিম সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তগণ বলিয়াছিলেন, "He knew not where he went." নববিধানাচার্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার ভক্তদের মধ্যে এই সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছিল। বিধাতার আদেশপ্রসূত কুচবিহার বিবাহে তাঁহাকে অনেকে আর ধরিতে পারিলেন না। পৃথিবীর নিয়মে সেই ঘটনায় যে তরঙ্গ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহাতে তাঁহাকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে এক স্বতন্ত্র দল উত্থিত হইল। বিধাতার আদেশবাদী তৎকালীন হিন্দু সাধক ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বললেন, তাই কেশব কুচবিহারে কন্যা দিলেন"। হিন্দু সাধকও বিধাতার আদেশতত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধু পলের পত্র এবং বাইবেলে লিখিত Canna-marriage তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারাই এই আদেশ-সম্ভূত বাধা-বিঘ্নপূর্ণ কুচবিহার বিবাহ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। কোন পাশ্চাত্য সাধক বলিয়া-ছেন, "Sven seals opened, the truth comes out."

কুচবিহারে প্রেরিতা ভক্তকন্যা দেবী সুনীতিও এই আদেশ-তত্ত্ব খুব ধরিতে পারিয়াছিলেন। একদিন তিনি মাননীয় মহারাজার সমাধিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর, এখনও আমি কুচবিহারের দ্বারে বাবার সেই করাঘাত শুনিতেছি। এখন বুঝিতেছি, এই মহাসমাধিতে তোমার অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত বাবার সেই করাঘাত পূর্ণ হইতেছে। এই করাঘাত ভবিষ্যৎ কুচবিহারও শ্রবণ করিবে।"

তাহার পর প্রার্থনা ও উপাসনা সম্বন্ধে একটু নিবেদন করিতে আসিলাম। আমাদিগের প্রার্থনা মুখের শব্দ নহে। অন্তরের ভিতর হইতে ভগবানের নিকট যে ভিক্ষার ভাব আসে, তাহাই প্রার্থনা। প্রার্থনা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে ভিক্ষা করা। ভিখারী যখন দাতার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তখন ভিখারীর ভিতর হইতে যে ভাব আসে, তাহাই ভিক্ষা। ভগবানের নিকট ভক্তের এ ভাব না আসিলে প্রার্থনা হয় না।

তোমারই আকর্ষণে তোমারই দিকে জীবনের গতি প্রধাবিত হইবে। বদ্ধজীব হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে তুমি আমাদিগকে সৃজন কর নাই; তুমি যখন নিত্য জীবনের জীবন, তখন তোমাতেই নিত্য জীবিত থাকিয়া, তোমার প্রেমলীলা দর্শন করিতে করিতে মানব-জীবন ধন্য করিব এবং মুক্তভাবে অমৃতধামের যাত্রী হইয়া তোমারই হাত ধরিয়া চলিব, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

সংসার পবিত্র তীর্থ।

যুগধর্ম্মবিধান নববিধানে আমরা বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদে এই শিক্ষাই পাইয়াছি, "সংসার পবিত্র তীর্থ"। তীর্থ কাহাকে বলে, আমরা তাহা সকলেই জানি। হিন্দু-তীর্থের মাহাত্ম্য শতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তীর্থে শ্রীভগবান্ জীবন্ত জাগ্রতরূপে বিদ্যমান। তীর্থে গেলে সেই তীর্থরাজ শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎরূপে দেখা যায়, তাহাতে পাপ তাপ দূর হয়, ভববন্ধন ছিন্ন হয়, মুক্তিলাভ করা যায়। ভক্তগণের তীর্থযাত্রার এই তো উদ্দেশ্য।

তীর্থ বলিলেই এই বুঝা যায়, যে স্থান শ্রীভগবানের প্রকট লীলাস্থান। অনন্ত পূর্ণ যিনি, তাঁহার লীলাস্থান কোথায়? আপনাতে আপনি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকুন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার অনন্তলীলার প্রকাশ স্থানকালে কিরূপ হয়, তাহাই আমাদের অদ্য দেখিবার বিষয়। ভক্তের সঙ্গীতে আমরা দেখিতে পাই, "স্থানেতে এখানে, কালেতে এক্ষণ, প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন।" অর্থাৎ ভক্ত যখন যেখানে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখনই সেখানে তাঁহাকে প্রিয়দর্শনরূপে দেখিতে পান। সকল দেশে, সকল কালেই ভক্তগণ তাঁর দর্শনার্থী।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"—এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু পদার্থ, তৎসমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনন্ত পূর্ণ তিনি, সুতরাং স্থান কাল সমস্ত পূর্ণ করিয়া তিনি বিদ্যমান। এমন কোন স্থান বা কাল নাই, যাহাতে তিনি নাই। সুতরাং এই গৃহপরিবার—সংসার পূর্ণ করিয়া জীবন্ত জাগ্রতভাবে তিনি বর্ত্তমান; অথচ তিনি স্থানকালে বদ্ধ হইয়াও থাকেন না।

তিনি অনন্ত ভূমা মহান্; স্থান কালে বদ্ধ হইলে তাঁহার অনন্তত্ব খণ্ডিত হয়। সুতরাং ইহপরলোক সমগ্র বিশ্বকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া তিনি প্রকাশিত। স্থানকালে তিনি বদ্ধ নন, অথচ স্থান কাল পূর্ণ করিয়া তিনি বিদ্যমান। কেহ কেহ বলিতে পারেন, স্থান কালে তাঁহার প্রকাশ স্বীকার করিলেও তো তাঁহার অনন্তত্ব খণ্ডিত হয়; তাহা হয় না, কেন না তিনি সমস্ত আপনার অন্তর্ভূত করিয়া তাহার বাহিরেও তিনি রহিয়াছেন। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।" রূপে রূপে তিনি বিদ্যমান, অথচ তাহার বাহিরেও তিনি আছেন। "ঘটে ঘটে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান। জ্বলে জ্বলন্ত অনলসমান।"

তাঁহার জীবন্ত জ্বলন্তরূপ ভক্তেরা কি চক্ষে দেখিলেন? আমরা যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পাইয়াছি, যদ্দ্বারা জড়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তদ্দ্বারা কি অনন্ত নির্ব্বিকার শ্রীভগবানের রূপ দেখা যায়? তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। অরূপের রূপ এই চক্ষে প্রতিভাত হয় না; জড়ের রূপই এই চক্ষে প্রতিভাত হয়। তবে কোন্ চক্ষে অরূপের রূপ দেখা যায়—বিশ্বাসচক্ষে। আমাদের এই চক্ষু ব্যতীত আর একটী চোখ আছে, তাকে বিশ্বাসের চোখ বা যোগের চোখ বলা যায়। শ্রীভগবান্ আমাদের প্রত্যেককে ত্রিলোচন করিয়া সৃজন করিয়াছেন। বহির্জ্জগতের দৃশ্য দেখিবার জন্য এই দুই চক্ষু ব্যতীত, অতীন্দ্রিয় জগতের দৃশ্য দেখিবার জন্য বিশ্বাসের চোখ দিয়াছেন। সেখানে অন্তর্জ্জগতের দৃশ্য যত দেখিতে অভ্যাস করি, ততই অন্তর্জ্জগৎ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

যখন যোগের চোখ বা বিশ্বাসের চোখ ফোটে, তখনই অনন্ত শ্রীভগবানের লীলামাধুরী আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। দেখিতে চাহিলেই দেখা যায়; যখন আমাদের ব্যাকুল দৃষ্টি অনুরাগরঞ্জিত হইয়া তাঁকে খোঁজে, তখনই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ভক্তেরা তীর্থে যান যে বিশ্বাস লইয়া, সেই বিশ্বাসই ভগবদ্দর্শনের একমাত্র অবলম্বন। তীর্থে দেবতার জাগ্রতলীলা, তাঁকে সেখানে সাক্ষাৎভাবে দেখা যায়, তাঁকে দেখিলে মানব-জীবন সার্থক হয়, এই ভাব লইয়াই ব্যাকুলাত্মা ভক্তগণ তীর্থাভিমুখে কত কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বনপূর্ব্বক অনুরাগভরে অগ্রসর হন, এবং তীর্থে তীর্থরাজকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

এই সংসার গৃহপরিবারই শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ লীলা-ভূমি। বিশ্বাসীর চোখ তাঁকে সর্ব্বত্র লীলাময়রূপে দেখে। মোহের আবরণবশতঃ আমরা তাঁকে দেখিনা। "মোহ আবরণ, কর উন্মোচন, প্রাণভরে একবার দেখিহে তোমায়।" ভক্তগণ শ্রীভগবানের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনাই করেন। "আমি আমি, আমার আমার" এই মোহবশতঃই আমরা তাঁকে দেখিনা। এই পৃথিবীতে স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, জগন্নিয়ন্তা যে আর একজন আছেন, তা আমরা মোহবশতঃ মনে করিতে পারি না। আমরা সুধু জড়কেই দেখি, আর বিষয়াসক্তিবশতঃ জড়কে উপভোগ করিবার জন্যই লালায়িত হই। মনে করি, এই বিশ্ব আমারই উপভোগের জন্য। আর কেহ একজন আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং দৃশ্য বিশ্বকেও আমার আগমনের পূর্ব্বে নানা দ্রব্যসম্ভারে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, এ জ্ঞানোদয় হয় না। তাই আমি আমার লালসার বশবর্ত্তী হইয়া নিরীশ্বর জগতে আমি কর্ত্তা হইয়া বিচরণ করিতে ও নিজেকে সুখী করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি কি ?

সুখের অন্বেষণে কত ব্যগ্র হই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত চেষ্টা করি, কিন্তু সুখী হইতে তো পারি না। পদে পদে বিঘ্ন বিপদ, রোগ শোক তাপ, দুঃখ দৈন্য এসে আমাকে পলকের মধ্যে ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলে। তখন একটু বুঝিতে পারি, আমার লালসাকে প্রতিহত করে, আমার ইচ্ছাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, আর একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আছেন। এ বিশ্ব আমার নয়, তাঁরই। আমার যদি হত, কেন তবে আমি যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারি না, এবং ভোগ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। আর একজন পরম পুরুষের অধীন হইয়া না চলিলে, এ বিশ্বে আমার যাত্রা প্রতিপদে ব্যাহত হয়। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—যাঁর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, যাঁর এই গৃহপরিবার, ধনজন, তিনি যা দেন, বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া ভোগ করিলেই তাহাতে আত্মা তৃপ্ত হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রসাদলাভের জন্য যদি ব্যাকুল হইতে পারি, তবেই ভবক্ষুধা দুর হইবে। তীর্থে গিয়া ভক্তেরা দেবদর্শন ও দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া সুখী হন ; তাই সংসারতীর্থেও তাঁহার জীবন্ত জ্বলন্ত দর্শন লাভ করিয়া, নিত্য তাঁর অমৃতপ্রসাদ ভোগ করিয়া মানবজীবন ধন্য হয়, তবে আসা সার্থক হয়। তিনি বিচিত্ররূপে নিত্য নূতন দর্শন শ্রবণের সাহায্যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণকে তাঁহারই ভাবে, তাঁহারই মনোমত করিয়া গঠন করিবেন, অনন্ত উন্নতির দিকে মুক্তভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিবেন, এই তাঁহার প্রতি জীবনের সম্পর্কে অভিলাষ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

এক লক্ষ্য।

"পিতার প্রেম-রাজ্যে গমন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, ধনী হউন, মানী হউন, জ্ঞানী হউন, মূর্খ হউন, সকল অবস্থাতেই এই এক কর্ত্তব্য, এই এক সাধন ; পরিশেষে ব্রহ্ম-নিকেতনে, শান্তিধামে, স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে হইবে। বাহিরের বিভিন্নতা চিরদিন থাকিতে পারে না। আত্মা এক, ঈশ্বর এক, এক শান্তিধামই আত্মার উদ্দেশ্য। আমাদের লক্ষ্য এক, মন্ত্র এক, স্বর্গ এক, অন্তরে বাহিরে গৃহ এক, পরিবার এক, সপরিবারে এক রাজ্যে গিয়া উপনীত হইতে হইবে। একই স্বর্গধামের পথে চলিতে হইবে, ভিন্ন পথে চলিবার উপায় নাই ; যিনি চলিবেন, তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই লক্ষ্য পরিত্যাগ, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ একই। এই পথই মুক্তির পথ। ধন উপার্জ্জন কর, বিদ্যা উপার্জ্জন কর, কিম্বা জ্ঞানই লাভ কর, এই লক্ষ্য স্থির রাখিবে ; বামে দক্ষিণে না গিয়া অটল ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হও।"

—

মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্য।

"দেখ, স্বর্ণাক্ষরে মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। বিচিত্র সুন্দর ব্রহ্মরাজ্য বিশ্বাস-নয়নে সেখানে দেখিতে পাইবে। সেই অনন্ত প্রীতিধাম, স্বর্গধামের যিনি রাজা, তাঁহাকে অন্ধকারে অন্বেষণ করিতে হয় না। যিনি বিশ্বপতি হইয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে বাস করিতেছেন, এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভক্তি-করে এমনই তাঁহাকে ধারণ করা যায় যে, প্রাণ শীতল হয়। সহস্র ক্রোশ অন্তরে সেই স্বর্গরাজ্য, অথচ উহা এই ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত স্বর্গলোক একবার বিশ্বাস-চক্ষে দেখ, দুইই আমাদিগের অন্তরে। ঘরও আমাদিগের অন্তরে, গৃহদেবতাও অন্তরে, রাজাও আমাদিগের অন্তরে, রাজ্যও অন্তরে, ইহকাল অন্তরে, পরকাল অন্তরে ; অন্তরে নিমীলিত-নয়নে দেখ, জাজ্বল্যমান সেই ঈশ্বর-হস্ত-রচিত সুন্দর রাজ্য নয়ন-পথে প্রকাশিত হইবে।" (কেশব)

—•—

ব্রহ্ম-দর্শনে ব্রাহ্মত্ব।

(বৃহস্পতিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৬ শক ; ২৮শে মে, ১৮৭৪ খৃঃ)

আকার দেখিতে চাও, কি নিরাকার দেখিতে চাও, এই কথা যদি ঈশ্বর ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রহ্মভক্ত ইহার কি উত্তর দিবেন ? যথার্থ ভক্ত ব্রহ্মকে সাকার না নিরাকার দেখিতে ইচ্ছা করেন ? সমুদয় ভক্তেরা একবাক্য হইয়া এই কথা বলিবেন, আমরা সকলেই নিরাকার ব্রহ্মদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। সাধকের কখনই এ ইচ্ছা হইতে পারে না যে, তিনি ব্রহ্মের মধ্যেও বাহিরের সেই অস্থায়ী জড় পদার্থের আকারের ন্যায় কোন রূপ দর্শন করেন। ঈশ্বর ত জড় হইতে পারেন না ; আবার ভক্তেরাও ব্রহ্মকে সাকার দেখিতে চান না। কেন না যে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা আকার দেখিতে পায় না। সাধকের যে বিশ্বাস, যে প্রেম এবং যে ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর ধৃত হন, তাহা কোন প্রকার বাহিরের রূপ কিম্বা বাহ্যিক আকার গ্রহণ করিতে পারে না। যে রাজ্যে নানা প্রকার রূপ এবং আকার দৃষ্ট হয়, সাধক কখনই সেখানে বাস করেন না। পুরাকালে ঋষিদিগের ভক্তি এবং ধ্যান-চক্ষু কি কখনও বহির্বিষয়ে বিচরণ করিত ? প্রাচীনকালে যেমন, এখনও তেমনই। যদি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইতে চাও, তবে তাঁহাকে নিরাকার ভাবে দেখিতে হইবে। যাই ভক্ত বহির্বিষয়ে অবতরণ করেন, তৎক্ষণাৎ ধ্যান অসম্ভব হয়। এইজন্য চিরকাল সাধক, ঋষি এবং জগতের সমুদয় বিশ্বাসী ভক্তেরা এই প্রার্থনা করিয়াছেন, "ঈশ্বর ! আমরা তোমার আকার কিম্বা রূপ দেখিতে চাই না ; কিন্তু তুমি অতীন্দ্রিয় হইয়া অন্তরে দেখা দিয়া আমাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর।"

সন্তান জল চাহিলে পিতা কি তাহাকে প্রস্তর দিতে পারেন ? প্রাণ চায় যে সন্তান, তাহাকে কি তিনি বিনাশ করিবেন ? অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে আমরা চাই। সীমাবদ্ধ, পরিমিত আকার কিম্বা রূপ কি আমাদের আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারে ? ঈশ্বর স্বয়ং যেমন অনন্ত নিরাকার, তাঁহার সেই ভাবে তিনি সন্তান-দিগকে দেখা দিবেন, এইজন্যই তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি যেমন, যদি যথার্থ সেই ভাবে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ না পাই, তবে আমাদের পশু, পক্ষী, জলের মৎস্য অথবা অপর কোন নিকৃষ্ট জন্তু হওয়া ছিল ভাল। ঈশ্বর যদি দেখা না দিবেন, তবে কি জন্য তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন ? যদি ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব হয়, তবে পৃথিবীর এত প্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল কেন ? শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা যে ব্রহ্মকে ধারণ করিতে হইবে, তাঁহার আকারের প্রয়োজন কি ? আমাদের অন্তরের বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি এবং আত্মার অন্যান্য উচ্চতম বৃত্তি সকল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্য অন্বেষণ করিতেছে। যেখানে অনন্তের জন্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধা এবং ব্যাকুলতা, সেখানে ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু কি করিতে পারে ? কোথায় অনন্ত ? কোথায় অনন্ত জ্যোতি ? কোথায় অমৃতসাগর ? এই বলিয়া অমরাত্মা সকল কাঁদিতেছে। কোথায় তাঁর অন্ত ? কোথায় তাঁর অন্ত ? এ সকল কথা বলিয়া চিরকাল মনুষ্যমণ্ডলী হইতে স্তব স্তুতি উঠিতেছে। অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব, অনন্তকালের জন্য অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিব, এইজন্য আমরা জন্মধারণ করিয়াছি। অমৃতের অধিকারী করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন।

এই অনন্ত সৌন্দর্য্য যিনি দেখিতে পান, ঈশ্বরের উপাসনা কেমন সুমিষ্ট, তিনিই তাহা আস্বাদ করিতে পারেন। কেমন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব, কিরূপে তাঁহার ধ্যান করিব, চক্ষু মুদ্রিত করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, কত লোকে বারম্বার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করে, এবং ইহারই জন্য পৃথিবীতে জড়পূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মদর্শনে মনুষ্যের মন মোহিত হইতে পারে, আর কিছুতেই তেমন হয় না। যদি নিরাকার ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া গভীর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন না হইলাম, তবে অনন্তের পূজা হইল কৈ ? ব্রাহ্ম হওয়া অতি কঠিন ব্রত। নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শন অতি উচ্চ ব্যাপার। সকলের ইহাতে শীঘ্র এবং অনায়াসে অধিকার জন্মে না। বাস্তবিক ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর-মুখে তাঁহার অভ্রান্ত বেদবাক্য শ্রবণ অতি উচ্চ ব্যাপার। ব্রাহ্ম কে ? যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তোমাদিগকে আমি দেখিতেছি, আমাকে তোমরা দেখিতেছ, ইহাতে যেমন সন্দেহ নাই, এইরূপ সহজ ভাবে যিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। কতকগুলি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যদি সকলেই ব্রহ্মকে দেখিত, প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিত, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি একটী ব্রাহ্মমণ্ডলী হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের পরিচয় দিত। সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হয় নাই, এইজন্য নহে যে, সকলের ব্রাহ্মনামে ঘৃণা আছে ; কিন্তু ইহাই যথার্থ কথা যে, মনুষ্য ব্রহ্মকে দেখিল না।

নিমীলিতনয়নে অন্ধকার মধ্যে করতলন্যস্ত বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা কি সহজ ব্যাপার ? হৃদয়ের মধ্যে নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মকে না দেখিয়া, ভ্রান্ত মনুষ্য পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে, পর্ব্বতে, কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর বলিয়া ধাবিত হইল। যাঁহার হস্ত, পদ এবং কোন অবয়ব নাই, তাঁহাকে অতি সহজ এবং উজ্জ্বল ভাবে দেখা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই বুঝিতেছি, ব্রহ্মসাধন কি জন্য পূর্ব্বতন ঋষিরা কঠিন বলিতেন। যেখানে কেবল আত্মা আর পরমাত্মার সম্পর্ক, সেখানে দিবারাত্র নিতান্ত নিগূঢ় সাধন আবশ্যক। কিন্তু যতই গূঢ়ভাবে ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিবে, ততই দেখিবে, তাঁহার মধ্যে কেমন নব নব সুন্দর মনোহর ভাব সকল সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ, যাহারা তোমাদের বিরোধী, যাহারা ঈশ্বরকে দুষ্প্রাপ্য মনে করে, যাহারা কেবলই সংসারের প্রিয়-

ভূমিতে বিচরণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একবার দেখাও—নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিলে দেহ মন কেমন রোমাঞ্চিত হয়। ব্রহ্মদর্শনে কত সুখ, তোমরা পাঁচজন দেখাও, দেখি ভারত টলমল করে কি না। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে ব্রহ্ম-দর্শনে কত সুখ এবং ব্রহ্মোপাসনার কত মধুরতা, দেখাও। যে প্রকারে হউক, পিতার মনে কষ্ট দিয়াও, কেবল ঐহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই হইল, এই প্রকার নীচ অভিসন্ধি দূর কর। উপাসনাতে মত্ত হইয়া কত সুখী হইতে পার, জগৎকে দেখাও। বুদ্ধি কিম্বা তর্কে নহে, কিন্তু তোমাদের জীবন-শাস্ত্র দেখিয়া সকলে নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের জন্য লালায়িত হইবে। একবার যাঁহাকে দেখিলে আর মনের সন্তাপ থাকে না, তোমরা সকলে তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হও। সকলের কাছে গিয়া প্রণয়ের সহিত এই বল—যাঁহার উপাসনা করিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, কেন তোমরা তাঁহার কাছে আসিবে না? ব্রহ্মকৃপাতে ব্রহ্মকে দেখিবে এবং ব্রহ্মকে দেখাইবে, এই সংকল্প কর। আশু তোমাদের বিশুদ্ধ কামনা সকল চরিতার্থ হইবে, দেশের দুঃখ দূর হইবে, এবং পৃথিবী স্বর্গধাম হইবে। (আচার্য্যের উপদেশ)

—•—

স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়।

(৪ঠা অক্টোবর, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্তৃক পঠিত)

নবযুগের নবভক্ত শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেব বলিলেন, "সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকল বস্তু অপেক্ষা আদরণীয় আপনার জীবন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতি মনুষ্যজীবনকে বেদ বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবৃত করেন।" ভক্ত ব্রহ্মানন্দ পরম পিতার আদেশে নিজ জীবনের অমৃতময় কাহিনী ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সে মধুর কাহিনীতে কত তৃষিত প্রাণ শীতল হইয়াছিল। কিন্তু আমি নিতান্ত অযোগ্য অপরাধী সেবক হইয়াও, আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ কেদারনাথ রায়ের জীবনকাহিনী মা বিধানজননীর আদেশেই বর্ণনা করিতেছি; মা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

যদিও আমার সহিত তাঁর পার্থিব সম্বন্ধে দূর সম্পর্ক, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি আমার অগ্রজ। আমার পূর্ব্বেই তিনি পশ্চিম বঙ্গের নূতন ধর্ম্মমণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

হাওড়া জিলায় অমরাগড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী রাউতড়া গ্রামে ধন মানে বিখ্যাত [illegible] কেরাণী মহাশয়ের বংশে, স্বর্গীয় শ্রীনিবাস রায় মহাশয়ের ঔরসে ও শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবীর গর্ভে, ১২৬৮ সালের ২৮শে আষাঢ় তারিখে, আমাদের বড় দাদা কেদারনাথ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ভক্ত ফকিরদাস রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী; তাঁহাদের পিতৃদেব পুণ্যশ্লোক দাতা সূর্য্যকুমার রায় মহাশয় অত্যন্ত সন্তানবৎসল ছিলেন। তিনি কন্যাদিগকে নিজের কাছে রাখিতেন, সুতরাং দৌহিত্রেরাও তাঁর বাটীতেই থাকিতেন। বড় দাদা কেদারনাথ রায়ের বাল্যজীবন মাতুলালয়েই কাটিয়াছে। রাউতড়ায় কেরাণী বাবুদের অবস্থা সে সময় খুবই ভাল থাকিলেও, তদপেক্ষা সূর্য্যকুমার রায় মহাশয়ের অবস্থা আরো ভাল ছিল। তিনি এ দেশের একজন বড় জমিদার ও ব্যবসায়ী ছিলেন। কেদারবাবুর পিতা স্বর্গীয় শ্রীনিবাস রায় মহাশয় শ্বশুর মহাশয়ের জমিদারীর অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক থাকায়, তিনি ঐ কারণেও সপরিবারে অধিক সময় অমরাগড়ীতে থাকিতেন; সুতরাং কেদার বাবুর বাল্যজীবন মাতুলদিগের সঙ্গেই কাটিয়াছে এবং মাতুলদিগের সহিত একত্রে শয়ন, ভোজন ও অধ্যয়নে অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁর যৌবনারম্ভেই ঝিঁখিরানিবাসী রামচন্দ্র কলে মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী যাদুমণি দেবীর সহিত তিনি বিবাহিত হন। সে সময় এ দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। কেদারবাবু এদেশে সামান্য শিক্ষা পাইয়া, প্রথমে রাধাদাসীতে মাতামহ সূর্য্যকুমার বাবুর ইটখোলায় থাকিয়া আন্দুল হাই স্কুলে, তৎপরে জ্যেষ্ঠ মাতুলের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় বাদুরবাগান ও চোরবাগানে থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ১৬।১৭ বৎসর। ঐ সময় জ্যেষ্ঠ মাতুল ভক্ত ফকিরদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন ও মাঝে মাঝে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিতেন। ভক্ত ফকিরদাস যে দিন ব্রহ্মমন্দিরে গমন করেন, সেই দিবস আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপাসনানিরত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মাবতরণদর্শনে মোহিত হইয়া, এই মহান্ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেদারবাবুও মাঝে মাঝে মাতুলের সহিত রবিবারে ব্রহ্ম-মন্দিরে যাইয়া এবং মাতুলের ধর্ম্মানুরাগ ও ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেই জন্য পার্থিব রক্ত মাংসের সম্বন্ধ ব্যতীত জ্যেষ্ঠ মাতুলের সহিত তাঁহার একটী স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। চোরবাগানের বাসায় মাঝে মাঝে তাঁদের লইয়া ভক্ত ফকিরদাস এই ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতেন। একদিন ঐ ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইতেছে, সে সময় কেদার বাবু উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা দেশে প্রচার করিতে হইবে ও জীবনে প্রমাণ করিতে হইবে। অতএব আগামী গ্রীষ্মের ছুটীতে আমরা অমরাগড়ীতে যাইয়া নগরকীর্ত্তন বাহির করিব"। কেদারবাবুর ঐ উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইয়া, গ্রীষ্মের ছুটীতে প্রথমে নগরসংকীর্ত্তন করেন, তৎপরে সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা ও [illegible] জন্য [illegible]

নামে একটী সভা স্থাপন করেন। ঐ সভাতে ভক্ত ফকিরদাস ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁর নিজের চিন্তা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। কেদারবাবু, যশোদাবাবু ও পাণ্ডব বাবু লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। সভার আয়োজন, সভার বিজ্ঞাপন-প্রচারাদিতে কেদারবাবুর অদম্য উৎসাহ দেখিয়া সে সময় আমরাও আহ্লাদিত হইতাম। ঐ সভার প্রধানতঃ তিনটী উদ্দেশ্য ছিল; প্রথম নৈতিক জীবন গঠন, দ্বিতীয় সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃভাব স্থাপন, তৃতীয় ধর্ম্মজীবন গঠন ও সাধন।

ঐ সময়েই ভক্ত ফকিরদাসের বাল্যকালের ইচ্ছা—নিজেরা লেখাপড়া শিখিয়া এ দেশের ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর বালক-দিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ভিতর দিয়া চরিত্রগঠন এবং সেই জন্ত একটী বিদ্যালয়-স্থাপনের অভিপ্রায় মধ্যম সহোদর হৃদয়নাথ ও তৃতীয় সহোদর যশোদাকুমার এবং ভাগিনেয় কেদারনাথের নিকট প্রকাশ করা মাত্র, উঁহারা তিন জনেই ভক্ত ফকির-দাসের উক্ত সাধু প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সংকল্পযুক্ত হইলেন। ঐ সম্বন্ধে ভক্ত ফকিরদাস লিখিয়াছেন, "স্কুলস্থাপনের অভিপ্রায়-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যম সহোদর হৃদয়নাথ, তৃতীয় সহোদর যশোদ কুমার ও ভাগিনেয় কেদারনাথ জ্বলন্ত উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উক্ত সাধু কার্য্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন।" বিশেষ ভাবে যশোদাকুমার ও কেদারনাথের কার্য্যোদ্যম দেখিয়া ভক্ত ফকিরদাস আরো লিখিয়াছেন, "আহা! ধন্য সেই যৌবনের উৎসাহ এবং মত্ততা; তৎকালে যাঁহারা রাজপুত্রসদৃশ, তাঁহারা সকল মান অভিমানে জলাঞ্জলী দিয়া কখনও মাথায়, কখনও স্কন্ধে বিদ্যালয়ের গৃহ সামগ্রী রাত্রিতে বহন করিতেন। এবং দিবসে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিতেন। ঐরূপ অবস্থায় কার্য্য করিতে যশোদাকুমার ও কেদারনাথকে অনেকেই দেখিয়াছেন"। ভক্ত ফকিরদাস ঐ বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ সময়ে অধিক সময় পীড়িত ছিলেন, কিন্তু কেদারনাথ ও যশোদাকুমার তাঁর অনুমতিক্রমে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাই ভক্ত ফকিরদাস লিখিয়াছেন, "(আমার) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব স্নেহ ও আনুগত্য বিরাজিত, তাহা নিশ্চয়ই অনন্ত গুণনিধান পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপাবিধানের অন্তর্গত, উহা অতীব সুখপ্রদ ও অমূল্যরতনস্বরূপ; তাঁরা অল্পবয়স্ক হইলেও প্রবীণের ন্যায় ঐ সাধু কার্য্যে ব্রতী হয়েন। আহা! ধন্য সেই দেশ, যে দেশে পবিত্র জ্বলন্ত অনুরাগে প্রদীপ্ত হইয়া যুবাদল সাধু সঙ্কল্পে ব্রতী হয়েন।" ইংরেজী ১৮৮০ সনের শুভ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অমরাগড়ীর নিকটস্থ জয়পুর গ্রামের উত্তরে তালবাঁদী নামক বাঁধের উপর নব নির্ম্মিত গৃহখানিতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় খোলা হয়। ভক্ত ফকিরদাস স্বয়ং ঐবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন ও যশোদাকুমার ও পাণ্ডবনাথ এবং কিছুদিন পরে কেদারবাবুও জ্যেষ্ঠ মাতুলের সহকারী শিক্ষকের কার্য্য অবৈতনিক ভাবে করেন।

বিদ্যালয়গৃহখানি অতি ব্যস্ততার সহিত নির্ম্মিত হওয়ায় অনেক কাজ বাকী ছিল; তাঁরা চারিজন স্বহস্তে উলুটী ও লেপন ইত্যাদি করিয়া গৃহখানিকে নিজেরা অতি মনোরম করিয়াছিলেন। তাই তাঁরা বলিতেন, "বিদ্যালয়টী আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।" ভক্ত ফকিরদাসের ও তাঁর উক্ত সহকর্ম্মীদের নির্ম্মিত ঐ মাটীর সুবৃহৎ গৃহটী অট্টালিকা অপেক্ষাও অতি সুন্দর হইয়াছিল। ঐ গৃহে ভক্ত ফকিরদাস সহকর্ম্মীদের সহিত অনেক সময় বসবাস করিতেন। তাঁদের নিত্য কার্য্য ছিল, দিবসে ছাত্র-দিগকে পড়ান ও প্রাতে অপরাহ্ণে নিজেদের মধ্যে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মালোচনা। ইতিমধ্যে একদিবস হঠাৎ ফকিরদাস বিধাতার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন, যে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহা জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অচিরে দীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন; তাই তিনি প্রথমতঃ পাণ্ডবনাথ ও তৎপরে যশোদা কুমার ও কেদারনাথকে ঐ বিষয় জ্ঞাপন করায়, তাঁহারা তিন জনেই সম্মতি দিয়া যাহাতে শীঘ্র দীক্ষাগ্রহণ হয়, তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীরতত্ত্ব বিষয়ে ও তাহা জীবনে সাধন বিষয়ে তাঁহারা চারিজন একাগ্রভাবে যখন আলো-চনা করিতেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পাইত। তাই ঐসম্বন্ধে ভক্ত ফকিরদাস লিখিয়াছেন, "যখন আমাদের মধ্যে কথোপকথন হইত, তখন যে অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর শোভা হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপই প্রতীত হইতে লাগিল, যেন চারিখানি ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্ম অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গাঘাতে বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত হইতেছে"। বাং ১২৮৭ সালের শুভ ২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সায়ংকালে দীক্ষার দিন স্থির হওয়ায়, ঐদিন প্রাতঃকাল হইতে তাঁহারা শুভদীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন। যথাসময়ে ছাত্রদিগকে পড়াইয়া, সমস্তদিন উপবাস থাকিয়া, ছাত্রদের ছুটীর পর নিজেরাই স্কুলগৃহটী সুন্দরভাবে লেপন করেন। ঐকার্য্য করিতে তাঁদের প্রায় সন্ধ্যা হইল; তৎপরে তাঁরা চারিজনেই স্কুলের নিকটস্থ একটী দরিদ্র কৃষকপল্লীতে স্নান করিতে গমন করেন। তাঁরা যাই পুষ্করিণীতে আবগাহন করিলেন, অমনি মুষল-ধারে বৃষ্টি ও বজ্রপতন ও ঝড় উঠিল; আকাশের সেই ঘোরাল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁরা স্নানান্তে একটী দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১০টা বাজিল, তখনও ঝড় বৃষ্টি এবং বজ্রপতনের কিছুমাত্র বিরাম হইল না। সে সময় দেখা গেল, ভক্ত ফকিরদাসের চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিতেছে, এবং তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আর বিলম্ব করা কিছুতেই উচিত নয়। চল সবাই যাই, এবং আরো বলিলেন, "আজ যদি দীক্ষা গ্রহণ না হয়, তবে মৃত্যু হওয়া ভাল।" তৎপরে তাঁরা অগ্রগামী ফকিরদাসের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে বিদ্যালয়গৃহে উপস্থিত হন; এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় শুভ

বসন পরিধানান্তে স্ব স্ব স্থান পরিগ্রহ করিলেন। দীনবৎসল দয়াময় ভগবান স্বয়ং শ্রীগুরু ও আচার্য্য হইয়া সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন। ভক্ত ফকিরদাসই অদ্যকার উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনার প্রথমাঙ্গ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত দীক্ষা-গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার সম্মুখে তাঁহারা চারিজনে একে একে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

আহা! সেদিনকার বিগলিত হৃদয়ের আরাধনা, ব্যাকুল হৃদয়ের প্রার্থনা কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা সেই শুভদিনেই গুণনিধান শ্রীহরি তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ বুঝাইয়া কৃতার্থ করেন। সে দিবস মৃদঙ্গবিহীন কীর্ত্তনেই কত আহ্লাদ! কৃপাময়ের কৃপাগুণে, তাঁহাদের উক্ত চারিজনের দীক্ষাগ্রহণের অনুষ্ঠানটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এইরূপে আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় দাদা কেদারনাথ রায় মাতুলদিগের সঙ্গে ক্রমেই জীবনে ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

—০—

নববিধানের নূতন সুর।

প্রাণাধিক শ্রীব্রহ্মানন্দ বল্লেন, "মা আমি বাঁশী, তুমি সুর।" এতদিন পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বের কথা মনে হইতেছে। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে আমরা কয়েকটী দীন কাঙ্গাল মিলে প্রিয় নালুদার সঙ্গে সংগীত ও কীর্ত্তন করিতাম। নালুদা কীর্ত্তন ও সংগীত আরম্ভ হলেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। তাঁর কাছে যিনিই সংগীত করুন না কেন, গান শুনিলেই তাঁর অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইত এবং যেন একটা স্বর্গীয় প্রতিভা তাঁর মুখে প্রকাশ পাইত। তখন মনে হইত, আমাদের এই তো কোকিলকণ্ঠ, তালমানও সেইরূপ, তথাপি নালুদার এত ভাবোদয় হয় কেন? এখন বুঝছি, সত্যই ভক্তিতে, ভাবে ও প্রেমে যাঁরা সংগীত করেন, তাঁরা তো নিজেরা কিছু করেন না। মা বাগ্‌বাদিনী নিজেই ভক্তকণ্ঠে এমন নূতন সুর তুলে দেন, যে সুরের ঝঙ্কারে নরলোক ও দেবলোক মোহিত হয়ে যায়। তাই ভক্ত চিরঞ্জীব গাহিলেন, "......মধুর স্বর-লহরী শুনাও ঝঙ্কার করি, সংগীতসুধার্ণবে রাখ আমারে ডুবায়ে।" আমার এই তালমান-ও-সুরলয়বিহীন সংগীত শুনিয়া তাই বন্ধুরা বলেন, "তোমার দেখচি কোন গানের সুর আটকায় না, তোমার সবই একই সুর"। এখন বুঝছি, প্রাণাধিক নব ভক্তের কথাই ঠিক যে, "মা আমি বাঁশী, তুমি সুর"। সত্যই উহাই অভ্রান্ত বেদবাণী, যে কণ্ঠবীণায় মা নিজে সুর তুলে দেন; সে সুর কি বেসুর হয়? না, সে সুর শুনে মানুষ পাগল না হয়ে স্থির থাকতে পারে? তাই যাঁরা নিজের সুর ফলাতে যান, তাঁদের সব সুরই বেসুর হয়। তাঁর কাছে নিজের সুর ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ভক্তমণ্ডলীর প্রাণ তাতে মজে না। মা যখন আমাদের এই ভাঙ্গা বাঁশী হাতে নিয়ে নিজের সুর তোলেন, তখন আমাদের এই কঠোর প্রাণ বিগলিত হয়, নয়ন দিয়া অশ্রু নিপতিত হয়, প্রাণ উদাস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শনানন্দ-ভোগে জীবন সার্থক হয়। এখন তাই বলতে ইচ্ছা হয়, ভাই ভগিনীগণ, এসো; এতদিনতো অনেক গান করেছি, অনেক নেচেছি, এখন নববিধানের মার সুরে সুর মিলিয়ে, নূতন ভাবে আবার মণ্ডলী গঠন করি, নূতন ভাবে শ্রীদরবার করি, নবোদ্যমে নববিধানের অমৃতময়তত্ত্ব প্রচার করি। পুরাতন পূতিগন্ধময় ভ্রাতৃবিরোধ দূরে পরিহার করিয়া, নববিধানের স্বর্গীয় প্রেমে নব অভিষেক লাভ করি। দেখিতে দেখিতে আমরা বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছিলাম, কিন্তু এখনও নূতন বিধানের নূতন সুরে গান করে দেখাতে পাল্লাম না। "আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান।" জগদ্বাসী সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া আছেন, নববিধানের সেবকগণ, সাধক সাধিকাগণ সত্যই স্বর্গীয় প্রেমে এক অখণ্ড পরিবারের আদর্শ দেখাইতে পারেন কি না? মাগো! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার হাতে এই ক্ষুদ্র দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, তোমার সুরে সুর মিলাইয়া, নববিধানের আদর্শ স্বর্গীয় পরিবার দেখাইতে পারি। মা! আবার বলি, আমি হই তোমার হাতের বাঁশী, তুমি তাতে মধুর ঝঙ্কার তুলে দাও।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—০—

নূতন সঙ্গীত।

(১)

সুর—ভাটিয়ালী

পরাণবন্ধু দাও একবার দেখা,
তোমারই লাগিয়া জনমে জনমে
ভ্রমিতেছি পথে একা।
নিতি প্রভাতের পাখী গান গেয়ে যায়,
সন্ধ্যার বুকে রাত্রি ঘনায়,
শুধু আমার নয়নে পড়ে না তোমার
সোনার চরণ-রেখা॥

স্বপনে যে আমি চাহিনা লভিতে
পুণ্য হৃদয়খানি,
আলোকের মাঝে শুনিবারে চাই
মিলনের মহাবাণী।
কাঁদাইও না আর দাও ধরা দাও,
বিরহের ব্যথা ঘুচাও ঘুচাও,
তুমি বিনা মোর পূজার মন্ত্র
হবে না হবে না শেখা॥

(২)

সুর—"সে দিন দুজনে দোলেছিনু বনে"।

প্রভু অর্ঘ্য অরপিতে এসেছি তোমার দ্বারে

লহনা চরণে লহনা,

পবিত্র কর ওহে অন্তর মম

একবার ফিরে চাহ না।

চঞ্চল হিয়া যেথা খুসী যায়,

তব পদ পানে ফিরে নাহি চায়,

অশ্রুজলে বক্ষ ভাসায়

বেদনা যে শুধু বেদনা।

ধরণীতে আসা হবে কিহে মিছে,

পাব না কি তব পরশন,

কিছু কি হে দিয়ে পারিব না যেতে

প্রাণে প্রাণে করিয়া বপন ?

এখন যে মোরে ঘিরেছে আঁধারে,

ছুটেছে জীবনতরী অকূল পাথারে,

কোন সুরে গেয়ে পাব হে তোমারে,

বল না আমায় বল না।

শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়।

—০—

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

(ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের শ্রাদ্ধোপলক্ষে, গত ২৮শে জুন, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনার প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি)

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥"

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবন ধারণ করে; কিন্তু যাঁহার মন ব্রহ্মমনন দ্বারা সজীব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।

ব্রহ্মবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল; যাঁহারা ব্রহ্মবলে বলী, তাঁহারা জগতে অজেয়। পার্থিবশক্তিশালী রাজার রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, পৃথিবীর বুক হইতে রাজা ও রাজ্যের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের রাজ্য ও গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ব্রহ্মজ্ঞান ইহপরলোকের শ্রেষ্ঠ; সকল ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনী গৃহস্থদের জীবন দেখিয়া আমরাও এই পথের যাত্রী হইতে চেষ্টা করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যৌবনের প্রথম হইতে বহু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের দর্শন ও তাঁহাদের আহারও সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের মধ্যে একজন ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণবাবু পাবনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। বিধবা ধার্ম্মিকা মাতা অতিকষ্টে সন্তানকে শিশুকালে লালন পালন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বৃত্তির টাকা দিয়া নিজের পড়ার বন্দোবস্ত ও মাতার অন্ন সংস্থান করিতেন। এই মাতৃভক্ত বালক কলিকাতায় অধ্যয়নকালে মাতাকে দশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। কলিকাতার অন্ধকার গলির একতলা ঘরে দিনে আলো জ্বালিয়া ও রাত্রিতে জানালার মধ্য দিয়া গৃহাগত গ্যাসের আলোকের সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেন। ছাত্রজীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঘোর দরিদ্রতা ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল। যৌবনে ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া এই কষ্টসহিষ্ণু, উন্নতচরিত্র, সাহসী যুবক ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। নিজের সততা, পরিশ্রম, যত্ন চেষ্টা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে উন্নত জ্ঞান ও স্বীয় প্রতিভাবলে, তিনি অল্প দিন মধ্যেই কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইয়াছিলেন।

অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া, স্বর্গীয় ভক্ত সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা, স্যার কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী সুবালা দেবীকে বিবাহ করেন। সেই সময়ের সম্পন্ন ঘরের ও বঙ্গের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী পরিবারের কন্যা হইয়াও, সুবালা দেবী কয়েক বৎসর দরিদ্র মধ্যবিত্ত ধার্ম্মিক স্বামীর গৃহে সানন্দে ঘর সংসার করিয়াছিলেন।

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ বাবু নিজের চেষ্টায় আপনার দরিদ্রতা দূর করিয়া যখন অর্থ বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন, তখনও আপনার পূর্ব্ব দরিদ্রতা ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই এবং সামান্য অন্ন বস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া দরিদ্রের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যে প্রাচুর্য্য থাকিলেও, অন্তর ছিল দরিদ্রের বিনয় নম্রতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্যে, কার্য্যে ও ব্যবহারে কখনও কেহ বড় লোকের গন্ধ টের পায় নাই। তিনি দুঃখ দরিদ্রতার যে তিক্ত আস্বাদ পাইয়াছিলেন, চিরদিন তাহা তাঁহার মনে জাগ্রত থাকিয়া, দরিদ্র ছাত্রের অধ্যয়নের সাহায্যে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। মৃত্যুকালেও তিনি সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ সিটি কলেজের যোলটী দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার সাহায্যার্থে দান করিয়া গিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে দরিদ্র ছাত্রদের অধ্যয়নের সহায় হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়িয়া, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। অল্পদিন হইল, তিনিও পরলোকগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি ছিলেন বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী ও ব্যবসায়ী। তিনি দরিদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, শৈশবে পিতৃহীন হইয়া ভয়ঙ্কর দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যে মানুষ

স্নেহে প্রতিপালিত হন। যৌবনে আপনার উচ্চ চরিত্র, সততা, অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতাবলে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনিও বীরত্বের সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ততোধিক বীরত্বের সহিত মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া উপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অভাবগ্রস্তকে ও নানা সদনুষ্ঠানে দান করিয়াছেন। তিনি এত বিনয়ী ও নম্র ছিলেন যে, কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আপনার বড় লোকীর পরিচয় কখনও দেন নাই। ইঁহার নাম স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উভয়ে বেক্‌ওয়ার্ড ক্লাস মিশনের (অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠানের) সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।

অনুন্নত শ্রেণী স্যার রাজেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ, তাঁহার অশীতিতম জন্মোৎসবে ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেন ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অভিনন্দনপত্রের সহিত, সামান্য খদ্দর ধুতি, চাদর কাঁসার থালায় করিয়া উপহার প্রদান করেন।

দরিদ্রের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি পাইলেন, সেজন্য লোকে লোকারণ্য সভার মধ্যে তিনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে,—তাঁহার জন্মোৎসবে যত অভিনন্দন ও উপহার তিনি পাইয়াছেন, অনুন্নত শ্রেণীর এই দরিদ্রদের সরল শ্রদ্ধা-ভক্তি-মিশ্রিত উপহার ও অভিনন্দন পত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বর্গীয় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনা হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল, এমন সুন্দর প্রাণ মাতান উপাসনা জীবনে কখনও আর শুনি নাই। দারিদ্র্যব্রতাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য, ঘোর দরিদ্রতা হইতে ব্রহ্মের সাহায্যে ও নিজ পুরুষকারবলে উত্থিত, জীবন সংগ্রামে জয়ী বীরের জীবনে ব্রহ্মের লীলা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। জীবন-সংগ্রামে সম অবস্থাপন্ন প্রাণকৃষ্ণ বাবু স্যার রাজেন্দ্রনাথকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন।

দারিদ্র্যব্রতাবলম্বী ধনী প্রাণকৃষ্ণ বাবু দরিদ্রদিগের সহিত প্রাণের যোগ রক্ষার জন্য, নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ যখন আই, সি, এস্, বরের সঙ্গে ঠিক হইল, তখন তিনি দরিদ্রের ন্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মেয়ের বিবাহ দিলেন ও অভ্যাগতদিগকে সামান্য জলযোগ করাইলেন। কন্যার বিবাহের ব্যয়ের জন্য যে টাকা (শুনিয়াছি দুই হাজার টাকা) বরাদ্দ ছিল, তাহা জনহিতকর কাজে দরিদ্রদের জন্য দান করিলেন। চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্যে তিনি সারা জীবন দরিদ্রদের পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণবাবু ছিলেন সন্তানবৎসল পিতা, সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার সাহায্য করিতেন. এজন্য সন্তানেরাও পিতার উপযুক্ত সুসন্তান হইয়াছে।

যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ নয়, তাহারা ইহপরলোকে কখনও উন্নত আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারে না। নানা অবস্থায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের পুণ্যময় আনন্দের জীবন দেখিয়া, আমরাও যেন তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া নিজে সুখী হইতে পারি এবং সুখী পরিবার, সুখী মণ্ডলী ও আদর্শ সমাজ গঠন করিতে পারি, ঈশ্বর আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার।

—•—

নৃপেন্দ্র-স্মৃতি।

প্রারম্ভ সঙ্গীত

(কুচবিহারে স্মৃতি-সভা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

শতসঞ্চিত স্মৃতি স্মরণে!
নিতি তব পূজা হয়—দানী সদাশয়,
কত পূজা-উপকরণে!!
তুমি ছিলে দীনদুখহারী,
(তাই) স্মরিতেই তোমা—আজু ঘরে ঘরে—
কাঁদে যত নরনারী,—
(আজু) নৃপ নৃপেন্দ্র নামে চারিধার—
পুলকিত চিত—সকল প্রজার—
শুনি গুণগাথা—নু'য়ে পড়ে মাথা—
উদ্দেশে তব চরণে!!
হবে আবার সে দিন হবে গো—
(তব) বংশপ্রদীপ—জগদ্দীপের উজ্জ্বল বৈভবে গো—
আর নাহি কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব—
সবে লভিবে পরমানন্দ—
যদি ঝরেগো নৃপাল তবাশীষ ধারা
রাজ্যেরি হিতকরণে!!

স্মৃতি-অর্ঘ্য

হে বেহার কুলরবি! পুণ্যশ্লোক নৃপেন্দ্র নৃপাল!
হে রাজর্ষি প্রাতঃস্মরণীয়! তব মহাপ্রয়াণের
পঞ্চবিংশ বর্ষ অবসানে—আজি পুনঃ এ অন্তরে পাইয়াছি সাড়া।
আসিয়াছ অশরীরী আমাদের শিরে করুণায় করিবারে আশীষ সিঞ্চন!

নমি মোরা নতশিরে উদ্দেশে যুগল পদকমলে তোমার।
মৃত্যুলোক—কল্পলোক—স্বর্গ যারে কহি', আছ তুমি সেই পুণ্যধামে—
নিত্য সেথা রহি' বর্ষিছ করুণা-ধারা তোমার এ রাজ্যের কল্যাণে!
আসিয়াছ যদ আজ, শুনে যাও মহারাজ আনন্দসংবাদ;
পোহায়েছে বেহারের সুদীর্ঘ রজনী সুলগনে সুপ্রভাতে,
বেহারের উজ্জ্বল গগন-দমতুল-নবদিনমণিরূপী পৌত্র তব,
ভূপেন্দ্র শ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ প্রকাশিয়া দীপ্তি শত
উদিত শ্রীবিমণ্ডিত বেহারের রাজসিংহাসনে!

পৌত্র তব—তব সমতেজস্বী নৃপাল, তব সুশাসন পন্থা
অনুসরি চলিবার সঙ্কল্প যাঁহার,
তাঁর অতুলিত গুণে অচিরে এ বেহারের আকাশে বাতাসে
উড়িবে সহস্র দীপ্ত কীর্ত্তির নিশান, বাজিবে বিষাণ
বিঘোষিয়া দশদিশি জয়ধ্বনি তাঁর।
এসেছিলে তুমি রাজা—দেবতাবাঞ্ছিত এই—
বেহারের কাণ্ডারী হইয়া;—
জগতের চোখে—তুমিই গিয়াছ রাজা—জন্মভূমি জননীরে
পরিচিতা করি'—
তব পন্থা ধরি' মোদের রাজাধিরাজ—
এই মহীয়সী জননীরে নবীন গৌরবে করিবেন গরীয়সী!
বর্ষে বর্ষে স্মৃতিপূজা করি মোরা তব,
করিব সতত দেহে যাবৎ নিশ্বাস,
মুক্তকণ্ঠে গাহিব তোমার নীরব দানের গীতি!
প্রজাতরে স্নেহ-প্রীতি-গাঁথা, তব ধর্ম্মপ্রাণের কাহিনী—
তব বীরপণা সহ—তোমার অজস্র গুণ
কীর্ত্তন করিব মোরা নিত্য নিশিদিন!
বেহারের ইতিহাসে—তব কীর্ত্তি-গাঁথা—
স্বর্ণাক্ষরে ততদিন রহিবে অঙ্কিত—যাবৎ রহিবে ধরা—
যাবৎ এ ধরাবক্ষে রহিবে বেহারভূমি—যাবৎ এ পুণ্যরাজভূমি—
করিবে শাসন হর্ষে—আদি শম্ভু-অংশোদ্ভূত—
বিশ্বসিংহ নৃপতির—বংশধরগণ।
হে মোদের অতীতের রাজ-অধিরাজ!
হে মোদের অস্তমিত বেহার-গৌরব-সূর্য্য!
স্বর্গে বসি—কর তূর্য্যধ্বনি—শব্দে যার বেহারের বিঘ্ন হয় নাশ—
এ বেহার রহে যেন চিরশান্তিময়। স্মৃতিপথে আজি যবে—
আসিয়াছ আমাদের মাঝে—লহ পূজা—লহ রাজা—
ক্ষুদ্রভাবসূত্রে গাঁথা—ছন্দ-পুষ্পমাল্যের অঞ্জলি!
পূজা-অন্তে কি যাচিব বর? এইমাত্র আকিঞ্চন ধরণী-ঈশ্বর!
অজস্র ধারায় কর আশীর্ব্বাদ অমৃত বর্ষণ, দীর্ঘায়ু অমর কর—
আপনার বংশধর—শ্রীশ্রীমন্মহারাজ—শ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণে—
হেরি যাঁরে চির সুখী—যশস্বী ধরায়—মোরা দীন প্রজা তাঁর—
ভাসি নিত্য আনন্দ-সাগরে।

শ্রীসত্যনারায়ণ শুকুল।

—•—

স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

আজ আমাদের নববিধান-পরিবারে কোন দিন আসিয়া পড়িল! এখনও সেই দিনের স্মৃতি হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবল বাত্যা বিতাড়িত তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইতেছে। কুচবিহারে অবস্থানকালে সুদূর সাগরপার হইতে রাজ্যেশ্বরের মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হওয়ার সংবাদ তাড়িতবার্ত্তা-যোগে রাজ্যের দ্বারদেশে আসিয়া আঘাত করিল, এবং নরনারীর হৃদয়কে কাঁপাইয়া তুলিল। তখন উপাসনা-কুটীরে বসিয়া বলিলাম, "ঠাকুর! তোমার নববিধান কি পূর্ণ হইল? কুচবিহারের জন্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভিতর যে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলে, সেই আদেশ কি তোমার বিধানে পূর্ণ হইল?" এখন যতদিন যাইতেছে, ততই দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি যে, বিধাতার সে আদেশ পূর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিধান কে বুঝিবে? "Secrets of the most high." ইহাই তাঁহার বিধান। কুচবিহারে অবস্থান-কালে তাঁহার এই বিধানের ক্রমবিকাশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই সুদূর প্রদেশ হইতে সমাগত পবিত্র ভস্ম প্রাসাদভবনের অদূরে নীরব উদ্যানে মহা সমাধিতে বিশ্রামের জন্য প্রোথিত হইল। তাহার পর কি দেখিলাম, রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী মহারাণী সুনীতি দেবী সন্ন্যাসিনীবেশে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, স্বামীর সমাধিপার্শ্বে সমাধিস্থ হইয়া ভগবানকে ডাকিতেছেন। আমরাও সেই সময়ে, সেই মহা সন্ন্যাসিনীর যোগাসনের পার্শ্বে প্রতিদিন বসিয়াছি। মহারাণী দেবী সুনীতির সেই সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার পবিত্র পার্শ্বে বসিয়া কোন অনুভূতি লাভ করিয়াছিলাম, তাহার আভাস একটু এই স্থানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিশিষ্টাংশে নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ভিতর যে মহা প্রত্যাদেশের করাঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই করাঘাতের একটা প্রতিধ্বনি আমাদের ভিতরও আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ পূর্ণ বিশ্বাসে সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, বিধাতার সেই প্রত্যাদেশ এই মহা সমাধিতে পূর্ণ হইয়াছে। মহারাণী সন্ন্যাসিনী! ভাই ভগ্নীগণ, যদি বিশ্বাসের রাজ্যে তাঁহার বিধানের পূর্ণতা শিক্ষা করিতে চাও, তবে এই মহাসমাধিতে সেই পূর্ণতার গ্রন্থ পাঠ কর।

সেই মহারাজা পুরাতন হিন্দু কুচবিহারে চিরপ্রথাগত আচার ব্যবহার ও মহা পৌত্তলিকতার দুর্গের মধ্যে নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, বিধাতার নবালোক—আঁধারমুক্ত প্রভাতালোক দর্শন করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যাদিষ্ট ভক্তের প্রত্যাদেশের করাঘাত অনুভব করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার ভিতরে যে নববিধান আসিয়াছিল, তাহা একবার অনুভব করিয়া দেখ। নববিধান শব্দ নহে, অভিধান নহে, ইহা বিধাতার এক করাঘাত। কুচবিহার প্রদেশে প্রবেশের পথে একদিকে সাধু দলের বিশ্বাস, আর একদিকে কুচবিহারের নবালোক-সম্পন্ন রাজকুমারের সেই মহা পৌত্তলিকতার ভিতরে নাবিক বীর বালক ক্যাসাবায়ঙ্কার মত বিপন্ন পোতবক্ষে অটল ভাবে দণ্ডায়মানতা। পৌত্তলিকতা ও অপৌত্তলিকতার মহা সংগ্রাম। এই মহা সংগ্রামে একদিকে পৌত্তলিক হিন্দুগণ, আর একদিকে আদেশবাদী ও একেশ্বরবিশ্বাসী ব্রাহ্মদল। কুসংস্কারা-বিষ্ট কুচবিহারের উদ্ধারের জন্য সেই সংগ্রামানলে আহুতিস্বরূপ

ব্রহ্মানন্দের কন্যাদানে, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার-সমন্বিত বাঙ্গলা ও বেহারের মিলনের শুভ সময়ে যে প্রার্থনা উত্থিত হইল, তাহা কি বিশ্বাসীর ভাবিবার বিষয় নহে? পৌত্তলিক দুর্গে বিধাতার জয় হইল। এই অপৌত্তলিক নবীন মহারাজা সেই সুদূর সিন্ধু-পারে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণী মহারাণী ও অপরাপর আত্মীয়বর্গের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "Peace at last."—সব শেষে শান্তি। কুচবিহারে তাঁহার মহা সমাধির উপর এই উক্তি লিখিত রহিয়াছে। তিনি জীবনে অনেক সংগ্রামের পর যে শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, শেষে তাহার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন।

এখন একটু সন্ন্যাসিনী মহারাণীর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বামীর সমাধির পার্শ্বে বসিয়া তিনি একদিন তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন যে, "ঠাকুর, বাবা যে তোমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই সুদূর প্রদেশে অজ্ঞাতকুলশীল জাতির মধ্যে তোমার নামে আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রাপ্ত আদেশ এই সমাধিতে পূর্ণ হইল। এই পবিত্র ভস্ম ভাবী কুচবিহারের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিবে।" আজ আমার এই সাক্ষ্য কোন্ শব্দে, কোন্ অভিধানে শেষ করিব, জানি না। কুচবিহার বাগ্দান অনুষ্ঠানের দুই বৎসর পরে যে মহামিলনের অনুষ্ঠান ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ভক্ত পিতা ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতা কন্যাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, "সুনীতি, তুমি মনে করিও না যে, তুমি রাণী হইলে; আমি দেখিতেছি যে, তুমি দাসী হইলে"। এই উপদেশ নববিধানে নবাহূত রাজ-কুমারের ভিতরেও প্রবেশ করিল। ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়া কন্যা দেবী সাবিত্রী নবীন শিক্ষিত যুবক কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে এই মহামিলন-ক্ষেত্রে মিলিতা হইলেন। হায়! আজও কুচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দির তদ্দেশবাসীদিগের নিকট ব্রহ্মানন্দের ভিতর ব্রহ্মের প্রত্যাদেশের সাক্ষ্য দান করিতেছে। কুচবিহারে তাঁহার নববিধান পূর্ণ হউক।

যাঁহারা বাইবেলে New Testament অর্থাৎ নবসাক্ষ্যাংশে ক্যানা বিবাহ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই দিদৃক্ষু অধ্যাত্মদর্শি-রূপে কুচবিহার বিবাহ অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। ক্যানা বিবাহে যেমন তরল জল আধ্যাত্মিক সুরায় পরিণত হইয়া বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে ঘনীভূত করিয়াছিল, সেইরূপ এই বিবাহে প্রকৃত বিশ্বাসীর বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হইয়াছে। এ নববিধান সাধারণ মানুষের নিকট সহজ বোধগম্য নহে। ভিতরে নব বিধান না জন্মিলে অর্থাৎ "From the oldness of things to the newness of spirit"—এ মহাতত্ত্ব ভিতরে না জন্মিলে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিবেন না। হিমালয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে ময়লা মাটীর ভিতর যে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্রোত অনেক দুর্ভেদ্য প্রস্তর ও বালুকা-রাশি অতিক্রম করিয়া, পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া কত সুদূর পথে চলিয়া যাইতেছে। ইহাই কুচবিহার বিবাহের প্রকৃতিতত্ত্ব। যে ভূমিতে একদিন ভীষণ কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য নিভৃত দুর্গ বর্ত্তমান ছিল, এই বিবাহ সেই সমুদায় বাধা অতিক্রম করিয়া এক নূতন ব্যাপারে পরিণত হইল।] এখন সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, ভক্তকন্যা দেবী সুনীতি ও দেবী সাবিত্রী এবং মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ শরীরে বর্ত্তমান নাই। তবুও আজ সেই মহা অনুষ্ঠানের অষ্ট-পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে দিদৃক্ষু পাঠক পাঠিকাগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, এখনও তাঁহারা 'কুচবিহারের দিকে তাকাইয়', সেই মহা অগ্নিপরীক্ষার পরীক্ষিত ভক্ত ব্রহ্মানন্দের হিমালয়-সদৃশ অটলতা, ভক্তকন্যা দেবী সুনীতির প্রশস্ত ললাটে নব-বিধানের ত্রিপুণ্ড্রকের চিহ্ন, নব উন্মেষে উন্মেষিত মহারাজার হৃদয়ে পুরাতন কুচবিহারের নূতন উদ্ধারের নবীন আশা এবং ভক্তকন্যা দেবী সাবিত্রী ও কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের নব ভাব ও নব আশা অধ্যয়ন করুন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২রা অক্টোবর, সন্ধ্যার পর শান্তিকুটীরে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়; ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ডাক্তার বেরোজ সাহেবের লেখা প্রতাপচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে ও আশীষ গ্রন্থ হইতে প্রতাপচন্দ্রের বাল্যজীবনের বিবরণ পঠিত হয়।

কৃতজ্ঞতা-দান—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ লিখিতেছেন:—গত ভাদ্রোৎসবের কিছু পূর্ব্বে ৮২।২ অপার সার্কুলার রোড বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতিসময়ে, আমার সহধর্ম্মিণী কারবাঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। মঙ্গলপাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ নন্দন বিশেষ যত্নসহকারে চিকিৎসা করায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; এইজন্য আমি নব উদ্যমশীল ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের চরণে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি।

পারলৌকিক—গত ১২ই অক্টোবর, সন্ধ্যায় ৯নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয়া মাখমমণি বসুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার প্রথমাংশ ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ শেষাংশ নির্ব্বাহ করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংগীত করেন। পৌত্রগণ নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২্, ব্রহ্মমন্দিরে ২্, ও অনাথাশ্রমে ৪্, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সিংহ প্রচারভাণ্ডারে ২্ ও

অনাথাশ্রমে ১৲ এবং এই ভ্রাতার কন্যা শ্রীমতী কমলা ধর প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মার এবং পরিবারস্থ সকলের কল্যাণ করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৪ঠা অক্টোবর, ৯১।১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্নেহলতা দাস পিতৃদেব স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতা-নুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠ ও অনুষ্ঠানাংশ সম্পন্ন করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় কেদারবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন, এবং কন্যা প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্ত সংগীত করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, অমরাগড়ী ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, ময়মনসিং ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, শান্তিপুর ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲ ও অনাথ আশ্রমে ২৲, কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৪৲, অনাথাশ্রমে ২৲, মেয়েদের নীতিবিদ্যালয়ে ২৲, ছেলেদের নীতিবিদ্যালয়ে ২৲ ও ভগ্নীসমিতিতে ২৲, অমরাগড়ী নৈশ-বিদ্যালয়ে ২৲, বাগনান নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়ে ২৲, জোড়া ৩টী, ধুতি ৭খানা, কম্বল ১খান দান উৎসর্গিত হইয়াছে। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে নিত্যশান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত শোক-সহানুভূতিপূর্ণহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৯ই অক্টোবর, সাধক স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুলটীর বেঙ্গল আইরন ওয়ার্কসের ফোরম্যান্ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র রায় ৩৪ বৎসর বয়সে, মহাসঙ্কটাপন্ন টাইফয়েডে ভুগিয়া, কলিকাতায় মধ্যমা ভগ্নী শ্রীমতী সুষমা বসু ও ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসুর গৃহে, ৩৩।বি গোয়াবাগান লেনে, রাত্রি ১১টা ১৫মিনিটের সময়, পাঁচ মাসের নববিবাহিতা পত্নীকে এবং ভ্রাতা, ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, স্বধামে পিতামাতার সকাশে চলিয়া গিয়াছেন। পরমজননী তাঁহার স্নেহের সন্তানকে তাঁর অমৃতময় বক্ষে স্থানদান করুন এবং পৃথীবস্থ সকল শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, মধ্যাহ্নে, বিডন ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সংগীত করেন।

গত ১৪ই আশ্বিন, (৩০শে সেপ্টেম্বর) কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২রা অক্টোবর, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়; ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

অদ্য ৫২বি, রিচি রোডে, রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের গৃহেও এই উপলক্ষে উপাসনা হয়। জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতি দাস ২৲ এবং সুরেশবাবু ২৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর, ৬৮এ স্যার কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস গুপ্তের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা করেন।

গত ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর), কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের কন্যা স্বর্গীয়া সরমা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বেলা সেন প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভ্রাতা ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের গৃহে, ৯ই অক্টোবর, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের এবং ১১ই অক্টোবর তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মিত্রের সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনাদি হইয়াছে।

শারদীয় উৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী নিম্নলিখিত ভাবে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং সকলকে মার পূজায় যোগদানের জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন :—

আগামী ২২শে, ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে অক্টোবর—বৃহস্পতি-বার, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার—প্রতিদিন প্রাতে ৮টার সময়, ৭৮বি অপার সার্কুলার রোডে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে উপাসনা এবং রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬॥টার সময়, ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আরতির কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও পাঠাদি এবং রবিবার দশমীর দিন সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইয়া শান্তিবাচন হইবে।

মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দির।

এ বৎসর বিহারে প্রবল বর্ষা হওয়ায়, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের খাপরার ছাউনী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহাতে মন্দিরের ভিতর সহস্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ভক্তিতীর্থের তত্ত্বাবধায়ক সমবিশ্বাসী বন্ধু ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় মুঙ্গেরে যাইয়া ব্রহ্মমন্দিরটী মেরামত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ঐ কার্য্যে অন্যূন ৫০৲ পঞ্চাশটী টাকা শীঘ্র দরকার। অতএব ভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রাণের ভক্তিতীর্থের রক্ষণকল্পে, আমি সমবিশ্বাসী সহৃদয় ভাই ভগিনীদিগের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

বিনীত—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়
সহঃ সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ২০।২১শ সংখ্যা।
১৬ই কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩সাল, ১৮৫৮শক, ১০৭ব্রাহ্মাব্দ
2nd & 17th. November, 1936
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বজননি! এ সময়ে বঙ্গভারতের প্রাচীন অসংখ্য হিন্দু পরিবারের অনুষ্ঠিত শারদীয় শ্রীদুর্গা-পূজার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া আমরাও শারদীয় উৎসবকে আমাদের জাতীয় মহোৎসবরূপে গ্রহণ করিলাম। মা! তোমার আধ্যাত্মিক মহাপূজার যতটুকু সুযোগ তুমি আমাদিগকে দান করিলে, সেইভাবে পূজা নির্ব্বাহ করিলাম। মা, এবার তুমি অনন্তের মহাপূজায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছ, এই নবযুগে নববিধানে তুমি অনন্তের মহাপূজা সম্পাদন করিতে নিজে অন্তরের গুরু হইয়া শিক্ষাদান করিতেছে, বিশ্বের সকল সাধু ভক্ত মহাজনগণের জীবনের পূজোপকরণগুলি প্রাণে লইয়া শুদ্ধতার অগ্নিতে, নিষ্ঠার অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া, ভক্তি, অনুরাগ, সেবা প্রভৃতি হৃদয়ের বিবিধ অনুপম ভাবকুসুমে সজ্জিত হইয়া পূজা করিতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছ। আমরা এরূপ মহাপূজার প্রস্তুতিব্যাপারে কত কাঙ্গাল, তাহা তুমি জান। আমাদিগকে কাঙ্গাল জানিয়া, কাঙ্গালভাবেই আমরা তোমার পূজা-বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগকে কাঙ্গাল জানিয়া, আমাদের আদরের ভাই ভগ্নীগণ আমাদের আহ্বানে, মনে হয়, সকলে তেমন হৃদয়ের সহিত সাড়া দেন নাই। কিন্তু তুমি কি কাঙ্গাল গরিবদিগকে উপেক্ষা করিতে পার? তুমি যে, মা, দীনপালিনী। তাই তুমি আমাদের হৃদয়ের ও বাহিরের অল্প আয়োজন মধ্যেও আমাদিগকে তোমার মহা মহোৎসবের, মহাপূজার প্রসাদ আমাদের জীবনের উপযোগিভাবে বিতরণ করিয়া, পূজানন্দে আমাদিগকে ধন্য করিয়াছ। বালক যুবা বৃদ্ধ উপস্থিত সকলেই পূজার প্রসাদ আত্মিকভাবে ও বাহ্যভাবে গ্রহণ করিয়া স্বর্গের আনন্দে মাতিলেন ও নৃত্য গীত করিলেন। কিন্তু মা! এই মহোৎসবের সময়ে আমাদের মধ্যে বিশেষ শোকের আঘাতেও আমাদিগকে স্বর্গের বিশেষ চেতনা দান করিলে; শোকের আঘাতে জর্জ্জরিত প্রাণেও তুমি শান্তিসান্ত্বনা-দানে ধন্য করিতে ভুলিলে না। ধন্য তোমার করুণা! এ সময় মণ্ডলীর, দেশের, বিদেশের, সমস্ত বিশ্বের দুঃখ দৈন্য শোকে, নানাভাবে প্রপীড়িত লাঞ্ছিত আমাদের সকল ভাইভগ্নীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করি, দুর্গতিহারিণী জননি! তুমি নিজ কৃপাগুণে, তোমারই নিগূঢ় ব্যবস্থায়, এ মণ্ডলীর এবং এদেশের ও বিদেশের তোমার সকল পুত্রকন্যার দুঃখ দৈন্য দুর্গতি দূর করিয়া, সকলের প্রাণে স্বর্গের শান্তি, আরাম আনন্দ দান

কর, এবং তোমার পূজা সকল পরিবারে, সকল গৃহে, ছোট বড় সকল জীবনে সত্যিকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ভারতে জাতীয় উৎসব—শ্রীদুর্গোৎসব

কোন্ সুদূর অতীতে ভারতে মাতৃপূজার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে প্রশ্ন তুলিয়া তাহার মীমাংসার পক্ষে এ সময়ে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে মাতৃপূজা পৌরাণিক যুগের বিশেষ ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পৌরাণিক যুগ আরম্ভ হওয়ার পর কোন একটী দেবতার পূজা, কি কোন একটী দেবীর পূজা অখণ্ড ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, একথা বলা যায় না। বঙ্গভারতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায় আমরা পৌরাণিক যুগের ফলস্বরূপ বর্ত্তমানেও দেখিতে পাই। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিপালনীয় বিশেষ একটি বিধি এই দান করিলেন, "না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ, না করিবে অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।" নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ অন্যদেবতার নিন্দন বন্দন করিবেন না, অন্য দেবতার প্রসাদভক্ষণও করিবেন না। একনিষ্ঠভাবে একেতে মন প্রাণ না রাখিলে শুদ্ধা ভক্তির সাধন হয় না, এজন্য খাটি বৈষ্ণব গৃহে এক বিষ্ণুপূজা ভিন্ন অন্যদেবতার পূজা হইত না; অন্যদেবতার উদ্দেশ্যে কোন ব্রত নিয়মও প্রতিপালিত হইত না। এ অবস্থায় দুর্গাপূজা যে বঙ্গভারতের সকল গৃহের সর্ব্বথা অনুমোদনীয় পূজা কখন ছিল না, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বিশেষভাবে দুর্গাপূজা, কালীপূজা বলিপ্রধান; শুধু ছাগ প্রভৃতি বলি নহে, নরবলি পর্য্যন্তও এরূপ পূজায় ব্যবস্থা ছিল। বৈষ্ণবগণ, বৌদ্ধগণ কখন এরূপ পূজায় যোগ দান করিতে পারেন না। কথা আছে, যে গৃহে বলি হয়, অন্ততঃ তিন দিন সে গৃহে বৈষ্ণবের গমন নিষেধ। বঙ্গে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একটা স্মরণীয় ব্যাপার। যদিও পরবর্ত্তী সময়ে এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট জাতীয় জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবের একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দুর একই বাড়ীতে একদিকে দুর্গাপূজা হইতেছে, অন্য দিকে বিষ্ণুপূজা হইতেছে। সময়ে বিষ্ণু দেবতার এত প্রাধান্য-স্থাপন হইয়াছে যে, শালগ্রামশিলার পূজা ভিন্ন কোন পূজারই পূর্ণতা সাধন হয় না। ইহাই এখন অধিকাংশ গৃহীর ঘরের প্রচলিত প্রথা।

আমরা শ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এতগুলি কথা এই জন্য উল্লেখ করিলাম, যদিও গোঁড়া বৈষ্ণবগণ অন্য দেবতার পূজা করেন না, ভাবতঃ অন্য দেবতা স্বীকার করেন না, যদিও শালগ্রামশিলা বিষ্ণুপূজার স্থান অধিকার করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের প্রায় অধিকাংশের ঘরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যদিও দুর্গাপূজা বঙ্গভারতের অনুষ্ঠানগত সর্ব্ববাদিসম্মত পূজা নহে, তথাপি দুর্গাপূজা বঙ্গ ভারতের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনের মহাপূজারূপে, দুর্গোৎসব হিন্দুর জাতীয় জীবনের মহামহোৎসবরূপে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসবরূপে পরিণত হইয়াছে, একথা বলিতেই হইবে।

এত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসত্বেও বঙ্গভারতে শ্রীদুর্গার পূজা কেন এত প্রাধান্য লাভ করিল, কেন জাতীয় মহা মহোৎসবে পরিণত হইল, ইহার উত্তরে সহজে আমাদের এই বলিতে ইচ্ছা হয়, মাতৃভাবের তুল্য সুমিষ্ট ভাব, আপনা হইতেও অতি আপনার অন্তরঙ্গ ভাব আর কিছুই নাই, মাতৃনামের তুল্য সুমিষ্ট নামও আর কিছু নাই। মাতৃভাব আবার এত মহিমা গৌরবে পূর্ণ যে, মাতৃভাব পিতৃভাবকেও খানিকটা নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। তাই বঙ্গভারতে শ্রীদুর্গাপূজার এত প্রাধান্য ও গৌরব। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, এই তিন ভিন্ন ভাবের শ্রেষ্ঠ পূর্ণতা মাতৃভাবে। সংসারে আমরা দেখিতে পাই, পিতা উপার্জ্জন করেন, ধন ঐশ্বর্য্য দ্বারা গৃহ পূর্ণ করেন, কিন্তু গৃহসামগ্রী হিসাবে গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহিণী। পিতা বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন; যেমন গৃহে সামগ্রী সকল সঞ্চিত হইল, তেমনি গৃহের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল সামগ্রীই গৃহিণীর হস্তে। গৃহের পুত্রকন্যাগণের বিশেষ আবদার মায়ের কাছে। মায়ের ভাণ্ডার সন্তানের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পূর্ণ। তাই পুত্রকন্যার নিকট পৃথিবীর মাতা অসীম ঐশ্বর্য্যময়ী। আর স্নেহভরা মায়ের মত মধুর সামগ্রী সংসারে সন্তানের পক্ষে আর কি হইতে পারে? আবার মায়ের মত সন্তানের নিকট সুন্দরীই বা কে? মা কুরূপা হইলেও

সন্তানের নিকট সেই মা পরমা সুন্দরী; কেন না মধুর মাতৃভাবই কুরূপা মাকেও সুন্দরী করে সন্তানের নিকট। পৃথিবীর মাই যদি সন্তানের নিকট এত ঐশ্বর্য্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী ও পরমাসুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, তবে জগন্মাতা যিনি, অনন্তস্বরূপা যিনি, তিনি ভক্ত সন্তান, ভক্ত পুত্রকন্যাদিগের নিকট অনন্ত ঐশ্বর্য্যে, অনন্ত মাধুর্য্যে ও অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবেন এবং তাঁহারা সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহাই তো সত্যিকার কথা। কোন্ ভক্তের নিকট ঈশ্বরের চিন্ময়মাতৃরূপের মাতৃভাবের প্রথম প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল, আমরা জানিনা। কিন্তু ভক্তের হৃদয়-কন্দরে যে গভীর মাতৃভাবের ঐশ্বরিক প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহা সে ভক্তও ভাষায় সম্পূর্ণ অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন না, এবং যিনি সে ভাষা শ্রবণ করেন, তিনিও সম্পূর্ণ ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা"। ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর যখন মাতৃরূপে প্রকাশিত হইলেন, ঈশ্বরকে ভক্ত মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কবি সেই মাকে বাহিরের উপমায় নানা ভাবে চিত্রিত করিলেন, আর ভাস্কর সেই কবির চিত্রিত উপমাকে প্রতিমায় পরিণত করিলেন।

পৌরাণিক দেবদেবীগণের প্রত্যেকেরই প্রায় আপনাপন বৈশিষ্ট্যানুসারে মহিমা গৌরব বর্ণনাচ্ছলে, বিশেষ বিশেষ কবি বিশেষ বিশেষ গাথা বা প্রস্তাবনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীদুর্গার মহিমাবর্ণনা-সূচক গাথার নাম চণ্ডী। কথিত আছে, অদম্য দৈত্য দানব অসুর প্রভৃতির সংহারের জন্য, স্বর্গের দেবতাগণের প্রতিজনের বিশেষ বিশেষ শক্তির সম্মিলনে এক মহাশক্তি নারীমূর্ত্তি সৃজিত হয়। তিনিই মহাশক্তিরূপিণী দেবী। আপনার ঐশ্বরিক মহাশক্তি বলে শ্রীদুর্গা শম্ভু, নিশম্ভু, মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি দূর করেন, তাই তাঁহার নাম হইল শ্রীদুর্গা। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তাই তাঁহার নাম হইল ভগবতী। কবি আপনার কবিত্ববলে চণ্ডীগ্রন্থে দেবীমাহাত্ম্য যতদূর সম্ভব বর্ণনা করিয়াছেন। কবির বর্ণনা মানবীয়, তাহাতে কত অপূর্ণতা, কত কল্পনা, তাহা কত অসত্যজড়িত। তাই চণ্ডীর বর্ণনা এত কবিত্বপূর্ণ হইলেও, নিতান্ত অপূর্ণ ও কল্পনা-জড়িত। তাই চণ্ডীর বর্ণিত এবং ভাস্করের চিত্রিত বাহিরের শ্রীদুর্গা এত ঐশ্বর্য্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী ও সৌন্দর্য্যময়ী হইলেও, আসল দুর্গার তুলনায় নিতান্তই অপূর্ণ। আসল দুর্গা অতীতে কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে তখনকার অবস্থায় যতটা সম্ভব প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

নবযুগে নববিধানে ঈশ্বরের কল্পনা-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্যের প্রকাশ। তিনি সকল প্রকার অসত্য কল্পনা হইতে বঙ্গ ভারতকে, সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য, সত্য ব্রহ্মজ্ঞান জগতে বিস্তার করিবার জন্য, এই যুগে যেমন তাঁহার বিশেষ চিহ্নিত প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের জীবনে জীবন্ত জাগ্রত দেবতারূপে অবতীর্ণ হইতেছেন, তেমনই ছোট বড় তাঁহার সকল পুত্র কন্যার জীবনেও জীবন্ত ভাবে অবতীর্ণ হইয়া আপনার সত্যদর্শনদানে সকলকে ধন্য করিতেছেন। গুরুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যেমন সাধু মহাজনের জীবনে, তেমনি ছোট বড় অন্যান্য তাঁহার সকল পুত্রকন্যার জীবনে ধর্ম্মক্ষেত্রের সকল শিক্ষাদানে সকলকেই কৃপা করিতেছেন। এবার তিনি আপনার দিব্য বাণীতে সকলকে শিক্ষা দিতেছেন, জীবনপথে সকলকে পরিচালন করিতেছেন। এবার তাঁহার মাতৃরূপের অবতরণও সম্পূর্ণ কল্পনা-বর্জ্জিত। এবার একাধারে তিনি মহাশক্তিরূপা, পরম জ্ঞান পরাবিদ্যা, অনন্ত স্নেহের দিব্যমূর্ত্তি, ধনধান্যবিধায়িনী লক্ষ্মী, পরিত্রাণদায়িনী, পুণ্যদায়িনী, অসুরসংহারিণী, সকল বিঘ্নহারিণী শ্রীদুর্গা। এবার প্রতিমা নয়, উপমা নয়, সত্য মা। তাই নববিধানের শ্রীদুর্গোৎসব যথার্থ জাতীয় মহা মহোৎসব।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

শরীর আদরের বস্তু

"আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরীরের ভিতরে আত্মা থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া শরীর বাঁচিয়া আছে, আত্মা না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শরীর বিনা আত্মা পৃথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না; সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার, আত্মাও তেমনই শরীরের অবলম্বন। দুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি, আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে; কিন্তু শরীরের

সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস ও শান্তিরস লাভ করে, তাহা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাত্মা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্ম্মমধু, জ্ঞানমধু প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় করে। অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তু, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।"

ধর্ম্মপথে নিরাশা

"কতকগুলি পরীক্ষাতে হৃদয় আন্দোলিত হইলে নিরাশা উপস্থিত হয়। ইহার জন্য অগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত না রাখিলে অত্যন্ত বিপদ। মনে যদি একটু সংশয় কি নিরাশার ভাব থাকে, পরীক্ষার সময় তাহা দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। নিরাশা প্রমাণ দেখাইয়া অবিশ্বাসী হৃদয়কে বলে দেয়, 'তোর আর আশা নাই, তুই আর জীবনকে এরূপ উপহাসের বিষয় করিস না, ধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সকলই মিথ্যা।' ধর্ম্ম যেমন প্রমাণ দেখাইয়া বিশ্বাস দৃঢ় করেন, অধর্ম্ম তেমনই অবিশ্বাস প্রবল করিয়া দেয়। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মরিবে প্রতিজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে, 'এ অবস্থা নিরুপায়, অসহায় অবস্থা। যিনি বলিয়াছিলেন, আমি পরম পিতা, তিনিও পরিত্যাগ করেন। বুঝিয়াছি, বিপদ্‌কালে তিনিও শুনেন না, বিষয়ী বন্ধুর ন্যায় অকূল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করেন। তিনি যদি দয়াময় হন, তবে কি এমন হয়? তবে তিনি দয়াময় নন। তাঁহারও মনুষ্যের ন্যায় স্নেহ দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দুই বৎসর, নয় পাঁচ বৎসর দয়া করিলেন, কিন্তু চিরকাল কি করিতে পারেন?' কিন্তু ভক্ত সাধকের ভাব ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, ঈশ্বর কখনই পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না। তিনি কখন চরণের আশ্রয় দেন, কখন পদাঘাত করেন; কখন মিষ্টান্ন, কখন তিক্ত বস্তু দেন; কখন সূর্য্য, কখন অন্ধকার দেখান; কখন বিপদ, কখন সম্পদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর মারিতেছেন মারুন, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় নাই। কেন না আমি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার যে চরণ এক সময় আশ্রয় দিয়াছে, সেই চরণই আঘাত করিতেছে। তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে পরীক্ষাতে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আমার চৈতন্য হইবে। তিনি অন্ধকারের পর আলোক, বিপদের পর সম্পদ আনিবেন, কেন না উভয়ই তাঁহার প্রেরিত।"

(কেশব)

মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী

(রবিবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৮০২ শক; ১০ই অক্টোবর, ১৮৮০খ্রী)

একটি মৃত্তিকার পাত্রে সুবর্ণ; পাত্রটি বদ্ধ। এই অবস্থাতে সেই পাত্র প্রতিবৎসর আমাদের দেশে আসে। আধারের বাহ্য শোভা-দর্শনে নরনারী মুগ্ধ হয়। আধারের মুখ বদ্ধ, কেহই আধার খুলিয়া তাহার মধ্যে কি অমূল্য ধন আছে, তাহা দেখে না। সিন্দুকের ভিতরে কোটি কোটি মুদ্রা থাকিলেও চাবী বিনা তাহার সম্ভোগ অসম্ভব। সেইরূপ এই যে রত্নভরা মৃন্ময় আধার বৎসর বৎসর আমাদের দেশে আসে, যাহাকে এই দেশের লোকেরা পূজা করে, ভক্তি করে, সেই আধারের ভিতরে যে চিন্ময়ী দেবী আছেন, যোগ চাবী ভিন্ন তাঁহাকে খুলিয়া বাহির করিবার উপায়ান্তর নাই। মৃত্তিকার ভিতরে দেবীস্থাপন, মাটীর ভিতরে মহেশ্বরী। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মাণ্ডপতি মৃত্তিকা-মধ্যে! ভগবতী বাহির হইবেন মাটী ভেদ করিয়া! মৃন্ময় পাত্র অতি সুন্দর হইতে পারে, নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতে পারে, সকলে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহার মধ্যে যে মহেশ্বরী বাস করেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখিতে পায়। যোগনেত্রবিহীন হইয়া কেহই মৃন্ময় পাত্রে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। এই খেদ মনে রহিল, বঙ্গদেশে যথার্থ ভগবতীকে সাধারণ লোকে পূজা করে না। আশ্বিন মাস আসিল, কত ঘরে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু বঙ্গদেশে যথার্থ জগজ্জননীকে মা দুর্গা বলিয়া কেহ তো ডাকিতেছে না। বঙ্গদেশে পুতুল-পূজা হইল, কিন্তু মার পূজা হইল না। যথার্থ মা মাটীতে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন।

কোথায় সেই সতী? সতীপূজা করিবার জন্য সকলেই আকুল। সতী পূজার জন্য মনুষ্যস্বভাব লালায়িত। মাটীর ভিতরে সতী কল্পনা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থান কি প্রকৃত সতীপূজা ভুলিল? আমাদিগের পরমারাধ্যা দেবী, সতী যাঁহার নাম, যাঁহার মধ্যে অনন্ত পতিব্রতা ও প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে, কৈ তাঁহাকে কে ডাকিতেছে? সেই আদ্যাশক্তি সতী ব্রহ্মের প্রেমবিভাগ, অপরার্দ্ধ পুণ্য। এক স্বভাব যোগেশ্বর মহাদেবের স্বভাব, আর এক প্রকৃতি করুণাময়ী জননীর প্রকৃতি। সেই দেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে আপনার কোন অংশের অপমান অথবা লোপ দেখিলে সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই আখ্যায়িকায় কথিত আছে, যখন যজ্ঞস্থলে মহাদেবের অপমান হইল, তখনই সতী আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামিনিন্দা সতীর নিকটে অসহ্য। দুর্গা-চরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোমলহৃদয়া সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ্য করিতে পারেন না। ব্রহ্মের কোমল প্রেম, যাহা চিরকাল নারীরূপ ধরে, কদাচ ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ পবিত্রতার অপমান সহ্য করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেই সতী কোথায়, যাঁহার পূজা করিলে যুগপৎ পুণ্য ও প্রেম লাভ করা

য়। সমুদয় মানবপ্রকৃতি সেই সতীচরিত্র দেখিবার জন্ম ব্যাকুল। ব্রাহ্মসমাজও অসতী কলঙ্কিনীদিগের পাপরাজ্য ছাড়িয়া সতীর দিকে যাইতে চায়।

যাঁহার নাম-শ্রবণে জীবের পরিত্রাণ হয়, যাঁহার পূজা করিলে অশুদ্ধ এবং অসুখী মনও শুদ্ধ এবং সুখী হয়, সেই সতীপূজা ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এখন প্রশ্ন এই, সেই সতী কোথায়? কেহ কেহ বলে, এই আশ্বিন মাসে সেই সতী বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে মাটীর আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বিশ্বজননী সতী দেবী মাটী হইতে পারেন; কিন্তু মা মাটীর ভিতরে থাকিতে পারেন। যাহার ভক্তিচক্ষু আছে, সে মাটীর ভিতরেও মাকে দেখিতে পায়, মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে চিন্ময়ী জননীকে দেখিতে পায়। মৃত মাটীর ভিতরে জীবনময়ী সতীকে উপলব্ধি করাই যোগতত্ত্ব। যদি মাটীর ভিতরে সতীকে দেখিতে, তাহা হইলে যথার্থ দেবীপূজা কি, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতে। সতী ভগবতী ব্রহ্মের প্রকৃতি। তেজোময় পুণ্যময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি, মা নামে নারী-স্বভাব ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম আপনি আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন—"প্রকৃতি দেবি, তুমি জগতের মা হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা হইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি সুকোমল স্বভাবে জগৎকে বশীভূত কর।" মহাদেবীর অবতরণের অন্য অর্থ আর নাই। এই মা দুর্গা ব্রহ্মের প্রেমস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ। যাহারা দুর্গা-প্রতিমার মূলে ব্রহ্মের এই কোমল প্রকৃতি দেখে নাই, তাহারা অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচয় পায় নাই।

প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারেরা আকারের মধ্যে ভগবতীকে বদ্ধ করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সমর্পণ করিয়াছেন। লোকগুলি এত কাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিয়া আসিতেছে, এখন পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবতীর পূজা হয় নাই। যে মন্ত্রে মৃত্তিকাপূজা হয়, তাহাতে ভগবতীর পূজা হয় না। যোগসহকারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে, তাহার ভিতরে জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার নিরাকার অঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীও আত্মজারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এক মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্ত্তি দেখিবে। বাস্তবিক ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইঁহারা যে তিন ব্যক্তি, তাহা নহে; কিন্তু স্বয়ং ভগবতীই লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ইঁহারা ভগবতীর এক একটি স্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে ধন ধান্য ও সুখ শান্তি বিতরণ করিতেছেন, এবং তিনিই সরস্বতীরূপে অর্থাৎ বিদ্যারূপে সকলকে জ্ঞান দান করিতেছেন।

ভারতবর্ষে আর্য্য কবি ও ভাবুকেরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর্ণ লইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা কেবল উপমা। আবার যখন সুনিপুণ চিত্রকরেরা এই উপমা লইয়া দেব দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করে, তখন উপমা প্রতিমা হয়। প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা। তিনেতেই মা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ ভক্ত এ সকল উপমা ও প্রতিমা ভেদ করিয়া আসল জীবিতেশ্বরী মাকে না দেখিতে পান, ততক্ষণ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারেন না। কবি উপমা সৃজন করিল, চিত্রকর প্রতিমা গঠন করিল, ভক্ত এই উপমা প্রতিমার ভিতর হইতে আবার মাকে উদ্ভাবন করিলেন। আদিতে মা, অন্তে আবার মা। যথার্থ মা দুই শ্রেণীর লোকের হাতে পড়িয়া দুইটি রূপ ধরিলেন, একটি কবির অলঙ্কারশাস্ত্রের উপমা, আর একটি চিত্রকরের নিকট প্রতিমা। মার সম্পর্কে উপমা পরিত্যাগ করা শাস্ত্রকারের সাধ্যাতীত। মার যে প্রকার রূপ গুণ, তাহা দেখিলে কবিত্ব অনিবার্য্য। মার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলেই উপমা আবশ্যক হয়। যাই বলা হইল, আদ্যাশক্তি ভগবতী অসুরকুলনাশিনীর অনেক শক্তি, তখনই কবি মাকে দশভুজারূপে বর্ণনা করিলেন; দশ হস্তে অলৌকিক বল প্রকাশ করিয়া মা অসুরকুল বধ করিতেছেন। যখন কবি অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে এই উপমা করিলেন, পার্শ্বে ছিল মূর্ত্তিনির্ম্মাতা, সে তৎক্ষণাৎ মার বাহু গড়িল, অমনি অসুরসংহারের মূর্ত্তি গঠিত হইল। কবির গ্রন্থে বর্ণিত উপমা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইল না, এই জন্য মনুষ্যস্বভাবের স্পৃহা পূর্ণকরণার্থ চিত্রকর উপমাকে চিত্রে পরিণত করিল। অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনি উপমিত হইলেন, চিত্রে তিনি চিত্রিত হইলেন। জগজ্জননীর এক পার্শ্বে সরস্বতী অর্থাৎ শুভ্র জ্ঞান এবং অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যদায়িনী গৃহদেবী বিরাজ করিতেছেন। লোকে বলে লক্ষ্মী সরস্বতী জগজ্জননীর কন্যা; লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার কন্যা নহেন, ইঁহারা তাঁহার সখী। কেননা জগন্মাতার জ্ঞান ও সন্তানপালিনী শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হিন্দুদিগের দুর্গা-প্রতিমার মধ্যে এ সকল নিগূঢ় স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেবল যোগচক্ষেই এ সকল প্রকাশিত হয়, পৌত্তলিকেরা তাহা জানে না। উৎস জানে না, তাহার ভিতর হইতে কেমন নির্ম্মল বারি প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুক জানে না, তন্মধ্যে কত রত্ন আছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জগজ্জননীর এই অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। ইহার ভিতরে কত অমূল্য রত্ন আছে, বঙ্গদেশ দেখিল না। ভ্রান্ত বঙ্গদেশ, কেন তুমি মাকে উপমা ও উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাইলে? যিনি ত্রিজগতের জননী, তিনি কি মাটী হইতে পারেন? চিন্ময়ী মাকে, সতীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদাচ মৃন্ময়ী ভাবিও না; তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকারা আকাশরূপিণী জানিয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা কর। লক্ষ্মী সরস্বতী মা হইতে ভিন্ন নহেন, এই দুই প্রকৃতি মার স্বভাবের মধ্যে সখীভাব ধারণ করিয়া আছে। যখন

মাকে দেখিবে, মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও দেখিতে পাইবে। মা তাঁহার জ্ঞান ও বাৎসল্যপ্রকৃতি ছাড়িয়া ভক্ত সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। মাকে দেখিলে, মার পূজা অর্চ্চনা করিলে, অথচ তোমার জীবনে অজ্ঞান অন্ধকার, দুর্ভাগ্য দুর্গতি রহিল, ইহা হইতে পারে না। প্রকৃত মাকে দেখিলেই তাঁহার সরস্বতী এবং লক্ষ্মীপ্রকৃতি আসিয়া তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, করিবেই করিবে। মা তাঁহার দিব্যজ্ঞান, প্রত্যাদেশ ও শাস্ত্র সকল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতরণ করেন।

জ্ঞান ব্রহ্মপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য, যোগভক্তি, বিবিধ রহস্য, প্রত্যাদেশ, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ও শাস্ত্র প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার আর এক ভাব জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞানরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। যাঁহারা প্রেমের সহিত ব্রহ্ম-পূজা করেন, তাঁহারা জানেন, যিনি দুর্গা, তিনিই সরস্বতী ; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞানদাতা। মা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি বলিতে-ছেন, আর গণেশ সে সমস্ত জগতে বিস্তার করিতেছেন। ভাবিবার জন্য জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মনে করিতে পার, সরস্বতীকে ভগবতীর পার্শ্ববর্ত্তিনী মনে করিতে পার ; কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম এবং তাঁহার জ্ঞান, ভগবতী এবং সরস্বতী একই। যখনই সত্যভাবে ভক্তির সহিত মার পূজা করি, তখনই দেবীর উক্তি শুনিতে শুনিতে নূতন নূতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যেমন দুর্গা-দর্শন, অমনই সরস্বতীরূপ-দর্শন ; যেমন ব্রহ্মদর্শন তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের সঞ্চার। জগজ্জননী যেমন অসুরসংহারিণী দুর্গা, তেমনি তিনি জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। যখন তিনি সত্য প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সরস্বতী মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া উপমাকে প্রতিমা মনে করে, অলঙ্কারকে সত্য মনে করে, তবে তাহারই দোষ।

জগজ্জননীর যে কেবল সরস্বতী এক সখী, তাহা নহে, তাঁহার আর এক সখী লক্ষ্মী। যে ভক্তের বাড়ীতে মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষ্মীরূপা, শ্রীস্বরূপা। বিশ্রী দেবী, লক্ষ্মীবিহীন দেবী কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? ভুবনমোহিনী মা কি বিবর্ণা কদাকারা? যে নরনারীর হৃদয়মধ্যে মা ভগবতীর আবির্ভাব হয়, সেই নরনারীর লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। নাস্তিক পাষণ্ডের সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। যে দস্যু দশ হাজার মানুষ কাটিয়া ধনী হইল, তাহার সংসারকে কি লক্ষ্মীর সংসার বলিবে? ভক্ত যদি দরিদ্র হন, তথাপি তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ভক্তের গৃহের সম্পদ বিপদ সকলই ঈশ্বর প্রেরিত। ভক্ত শাকান্ন আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্ষ্মীর সংসার দেখিলেই বুঝা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লক্ষ্মীছাড়া হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, ঈশ্বরের পূজা করিয়া লক্ষ্মীবিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও অকল্যাণ দূর হয়। যাহার বাটীতে দুর্গতিনাশিনী অবতীর্ণ হয়েন, তাহার সংসারে আপনা আপনি লক্ষ্মীশ্রীর অভ্যুদয় হয়। যিনি ভক্তের আত্মার পাপ বিনাশ করেন, তিনি পার্থিব অকল্যাণও দূর করেন। কার্ত্তিক মূর্ত্তিরও অর্থ আছে। যে বাড়ীতে কার্ত্তিকের অধিষ্ঠান, সে বাড়ীতে অলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্য আসিতে পারে না। কার্ত্তিক যুদ্ধের তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সরস্বতীর বিরোধী ও লক্ষ্মীর বিরোধী অকল্যাণ সমুদয় বিনাশ করেন। পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিনা মার জয় হয় না। কার্ত্তিক সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন, এবং মার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন ও সত্যরাজ্য বিস্তার করেন। হে মূঢ় ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্মপূজা করিলে, অথচ তোমার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হইল না, তুমি অবিদ্যা পাপের উপর জয় লাভ করিলে না, তোমার শত্রুদল প্রবল রহিল, তবে তুমি কার্ত্তিকের পরাক্রম দেখিতে পাইলে না। তবে তোমার প্রকৃত মহাদেবী পূজা হয় নাই। সাধক, যদি তুমি ভগবতীর মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, এ সকল দেখিতে না পাও, তবে তুমি হিন্দু নহ, ব্রাহ্ম নহ। যদি তুমি যথার্থ হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম হও, তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিন্ময়ী মা, তাঁহার সখী, এবং সন্তানদিগকে বাহির কর। যে দিন তোমার স্তব স্তুতিতে ব্রহ্মপ্রসাদে তোমার চরিত্রে মাটীর দুর্গার পরিবর্ত্তে চিন্ময়ী দুর্গা প্রকাশিত হইবেন, সেই দিন তোমার দেশের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। মৃন্ময় সিন্দুকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই সিন্দুক খুলিয়া সতী দেবীকে বাহির কর, এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই জীবিতে-শ্বরী সতী দেবীকে, অসুরনাশিনী, জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণদায়িনী এবং শাস্ত্র-ও-জয়-প্রসবিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা কর। ব্রাহ্ম, তোমার হাতে ঈশ্বর প্রকাণ্ড ভার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি যোগসন্ধানে দুর্গা-প্রতিমার ভিতর হইতে স্বর্গীয় রত্ন সকল বাহির করিয়া আপনি দেখিবে ও সম্ভোগ করিবে এবং তোমার হিন্দু ভাই ভগিনীদিগকে দেখাইবে। হিন্দুর ঘরের সিন্দুক খুলিয়া তাঁহাকে তাঁহার সিন্দুকভরা রত্ন সকল দেখাইয়া মোহিত করিবে। মাটীর দুর্গা কেবল একটি সিন্দুক, ইহার ভিতরে মা তাঁহার সখী এবং সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব হিন্দুস্থান, মৃত মাটীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জীবিতেশ্বরী চিন্ময়ী মহাদেবীর পূজা কর।

(সেবকের নিবেদন, ১ম ও ২য় খণ্ড)

—•—

আর্য্যনারী সারদা দেবী

মহাভারত ও পুরাণে আমরা সীতা, সতী, সাবিত্রী, গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতি আর্য্যনারীগণের বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সতীত্বের কাহিনী পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি এবং ভারতনারী আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সদ্‌গুণাবলী জীবনে পরিণত করিতে যত্নবতী। আমরাও সেই আর্য্যবংশসম্ভূত।

এই আধুনিক যুগেও এরূপ কয়েকজন আদর্শ রমণীর সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি, যাঁহাদিগকে আর্য্যনারী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাদের সুন্দর জীবনচিত্র ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক পাঠিকাদের নিকট অঙ্কন করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কারণ যে জীবন স্বচক্ষে দেখা যায়, তাহা অধিকতর জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী।

প্রথমে যাঁহার কথা বলব, তাঁহার নাম সারদা দেবী। ইনি নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মাতা। শৈশবকালেই পিতৃগৃহ হইতে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত সেনপরিবারে বধূ হয়ে এসেছিলেন। লেখা পড়া তিনি বেশী শেখেন নি, কিন্তু তাঁহার জীবন, প্রকৃতি ও চরিত্র অতি উচ্চ, উদার এবং মধুময় ছিল।

সংযত চরিত্রের প্রভাবে সারদা দেবী প্রথম হতেই সবার অতিশয় প্রিয় হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে এসে সুমিষ্ট হাসিমুখে গুরুজনদিগের বাধ্য হয়ে সব কাজ সমাধা করতেন।

সারদা দেবী ক্রমে ক্রমে বড় হলেন, তিনটী পুত্র লাভ করেছিলেন। মাতার গুণেই পুত্র যে ধার্ম্মিক, গুণী জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ হয়েন, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে দেখা গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনচন্দ্র সেন অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও গৃহী থাকিয়া সংসারের তত্ত্বাবধান করিয়া সকলকে সুখী করেছিলেন। জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত হয়ে সকলকে যথোপযুক্ত ভক্তি স্নেহ যত্ন করতেন। মধ্যম কেশবচন্দ্র সেন শৈশব হইতেই সত্যব্রত ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ছিলেন; কালে তিনি ধর্ম্মার্থে জীবন দান করেছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেন বিদ্বান্ সমাজে সকলের পরিচিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন। পূর্ব্ব বংশ থেকে এই সেন বংশ অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং বৈষ্ণবপ্রধান ছিলেন এবং সেই পৈতৃক পবিত্র চরিত্রই ইঁহাদের পরিবারের বিশেষত্ব। ফুলেশ্বরী ও পান্না নামে সারদা দেবীর দুটী কন্যাও অতি শান্তস্বভাবা ও সুন্দরী ছিলেন।

যদিও সে সময়ে ধনে সম্পদে এই সেন বংশ ঐশ্বর্য্যশালী বলে পরিগণিত হতেন, তথাপি রন্ধন অথবা সংসারের পরিচর্য্যা, সন্তানপালন ইত্যাদি মেয়েরাই করতেন; দাস দাসীর উপর সমর্পণ করে কেহ নিশ্চিন্ত থাকতেন না।

সারদা দেবী সেই বৃহৎ সংসারের রান্না করতেন। ছেলেদের জন্মের ষষ্ঠীপূজার পরদিন থেকেই, পুত্রটীকে তেল মাখিয়ে দুধ পান করিয়ে, রোদে শুইয়ে, রন্ধনগৃহে সেই বড় বড় ডাল ভাতের ডেকো নামাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, বেলা ১২টা ১টার কমে ছেলেকে দেখতে আসতে পারতেন না। মনে হত, শিশুর গলাটা বুঝি শুখিয়ে উঠল। আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে, "এমনি করে সন্তান পালন করেছি, এখনকার তোমাদের মত কেবল সাবান পাউডার নিয়ে দিন কাটতোনা, কেবল তেল কাজল ইত্যাদি দিয়ে রোদে রাখতাম; আমার কেশব কি ময়লা হয়েছে?" সারদা দেবী উজ্জল গৌরবর্ণ ছিলেন; দেখেছি, শেষ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাঁর কেশ-গুচ্ছ কোমরের অনেক নীচে এসে পড়তো। কেশবচন্দ্র মাতার মত সুন্দর হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবারের অনেককেই গৌরবর্ণ ও আশ্চর্য্য সুষমাময় দেখেছি, যা সচরাচর দেখা যায় না। ধর্ম্মেতে যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, তা সারদা দেবী ও তাঁর পরিবারে সুন্দর প্রকাশ দেখেছি।

জীবনে সারদা দেবী অনেক পরীক্ষা, শোক ও বিপদের মধ্যে পড়েও, ধর্ম্মকে দৃঢ়তররূপে ধারণ করে জগতে বাস করেছিলেন। যখন সারদা দেবী পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি বহু পরিবারে পরিবৃত হলেন, তখন আর পূর্ব্বের মত সংসারে নিমজ্জিত না থেকে, তীর্থভ্রমণ, সাধুদর্শনযাত্রা, হোম, যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি নানা প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকতেন। শুধু একদিক করতেন না; সংসারের সব সম্বাদ রাখা, প্রতিবেশি-গণের পরিচর্য্যা, দেখাশুনা না করে সারদা দেবী জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করতেন না। এমন ব্রত পূজাদি ছিল না, যা তিনি করেন নি। দুর্গাপূজার সময় যে নবরাত্রিব্রত আছে, সে ব্রতকথা তাঁর কাছেই শুনেছিলাম। আর তিনি প্রতি বৎসরই নবরাত্রি-ব্রত পালন করে উপবাস করতেন। কেবল সারাদিনের পরে রাত্রে সামান্য একটু ফল খেতেন।

সারদা দেবী যে কি আশ্চর্য্য চরিত্রবতী মিষ্টভাষিণী দয়াশীলা দানশীলা স্নেহময়ী জননী ছিলেন, তা মনে হলে ভক্তিতে হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠে। কোন ধর্ম্মের প্রতি তাঁর অনাস্থা ছিল না। কখনও নিন্দা করা অভ্যাস ছিল না। কেশবচন্দ্র কখন কোন বিষয় পরামর্শ চাইলে, মাতা সারদা দেবী অসম্মতি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

তিনটী ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র যখন পরলোক গমন করেন, সারদা দেবীর সেই প্রথম পুত্রশোক। সকলেই জানেন, পুত্র-শোক, আবার প্রথম সন্তান-শোকের কি তীব্র যাতনা। কিন্তু সারদা দেবী আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশালিনী রমণী ছিলেন। মধ্যম কেশব ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারীকে অত্যধিক স্নেহ করতেন।

সারদা দেবী পৈতৃক শ্বশুরালয়, শৈশবকাল হইতে যেখানে কত সুখ দুঃখের স্মৃতি ভরা ছিল, সেই কলুটোলার বাড়ীতেই থাকতেন। কেশবচন্দ্রের সার্কুলার রোডের কমলকুটীরে সর্ব্বদা আসা যাওয়া করতেন।

ছোট বেলা থেকে সারদা দেবী যে ধর্ম্ম, সংসার ও সেবা প্রাণের সহিত গ্রহণ করে, দৃঢ়তার সঙ্কারে, পরিণত বয়সেও সাধন করতে পেরেছিলেন, তা কমলকুটীরে তাঁকে পর্য্যবেক্ষণ করে বিলক্ষণ অনুভব করেছি।

স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নবদেবালয়ে প্রায় বেলা বারটা বা ততোধিক সময় পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পূজা, ধ্যান, জপ তপে নিযুক্ত থাকতেন। মধ্যে মধ্যে নবদেবালয়ে পরমেশ্বরের সত্তা সন্নিধানে বসে, সারদা দেবী যে সরল প্রার্থনা নিবেদন করিতেন, তেমন সুমিষ্ট সরল প্রার্থনা, মনে হয়, আর শুনবো না।

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণে সারদা দেবী যৎপরোনাস্তি আঘাত পেলেন; তথাপি ধৈর্য্য অবলম্বন করে, নিজেকে নিজের ভিতর স্থির রেখে, মেজ বৌয়ের এই অসহ্য শোকে সান্ত্বনা দিতে, পৌত্র পৌত্রীগুলিকে স্নেহের সহিত দেখতে শুনতে আরও বেশী করে কমলকুটীরে আসতে লাগলেন। বধূমাতাকে স্বহস্তে রন্ধন করে খাইয়ে, পরে নিজে খেতেন। তিনি এত সুন্দর ও শীঘ্র রান্না করতে পারতেন, দেখে আশ্চর্য্য হতে হত। পাছে মেজ বৌয়ের খাওয়ার দেরী হয়ে যায়, এজন্য দেবালয় থেকে এসেই, উপরের সেই হবিষ্য ঘরটীতে, দুই তিনটী উনুনে তাড়াতাড়ি চড়িয়ে খুব শীঘ্রই খাওয়াতেন। সকলে তাঁর হাতের রান্না খেতে ভালবাসত। রান্না অনেকটা শেষ হয়ে আসার পরে, অনেক অনুরোধে একটু জল স্পর্শ করতেন।

মেজ বৌ যেটী খেতে ভালবাসেন, তাই রাঁধতে চেষ্টা করতেন। রান্নার সময়ও সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কত গল্প করতেন। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে, ব্যস্ততার মধ্যেও সব উত্তর দিতেন। কত গল্পকাহিনী, আবার প্রাচীনকালের ধর্ম্মবার্ত্তা যে সারদা দেবীর মুখে শুনেছিলাম, কিন্তু আজ দুঃখের সহিত মনে করছি, কেন সে সব জগতের ইতিহাসের নিমিত্ত লিখে রাখলাম না। আজ লিখেও কত লোককে সুখী করতে পারতাম।

সারদা দেবী দীর্ঘজীবনে পরিবারের অনেক মৃত্যু দেখে গেছেন; কিন্তু তাঁর অটল পর্ব্বতের মত ধৈর্য্য ছিল, পূর্ব্বেও তা বলা হয়েছে। তাঁর এই জগতে অবিরল সহিষ্ণুতা পৃথিবীতে দেখাবার জন্যই, বুঝি ভগবান সারদা দেবীকে এতদিন সংসারে রেখেছিলেন। আবার প্রাণের শেষ আলো কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণবিহারীর শোকও তাঁকে পেতে হল। তখন পর্য্যন্ত অচল সহিষ্ণুতা দেখিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। এমন কি, ছোট বৌকে বৈধব্যেও রান্না করে তিনি কতদিন খাইয়েছেন।

কি মধুময়প্রকৃতির ধৈর্য্যশীলা নারী! এমন একটী রমণীর দর্শনে বা চরিত্রের অনুশীলনে সকলে ধন্য হব, আর বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত মহিলাবৃন্দ ইঁহার অনুসরণ করে আর্য্যনারী হতে ভুলবেন না, এই আশা করে, আমার দেখা আর্য্যনারী শ্রীসারদা দেবীর জীবন-মাহাত্ম্য উপস্থিত পাঠক পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি।

(ক্রমশঃ)

সেবিকা—হেমলতা চন্দ্র।

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" *

"নানা মুনির নানা মত" এই বাক্য অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশের লোক ধর্ম্মের নানা পথ অবলম্বন করিতেছেন, দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, ইহাই ধর্ম্মের স্বাভাবিক পথ। ধর্ম্ম লইয়া পৃথিবীতে যে মতবিরোধ ও মনোমালিন্য হইতেছে, তাহাতে যাহার যে প্রকার রুচি, সংস্কার এবং শিক্ষা, তাহাকে সেইরূপেই চলিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, অনেক শিক্ষিত লোক আমাদের দেশে এই মতই পোষণ করিতেছেন, মনে হয়। ইহাকে Tolerationএর পথ বলা হইয়া থাকে। সকলকে নিজ মতে আনিতে চেষ্টা না করিয়া, প্রত্যেককেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পথে চলিতে দেওয়া, বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অন্যদিকে ধর্ম্মরাজ্যের দিকপালগণ সাধনার ভূমিতে দৃঢ়স্বরে এক পথের কথাই বলিয়াছেন, একথা ভুলিলে চলিবে না। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ"—সকল ধর্ম্ম অর্থাৎ অন্য বহু পথ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। ঈশাও দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন, 'Leave all and follow me.'—সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর। আমাদের নবযুগের ধর্ম্মনেতারাও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রদর্শন না করিয়া, বাঙ্গলার আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া এক সময়ে গাহিয়াছিলেন,'একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে'। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-প্রধান বঙ্গদেশে আবার আজই শুনিতেছি, 'যত মত, তত পথ', ইহাই ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন পন্থা।

সাধারণতঃ আমরা একথাটী যত সহজ মনে করি, তত সহজ নহে। এ বিষয়ে গীতার একটী শ্লোক দেখিতে পাই, তাহা এই :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

(গীতা ৪।১১)

"যে আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি; হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।"

এই শ্লোকটীর অর্থ আমাদিগকে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। এই শ্লোকের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া মনে হয়, উহাতে ধর্ম্মের নানা পথেরই সমর্থন করা হইয়াছে।— 'যে আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।' কিন্তু দ্বিতীয় অংশে 'বর্ত্ম' কথাটী এক

* ১৮ই অক্টোবর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় নিবেদিত।

চনান্ত দেখিয়া মনে হয়, গীতাকার ধর্ম্মের একমাত্র পথের কথাই লতেছেন। 'মানুষ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুবর্ত্তন রিয়া থাকে'—তিনি যদি মনে করিতেন, ধর্ম্মের প্রকৃত পথ বহু, াহা হইলে একবচনান্ত বর্ত্ম শব্দ ব্যবহার করিতেন না। শ্লোকের উত্তরাংশ মিলিত করিলে ইহার প্রকৃত অর্থ ইহাই মনে হয় যে. লোকে নানাভাবে যাহাকে নানা পথ মনে করিতেছে—ভাবিয়া দেখিলে উহা একই পথ—একই ভগবান, তিনিই মানবের একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পথ। "একই ঈশ্বরকে, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানপ্রধান তাঁহারা জ্ঞানযোগে জ্ঞানময়রূপে, যাঁহারা প্রবৃত্তিপ্রধান তাঁহারা কর্ম্মযোগে শক্তিময়রূপে, যাঁহারা ভাবপ্রধান তাঁহারা ভক্তিযোগে প্রিয়রূপে, যাঁহারা কামনাপরবশ তাঁহারা ফলের আকাঙ্ক্ষায় অভীষ্টফলদাতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে—যিনি গম্যস্থান তিনিই পথ যিনি সাধ্য তিনিই সাধনার পথ। ঈশ্বর যে এক, তাহা বোধ হয়, কোন সম্প্রদায়ের লোকই অস্বীকার করিবেন না। মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি সকলেরই বিশ্বাস ঈশ্বর এক—এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদারমতাবলম্বীরা স্বীকার করিবেন, তিনিই মানুষের একমাত্র পথ—তবেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, নানামত, নানা ভাব থাকিলেও প্রকৃত ধর্ম্মের পথ একই—সেই পরমপুরুষই ধর্ম্মে সনাতন এবং শাশ্বত পথ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'বর্ত্ম' কথাটীর অর্থ আরও একটু ভাবিয়া দেখা যাক। বর্ত্ম বা পথ কথাটী কোন্ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে? শ্রীমৎ শঙ্কর মনে করেন, পথের অর্থ—ঈশ্বরের পথ; রামানুজ মনে করেন, পথ অর্থ—"আমারই স্বভাব"; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মনে করেন, 'জ্ঞানধর্ম্মাদি সকলই আমার স্বরূপ, সুতরাং আমার পথ'। ঈশ্বরের বহুরূপ হইলেও তিনি যে এক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—সুতরাং ইহা কেন না মনে করিব, তিনিই তাঁহাকে পাইবার পথ—এবং সকল মানুষেরই একমাত্র পথ।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া একটুকু আলোচনা করিলেও আমরা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, জ্ঞানধর্ম্মাদি সকলই ঈশ্বরের স্বরূপ। কতকাল পূর্ব্বে এই কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানযুগেও সকলে ইহার মর্ম্ম সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। কতক মনোবিজ্ঞানবিদ্ মনে করেন, পুরুষের লক্ষণ শুধু জ্ঞান, কেহ বা মনে করেন, উহা শুধু ইচ্ছা বা শক্তি, অপরে মনে করেন, উহা শুধু ভাব বা অনুভূতি। কিন্তু এ তিনই একের স্বভাব, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে আমরা ইহাই দেখিতেছি। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেমানুরক্তি এক পুরুষেরই স্বভাব—ধর্ম্মের পথেও তাই এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে সমন্বয়ীভূত করিয়া লইতে হইবে। ইহা মানুষের বুদ্ধিকৌশল-প্রসূত নহে—বিধাতা কৃপা করিয়া এ যুগে আপনাকেই একমাত্র ধর্ম্মের পথরূপে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এ যুগের নূতন বিধান। ভক্তেরা ধর্ম্মপথকে শাণিতক্ষুরধারবৎ বলিয়াছেন; আমাদের মত কলির জীব, দুর্ব্বল নগণ্য কীট যে এই সর্ব্বৈক্যের পথে চলিতে পারিবে, তাহার ভরসা কি? ভরসা ভগবৎকৃপা। নববিধান তাই ভগবৎকৃপার বিধান।

আজ কালকার শারদীয় উৎসবের দিনে. আর একটা কথা বলিয়া এই নিবেদনের উপসংহার করতে চাই। চারিদিকে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাই, জিজ্ঞাসা করি, যেখানে পরিমিত মূর্ত্তির পূজা হয়, সেখানে কি সার্ব্বজনীন উৎসব হইতে পারে? হিন্দুসমাজের এই আহ্বানে আজ কি মুসলমান ও খৃষ্টসমাজ কোন সাড়া দিতেছেন, না দিতে পারেন? অনন্তের উপাসনাই একমাত্র বিশ্বজনীন ও সার্ব্বজনীন উপাসনা—পরিমিতের উপাসনা কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না; শুধু ভাবের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া আজ হিন্দুসমাজ এ মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই মন্দিরে যে নবভক্তদল অনন্তরূপিণীর উৎসব করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ভিতরে সার্ব্বজনীন উৎসবের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। একের ভিতর বহুরূপীকে দেখিয়া, ইঁহারা অনন্তের উপাসনার এক অভিনব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

একদল লোক বলেন, এই পরিমিত দেবদেবীর উপাসনা, এই দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা; কেন না কলির জীবের এরূপ অধোগতি হইয়াছে যে, সে অনন্তের উপাসনার অধিকারী নহে। অনেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করেন, এ সব প্রতীক উপাসনা শুধু পাপেরই প্রশ্রয় দেয়—এগুলি Sinful; কিন্তু নবভক্তেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই সকল প্রতীক উপাসনার ভিতর যে ভাবরূপ শস্য নিহিত আছে—সে গুলিকে আশ্রয় করিয়া অনন্তের উপাসনাকে সরস করিয়া লইতে হইবে—এখানেই নববিধানবাদী এবং প্রাচীন ব্রহ্মবাদীদের বিরোধ। যে সাধক প্রথমে আদ্যাশক্তিকে হৃদয়ে মা রূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণে প্রণাম করি।

ব্রহ্মানন্দ তাই বলিলেন, প্রথমে মা, পরে উপমা, তারপর প্রতিমা। ভক্ত হৃদয়ে বিশ্বজননীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 'মা'। কবি মাকে দশভুজারূপে কল্পনা করিলেন, শিল্পী তাঁহার প্রতিমা রচনা করিলেন—বিধানভক্ত এই মাতৃ-অনুভূতি আশ্রয় করিয়া অনন্তকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং এইরূপে মায়ের নব নব রূপ দেখিতে লাগিলেন—বেদান্ত ও পুরাণের মিলন হইল। একদিন এই অভিনব মাতৃপূজার আহ্বান দিক দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—নবভক্তিস্রোত এই মন্দির হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বিধাতা কৃপা করুন, এই ভক্তি-স্রোতে ভাসিয়া দেশবাসীর সকল দুঃখ দুর্গতি দূর হউক—নব ভক্তদলের সাধ পূর্ণ হউক।

শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ।

ডাঃ সুধেন্দুকুমার দাস

(৮ই নবেম্বর, ব্রাহ্মবাসরে পঠিত)

শোকাহত প্রাণ উপলব্ধি করিতেছে, "বেদনা আনে চেতনা নব।" বেদনাঘাতে অন্তর ঊর্দ্ধ লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে। সে লোকেই ত আমাদের আত্মীয়বন্ধু প্রিয়জন—সে লোকই যে আমাদের চিরবাসস্থান। মৃত্যু প্রিয়জনকে আরও গভীরভাবে আমাদের মাঝে আনিয়া দেয়, জীবনকে আরও সুন্দর ও মাধুরী-মণ্ডিত করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া যায়। মৃত্যু না থাকিলে জীবনের সৌন্দর্য্য এমন করিয়া আমাদের চোখে প্রতিভাত হইত না। মৃত্যু যথার্থ মানুষকে চিনাইয়া দেয়, আরও নিকট-তর করিয়া দেয়।

আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ মেজদাদা আজ পরলোকবাসী। সংসারে থাকিতে তাঁহার পূত সৌরভময় জীবনের সৌন্দর্য্য এমন করিয়া দেখি নাই, অনুভব করি নাই; কিন্তু মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে দেহমুক্ত করিয়া, তাঁহার জীবনের যা কিছু সৌন্দর্য্য মাহাত্ম্য আমাদের নিকট রাখিয়া গেল।

সূর্য্য যেমন করিয়া বিদায়কালে পৃথিবীর বুকে আলোকরশ্মি ঢালিয়া দিয়া যায়, তেমনি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সবটুকু সুষমা আমাদের অন্তরে ঢালিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর জীবনকথা আমাদের অন্তরে আজ জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহার সুন্দর কর্ম্মময় জীবনকথা বলিবার মত শক্তি আমার নাই।

মেজদার জীবন ছিল, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। কি গভীর জ্ঞানপূর্ণ, কি সুস্থ চিন্তাশীল মনের পরিচয় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জন পাইয়াছেন। সংস্কৃত, সাহিত্য, দর্শন, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার কি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মেজদা ছিলেন বিদ্যানুরাগী সুধী ও কর্ম্মঠ পুরুষ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ছিল গভীর অনুরাগ এবং আজীবন এ ভাষার চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। শৈশবেই তাঁহার এ অনুরাগের অভিব্যক্তি হয়।

একজন ইংরাজ কবি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "He lisped in numbers and numbers came." মেজদার সংস্কৃতানুরাগ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। পিতামাতার কাছে শুনিয়াছি, তাঁহাদের পাটনা নগরে অবস্থান কালে মেজদা যখন দেড় কি দুই বৎসরের শিশু, যে বয়সে মাত্র কথা ফুটিতে আরম্ভ করে, সে বয়সে তিনি ভোর চারিটার সময় গঙ্গাযাত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে মন্ত্র শুনিয়া সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তন্মধ্যে "রামকে ভজনা কর কেইসা মন ভাব হে।" এই হিন্দি বচন প্রতিদিন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া বিছানায় শুইয়াই আওড়াইতেন।

ইংরাজি স্কুলে তিনি যখন ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তখনই তিনি অমরকোষের অধিকাংশ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পিতামাতা বালকের মুখে সে সব শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। মেজদার সুমিষ্ট স্বরে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি আমরা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়াছি।

শৈশব হইতেই লেখাপড়ায় তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল। ছাত্রাবস্থায় যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন ছাত্র পড়াইয়া যে অর্থ লাভ করিতেন, তাহা দ্বারা পুস্তক ক্রয় করিতেন। গ্রন্থাবলি ছিল তাঁহার প্রাণ। তাঁহার আলমারি বোঝাই বইগুলির কি যত্ন ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও কত পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন।

মেজদার ছাত্রজীবন উজ্জ্বল সাফল্যে মণ্ডিত। শৈশবে তিনি পিতার কর্ম্মস্থল ঢাকানগরে অধ্যয়ন করেন। তারপর মালদহ হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে তিনি আই,এ, ও বি,এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বি,এ, পড়িবার কালে পিতার ইচ্ছা ছিল, মেজদা ইংরাজী কিম্বা ইতিহাসে অনার্স নেন; কিন্তু যে ভাষাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, সে সংস্কৃতে ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও দুর্গাচরণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ সনে তিনি সংস্কৃত বেদান্তদর্শনে প্রথম শ্রেণীর ২য় স্থান অধিকার করেন ও ভগবৎ গীতায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

১৯২৫ সনে মেজদা বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে বৃটিশ মিউজিয়ামে ভারতবর্ষের যে সকল দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সুরক্ষিত ছিল, সে সকল অধ্যয়ন করিয়া শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা দ্বারা তিনি পি,এইচ,ডি, উপাধি লাভ করেন। ভূতপূর্ব্ব হাই-কোর্টের জজ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রের ইংরাজীর রচয়িতা সুবিখ্যাত Sir John Woodroff ও L. D, Barnet উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

L. D. Barnet মেজদার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"I have much pleasure in recording my high opinion of the mental ability and moral character of Mr. S. K. Das. For the last two years he has studied in this school, when he began his work here he already possessed a deep knowledge of Sanskrit and of the much of the classical phylosophy of India and he has since then largely widened his attainment by most industrious and intelligent study."

নবদ্বীপের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শিরোমণি ও মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ তাঁহাকে বিদ্যারত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জ্ঞান আহরণের জন্য কি একাগ্রভাবে তথায় অধ্যয়ন করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশের সময় তিনি শিক্ষার্থিরূপে তথায় বাস করিতেন।

পারিবারিক একটি ঘটনায় মেজদার উদার হৃদয়, সূক্ষ্ম

দৃষ্টি ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। মেজদা যখন এম,এ, পাশ করিয়াছেন এবং ছোটদা সবেমাত্র কৃতিত্বের সহিত বি,এ, পাশ করিয়াছেন, এমন সময় পিতা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একজনকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। পিতা মেজদার নিকট এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন, "আমার ছোট ভাইয়ের বয়স অল্প এবং তিনি অধিকতর মেধাবী, সুতরাং তাঁহাকেই প্রেরণ করা হউক; তিনি বিলাতে গমন করিয়া অধিকতর কৃতিত্বের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন।"

১৯২০ সনে জুলাই মাসে মেজদা ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে Lecturer নিযুক্ত হন। ছোটদা দুই মাস পরে বিলাত গমন করেন। মেজদা ১২৫৲ টাকা মাহিনা পাইয়া, ৫০৲ টাকা নিজের খরচের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট ৭৫৲ টাকা ছোট ভাইয়ের বিলাতের খরচের জন্য পিতাকে নিয়মিতরূপে প্রেরণ করিতেন। এক বৎসরের মধ্যে ছোটদা আই,সি,এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সংবাদ তারযোগে পৌঁছিলে তিনি কতই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মেজদা ছিলেন, ছাত্রবৎসল ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁহাকে ছাত্রগণ কিরূপ ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, তাহার নিদর্শন রাজসাহী কলেজের ছাত্রবৃন্দের বিদায় অভিনন্দনে বুঝিতে পারি। তিনি ছাত্রদের সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিতেন। তাদের অভাব অভিযোগ সহানুভূতি সহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি তাহাদের শুধু শিক্ষা দিয়াই বিরত হন নাই, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেন। রাজসাহী কলেজের ছাত্রবৃন্দ লিখিয়াছিলেন, "আপনি একাধারে গুরু ও বন্ধুরূপে আমাদিগের কত আপনার ছিলেন, তাহাই মনে করিতেছি। এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, আজকাল বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বত্র শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছে; আপনার মধ্যে এই ব্যবধানের অভাবই আমাদিগকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ছাত্রদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া ও পুরুষোচিত ব্যায়ামে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, আপনি শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবল মস্তিষ্কচালনা নয়, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, এই তত্ত্বটি তাহাদিগের জীবনে সহজ করিয়া আনিয়াছেন। জ্ঞানচর্চ্চায় আপনার উৎসাহ যে কম নয়, তাহার প্রমাণ Cultural Society প্রতিষ্ঠায় আমরা পাই। এইরূপে কলেজের ছাত্রদের চরিত্র যাহাতে সব দিক দিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাতে আপনার সতত দৃষ্টি ছিল।"

মেজদা ছিলেন জ্ঞানের উপাসক। কার্য্যোপলক্ষে যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, তখন সে স্থানের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত থাকিতেন। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কৃষ্ণনগর শাখা সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার, এই ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিবার তাঁহার ছিল প্রাণ আকাঙ্ক্ষা। কত পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিতেন। কাশ্মীরের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি লণ্ডন মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছিলেন ও আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন।

মেজদার স্বাদেশিকতা ছিল প্রবল। বাংলার শিল্পের উন্নতি কামনা করিয়া যথাসম্ভব শিল্পদ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। বাঙ্গালীর ধুতি পাঞ্জাবী পরিধান করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একদিনের জন্যও হ্যাটকোট প্রভৃতি পরিধান করেন নাই। মেজদা স্বাধীনচেতা ও কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ছোট বড় সকল কাজই তাঁহাকে সহাস্যবদনে করিতে দেখিয়াছি। পরোপকার ও সেবাপরায়ণতা তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। অসুস্থকালে গৃহের ভৃত্য পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা পাইয়া অবাক হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বিগত বিহার ভূমিকম্পের সময় কৃষ্ণনগর কলেজের একদল ছাত্র লইয়া তিনি ভূকম্পপ্রপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ কি ব্যাকুল হইয়া মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও কত উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে আর্ত্তের সেবা ও সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহাদের জনসেবা তাঁহাকে আনন্দ দিত। কৃষ্ণনগরেও তিনি সেখানকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দরিদ্রভাণ্ডার, রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহার তাঁহাকে জনপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল করিয়াছিল।

সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পরমানন্দ লাভ করিবার জন্য তাঁহার অন্তর ব্যগ্র হইত। সংকীর্ত্তন শুনিয়া তিনি গভীর আনন্দ পাইতেন। ভক্ত রামপ্রসাদের গান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। অসুখের প্রথম অবস্থায় তিনি একদিন নিজে নিজে গাহিয়াছিলেন, "কতদিন ঘুরাবি মা, চোখ ঢাকা বলদের মত।"

ঢাকায় অবস্থানকালে সেখানকার ওস্তাদদের বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে তাঁহার হৃদয়তন্ত্র কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ঝঙ্কৃত হইত। কৃষ্ণনগরে নিজগৃহে প্রতি সপ্তাহে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কি গভীর তন্ময় হইয়া তিনি সে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন।

মেজদা ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু বাহিরে তাঁহার আত্মপ্রকাশ ছিল না। একবার তাঁহার আগ্রহে গৃহে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বোন ও ২।১টি ছাত্রীকে কয়েকদিন গীতা পাঠ করিয়া শোনাইয়াছিলেন। তখন বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার চিন্তা কত গভীর, অন্তর কত উর্দ্ধমুখী। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের বাণী তিনি কি আন্তরিকতার সহিত শোনাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত সে বাণী এখনও মনে বাজিতেছে।

যোগবলে পরব্রহ্মে আত্মস্থ হইবেন, বোধ হয়, এই ছিল তাঁহার

অন্তরের গোপন আকাঙ্খা; তাই শুনিলাম, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে নিজে নিজে যোগসূত্র পাঠ করিতেন। বিধাতা কি তাঁহাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহার সন্ধান আমরা পাই নাই, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে কখনও কাহারও সহিত যদি আলোচনা হইত, তখন তিনি মেজদার গভীরজ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয়ে আনন্দ পাইতেন। আমাদের দাদা মহাশয় স্বর্গীয় ভক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মেজদার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া বড় আনন্দ ও আরাম পাইতেন।

শৈশব হইতে মেজদার কত স্নেহ ভালবাসায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি! কতভাবে তাঁহার স্নেহ পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে, স্নেহশীল মেজদাদার স্থান তো কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মেজদার জীবন আমাদের কত বড় সম্পদ্ ছিল, তাহা তাঁহার জীবিতকালে বুঝিতে পারি নাই; তাই আজ আমরা তাঁহাকে হারাইয়া বড় দরিদ্র হইলাম, মনে হইতেছে।

বিধাতার অকস্মাৎ এ কি বিধান, জানিনা। ইহার ভিতর কি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা আছে, আমরা বুঝিতে পারি না। অন্ধকারের পরপারে যে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতলোক আছে, আজ তিনি সে লোকের অধিবাসী। আজ অশ্রুজলে তাঁহার পুণ্যাত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যিনি তাঁহাকে এ দুঃখশোকপূর্ণ মরজগৎ হইতে চিরশান্তিসুখপূর্ণ অমরলোকে লইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে নিশ্চয় সে লোকে আরও সুন্দর, আরও মধুর করিয়া তুলিবেন। মেজদার জীবন-সম্পদ আমাদের মাঝে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকুক, এই প্রার্থনা।

"হাসি"

—•—

স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়

(৪ঠা অক্টোবর, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে ভাই অনিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দীক্ষান্তে কেদারবাবু প্রভৃতি স্কুলে বসবাস করিয়া নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। এই সময় তাঁরা অতি দীনভাবে বৈরাগী ও তপস্বীর ন্যায় থাকিতেন। তাঁদের আহারে বৈরাগ্য ও সংযম, পাঠে খুবই মনোযোগ ছিল। এ সময় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে একটা স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধন হয়। তাঁদের আহার-সম্বন্ধে ভক্ত ফকিরদাস লিখিয়াছেন, "কোন দিন অনাহার, কোন দিন অল্পাহার, কোন দিনের আহার অতি বিচিত্র রকমের হইত। (অর্থাৎ কিছু না জুটিলে বনের কচু পোড়াইয়া এবং গাছের সটে কলা ভাতে দিয়া অল্লাহার করিতেন।)" তাঁদের জীবনের ঐ উচ্চ আদর্শ স্মরণ করিয়া প্রেমাস্পদ ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র তাঁর পিতৃদেবের সমাধিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, "যৌবনে বাছিয়া নিলে জীবনের পথ, কি মহান গৌরবময়।" সত্যই কেদারবাবুও তাঁর মাতুলদিগের সহিত সে সময় দেশের সেবা জীবনের শ্রেষ্ঠ পথরূপে ধরিয়াছিলেন। এইরূপে কেদারবাবু তাঁর জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় মাতুলের সহিত কিছুদিন জয়পুর মধ্যইংরাজী স্কুলে অবৈতনিক রূপে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া, কলিকাতায় একটী মার্চেন্ট আফিসের ক্লার্কের কার্য্য গ্রহণ করেন। ঐ হইতেই তাঁর প্রথমতঃ অর্থাগম হয় এবং ক্রমে একটী ল্যাম্পের কারখানা খোলেন। ব্যবসায় বিষয়েও তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। এই সময় হইতে তিনি তাঁর পত্নী সহ কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে কলিকাতার মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হন। এইরূপে কিছু কাল কলিকাতায় বসবাসের পর, কেদারবাবুর স্ত্রী অমরাগড়ীতে ১২৯২ সালে ফাল্গুন মাসে উৎসবের সময় নবসংহিতামতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া, নিত্য নিত্য নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে থাকেন। অল্পদিন পরেই কেদারবাবুর একটী কন্যাসন্তান হইলে, ঐ কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন তাঁর পৈত্রিক বাস-ভবনে রাউতড়ায় করেন। ঐ দিনের কথা আজও মনে হইতেছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্ত ফকিরদাসের সহিত আমরা কয়েকটী বন্ধু রাউতড়ার বাটীতে গমন করিলে, কেদার বাবুর জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্ল-তাত এবং জ্ঞাতিভ্রাতৃগণ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া, আমাদের বাড়ীর ভিতর যাইতে দিলেন না, এবং কিছুতেই ব্রাহ্ম-মতে নামকরণ করিতে না দেওয়ায় আমরা বেলা ২টার সময় অনাহারে অমরাগড়ীতে ফিরিয়া আসি। এই ঘটনায় কেদারবাবুর সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া, তাঁদের জ্যেষ্ঠ মাতুল ভক্ত ফকিরদাসকে লিখিয়াছিলেন, "কল্য কন্যার নামকরণের সমস্ত আয়োজনে বাধা দেওয়ায়, আমি যারপরনাই মর্ম্মবেদনা ভোগ করিয়াছি। যখন আপনারা অনাহারে ফিরিয়া যান, সে সময় আমি মেয়েকে লইয়া আপনাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি অবলা, স্ত্রীজাতি ও কুলবধূ, যিনি আমার স্বামী, তিনি সেরূপ সাহসী নন, তাঁর সহায়তা পাইলে এই পাপ সংসার ছাড়িয়া তখনই চলিয়া যাইতাম।" এই ঘটনায় কেদারবাবু একেবারে হতভম্ব হইয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যে কেদারবাবুর স্ত্রী কন্যাসহ অমরাগড়ীতে ভক্ত ফকিরদাসের আশ্রম-কুটীরে আসিয়া, কন্যার নামকরণ করেন। ভক্ত ফকিরদাস যথাবিধি উপাসনাদি করিয়া কন্যার নাম 'স্নেহলতা' নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনায় কেদারবাবু সপরিবারে খুবই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া, তাঁর হিন্দু জ্ঞাতি ভ্রাতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কিছুদিন পরে কেদারবাবুর মাতা শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া, প্রথমে কলিকাতায় বাসায়, তৎপরে

গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রী হইয়া বাস করেন। তিনি প্রায় ছয়মাস জীবিত ছিলেন। এই নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা ভক্ত ভ্রাতা ফকিরদাসের মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং পুত্র কেদারনাথকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার বিশ্বাসমত আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিও।" মাতা কৃপাময়ীর মৃত্যুর পর কলিকাতাতেই তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতামতে করিয়া, কেদারবাবু তাঁর মাতার ইচ্ছানুসারে কয়েকটী স্থানীয় অনুষ্ঠানে, অমরাগড়ীর ব্রহ্মমন্দিরের স্থায়ী ফণ্ডে ও মাতামহের সেবার্থে কিছু সাহায্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের কিছুদিন পরেই কেদারবাবু তাঁর জ্ঞাতি আত্মীয়দের সম্মতিক্রমেই তাঁর পৈত্রিক বাসভবনের উঠানে মাতৃদেবীর সমাধি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, ঐ পৈত্রিক বাসভূমির অন্যান্য জ্ঞাতিগণই একদিবস রাত্রিতে উক্ত সমাধি সমূলে নষ্ট করিয়া দেন। এইটী কেদার বাবুর উপর দ্বিতীয় নির্য্যাতন, এবং ধর্ম্মের প্রতি এবং মাতৃদেবীর অমরাত্মার প্রতি অবমাননা। এই ব্যাপারে কেদারবাবু ও তাঁর স্ত্রী রাউতড়ায় আর থাকিবেন না, এবং আমরাগড়ীতে আসিয়া বসবাস করিবেন, এই দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। তাঁদের উভয়ের আগ্রহ দেখিয়া ভক্ত ফকির দাস একখণ্ড নিষ্কর বাস্তুভূমি ক্রয় করিয়া দেন এবং ঐ স্থানেই একটি সুরম্য অট্টালিকা অচিরে নির্ম্মিত হয়। মাতৃদেবীর স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য, যথাসময়ে ঐ অট্টালিকা যথাবিধি ব্রহ্মোপাসনা-যোগে প্রতিষ্ঠা করিয়া, গৃহটীকে "কৃপাকুটীর" নামে অভিহিত করা হয়। ইতিমধ্যে কেদারবাবুর মাতুল নববিধানসাধক যশোদাকুমার রায়ের অকালে মৃত্যু হওয়ায়, যশোদাবাবুর নাবালক পুত্রদিগকে মাতাসহ নিজের উক্ত গৃহে স্থান দান করেন। সেই অবধি ঐ পরিবার কেদার বাবুর পরিবারের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত। ক্রমে কন্যা স্নেহলতা বিবাহযোগ্যা হইল, নানা স্থানে পাত্র অন্বেষণ করা হয়; পরিশেষে দরিদ্র প্রচারকদিগের পুত্র শ্রীমান্ চারুসুন্দর পাত্ররূপে মনোনীত হন। অল্পদিন মধ্যেই মহা সমারোহে অমরাগড়ীতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই স্নেহলতার একটী কন্যা হয়, তাঁর নামকরণ নবসংহিতামতেই হইয়াছিল। ঐ দৌহিত্রীটীও বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, একটী দরিদ্র প্রচারকের পৌত্রের সহিত বিবাহ দেন; ঐ বিবাহ কলিকাতাতেই সমারোহে সম্পাদন করেন। কন্যা ও দৌহিত্রীর বিবাহে প্রচারকপরিবারের সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগযুক্ত হন। কেদার বাবুর স্ত্রী প্রায় চারি বৎসর হইল, পরলোকগমন করিয়াছেন; দৌহিত্রী শ্রীমতী আভাময়ীও প্রায় দুই বৎসর হইল দেহত্যাগ করায়, কেদারবাবুর দেহ মন খুবই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ইদানীং তিনি রুগ্ন শরীরেও ভাড়াবাটীর নিকটবর্ত্তী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে রীতিমত প্রাতে যাইয়া, পাঠকদিগের সহায়তা করিতেন। কিছুদিন হইতে তাঁর শরীর খুবই ভাঙ্গিয়াছিল। ক্রমে তিনি ভীষণ রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। প্রায় সাত মাস হইল, কেদার বাবু কলিকাতায় আসিয়া শয্যাগত ছিলেন। বিধাতার ইচ্ছা বুঝা ভার, তিনি তাঁর এই বৃদ্ধ সন্তানকে সংসারের সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁর অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় দাদা কেদারবাবু অমরাগড়ী ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে তিনি আর্থিক অবস্থায় সকলের চেয়ে বড় ছিলেন; তিনি অমরাগড়ী অঞ্চলের সেবকদিগকে দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মেরা অধ্যবসায়গুণে কিরূপ বড় লোক হইতে পারে ও কিরূপ ধোশীল ও বিশ্বাসী হইতে পারে। কেদারবাবু সমাগত বন্ধুবান্ধবদিগের সেবায় খুবই সুদক্ষ ছিলেন। আমি তাঁর কঠিন রোগশয্যাপার্শ্বে কয়েকবার যাইয়া দেখিয়াছি, ইদানীং ভগবানের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাড়িয়াছিল, আমাদের কাছে পাইলে খুবই আনন্দিত হইতেন, এবং ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কবে মায়ের কোলে উঠিব, মা কবে তাঁর কোলে স্থান দিবেন।" এই যে ব্যাকুলতা, ইহাতে তাঁকে স্বর্গের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। মার ডাকে আমাদের দাদা গত ২৫শে সেপ্টেম্বর নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়াছেন। তাই প্রার্থনা করি, করুণাময়ী তাঁর এই বৃদ্ধ বিশ্বাসী সন্তানকে অমরলোকে শিবস্থানন্দ ও ফকিরের দলে আশ্রয় দান করুন ও শোকার্ত্ত কন্যাকে ও আত্মীয়দিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

নূতন সঙ্গীত।

নগদা মুটে

রামপ্রসাদী—একতালা

হাতে হাতে নগদ বিদেয়, নইলে কি মোর মন উঠে?
আমি করে যাই মা দিনমজুরী, আমি যে মা নগদা মুটে।
যা ছিল মোর পুঁজি পাটা, জুটে ঐ রিপু ছটা,
ঘটালে বিষম ল্যাঠা, নিয়েছে সব লুটে পুটে।
আমার অভাব ভারি, সয় না দেরী, তাই পায়ে ধরি আর
বায়না করি;
দাও মা দীনে চরণতরি, আমার সকল অভাব যাক্ ছুটে।
শ্বাসের ক্রিয়া নাড়ীর শোধন, তাতে আমার কি প্রয়োজন,
যদি আলো করে হৃদয়-কানন ভক্তি-কুসুম ওঠে ফুটে॥

সংগৃহীত—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

প্রার্থনা

(স্বর্গীয় সাধক অক্রুরচন্দ্র রায়ের একটী প্রার্থনা ;
২৯শে ফাল্গুন, ১২৯৯ সাল।)

অনন্ত সত্তা! তুমি এই বিশ্ব সংসারের সকল স্থান অধিকার করে, সকল বস্তুর অন্তর বাহির তোমারই সত্তাতে পূর্ণ করে আছ। তুমি আমার অন্তরে বাহিরে রহিয়াছ; কিন্তু হায়! তোমায় সর্ব্বদা অনুভব করতে পারি না কেন? বাহিরে রহিয়াছ, সেতো একটু দূরের কথা; হৃদয়ের ভিতরে রহিয়াছ, অথচ তোমায় সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তোমার একি স্বভাব, লুকিয়ে সর্ব্বদা খেলা করছ, চুপে চুপে আমাদের ভালবাসছ, তবু স্পষ্ট জানতে দিচ্ছ না! করুণাময়! আর ত হবে না, তোমার খেলার কৌশল আমি এবার বুঝতে পেরেছি। পরীক্ষার ভিতর তোমার কথা শুনে বুঝেছি যে, তোমার সত্তা লুকিয়ে থেকে আমায় ভালবাসছে; সেই সত্তাই আবার কথা বলছে। সকলে ইহাকে বিবেকবাণী বলে, আমি কিন্তু তোমার স্পষ্ট বাণী বলি। যাঁর কথা সর্ব্বদা কাণে ও মর্ম্মে প্রবেশ করছে, তিনি কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারেন? আমায় কি দেখা দিবে না? তুমি তো দেখা দিবার জন্য ও ধরা দিবার জন্য বিবেকের ভিতর দিয়ে ডাক, নাম ধরে স্পষ্ট ডাক। লীলাময়, আশ্চর্য্য তোমার লুকোচুরী খেলা! শৈশবে ভাই বোনের সঙ্গে জগতে কত লুকোচুরী খেলেছি; স্বর্গরাজ্যে ধর্ম্মজীবনের শৈশবাবস্থায় আবার দেখছি যে, সেই লুকোচুরী খেলাই চলছে। লুকোচুরী খেলাতে "বুড়ী" নিশ্চয় আছে। এবার বুড়ীকে নিশ্চয় ধরিবই ধরিব। তুমি বিবেকের ভিতর দিয়ে সর্ব্বদা "টু" "টু" সঙ্কেত করছ; তাহলে প্রমাণ হচ্ছে যে, লুকিয়ে থেকে ঠকাবার অভিসন্ধি আদৌ নাই। ওহে লুকান সত্তা! তোমায় একদিন "খুঁজি খুঁজি নারি—যে পায় তারি" বলতে বলতে টপ করে যে ধরে ফেলিব। এবার 'টু টু' শব্দ থেকেই বুঝেছি, তা হলে আর চোর হতে হবে না, চোর হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবই পাব। ভাই বোন, কে চোর হয়েছ, শুন মন দিয়ে, বিবেক-কাণ পেতে শুন, ঐ বুড়ী টু টু শব্দ করছে; এস, সকলে টপ করে গিয়ে আঁধারের ভিতর দিয়ে বুড়ীকে ধরে ফেলি। তাহ'লে আর আমাদের মাথায় টোকা খেতে হবে না, পাপের ডাঙ্গস মাথায় পড়বে না; যদি মাথা বাঁচাতে চাও, তবে চল ভাই সকলে, বুড়ী ধরে বসে থাকি। মা, তোমার কাছে কি ভিক্ষা চাহিব? অনেক ঠেকে শিখেছি; যেখানে, মা, তোমায় ছেড়ে খেলিতে চাই, সেই খানে চোর হয়ে মরি। তোমার অধম সন্তানকে তুমি রক্ষা কর, আর যেন বুড়ী ছাড়া হয়ে সংসারে খেলতে চাই না। তোমায় ছেড়ে থাকার সুখ যথেষ্ট ভোগ করেছি; আর তোমায় ছেড়ে কোথাও কখনো যাব না, কাজ করব না, কথা বলিব না, চিন্তা মনে থাকবে না। দয়াময়ী! আরও কি লুকিয়ে থাকবে? আমি কি তোমায় ছুঁয়ে থাকতে পারব না? এক মুহূর্ত্তের অথবা এক ঘণ্টার ছোঁয়া আমি চাই না, শুধু উপাসনার সময় আমি ছুঁতে চাই না; উপাসনান্তে যখন কার্য্যক্ষেত্রে যাই, তখনি তোমায় ছাড়ি, আর চোর যদিও না হতে পারি, কিন্তু চোর হবার সম্ভাবনা থাকে। মা অভয়-দায়িনী, তবে আর অভয় পেলাম কৈ? মা, তাই ভয়ে কাতর হয়ে তোমার চরণ তলে এসেছি; জননী, কৃপা কর, সমস্ত জীবনটা, সকল সময় যেন তোমায় ছুঁয়ে থাকতে পারি। শৈশবের সেই লুকোচুরী খেলার স্মৃতি জেগে আছে, তখন বুড়ী ছুঁলে কত সুখ ও নিশ্চিন্ততা হোত। এখন কি একবার বলিতে পারিব না যে, বুড়ী ধরেছি? সংসার, আর তুই আমায় চোর করতে পারবি না, আমি বুড়ী ধরে নিরাপদে আছি, এই ভরসা করে তোমায় ছুঁয়ে থাকতে ও বলতে যেন পারি। এই দাসের বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ!　　শান্তিঃ!　　শান্তিঃ!

—০—

স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র রায়

(শ্রাদ্ধবাসরে কুলটীতে ২৪শে অক্টোবর পঠিত)

জন্ম—২৬শে শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল।

স্বর্গাধিরোহণ—২১শে আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল।

প্রকৃতির নিয়মে গর্ভবেদনা না হলে নবীন আগন্তুকের দেবমুখ-দর্শনের আনন্দ হয় না, ভীম বজ্রনাদে নভোগগুলের মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন না করলে উহা হতে বারিপাত হয় না, ডিমটী না ফুটিলে সুন্দর পক্ষিশাবকটী বাহির হয় না, বীজটী না দ্বিধা হলে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায় না; এইরূপ ভাঙ্গা গড়াই সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক ব্যাপার, এ জগতে নিত্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংঘটন করে। আমাদিগের শরীর ও মন সেইরূপ নিত্য রূপান্তরের অধীন। ইহলোকেই সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য সত্য পরমাত্মাই তাঁর সৃষ্টির জ্ঞানবিধানের জন্যই জীবন ও মৃত্যুর বিধি করেছেন; একেরই দুই দিক দেখলে দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়ের মধ্যে জীবের গতি নির্দ্ধারিত।

If thou shouldst call me to resign
What most I prize it was never mine
I only yield thee what is Thine
　　Thy will be done!
Let but my fainting heart be blest
With Thy sweet spirit for its quest
My God to Thee I leave the rest
　　Thy will be done!

শ্রীমৎ নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের অকস্মাৎ এ মর জগৎ হতে চির বিদায় লওয়া এক অভিনব অভিনয়। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই

য, সবল, সৌষ্ঠব ও কান্তিযুক্ত এবং সদা হাস্য কৌতুকে মুখরিত, মাত্র ৩৫ বৎসরের যুবা পাঁচ মাসের পরিণীতা এক বালিকাকে বিধবা করে, অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে যাবেন! এখনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাঁর খুল্লতাতের শোকে কাতর পরিজনকে আরও বিহ্বল করে, সোণার পাখী মা শান্তিদায়িনীর সান্ত্বনা-বক্ষে তাঁরই পিতার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের দিনে উড়ে যাবেন। আশৈশব কোমলপ্রাণ, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনে সদা দৃঢ়সংকল্প, আর্ত্তের প্রতি দয়া মায়া ও মমতা বিশিষ্ট, পিতৃধর্ম্মানুশীলনে একনিষ্ঠ পক্ষপাতী, উদার ও প্রশস্তহৃদয়বান্ এবং সর্ব্বোপরি আত্মসংযমী নবীন সন্ন্যাসী, স্বীয় মণ্ডলীর ভাবী আশা ও বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে যাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ও মহৎ আদর্শকে অতি সন্তর্পণে এবং যত্নে রক্ষা-কবচের মত হৃদয়ে ধারণ করে যাঁর চরিত্র সৌরভ বিস্তার করছিল, তিনি ২৬ দিনের অবিরাম জ্বরে ভুগে, দুর্দ্দমনীয় বাঁচিবার আশা করিয়াও, কলিকাতা নগরীর স্বনামধন্য এবং সুপরিচিত ও সুবিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুচিকিৎসায়ও পরিত্রাণ পেলেন না। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের যত্ন ও অক্লান্ত সেবা ব্যর্থ করে, অবশেষে "The little bird 'I' soared high into unseen whence no traveller ever returneth." যাও ভাই মন! সেই অমর নগরে, যথায় তোমার পিতা মাতা ও পিসিমাতা তৃষিত হয়ে তোমার আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

"যাওরে অনন্তধামে, মোহ মায়া পাশরি, দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি; জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে, কেবলি আনন্দ-স্রোতে চলিছে প্রবাহি।

যাওরে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে, অমরগণে লইবে তোমায় উদার প্রাণে; দেব ঋষি, রাজ ঋষি, ব্রহ্ম ঋষি যে লোকে, ধ্যান ভরে গান করে একতানে।

যাওরে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে, শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য কিরণে; যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান, যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে॥"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

প্রার্থনা

মাগো! আজ যে আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের দিন। আজকের দিনেই ঘরের দুলাল, প্রাণের দাদা—লক্ষ্মী স্ত্রী, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সাধের নূতন সংসার সব ফেলে তোমার বুকের মাঝে পবিত্র ফুল হয়ে ফুটে রইলেন? আসল নির্ম্মলকে তুমি নিয়ে নিলে মা? বাজে ফুলে যে তোমার পূজা হয় না, তাই বুঝি, বেছে বেছে পবিত্র নির্ম্মল ফুলটিকেই হাতে করে তুলে নিয়ে গেলে? তুমি যখন তোমারই পবিত্র ফুলটিকে তুলে নিলে বুকের মাঝে,—আমরাও ত মা তোমারই সন্তান—পিতৃমাতৃভ্রাতৃহীন, স্বামীহীনা কাতর প্রাণগুলিকে সান্ত্বনা দান কর।

মাগো! এই মহাদিনে প্রাণের দাদার পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে দাও। স্বামীহীনা সতীও যেন তোমার ভিতর তাঁকে দেখতে পান। দাদার নির্ম্মল জীবন আমাদের চিরস্মরণীয়। আমরা যেন সেই দাদার নির্ম্মল চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারি, তুমি আমাদের শক্তি দাও, মা।

তিনি যে তোমার বিধানে বিশ্বাস করে নববিধানের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন; সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতে তোমার ডাকে শরীর ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। মা! এখন তাঁর সেই নব অনুরাগ নবভক্তি, নববিশ্বাস তাঁর স্ত্রী, ভাইবোন, আত্মীয় বন্ধুদের জীবনে সঞ্চার কর।

মাগো মা! আজ প্রাণের দাদার অভাবে বুকের পাঁজর খসে পড়ে গেছে। ধৈর্য্য, শক্তি কিছুই নেই যে, পাথর দিয়ে বুক বেঁধে যেন পাগলিনী হয়েছি।

তবু তুমি যে বলেছ—সকল ক্ষতি পূরণ হবে—মাগো, এই আশা করে তোমার মুখ পানে চেয়ে থাকি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই পবিত্র দাদার নির্ম্মল জীবন-ফুলটী আমাদের প্রতিজনের জীবনে ফুটে থাকে।

শোকার্ত্ত—সুষমা বসু

প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন

হে নিত্যবিধাতা, তোমার নববিধানের সাধক অনুকূলচন্দ্রের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আজ শোকাশ্রুর অর্ঘ্যদানে প্রার্থনা করি, মা! সুন্দর সুগঠিত নির্ম্মলচন্দ্রের অশরীরী আত্মাকে তোমার শান্তিময় বক্ষে স্থান দিয়া এ কি করিলে? তাঁর প্রিয় সঙ্গীত—"থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে, যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দধামে"—এত শীঘ্র তাঁর জীবনে পূর্ণ হইল? নির্ম্মল ছিলেন সাধক অনুকূলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র; যৌবনের আরম্ভে তাঁর বিবাহ দিয়া নববিধানের পরিবার-গঠনের জন্য অনুকূলচন্দ্রের কত সাধ ছিল। নির্ম্মল পিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি যথাসময়ে খাঁটী নববিধানীর সুরূপা কন্যাকে বিবাহ করিয়া নববিধানের আদর্শে পরিবার গঠন করিব।" পিতার মৃত্যুর পরও জ্যেষ্ঠ ভাগিনীপতিকে ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ঐ কথাই বলিয়া নিরস্ত রাখিয়া, মধ্যে উপার্জ্জনক্ষম অনুজ ভ্রাতার বিবাহ দিলেন। শান্তিসুধার বিবাহে নির্ম্মলের কত উৎসাহ, অকাতরে অর্থব্যয় করিলেন, ভ্রাতৃবধূকে আনিয়া ভ্রাতার সুখের সংসার পাতিয়া দিলেন। শান্তি বুঝতেই পাল্লেন না যে, তাঁর পিতা নাই; পিতার অভাব নির্ম্মলের স্নেহবাৎসল্যে পূর্ণ হইয়াছিল। তারপর অল্পদিন হইল, একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ নববিধানীর সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিলেন, উভয়ে সুখের সংসার পাতিলেন। মাগো! এ কি লীলা তোমার! নির্ম্মলের বিবাহবাসর যে এত শীঘ্র শ্রাদ্ধবাসরে পরিণত হবে, তাতো আমরা ভাবতেই পারি না।

তুমি, মা! আমাদের দেখাচ্চ, তোমার প্রেমের জন্যেই তাহা গড়ার ব্যাপার করিতেছ। তুমি নির্ম্মলচন্দ্রকে এখন অমর লোকে পিতামাতার ক্রোড়ে বসাইয়া, তোমার মধুর মা নাম করাচ্চ। তাঁকে তুমি কি মধুর স্বরে ডাকিলে যে, তিনি সে ডাক শুনে আর থাকতে পাল্লেন না। তাই তাঁর প্রিয় সঙ্গীতের সত্য জীবনে পূর্ণ হইল, "অনন্তজীবনে অনন্তমিলনে বিহরিব লোকান্তরে।" মা! এই মরধাম আর ঐ অমরধাম নববিধানে এক করিবার জন্যই যদি এই ভীষণ শোকের ব্যাপার করলে, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরাও যেন সকলে ঐ নিত্যলোকের জন্য প্রস্তুত হই। তুমি, মা, শোকার্ত্তা ও পতিহীনা বিধবা কন্যার প্রাণে সান্ত্বনা দাও; তিনি যেন পতির আত্মাকে তোমার মধ্যে দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। ভাই ভগিনী ও আত্মীয়দের প্রাণেও সান্ত্বনা দাও। আমরাও যেন সকলে তোমার প্রেমময় শান্তি-বক্ষে নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিয়া, আমরাও ঐ অমরাত্মাদের সহিত অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে মিলিত হই।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

কোচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (বড়)

গত ২৭শে অক্টোবর, কোচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। তাঁহার পুত্রকন্যা নাতিনাতিনীগণের অনেকে এবং জামাতা ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনায় যোগদান করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীর নেতৃত্বে মধুর সঙ্গীত হয়। উপাসনার যোগে শ্রীমদ্ গজেন্দ্রনারায়ণের জীবনী প্রাণে যে ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার অনুসরণে তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী কিঞ্চিৎ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

কোচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গী হইয়া স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বিলাতে আপনার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোচবিহার রাজ্যে বিচারবিভাগে বিশেষ বিশেষ উচ্চ পদে কর্ম্ম করেন এবং সময়ে পেনসন্ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় জামাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ নববিধানে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রে একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। নৈতিক জীবনের সুগন্ধে তিনি কোচবিহারের রাজবংশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি কোন দিন মদ স্পর্শ করেন নাই।

তিনি দীর্ঘকাল কোচবিহার নববিধান সমাজের সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকের উচ্চ কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রাণে লইয়া, তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরের রবিবাসরীয় উপাসনায় নিষ্ঠার সহিত যোগদান করিতেন এবং সমাজসম্পর্কে সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্ম সুনির্ব্বাহ বিষয়ে নিজে সাক্ষাৎ থাকিয়া যতদূর সম্ভব সহায়তা করিতেন। কোচবিহারের নববিধান মন্দির, ব্রাহ্মপল্লী, ব্রাহ্মবোর্ডিং, কেশবাশ্রম, বিধান লাইব্রেরী এবং নিয়মিত পাঠ, প্রসঙ্গ, আলোচনাসভা প্রভৃতির কার্য্য দর্শন, তাহাতে যোগদান ও তাহার পরিচালন বিষয়ে কতই উৎসাহ প্রকাশ ও আনন্দ অনুভব করিতেন। রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের পর তিনি কোচবিহার নববিধানসমাজ ও সমাজ সংক্রান্ত কাজে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

আজ কোথায় সেই ব্রহ্মমন্দিরের পূর্ব্বশ্রী, কোথায় ব্রাহ্মপল্লী, কোথায় ব্রাহ্মবোর্ডিং, কোথায় বিধান লাইব্রেরী, কোথায় নিয়মিত ছাত্রসভা, আলোচনাসভা, পল্লীতে পল্লীতে প্রচার, কোথায় কেশবাশ্রমের পূর্ব্ব প্রাকৃতিক শ্রীসৌন্দর্য্য? স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগের অল্পদিন পর হইতেই স্বর্গীয় মাননীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ও স্বর্গীয়া মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর সময়ের প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত ব্রাহ্মপল্লীর, ব্রাহ্ম বোর্ডিংএর, বিধান লাইব্রেরীর এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির মূল দেশ পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া কি এক কীর্ত্তিনাশা নদী কখন লোকচক্ষুর গোচরে, কখন লোকচক্ষুর অগোচরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই দেখা গেল, সেই কীর্ত্তিনাশা নদীর আঘাতে কোচবিহার নববিধানসংক্রান্ত প্রায় সকল কীর্ত্তিই বিলুপ্ত। এখন যাহা আছে, তাহা ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় অবস্থান করিয়া, হৃদয়বান সহানুভূতিকারী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের চক্ষু হইতে বিষাদের অশ্রু আকর্ষণ করিতেছে!

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণকে জীবনের বিশেষ পরীক্ষায় কোচবিহার পরিত্যাগ করিতে হইল। সে পরিত্যাগ তাঁহার কত মর্ম্মবেদনাদায়ক হইয়াছিল, সাংসারিক জীবনে তাঁহার সে পরিত্যাগ কত ক্ষতিকর হইয়াছিল, তাহা আর বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার কথা নয়। গ্রাম্য সংগীতে গীত হয়, "থাকতাম যদি গুরুপদে, ভক্তাম যদি গুরুপদে, বিপদে হতো শুভদিনরে, বিপদে হতো শুভদিন।" প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, তাঁহার কোচবিহারত্যাগে গুরুপদে শরণাপন্নতা বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। শরণাপন্নাবস্থায় তাঁহার আত্মিক জীবনের পক্ষে সে শুভদিন বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। কোচবিহার তাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র দুইই ছিল। তিনি যতদিন কোচবিহারে ছিলেন, অল্লাধিক রাজকার্য্যের সঙ্গে তাঁহার জীবন জড়িত ছিল। কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় কার্য্য হইতে ও রাজকীয় সংস্রব হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইলেন; পৃথিবীর

ঐশ্বর্য্য কত অসার ও অনিত্য, তাহা তাঁহার মানস চক্ষে তখন বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হইল। তিনি মুক্ত পাখী হইয়া পরম-জননী হইতে সঘনে, নির্জ্জন স্বর্গের পুণ্যছোঁয়া স্নেহদুগ্ধ পান করিয়া পরিপুষ্ট ও বলীয়ান্ হইতে লাগিলেন। যথা সময়ে, ভগ্ন দেহ খাঁচা হইতে উড়িয়া স্বর্গধামে ব্রহ্মানন্দনে পরমজননীর অমৃতবক্ষে তাঁহার ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় আসিল। ২৭শে অক্টোবর দেহ খাঁচা হইতে উড়িয়া তাঁহার পরমজননীর শান্তিবক্ষে স্থানলাভের সেই পুণ্যদিন।

যৌবনের স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাল্যকাল অথবা যৌবনের প্রারম্ভে পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলারের মহাপ্রভু শ্রীবুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই অবধি এক স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটাইতে লাগিলাম। দিবসের জাগরণের ভিতর শ্রীবুদ্ধবিষয়ক স্বপ্ন, রাত্রে নিদ্রার ভিতর ঐ স্বপ্নই আমার দেহ মনকে অধিকার করিয়া বসিল। ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, জাগরণে ও নিদ্রায় ঐ একই স্বপ্নের ঘোর চলিতে লাগিল। শুভক্ষণে পাটুলিপুত্রের ধূলিকণার স্পর্শ পাইয়া আমি যেদিন ধন্য হইলাম—পাটুলিপুত্রের অণুকণাগুলি স্বর্ণরেণু হইয়া যেদিন আমার সর্ব্বশরীরে শ্রাবণের ধারার মত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—যেদিন শ্রীবুদ্ধবিহারভূমির সুবাসিত মলয়-পবন আমার শ্বাস প্রশ্বাসে সঞ্চারিত হইয়া নূতন জীবন দান করিল, সেইদিন জানিলাম, কোন শুভক্ষণে কালের অন্ধকার ভেদ করিয়া এক অলৌকিক আলোকধারা বিদ্যুৎ চমকের মত সেই মহাপুরুষের স্পর্শ দান করিল।

কি জানি, কোন অলৌকিক কারণ হইতে সেই দিব্যপুরুষের সহিত আমার অচ্ছেদ্য আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহা কোন তপস্যা বা আলোচনার ফল নহে—ইহা তাঁহার ধর্ম্ম ও চরিত্রবিষয়ক শ্রমসাধ্য গবেষণার পুরস্কারও নহে। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বের ও কৃচ্ছ্র সাধনার দুর্লভ সাধনাও নহে।

একটী স্বজাতীয় অণুকণা কালকালান্তর পরে প্রকৃতির নিয়মে মিলিত হয়, আত্মারও প্রকৃতিগত কোন প্রচ্ছন্ন মূল কারণ সেইরূপ নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, যেখানে যুগযুগান্তর হইতে একটি মহান্ আত্মা আর একটি ক্ষুদ্র আত্মাকে আপনার দিকে টানিয়া লন; ইহা বিধাতার বিধান। আমার সঙ্গে তাঁহার এই বিস্ময়কর সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সঙ্গত মীমাংসা খুঁজিয়া পাই না। ইহাই আমার পূর্ণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে আমার জীবন তাঁহার স্পর্শে আলোকময় হইবে। এই আলোক হইতে যে কণামাত্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাই জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিল। শুভক্ষণে পাটুলীপুত্রে আগমন। আমার শ্রীবুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার একটি প্রশস্ত পথ খুলিয়া গেল। শুভক্ষণে আমি দুইজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সাধকের সহিত পরিচিত হইলাম। তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা এবং শ্রীবুদ্ধবিষয়ক আলোচনার ফলে আমার জ্ঞান একটু উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সেই বিশিষ্ট সাধকদের ভিতর একজন শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল, আর একজন সাধু প্রকাশচন্দ্র। ভাই ব্রজগোপালের বৌদ্ধ গ্রন্থ কিছু পড়া ছিল. তাহা ব্যতীত তিনি হরিসুন্দরবাবুর নিকট গয়ায় তখন বাস করিতেন। গয়া হইতে ৬।৭ মাইল দূরে বুদ্ধগয়ার মন্দির অবস্থিত। সেই মন্দিরদর্শনের জন্য অথবা তীর্থ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয়, চীনদেশীয়, সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিতেন। ভাই ব্রজগোপাল তাঁহাদের সহিত বুদ্ধবিষয়ক প্রসঙ্গ করিতেন। ইহাতে ভাই ব্রজগোপালের শ্রীবুদ্ধের প্রতি এবং তাঁহার চরিত্র, সাধনা ও প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি বেশ আস্থা হইতে লাগিল। তিনি শ্রীবুদ্ধদেবের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। আমার সহিত তাঁহার এই বুদ্ধবিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, আমার ভাবের সহিত তাঁহার ভাব মিলিত হইয়াছে। আমার চিন্তার সহিত তাঁহার চিন্তা এক হইয়া গিয়াছে।

যে সকল সাধন লইয়া ভাই ব্রজগোপাল শ্রীবুদ্ধদেবের অনুগত সাধক বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিলেন, আমারও মনের গতি সেই দিকে ধাবিত হইল। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন একটি প্রাণ হইলাম; একই ভাবের তরঙ্গে উভয়ের চিত্ত উদ্বেলিত হইল। একই চিন্তার ধারায় উভয়ের মন ভাসিয়া যাইত। ক্রমে আমাদের মধ্যে সাধনার ভাব বেশ জমাট হইয়া গেল। তাঁহার সহিত এই আত্মীয়তা বুদ্ধবিষয়ক স্বপ্নের সাহায্য করিল। তখন ভাবিলাম, আমিও একবার বুদ্ধ গয়া যাইয়া সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত আলাপ পরিচয় করি। তখন ব্রহ্মদেশীয় দুইটী সন্ন্যাসী, চীনদেশীয় একটি ও সিংহলদেশীয় একটী সন্ন্যাসী তীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছেন। আমরা কেহ কাহারো ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সমস্তদিন অথবা দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া থাকিতাম। তাঁহাদের সাধন দর্শন করিতাম। তাঁহাদের স্তোত্রপাঠ ঠিক আমাদের স্তোত্রপাঠের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা একাহারী, প্রাতে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইতেন। ভজনের পর পাঠ ও আলোচনা হইত। তাঁহাদের সাধন আরো অতিশয় কঠোর। দিবসের এক মুহূর্ত্তও বৃথা কাজে বা কথায় তাঁহারা ব্যয় করিতেন না। উঠা, বসা, পাঠ, প্রসঙ্গ, স্তোত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা সমস্ত একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। রাত্রিতে তাঁহারা অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইতেন না। এই সকল ঘটনা আমার বুদ্ধবিষয়ক স্বপ্নের সহায় হইল। মন মুগ্ধ হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া ভাই ব্রজগোপালের সহিত এই

সব বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহাতে জীবন ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বপ্ন জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হইল।

আর একটি বিশিষ্ট সাধক—যাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়—তিনি সাধু প্রকাশচন্দ্র। যদিও প্রকাশচন্দ্রের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের আলাপ প্রসঙ্গাদি হইত না, কিন্তু তাঁহার সাধনা বুদ্ধ-সাধনার অনুরূপ। ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশচন্দ্রের সাধনা ছিল। তাঁহার মন্ত্র ছিল, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।" তিনি বলিতেন, "যদি কেহ চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে মিথ্যা বলে বা মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহার ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনা করিবার কোন অধিকার নাই। তাহার সেই ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা জীবনে নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সেইরূপ যদি কেহ ক্রোধাদি রিপুদিগকে বর্জ্জন করিতে না পারে বা তাহাদিগের উপর জয়লাভ করিতে না পারে, তাহার 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' অর্থাৎ ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ এ কথা বলিবার কোন অধিকার নাই। আমার ধর্ম্মের পরীক্ষা এই। এই ব্রহ্মচর্য্য কে কি পরিমাণে পালন করিতেছে, কি পরিমাণে কামাদি রিপুর উপর জয় লাভ করিয়াছে, তাহারই পরিচয়ে আমি ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মিথ্যা উপাসনা তাহার, যাহার সহিত চরিত্রগত কোন সংস্রব নাই; ভগবান সে উপাসনা গ্রহণ করেন না।" যদিও তিনি বুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান অধিক উপার্জ্জন করেন নাই, তথাপি শ্রীবুদ্ধের সাধন ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি বৎসর শ্রীবুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ বিহারভূমি রাজগৃহে তাঁহার একটি ছোট দল লইয়া গমন করিতেন। ৫।৭ দিন ধরিয়া সাধন, ভজন, নামকীর্ত্তন, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সাধনে মগ্ন থাকিতেন। একটা স্বর্গের আবহাওয়া রাজগৃহের চারিদিকে এই কয়েকদিন প্রবাহিত হইত।

নারীগণও সংসার ভুলিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই সাধনে যোগদান করিতেন। রাজগৃহে শ্রীপ্রকাশচন্দ্রের সস্ত্রীক সিদ্ধিলাভ হয়। রাজগৃহে তিনি স্বহস্তে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং তিনি নিজে আপনার মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক ধারণ করিয়া, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় কাল কাটাইতেন। এখানে শ্রীবুদ্ধদেবের ধর্ম্ম কালের আবরণ ভেদ করিয়া কয়দিন জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিত। এখানে শ্রীপ্রকাশচন্দ্রের ক্ষুদ্র দলের ভিতর ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ বৈরাগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা সংযম কয়দিন উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিত; তাহাতে সকলের মনে হইত, যেন তাঁহারা স্বর্গে বাস করিতেছেন। পৃথিবীর কোলাহল ছাড়িয়া সকলেই নূতন যোগভূমির সন্ধান পাইলেন। প্রকাশচন্দ্র রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটা ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ দল সৃষ্টি করিলেন। এই দলের ভিতর ভাই ব্রজগোপাল, মৈমনসিংহের ভাই দীননাথ, গাজীপুরের সাধু নিত্যগোপাল, বাঁকিপুরের অপূর্ব্বকৃষ্ণ, খগোলের ষষ্ঠীদাস প্রভৃতি এই দলের অন্তর্গত হইলেন। প্রকাশচন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যের আবহাওয়ার ভিতরে বাস করিয়া ভাই দীননাথ পাগল হইয়া গেলেন। যেখানে উপাসনা করিতে যাইতেন, বাঁকিপুরের যে পরিবারের সহিত তিনি মিশিতেন, উপাসনার পরেই তাঁহার প্রশ্ন ছিল যে, তোমরা কি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ? বহু পুত্র কন্যার পিতামাতা হওয়া ধর্ম্মের সার্থকতা নয়, যাঁহারা বিবাহ করিয়া অবিবাহিতের ন্যায় কালযাপন করেন, তাঁহারাই যথার্থ গৃহস্থ বৈরাগী।

সে সময় ব্রহ্মচর্য্যের আবহাওয়া এমন করিয়া ক্ষুদ্রদলকে অধিকার করিয়াছিল যে, সেই দলের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কেহ অল্পকালের জন্য, কেহ দীর্ঘকালের জন্য, কেহ বা চিরদিনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মবন্ধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন; উপাসনা, প্রার্থনা, পাঠ, ধর্ম্মালোচনা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতেন না। নারীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। বাঁকিপুরের ক্ষুদ্র দল একক্ষণে ব্রহ্মচারী ত্যাগী বৈরাগী হইলেন। তিনি যে অন্তরঙ্গ দল গঠন করিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা হইত। কোন গভীর ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক প্রসঙ্গ সেখানে আলোচনা হইত না। কেমন করিয়া চরিত্রকে ভাল করা যায়, কেমন করিয়া সত্যপরায়ণ হওয়া যায়, চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মে কেমন করিয়া প্রতিদিন আত্মা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, কেমন করিয়া সেবাপরায়ণ হওয়া যায়, প্রেমিক হওয়া যায়, প্রতিবেশীর উপকার জীবনে কেমন করিয়া সার্থক হইতে পারে, কেমন করিয়া কাম ও ক্রোধাদি রিপুদিগকে বশীভূত করা যায়, এই সকল বিষয় সেখানে আলোচিত হইত। ক্ষুদ্রদলের প্রত্যেককে, কে কিরূপভাবে জীবন কাটাইলেন, তাহার হিসাব দিতে হইত। গৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে, সন্তানপালনে দাসদাসীর সহিত ব্যবহারে কেহ ক্রোধাদির বশীভূত হইলেন কি না, তাহার দৈনিক হিসাব রাখিতে হইত। বস্তুতঃ যাঁহারা সেই দলের অনুগত হইলেন, তাঁহারা শুদ্ধচরিত্র, সেবাপরায়ণ ও পরোপকারী হইলেন এবং রিপুসংহারব্রতপালনে অনেকেই কৃতকার্য্য হইলেন।

কেহ তাঁহার নিকট ফাঁকি দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারিত না, তাঁহার আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল; প্রতিদিন উপাসনার সময় এক একজনকে এক একটী স্বরূপ আরাধনা করিতে বলিতেন। সেই আরাধনা হইতে তিনি বুঝিতে পারিতেন, কে কতদূর অগ্রসর হইল, কাহার চরিত্রে কতদূর ব্রহ্মস্বরূপের ছাপ পড়িল। প্রকাশচন্দ্র প্রোমক ছিলেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, সমস্তই পরার্থে দান করিতেন। তিনি একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বাঙ্গালী, বিহারী, এমন কি সিন্ধুদেশ হইতেও লোকে কন্যা পাঠাইতেন। ভগবানের কৃপায় এইরূপে কয়েকজন বিশিষ্ট সাধুর সংস্রবে আসিয়া, আমার বুদ্ধবিষয়ক স্বপ্ন বাস্তব জীবনে কথঞ্চিৎ পরিণত হইল। শ্রীবুদ্ধদেব এখনও প্রতিদিন আমার জীবনের পথপ্রদর্শক হইয়া, শয়নে

পনে আমাকে পথ দেখাইতেছেন। শীল, ব্রত, ত্যাগ, বৈরাগ্য আচার ও উপাসনায় আমি সেই মহাপুরুষের অনুপ্রাণন প্রাপ্ত হইয়া চলিতেছি। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া জীবন আরম্ভ করি এবং রাত্রিকালে শুইবার সময় 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' বলিয়া শয়ন করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

সংবাদ।

শুভবিবাহ—১৭ই অক্টোবর, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, আলিপুরে, আচার্য্যদেবের পৌত্রী, কাপ্তান প্রফুল্লচন্দ্র সেনের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুরজাহান সেনের সহিত, বোম্বায়ের ডাঃ পি, ধর্গালকারের দ্বিতীয় পুত্র ময়ূরভঞ্জের বিমানপোতপরিচালক কল্যাণীয় মিঃ আর, পি, ধর্গালকারের শুভবিবাহ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ শুভবিবাহে উপাসনাদির কার্য্য করিয়াছেন।

গত ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, বুধবার, চট্টগ্রামে নন্দনকাননস্থ নবীনভবনে, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জনিবাসী স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্র দাসের সহিত, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর, বুধবার, চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কানুনগোর জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ব্রহ্মবীরের সহিত, ঢাকা ওয়ারিনিবাসী স্বর্গীয় গোপীমোহন সেনের পৌত্রী, স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন সেনের তৃতীয় কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুকার শুভবিবাহ ওয়ারিস্থিত ১নং নবাব ষ্ট্রীট ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যার ভ্রাতা শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রমোহন সেন এই শুভানুষ্ঠানে প্রচারভাণ্ডারে ১২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিদিগকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৪শে অক্টোবর, কুলটীতে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ অতুলচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ভ্রাতা ভগ্নীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার প্রথমাংশ এবং ভাই অক্ষয়কুমার নথ উপাসনার শেষাংশ সম্পন্ন করেন। অনুজ ভ্রাতা শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা এবং জ্যেষ্ঠভগ্নীপতি ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের লিখিত নির্ম্মলের চরিত্রস্মৃতি পাঠ করেন। দ্বিতীয়া ভগ্নী শ্রীমতী সুষমা বসু দাদার নির্ম্মল আত্মার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায় কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, অনাথাশ্রমে ৫৲, ভগ্নীসমিতিতে ৫৲, ছেলেমেয়েদের নীতিবিদ্যালয়ে ৫৲ এবং ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা এবং ভগিনী সুষমা বসু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। গত ১৮ই অক্টোবর, ভাগলপুরে, তত্রত্য পোষ্ট মাষ্টার স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্রের শ্বশুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের গৃহে, পত্নী শ্রীমতী মণিকা কর্ত্তৃক স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন।

পরলোকগমন—অতীব দুঃখের সহিত আমরা নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

হাওড়ায় ৩নং নেপাল সাহা লেনে, ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণের শিশুপুত্র গত ২০শে অক্টোবর মা বাবার ক্রোড় শূন্য করিয়া পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া যায়। শিশুটী গত ১১ই সেপ্টেম্বর পাবনায় জন্মগ্রহণ করে। শিশুর পরলোকগমনে গত ২৭শে অক্টোবর ভাই অখিলচন্দ্র রায় ঐ গৃহে উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পিতা ইন্দুভূষণ শিশুর পুণ্যস্মৃতিতে নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন :—

অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কলিকাতা অনাথাশ্রম ৪৲, ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটী ৫৲, পাবনা সদর হসপিটাল ৫৲, কলিকাতা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটী ৫৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২৲, অমরাগড়ীর নিকটস্থ গ্রামের দরিদ্র শিশুদের সেবার্থে ২৲ টাকা।

গত ২২শে অক্টোবর, কলিকাতায় ১৬৪এ ল্যান্সডাউন রোডে, কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের পুত্র, প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র ডাঃ সুরেন্দুকুমার দাস অল্প কয়দিনের জ্বরে পিতামাতা, পত্নী, দুইটী অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী ও বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। গত ৮ই নবেম্বর, ঐ গৃহে তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উদ্বোধন, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ আরাধনা এবং ভাই অক্ষয়কুমার নথ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। ভ্রাতা সন্তোষকুমার দাস প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। ভ্রাতা শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দাস (I.C.S.) মেজদাদার জীবনী এবং ভগ্নী শ্রীমতী কানন লিখিত মেজদাদার জীবনী শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাস পাঠ করেন। অতি গম্ভীর ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গীত হয় :—

কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, অনাথাশ্রম ৩৲, নববিধান প্রচারকণ্ড ৫৲; ঢাকা—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, অনাথাশ্রম ৩৲, বিধবাশ্রম ৩৲, অনাথ

ব্রাহ্মধনভাণ্ডার ৩৲, রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য হাসপাতাল ৩৲; চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ ৩৲, পুরী নববিধান ৩৲, মুঙ্গের নববিধানসমাজ ৩৲; কৃষ্ণনগর—ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, দরিদ্র ভাণ্ডার ৩৲, দাতব্য স্কুল ৫৲, রামকৃষ্ণমিশন ৫৲; নবদ্বীপ পণ্ডিত পরিবারের জন্য ১০৲; বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাঁকুড়া কেন্দ্র ৫৲, সঙ্কটত্রাণসমিতি ৫৲; দরিদ্রদের জন্য বস্ত্র ১০৲ ও নগদ পয়সা ৫৲, গীতাদান ৭৲ টাকা, মোট ১০০৲ টাকা।

বার্ডকোম্পানীর পেটেণ্ট ষ্টোন ফেক্টরীর ম্যানেজার, আমাদের প্রেমাস্পদ বন্ধু মিঃ শিশিরকুমার গুপ্তের চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা একমাত্র সন্তান শ্রীমতী কল্যাণী কয়েকমাস রোগ ভোগ করিয়া, গত ২৪শে অক্টোবর, ২৫।১ রোলাণ্ড রোডে, মাসীমা শ্রীমতী মীরা দেবীর (মিসেস, এ, কে গুপ্ত) কাছ হইতে, মাসীমা ও পিতার প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগতা মা উমা দেবীর কাছে চলিয়া গিয়াছেন। গত ১লা নবেম্বর, ঐ গৃহে কল্যাণীর আত্মার কল্যাণার্থ ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ২৮শে কার্ত্তিক, শনিবার, শেষরাত্রি আটার (১৫ই নবেম্বর), বালিগঞ্জে ৪৩নং কার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম সাধক, ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ৯১ বৎসর বয়সে, শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে ভাগলপুরের স্বর্গগত ভক্তদল ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্ত হরিসুন্দর বসু, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বামাচরণ ঘোষ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এখানে সুদীর্ঘ কাল নির্ম্মল চরিত্রের সুগন্ধ ও নববিধানের বিশ্বাস-প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ আদর্শ জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বংশের চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিবারে ও মণ্ডলীতে বিকীর্ণ করিয়া বিধানকে জয়যুক্ত করিয়া গেলেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে উন্নত লোকে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই নবেম্বর, কমলকুটীরস্থ নব-দেবালয়ে, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সুনীতি দেবীর চতুর্থ সাম্বৎসরিক কুচবিহার ষ্টেটের ব্যবস্থানুযায়ী জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে উপাসনা হয়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন-কলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেনকৃষ্ণ বসু ভক্তিরত্ন মধুর কীর্ত্তনানন্দে সকলকে মুগ্ধ করেন।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুনর্মুদ্রণ

এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ জন্য এ পর্য্যন্ত যে টাকা হস্তগত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছি:—

মিঃ বি, কে, হালদার (পিংমালা) ৫০০৲, মিঃ জি, সি, বানার্জি ৫০০৲, মিঃ প্রবোধকুমার দত্ত (ইংলণ্ড) ৩০০৲, ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও (মসলিপত্তন) ১০০৲, ডাঃ বি, সি, ঘোষ ও মিসেস এডিথ ঘোষ ১০০৲, প্রঃ ও মিসেস এস, সি, মহালানবিস ৫০৲, ডাঃ জি, এম্ ব্যানার্জি ৫০৲ (প্রঃ কিঃ), মিঃ জে, এম, সেন ২৫৲, জনৈক মহিলা ২০৲, লেঃ কর্ণেল জে, এল, সেন (প্রঃ, কিঃ,) ২০৲, স্যার এল, জি, মুখার্জি (এলাহাবাদ) ১০৲, মিঃ বি, কে, সেন (এটর্ণি) ১০৲, মিঃ মহেন্দ্রচন্দ্র দেব (দেরাদুন) ৫৲, মিঃ এস, এন, রায় (লক্ষ্ণৌ) ৫৲, মিঃ বিনয়ভূষণ বসু (ফরিদপুর) ২৲ মিঃ মতিরামদখিরাম আদ্‌ভানি (হায়দ্রাবাদ) ১০০৲, ডাক্তার সচ্চিদানন্দহোসেন পাল ২০৲ টাকা। মোট ১৮১৭৲ টাকা।

পুনর্মুদ্রণে ৩০০০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে, এখনও ১২০০, ১৩০০৲ টাকা আবশ্যক। এজন্য যাঁহারা সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের ও যাঁহারা এখনও সাহায্যদানে অগ্রসর হন নাই, তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষভাবে নিবেদন যে, সত্বর এই মহৎকার্য্যে সাহায্যদান করিয়া বাধিত করুন ও পুণ্য সঞ্চয় করুন। কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতেছে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা
এলাহবাদ ; ১০।১১।৩৬ } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

যে সকল মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মেরা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়া বাসস্থানের অসুবিধা ভোগ করেন, তাঁহাদের জন্য নববিধান প্রচারকার্য্যালয়, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, দুইখানি ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি পৃথক করিয়া রাখিবার একটা সাময়িক আয়োজন আমরা করিতেছি। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত হইবে:—

১। মফঃস্বল হইতে আগত ব্রাহ্ম অতিথিগণ এখানে থাকিতে পারিবেন।

২। আসিবার পূর্ব্বে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয়ের নিকট দিন ও তারিখ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া আসতে হইবে।

৩। সাধারণতঃ ৭দিন পর্য্যন্ত বাসের অনুমতি দেওয়া হইবে; যদি তাহার পর থাকার প্রয়োজন হয়, অন্য কেহ প্রার্থী না থাকিলে, আরও ৩ দিন পর্য্যন্ত অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে। একসঙ্গে ১০ দিনের অধিক বাসের স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৪। যিনি যে যে তারিখের অনুমতি পাইবেন, তাহার অতি-রিক্ত থাকিতে পারিবেন না।

৫। পূর্ব্বে অনুমতি লইয়া না আসিলে, স্থান পাওয়া সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা থাকিবে না।

৬। কেবল থাকিবার স্থান ও আলো দেওয়া হইবে। আহার, চাকর বাকর ইত্যাদির ব্যয় যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদের নিজেদের দিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে অতিথিরা এ সকলের ব্যবস্থা কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত করিতে পারিবেন।

৭। প্রয়োজন হইলে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৮। স্থান দেওয়া ও আয়োজনের পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ-ভাবে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয়ের হাতে থাকিবে এবং এ বিষয়ে পত্রাদি তাঁহাকেই লিখিতে হইবে। এই নিয়মাবলীও তাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে।

৯। অনুগ্রহ করিয়া কেহ রোগী লইয়া আসিবেন না।

এখন হইতে আপাততঃ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৭, পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা রাখা হইবে। মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মদের ইহাতে কোনো উপকার হইলে আমরা সুখী হইব।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৬। } নিবেদক
শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ২০।২১শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩সাল, ১৮৫৮শক, ১০৭ব্রাহ্মাব্দ | 2nd & 17th. November, 1936 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বজননি! এ সময়ে বঙ্গভারতের প্রাচীন অসংখ্য হিন্দু পরিবারের অনুষ্ঠিত শারদীয় শ্রীদুর্গা-পূজার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া আমরাও শারদীয় উৎসবকে আমাদের জাতীয় মহোৎসবরূপে গ্রহণ করিলাম। মা! তোমার আধ্যাত্মিক মহাপূজার যতটুকু সুযোগ তুমি আমাদিগকে দান করিলে, সেইভাবে পূজা নির্ব্বাহ করিলাম। মা, এবার তুমি অনন্তের মহাপূজায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছ, এই নবযুগে নববিধানে তুমি অনন্তের মহাপূজা সম্পাদন করিতে নিজে অন্তরের গুরু হইয়া শিক্ষাদান করিতেছে, বিশ্বের সকল সাধু ভক্ত মহাজনগণের জীবনের পূজোপকরণগুলি প্রাণে লইয়া শুষ্কতার অগ্নিতে, নিষ্ঠার অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া, ভক্তি, অনুরাগ, সেবা প্রভৃতি হৃদয়ের বিবিধ অনুপম ভাবকুসুমে সজ্জিত হইয়া পূজা করিতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছ। আমরা এরূপ মহাপূজার প্রস্তুতিব্যাপারে কত কাঙ্গাল, তাহা তুমি জান। আমাদিগকে কাঙ্গাল জানিয়া, কাঙ্গালভাবেই আমরা তোমার পূজা-বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগকে কাঙ্গাল জানিয়া, আমাদের আদরের ভাই ভগ্নীগণ আমাদের আহ্বানে, মনে হয়, সকলে তেমন হৃদয়ের সহিত সাড়া দেন নাই। কিন্তু তুমি কি কাঙ্গাল গরিবদিগকে উপেক্ষা করিতে পার? তুমি যে, মা, দীনপালিনী। তাই তুমি আমাদের হৃদয়ের ও বাহিরের অল্প আয়োজন মধ্যেও আমাদিগকে তোমার মহা মহোৎসবের, মহাপূজার প্রসাদ আমাদের জীবনের উপযোগিভাবে বিতরণ করিয়া, পূজানন্দে আমাদিগকে ধন্য করিয়াছ। বালক যুবা বৃদ্ধ উপস্থিত সকলেই পূজার প্রসাদ আত্মিকভাবে ও বাহ্যভাবে গ্রহণ করিয়া স্বর্গের আনন্দে মাতিলেন ও নৃত্য গীত করিলেন। কিন্তু মা! এই মহোৎসবের সময়ে আমাদের মধ্যে বিশেষ শোকের আঘাতেও আমাদিগকে স্বর্গের বিশেষ চেতনা দান করিলে; শোকের আঘাতে জর্জ্জরিত প্রাণেও তুমি শান্তিসান্ত্বনা-দানে ধন্য করিতে ভুলিলে না। ধন্য তোমার করুণা। এ সময় মণ্ডলীর, দেশের, বিদেশের, সমস্ত বিশ্বের দুঃখ দৈন্য শোকে, নানাভাবে প্রপীড়িত লাঞ্ছিত আমাদের সকল ভাইভগ্নীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করি, দুর্গতিহারিণী জননি! তুমি নিজ কৃপাগুণে, তোমারই নিগূঢ় ব্যবস্থায়, এ মণ্ডলীর এবং এদেশের ও বিদেশের তোমার সকল পুত্রকন্যার দুঃখ দৈন্য দুর্গতি দূর করিয়া, সকলের প্রাণে স্বর্গের শান্তি, আরাম আনন্দ দান

কর, এবং তোমার পূজা সকল পরিবারে, সকল গৃহে, ছোট বড় সকল জীবনে সত্যিকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

ভারতে জাতীয় উৎসব—শ্রীদুর্গোৎসব

কোন্ সুদূর অতীতে ভারতে মাতৃপূজার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে প্রশ্ন তুলিয়া তাহার মীমাংসার পক্ষে এ সময়ে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে মাতৃপূজা পৌরাণিক যুগের বিশেষ ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পৌরাণিক যুগ আরম্ভ হওয়ার পর কোন একটী দেবতার পূজা, কি কোন একটী দেবীর পূজা অখণ্ড ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, একথা বলা যায় না। বঙ্গভারতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায় আমরা পৌরাণিক যুগের ফলস্বরূপ বর্ত্তমানেও দেখিতে পাই। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিপালনীয় বিশেষ একটি বিধি এই দান করিলেন, "না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ, না করিবে অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।" নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ অন্যদেবতার নিন্দন বন্দন করিবেন না, অন্য দেবতার প্রসাদভক্ষণও করিবেন না। একনিষ্ঠভাবে একেতে মন প্রাণ না রাখিলে শুদ্ধা ভক্তির সাধন হয় না, এজন্য খাটি বৈষ্ণব গৃহে এক বিষ্ণুপূজা ভিন্ন অন্যদেবতার পূজা হইত না; অন্যদেবতার উদ্দেশ্যে কোন ব্রত নিয়মও প্রতিপালিত হইত না। এ অবস্থায় দুর্গাপূজা যে বঙ্গভারতের সকল গৃহের সর্ব্বথা অনুমোদনীয় পূজা কখন ছিল না, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বিশেষভাবে দুর্গাপূজা, কালীপূজা বলিপ্রধান; সুধু ছাগ প্রভৃতি বলি নহে, নরবলি পর্য্যন্তও এরূপ পূজায় ব্যবস্থা ছিল। বৈষ্ণবগণ, বৌদ্ধগণ কখন এরূপ পূজায় যোগ দান করিতে পারেন না। কথা আছে, যে গৃহে বলি হয়, অন্ততঃ তিন দিন সে গৃহে বৈষ্ণবের গমন নিষেধ। বঙ্গে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একটা স্মরণীয় ব্যাপার। যদিও পরবর্ত্তী সময়ে এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট জাতীয় জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবের একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দুর একই বাড়ীতে একদিকে দুর্গাপূজা হইতেছে, অন্য দিকে বিষ্ণুপূজা হইতেছে। সময়ে বিষ্ণু দেবতার এত প্রাধান্য-স্থাপন হইয়াছে যে, শালগ্রামশিলার পূজা ভিন্ন কোন পূজারই পূর্ণতা সাধন হয় না। ইহাই এখন অধিকাংশ গৃহীর ঘরের প্রচলিত প্রথা।

আমরা শ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এতগুলি কথা এই জন্য উল্লেখ করিলাম, যদিও গোঁড়া বৈষ্ণবগণ অন্য দেবতার পূজা করেন না, ভাবতঃ অন্য দেবতা স্বীকার করেন না, যদিও শালগ্রামশিলা বিষ্ণুপূজার স্থান অধিকার করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের প্রায় অধিকাংশের ঘরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যদিও দুর্গাপূজা বঙ্গভারতের অনুষ্ঠানগত সর্ব্ববাদিসম্মত পূজা নহে, তথাপি দুর্গাপূজা বঙ্গ ভারতের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনের মহাপূজারূপে, দুর্গোৎসব হিন্দুর জাতীয় জীবনের মহামহোৎসবরূপে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসবরূপে পরিণত হইয়াছে, একথা বলিতেই হইবে।

এত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসত্ত্বেও বঙ্গভারতে শ্রীদুর্গার পূজা কেন এত প্রাধান্য লাভ করিল, কেন জাতীয় মহা মহোৎসবে পরিণত হইল, ইহার উত্তরে সহজে আমাদের এই বলিতে ইচ্ছা হয়, মাতৃভাবের তুল্য সুমিষ্ট ভাব, আপনা হইতেও অতি আপনার অন্তরঙ্গ ভাব আর কিছুই নাই, মাতৃনামের তুল্য সুমিষ্ট নামও আর কিছু নাই। মাতৃভাব আবার এত মহিমা গৌরবে পূর্ণ যে, মাতৃভাব পিতৃভাবকেও খানিকটা নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। তাই বঙ্গভারতে শ্রীদুর্গাপূজার এত প্রাধান্য ও গৌরব। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, এই তিন ভিন্ন ভাবের শ্রেষ্ঠ পূর্ণতা মাতৃভাবে সংসারে আমরা দেখিতে পাই, পিতা উপার্জ্জন করেন, ধন ঐশ্বর্য্য দ্বারা গৃহ পূর্ণ করেন, কিন্তু গৃহসামগ্রী হিসাবে গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহিণী। পিতা বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন; যেমন গৃহে সামগ্রী সকল সঞ্চিত হইল, তেমনি গৃহের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল সামগ্রীই গৃহিণীর হস্তে। গৃহের পুত্রকন্যাগণের বিশেষ আবদার মায়ের কাছে। মায়ের ভাণ্ডার সন্তানের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পূর্ণ। তাই পুত্রকন্যার নিকট পৃথিবীর মাতা অসীম ঐশ্বর্য্যময়ী। আর স্নেহভরা মায়ের মত মধুর সামগ্রী সংসারে সন্তানের পক্ষে আর কি হইতে পারে? আবার মায়ের মত সন্তানের নিকট সুন্দরীই বা কে? মা কুরূপা হইলেও

সন্তানের নিকট সেই মা পরমা সুন্দরী; কেন না মধুর মাতৃভাবই কুরূপা মাকেও সুন্দরী করে সন্তানের নিকট। পৃথিবীর মাই যদি সন্তানের নিকট এত ঐশ্বর্য্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী ও পরমাসুন্দরী বলিয়া পরিণত হইতে পারেন, তবে জগন্মাতা যিনি, অনন্তস্বরূপা যিনি, তিনি ভক্ত সন্তান, ভক্ত পুত্রকন্যাদিগের নিকট অনন্ত ঐশ্বর্য্যে, অনন্ত মাধুর্য্যে ও অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবেন এবং তাঁহারা সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহাই তো সত্যিকার কথা। কোন্ ভক্তের নিকট ঈশ্বরের চিন্ময়মাতৃরূপের মাতৃভাবের প্রথম প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল, আমরা জানিনা। কিন্তু ভক্তের হৃদয়-কন্দরে যে গভীর মাতৃভাবের ঐশ্বরিক প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহা সে ভক্তও ভাষায় সম্পূর্ণ অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন না, এবং যিনি সে ভাষা শ্রবণ করেন, তিনিও সম্পূর্ণ ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা"। ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর যখন মাতৃরূপে প্রকাশিত হইলেন, ঈশ্বরকে ভক্ত মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কবি সেই মাকে বাহিরের উপমায় নানা ভাবে চিত্রিত করিলেন, আর ভাস্কর সেই কবির চিত্রিত উপমাকে প্রতিমায় পরিণত করিলেন।

পৌরাণিক দেবদেবীগণের প্রত্যেকেরই প্রায় আপনাপন বৈশিষ্ট্যানুসারে মহিমা গৌরব বর্ণনাচ্ছলে, বিশেষ বিশেষ কবি বিশেষ বিশেষ গাথা বা প্রস্তাবনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীদুর্গার মহিমাবর্ণনা-সূচক গাথার নাম। চণ্ডী। কথিত আছে, অদম্য দৈত্য দানব অসুর প্রভৃতির সংহারের জন্য, স্বর্গের দেবতাগণের প্রতিজনের বিশেষ বিশেষ শক্তির সম্মিলনে এক মহাশক্তি নারীমূর্ত্তি সৃজিত হয়। তিনিই মহাশক্তিরূপিণী দেবী। আপনার ঐশ্বরিক মহাশক্তি বলে শ্রীদুর্গা শম্ভু, নিশম্ভু, মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি দূর করেন, তাই তাঁহার নাম হইল শ্রীদুর্গা। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তাই তাঁহার নাম হইল ভগবতী। কবি আপনার কবিত্ববলে চণ্ডীগ্রন্থে দেবীমাহাত্ম্য যতদূর সম্ভব বর্ণনা করিয়াছেন। কবির বর্ণনা মাননীয়, তাহাতে কত অপূর্ণতা, কত কল্পনা, তাহা কত অসত্যজড়িত। তাই চণ্ডীর বর্ণনা এত কবিত্বপূর্ণ হইলেও, নিতান্ত অপূর্ণ ও কল্পনা-জড়িত। তাই চণ্ডীর বর্ণিত এবং ভাস্করের চিত্রিত বাহিরের শ্রীদুর্গা এত ঐশ্বর্য্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী ও সৌন্দর্য্যময়ী হইলেও, আসল দুর্গার তুলনায় নিতান্তই অপূর্ণ। আসল দুর্গা অতীতে কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে তখনকার অবস্থায় যতটা সম্ভব প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

নবযুগে নববিধানে ঈশ্বরের কল্পনা-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্যের প্রকাশ। তিনি সকল প্রকার অসত্য কল্পনা হইতে বঙ্গ ভারতকে, সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য, সত্য ব্রহ্মজ্ঞান জগতে বিস্তার করিবার জন্য, এই যুগে যেমন তাঁহার বিশেষ চিহ্নিত প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের জীবনে জীবন্ত জাগ্রত দেবতারূপে অবতীর্ণ হইতেছেন, তেমনই ছোট বড় তাঁহার সকল পুত্র কন্যার জীবনেও জীবন্ত ভাবে অবতীর্ণ হইয়া আপনার সত্যদর্শনদানে সকলকে ধন্য করিতেছেন। গুরুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যেমন সাধু মহাজনের জীবনে, তেমনি ছোট বড় অন্যান্য তাঁহার সকল পুত্রকন্যার জীবনে ধর্ম্মক্ষেত্রের সকল শিক্ষাদানে সকলকেই কৃপা করিতেছেন। এবার তিনি আপনার দিব্য বাণীতে সকলকে শিক্ষা দিতেছেন, জীবনপথে সকলকে পরিচালন করিতেছেন। এবার তাঁহার মাতৃরূপের অবতরণও সম্পূর্ণ কল্পনা-বর্জ্জিত। এবার একাধারে তিনি মহাশক্তিরূপা, পরম জ্ঞান পরাবিদ্যা, অনন্ত স্নেহের দিব্যমূর্ত্তি, ধনধান্যবিধায়িনী লক্ষ্মী, পরিত্রাণদায়িনী, পুণ্যদায়িনী, অসুরসংহারিণী, সকল বিঘ্নহারিণী শ্রীদুর্গা। এবার প্রতিমা নয়, উপমা নয়, সত্য মা। তাই নববিধানের শ্রীদুর্গোৎসব যথার্থ জাতীয় মহা মহোৎসব।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

শরীর আদরের বস্তু

"আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরীরের ভিতরে আত্মা থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া শরীর বাঁচিয়া আছে, আত্মা না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শরীর বিনা আত্মা পৃথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না; সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার, আত্মাও তেমনই শরীরের অবলম্বন। দুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি, আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে; কিন্তু শরীরের

সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস ও শান্তি-রস লাভ করে, তাহা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাত্মা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্ম্মমধু, জ্ঞানমধু প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় করে। অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তু, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।"

ধর্ম্মপথে নিরাশা

"কতকগুলি পরীক্ষাতে হৃদয় আন্দোলিত হইলে নিরাশা উপস্থিত হয়। ইহার জন্য অগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত না রাখিলে অত্যন্ত বিপদ। মনে যদি একটু সংশয় কি নিরাশার ভাব থাকে, পরীক্ষার সময় তাহা দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। নিরাশা প্রমাণ দেখাইয়া অবিশ্বাসী হৃদয়কে বলে দেয়, 'তোর আর আশা নাই, তুই আর জীবনকে এরূপ উপহাসের বিষয় করিস না, ধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সকলই মিথ্যা।' ধর্ম্ম যেমন প্রমাণ দেখাইয় বিশ্বাস দৃঢ় করেন, অধর্ম্ম তেমনই অবিশ্বাস প্রবল করিয়া দেয়। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মরিবে প্রতিজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে, 'এ অবস্থা নিরুপায়, অসহায় অবস্থা। যিনি বলিয়াছিলেন, আমি পরম পিতা, তিনিও পরিত্যাগ করেন। বুঝিয়াছি, বিপদ্‌কালে তিনিও শুনেন না, বিষয়ী বন্ধুর ন্যায় অকূল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করেন। তিনি যদি দয়াময় হন, তবে কি এমন হয়? তবে তিনি দয়াময় নন। তাঁহারও মনুষ্যের ন্যায় স্নেহ দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দুই বৎসর, নয় পাঁচ বৎসর দয়া করিলেন, কিন্তু চিরকাল কি করিতে পারেন?' কিন্তু ভক্ত সাধকের ভাব ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, ঈশ্বর কখনই পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না। তিনি কখন চরণের আশ্রয় দেন, কখন পদাঘাত করেন; কখন মিষ্টান্ন, কখন তিক্ত বস্তু দেন; কখন সূর্য্য, কখন অন্ধকার দেখান; কখন বিপদ, কখন সম্পদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর মারিতেছেন মারুন, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় নাই। কেন না আমি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার যে চরণ এক সময় আশ্রয় দিয়াছে, সেই চরণই আঘাত করিতেছে। তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে পরীক্ষাতে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আমার চৈতন্য হইবে। তিনি অন্ধকারের পর আলোক, বিপদের পর সম্পদ আনিবেন, কেন না উভয়ই তাঁহার প্রেরিত।"

(কেশব)

মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী

(রবিবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৮০২ শক; ১০ই অক্টোবর, ১৮৮০খ্রী)

একটি মৃত্তিকার পাত্রে সুবর্ণ; পাত্রটি বদ্ধ। এই অবস্থাতে সেই পাত্র প্রতিবৎসর আমাদের দেশে আসে। আধারের বাহ্য শোভা-দর্শনে নরনারী মুগ্ধ হয়। আধারের মুখ বদ্ধ, কেহই আধার খুলিয়া তাহার মধ্যে কি অমূল্য ধন আছে, তাহা দেখে না। সিন্দুকের ভিতরে কোটি কোটি মুদ্রা থাকিলেও চাবী বিনা তাহার সম্ভোগ অসম্ভব। সেইরূপ এই যে রত্নভরা মৃন্ময় আধার বৎসর বৎসর আমাদের দেশে আসে, যাহাকে এই দেশের লোকেরা পূজা করে, ভক্তি করে, সেই আধারের ভিতরে যে চিন্ময়ী দেবী আছেন, যোগ চাবী ভিন্ন তাঁহাকে খুলিয়া বাহির করিবার উপায়ান্তর নাই। মৃত্তিকার ভিতরে দেবীস্থাপন, মাটীর ভিতরে মহেশ্বরী। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মাণ্ডপতি মৃত্তিকা-মধ্যে! ভগবতী বাহির হইবেন মাটী ভেদ করিয়া! মৃন্ময় পাত্র অতি সুন্দর হইতে পারে, নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতে পারে, সকলে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহার মধ্যে যে মহেশ্বরী বাস করেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখিতে পায়। যোগনেত্রবিহীন হইয়া কেহই মৃন্ময় পাত্রে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। এই খেদ মনে রহিল, বঙ্গদেশে যথার্থ ভগবতীকে সাধারণ লোকে পূজা করে না। আশ্বিন মাস আসিল, কত ঘরে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু বঙ্গদেশে যথার্থ জগজ্জননীকে মা দুর্গা বলিয়া কেহ তো ডাকিতেছে না। বঙ্গদেশে পুতুল-পূজা হইল, কিন্তু মার পূজা হইল না। যথার্থ মা মাটীতে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন।

কোথায় সেই সতী? সতীপূজা করিবার জন্য সকলেই আকুল। সতী পূজার জন্য মনুষ্যস্বভাব লালায়িত। মাটীর ভিতরে সতী কল্পনা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থান কি প্রকৃত সতীপূজা ভুলিল? আমাদিগের পরমারাধ্যা দেবী, সতী যাঁহার নাম, যাঁহার মধ্যে অনন্ত পতিব্রতা ও প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে, কৈ তাঁহাকে কে ডাকিতেছে? সেই আদ্যাশক্তি সতী ব্রহ্মের প্রেমবিভাগ, অপরার্দ্ধ পুণ্য। এক স্বভাব যোগেশ্বর মহাদেবের স্বভাব, আর এক প্রকৃতি করুণাময়ী জননীর প্রকৃতি। সেই দেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে আপনার কোন অংশের অপমান অথবা লোপ দেখিলে সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্য আখ্যায়িকায় কথিত আছে, যখন যজ্ঞস্থলে মহাদেবের অপমান হইল, তখনই সতী আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামিনিন্দা সতীর নিকটে অসহ্য। দুর্গা-চরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোমলহৃদয়া সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ্য করিতে পারেন না। ব্রহ্মের কোমল প্রেম, যাহা চিরকাল নারীরূপ ধরে, কদাচ ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ পবিত্রতার অপমান সহ্য করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেই সতী কোথায়, যাঁহার পূজা করিলে যুগপৎ পুণ্য ও প্রেম লাভ করা

[ব]ায়। সমুদয় মানবপ্রকৃতি সেই সতীচরিত্র দেখিবার জন্য [ব্]যাকুল। ব্রাহ্মসমাজও অসতী কলঙ্কিনীদিগের পাপরাজ্য [ছ]াড়িয়া সতীর দিকে যাইতে চায়।

যাঁহার নাম-শ্রবণে জীবের পরিত্রাণ হয়, যাঁহার পূজা করিলে অশুদ্ধ এবং অসুখী মনও শুদ্ধ এবং সুখী হয়, সেই সতীপূজা ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এখন প্রশ্ন এই, সেই সতী কোথায়? কেহ কেহ বলে, এই আশ্বিন মাসে সেই সতী বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে মাটীর আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বিশ্বজননী সতী দেবী মাটী হইতে পারেন; কিন্তু মা মাটীর ভিতরে থাকিতে পারেন। যাহার ভক্তিচক্ষু আছে, সে মাটীর ভিতরেও মাকে দেখিতে পায়, মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে চিন্ময়ী জননীকে দেখিতে পায়। মৃত মাটীর ভিতরে জীবনময়ী সতীকে উপলব্ধি করাই যোগতত্ত্ব। যদি মাটীর ভিতরে সতীকে দেখিতে, তাহা হইলে যথার্থ দেবীপূজা কি, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতে। সতী ভগবতী ব্রহ্মের প্রকৃতি। তেজোময় পুণ্যময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি, মা নামে নারী-স্বভাব ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম আপনি আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন—"প্রকৃতি দেবি, তুমি জগতের মা হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা হইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি সুকোমল স্বভাবে জগৎকে বশীভূত কর।" মহাদেবীর অবতরণের অন্য অর্থ আর নাই। এই মা দুর্গা ব্রহ্মের প্রেমস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ। যাহারা দুর্গা-প্রতিমার মূলে ব্রহ্মের এই কোমল প্রকৃতি দেখে নাই, তাহারা অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচয় পায় নাই।

প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারেরা আকারের মধ্যে ভগবতীকে বদ্ধ করিয়া এই হতভাগা বঙ্গদেশে সমর্পণ করিয়াছেন। লোকগুলি এত কাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিয়া আসিতেছে, এখন পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবতীর পূজা হয় নাই। যে মন্ত্রে মৃত্তিকাপূজা হয়, তাহাতে ভগবতীর পূজা হয় না। যোগসহকারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে, তাহার ভিতরে জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার নিরাকার অঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীও জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এক মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্ত্তি দেখিবে। বাস্তবিক ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইঁহারা যে তিন ব্যক্তি, তাহা নহে; কিন্তু স্বয়ং ভগবতীই লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ইঁহারা ভগবতীর এক একটি স্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে ধন ধান্য ও সুখ শান্তি বিতরণ করিতেছেন, এবং তিনিই সরস্বতীরূপে অর্থাৎ বিদ্যারূপে সকলকে জ্ঞান দান করিতেছেন।

ভারতবর্ষে আর্য্য কবি ও ভাবুকেরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর্ণ লইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা কেবল উপমা। আবার যখন সুনিপুণ চিত্রকরেরা এই উপমা লইয়া দেব দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করে, তখন উপমা প্রতিমা হয়। প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা। তিনেতেই মা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ ভক্ত এ সকল উপমা ও প্রতিমা ভেদ করিয়া আসল জীবিতেশ্বরী মাকে না দেখিতে পান, ততক্ষণ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারেন না। কবি উপমা সৃজন করিল, চিত্রকর প্রতিমা গঠন করিল, ভক্ত এই উপমা প্রতিমার ভিতর হইতে আবার মাকে উদ্ভাবন করিলেন। আদিতে মা, অন্তে আবার মা। যথার্থ মা দুই শ্রেণীর লোকের হাতে পড়িয়া দুইটি রূপ ধরিলেন, একটি কবির অলঙ্কারশাস্ত্রের উপমা, আর একটি চিত্রকরের নিকট প্রতিমা। মার সম্পর্কে উপমা পরিত্যাগ করা শাস্ত্রকারের সাধ্যাতীত। মার যে প্রকার রূপ গুণ, তাহা দেখিলে কবিত্ব অনিবার্য্য। মার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলেই উপমা আবশ্যক হয়। যাই বলা হইল, আদ্যাশক্তি ভগবতী অসুরকুলনাশিনীর অনেক শক্তি, তখনই কবি মাকে দশভুজারূপে বর্ণনা করিলেন; দশ হস্তে অলৌকিক বল প্রকাশ করিয়া মা অসুরকুল বধ করিতেছেন। যখন কবি অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে এই উপমা করিলেন, পার্শ্বে ছিল মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা, সে তৎক্ষণাৎ মার বাহু গড়িল, অমনি অসুরসংহারের মূর্ত্তি গঠিত হইল। কবির গ্রন্থে বর্ণিত উপমা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইল না, এই জন্য মনুষ্যস্বভাবের স্পৃহা পূর্ণকরণার্থ চিত্রকর উপমাকে চিত্রে পরিণত করিল। অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনি উপমিত হইলেন, চিত্রে তিনি চিত্রিত হইলেন। জগজ্জননীর এক পার্শ্বে সরস্বতী অর্থাৎ শুভ্র জ্ঞান এবং অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যদায়িনী গৃহদেবী বিরাজ করিতেছেন। লোকে বলে লক্ষ্মী সরস্বতী জগজ্জননীর কন্যা; লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার কন্যা নহেন, ইঁহারা তাঁহার সখী। কেননা জগন্মাতার জ্ঞান ও সন্তানপালিনী শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হিন্দুদিগের দুর্গা-প্রতিমার মধ্যে এ সকল নিগূঢ় স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেবল যোগচক্ষেই এ সকল প্রকাশিত হয়, পৌত্তলিকেরা তাহা জানে না। উৎস জানে না, তাহার ভিতর হইতে কেমন নির্ম্মল বারি প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধু জানে না, তন্মধ্যে কত রত্ন আছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জগজ্জননীর এই অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। ইহার ভিতরে কত অমূল্য রত্ন আছে, বঙ্গদেশ দেখিল না। ভ্রান্ত বঙ্গদেশ, কেন তুমি মাকে উপমা ও উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাইলে? যিনি ত্রিজগতের জননী, তিনি কি মাটী হইতে পারেন? চিন্ময়ী মাকে, সতীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদাচ মৃন্ময়ী ভাবিও না; তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকারা আকাশরূপিণী জানিয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা কর। লক্ষ্মী সরস্বতী মা হইতে ভিন্ন নহেন, এই দুই প্রকৃতি মার স্বভাবের মধ্যে সখীভাব ধারণ করিয়া আছে। যখন

মাকে দেখিবে, মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও দেখিতে পাইবে। মা তাঁহার জ্ঞান ও বাৎসল্য-প্রকৃতি ছাড়িয়া ভক্ত সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। মাকে দেখিলে, মার পূজা অর্চ্চনা করিলে, অথচ তোমার জীবনে অজ্ঞান অন্ধকার, দুর্ভাগ্য দুর্গতি রহিল, ইহা হইতে পারে না। প্রকৃত মাকে দেখিলেই তাঁহার সরস্বতী এবং লক্ষ্মীপ্রকৃতি আসিয়া তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, করিবেই করিবে। মা তাঁহার দিব্যজ্ঞান, প্রত্যাদেশ ও শাস্ত্র সকল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতরণ করেন।

জ্ঞান ব্রহ্মপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য, যোগভক্তি, বিবিধ রহস্য, প্রত্যাদেশ, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ও শাস্ত্র প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার আর এক ভাব জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞানরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। যাঁহারা প্রেমের সহিত ব্রহ্ম-পূজা করেন, তাঁহারা জানেন, যিনি দুর্গা, তিনিই সরস্বতী; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞানদাতা। মা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি বলিতে-ছেন, আর গণেশ সে সমস্ত জগতে বিস্তার করিতেছেন। ভাবিবার জন্য জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মনে করিতে পার, সরস্বতীকে ভগবতীর পার্শ্ববর্ত্তিনী মনে করিতে পার; কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম এবং তাঁহার জ্ঞান, ভগবতী এবং সরস্বতী একই। যখনই সত্যভাবে ভক্তির সহিত মার পূজা করি, তখনই দেবীর উক্তি শুনিতে শুনিতে নূতন নূতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যেমন দুর্গা-দর্শন, অমনই সরস্বতীরূপ-দর্শন; যেমন ব্রহ্মদর্শন তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের সঞ্চার। জগজ্জননী যেমন অসুরসংহারিণী দুর্গা, তেমনি তিনি জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। যখন তিনি সত্য প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সরস্বতী মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া উপমাকে প্রতিমা মনে করে, অলঙ্কারকে সত্য মনে করে, তবে তাহারই দোষ।

জগজ্জননীর যে কেবল সরস্বতী এক সখী, তাহা নহে, তাঁহার আর এক সখী লক্ষ্মী। যে ভক্তের বাড়ীতে মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষ্মীরূপা, শ্রীস্বরূপা। বিশ্রী দেবী, লক্ষ্মীবিহীন দেবী কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? ভুবনমোহিনী মা কি বিবর্ণা কদাকারা? যে নরনারীর হৃদয়মধ্যে মা ভগবতীর আবির্ভাব হয়, সেই নরনারীর লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। নাস্তিক পাষণ্ডের সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। যে দস্যু দশ হাজার মানুষ কাটিয়া ধনী হইল, তাহার সংসারকে কি লক্ষ্মীর সংসার বলিবে? ভক্ত যদি দরিদ্র হন, তথাপি তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ভক্তের দুঃখেৎ সম্পদ বিপদ সকলই ঈশ্বর প্রেরিত। ভক্ত শাকান্ন আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্ষ্মীর সংসার দেখিলেই বুঝা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লক্ষ্মীছাড়া হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, ঈশ্বরের পূজা করিয়া লক্ষ্মীবিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও অকল্যাণ দূর হয়। যাহার বাটীতে দুর্গতিনাশিনী অবতীর্ণ হয়েন, তাহার সংসারে আপনা আপনি লক্ষ্মীশ্রীর অভ্যুদয় হয়। যিনি ভক্তের আত্মার পাপ বিনাশ করেন, তিনি পার্থিব অকল্যাণও দূর করেন। কার্ত্তিক মূর্ত্তিরও অর্থ আছে। যে বাড়ীতে কার্ত্তিকের অধিষ্ঠান, সে বাড়ীতে অলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্য আসিতে পারে না। কার্ত্তিক যুদ্ধের তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সরস্বতীর বিরোধী ও লক্ষ্মীর বিরোধী অকল্যাণ সমুদয় বিনাশ করেন। পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিনা মার জয় হয় না। কার্ত্তিক সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন, এবং মার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন ও সত্যরাজ্য বিস্তার করেন। হে মূঢ় ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্মপূজা করিলে, অথচ তোমার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হইল না, তুমি অবিদ্যা পাপের উপর জয় লাভ করিলে না, তোমার শত্রুদল প্রবল রহিল, তবে তুমি কার্ত্তিকের পরাক্রম দেখিতে পাইলে না। তবে তোমার প্রকৃত মহাদেবী পূজা হয় নাই। সাধক, যদি তুমি ভগবতীর মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, এ সকল দেখিতে না পাও, তবে তুমি হিন্দু নহ, ব্রাহ্ম নহ। যদি তুমি যথার্থ হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম হও, তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিন্ময়ী মা, তাঁহার সখী, এবং সন্তানদিগকে বাহির কর। যে দিন তোমার স্তব স্তুতিতে ব্রহ্মপ্রসাদে তোমার চরিত্রে মাটীর দুর্গার পরিবর্ত্তে চিন্ময়ী দুর্গা প্রকাশিত হইবেন, সেই দিন তোমার দেশের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। মৃন্ময় সিন্দুকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই সিন্দুক খুলিয়া সতী দেবীকে বাহির কর, এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই জীবিতে-শ্বরী সতী দেবীকে, অসুরনাশিনী, জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণদায়িনী এবং শাস্ত্র-ও-জয়-প্রসবিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা কর। ব্রাহ্ম, তোমার হাতে ঈশ্বর প্রকাণ্ড ভার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি যোগসন্ধানে দুর্গা-প্রতিমার ভিতর হইতে স্বর্গীয় রত্ন সকল বাহির করিয়া আপনি দেখিবে ও সম্ভোগ করিবে এবং তোমার হিন্দু ভাই ভগিনীদিগকে দেখাইবে। হিন্দুর ঘরের সিন্দুক খুলিয়া তাঁহাকে তাঁহার সিন্দুকভরা রত্ন সকল দেখাইয়া মোহিত করিবে। মাটীর দুর্গা কেবল একটি সিন্দুক, ইহার ভিতরে মা তাঁহার সখী এবং সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব হিন্দুস্থান, মৃত মাটীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জীবিতেশ্বরী চিন্ময়ী মহাদেবীর পূজা কর।

(সেবকের নিবেদন, ১ম ও ২য় খণ্ড)

—•—

আর্য্যনারী সারদা দেবী

মহাভারত ও পুরাণে আমরা সীতা, সতী, সাবিত্রী, গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতি আর্য্যনারীগণের বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সতীত্বের কাহিনী পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি এবং ভারতনারী আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সদ্‌গুণাবলী জীবনে পরিণত করিতে যত্নবতী। আমরাও সেই আর্য্যবংশসম্ভূত।

এই আধুনিক যুগেও এরূপ কয়েকজন আদর্শ রমণীর সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি, যাঁহাদিগকে আর্য্যনারী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাদের সুন্দর জীবনচিত্র ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক পাঠিকাদের নিকট অঙ্কন করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কারণ যে জীবন স্বচক্ষে দেখা যায়, তাহা অধিকতর জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী।

প্রথমে যাঁহার কথা বলব, তাঁহার নাম সারদা দেবী। ইনি নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মাতা। শৈশবকালেই পিতৃগৃহ হইতে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত সেনপরিবারে বধূ হয়ে এসেছিলেন। লেখা পড়া তিনি বেশী শেখেন নি, কিন্তু তাঁহার জীবন, প্রকৃতি ও চরিত্র অতি উচ্চ, উদার এবং মধুময় ছিল।

সংযত চরিত্রের প্রভাবে সারদা দেবী প্রথম হতেই সবার অতিশয় প্রিয় হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে এসে সুমিষ্ট হাসিমুখে গুরুজনদিগের বাধ্য হয়ে সব কাজ সমাধা করতেন।

সারদা দেবী ক্রমে ক্রমে বড় হলেন, তিনটী পুত্র লাভ করেছিলেন। মাতার জন্যই পুত্র যে ধার্ম্মিক, গুণী জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ হয়েন, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে দেখা গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনচন্দ্র সেন অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও গৃহী থাকিয়া সংসারের তত্ত্বাবধান করিয়া সকলকে সুখী করেছিলেন। জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত হয়ে সকলকে যথোপযুক্ত ভক্তি স্নেহ যত্ন করতেন। মধ্যম কেশবচন্দ্র সেন শৈশব হইতেই সত্যব্রত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন; কালে তিনি ধর্ম্মার্থে জীবন দান করেছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেন বিদ্বান্ সমাজে সকলের পরিচিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন। পূর্ব্ব বংশ থেকে এই সেন বংশ অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং বৈষ্ণবপ্রধান ছিলেন এবং সেই পৈতৃক পবিত্র চরিত্রই ইঁহাদের পরিবারের বিশেষত্ব। ফুলেশ্বরী ও পান্না নামে সারদা দেবীর দুটী কন্যাও অতি শান্তস্বভাবা ও সুন্দরী ছিলেন।

যদিও সে সময়ে ধনে সম্পদে এই সেন বংশ ঐশ্বর্য্যশালী বলে পরিগণিত হতেন, তথাপি রন্ধন অথবা সংসারের পরিচর্য্যা, সন্তানপালন ইত্যাদি মেয়েরাই করতেন; দাস দাসীর উপর সমর্পণ করে কেহ নিশ্চিন্ত থাকতেন না।

সারদা দেবী সেই বৃহৎ সংসারের রান্না করতেন। ছেলেদের জন্মের ষষ্ঠীপূজার পরদিন থেকেই, পুত্রটীকে তেল মাখিয়ে দুধ পান করিয়ে, রোদে শুইয়ে, রন্ধনগৃহে সেই বড় বড় ডাল ভাতের তোলো নামাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, বেলা ১২টা ১টার কমে ছেলেকে দেখতে আসতে পারতেন না। মনে হত, শিশুর গলাটা বুঝি শুখিয়ে উঠল। আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে, "এমনি করে সন্তান পালন করেছি, এখনকার তোমাদের মত কেবল সাবান পাউডার নিয়ে দিন কাটতোনা, কেবল তেল কাজল ইত্যাদি দিয়ে রোদে রাখতাম; আমায় কেশব কি ময়লা হয়েছে?" সারদা দেবী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন; দেখেছি, শেষ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাঁর কেশ-গুচ্ছ কোমরের অনেক নীচে এসে পড়তো। কেশবচন্দ্র মাতার মত সুন্দর হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবারের অনেককেই গৌরবর্ণ ও আশ্চর্য্য সুবর্ণময় দেখেছি, যা সচরাচর দেখা যায় না। ধর্ম্মেতে যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, তা সারদা দেবী ও তাঁর পরিবারে সুন্দর প্রকাশ দেখেছি।

জীবনে সারদা দেবী অনেক পরীক্ষা, শোক ও বিপদের মধ্যে পড়েও, ধর্ম্মকে দৃঢ়তররূপে ধারণ করে জগতে বাস করেছিলেন। যখন সারদা দেবী পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি বহু পরিবারে পরিবৃত হলেন, তখন আর পূর্ব্বের মত সংসারে নিমজ্জিত না থেকে, তীর্থভ্রমণ, সাধুদর্শনযাত্রা, হোম, যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি নানা প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকতেন। শুধু একদিক করতেন না; সংসারের সব সম্বাদ রাখা, প্রতিবেশি-গণের পরিচর্য্যা, দেখাশুনা না করে সারদা দেবী জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করতেন না। এমন ব্রত পূজাদি ছিল না, যা তিনি করেন নি। দুর্গাপূজার সময় যে নবরাত্রিব্রত আছে, সে ব্রতকথা তাঁর কাছেই শুনেছিলাম। আর তিনি প্রতি বৎসরই নবরাত্রি-ব্রত পালন করে উপবাস করতেন। কেবল সারাদিনের পরে রাত্রে সামান্য একটু ফল খেতেন।

সারদা দেবী যে কি আশ্চর্য্য চরিত্রবতী মিষ্টভাষিণী দয়াশীলা দানশীলা স্নেহময়ী জননী ছিলেন, তা মনে হলে ভক্তিতে হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠে। কোন ধর্ম্মের প্রতি তাঁর অনাস্থা ছিল না। কখনও নিন্দা করা অভ্যাস ছিল না। কেশবচন্দ্র কখন কোন বিষয় পরামর্শ চাইলে, মাতা সারদা দেবী অসম্মতি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

তিনটী ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র যখন পরলোক গমন করেন, সারদা দেবীর সেই প্রথম পুত্রশোক। সকলেই জানেন, পুত্র-শোক, আবার প্রথম সন্তান-শোকের কি তীব্র যাতনা। কিন্তু সারদা দেবী আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশালিনী রমণী ছিলেন। মধ্যম কেশব ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারীকে অত্যধিক স্নেহ করতেন।

সারদা দেবী পৈতৃক শ্বশুরালয়, শৈশবকাল হইতে যেখানে কত সুখ দুঃখের স্মৃতি ভরা ছিল, সেই কলুটোলার বাড়ীতেই থাকতেন। কেশবচন্দ্রের সার্কুলার রোডের কমলকুটীরে সর্ব্বদা আসা যাওয়া করতেন।

ছোট বেলা থেকে সারদা দেবী যে ধর্ম্ম, সংসার ও সেবা প্রাণের সহিত গ্রহণ করে, দৃঢ়তার সহকারে, পরিণত বয়সেও সাধন করতে পেরেছিলেন, তা কমলকুটীরে তাঁকে পর্য্যবেক্ষণ করে বিলক্ষণ অনুভব করেছি।

স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নবদেবালয়ে প্রায় বেলা বারটা বা ততোধিক সময় পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পূজা, ধ্যান, জপ তপে নিযুক্ত থাকতেন। মধ্যে মধ্যে নবদেবালয়ে পরমেশ্বরের সত্য সন্নিধানে বসে, সারদা দেবী যে সরল প্রার্থনা নিবেদন করিতেন, তেমন সুমিষ্ট সরল প্রার্থনা, মনে হয়, আর শুনবো না।

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণে সারদা দেবী যৎপরোনাস্তি আঘাত পেলেন; তথাপি ধৈর্য্য অবলম্বন করে, নিজেকে নিজের ভিতর স্থির রেখে, মেজ বৌয়ের এই অসহ্য শোকে সান্ত্বনা দিতে, পৌত্র পৌত্রীগুলিকে স্নেহের সহিত দেখতে শুনতে আরও বেশী করে কমলকুটীরে আসতে লাগলেন। বধূমাতাকে স্বহস্তে রন্ধন করে খাইয়ে, পরে নিজে খেতেন। তিনি এত সুন্দর ও শীঘ্র রান্না করতে পারতেন, দেখে আশ্চর্য্য হতে হত। পাছে মেজ বৌয়ের খাওয়ার দেরী হয়ে যায়, একজ দেবালয় থেকে এসেই, উপরের সেই হবিষ্য ঘরটীতে, দুই তিনটী উনুনে তাড়াতাড়ি চড়িয়ে খুব শীঘ্রই খাওয়াতেন। সকলে তাঁর হাতের রান্না খেতে ভালবাসত। রান্না অনেকটা শেষ হয়ে আসার পরে, অনেক অনুরোধে একটু জল স্পর্শ করতেন।

মেজ বৌ যেটী খেতে ভালবাসেন, তাই রাঁধতে চেষ্টা করতেন। রান্নার সময়ও সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কত গল্প করতেন। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে, ব্যস্ততার মধ্যেও সব উত্তর দিতেন। কত গল্পকাহিনী, আবার প্রাচীনকালের ধর্ম্ম-বার্ত্তা যে সারদা দেবীর মুখে শুনেছিলাম, কিন্তু আজ দুঃখের সহিত মনে করছি, কেন সে সব জগতের ইতিহাসের নিমিত্ত লিখে রাখলাম না। আজ লিখেও কত লোককে সুখী করতে পারতাম।

সারদা দেবী দীর্ঘজীবনে পরিবারের অনেক মৃত্যু দেখে গেছেন; কিন্তু তাঁর অটল পর্ব্বতের মত ধৈর্য্য ছিল, পূর্ব্বেও তা বলা হয়েছে। তাঁর এই জগতে অবিরল সহিষ্ণুতা পৃথিবীতে দেখাবার জন্যই, বুঝি ভগবান সারদা দেবীকে এতদিন সংসারে রেখেছিলেন। আবার প্রাণের শেষ আলো কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণবিহারীর শোকও তাঁকে পেতে হল। তখন পর্য্যন্ত অচল সহিষ্ণুতা দেখিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। এমন কি, ছোট বৌকে বৈধব্যেও রান্না করে তিনি কতদিন খাইয়েছেন।

কি মধুময়প্রকৃতির ধৈর্য্যশীলা নারী! এমন একটী রমণীর দর্শনে বা চরিত্রের অনুশীলনে সকলে ধন্য হব, আর বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত মহিলাবৃন্দ ইঁহার অনুসরণ করে আর্য্যনারী হতে ভুলবেন না, এই আশা করে, আমার দেখা আর্য্যনারী শ্রীসারদা দেবীর জীবন-মাহাত্ম্য উপস্থিত পাঠক পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি।

(ক্রমশঃ)

সেবিকা—হেমলতা চন্দ।

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" *

"নানা মুনির নানা মত" এই বাক্য অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশের লোক ধর্ম্মের নানা পথ অবলম্বন করিতেছেন, দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, ইহাই ধর্ম্মের স্বাভাবিক পথ। ধর্ম্ম লইয়া পৃথিবীতে যে মতবিরোধ ও মনোমালিন্য হইতেছে, তাহাতে যাহার যে প্রকার রুচি, সংস্কার এবং শিক্ষা, তাহাকে সেইরূপেই চলিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, অনেক শিক্ষিত লোক আমাদের দেশে এই মতই পোষণ করিতেছেন, মনে হয়। ইহাকে Tolerationএর পথ বলা হইয়া থাকে। সকলকে নিজ মতে আনিতে চেষ্টা না করিয়া, প্রত্যেককেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পথে চলিতে দেওয়া, বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অন্যদিকে ধর্ম্মরাজ্যের দিকপালগণ সাধনার ভূমিতে দৃঢ়স্বরে এক পথের কথাই বলিয়াছেন, একথা ভুলিলে চলিবে না। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ" - সকল ধর্ম্ম অর্থাৎ অন্য বহু পথ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। ঈশাও দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন, 'Leave all and follow me.'—সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর। আমাদের নবযুগের ধর্ম্মনেতারাও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রদর্শন না করিয়া, বাঙ্গলায় আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া এক সময়ে গাহিয়াছিলেন,'একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে'। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-প্রধান বঙ্গদেশে আবার আজই শুনিতেছি, 'যত মত, তত পথ', ইহাই ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন পন্থা।

সাধারণতঃ আমরা একথাটী যত সহজ মনে করি, তত সহজ নহে। এ বিষয়ে গীতার একটী শ্লোক দেখিতে পাই, তাহা এই :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

(গীতা ৪।১১)

"যে আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি; হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।"

এই শ্লোকটীর অর্থ আমাদিগকে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। এই শ্লোকের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া মনে হয়, উহাতে ধর্ম্মের নানা পথেরই সমর্থন করা হইয়াছে।— 'যে আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।' কিন্তু দ্বিতীয় অংশে 'বর্ত্ম' কথাটী এক

* ১৮ই অক্টোবর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় নিবেদিত।

চনান্ত দেখিয়া মনে হয়, গীতাকার ধর্ম্মের একমাত্র পথের কথাই বলিতেছেন। 'মানুষ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে'—তিনি যদি মনে করিতেন, ধর্ম্মের প্রকৃত পথ বহু, তাহা হইলে একবচনান্ত বর্ত্ম শব্দ ব্যবহার করিতেন না। শ্লোকের উত্তরাংশ মিলিত করিলে ইহার প্রকৃত অর্থ ইহাই মনে হয় যে, লোকে নানাভাবে যাহাকে নানা পথ মনে করিতেছে—ভাবিয়া দেখিলে উহা একই পথ—একই ভগবান, তিনিই মানবের একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পথ। "একই ঈশ্বরকে, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানপ্রধান তাঁহারা জ্ঞানযোগে জ্ঞানময়রূপে, যাঁহারা প্রবৃত্তিপ্রধান তাঁহারা কর্ম্মযোগে শক্তিময়রূপে, যাঁহারা ভাবপ্রধান তাঁহারা ভক্তিযোগে প্রিয়রূপে, যাঁহারা কামনাপরবশ তাঁহারা ফলের আকাঙ্ক্ষায় অভীষ্টফলদাতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে—যিনি গম্যস্থান তিনিই পথ যিনি সাধ্য তিনিই সাধনার পথ। ঈশ্বর যে এক, তাহা বোধ হয়, কোন সম্প্রদায়ের লোকই অস্বীকার করিবেন না। মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি সকলেরই বিশ্বাস ঈশ্বর এক—এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদারমতাবলম্বীরা স্বীকার করিবেন, তিনিই মানুষের একমাত্র পথ—তবেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, নানামত, নানা ভাব থাকিলেও প্রকৃত ধর্ম্মের পথ একই—সেই পরমপুরুষই ধর্ম্মে সনাতন এবং শাশ্বত পথ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'বর্ত্ম' কথাটীর অর্থ আরোও একটু ভাবিয়া দেখা যাক। বর্ত্ম বা পথ কথাটী কোন্ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে? শ্রীমৎ শঙ্কর মনে করেন, পথের অর্থ—ঈশ্বরের পথ; রামানুজ মনে করেন, পথ অর্থ—"আমারই স্বভাব"; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মনে করেন, 'জ্ঞানধর্ম্মাদি সকলই আমার স্বরূপ, সুতরাং আমার পথ'। ঈশ্বরের বহুরূপ হইলেও তিনি যে এক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—সুতরাং ইহা কেন না মনে করিব, তিনিই তাঁহাকে পাইবার পথ—এবং সকল মানুষেরই একমাত্র পথ।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া একটুকু আলোচনা করিলেও আমরা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, জ্ঞানধর্ম্মাদি সকলই ঈশ্বরের স্বরূপ। কতকাল পূর্ব্বে এই কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানযুগেও সকলে ইহার মর্ম্ম সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। কতক মনোবিজ্ঞানবিদ্ মনে করেন, পুরুষের লক্ষণ শুধু জ্ঞান, কেহ বা মনে করেন, উহা শুধু ইচ্ছা বা শক্তি, অপরে মনে করেন, উহা শুধু ভাব বা অনুভূতি। কিন্তু এ তিনই একের স্বভাব, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে আমরা ইহাই দেখিতেছি। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেমানুরক্তি এক পুরুষেরই স্বভাব—ধর্ম্মের পথেও তাই এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে সমন্বয়ীভূত করিয়া লইতে হইবে। ইহা মানুষের বুদ্ধি-কৌশল-প্রসূত নহে—বিধাতা কৃপা করিয়া এ যুগে আপনাকেই একমাত্র ধর্ম্মের পথরূপে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এ যুগের নূতন বিধান। ভক্তেরা ধর্ম্মপথকে শাণিতক্ষুরধারবৎ বলিয়াছেন; আমাদের মত কলির জীব, দুর্ব্বল নগণ্য কীট যে এই সর্ব্বৈক্যের পথে চলিতে পারিবে, তাহার ভরসা কি? ভরসা ভগবৎকৃপা। নববিধান তাই ভগবৎকৃপার বিধান।

আজ কালকার শারদীয় উৎসবের দিনে, আর একটী কথা বলিয়া এই নিবেদনের উপসংহার করতে চাই। চারিদিকে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাই, জিজ্ঞাসা করি, যেখানে পরিমিত মূর্ত্তির পূজা হয়, সেখানে কি সার্ব্বজনীন উৎসব হইতে পারে? হিন্দুসমাজের এই আহ্বানে আজ কি মুসলমান ও খৃষ্টসমাজ কোন সাড়া দিতেছেন, না দিতে পারেন? অনন্তের উপাসনাই একমাত্র বিশ্বজনীন ও সার্ব্বজনীন উপাসনা—পরিমিতের উপাসনা কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না; শুধু ভাবের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া আজ হিন্দু সমাজ এ মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই মন্দিরে যে নবভক্তদল অনন্তরূপিণীর উৎসব করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ভিতরে সার্ব্বজনীন উৎসবের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। একের ভিতর বহুরূপীকে দেখিয়া, ইঁহারা অনন্তের উপাসনার এক অভিনব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

একদল লোক বলেন, এই পরিমিত দেবদেবীর উপাসনা, এই দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা; কেন না কলির জীবের এরূপ অধোগতি হইয়াছে যে, সে অনন্তের উপাসনার অধিকারী নহে। অনেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করেন, এ সব প্রতীক উপাসনা শুধু পাপেরই প্রশ্রয় দেয়—এ গুলি Sinful; কিন্তু নবভক্তেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই সকল প্রতীক উপাসনার ভিতর যে ভাবরূপ শস্য নিহিত আছে—সে গুলিকে আত্মস্থ করিয়া অনন্তের উপাসনাকে সরস করিয়া লইতে হইবে—এখানেই নববিধানবাদী এবং প্রাচীন ব্রহ্মবাদীদের বিরোধ। যে সাধক প্রথমে আদ্যাশক্তিকে হৃদয়ে মা রূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণে প্রণাম করি।

ব্রহ্মানন্দ তাই বলিলেন, প্রথমে মা, পরে উপমা, তারপর প্রতিমা। ভক্ত হৃদয়ে বিশ্বজননীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 'মা'। কবি মাকে দশভুজারূপে কল্পনা করিলেন, শিল্পী তাঁহার প্রতিমা রচনা করিলেন—বিধানভক্ত এই মাতৃ-অনুভূতি আত্মস্থ করিয়া অনন্তকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং এইরূপে মায়ের নব নব রূপ দেখিতে লাগিলেন—বেদান্ত ও পুরাণের মিলন হইল। একদিন এই অভিনব মাতৃপূজার আহ্বান দিক দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—নবভক্তিস্রোত এই মন্দির হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বিধাতা কৃপা করুন, এই ভক্তি-স্রোতে ভাসিয়া দেশবাসীর সকল দুঃখ দুর্গতি দূর হউক—নব ভক্তদলের সাধ পূর্ণ হউক।

শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ।

—৹—

ডাঃ সুখেন্দুকুমার দাস

(৮ই নবেম্বর, ব্রাহ্মসমাজে পঠিত)

শোকাহত প্রাণ উপলব্ধি করিতেছে, "বেদনা আনে চেতনা নব।" বেদনাঘাতে অন্তর ঊর্দ্ধ লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে। সে লোকেই ত আমাদের আত্মীয়বন্ধু প্রিয়জন—সে লোকই যে আমাদের চিরবাসস্থান। মৃত্যু প্রিয়জনকে আরও গভীরভাবে আমাদের মাঝে আনিয়া দেয়, জীবনকে আরও সুন্দর ও মাধুরী-মণ্ডিত করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া যায়। মৃত্যু না থাকিলে জীবনের সৌন্দর্য্য এমন করিয়া আমাদের চোখে প্রতিভাত হইত না। মৃত্যু যথার্থ মানুষকে চিনাইয়া দেয়, আরও নিকট-তর করিয়া দেয়।

আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ মেজদাদা আজ পরলোকবাসী। সংসারে থাকিতে তাঁহার পূত সৌরভময় জীবনের সৌন্দর্য্য এমন করিয়া দেখি নাই, অনুভব করি নাই; কিন্তু মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে দেহমুক্ত করিয়া, তাঁহার জীবনের যা কিছু সৌন্দর্য্য মাহাত্ম্য আমাদের নিকট রাখিয়া গেল।

সূর্য্য যেমন করিয়া বিদায়ক্ষণে পৃথিবীর বুকে আলোকরশ্মি ঢালিয়া দিয়া যায়, তেমনি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সবটুকু সুষমা আমাদের অন্তরে ঢালিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর জীবনকথা আমাদের অন্তরে আজ জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহার সুন্দর কর্ম্মময় জীবনকথা বলিবার মত শক্তি আমার নাই।

মেজদার জীবন ছিল, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। কি গভীর জ্ঞানপূর্ণ, কি সুস্থ চিন্তাশীল মনের পরিচয় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জন পাইয়াছেন। সংস্কৃত, সাহিত্য, দর্শন, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার কি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মেজদা ছিলেন বিদ্যানুরাগী সুধী ও কর্ম্মঠ পুরুষ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ছিল গভীর অনুরাগ এবং আজীবন এ ভাষার চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। শৈশবেই তাঁহার এ অনুরাগের অভিব্যক্তি হয়।

একজন ইংরাজ কবি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "He lisped in numbers and numbers came." মেজদার সংস্কৃতানুরাগ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। পিতামাতার কাছে শুনিয়াছি, তাঁহাদের পাটনা নগরে অবস্থান কালে মেজদা যখন দেড় কি দুই বৎসরের শিশু, যে বয়সে মাত্র কথা ফুটিতে আরম্ভ করে, সে বয়সে তিনি ভোর চারিটার সময় গঙ্গাযাত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে মন্ত্র শুনিয়া সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তন্মধ্যে "রামকে ভজনা কর কেইসা মন ভাব হে।" এই তিনটি বচন প্রতিদিন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া বিছানায় শুইয়াই আওড়াইতেন।

ইংরাজি স্কুলে তিনি যখন ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তখনই তিনি অমরকোষের অধিকাংশ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পিতামাতা বালকের মুখে সে সব শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। মেজদার সুমিষ্ট স্বরে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি আমরা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়াছি।

শৈশব হইতেই লেখাপড়ায় তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল। ছাত্রাবস্থায় যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন ছাত্র পড়াইয়া যে অর্থ লাভ করিতেন, তাহা দ্বারা পুস্তক ক্রয় করিতেন। গ্রন্থাবলি ছিল তাঁহার প্রাণ। তাঁহার আলমারি বোঝাই বইগুলির কি যত্ন ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও কত পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন।

মেজদার ছাত্রজীবন উজ্জ্বল সাফল্যে মণ্ডিত। শৈশবে তিনি পিতার কর্ম্মস্থল ঢাকানগরে অধ্যয়ন করেন। তারপর মালদহ হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে তিনি আই,এ, ও বি,এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বি,এ, পড়িবার কালে পিতার ইচ্ছা ছিল, মেজদা ইংরাজী কিম্বা ইতিহাসে অনার্স নেন; কিন্তু যে ভাষাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, সে সংস্কৃতে ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও দুর্গাচরণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ সনে তিনি সংস্কৃত বেদান্তদর্শনে প্রথম শ্রেণীর ২য় স্থান অধিকার করেন ও ভগবৎ গীতায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

১৯২৫ সনে মেজদা বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে বৃটিশ মিউজিয়ামে ভারতবর্ষের যে সকল দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সুরক্ষিত ছিল, সে সকল অধ্যয়ন করিয়া শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা দ্বারা তিনি পি,এইচ,ডি, উপাধি লাভ করেন। ভূতপূর্ব্ব হাই-কোর্টের জজ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রের ইংরাজীর রচয়িতা সুবিখ্যাত Sir John Woodroff ও L. D. Barnet উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

L. D. Barnet মেজদার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"I have much pleasure in recording my high opinion of the mental ability and moral character of Mr. S. K. Das. For the last two years he has studied in this school, when he began his work here he already possessed a deep knowledge of Sanskrit and of the much of the classical phylosophy of India and he has since then largely widened his attainment by most industrious and intelligent study."

নবদ্বীপের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শিরোমণি ও মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ তাঁহাকে বিদ্যারত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জ্ঞান আহরণের জন্য কি একাগ্রভাবে তথায় অধ্যয়ন করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশের সময় তিনি শিক্ষার্থিরূপে তথায় বাস করিতেন।

পারিবারিক একটি ঘটনায় মেজদার উদার হৃদয়, সূক্ষ্ম

প্রীতি ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। মেজদা যখন এম,এ, পাশ করিয়াছেন এবং ছোটদা সবেমাত্র কৃতিত্বের সহিত বি,এ, পাশ করিয়াছেন, এমন সময় পিতা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একজনকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। পিতা মেজদার নিকট এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন, "আমার ছোট ভাইয়ের বয়স অল্প এবং তিনি অধিকতর মেধাবী, সুতরাং তাঁহাকেই প্রেরণ করা হউক; তিনি বিলাতে গমন করিয়া অধিকতর কৃতিত্বের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন।"

১৯২০ সনে জুলাই মাসে মেজদা ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে Lecturer নিযুক্ত হন। ছোটদা দুই মাস পরে বিলাত গমন করেন। মেজদা ১২৫৲ টাকা মাহিনা পাইয়া, ৫০৲ টাকা নিজের খরচের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট ৭৫৲ টাকা ছোট ভাইয়ের বিলাতের খরচের জন্য পিতাকে নিয়মিতরূপে প্রেরণ করিতেন। এক বৎসরের মধ্যে ছোটদা আই,সি,এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সংবাদ তারযোগে পৌঁছিলে তিনি কতই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মেজদা ছিলেন, ছাত্রবৎসল ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁহাকে ছাত্রগণ কিরূপ ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, তাহার নিদর্শন রাজসাহী কলেজের ছাত্রবৃন্দের বিদায় অভিনন্দনে বুঝিতে পারি। তিনি ছাত্রদের সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিতেন। তাদের অভাব অভিযোগ সহানুভূতি সহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি তাহাদের শুধু শিক্ষা দিয়াই বিরত হন নাই, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেন। রাজসাহী কলেজের ছাত্রবৃন্দ লিখিয়াছিলেন, "আপনি একাধারে গুরু ও বন্ধুরূপে আমাদিগের কত আপনার ছিলেন, তাহাই মনে করিতেছি। এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, আজকাল বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বত্র শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছে; আপনার মধ্যে এই ব্যবধানের অভাবই আমাদিগকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ছাত্রদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া ও পুরুষোচিত ব্যায়ামে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, আপনি শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবল মস্তিষ্কচালনা নয়, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, এই তত্ত্বটি তাহাদিগের জীবনে সহজ করিয়া আনিয়াছেন। জ্ঞানচর্চ্চায় আপনার উৎসাহ যে কম নয়, তাহার প্রমাণ Cultural Society প্রতিষ্ঠায় আমরা পাই। এইরূপে কলেজের ছাত্রদের চরিত্র যাহাতে সব দিক দিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাতে আপনার সতত দৃষ্টি ছিল।"

মেজদা ছিলেন জ্ঞানের উপাসক। কার্য্যোপলক্ষে যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, তখন সে স্থানের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত থাকিতেন। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কৃষ্ণনগর শাখা সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার, এই ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিবার তাঁহার ছিল প্রাণ আকাঙ্ক্ষা। কত পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিতেন। কাশ্মীরের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি লণ্ডন মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছিলেন ও আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন।

মেজদার স্বাদেশিকতা ছিল প্রবল। বাংলার শিল্পের উন্নতি কামনা করিয়া যথাসম্ভব শিল্পদ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। বাঙ্গালীর ধুতি পাঞ্জাবী পরিধান করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একদিনের জন্যও হ্যাটকোট প্রভৃতি পরিধান করেন নাই। মেজদা স্বাধীনচেতা ও কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ছোট বড় সকল কাজই তাঁহাকে হাস্যবদনে করিতে দেখিয়াছি। পরোপকার ও সেবাপরায়ণতা তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। অসুস্থকালে গৃহের ভৃত্য পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা পাইয়া অবাক হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বিগত বিহার ভূমিকম্পের সময় কৃষ্ণনগর কলেজের একদল ছাত্র লইয়া তিনি ভূকম্পপ্রপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ কি ব্যাকুল হইয়া মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও কত উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে আর্ত্তের সেবা ও সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের জনসেবা তাঁহাকে আনন্দ দিত। কৃষ্ণনগরেও তিনি সেখানকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দরিদ্রভাণ্ডার, রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহার তাঁহাকে জনপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল করিয়াছিল।

সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পরমানন্দ লাভ করিবার জন্য তাঁহার অন্তর ব্যগ্র হইত। সংকীর্ত্তন শুনিয়া তিনি গভীর আনন্দ পাইতেন। ভক্ত রামপ্রসাদের গান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। অসুখের প্রথম অবস্থায় তিনি একদিন নিজে নিজে গাহিয়াছিলেন, "কতদিন ঘুরাবি মা, চোখ ঢাকা বলদের মত।"

ঢাকায় অবস্থানকালে সেখানকার ওস্তাদদের বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে তাঁহার হৃদয়তন্ত্র কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ঝঙ্কৃত হইত। কৃষ্ণনগরে নিজগৃহে প্রতি সপ্তাহে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কি গভীর তন্ময় হইয়া তিনি সে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন।

মেজদা ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু বাহিরে তাঁহার আত্মপ্রকাশ ছিল না। একবার তাঁহার আগ্রহে গৃহে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বোন ও ২।১টি ছাত্রীকে কয়েকদিন গীতা পাঠ করিয়া শোনাইয়াছিলেন। তখন বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার চিন্তা কত গভীর, অন্তর কত উর্দ্ধমুখী। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের বাণী তিনি কি আন্তরিকতার সহিত শোনাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত সে বাণী এখনও মনে বাজিতেছে।

যোগবলে পরব্রহ্মে আত্মস্থ হইবেন, বোধ হয়, এই ছিল তাঁহার

অন্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষা; তাই শুনিলাম, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে নিজে নিজে যোগসূত্র পাঠ করিতেন। বিধাতা যে তাঁহাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহার সন্ধান আমরা পাই নাই, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে কখনও কাহারও সহিত যদি আলোচনা হইত, তখন তিনি মেজদার গভীরজ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয়ে আনন্দ পাইতেন। আমাদের দাদা মহাশয় স্বর্গীয় ভক্ত বঙ্কচন্দ্র রায় মেজদার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া বড় আনন্দ ও আরাম পাইতেন।

শৈশব হইতে মেজদার কত স্নেহ ভালবাসায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। কতভাবে তাঁহার স্নেহ পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে, স্নেহশীল মেজদাদার স্থান তো কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মেজদার জীবন আমাদের কত বড় সম্পদ্ ছিল, তাহা তাঁহার জীবিতকালে বুঝিতে পারি নাই; তাই আজ আমরা তাঁহাকে হারাইয়া বড় দরিদ্র হইলাম, মনে হইতেছে।

বিধাতার অকস্মাৎ এ কি বিধান, জানিনা। ইহার ভিতর কি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা আছে, আমরা বুঝিতে পারি না। অন্ধকারের পরপারে যে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতলোক আছে, আজ তিনি সে লোকের অধিবাসী। আজ অশ্রুজলে তাঁহার পুণ্যাত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যিনি তাঁহাকে এ দুঃখশোকপূর্ণ মরজগৎ হইতে চিরশান্তিসুখপূর্ণ অমরলোকে লইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে নিশ্চয় সে লোকে আরও সুন্দর, আরও মধুর করিয়া তুলিবেন। মেজদার জীবন-সম্পদ আমাদের মাঝে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকুক, এই প্রার্থনা।

"হাসি"

—•—

স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়

(৪ঠা অক্টোবর, স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দীক্ষান্তে কেদারবাবু প্রভৃতি স্কুলে বসবাস করিয়া নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। এই সময় তাঁরা অতি দীনভাবে বৈরাগী ও তপস্বীর ন্যায় থাকিতেন। তাঁদের আহারে বৈরাগ্য ও সংযম, পাঠে খুবই মনোযোগ ছিল। এ সময় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে একটা স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধন হয়। তাঁদের আহার-সম্বন্ধে ভক্ত ফকিরদাস লিখিয়াছেন, "কোন দিন অনাহার, কোন দিন অল্পাহার, কোন দিনের আহার অতি বিচিত্র রকমের হইত। (অর্থাৎ কিছু না জুটিলে বনের কচু পোড়াইয়া এবং গাছের নটে কলা ভাতে দিয়া অল্পাহার করিতেন।)" তাঁদের জীবনের ঐ উচ্চ আদর্শ স্মরণ করিয়া প্রেমাস্পদ ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র তাঁর পিতৃদেবের সমাধিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, "যৌবনে বাহিরিয়া নিলে জীবনের পথ, কি মহান গৌরবময়।" সত্যই কেদারবাবুও তাঁর মাতুলদিগের সহিত সে সময় দেশের সেবা জীবনের শ্রেষ্ঠ পথরূপে ধরিয়াছিলেন। এইরূপে কেদারবাবু তাঁর জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় মাতুলের সহিত কিছুদিন জয়পুর মধ্যইংরাজী স্কুলে অবৈতনিক রূপে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া, কলিকাতায় একটী মার্চেণ্ট আফিসের ক্লার্কের কার্য্য গ্রহণ করেন। ঐ হইতেই তাঁর প্রথমতঃ অর্থাগম হয় এবং ক্রমে একটী ল্যাম্পের কারখানা খোলেন। ব্যবসায় বিষয়েও তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। এই সময় হইতে তিনি তাঁর পত্নী সহ কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে কলিকাতার মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হন। এইরূপে কিছু কাল কলিকাতায় বসবাসের পর, কেদারবাবুর স্ত্রী অমরাগড়ীতে ১২৯২ সালে ফাল্গুন মাসে উৎসবের সময় নবসংহিতামতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া, নিত্য নিত্য নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে থাকেন। অল্পদিন পরেই কেদারবাবুর একটী কন্যাসন্তান হইলে, ঐ কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন তাঁর পৈত্রিক বাস-ভবনে রাউতড়ায় করেন। ঐ দিনের কথা আজও মনে হইতেছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্ত ফকিরদাসের সহিত আমরা কয়েকটী বন্ধু রাউতড়ার বাটীতে গমন করিলে, কেদার বাবুর জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্ল-তাত এবং জ্ঞাতিভ্রাতৃগণ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া, আমাদের বাড়ীর ভিতর যাইতে দিলেন না, এবং কিছুতেই ব্রাহ্ম-মতে নামকরণ করিতে না দেওয়ায় আমরা বেলা ২টার সময় অনাহারে অমরাগড়ীতে ফিরিয়া আসি। এই ঘটনায় কেদারবাবুর সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া, তাঁদের জ্যেষ্ঠ মাতুল ভক্ত ফকিরদাসকে লিখিয়াছিলেন, "কল্য কন্যার নামকরণের সমস্ত আয়োজনে বাধা দেওয়ায়, আমি যারপরনাই মর্ম্মবেদনা ভোগ করিয়াছি। যখন আপনারা অনাহারে ফিরিয়া যান, সে সময় আমি মেয়েকে লইয়া আপনাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি অবলা, স্ত্রীজাতি ও কুলবধূ, যিনি আমার স্বামী, তিনি সেরূপ সাহসী নন, তাঁর সহায়তা পাইলে এই পাপ সংসার ছাড়িয়া তখনই চলিয়া যাইতাম।" এই ঘটনায় কেদারবাবু একেবারে হতভম্ব হইয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যে কেদারবাবুর স্ত্রী কন্যাসহ অমরাগড়ীতে ভক্ত ফকিরদাসের আশ্রম-কুটীরে আসিয়া, কন্যার নামকরণ করেন। ভক্ত ফকিরদাস যথাবিধি উপাসনাদি করিয়া কন্যার নাম 'স্নেহলতা' নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনায় কেদারবাবু সপরিবারে খুবই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া, তাঁর হিন্দু জ্ঞাতি ভ্রাতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কিছুদিন পরে কেদারবাবুর মাতা শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া, প্রথমে কলিকাতার বাসায়, তৎপরে

গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রী হইয়া বাস করেন। তিনি প্রায় দুইমাস জীবিত ছিলেন। এই নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা ভক্ত ভ্রাতা ফকিরদাসের মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং পুত্র কেদারনাথকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার বিশ্বাসমত আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিও।" মাতা কৃপাময়ীর মৃত্যুর পর কলিকাতাতেই তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতামতে করিয়া, কেদারবাবু তাঁর মাতার ইচ্ছানুসারে কয়েকটী স্থানীয় অনুষ্ঠানে, অমরাগড়ীর ব্রহ্মমন্দিরের স্থায়ী ফণ্ডে ও মাতামহের সেবার্থে কিছু সাহায্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের কিছুদিন পরেই কেদারবাবু তাঁর জ্ঞাতি আত্মীয়দের সম্মতিক্রমেই তাঁর পৈত্রিক বাসভবনের উঠানে মাতৃদেবীর সমাধি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, ঐ পৈত্রিক বাসভূমির অন্যান্য জ্ঞাতিগণই একদিবস রাত্রিতে উক্ত সমাধি সমূলে নষ্ট করিয়া দেন। এইটী কেদার বাবুর উপর দ্বিতীয় নির্য্যাতন, এবং ধর্ম্মের প্রতি এবং মাতৃদেবীর অমরাত্মার প্রতি অবমাননা। এই ব্যাপারে কেদারবাবু ও তাঁর স্ত্রী রাউতড়ায় আর থাকিবেন না, এবং অমরাগড়ীতে আসিয়া বসবাস করিবেন, এই দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। তাঁদের উভয়ের আগ্রহ দেখিয়া ভক্ত ফকির দাস একখণ্ড নিষ্কর বাস্তুভূমি ক্রয় করিয়া দেন এবং ঐ স্থানেই একটি সুরম্য অট্টালিকা অচিরে নির্ম্মিত হয়। মাতৃদেবীর স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য, যথাসময়ে ঐ অট্টালিকা যথাবিধি ব্রহ্মোপাসনা-যোগে প্রতিষ্ঠা করিয়া, গৃহটীকে "কৃপাকুটীর" নামে অভিহিত করা হয়। ইতিমধ্যে কেদারবাবুর মাতুল নববিধানসাধক যশোদাকুমার রায়ের অকালে মৃত্যু হওয়ায়, যশোদাবাবুর নাবালক পুত্রদিগকে মাতাসহ নিজের উক্ত গৃহে স্থান দান করেন। সেই অবধি ঐ পরিবার কেদার বাবুর পরিবারের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত। ক্রমে কন্যা স্নেহলতা বিবাহযোগ্যা হইল, নানা স্থানে পাত্র অন্বেষণ করা হয়; পরিশেষে দরিদ্র প্রচারকদিগের পুত্র শ্রীমান্ চারুসুন্দর পাত্ররূপে মনোনীত হন। অল্প দিন মধ্যেই মহা সমারোহে অমরাগড়ীতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই স্নেহলতার একটী কন্যা হয়, তাঁর নামকরণ নবসংহিতামতেই হইয়াছিল। ঐ দৌহিত্রীটীও বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, একটী দরিদ্র প্রচারকের পৌত্রের সহিত বিবাহ দেন; ঐ বিবাহ কলিকাতাতেই সমারোহে সম্পাদন করেন। কন্যা ও দৌহিত্রীর বিবাহে প্রচারকপরিবারের সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগযুক্ত হন। কেদার বাবুর স্ত্রী প্রায় চারি বৎসর হইল, পরলোকগমন করিয়াছেন; দৌহিত্রী শ্রীমতী আভাময়ীও প্রায় দুই বৎসর হইল দেহত্যাগ করায়, কেদারবাবুর দেহ মন খুবই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ইদানীং তিনি রুগ্ন শরীরেও ভাড়াবাটীর নিকটবর্ত্তী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে রিডিংরুমে প্রাতে যাইয়া, পাঠকদিগের সহায়তা করিতেন। কিছুদিন হইতে তাঁর শরীর খুবই ভাঙ্গিয়াছিল। ক্রমে তিনি ভীষণ রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। প্রায় সাত মাস হইল, কেদার বাবু কলিকাতায় আসিয়া শয্যাগত ছিলেন। বিধাতার ইচ্ছা বুঝা ভার, তিনি তাঁর এই বৃদ্ধ সন্তানকে সংসারের সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁর অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় দাদা কেদারবাবু অমরাগড়ী ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে তিনি আর্থিক অবস্থায় সকলের চেয়ে বড় ছিলেন; তিনি অমরাগড়ী অঞ্চলের সেবকদিগকে দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মেরা অধ্যবসায়গুণে কিরূপ বড় লোক হইতে পারে ও কিরূপ সৌখীন ও বিলাসী হইতে পারে। কেদারবাবু সমাগত বন্ধুবান্ধবদিগের সেবায় খুবই সুদক্ষ ছিলেন। আমি তাঁর কঠিন রোগশয্যাপার্শ্বে কয়েকবার যাইয়া দেখিয়াছি. ইদানীং ভগবানের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাড়িয়াছিল, আমাদের কাছে পাইলে খুবই আনন্দিত হইতেন, এবং ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কবে মায়ের কোলে উঠিব, মা কবে তাঁর কোলে স্থান দিবেন।" এই যে ব্যাকুলতা, ইহাতে তাঁকে স্বর্গের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। মার ডাকে আমাদের দাদা গত ২৫শে সেপ্টেম্বর নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়াছেন। তাই প্রার্থনা করি, করুণাময়ী তাঁর এই বৃদ্ধ বিশ্বাসী সন্তানকে অমরলোকে শ্রীব্রহ্মানন্দ ও ফকিরের দলে আশ্রয় দান করুন ও শোকার্ত্তা কন্যাকে ও আত্মীয়দিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

নূতন সঙ্গীত।

নগদা মুটে

রামপ্রসাদী—একতালা

হাতে হাতে নগদ বিদেয়, নইলে কি মোর মন উঠে?
আমি করে যাই মা দিনমজুরী, আমি যে মা নগদা মুটে।
যা ছিল মোর পুঁজি পাটা, জুটে ঐ রিপু ছটা,
ঘটালে বিষম ল্যাঠা, নিয়েছে সব লুটে পুটে।
আমার অভাব ভারি, সয় না দেরী, তাই পায়ে ধরি আর
বায়না করি;
দাও মা দীনে চরণতরি, আমার সকল অভাব যাক্ ছুটে।
শ্বাসের ক্রিয়া নাড়ীর শোধন, তাতে আমার কি প্রয়োজন,
যদি আলো করে হৃদয়-কানন ভক্তি-কুসুম ওঠে ফুটে॥

সংগৃহীত—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

প্রার্থনা

(স্বর্গীয় সাধক অনুকূলচন্দ্র রায়ের একটী প্রার্থনা ;
২৯শে ফাল্গুন, ১২৯৯ সাল ।)

অনন্ত সত্তা! তুমি এই বিশ্ব সংসারের সকল স্থান অধিকার করে, সকল বস্তুর অন্তর বাহির তোমারই সত্তাতে পূর্ণ করে আছ। তুমি আমার অন্তরে বাহিরে রহিয়াছ; কিন্তু হায়! তোমায় সর্ব্বদা অনুভব করতে পারি না কেন? বাহিরে রহিয়াছ, সেতো একটু দূরের কথা; হৃদয়ের ভিতরে রহিয়াছ, অথচ তোমায় সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তোমার একি স্বভাব, লুকিয়ে সর্ব্বদা খেলা করছ, চুপে চুপে আমাদের ভালবাসছ, তবু স্পষ্ট জানতে দিচ্ছ না! করুণাময়! আর ত হবে না, তোমার খেলার কৌশল আমি এবার বুঝতে পেরেছি। পরীক্ষার ভিতর তোমার কথা শুনে বুঝছি যে, তোমার সত্তা লুকিয়ে থেকে আমায় ভালবাসছে; সেই সত্তাই আবার কথা বলছে। সকলে ইহাকে বিবেকবাণী বলে, আমি কিন্তু তোমার স্পষ্ট বাণী বলি। যাঁর কথা সর্ব্বদা কাণে ও মর্ম্মে প্রবেশ করছে, তিনি কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারেন? আমায় কি দেখা দিবে না? তুমি তো দেখা দিবার জন্য ও ধরা দিবার জন্য বিবেকের ভিতর দিয়ে ডাক, নাম ধরে স্পষ্ট ডাক। লীলাময়, আশ্চর্য্য তোমার লুকোচুরী খেলা! শৈশবে ভাই বোনের সঙ্গে জগতে কত লুকোচুরী খেলেছি; স্বর্গরাজ্যে ধর্ম্মজীবনের শৈশবাবস্থায় আবার দেখছি যে, সেই লুকোচুরী খেলাই চলছে। লুকোচুরী খেলাতে "বুড়ী" নিশ্চয় আছে। এবার বুড়ীকে নিশ্চয় ধরিবই ধরিব। তুমি বিবেকের ভিতর দিয়ে সর্ব্বদা "টু" "টু" সঙ্কেত করছ; তাহলে প্রমাণ হচ্ছে যে, লুকিয়ে থেকে ঠকাবার অভিসন্ধি আদৌ নাই। ওহে লুকান সত্তা! তোমায় একদিন "খুঁজি খুঁজি নারি—যে পায় তারি" বলতে বলতে টপ করে যে ধরে ফেলিব। এবার 'টু টু' শব্দ থেকেই বুঝেছি, তা হলে আর চোর হতে হবে না, চোর হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবই পাব। ভাই বোন, কে চোর হয়েছ, শুন মন দিয়ে, বিবেক-কাণ পেতে শুন, ঐ বুড়ী টু টু শব্দ করছে; এস, সকলে টপ করে গিয়ে আঁধারের ভিতর দিয়ে বুড়ীকে ধরে ফেলি। তাহ'লে আর আমাদের মাথায় টোকা খেতে হবে না, পাপের ডাঙ্গস মাথায় পড়বে না; যদি মাথা বাঁচাতে চাও, তবে চল ভাই সকলে, বুড়ী ধরে বসে থাকি। মা, তোমার কাছে কি ভিক্ষা চাহিব? অনেক ঠেকে শিখেছি; যেখানে, মা, তোমায় ছেড়ে খেলিতে চাই, সেই খানে চোর হয়ে মরি। তোমার অধম সন্তানকে তুমি রক্ষা কর, আর যেন বুড়ী ছাড়া হয়ে সংসারে খেলতে চাই না। তোমায় ছেড়ে থাকার সুখ যথেষ্ট ভোগ করেছি; আর তোমায় ছেড়ে কোথাও কখনো যাব না, কাজ করব না, কথা বলিব না, চিন্তা মনে থাকবে না। দয়াময়ী! আরও কি লুকিয়ে থাকবে? আমি কি তোমায় ছুঁয়ে থাকতে পারব না? এক মুহূর্ত্তের অথবা এক ঘণ্টার ছোঁয়া আমি চাই না; শুধু উপাসনার সময় আমি ছুঁতে চাই না; উপাসনান্তে যখন কার্য্যক্ষেত্রে যাই, তখনি তোমায় ছাড়ি, আর চোর যদিও না হতে পারি, কিন্তু চোর হবার সম্ভাবনা থাকে। মা অন্তরদায়িনী, তবে আর অভয় পেলাম কৈ? মা, তাই ভয়ে কাতর হয়ে তোমার চরণ তলে এসেছি; জননী, কৃপা কর, সমস্ত জীবনটা, সকল সময় যেন তোমায় ছুঁয়ে থাকতে পারি। শৈশবের সেই লুকোচুরী খেলার স্মৃতি জেগে আছে, তখন বুড়ী ছুঁলে কত সুখ ও নিশ্চিন্ততা হোত। এখন কি একবার বলিতে পারিব না যে, বুড়ী ধরেছি? সংসার, আর তুই আমায় চোর করতে পারবি না, আমি বুড়ী ধরে নিরাপদে আছি, এই ভরসা করে তোমায় ছুঁয়ে থাকতে ও বলতে যেন পারি। এই দাসের বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—o—

স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র রায়

(শ্রাদ্ধবাসরে কুলটীতে ২৪শে অক্টোবর পঠিত)

জন্ম—২৬শে শ্রাবণ, ১৩০৮সাল।
স্বর্গাধিরোহণ—২০শে আশ্বিন, ১৩৪৩সাল।

প্রকৃতির নিয়মে গর্ভবেদনা না হলে নবীন আগন্তুকের দেবমুখ-দর্শনের আনন্দ হয় না, ভীম বজ্রনাদে নভোমণ্ডলের মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন না করলে উহা হতে বারিপাত হয় না, ডিমটী না ফুটিলে সুন্দর পক্ষিশাবকটী বাহির হয় না, বীজটী না দ্বিধা হলে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায় না; এইরূপ ভাঙ্গা গড়াই সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক ব্যাপার, এ জগতে নিত্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংঘটন করে। আমাদিগের শরীর ও মন সেইরূপ নিত্য রূপান্তরের অধীন। ইহলোকেই সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য সত্য পরমাত্মাই তাঁর সৃষ্টির জ্ঞানবিধানের জন্যই জীবন ও মৃত্যুর বিধি করেছেন; একেরই দুই দিক দেখলে দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়ের মধ্যে জীবের গতি নির্দ্ধারিত।

If thou shouldst call me to resign
What most I prize it was never mine
I only yield thee what is Thine
Thy will be done!
Let but my fainting heart be blest
With Thy sweet spirit for its quest
My God to Thee I leave the rest
Thy will be done!

শ্রীমৎ নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের অকস্মাৎ এ মর জগৎ হতে চির বিদায় লওয়া এক অভিনব অভিনয়। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই

ন, সবল, সৌষ্ঠব ও কান্তিযুক্ত এবং সদা হাস্য কৌতুকে মুখরিত, মাত্র ৩৫ বৎসরের যুবা পাঁচ মাসের পরিণীতা এক বালিকাকে বিধবা করে, অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে যাবেন! এখনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাঁর খুল্লতাতের শোকে কাতর পরিজনকে আরও বিহ্বল করে, সোণার পাখী মা শান্তিদায়িনীর সান্ত্বনা-বক্ষে তাঁরই পিতার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের দিনে উড়ে যাবেন। আশৈশব কোমলপ্রাণ, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনে সদা দৃঢ়সংকল্প, আর্ত্তের প্রতি দয়া মায়া ও মমতা বিশিষ্ট, পিতৃধর্ম্মানুশীলনে একনিষ্ঠ পক্ষপাতী, উদার ও প্রশস্তহৃদয়বান্ এবং সর্ব্বোপরি আত্মসংযমী নবীন সন্ন্যাসী, স্বীয় মণ্ডলীর ভাবী আশা ও বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে যাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ও মহৎ আদর্শকে অতি সন্তর্পণে এবং যত্নে রক্ষা-কবচের মত হৃদয়ে ধারণ করে যাঁর চরিত্র সৌরভ বিস্তার করছিল, তিনি ২৬ দিনের অবিরাম জ্বরে ভুগে, দুর্দ্দমনীয় বাঁচিবার আশা করিয়াও, কলিকাতা নগরীর সুনামধন্য এবং সুপরিচিত ও সুবিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুচিকিৎসায়ও পরিত্রাণ পেলেন না। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের যত্ন ও অক্লান্ত সেবা ব্যর্থ করে, অবশেষে "The little bird 'I' soared high into unseen whence no traveller ever returneth." যাও ভাই ধন! সেই অমর নগরে, যথায় তোমার পিতা মাতা ও পিসিমাতা তৃষিত হয়ে তোমার আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

"যাওরে অনন্তধামে, মোহ মায়া পাশরি, দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি; জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে, কেবলি আনন্দ-স্রোতে চলিছে প্রবাহি।

যাওরে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে, অমরগণে লইবে তোমায় উদার প্রাণে; দেব ঋষি, রাজ ঋষি, ব্রহ্ম ঋষি যে লোকে, ধ্যান ভরে গান করে একতানে।

যাওরে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে, শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য কিরণে; যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান, যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে॥"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

প্রার্থনা

মাগো! আজ যে আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের দিন। আজকের দিনেই ঘরের দুলাল, প্রাণের দাদা—লক্ষ্মী স্ত্রী, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সাধের নূতন সংসার সব ফেলে তোমার বুকের মাঝে পবিত্র ফুল হয়ে ফুটে রইলেন? আসল নির্ম্মলকে তুমি নিয়ে নিলে মা? বাজে ফুলে যে তোমার পূজা হয় না, তাই বুঝি, বেছে বেছে পবিত্র নির্ম্মল ফুলটিকেই হাতে করে তুলে নিয়ে গেলে? তুমি যখন তোমারই পবিত্র ফুলটীকে তুলে নিলে বুকের মাঝে,—আমরাও ত মা তোমারই সন্তান—পিতৃমাতৃভ্রাতৃহীন, স্বামীহীনা কাতর প্রাণগুলিকে সান্ত্বনা দান কর।

মাগো! এই মহাদিনে প্রাণের দাদার পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে দাও। স্বামীহীনা সতীও যেন তোমার ভিতর তাঁকে দেখতে পান। দাদার নির্ম্মল জীবন আমাদের চিরস্মরণীয়। আমরা যেন সেই দাদার নির্ম্মল চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারি, তুমি আমাদের শক্তি দাও, মা।

তিনি যে তোমার বিধানে বিশ্বাস করে নববিধানের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন; সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতে তোমার ডাকে শরীর ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। মা! এখন তাঁর সেই নব অনুরাগ নবভক্তি, নববিশ্বাস তাঁর স্ত্রী, ভাইবোন, আত্মীয় বন্ধুদের জীবনে সঞ্চার কর।

মাগো মা! আজ প্রাণের দাদার অভাবে বুকের পাঁজর খসে পড়ে গেছে। ধৈর্য্য, শক্তি কিছুই নেই যে, পাথর দিয়ে বুক বেঁধে যেন পাগলিনী হয়েছি।

তবু তুমি যে বলেছ—সকল ক্ষতি পূরণ হবে—মাগো, এই আশা করে তোমার মুখ পানে চেয়ে থাকি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই পবিত্র দাদার নির্ম্মল জীবন-ফুলটী আমাদের প্রতিজনের জীবনে ফুটে থাকে।

শোকার্ত্ত—সুষমা বসু

প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন

হে নিত্যবিধাতা, তোমার নববিধানের সাধক অনুকূলচন্দ্রের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আজ শোকাশ্রুর অর্ঘ্যদানে প্রার্থনা করি, মা! সুন্দর সুগঠিত নির্ম্মলচন্দ্রের অশরীরী আত্মাকে তোমার শান্তিময় বক্ষে স্থান দিয়া এ কি করিলে? তাঁর প্রিয় সঙ্গীত—"থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে, যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দধামে"—এত শীঘ্র তাঁর জীবনে পূর্ণ হইল? নির্ম্মল ছিলেন সাধক অনুকূলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র; যৌবনের আরম্ভে তাঁর বিবাহ দিয়া নববিধানের পরিবার-গঠনের জন্য অনুকূলচন্দ্রের কত সাধ ছিল। নির্ম্মল পিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি যথাসময়ে খাঁটী নববিধানীর সুরূপা কন্যাকে বিবাহ করিয়া নববিধানের আদর্শে পরিবার গঠন করিব।" পিতার মৃত্যুর পরও জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতিকে ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ঐ কথাই বলিয়া নিরস্ত রাখিয়া, মধ্যে উপার্জ্জনক্ষম অনুজ ভ্রাতার বিবাহ দিলেন। শান্তিসুধার বিবাহে নির্ম্মলের কত উৎসাহ, অকাতরে অর্থব্যয় করিলেন, ভ্রাতৃবধূকে আনিয়া ভ্রাতার সুখের সংসার পাতিয়া দিলেন। শান্তি বুঝতেই পাল্লেন না যে, তাঁর পিতা নাই; পিতার অভাব নির্ম্মলের স্নেহবাৎসল্যে পূর্ণ হইয়াছিল। তারপর অল্পদিন হইল, একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ নববিধানীর সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিলেন, উভয়ে সুখের সংসার পাতিলেন। মাগো! এ কি লীলা তোমার! নির্ম্মলের বিবাহবাসর যে এত শীঘ্র শ্রাদ্ধবাসরে পরিণত হবে, তা'তো আমরা ভাবতেই পারি না।

তুমি, মা! আমাদের দেখাচ্ছ, তোমার প্রেমের হস্তেই আত্মা গড়ার ব্যাপার করিতেছ। তুমি নির্ম্মলচন্দ্রকে এখন অমর লোকে পিতামাতার ক্রোড়ে বসাইয়া, তোমার মধুর মা নাম করাচ্ছ। তাঁকে তুমি কি মধুর স্বরে ডাকিলে যে, তিনি সে ডাক শুনে আর থাকতে পাল্লেন না। তাই তাঁর প্রিয় সঙ্গীতের সত্য জীবনে পূর্ণ হইল, "অনন্তজীবনে অনন্তমিলনে বিহরিব লোকান্তরে।" মা! এই মরধাম আর ঐ অমরধাম নববিধানে এক করিবার জন্যই যদি এই ভীষণ শোকের ব্যাপার করলে, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরাও যেন সকলে ঐ নিত্যলোকের জন্য প্রস্তুত হই। তুমি, মা, শোকার্ত্তা ও পতিহীনা বিধবা কন্যার প্রাণে সান্ত্বনা দাও; তিনি যেন পতির আত্মাকে তোমার মধ্যে দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। ভাই ভগিনী ও আত্মীয়দের প্রাণেও সান্ত্বনা দাও। আমরাও যেন সকলে তোমার প্রেমময় শান্তি-বক্ষে নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিয়া, আমরাও ঐ অমরাত্মাদের সহিত অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে মিলিত হই।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

কোচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (বড়)

গত ২১শে অক্টোবর, কোচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, পূর্ব্বাহ্ণে ন.. দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। তাঁহার পুত্রকন্যা নাতীনাতিনীগণের অনেকে এবং জামাতা ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনায় যোগদান করেন। ভাই গোপালচন্দ্র শুহ উপাসনার কার্য্য করেন। কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীর নেতৃত্বে মধুর সঙ্গীত হয়। উপাসনার যোগে শ্রীমদ্ গজেন্দ্রনারায়ণের জীবনী প্রাণে যে ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার অনুসরণে তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী কিঞ্চিৎ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

কোচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গী হইয়া স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বিলাতে আপনার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোচবিহার রাজ্যে বিচারবিভাগে বিশেষ বিশেষ উচ্চ পদে কর্ম্ম করেন এবং সময়ে পেনসন্ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় জামাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ নববিধানে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রে একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। নৈতিক জীবনের সুগন্ধে তিনি কোচবিহারের রাজবংশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি কোন দিন মদ স্পর্শ করেন নাই।

তিনি দীর্ঘকাল কোচবিহার নববিধান সমাজের সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকের উচ্চ কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রাণে লইয়া, তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে সন্ধ্যার ব্রহ্মমন্দিরের রবিবাসরীয় উপাসনায় নিষ্ঠার সহিত যোগদান করিতেন এবং সমাজসম্পর্কে সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্ম সুনির্ব্বাহ বিষয়ে নিজে সাক্ষাৎ থাকিয়া যতদূর সম্ভব সহায়তা করিতেন। কোচবিহারের নববিধান মন্দির, ব্রাহ্মপল্লী, ব্রাহ্মবোর্ডিং, কেশবাশ্রম, বিধান লাইব্রেরী এবং নিয়মিত পাঠ, প্রসঙ্গ, আলোচনাসভা প্রভৃতির কার্য্য দর্শন, তাহাতে যোগদান ও তাহার পরিচালন বিষয়ে কত্তই উৎসাহ প্রকাশ ও আনন্দ অনুভব করিতেন। রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের পর তিনি কোচবিহার নববিধানসমাজ ও সমাজ সংক্রান্ত কাজে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

আজ কোথায় সেই ব্রহ্মমন্দিরের পূর্ব্বশ্রী, কোথায় ব্রাহ্মপল্লী, কোথায় ব্রাহ্মবোর্ডিং, কোথায় বিধান লাইব্রেরী, কোথায় নিয়মিত ছাত্রসভা, আলোচনাসভা, পল্লীতে পল্লীতে প্রচার, কোথায় কেশবাশ্রমের পূর্ব্ব প্রাকৃতিক শ্রীসৌন্দর্য্য? স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগের অল্পদিন পর হইতেই স্বর্গীয় মাননীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ও স্বর্গীয়া মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর সময়ের প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত ব্রাহ্মপল্লীর, ব্রাহ্ম বোর্ডিংএর, বিধান লাইব্রেরীর এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির মূল দেশ পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া কি এক কীর্ত্তিনাশা নদী কখন লোকচক্ষুর গোচরে, কখন লোকচক্ষুর অগোচরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই দেখা গেল, সেই কীর্ত্তিনাশা নদীর আঘাতে কোচবিহার নববিধানসংক্রান্ত প্রায় সকল কীর্ত্তিই বিলুপ্ত। এখন যাহা আছে, তাহা ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় অবস্থান করিয়া, হৃদয়বান সহানুভূতিকারী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের চক্ষু হইতে বিষাদের অশ্রু আকর্ষণ করিতেছে!

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণকে জীবনের বিশেষ পরীক্ষায় কোচবিহার পরিত্যাগ করিতে হইল। সে পরিত্যাগ তাঁহার কত মর্ম্মবেদনাদায়ক হইয়াছিল, সাংসারিক জীবনে তাঁহার সে পরিত্যাগ কত ক্ষতিকর হইয়াছিল, তাহা আর বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার কথা নয়। গ্রাম্য সংগীতে গীত হয়, "থাকতাম যদি গুরুপদে, ভজতাম যদি গুরুপদে, বিপদে হতো শুভদিনরে, বিপদে হতো শুভদিন।" প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, তাঁহার কোচবিহারত্যাগে গুরুপদে শরণাপন্নতা বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। শরণাপন্নাবস্থায় তাঁহার আত্মিক জীবনের পক্ষে সে শুভদিন বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। কোচবিহার তাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র দুইই ছিল। তিনি যতদিন কোচবিহারে ছিলেন, অন্যাদিক রাজকার্য্যের সঙ্গে তাঁহার জীবন জড়িত ছিল। কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় কার্য্য হইতে ও রাজকীয় সংস্রব হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইলেন; পৃথিবীর

ঐশ্বর্য্য কত অসার ও অনিত্য, তাহা তাঁহার মানস চক্ষে তখন বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হইল। তিনি মুক্ত পাখী হইয়া পরম-জননী হইতে সতনে, নির্জ্জন স্বর্গের পুণ্যছোলা স্নেহদুগ্ধ পান করিয়া পরিপুষ্ট ও বলীয়ান্ হইতে লাগিলেন। যথা সময়ে, ভগ্ন দেহ খাঁচা হইতে উড়িয়া স্বর্গধামে ব্রহ্মানন্দদলে পরমজননীর অমৃতবক্ষে তাঁহার ঝাপাইয়া পড়িবার সময় আসিল। ২৭শে অক্টোবর দেহ খাঁচা হইতে উড়িয়া তাঁহার পরমজননীর শান্তিবক্ষে স্থানলাভের সেই পুণ্যদিন।

—০—

যৌবনের স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাল্যকাল অথবা যৌবনের প্রারম্ভে পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলারের মহাপ্রভু শ্রীবুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই অবধি এক স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটাইতে লাগিলাম। দিবসের জাগরণের ভিতর শ্রীবুদ্ধবিষয়ক স্বপ্ন, রাত্রে নিদ্রার ভিতর ঐ স্বপ্নই আমার দেহ মনকে অধিকার করিয়া বসিল। ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, জাগরণে ও নিদ্রায় ঐ একই স্বপ্নের ঘোর চলিতে লাগিল। শুভক্ষণে পাটুলিপুত্রের ধূলিকণার স্পর্শ পাইয়া আমি যেদিন ধন্য হইলাম—পাটুলিপুত্রের অণুকণাগুলি স্বর্ণরেণু হইয়া যেদিন আমার সর্ব্বশরীরে শ্রাবণের ধারার মত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—যেদিন শ্রীবুদ্ধবিহারভূমির সুবাসিত মলয়-পবন আমার শ্বাস প্রশ্বাসে সঞ্চারিত হইয়া নূতন জীবন দান করিল, সেইদিন জানিলাম, কোন শুভক্ষণে কালের অন্ধকার ভেদ করিয়া এক অলৌকিক আলোকধারা বিদ্যুৎ চমকের মত সেই মহাপুরুষের স্পর্শ দান করিল।

কি জানি, কোন অলৌকিক কারণ হইতে সেই দিব্যপুরুষের সহিত আমার অচ্ছেদ্য আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহা কোন তপস্যা বা আলোচনার ফল নহে—ইহা তাঁহার ধর্ম্ম ও চরিত্রবিষয়ক শ্রমসাধ্য গবেষণার পুরস্কারও নহে। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বের ও কৃচ্ছ্র সাধনার দুর্ল্লভ সাধনাও নহে।

একটী স্বজাতীয় অণুকণা কালকালান্তর পরে প্রকৃতির নিয়মে মিলিত হয়, আত্মারও প্রকৃতিগত কোন প্রচ্ছন্ন মূল কারণ সেই রূপ নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, যেখানে যুগযুগান্তর হইতে একটি মহান্ আত্মা আর একটি ক্ষুদ্র আত্মাকে আপনার দিকে টানিয়া লন; ইহা বিধাতার বিধান। আমার সঙ্গে তাঁহার এই বিস্ময়কর সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সঙ্গত মীমাংসা খুঁজিয়া পাই না। ইহাই আমার পূর্ণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে আমার জীবন তাঁহার স্পর্শে আলোকময় হইবে। এই আলোক হইতে যে কণামাত্র জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাই জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিল। শুভক্ষণে পাটুলীপুত্রে আগমন। আমার শ্রীবুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার একটি প্রশস্ত পথ খুলিয়া গেল। শুভক্ষণে আমি দুইজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সাধকের সহিত পরিচিত হইলাম। তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা এবং শ্রীবুদ্ধবিষয়ক আলোচনার ফলে আমার জ্ঞান একটু উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সেই বিশিষ্ট সাধকদের ভিতর একজন শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল, আর একজন সাধু প্রকাশচন্দ্র। ভাই ব্রজগোপালের বৌদ্ধ গ্রন্থ কিছু পড়া ছিল, তাহা ব্যতীত তিনি হরিসুন্দরবাবুর নিকট গয়ায় তখন বাস করিতেন। গয়া হইতে ৬।৭ মাইল দূরে বুদ্ধগয়ার মন্দির অবস্থিত। সেই মন্দিরদর্শনের জন্য অথবা তীর্থ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয়, চীনদেশীয়, সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিতেন। ভাই ব্রজগোপাল তাঁহাদের সহিত বুদ্ধবিষয়ক প্রসঙ্গ করিতেন। ইহাতে ভাই ব্রজগোপালের শ্রীবুদ্ধের প্রতি এবং তাঁহার চরিত্র, সাধনা ও প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি বেশ আস্থা হইতে লাগিল। তিনি শ্রীবুদ্ধদেবের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। আমার সহিত তাঁহার এই বুদ্ধবিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, আমার ভাবের সহিত তাঁহার ভাব মিলিত হইয়াছে। আমার চিন্তার সহিত তাঁহার চিন্তা এক হইয়া গিয়াছে।

যে সকল সাধন লইয়া ভাই ব্রজগোপাল শ্রীবুদ্ধদেবের অনুগত সাধক বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিলেন, আমারও মনের গতি সেই দিকে ধাবিত হইল। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন একটি প্রাণ হইলাম। একই ভাবের তরঙ্গে উভয়ের চিত্ত উদ্বেলিত হইল। একই চিন্তার ধারায় উভয়ের মন ভাসিয়া যাইত। ক্রমে আমাদের মধ্যে সাধনার ভাব বেশ জমাট হইয়া গেল। তাঁহার সহিত এই আত্মীয়তা বুদ্ধবিষয়ক স্বপ্নের সাহায্য করিল। তখন ভাবিলাম, আমিও একবার বুদ্ধ গয়া যাইয়া সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত আলাপ পরিচয় করি। তখন ব্রহ্মদেশীয় দুইটী সন্ন্যাসী, চীনদেশীয় একটি ও সিংহলদেশীয় একটী সন্ন্যাসী তীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছেন। আমরা কেহ কাহারো ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সমস্তদিন অথবা দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহা-দিগের নিকট বসিয়া থাকিতাম। তাঁহাদের সাধন দর্শন করিতাম। তাঁহাদের স্তোত্রপাঠ ঠিক আমাদের স্তোত্রপাঠের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা একাহারী, প্রাতে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রে থান করিয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইতেন। ভজনের পর পাঠ ও আলোচনা হইত। তাঁহাদের সাধন আরো অতিশয় কঠোর। দিবসের এক মুহূর্ত্তও বৃথা কাজে বা কথায় তাঁহারা ব্যয় করিতেন না। উঠা, বসা, পাঠ, প্রসঙ্গ, স্তোত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা সমস্ত একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। রাত্রিতে তাঁহারা অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইতেন না। এই সকল ঘটনা আমার বুদ্ধবিষয়ক স্বপ্নের সহায় হইল। মন মুগ্ধ হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া ভাই ব্রজগোপালের সহিত এই

সব বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহাতে জীবন ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বপ্ন জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হইল।

আর একটি বিশিষ্ট সাধক—যাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়—তিনি সাধু প্রকাশচন্দ্র। যদিও প্রকাশচন্দ্রের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের আলাপ প্রসঙ্গাদি হইত না, কিন্তু তাঁহার সাধনা বুদ্ধ-সাধনার অনুরূপ। ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশচন্দ্রের সাধনা ছিল। তাঁহার মন্ত্র ছিল, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।" তিনি বলিতেন, "যদি কেহ চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে মিথ্যা বলে বা মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহার ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনা করিবার কোন অধিকার নাই। তাহার সেই ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা জীবনে নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সেইরূপ যদি কেহ ক্রোধাদি রিপুদিগকে বর্জ্জন করিতে না পারে বা তাহাদিগের উপর জয়লাভ করিতে না পারে, তাহার 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' অর্থাৎ ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ এ কথা বলিবার কোন অধিকার নাই। আমার ধর্ম্মের পরীক্ষা এই। এই ব্রহ্মচর্য্য কে কি পরিমাণে পালন করিতেছে, কি পরিমাণে কামাদি রিপুর উপর জয় লাভ করিয়াছে, তাহারই পরিচয়ে আমি ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মিথ্যা উপাসনা তাহার, যাহার সহিত চরিত্রগত কোন সংস্রব নাই; ভগবান সে উপাসনা গ্রহণ করেন না।" যদিও তিনি বুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান অধিক উপার্জ্জন করেন নাই, তথাপি শ্রীবুদ্ধের সাধন ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি বৎসর শ্রীবুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ বিহারভূমি রাজগৃহে তাঁহার একটি ছোট দল লইয়া গমন করিতেন। ৫।৭ দিন ধরিয়া সাধন, ভজন, নামকীর্ত্তন, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সাধনে মগ্ন থাকিতেন। একটা স্বর্গের আবহাওয়া রাজগৃহের চারিদিকে এই কয়েকদিন প্রবাহিত হইত।

নারীগণও সংসার ভুলিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া এই সাধনে যোগদান করিতেন। রাজগৃহে শ্রীপ্রকাশচন্দ্রের সস্ত্রীক দীক্ষালাভ হয়। রাজগৃহে তিনি স্বহস্তে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং তিনি নিজে আপনার মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক ধারণ করিয়া, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় কাল কাটাইতেন। এখানে শ্রীবুদ্ধদেবের ধর্ম্ম কালের আবরণ ভেদ করিয়া কয়দিন জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিত। এখানে শ্রীপ্রকাশচন্দ্রের ক্ষুদ্র দলের ভিতর ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ বৈরাগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা সংযম কয়দিন উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিত; তাহাতে সকলের মনে হইত, যেন তাঁহারা স্বর্গে বাস করিতেছেন। পৃথিবীর কোলাহল ছাড়িয়া সকলেই নূতন যোগভূমির সন্ধান পাইলেন। প্রকাশচন্দ্র রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটী ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ দল সৃষ্টি করিলেন। এই দলের ভিতর ভাই ব্রজগোপাল, মৈমনসিংহের ভাই দীননাথ, গাজীপুরের সাধু নিত্যগোপাল, বাঁকিপুরের অপূর্ব্বকৃষ্ণ, যশোরের যতীন্দ্র প্রভৃতি এই দলের অন্তর্গত হইলেন। প্রকাশচন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যের আবহাওয়ার ভিতরে বাস করিয়া ভাই দীননাথ পাগল হইয়া গেলেন। যেখানে উপাসনা করিতে যাইতেন, বাঁকিপুরের যে পরিবারের সহিত তিনি মিশিতেন, উপাসনার পরেই তাঁহার প্রশ্ন ছিল যে, তোমরা কি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ? বহু পুত্র কন্যার পিতামাতা হওয়া ধর্ম্মের সার্থকতা নয়, যাঁহারা বিবাহ করিয়া অবিবাহিতের ন্যায় কালযাপন করেন, তাঁহারাই যথার্থ গৃহস্থ বৈরাগী।

সে সময় ব্রহ্মচর্য্যের আবহাওয়া এমন করিয়া ক্ষুদ্রদলকে অধিকার করিয়াছিল যে, সেই দলের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কেহ অল্পকালের জন্য, কেহ দীর্ঘকালের জন্য, কেহ বা চিরদিনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মবন্ধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন; উপাসনা, প্রার্থনা, পাঠ, ধর্ম্মালোচনা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতেন না। নারীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। বাঁকিপুরের ক্ষুদ্র দল একপ্রকার ব্রহ্মচারী ত্যাগী বৈরাগী হইলেন। তিনি যে অন্তরঙ্গ দল গঠন করিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা হইত। কোন গভীর দর্শনতত্ত্ববিষয়ক প্রসঙ্গ সেখানে আলোচনা হইত না। কেমন করিয়া চরিত্রকে ভাল করা যায়, কেমন করিয়া সত্যপরায়ণ হওয়া যায়, চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মে কেমন করিয়া প্রতিদিন আত্মা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, কেমন করিয়া সেবাপরায়ণ হওয়া যায়, প্রেমিক হওয়া যায়, প্রতিবেশীর উপকার জীবনে কেমন করিয়া সার্থক হইতে পারে, কেমন করিয়া কাম ও ক্রোধাদি রিপুদিগকে বশীভূত করা যায়, এই সকল বিষয় সেখানে আলোচিত হইত। ক্ষুদ্রদলের প্রত্যেককে, কে কিরূপভাবে জীবন কাটাইলেন, তাহার হিসাব দিতে হইত। গৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে, সন্তানপালনে দাসদাসীর সহিত ব্যবহারে কেহ ক্রোধাদির বশীভূত হইলেন কি না, তাহার দৈনিক হিসাব রাখিতে হইত। বস্তুতঃ যাঁহারা সেই দলের অনুগত হইলেন, তাঁহারা শুদ্ধচরিত্র, সেবাপরায়ণ ও পরোপকারী হইলেন এবং রিপুসংহারব্রতপালনে অনেকেই কৃতকার্য্য হইলেন।

কেহ তাঁহার নিকট ফাঁকি দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারিত না, তাঁহার আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল; প্রতিদিন উপাসনার সময় এক একজনকে এক একটী স্বরূপ আরাধনা করিতে বলিতেন। সেই আরাধনা হইতে তিনি বুঝিতে পারিতেন, কে কতদূর অগ্রসর হইল, কাহার চরিত্রে কতদূর ব্রহ্মস্বরূপের ছাপ পড়িল। প্রকাশচন্দ্র প্রেমিক ছিলেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, সমস্তই পরার্থে দান করিতেন। তিনি একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বাঙ্গালী, বিহারী, এমন কি সিন্ধুদেশ হইতেও লোকে কন্যা পাঠাইতেন। ভগবানের কৃপায় এইরূপে কয়েকজন বিশিষ্ট সাধুর সংস্রবে আসিয়া, আমার বুদ্ধবিষয়ক স্বপ্ন বাস্তব জীবনে কথঞ্চিৎ পরিণত হইল। শ্রীবুদ্ধদেব এখনও প্রতিদিন আমার জীবনের পথপ্রদর্শক হইয়া, শয়নে

রূপনে আমাকে পথ দেখাইতেছেন। শীল, ব্রত, ত্যাগ, বৈরাগ্য আচার ও উপাসনায় আমি সেই মহাপুরুষের অনুপ্রাণন প্রাপ্ত হইয়া চলিতেছি। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া জীবন আরম্ভ করি এবং রাত্রিকালে শুইবার সময় 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' বলিয়া শয়ন করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায়।

—•—

সংবাদ।

শুভবিবাহ—১৭ই অক্টোবর, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, রাজাবাগে, আচার্য্যদেবের পৌত্রী, কাপ্তান সুব্রতচন্দ্র সেনের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুরঞ্জাচান সেনের সহিত, বোম্বায়ের ডাঃ পি, ধর্গালকারের দ্বিতীয় পুত্র ময়ূরভঞ্জের বিমানপোতপরিচালক কল্যাণীয় মিঃ আর, পি, ধর্গালকারের শুভবিবাহ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ শুভবিবাহে উপাসনাদির কার্য্য করিয়াছেন।

গত ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, বুধবার, চট্টগ্রামে নন্দনকাননস্থ নবীনভবনে, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জনিবাসী স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্র দাসের সহিত, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর, বুধবার, চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল কানুগোয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ব্রহ্মবীরের সহিত, ঢাকা ওয়ারিনিবাসী স্বর্গীয় গোপীমোহন সেনের পৌত্রী, স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন সেনের তৃতীয় কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুকার শুভবিবাহ ওয়ারিস্থিত ১নং নবাব ষ্ট্রীট ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যার ভ্রাতা শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রমোহন সেন এই শুভানুষ্ঠানে প্রচারভাণ্ডারে ১২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিদিগকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৪শে অক্টোবর, কুলটীতে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ অতুলচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ভ্রাতা ভগ্নীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার প্রথমাংশ এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার শেষাংশ সম্পন্ন করেন। অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা এবং জ্যেষ্ঠভগ্নীপতি ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের লিখিত নির্ম্মলের চরিত্রস্মৃতি পাঠ করেন। দ্বিতীয়া ভগ্নী শ্রীমতী সুষমা বসু দাদার নির্ম্মল আত্মার উদ্দেশ্য লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায় কলিকাতা, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, অনাথাশ্রমে ৫৲, ভগ্নীসমিতিতে ৫৲, ছেলেমেয়েদের নীতিবিদ্যালয়ে ৫৲ এবং ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা এবং ভগিনী সুষমা বসু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। গত ১৮ই অক্টোবর, ভাগলপুরে, তত্রস্থ পোষ্টমাষ্টার স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্রের শ্বশুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের গৃহে, পত্নী শ্রীমতী মণিকা কর্ত্তৃক স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন।

পরলোকগমন—অতীব দুঃখের সহিত আমরা নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

হাওড়ায় ৩নং নেপাল সাহা লেনে, ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণের শিশুপুত্র গত ২০শে অক্টোবর মা বাবার ক্রোড় শূন্য করিয়া পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া যায়। শিশুটী গত ১১ই সেপ্টেম্বর পাবনায় জন্মগ্রহণ করে। শিশুর পরলোকগমনে গত ২১শে অক্টোবর ভাই অখিলচন্দ্র রায় ঐ গৃহে উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পিতা হিন্দুভূষণ শিশুর পুণ্যস্মৃতিতে নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন :—

অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ২৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কলিকাতা অনাথাশ্রম ৪৲, ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটী ৫৲, পাবনা সদর হসপিটাল ৫৲, কলিকাতা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটী ৫৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২৲, অমরাগড়ীর নিকটস্থ গ্রামের দরিদ্র শিশুদের সেবার্থে ২৲ টাকা।

গত ২২শে অক্টোবর, কলিকাতায় ১৬৪এ ল্যান্স্‌ডাউন রোডে, কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের পুত্র, প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র ডাঃ সুখেন্দুকুমার দাস অল্প কয়দিনের জ্বরে পিতামাতা, পত্নী, দুইটী অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী ও বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। গত ৮ই নবেম্বর, ঐ গৃহে তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উদ্বোধন, অধ্যাপক খগেন্দ্রসিংহ ঘোষ আরাধনা এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। ভ্রাতা সন্তোষকুমার দাস প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। ভ্রাতা শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দাস (I.C.S.) মেজদাদার জীবনী এবং ভগ্নী শ্রীমতী কাসির লিখিত মেজদাদার জীবনী শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাস পাঠ করেন। অতি গম্ভীর ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হয় :—

কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, অনাথাশ্রম ৩৲, নববিধান প্রচারফণ্ড ৫৲; ঢাকা—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, অনাথাশ্রম ৩৲, বিধবাশ্রম ৩৲, অনাথ

ব্রাহ্মধনভাণ্ডার ৩৲, রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য হাসপাতাল ৩৲; চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ ৩৲, পুরী নববিধান ৩৲, মুঙ্গের নববিধানসমাজ ৩৲; কৃষ্ণনগর—ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, দরিদ্র ভাণ্ডার ৩৲, দাতব্য স্কুল ৫৲, রামকৃষ্ণমিশন ৫৲; নবদ্বীপ পণ্ডিত পরিবারের জন্য ১০৲; বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাঁকুড়া কেন্দ্র ৫৲, সঙ্কটত্রাণসমিতি ৫৲; দরিদ্রদের জন্য বস্ত্র ১০৲ ও নগদ পয়সা ৫৲, গীতাদান ৭৲ টাকা, মোট ১০০৲ টাকা।

বার্ডকোম্পানীর পেটেন্ট ষ্টোন ফেক্‌টরীর ম্যানেজার, আমাদের প্রেমাস্পদ বন্ধু মিঃ শিশিরকুমার গুপ্তের চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা একমাত্র সন্তান শ্রীমতী কল্যাণী কয়েকমাস রোগ ভোগ করিয়া, গত ২৪শে অক্টোবর, ২৫।১ রোলাণ্ড রোডে, মাসীমা শ্রীমতী মীরা দেবীর (মিসেস, এ, কে গুপ্ত) কাছ হইতে, মাসীমা ও পিতার প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগতা মা উমা দেবীর কাছে চলিয়া গিয়াছেন। গত ১লা নবেম্বর, ঐ গৃহে কল্যাণীর আত্মার কল্যাণার্থ ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ২৮শে কার্ত্তিক, শনিবার, শেষরাত্রি ৩টায় (১৫ই নবেম্বর), বালিগঞ্জে ৪৩নং ফার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম সাধক, ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ৯১ বৎসর বয়সে, শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে ভাগলপুরের স্বর্গগত ভক্তদল ডাঃ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্ত হরিসুন্দর বসু, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বামাচরণ ঘোষ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এখানে সুদীর্ঘ কাল নির্ম্মল চরিত্রের সুগন্ধ ও নববিধানের বিশ্বাস-প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ আদর্শ জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বংশের চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিবারে ও মণ্ডলীতে বিকীর্ণ করিয়া বিধানকে জয়যুক্ত করিয়া গেলেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে উন্নত লোকে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই নবেম্বর, কমলকুটীরস্থ নব-দেবালয়ে," কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সুনীতি দেবীর চতুর্থ সাম্বৎসরিক কুচবিহার ষ্টেটের ব্যবস্থানুযায়ী জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে উপাসনা হয়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন-কলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেনকৃষ্ণ বসু ভক্তিরত্ন মধুর কীর্ত্তনানন্দে সকলকে মুগ্ধ করেন।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুনর্মুদ্রণ

এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ জন্য এ পর্য্যন্ত যে টাকা হস্তগত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছি :—

মিঃ বি, কে, হালদার (পিংমানা) ৫০০৲, মিঃ জি, সি, বানার্জি ৫০০৲, মিঃ প্রবোধকুমার দত্ত (ইংলণ্ড) ৩০০৲, ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও (মসলিপত্তন) ১০০৲, ডাঃ বি, পি, ঘোষ ও মিসেস এডিথ্ ঘোষ ১০০৲, প্রঃ ও মিসেস এস, সি, মহলানবিস ৫০৲, ডাঃ ডি, এন্ ব্যানার্জি ৫০৲ (প্রঃ কিঃ), মিঃ জে, এম, সেন ২৫৲, জনৈক মহিলা ২০৲, লেঃ কর্ণেল জে, এল, সেন (প্রঃ, কিঃ,) ২০৲, সার এল, জি, মুখার্জি (এলাহাবাদ) ১০৲, মিঃ বি, কে, সেন (এটর্ণি) ১০৲, মিঃ হরেন্দ্রচন্দ্র দেব (দেরাদুন) ৫৲, মিঃ এস, এন, রায় (লক্ষ্ণৌ) ৫৲, মিঃ বিনয়ভূষণ বসু (ফরিদপুর) ২৲, মিঃ মতিরামদশিরাম আদ্‌ভানি (হায়দ্রাবাদ) ১০০৲, ডাক্তার সচ্চিদানন্দহোসেন পাল ২০৲ টাকা। মোট ১৮১৭৲ টাকা।

পুনর্মুদ্রণে ৩০০০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে, এখনও ১২০০, ১৩০০৲ টাকা আবশ্যক। এজন্য যাঁহারা সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের ও যাঁহারা এখনও সাহায্যদানে অগ্রসর হন নাই, তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষভাবে নিবেদন যে, সত্বর এই মহৎকার্য্যে সাহায্যদান করিয়া বাধিত করুন ও পুণ্য সঞ্চয় করুন। কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতেছে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা
এলাহবাদ ; ১০।১১।৩৬ } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

যে সকল মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মেরা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়া বাসস্থানের অসুবিধা ভোগ করেন, তাঁহাদের জন্য নববিধান প্রচারকার্য্যালয়, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, দুইখানি ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি পৃথক করিয়া রাখিবার একটী সাময়িক আয়োজন আমরা করিতেছি। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত হইবে :—

১। মফঃস্বল হইতে আগত ব্রাহ্ম অতিথিগণ এখানে থাকিতে পারিবেন।

২। আসিবার পূর্ব্বে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয়ের নিকট দিন ও তারিখ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া আসিতে হইবে।

৩। সাধারণতঃ ৭দিন পর্য্যন্ত বাসের অনুমতি দেওয়া হইবে; যদি তাহার পর থাকার প্রয়োজন হয়, অন্য কেহ প্রার্থী না থাকিলে, আরও ৩ দিন পর্য্যন্ত অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে। একসঙ্গে ১০ দিনের অধিক বাসের স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৪। যিনি যে যে তারিখের অনুমতি পাইবেন, তাহার অতি-রিক্ত থাকিতে পারিবেন না।

৫। পূর্ব্বে অনুমতি লইয়া না আসিলে, স্থান পাওয়া সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা থাকিবে না।

৬। কেবল থাকিবার স্থান ও আলো দেওয়া হইবে। আহার, চাকর বাকর ইত্যাদির ব্যয় যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদের নিজেদের দিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে অতিথিরা এ সকলের ব্যবস্থা কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত করিতে পারিবেন।

৭। প্রয়োজন হইলে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৮। স্থান দেওয়া ও আয়োজনের পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ-ভাবে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয়ের হাতে থাকিবে এবং এ বিষয়ে পত্রাদি তাঁহাকেই লিখিতে হইবে। এই নিয়মাবলীও তাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে।

৯। অনুগ্রহ করিয়া কেহ রোগী লইয়া আসিবেন না।

এখন হইতে আপাততঃ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৭, পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা রাখা হইবে। মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মদের ইহাতে কোনো উপকার হইলে আমরা সুখী হইব।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৬। } নিবেদক
শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা:—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ
2nd. December, 1936

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

অনন্ত করুণাময়ী জননী, তোমার অযাচিত কৃপায় তোমার প্রিয় ভক্তের জন্মোৎসব করিতে দিলে। তোমার কৃপায় এরূপ কতবার তোমার ভক্তের জন্মোৎসব করিলাম; কিন্তু জীবনে জন্মোৎসব সার্থক হইল কৈ? যুগে যুগে ভক্তেরা আসেন, পৃথিবীকে নূতন করিবার জন্য, পৃথিবীর পাপ মলিনতা দূর করিবার জন্য। নব ভক্ত ব্রহ্মানন্দকে তুমি পৃথিবীতে আনিলে, যাতে পৃথিবী ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়, সমস্ত বিরোধ বিসম্বাদ চলে যায়, সমস্ত পৃথিবীতে মহামিলনের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার জীবনকে নববিধানমূর্ত্তিমান করিলে; নব আদর্শ পৃথিবীর সম্মুখে ধরিলে। জাতীয় ভাবের সঙ্গে সার্ব্বভৌকিতার মিলন দেখালে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের মধুরিমা প্রকাশ করিলে। এই একটা অদ্ভুত জীবন তুমি তোমার মনোমত করিয়া গঠন করিলে। তিনিও বলিলেন, আমি মার হাতে গঠিত। তোমার স্তন্যসুধাপানে তিনি সদা বীর বলবান্। তোমা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না। নববিধানের নবশিশু করে তুমি তাঁহাকে তোমারই অনন্ত বিশাল প্রেমবক্ষে নিয়ত রক্ষা করিলে। তিনিও মা-সর্ব্বস্ব হইয়া কায়মনোবাক্যে তোমার ইচ্ছা পালন করিয়া গেলেন। এ হেন ভক্তের জন্মোৎসব করিবার অধিকার তুমি আমাদের দিয়েছ। কিন্তু তাঁহার জন্মোৎসব করে আমাদের জীবন পরিবর্ত্তিত হইল কৈ? তাঁর অনুগামী হতে পারিলাম কৈ? তোমার ভক্তদের জন্মোৎসবের অর্থ এই, তাঁদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া তদনুরূপ জীবন লাভ করা, তাঁদের জীবন লাভ করে দুঃখতাপময় জীবনকে উৎসবময় করিয়া তোলা। নবভক্ত তোমার আনন্দে পূর্ণ হইয়া "ব্রহ্মানন্দ" নাম পেলেন; তাঁহার জন্মোৎসব করে তোমার আনন্দে যদি আমাদের জীবন পূর্ণ না হয়, তবে তাঁর জন্মোৎসব সার্থকতো হয় না। মহামিলনের বিধান যিনি জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, তাঁর জন্মোৎসব করে যদি আমরা দুইটী প্রাণও তোমার চরণে মিলিত হইতে না পারি, তবে তো জন্মোৎসবে বৃথা হল। মা স্নেহময়ী জননী, তুমি আমাদের কৃপা কর। তোমার নবভক্তের জন্মোৎসব আমাদের জীবনে সার্থক কর। তোমার অনন্ত বক্ষের ধনকে তোমার কৃপার আলোকে ভাল করিয়া দেখি। আমরা আমাদের নিজের মনোমত করে তাঁকে পেতে চাই; তাই জীবনে জীবনে কেশবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আমার কেশব অন্যের কেশব নহেন। তোমার মনোমত বিধানের অখণ্ড কেশবকে গ্রহণ করিতে

দাও। তোমার নবভক্ত সম্বন্ধে আমাদের কত অপরাধ, তা তুমি জান ; এবার আমরা তোমার চরণে মাথা নত করে, হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করে, তোমার নবভক্ত ব্রহ্মানন্দকে তোমার মনের মত করে গ্রহণ করিয়া ধন্য হই, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

অখণ্ড কেশব

কেশব কে, তিনি কি জন্য পৃথিবীতে এলেন, এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা বা ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া, আমরা সকলে অনন্ত স্নেহময়ী কেশবজননীর কাছে উপস্থিত হই, এবং কেশবের প্রকৃত রূপ দেখিতে চেষ্টা করি। মা সারদা দেবীর গর্ভ হইতে কলুটোলার বাড়ীতে অন্ধকারময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন, সেই কেশবকে, জননীর জননী অনন্তকরুণারূপিণী বিশ্বজননী ক্রমে ক্রমে নিজ গর্ভস্থ করিয়া, তাঁর অনন্ত আনন্দের খণ্ড ব্রহ্মানন্দরূপে জগতের সম্মুখে নবশিশু-রূপে নবজন্ম দান করিলেন। মা সারদার বক্ষের ধন অনন্তকৃপাময়ীর বক্ষের ধন হইলেন। দেশকালের মধ্যে খণ্ডজীবন লাভ করিয়া, নববিধানজননীর বক্ষে অখণ্ড জীবন ধারণ করিলেন। এই অখণ্ডত্বই কলুটোলার রামকমল সেনের বংশজাত কেশবের জীবনমাহাত্ম্য।

এই অখণ্ডত্ব শিক্ষা দিতেই শ্রীকেশবের পৃথিবীতে আগমন। পৃথিবী খণ্ড খণ্ড ভাবেই সসৃষ্ট। খণ্ড খণ্ড ভাবের মধ্যে মানুষ আপনার আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, নিজ নিজ ভাব রুচিকে প্রস্ফুটিত করিয়া, আত্ম-ভাবের মহিমালোকে পুলকিত হইয়া আত্মপ্রসাদ বা চরি-তার্থতা লাভ করিতে পারে। মানবের এই আমিত্ব-প্রভাবেই জগতে কত ধর্ম্ম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে ; কত শাস্ত্র, কত সাধন, কত প্রতিষ্ঠান ধর্ম্মজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অন্যান্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অখণ্ডত্বসাধনপথে খণ্ড খণ্ড ভাবধারার প্রতিপোষক আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, অখণ্ডভাবস্রোতের মধ্যে আত্মহারা হইয়া স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে বিধানের রাজ্যে উপনীত হইতে হয়। বিধানের রাজ্যে সবই বিধাতার বিধান, মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব বা আমিত্ব নাই, ইহা বিশেষরূপে অনুভূত হয়।

এই অখণ্ডত্ব-সাধন-পথের যাত্রী শ্রীকেশব প্রথম হইতেই আপনার ভাবরুচি পরিহার করিয়া, একমাত্র প্রার্থনারই বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ভিতর হইতে এই ধ্বনি হইল, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর ; যাহা কিছু প্রয়োজন, সব পাবে।" সেই পথ ধরিয়াই তিনি চলিলেন; প্রার্থনা করিয়া ভিতর হইতে যে উত্তর পেতেন, তাহাই তাঁহার জীবনের পথপ্রদর্শক ও নিয়ামক হইল। কোন শাস্ত্রের কাছে যেতেন না, কোন গুরুকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। প্রার্থনার ভিতর দিয়া পরমগুরুর যে ইঙ্গিত পাইতেন, তাহাই তাঁহার জীবনপথের আলো হইল। খণ্ড খণ্ড ভাবের ভিতরে, আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে জীবনকে সংকীর্ণ না করিয়া, অখণ্ড মুক্তির রাজ্যে বিধাতার হস্তে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিলেন এবং বিধানের মুক্ত উদার জীবনলাভে অখণ্ড কেশব হইলেন। বিধানসাগরে আপন জীবনবিন্দু মিশাইয়া দিয়া, সকল বিধানের সঙ্গে, সকল সাধু ভক্তদের সঙ্গে একীভূত হইলেন। সকলের সঙ্গে অখণ্ড মিলনে তিনি মিলিত হইলেন, বিন্দু হইয়া সিন্ধুতে আত্মবিলীনতায় অখণ্ড যোগে যুক্ত হইলেন।

জগতে খণ্ড খণ্ড ভাবের সাধন হইয়াছে ; অখণ্ড-ভাবসাধনের পথ দেখাইবার জন্যই কেশবের আগমন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এক একজন সাধু ভগবানের এক এক স্বরূপের সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবানের অন্যস্বরূপ বা ভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। এই একদেশদৃষ্টিবশতঃ ভগবানের অখণ্ড বিধান খণ্ড খণ্ড বিধানে পরিণত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র এই একদেশ-দৃষ্টি পরিহার করিয়া, অনন্তরূপসাগরে ভিন্ন ভিন্ন রূপের সাধক সাধু ভক্ত মহাজনগণের সঙ্গে এক অখণ্ড অবয়বে আপনাকে পরিণত করিয়াছিলেন।

কেশবের প্রকৃত রূপ কি? এই অখণ্ডত্বই কেশবের প্রকৃতরূপ। এই কেশবকে কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় গেলে কেশবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়? আমরা তো কেশবের জন্মোৎসব করিলাম ; কেশবের প্রকৃতরূপ না জানিলে, তাঁর জন্মোৎসব যে কথার কথা হইয়া যায়। তাই বৎসরের পর বৎসর আমরা কেশবের জন্মোৎসব করিতেছি, অথচ কেশবকে দেখেছি বা পেয়েছি, তাহার কোন পরিচয় আমরা জীবনের মধ্যে

দেখাইতে পারিতেছি না। কেশব কোথায়? সমুদায় খণ্ডের মিলন যেখানে—সমুদয় ভাবের মিলন যেখানে—সমুদয় ধর্ম্মের মিলন যেখানে—সমুদায় ভগবদ্রূপের মিলন যেখানে—যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মিলন যেখানে—সকল মানবসন্তানের মিলন যেখানে—সেখানেই কেশবকে পাওয়া যায়। কলুটোলার বাড়ীতে, কিংবা কলিকাতায়, কিংবা বাঙ্গলায়, কিংবা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, কিংবা ব্রাহ্মসমাজে কেশবকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনন্ত বিধাতার অখণ্ড বিধানসাগরে, মহা মিলনের নববিধানরাজ্যে তাঁহাকে প্রকৃতরূপে সাক্ষাৎ ভাবে পাওয়া যায়। তাই তিনি বলিলেন, "আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিও না, অখণ্ডভাবে গ্রহণ কর; জলছাড়া করিয়া মৎস্য নিওনা, জলশুদ্ধ গ্রহণ কর; তাহা হইলেই আমাকে পাইবে।"

কেশবচন্দ্র নববিধানের নব মানুষ—অখণ্ড মানব। খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ প্রাচীন বিধান; নববিধানের নব মানুষ নবদুর্গার নবসন্তান দেখাইলেন, নূতন বিধানে কেমন অখণ্ডভাবে সব গ্রহণ করা যায়। এই অখণ্ডভাবে সব গ্রহণ করিলে খণ্ডের আর খণ্ডত্ব থাকে না, তাহা অখণ্ডত্বে পরিণত হয়; দেশকালে বদ্ধ যাহা, তাহা বিশ্বজনীন উদার ভাব ধারণ করে। কেশবচন্দ্র সেই অদ্ভুত যাদুকরের নিকট এই যাদুমন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, যে মন্ত্রের প্রভাবে তিনি খণ্ডকে অখণ্ডে পরিণত করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে অদ্ভুত বাজিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ছেলে বেলায় তিনি বাজিকর সেজেছিলেন, যৌবনে ধর্ম্মজীবনের রাজ্যে মহা বাজি দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া গেলেন। সেই মোহমন্ত্রে বর্ত্তমান যুগের পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও মুগ্ধ হইয়াছিলেন; হিন্দু সাধক কেশবের সঙ্গলাভ করে, সমগ্র গণ্ডীর পরপারে মহামিলনরাজ্যের সাধনপথ ধরিয়া মহামুক্তির পথ দেখাইয়া গেলেন। ভক্ত চেনেন ভক্তকে; কেশব চিনিলেন রামকৃষ্ণকে, রামকৃষ্ণ চিনিলেন কেশবকে; দুজনে হরিহরাত্মা, একাত্মা হইয়া, "মা আমাদের, আমরা মায়ের" এই আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। এইরূপে কেশব সকল সাধু ভক্তের সঙ্গে একাত্মতা সাধন করে, নবভক্তরূপে আপনার নূতন পরিচয় দিয়া গেলেন।

নববিধানের অখণ্ডবিশ্বাসে, নববিধানের নূতন চক্ষে তাঁহার কাছে সব নূতন হইল। সত্য শিব সুন্দরের সাধনায় তাঁহার জীবন যেমন মুক্ত হইয়া নূতন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল, তেমনি তিনি সকলের মধ্যে ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নূতন ভাবে সকলকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সুন্দর চক্ষে কিছুই কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাজ্য হইল না; সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে গ্রহণ কিরূপে করিতে হয়, তাহার আদর্শ তিনি জীবনে দেখাইলেন।

অনন্ত শ্রীভগবানের কৃপার প্রভাবে এক অখণ্ড মানুষ হইয়া, কেশবকে জীবনে লাভ করার দায়িত্ব আমরা প্রত্যেকে অনুভব করি। কেশবজীবন গ্রহণ করা,কেশবের জন্মোৎসব করার অর্থ, অখণ্ড মানুষ হওয়া—আমাদের জীবন-সরোবরে সেই অখণ্ড জীবনমীনকে খেলা করিতে দেওয়া। অতএব ভগবানের হাতে আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে ছাড়িয়া দিই; তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাঁহার অখণ্ড সন্তানকে আমাদের মধ্যে চিরজীবিত রাখুন, নিত্য নব পূজানন্দে মত্ত থাকিতে দিন। আর যেন আমিত্বের অধীনতায় খণ্ড খণ্ড ভাবের মধ্যে সংকীর্ণ হইয়া মৃত্যুর অধীন না নাই। অনন্ত মুক্ত জীবনের পথে, অখণ্ড অমরত্ব সাধন করিতে করিতে, অখণ্ড কেশবকে প্রাণে লাভ করিয়া, তাঁহার অনুগামী সহগামিরূপে নববিধানের মহামিলন-সাধনে, কেশব যেমন মার মনোমত হইয়াছিলেন, আমরাও মার মনোমত হইয়া ছোট ছোট কেশব হই, বিধানজননী আমাদিগকে জন্মোৎসবে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

ভক্তের জন্মোৎসব

জন্মোৎসবের অর্থ কি? যাঁহার জন্মোৎসব করিতেছি, সেই জীবন ভালরূপে জানা, সেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ভালরূপে অনুভব করা এবং সেই রূপে রূপবান্ হওয়া। ভক্তদের জন্মোৎসব করার গুরুতর দায়িত্ব। তাঁদের জন্মোৎসব করিয়া, যদি জীবনে তাঁদের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে না পারা যায়, তবে জীবনে তাঁদের প্রশংসা না হইয়া অবহেলা হয়, মহা অপরাধ হয়, তাঁদের জন্মোৎসব না হইয়া মৃত্যুৎসব হয়। তাঁদের না পাইয়া তাঁদের আরও হারাইয়া ফেলিতে হয়। ভক্তদের জন্মোৎসবের অর্থ জীবনে তাঁদের অমৃতলাভ হওয়া, অর্থাৎ তাঁদের জীবনধনে ধনী হইয়া মানবজীবনকে সার্থক করা। ভক্তদের লাভ করিয়াই এই জীবন ধন্য হয়। ভক্তের জীবনধন শ্রীভগবানের অমূল্য কৃপার দান। তিনি তাঁহার ভক্তের জীবনফুলে আমাদের জীবনকে তাঁহার

মনোমত করিয়া সাজাইবেন, এই তাঁহার সাধ। তাঁহার সাধ আমাদের জীবনে পূর্ণ হোক।

হরিভক্তি বিনা ভক্তদের লাভ হয় না

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।"—ভাগবতের ঋষি বলিলেন, "হরিতে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমুদায় দেবতারা তাঁদের দেব গুণ সহ তাঁহাতে অধিবাস করেন।" ভক্তদের পেতে হলে, ভক্তদের প্রাণধন শ্রীহরির চরণে অকিঞ্চনা ভক্তিযোগে—অর্থাৎ হরিচরণ বিনা আর গতি নাই, আর কোন সম্বল নাই, এইরূপ ভাবে সম্পূর্ণরূপে শ্রীহরিচরণে শরণাপত্তিযোগে—যুক্ত হইতে হয়। ভক্তেরা সকলে শ্রীহরিচরণে মিলিত; তাঁরা শ্রীহরিচরণ বিনা আর কিছুই জানেন না; সুতরাং ভক্তদের পেতে হলে শ্রীহরিচরণভিখারী হইতে হয়। তাঁর কৃপা বিনা ভক্তদের চেনা যায় না, পাওয়াও যায় না। তাই সঙ্গীতে আছে, "তব দয়া বিনে, এ পাপ জীবনে, সাধু ভক্ত জনে কেমনে চিনিব। ওহে ভক্তপ্রাণ, পুরুষপ্রধান, তুমি না দেখালে কেমনে দেখিব।"

পুণ্যস্মৃতি

(১৫ই নবেম্বর, রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের নিবেদন)

নববিধানের দৃশ্য মণ্ডলীর কত অবস্থার পরিবর্ত্তন। জন্ম মৃত্যু, আলোক ও আঁধারের ভিতর দিয়া মণ্ডলীর দিন চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সুখ ও দুঃখে জননী ইহাকে তাঁহার চরণাশ্রয়ে রাখিয়াছেন। যখন বিধানবিশ্বাসী ভ্রাতৃমণ্ডলী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তখন মৃত্যুর আঁধার আবার আসিয়া মণ্ডলীর সম্মুখে দেখা দিয়াছে। আজ প্রভাতে প্রবীণ বিধান-সেবক ও সাধক শ্রদ্ধাস্পদ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ জীবনের কর্ম্মাবসানে সেই অমৃতলোকের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি যে লোকের অধিবাসী, সেইলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে আমরা এ লোকে কত ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি মণ্ডলীতে এক বিশেষ স্থান শূন্য করিয়া, অদৃশ্যলোকে চলিয়া গেলেন; এ সংসারে সে স্থান আর কে পূর্ণ করিবে? ব্রহ্মানন্দের দল মৃত্যুর এ পারে ভাঙ্গিয়া, আবার সেই অজর, অমর দেশে গড়িয়া উঠিতেছে।

ভক্ত হরিনাথ মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিসুন্দর বসু, নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহসাধক ছিলেন। ভাগলপুরে ইঁহারা ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দরসপানে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ সেই লোকে তাঁহার সহসাধকদিগের সহিত মিলিত হইলেন। আজ সেখানে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত, কিন্তু এখানে আমরা শোক ও দুঃখের আঁধারে পড়িয়া আছি। বিধাতা আজ শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা দান করুন।

এ সপ্তাহ অতি পবিত্র সপ্তাহ। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজগতে তাঁহার স্থান দেশবাসী এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। চারিদিকে ধর্ম্মের নামে কত কলহ বিদ্বেষ, কত মনোমালিন্য, কত ভ্রাতৃদ্রোহ! তিনি অখণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্ব মানবকে দেখিয়া, ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। কত ভাবে গত পঞ্চাশ বৎসর এই শ্রীমন্দিরে এই বেদী হইতে সে কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্মের যে ত্রিবেণী-সঙ্গমে দাঁড়াইয়াছিলেন, আজ তাহার সম্বন্ধে দু' চারটী কথা নিবেদন করিব।

একদিকে এদেশে ভাগবত ধর্ম্মের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করেন, কোনও বিশেষ নরদেহী ভগবান্‌কে অবলম্বন না করিলে, মানবধর্ম্মজীবন যাপন করা সম্ভবপর নয়। অনন্তের উপাসনা এ কলির জীবের অসাধ্য। অনন্ত অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত ও অবাঙ্‌মনসগোচর। জন্মজন্মান্তরে বহু সাধনার পর দু'একটী লোকের কদাচিৎ ব্রহ্মসান্নিধ্যলাভ হইয়া থাকে। প্রাচীন য়িহুদীরা মনে করিত, ভগবান্‌কে কেহ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—তাঁহার আলোতে মানুষের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তিনি যুগে যুগে আপনার পয়গম্বরদিগকে প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া আপনার অনুজ্ঞা প্রচার করেন, তাহা মানিয়া চলাই ধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম একটী বিশেষ ভাগবতধর্ম্ম। ঈশার ভিতর দিয়া না গেলে ঈশ্বরকে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুত্রের ভিতর দিয়া না গেলে পিতাকে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম একটী বিশিষ্ট ভাগবত ধর্ম্ম। বিষ্ণুর নানা অবতার আছে, তন্মধ্যে রাম ও শ্রীকৃষ্ণই প্রধান। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার। তারপর আজকাল অনেক বাঙ্গালী পরমহংস রামকৃষ্ণকে ভগবানের পূর্ণাবতার মনে করেন। এরূপ ভক্তিবাদকে ভাগবত ধর্ম্ম বলা যায়। ইঁহারা কোনও নরদেহধারী ভগবান্, কোনও বিশিষ্ট গুরু বা কোনও গ্রন্থের শরণাপন্ন হন; এবং মনে করেন, এসব উপায় অবলম্বন না করিলে, কেহ সাক্ষাদ্ভাবে অনন্তের দর্শন লাভ করিতে পারেন না। এই সব অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মসান্নিধ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ হয়। ধর্ম্মের আর অন্যপথ নাই। বাইবেল, গীতা ও ভাগবত গ্রন্থের মোটামুটী এই শিক্ষা।

কিন্তু উপনিষদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও কোরাণে আমরা যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই, তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। আরবদেশে হজরত মহম্মদ সকল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাকে অনন্তের ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত, কোরাণ ও বাইবেল গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, এই অনন্তের উপাসনাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অনন্তের উপাসনা ব্যতীত অমৃতত্বের আর দ্বিতীয় উপায় নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শিক্ষা। পরমাত্মাকে না জানিলে, দেবদেবী, বিগ্রহাদি ও অন্য কোন বস্তু জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পরিচয়েই সকলের পরিচয়, প্রাচীন বেদান্ত ও নানাদেশীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শিক্ষা।

ভাগবতধর্ম্মাবলম্বীরা ও ব্রহ্মবাদীরা অনন্ত ঈশ্বরকে মানেন। কেহ মনে করেন, তিনি চিন্ময়; কেহ মনে করেন, তিনি চিন্ময় হইলেও মৃন্ময় হইতে পারেন, নরদেহও ধারণ করিতে পারেন। ইঁহাদের ভিতর কত বিরোধ, তাহা আমরা চারিদিকেই দেখিতেছি। তবুও ইঁহাদের ভিতর গভীর মিল এই যে, উভয়ই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। কিন্তু এ দুটী ছাড়া ধর্ম্মের আরো একটী বিশিষ্টরূপ আছে, তাহাকে মানবধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। অনেক মানবধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করেন, ভগবদ্‌ভক্তি ভ্রান্তিপ্রসূত; নরহিতসাধনই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম। তাই সকল মন্দির, সকল মস্‌জিদ, সকল গির্জ্জা উঠাইয়া দিয়া, সকল পূজা উপাসনা দূরে ফেলিয়া, যেখানে দুঃখী, রোগী, শোকী দুঃখসাগরে ভাসিতেছে—তাহাদিগকে দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমাদের দেশে বুদ্ধের সময়ে তাঁহার মতাবলম্বীরা এই মানবধর্ম্মের সাধন করিতেন। আজকাল রুশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে এই মানবধর্ম্মের প্রসার দেখিতে পাইতেছি। ইঁহাদের অনেকে মনে করেন, ভাগবত ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত কাঁপাইয়া চীৎকার করিতেছেন, 'God is dead ; Long live humanity.' ঈশ্বর বিদায় গ্রহণ করুন, মানুষ আপনার মহত্ত্ব আপনি বুঝিয়া লইয়া, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদির দ্বারা আপনাদের দুঃখ দূর করিয়া—পৃথিবীতে স্বাস্থ্য, সভ্যতা ও শান্তি লাভ করুন। ইহার নাম ইহসর্ব্বস্ববাদ বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম ও মানবধর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গমে দাঁড়াইয়া, আপনার অসামান্য প্রতিভাবলে এই ত্রিধারার অন্তর্নিহিত যোগ দেখিয়া—ইহাদের সামঞ্জস্যের ভূমি দেখাইয়া গিয়াছেন। এ যুগের ধর্ম্মের বিজ্ঞানে ও দর্শনে ইহাই তাঁহার এক বিশেষ দান।

তাঁহার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্মের মিলন দেখিতে না পাইয়া, প্রাচীন ব্রাহ্মেরা সরিয়া দাঁড়াইলেন। এই মিলনকে তিনি সেবকের নিবেদনের এক উপদেশে বেদান্ত ও পুরাণের উদ্বাহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিরূপে অনন্তের উপাসনা ও ভক্তভক্তির মিলন হইতে পারে, তাহা যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহাদিগকে সবিনয়ে ব্রহ্মানন্দের প্রদত্ত "এক কি তেত্রিশকোটী" শীর্ষক উপদেশটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিতে বলি। পিতৃভক্তির সহিত যদি এ সংসারে ভ্রাতৃভক্তির বিরোধ না থাকে, ধর্ম্মজগতে ঈশ্বরভক্তির সহিত ভক্তভক্তির বিরোধ আছে, একথা কেন স্বীকার করিব? তাই ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানের সহিত, ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধ ও ঋষিদিগকে ভক্তি ও অনুকরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। ভক্তদিগকে ভক্তি করিয়া তাঁহার ব্রহ্মভক্তি সরস মধুর হইল। আর ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরসপানে, তাঁহার দৃষ্টি, হৃদয় ও ইচ্ছা রূপান্তরিত হইয়া ও পবিত্রতা লাভ করিল; নূতন দৃষ্টিতে ও নূতন প্রাণে তিনি ভক্তদলকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাকে পৌত্তলিকতা, গুরুবাদ, অবতারবাদ হইতে রক্ষা করিল, এবং সাধুভক্তি তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদ, কঠোরতা, সংসারবিমুখীনতা এবং ধর্ম্মের শুষ্কতা হইতে রক্ষা করিল।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে মিলিত হইয়া, তাঁহার শক্তি, ইচ্ছা, সৎসাহসকে দৈবশক্তি প্রদান করিল—তাঁহাকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নিষ্কামী বীররূপে তাঁহাকে বিপুলতর ও গভীরতর মানবধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিল—যাহার প্রবল স্রোতের নিকট ভগবদ্‌বিশ্বাসবিহীন মানবধর্ম্ম ক্ষীণকায়া স্বল্পতোয়া নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাই তাঁহার মানবধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ইহলোক প্লাবিত করিয়া সেই অমরলোকে অমৃতধারার সহিত মিলিত হইল। আসুন, আমরা এই সপ্তাহে এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নাত হইয়া, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করি, ভক্তদলের শরণ গ্রহণ করি, বিধানের শরণ গ্রহণ করি।

স্বর্গীয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২৪শে নবেম্বর, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

পিতামহ—স্বর্গীয় গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়

মাতামহ—স্বর্গীয় রামানন্দ মুখোপাধ্যায়

পিতা—স্বর্গীয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সকল পূর্ব্ব পুরুষদিগকে এবং অগ্রজ অগ্রজাদিগকে আজ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করি।

আমাদের পিতা, পিতামহদিগের নিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত হালিসহর গ্রামে। কিন্তু আমাদের জন্মভূমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে। আমাদের পিতৃবংশীয়েরা উচ্চ শ্রেণীর

কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণপরিবারে কৌলীন্যের বিশেষ মর্য্যাদা ছিল। বিবাহানুষ্ঠানে এই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণেরা যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন। মেহেরপুরে আমাদের মাতামহের এবং মাতুলদিগের নিবাস।

ইঁহারা ধনী জমিদার ছিলেন। মেহেরপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবার প্রসিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠান্বিত। এই পরিবারে কৌলীন্যের অনুযায়ী আমার পূজনীয় পিতৃদেবের বিবাহ হয়। বিবাহের পর পিতৃদেব ঘরজামাই হইয়া আমাদের মাতুলদিগের জমিদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। আমাদের মাতুলদিগের সে সময়ে নীলের কুঠি ছিল। অনুমিত ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেব নীল বিক্রয় করিবার জন্য নৌকাযোগে কলিকাতা প্রেরিত হন। ফিরিবার সময় কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বৈশাখের প্রথম দিবসে ত্রিবেণী ভাগীরথীর বক্ষে মানবলীলা সম্বরণ করেন। আমি তখন মাতৃগর্ভে এবং আমার দাদা মহাশয়ের বয়ঃক্রম তখন অনুমিত প্রায় চারিবৎসর হইবে। আমাদিগের পরিবারে আমরা সর্ব্বসমেত চারিভাই এবং তিন ভগ্নী ছিলাম। জ্যেষ্ঠ ভাই সীতানাথ পিতাঠাকুরের পরলোকগমনের কিছু পূর্ব্বে পরলোকগমন করেন। সেজন্য আমাদের পিতামাতা একান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। বজ্রাঘাতের পর পুনঃ বজ্রাঘাত হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগে শোকার্ত্তা মাতা আবার বিধবা হইলেন। নিদারুণ শোকার্ত্তা মাতার গর্ভ হইতে আমি জন্মলাভ করিয়াছিলাম।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপূজার পর শারদীয় পূর্ণিমার দিনে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। তখন মাতাঠাকুরাণীর তিন পুত্র, তিন কন্যা বর্ত্তমান। এই ছয়টি সন্তানকে শোকার্ত্তা বিধবা মাতা প্রতিপালন করিতেছিলেন। আমার বয়ঃক্রম যখন প্রায় আড়াই বৎসর, তখন মাতৃদেবী উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। আমরা ছয়টি ভাই বোন একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় সংসারে পড়িয়া রহিলাম। তখন দাদা মহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় ছয় বৎসর হইবে। হিন্দুসমাজের তৎসময়ের প্রথা অনুসারে মাতাঠাকুরাণীকে অন্তিমকালে গঙ্গাযাত্রা করা হয়। আমি তখন তাঁহার বক্ষের শিশু। জোর করে তাঁর বক্ষ হতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেওয়া হইল। আমার মাতৃদেবীর নাম সরস্বতী ছিল, সরস্বতী দেবীর বিসর্জ্জনের দিনেই তাঁহার বিসর্জ্জন হইয়াছিল। আমরা ছয়টী ভাই বোন একটি আদর্শ দুঃখী পরিবাররূপে সংসারে রহিলাম। সকলেই আমাদের দুঃখে দুঃখী হইলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে দুঃখী দেখিয়া, সকলেই "দুঃখী" নাম আমাকে দিলেন। আমি বাল্যকালে সমাজে সকলের মধ্যে "দুঃখী" নামেই অভিহিত হইতাম। দুঃখই আমাদের পরিবারে ভগবানের বিশেষ মঙ্গল বিধান। দুঃখই আমাদের জীবনের পত্তনভূমি এবং বিশেষত্ব। এই পত্তনভূমির উপরই আমাদের জীবন গঠিত হইয়াছে। এখন মঙ্গলময় বিধাতার বিধান-মাহাত্ম্য পরিষ্কার বুঝিতেছি, তাঁহার আধ্যাত্মিক Economics-এর কখন ভুল হয় না। দুঃখের পত্তনের উপরে সুখের অট্টালিকা বিধাতা গঠন করিয়াছেন। আমরা এখন পরম সুখী। সে সুখ সামান্য সুখ নহে। আমরা অনাময় হরিসুখে সুখী হইয়াছি। ব্রহ্মানন্দের সন্ধান পাইয়াছি। মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের সময় আমরা যে ছ'টি ভাই বোন ছিলাম, তাহার পর কালক্রমে আরও দুটী ভাই বোন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তখন আমরা দুইটী ভাই, দুই ভগ্নী সংসারে রহিলাম। আমরা চারিজন জড়িত ছিলাম এবং তাঁহাদের সন্তানাদি আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন। আমাদের মাতৃতুল্য মাতুলানী আমাদের সকলকে প্রতিপালন করেন। তাঁহার পরলোকগমনে দাদা মহাশয়ের উপর আমাদের সকলের প্রতিপালনের ভার আসিয়া পড়ে। তিনি যে কত স্নেহ যত্নে আমাদের সকলকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। আমরা দুটি ভাই চিরদিন অভিন্নহৃদয় এবং একাত্মা।

অদ্য এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে পবিত্রাত্মাতে তাঁর সঙ্গে আরও একাত্মা হই। তিনি যে কেবল আমার দাদা ছিলেন, তাহা নহে; তিনি এই চিরপিতৃমাতৃহীনের পিতামাতার স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কেবল প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা নহে; আমার বায়সাধ্য শিক্ষার সকল ভার তিনি একান্ত গরিব হইয়াও লইয়াছিলেন। আমাকে একদিনের জন্যও কোন অভাব বোধ করিতে দেন নাই। আমার সঙ্গে তাঁর চিরদিন হৃদয় ও আত্মার আদান প্রদান হইয়াছে।

অনুমিত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন আমি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করি এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করি, তাহাতে দাদা মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হন; কিন্তু আমার উপর কখন রাগ করেন নাই। পরে ৫।৬ বৎসর হিন্দুসমাজে থাকিয়াও আমাকে প্রতিপালন করেন। সুচারুভাবে আমার মেডিকেল কলেজে পড়ার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার সৌহার্দ্দ্য এবং গভীর সহানুভূতি কখন কোন কারণে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরে যখন আমি মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুরে প্র্যাকটিস করিতে আসি, তিনি সপরিবারে আমাদের সহিত যোগদান করেন। বর্ত্তমান জলা-বাঙ্গালার গৃহে আমরা সকলে একত্রে বাস করি।

এই সময় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় স্থানীয় আচার্য্যরূপে ভাগলপুরে থাকিতেন। আমাদের জলা-বাঙ্গলার গৃহে প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপাসনা হইত। দাদা মহাশয় যোগদান করিতেন। এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মসমাজে সপরিবারে যোগদান করেন। যোগদান করিয়া নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত চিরদিন ধর্ম্মব্রত পালন করিয়াছেন। আজ এই তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে প্রিয়দর্শন তাঁর পুত্র, পৌত্র ও

পৌত্রীগণ কত উৎসাহ, অনুরাগ ও বিশ্বাসের সহিত কত আয়োজন করিতেছেন এবং যোগদান করিতেছেন।

আমাদের পিতামহ পরম যোগী বৈরাগী ছিলেন। শুনিয়াছি, সাংসারিক জীবনেই কৃচ্ছ্রযোগ সাধন করিতেন; অবশেষে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তৎপরে নিরুদ্দেশ হইয়া যান। আমাদের মাতামহ পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার গৃহে তিনি গোপাল এবং পাদপদ্মের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অনুরাগ ও ভক্তির সহিত পূজা অর্চ্চনাতে সদা মগ্ন থাকিতেন। মনে হয়, আমাদের পিতামহের এবং মাতামহের যোগ, বৈরাগ্য, ভক্তিভাবের আমরা কথঞ্চিৎ উত্তরাধিকারী হইয়াছি।

হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বপ্রাণ! তোমার দুরবগাহ মর্ম্ম হতে আমার দাদা মহাশয়ের জীবন-পরমায়ু উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তোমারই বিশ্বরক্ষার মঙ্গল বিধানে নব্বই বৎসরের অধিককাল জীবন ধারণ করিয়া, তোমাতেই সেই জীবন-পরমায়ু বিলীন হইল। তুমি তাঁহার অন্তরে এবং জীবনে কত সদ্‌গুণ এবং সৎকার্য্য বিকশিত করিলে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে, হে মঙ্গলময় বিধাতা, কত মঙ্গল বিধান করিলে এবং অন্তিমে তোমারই শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে।

তাঁর স্থানটুকু এই পৃথিবীতে এখন শূন্য এবং নীরব। তিনি বাহু প্রসারিত করিয়া সময়ে সময়ে ঘোর যন্ত্রণার মধ্যে "আনন্দম্ আনন্দম্" বলিয়া তোমাকে ডাকিতেন। আমরা তাঁর পুণ্যকান্তি মূর্ত্তি আর এখানে দেখিব না, তাঁর বাণী শুনিব না। আমরা যে তাঁর একটু সেবা শুশ্রূষা করিতাম, তাহা আর করিবার রহিল না। জলন্ত হুতাশনে বিসর্জ্জন করিয়া, তাঁর পুণ্যদেহের এক মুষ্টি ভস্ম আমরা গৃহে ফিরিয়া আনিলাম।

এই যে গম্ভীর পবিত্র নীরব শূন্যতা তাঁর পার্থিব স্থানকে অধিকার করিল, তাহা কি পূর্ণ হয় না? তবে এই পবিত্র শোক আমাদের সকলের অন্তরে বিধান করিলে কেন? শোক যে তোমার প্রেমের পবিত্র অঙ্গীকার; তোমার অঙ্গীকার তুমি আজ পূর্ণ কর। হে বিশ্বরূপ, তোমার এই বিশ্বে যাহা আছে, তাহা আছেই; 'নাই নাই' যে আমরা মনে করি, তাহা আমাদের অজ্ঞানতা মাত্র। তাই আমরা আমাদের অন্তরের শোক তোমার চরণে কাতরে নিবেদন করি; তুমি আমাদের পিতার এবং দাদা মহাশয়ের এই পবিত্র গম্ভীর শূন্য স্থান আমাদের অন্তরে পূর্ণ কর। আমাদের অন্তরে তিনি যেমন ছিলেন, তেমন থাকুন। তোমার বিশ্বে কোথায়ও বিনাশ নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র বিকাশ। সেই বিকাশ আমাদের অন্তরে দিয়ে, অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ কর এবং সান্ত্বনা দান কর। তাঁহার মহান্ আত্মাকে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি এবং যে স্বর্গে তিনি গেলেন, সকল স্বর্গীয়দিগকে নমস্কার করি। পূর্ব্ব পুরুষদিগকে নমস্কার করি। হে বিশ্বরূপ বিশ্বজীবন, তোমাতেই ত সব। সর্ব্বোপরি তোমাকে ভক্তি বিশ্বাসের সহিত বার বার নমস্কার করি।

শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—•—

মেজদা স্বর্গীয় ডাঃ সুধেন্দুকুমার দাস

(৮ই নবেম্বর, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আজ কত কথাই না আমাদের মনে হইতেছে। আজ কত ছোট ঘটনা, কত ছোট কথা, কত ছোট খাটো কাজ, আজ মেজদার জীবনকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে! আজ আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের দিন। সে শ্রদ্ধা কত ঘটনার ভেতর দিয়ে আজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে।

সেই সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ আজ নাই। আমরা তো কখনও ভাবিতে পারি নাই যে, এত অল্প দিনের অসুখে এমন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। দুঃখকে, শারীরিক কষ্টকে তিনি কখনও কষ্ট মনে করিতেন না—কতলোকের দুঃখ কষ্টকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বিনা দ্বিধায় কত জনের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন—নিজের কথা একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই। আর নিজে স্বল্প কয়েক দিনের অসুখে এমন করিয়া চলিয়া যাইবেন, এ কথা কি আমরা ভাবিতে পারিয়াছিলাম? মনে হয়, যেন নিজের জন্য অন্য কাহাকেও কষ্ট সহিতে না হয়, এই ইচ্ছাও ভগবান তাঁহার পূর্ণ করিয়াছেন।

আমাদের পরিবারে মেজদা বিদ্যাবত্তায়, তেজস্বিতায় ও স্বাধীন চিত্তের নির্ভীকতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায়ই একদিকে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অন্যদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহাকে সাধারণ শিক্ষার্থী হইতে বহু ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছিল। "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ" তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। পাঠে এত তন্ময়তা সচরাচর দেখা যায় না। আমি মেজদা হইতে দুই বৎসরের ছোট। ছেলে বেলায় বিদ্যার্জ্জনে যে inspiration তাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছি, আজ তাহা মনে পড়ে। মেজদার বয়স যখন দশ বৎসরেরও কম, তখন তাঁহাকে তন্ময়তার সহিত "আনন্দমঠ" পাঠ করিতে দেখিয়াছি। জলপাইগুড়িতে সমগ্র স্কুলের ভেতর প্রবন্ধরচনায় তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল "রামায়ণের কথা"। স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মহাশয় সে প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রিতে তিনি পাঠে এত তন্ময় হইতেন যে, একদিন একটি বিকৃতমস্তিষ্ক লোক তাঁহার নিকট বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারে নাই। আহারের জন্য মা যখন ডাকিতে আসিয়াছেন, তখন দেখিয়াছেন যে, মেজদা পাঠে তন্ময় এবং তাঁহার পাশে অজানা ও অচেনা একটী পাগল দাঁড়াইয়া। বাংলা প্রবন্ধ ও কবিতা-রচনায় মেজদার অসামান্য দক্ষতা ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেজদা যখন কলিকাতা Scottish Churches College এ পড়িতেন, তখন রাজপুত ইতিহাসের অনেক কাহিনী সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে, কিন্তু বাংলা ভাষায় তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বীর মল্ল ও ধাত্রী পান্নার কবিতা আমার এখনও মনে আছে। অনেক অনুরোধ করিয়াও

তাঁহাকে সে কবিতা ছাপাইতে সম্মত করাইতে পারি নাই। বিনয়ের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন যে, কবিতাগুলি ছাপাইবার উপযুক্ত হয় নাই। বিদ্যার অহঙ্কার তাঁহার ছিল না। পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি কখনও করিতেন না। কিন্তু যে মত মনে মনে সত্য বলিয়া মানিয়াছেন, তাহার জন্ম প্রাণপণ লড়িতেন। স্কটিশচার্চ্চ কলেজে আই,এ, পড়িবার সময় তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মুগ্ধ হন। একবার ছুটীর সময় "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" আমাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সে কথা আজ মনে পড়িতেছে। কি গভীর ভাবের সহিত পড়িয়াছিলেন—"আজিকে প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের 'পর।" যে আলোর সন্ধান তখন তাঁহাকে তন্ময় করিয়াছিল, সে আলোর ধারা তো আজ তাঁহার জীবনে চিরন্তন বহিতেছে। বড় হইয়া একবার মেজদা, আমি ও ডাঃ খাস্তগীর কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। মেজদা তখন বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি গীতাঞ্জলির কয়েকটী কবিতা সহজ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন—তাহা তখন আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে যখন টোলে পড়িতেন, তখন অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন, গীতাঞ্জলির কবিতা সব সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে।

সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল এবং ততোধিক ছিল পাণ্ডিত্য। ছাত্রাবস্থার প্রথম ভাগে তাঁহার সাহিত্যে আকর্ষণ ছিল এবং স্বর্গগত অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় মোহিত বাবুর সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" কবিতাগুলি বার বার পড়িতেন। আরও অধিক বয়সে তিনি সংস্কৃত দর্শনে মগ্ন হইয়াছিলেন এবং ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের তত্ত্বোদ্ঘাটনে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিলাতে অধ্যয়ন কালেও তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল, "Divine Sakti." প্রবন্ধটি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং Dr. Barnett ও Justice Woodroffe প্রমুখ পণ্ডিতজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বেদান্তদর্শনের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, বিশেষতঃ শঙ্করের অদ্বৈতবাদে। আমরা দুই ভাই কেশব নিকেতনে থাকিয়া যখন কলেজে পড়িতাম, মনে পড়ে, শ্রদ্ধেয় যামিনীকান্ত কোঁয়ার মহাশয় আমাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"The two turbulent grandsons of Banga Babu."—কারণ, মতের স্বাধীনতা তখন হইতেই মেজদার ছিল।

পরম পূজনীয় দাদাম'শায়ের সাথে মেজদার প্রায়ই বেদান্তদর্শনের আলোচনা হইত। দাদাম'শায় একবার ঠাট্টা করিয়া মেজদাকে বলিয়াছিলেন যে, যে দর্শন জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ মানে না, সে আবার দর্শন কি? দাদা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিলেন—"তা কেন? বেদান্ত শুধু তো মায়াবাদ নয়। বেদান্ত দুই রকম সত্তাকে মানে, এক ব্যবহারিক সত্তা ও দুই পারমার্থিক সত্তা। ব্যবহারিক সত্তা ছাড়িয়া তো জীবন চলে না; কিন্তু যে জীবন ব্যবহারিক সত্তার উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার আর প্রভেদ কোথায়?" আজ ব্যবহারিক সত্তার বন্ধন মেজদার কাটিয়া গিয়াছে। আর তো কোনও প্রভেদ তোমার নাই! শক্তি দর্শনের ব্যাখ্যায় তাই তুমি লিখিয়াছিলে—"He into whose self all the Gods such as Brahma, Vishnu etc. and all the branches of Scriptural learning such as the Vedas, the Agamas etc. dissolve and again come out is the Lingam, the Highest Brahma."

সাধারণ সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতেন না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অনুযোগ দিয়াছেন; কিন্তু নববিধানের পবিত্র আদর্শ তাঁহার জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল—"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং, চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।"

পাঠ্যাবস্থায় সমপাঠীরা মাঝে মাঝে মেজদাকে "দধীচি" মুনি বলিয়া ডাকিতেন। কারণ, পাঠে পরিশ্রমের সীমা ছিল না। অতি অল্প বয়সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি অমরকোষ মুখস্থ করিয়াছিলেন।

শুধু যে মানসিক পরিশ্রমই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল, তাহা নয়। শারীরিক পরিশ্রমেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর বিহার অঞ্চল যখন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়, তখন মেজদা কৃষ্ণনগরের ছাত্রদলের নেতা হইয়া মজঃফরপুরে গিয়াছিলেন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আর্ত্তের সেবা করিয়াছিলেন। নিজহস্তে ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করিয়া মৃতদেহ উত্তোলন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ভয় তাঁহার ছিল না বলিলেও হয়। ছেলেবেলায় ঢাকার Engineering College র সু-উচ্চ Chimney বাহিয়া তিনি অকুতোভয়ে উপরে উঠিয়া গিয়াছেন—আমরা ভীত চকিতহৃদয়ে নীচে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি। নির্ভীকতা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যাইতে পারে, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।" মিথ্যা কিম্বা লাঞ্ছনা যেখানে আক্রমণ করিয়াছে, সেখানে তিনি পুরুষসিংহের ন্যায় অমিতবিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এ সাহসের জন্য অনেকবার তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তবুও তিনি দমিত হন নাই। আমি যখন মধুপুরীতে, তখন মেজদা একবার পাটনা গিয়াছিলেন—পাটনা কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ খালি হইয়াছিল—সেই পদলাভের চেষ্টায়। কলেজের Principal ছিলেন Mr. Jackson. তাঁহার সাথে appointment এ সময় ঠিক করা হইয়াছিল। দাদা ঠিক সেই সময় গিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব দাদাকে প্রায় ২০ মিনিট বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। দাদা তৎক্ষণাৎ সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তোমার চাকরীর আমার দরকার নাই, আমি অবমানিত হইবার জন্য আসি নাই। সেই চিঠি পাইয়া সাহেব দাদার কাছে apology চাহিয়াছিলেন। আমি এই গল্প শুনিয়া দাদাকে tactless বলিয়াছিলাম। দাদা

হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আমি কুলিগিরি করিয়া খাইতেও প্রস্তুত, কিন্তু আত্মমর্য্যাদা হারাইতে পারি না।" কত সময় মনে হইয়াছে, সাফল্যের চাতুর্য্য, বোধ হয়, দাদার নাই; কিন্তু আজ বুঝিতেছি, চাতুর্য্য ও চরিত্রের দৃঢ়তায় কত প্রভেদ—সংসারের মাপকাঠিতে কি আমরা অমৃতের অধিকারীকে মাপিব?

চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার আরও কথা মনে পড়িতেছে। বিলাত হইতে আসিয়াও তিনি বিলাতফেরত হইয়া যান নাই। সেই নিরাড়ম্বর বাঙ্গালী বেশভূষাই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। কয়েক বৎসর আগে His Excellency the Governor যখন কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণনগরে কলেজ হলে দরবার হইয়াছিল। দরবারে হয় কোটপ্যান্ট কিম্বা চোগাচাপকান পরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু দাদাই Dist. Magistrateকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি বাঙ্গালী বেশভূষা পরিয়া যাইতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাকে সেই বেশভূষায় দরবারে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই কথা দাদার কাছে আমি শুনিয়াছি। এমন নিরহঙ্কার জীবন খুব কম দেখা যায়। কৃষ্ণনগরে আপামর সাধারণের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল এবং সকলের শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সামাজিক প্রভেদকে তিনি কখনও বড় করিয়া দেখিতেন না। অমুকের সহিত মিশিব না, অমুকের সহিত মিশিব, এ ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। তাই ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলের সাথেই তিনি মিশিতেন। সকলের কাছেই তিনি ছিলেন, "ডাক্তার দাস"। একবার শিলং এ অবস্থানকালে আমার এক চাকর মেজদাকে মেডিকেল ডাক্তার মনে করিয়াছিল। দাদা সেই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ তো, আমি Homœpathy study করে ঔষধ দেব, তাতে হয়তো নামটা সার্থক হবে।"

এমনি ভাবে সবার সাথে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও সহৃদয় ব্যবহার তাঁহাকে অনেকের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ঠিক এই গুণেই তিনি ছাত্রসমাজের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্র ও শিক্ষকের artificial ব্যবধান মানিতেন না এবং ছাত্রদের সাথে সহজ, সরল ভাবে মিশিতেন। অসুখের সময়ও কত ছাত্র তাঁহার খোঁজ লইয়াছেন ও তাঁহার কাছে পড়িবার আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আজ যে বেদনা-ভার আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, তাহা যে কত লোকে বাঁটিয়া লইয়াছেন, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? আমাদের তো কত সময় মনে হয় যে, মেজদার কত আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—মনে হয়, উন্নতির পথে চলিতে চলিতে কেন মর্ম্মান্তিক ডাক আসিল! ক্ষুদ্র আমরা, সসীম আমাদের দৃষ্টি। অল্প লইয়া থাকি, তাই মনে হয়, যাহা যায়, তাহা যায়; কিন্তু মেজদাই তো কতবার বলিয়াছেন যে, জীবনপ্রবাহ যে শুধু অনাদি, তা নয়—সে প্রবাহ যে অনন্ত। তবে আর সীমার কথা কেন ভাবি, খণ্ডবুদ্ধির মূঢ়তায় কেন দুঃখ করি। তোমার আরব্ধ কাজ এখানে যেমন শেষ হয় নাই এবং হইতে পারে না, তেমনি সেখানেও তাহা কত নব নব শুভ পথে চলিবে, তাহা কে বলিতে পারে।

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

তুমি কত সম্পদ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছ—এ পরিবারে তুমি আমাদের অগ্রজ ও কত বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলে। আজো তুমি আমাদের পথ দেখাইবার জন্য আগে চলিয়া গিয়াছ। তোমার জীবন-বর্ত্তিকা সেই সীমান্তের পথ আমাদের কাছে উজ্জ্বল করিয়া তুলুক। সেই অখণ্ড দৃষ্টি লাভ করিয়া আমরা ধন্য হই ও বলি—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"সুধাংশু"

—০—

শারদীয় উৎসব

শারদীয় উৎসব হিন্দুর জাতীয় জীবনের বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি। নববিধান জাতীয় বিধান। তাই এ উৎসব শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার সহপ্রেরিতবর্গের বড় আদরের উৎসব।

এবার সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এই চারিদিনের প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে উপাসনা হইয়াছে। সপ্তমী ও নবমী এই দুইদিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, অষ্টমী ও দশমী এই দুই দিন ভাই অক্ষয়কুমার লধ নবদেবালয়ে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। উপাসনাকালে শ্রীমদাচার্য্যদেবের কৃত শারদীয় উৎসবের প্রার্থনা পঠিত হইয়াছে। নবমীর দিন নবদেবালয়ে উপাসনার পর নবদেবালয়ে উপস্থিত সকলকে এবং মঙ্গলপাড়ার ও শান্তি-কুটীরের অনুপস্থিত মণ্ডলীসংক্রান্ত প্রায় সকলকেই মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এ তিন দিন সন্ধ্যায় সঙ্গীত, কীর্ত্তন, পাঠ, প্রসঙ্গাদি যথাসম্ভব হইয়াছিল। সপ্তমীর দিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠ প্রসঙ্গ করেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীত করেন। অষ্টমীর দিন ভাই অক্ষয়কুমার লধের নেতৃত্বে "জয় মাতঃ, জয় মাতঃ" আরতির

কীর্ত্তনটী প্রথমে গীত হয়; তৎপর ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠের কার্য্য করেন। রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় নববিধানে জাতীয় ভাবের ও সার্ব্বজনীন ভাবের সামঞ্জস্যসাধন বিষয়ে মধুর ও সারগর্ভ প্রসঙ্গ করেন। শেষ সঙ্গীত দ্বারা এই দিনের কার্য্য শেষ হয়। নবমীর দিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠ করেন, তৎপর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাতৃপূজা সম্বন্ধে সুন্দর প্রসঙ্গ করেন। সে বিষয়ে গোপালচন্দ্র গুহও কিছু বলেন। স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রচারক ভাই কালীশঙ্কর দাসের পৌত্র শ্রীমান্ সুনীলকুমার দাস এদিন পূর্ব্বাপর মধুর সঙ্গীত করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন। তৎপর দশমীর দিন রবিবার সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার শান্তিবাচনে উৎসবের শান্তিবাচন হয়; ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এবার অযাচিতভাবে পিনমানার ম্যাড্‌ভোকেট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার শারদীয় উৎসবের জন্য ১০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সংবাদ।

জন্মোৎসব—গত ১৯শে নবেম্বর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অষ্টনবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন; ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠের সহায়তা করেন। অপরাহ্ণে ৪টার পর শান্তিকুটীরে আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশের নেতৃত্বে "কল্পতরু" হয়। "কল্পতরু"র সঙ্গীতটী গীত হইলে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। তৎপর বালকবালিকাদিগকে খেলানা ও মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হয়। ২০শে নবেম্বর, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও বঙ্গদেশ" বিষয়ে অমিয়ময় ভাষায় প্রাণস্পর্শী সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। ২১শে নবেম্বর, সন্ধ্যার পর কলুটোলায় ব্রহ্মানন্দের জন্মভবনে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ভক্তিরসাত্মক কীর্ত্তন করেন।

জন্মদিন—গত ১২ই কার্ত্তিক, সায়ংকালে অমরাগড়ী বিধানকুটীরে শ্রীমান্ সুব্রতানন্দের জন্মতিথিতে এবং ১৩ই কার্ত্তিক প্রাতে জয়পুর ফকিরদাস হাই স্কুলে ও সায়ংকালে অমরাগড়ী বিধানকুটীরস্থ সমাধিমন্দিরে স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাসের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ২৮শে অক্টোবর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের জন্মদিনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জন্মদিনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন।

গত ২৩শে নবেম্বর, ৫১নং মাণিকতলা স্পারে, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্রের গৃহে, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী গৌরীর জন্মদিনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা ও অনুকূলবাবু প্রার্থনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৩০শে নবেম্বর, ২৪।৩ বাকির মির্জ্জাপুর রোডে শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দত্তের নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৯লা নবেম্বর জন্মগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে শিশুর মাতৃদেবী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন। জগজ্জননী শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ময়মনসিংহে, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চকদৌলত-নিবাসী স্বর্গীয় পঞ্চানন রায়ের চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের সহিত, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রেমরঞ্জন দাস গুপ্তের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী নমিতার শুভপরিণয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত এই অনুষ্ঠানে উপাসনাদির কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

স্বর্ণজুবিলী—কেশব একাডেমী স্কুলের স্বর্ণজুবিলী উৎসব গত ১৯শে নবেম্বর হইতে ২২শে নবেম্বর পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা উৎসবের বিবরণ হস্তগত হইলে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

উৎসব—গিরিধি নববিধানব্রহ্মমন্দিরের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় আরতি হয়; ভাই অক্ষয়কুমার লধ ব্রহ্মানন্দের আরতির প্রার্থনা পাঠ করেন। ২৭শে প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ, সন্ধ্যায় মহিলাদিগের উৎসবে আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী উপাসনা করেন। ২৮শে প্রাতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন এবং সন্ধ্যায় ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৪শে অগ্রহায়ণ, শান্তিকুটীরে, মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বর্গগত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উদ্বোধন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আরাধনা ও প্রার্থনা এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠাদি অনুষ্ঠানাংশ সম্পন্ন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পিতৃজীবনী ও প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকিপুরের পিতব্য ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত জীবনী পাঠ করেন। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষও কিছু বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় প্রেরিত প্রার্থনা ভাই অক্ষয়কুমার পাঠ করেন। ডাঃ পরেশবাবুর লিখিত জীবনী স্থানান্তরে দেওয়া গেল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে:—

পুত্র ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সমবেত দান:—

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, স্বর্গীয়

পিতার নামে মুঙ্গের ও ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরের রক্ষণ ও পোষণার্থ স্থায়ী ফণ্ড স্থাপন জন্য "নববিধান ট্রষ্টের হস্তে" ২৫০৲, "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে ১০৲, কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲, প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধনাশ্রমে ১০৲।

পৌত্র ডাঃ শচীকুমার, শ্রীমান্ সতীকুমার, শশিকুমার, সুশান্তকুমার, শ্রীশান্তকুমারের পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি :—

প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা করিয়া ২৫০৲ টাকা স্থায়ী ফণ্ডরূপে, ভাগলপুর ও মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের রক্ষণ ও পোষণার্থ, স্বর্গীয় পিতামহের নামে "নববিধান ট্রষ্টের হস্তে" এবং শ্রীমান্ সতীকুমার ৫০০৲ নববিধান প্রচারাশ্রম-গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে।

পৌত্রী শ্রীমতী সুধা, মাধবী, মালতী, মল্লিকা, বাণী, মন্দাকিনী, উমা, রমা, কল্যাণী ও পূর্ণিমা দেবী প্রত্যেকে ১০৲ করিয়া ১০০৲ টাকা নিম্নপ্রকারে :—

আতুরাশ্রমে ১০৲, অনাথাশ্রমে ১০৲, ভাগলপুর কুষ্ঠাশ্রমে ১০৲, নিমতা ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়ে ১০৲, Mahamedan orphanage ১০৲, Little Sisters of the poor ১০৲, Hiranand Kutir (Patna) ১০৲, ভগিনীসমিতি ১০৲, পুণ্যাশ্রম ১০৲, বালকদিগের নীতিবিদ্যালয়ে ৫৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ে ৫৲।

সর্ব্ব মোট ১১৬৫৲ টাকা। ভগবান্ এ দান সার্থক করুন।

সেবা—লক্ষ্ণৌর স্বর্গীয় ভুবনমোহন রায়ের পুত্রদ্বয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় প্রচারোদ্দেশে ঢাকা ও চট্টগ্রাম হইয়া রেঙ্গুনে গমন করেন। রেঙ্গুনে ১১ই অক্টোবর ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় বাংলায় উপাসনা করেন। রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার স্নেহভাজন শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার সুমধুর সংগীতে সকলকে তৃপ্ত করেন। "শ্রীকেশবের শ্রেষ্ঠদান—নববিধানের মধুর উপাসনা" সম্বন্ধে উপদেশ হয়। ১৬ই অক্টোবর ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় "Keshub's assimilation of Buddhism" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৮ই অক্টোবর ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় হিন্দীতে উপাসনা করেন। বহু হিন্দুস্থানী ও হিন্দিভাষীর সমাগম হয়। আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "নিরাকারই সত্য" হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া পাঠ করা হয়। উপদেশের বিষয় ছিল—"নববিধানে উপাসনা, উপাসক ও উপাস্য দেবতা নিরাকার—ঈশা, মুষা, মহম্মদ, গৌর, নানক ইত্যাদি সব নিরাকার।" হিন্দিতে সংগীত হয়। একদিন পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর গৃহে প্রীতিসম্মিলনে অধ্যাপক রায় বাইবেলের বিশেষ বিশেষ স্থলের সহিত পুরাণাদি শ্লোকের তুলনা করিয়া সামঞ্জস্য প্রমাণ করেন।

রাজর্ষির সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজর্ষি রামমোহনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু প্রাতে বাগনানের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে এবং অপরাহ্নে বাগনান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু বাগনানে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজে এবং সমবিশ্বাসীদের বাড়ীতে উপাসনাদিযোগে সেবা করিতেছেন।

পারলৌকিক—গত ১৪ই অক্টোবর, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্রের গৃহে, স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের আত্মার স্মরণার্থ, ১৬ই নবদেবালয়ে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই দীননাথ মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিনে, ২২শে ১৩২নং রাসবিহারী এভিনিউ গৃহে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের পিতৃদেব স্বর্গীয় রাধানাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, ২৩শে ৩৩বি গোয়াবাগান লেনে শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসুর গৃহে পরলোকগত নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের আত্মার স্মরণে, ৩০শে কলুটোলায় স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিকে, ৪ঠা নবেম্বর শান্তি-কুটীরে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, ৮ই মঙ্গল-পাড়ায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথের সাম্বৎসরিকে, ৯ই ৩৩বি গোয়াবাগান লেনে, শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসুর গৃহে স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের স্বর্গারোহণের প্রথম মাসিক স্মৃতি উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিকে কন্যা শ্রীমতী মাধবীবালা মল্লিক প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ২৫শে আশ্বিন, দেউলটী গ্রামে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া প্রতিভাসুন্দরীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন; পিতা প্রার্থনা করেন এবং প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা ও সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ১৲ টাকা দান করেন।

ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের মাণিকতলায় বাসভবনে, গত ১৬ই অক্টোবর, তাঁর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মিলিতভাবে উপাসনা করেন। এবং ২৩শে অক্টোবর, তাঁর পিসীমাতা স্বর্গীয়া ক্ষীরোদমোহিনী দেবীর সাম্বৎসরিকে ঢাকার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনাদি করেন।

গত ৩১শে অক্টোবর (১৪ই কার্ত্তিক), ৭৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

গত ১লা নবেম্বর (১৫ই কার্ত্তিক), ১৪০বি, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসু ও ডাঃ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় হিমাদ্রিভূষণ বসুর সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে দুই ভ্রাতা ২৲ টাকা করিয়া ৪৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। এই গৃহে গত ২৯শে নবেম্বর, ইঁহাদের পিতামহী, গৃহস্থ প্রচারক পরলোকগত কালীকুমার বসুর সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা দিনমণি দেবীর সাম্বৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ২৲ ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲, কন্যা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ১৲ ও শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দাস ২৲ এবং পৌত্রী শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ ১৲ প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ৫ই নবেম্বর (১৯শে কার্ত্তিক), ভবানীপুরে ৫।১ মাধব লেনে, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০শে নবেম্বর (৪ঠা অগ্রহায়ণ), ১১নং পদ্মনাথ লেনে, শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্তের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় যোগেন্দ্র-নারায়ণ গুপ্তের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৬শে নবেম্বর (১০ই অগ্রহায়ণ), ১২।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, অনাথাশ্রমে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৯শে নবেম্বর, নবদেবালয়ে ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় করুণাচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

পাটনার সংবাদ—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে দুর্গাপূজার কয়দিন শারদীয় উৎসবের ভাবে, ১০ই নবেম্বর কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর পুণ্য-স্মৃতিতে, ২৮শে অক্টোবর ও ২৮শে নবেম্বর, জামাতা স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের মাসিক স্মৃতিতে এবং ১৯শে নবেম্বর আচার্য্য-দেবের জন্মদিনে পারিবারিক উপাসনা হইয়াছে।

ঢাকার সংবাদ—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে বিধান-পল্লীস্থ দেবালয়ে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং মতিলাল দাস গুপ্ত নববিধানের ত্রিধারা—ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান—রাজর্ষি, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের জীবন একত্র সম্মিলিত করিয়া প্রার্থনা করেন এবং সন্ধ্যায় পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। রাজার ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই নববিধানের নূতন ধারা জগতে প্রবাহিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাই নিবেদনে প্রকাশিত হয়। গত ১লা অক্টোবর, প্রাতে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে ভক্তি-ভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের স্বর্গারোহণদিনে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস গুপ্ত উপাসনা ও শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় দেবালয়ে একটী ক্ষুদ্র সভা হয়। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস গুপ্ত ও ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্রের জীবনী বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় তাঁহার আত্মিক দান স্বীকারপূর্ব্বক প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজা রামমোহন সম্বন্ধে বেদী হইতে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া উপাসনা করেন। ৭ই নবেম্বর, স্বর্গীয় মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে, পবিত্র সমাধিপার্শ্বে উপাসনা এবং অপরাহ্নে দরিদ্রবিদায় হয়। ১০ই নবেম্বর, কেশবাশ্রমে মাননীয় মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পবিত্র সমাধিপার্শ্বে, স্বর্গীয়া মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে দরিদ্রবিদায় এবং সন্ধ্যায় ঐ সমাধিপার্শ্বে কীর্ত্তন হয়। ১৯শে নবেম্বর, অপরাহ্নে আচার্য্যদেবের জন্মদিনে কেশবা-শ্রমে উপাসনা, ২৩শে নবেম্বর, মহামান্য শ্রীমন্ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের জন্মতিথিতে প্রাতে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, তৎপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা হয়। মহেশবাবুই এই সমস্ত উপাসনাদি করেন।

পুস্তক-সংবাদ

কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য—"শিশু-ভারতীর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, রয়েল সাইজে মসৃণ কাগজে ইণ্ডিয়ান প্রেসে সুন্দররূপে মুদ্রিত অভিনব গ্রন্থ; মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, 'ইয়ং বেঙ্গলের' ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রধানতম নেতা, বঙ্গজননীর সুসন্তান, বিশ্বমানবতার অপূর্ব্ব প্রতীক, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাদীপ্ত, সর্ব্বসমন্বয়কারী অদ্ভুত-পূর্ব্ব জীবনচ্ছবি সুনিপুণ অঙ্কনসৌন্দর্য্যে অতীব মনোরম হইয়া, যোগেন্দ্রবাবুর শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে 'ইয়ং বেঙ্গলের' সম্মুখে উপস্থিত। এই শুভ মুহূর্ত্তে 'ইয়ং বেঙ্গল' বিস্মৃতির নিদ্রালস পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গলার নবোদিত গৌরব-সূর্য্যের নবলোকে নবজাগরণ ও নবজীবন লাভ করুন।

কোর্-আন্ শরীফ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুগামী, নববিধানের প্রেরিতপ্রচারক, মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেনের মূল আরবী কোর্-আন্ শরীফের সর্ব্বজনপ্রশংসিত অবিকল বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ, চতুর্থ সংস্করণ, রয়েল সাইজে ৭৫০ পৃষ্ঠায়, মসৃণ কাগজে সুবিখ্যাত আর্টপ্রেসে পরিপাটি ও পরিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কাপড়ে সুন্দর মজবুত বাঁধাই মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র। কলিকাতায় সকল পুস্তকালয়ে এবং অধ্যক্ষ, নববিধান পাব্লিকেশন কমিটী, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha,

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা।
১লা পৌষ, বুধবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ
16th. December, 1936
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বজনত্রাতা! এই পৃথিবীর তোমার পুত্র কন্যাদিগের জীবনে উচ্চগতি বিধান জন্য, তাহাদের জীবনকে স্বর্গের অপূর্ব্ব উপাদানে গঠন দান করিয়া, স্বর্গের গৌরব সৌরভে মণ্ডিত করিবার জন্য, তাহাদের জীবনে, গৃহ পরিবারে এবং সমাজে স্বর্গের জীবন্ত মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন জন্য, তুমি এই নবযুগে নবধর্ম্ম নববিধানে অপূর্ব্ব পূর্ণাঙ্গ উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, এবং এই পূর্ণাঙ্গ উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই উপাসনা শিক্ষা দিবার ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছ। ধন্য তোমার করুণা! এবার দীক্ষাগুরু তুমি, শিক্ষা-গুরু তুমি। কিন্তু দেখ, আমরা তোমাকে পরম গুরু-রূপে স্বীকার করিয়াও, সুশিষ্য হইয়া তোমার নিকট শিখিতেছি না, নিত্য পাঠ লইয়া পাঠাভ্যাস করিয়া তোমার নিকট পাঠের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছিনা। তুমি পাঠ দিতে সদাই প্রস্তুত। একটু আকাঙ্ক্ষার সহিত ঊর্দ্ধ-মুখে তাকাইলেই, একটু মনের দ্বার আমাদের খোলা পাইলেই, তুমি সদ্‌গুরুরূপে স্বর্গের সুন্দর পাঠ দিয়া থাক; কিন্তু আমরা পাঠ গ্রহণ করিয়া পাঠের আদর করিতেছিনা, পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হইতেছি না, তাই ধর্ম্মজীবনে আমাদের উন্নতি নাই, ঊর্দ্ধগতি নাই। তাই উপাসনার সরসতা নাই, গভীরতা নাই, উপাসনার সঞ্জীবনী শক্তি নাই। এই নব উপাসনা তুমি তোমার নব ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনেই সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত করিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। এই উপা-সনার ফলে তাঁহার জীবন হইয়াছিল অগ্নিময়, প্রভাবময়, সুকোমল, সরস, সুন্দর, হাস্যময়। সত্যই এই পূর্ণাঙ্গ উপাসনার একটী আধ্যাত্মিক আকার আছে, সে আকার তোমার হাতের গড়া। তাহার একটু কেহ খর্ব্ব করিতে পারিবে না, তুমি স্বয়ং তাহার বৃদ্ধি দান না করিলে কেহ বাড়াইতেও পারিবেনা, একটু রূপান্তর ভাবান্তরও করিতে পারিবে না। সে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর উপাসনার কথঞ্চিৎ স্ফুরণ হইলেও আমাদের শুষ্ক প্রাণ সরস হয়, সুন্দর হয়, সতেজ হয় এবং তাহার মহিমার সাক্ষ্য লাভ করিয়া আমরা চমকিত হই। আমাদের উপাসনাময় স্বর্গের প্রিয় মাঘোৎসব আগতপ্রায়। এ সময় তব চরণে কাতর প্রার্থনা, তুমি নিজ কৃপাগুণে তোমার প্রবর্ত্তিত এই নব উপাসনাকে আমাদের জীবনে নবভাবে মূর্ত্তিমান করিয়া তোল। উপাসনা সম্পর্কে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের জীবনকে উপাসনাময় কর, গৃহ পরিবারে উপাসনার সুগন্ধ বিস্তার কর। আমরা উপাসনার

সাজে সজ্জিত হইয়া যেন সমাগতপ্রায় মহা মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, উৎসব সাধন করিতে পারি, উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

সাকার ও নিরাকার

সাকার ও নিরাকার এই দুই লইয়া এই বিশ্ব। তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, নিরাকার পরম চৈতন্য যিনি, তিনি জড়কে অবলম্বন করিয়া, জড়কে উপায়রূপ গ্রহণ করিয়া এই বাহ্যজগৎ রচনা করিলেন, এই বাহ্য জগৎকে চৈতন্যের প্রকাশের ক্ষেত্র করিয়া এই বাহ্যজগতের ছোট বড় সকলের গঠন দান করিলেন। তাই গভীরতত্ত্বজ্ঞ তীক্ষ্নদৃষ্টিশীল ভারতের ঋষিগণ সাকারে অখণ্ড নিরাকারের দর্শন লাভ করিয়া, অখণ্ড নিরাকার চৈতন্যকে মানসপ্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাদের অমরবাণীতে ধ্বনি করিলেন, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" এই বাহ্য সাকার জগতের ছোট বড় সকল বস্তুই সেই অনন্ত চৈতন্য নিরাকার ঈশ্বরের আবাসস্থল, ইহা ঋষিদের বিজ্ঞানদৃষ্টির অমোঘ সাক্ষ্যদান। মানবসমাজের বাল্যস্তরে যখন মানবকুলে বিজ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয় নাই, মানবসমাজ যখন অস্ফুট জ্ঞানের বাল্য জীবন যাপন করিতেছিল, তখনও কি তাহারা সাকারে নিরাকার পরম চৈতন্যকে কোন না কোন আকারে স্বীকার করে নাই? তাহাদের সেই বাল্য জীবনের কার্য্যে আচরণে নিরাকার পরম চৈতন্যকে কোন না কোন আকারে প্রকাশ ও প্রচার করিতে প্রয়াস পায় নাই? জীব-চৈতন্য পরম চৈতন্যের সঙ্গ সহায়তার প্রয়োজন সর্ব্বদাই অনুভব করে; তাই মানবসমাজ আপনার অস্ফুট জ্ঞানের বাল্যাবস্থায় তাহার আপনার ধারণা করিবার যতদূর শক্তি, সে সেই ভাবে সাকারে নিরাকার পরম চৈতন্যকে স্বীকার করে, পরম চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে।

মানবসমাজের সেই বাল্যজীবনে বাহ্য সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপের অমানুষিক প্রভাবদর্শনে মানুষ সেই অমানুষিক প্রভাব মধ্যে দেবত্বের আরোপ করিল, এবং এই প্রচণ্ড উত্তাপময় সূর্য্যকে অমানুষিকশক্তিসম্পন্ন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিল, যিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকে নানাভাবে সহায়তা করিতে পারেন, নানা বিপদ, বিঘ্ন, পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। এইরূপে চন্দ্রের অসামান্য সুকোমল স্নিগ্ধ বিমলজ্যোতি দর্শনে তাহাতে দেবতার আরোপ, মেঘের অসামান্য শক্তি দর্শনে মেঘে দেবতার আরোপ, অগ্নির অসাধারণ শক্তি দর্শনে অগ্নিতে দেবতার অর্থাৎ পরম চৈতন্যের আরোপ, নদনদীর অসামান্য প্রভাব দর্শনে নদনদীতে দেবতা বা পরম চৈতন্যের আরোপ হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত হইতেছে, মানুষের প্রাণ অভাবে পড়িয়া একজন অসামান্য প্রাণময়, জ্ঞানময়, শক্তিময়, দয়াময়, ইচ্ছাময় ব্যক্তির সহায়তাই অন্বেষণ করে। স্বভাবের নিয়মে ক্ষুদ্র চৈতন্য পরম চৈতন্যকে চায়, পরম চৈতন্যের সহায়তা ভিক্ষা করে। সামান্য লোক সাকার শরীরের মধ্যে ক্ষুদ্র চৈতন্যরূপে, ক্ষুদ্র জ্ঞানময়, প্রাণময়, ইচ্ছাময় ব্যক্তিরূপে বাস করে। সে আপনি সাকারে নিরাকার চৈতন্য হইয়া আপনার সাকার শরীরকে ইচ্ছামত নিয়োগ ও পরিচালন করে; সে নিরাকার যন্ত্রী, সাকার শরীর তাহার হাতের যন্ত্র। সে নিরাকার জ্ঞানময় চৈতন্যরূপে তাহার সাকার দেহকে যথা ইচ্ছা পরিচালনা করে, সাকার শরীর তাহাকে পরিচালন করে না, করিতে পারে না; ইহা তাহার সকল সময় ভাবিয়া দেখিবার সময় হয় না, ইহা ভাবিবার শক্তিরও স্ফুরণ সকলের হয় না। যাহার ভাবিবার সময় হয়, বুঝিবার শক্তির স্ফুরণ হয়, সে বুঝিতে পারে, সাকার দেহের যাহা কিছু সব যন্ত্রবৎ কার্য্য করে, আর সাকারের অন্তরালে নিরাকার চৈতন্য পদার্থ যন্ত্রিরূপে দেহকে পরিচালন করে। এরূপ ব্যক্তি আপনার দেহ ও দেহস্থ দেহী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিল, তাই সে দেহ ও দেহী সম্পর্কে বিজ্ঞানাত্মা। দেখা যাইতেছে, দেহস্থ এই ক্ষুদ্র চৈতন্য আপনার বিপদ পরীক্ষা, অভাবকালে সহায়তা জন্য, সাকার জড় বা ভৌতিক পদার্থ যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহার সহায়তা চায় না, সাকারের অন্তরালে অবস্থিত পরম চৈতন্যের সহায়তা চায়। মানুষ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যেরই সহায়তা অন্বেষণ করে, জড় বা ভৌতিকের সহায়তা অন্বেষণ করে না। মানবসমাজের বাল্যাবস্থায় মানুষ খণ্ড খণ্ড সাকারের অন্তরালে খণ্ড খণ্ড শ্রেষ্ঠ চৈতন্যের অন্বেষণ করিল, কিন্তু মানবসমাজের পরিপক্ক স্তরে সুধীগণ, ধ্যানী, জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষ করিলেন, সকল খণ্ড সাকারের অন্তরালে বা অভ্যন্তরে, সকল সাকারের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতারূপে এক অখণ্ড শ্রেষ্ঠ চৈতন্য বা পরম চৈতন্য বিরাজমান,—এক অদ্বিতীয়, অপরিবর্ত্তনীয়, অবিভাজ্য পরম চৈতন্য বিদ্যমান। তাই ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিগণ সকল খণ্ড সাকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে এক অখণ্ড অদ্বিতীয় নিরাকার, প্রাণময়, জ্ঞানময়, অনন্ত-শক্তিময়, করুণাময়, ইচ্ছাময় দেবতাকে প্রত্যক্ষের বিষয় করিয়া, সেই অখণ্ড অদ্বিতীয়ের পূজাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। তাই তাঁহারা ধ্বনি করিলেন, "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্।" সেই চৈতন্যের রাজ্যে সূর্য্যও আলোক দান করেনা, চন্দ্র তারকাও আলোকদান করে না; সেই পরম চৈতন্য যিনি, তাঁহার দিব্যালোকেই সে রাজ্য আলোকিত, তাঁহার দিব্য প্রকাশেই সকল প্রকাশিত। এই এক অখণ্ড নিরাকার পরম চৈতন্য সকল সাকার খণ্ডকে, আকাশের সূর্য্য চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ সকল পাহাড়, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, তৃণদল পর্য্যন্ত সকলকে, আকাশ, বাতাস, জল, স্থল প্রভৃতি খণ্ড সকল সামগ্রীকে এক অখণ্ডে পরিণত করিয়া, সকলের অস্তিত্বের পরম অস্তিত্বরূপে বর্ত্তমান। আবার প্রাণিজগতে কীটাদি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকুলের ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, গণ্য নগণ্য, সকলের মধ্যে এক অখণ্ড নিরাকার প্রাণরূপে বর্ত্তমান।

মানবকুল অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ কেন? তাহার আত্মিক জীবনের জন্য। মানবের আত্মিক জীবনে পরমাত্মা বাস করেন, দেবপ্রভাব বিস্তার করেন; তাই মানবের আত্মিক জীবনের গৌরব, সৌরভ। অখণ্ড নিরাকার পরম চৈতন্য যেমন জড় জগতের, তেমনই ভৌতিক জগতের, তেমনই প্রাণিজগতের এবং প্রাণি-জগতের মধ্যে সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজীবনের গৌরব, সৌরভ। সেই নিরাকার অখণ্ড পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যে বিশ্বের সকলই শোভা সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে, "পুণ্য-গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥" ঈশ্বর পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, পুণ্য-সৌন্দর্য্য। তিনিই সূর্য্যচন্দ্রের তেজ, তিনিই সকল ভূতের জীবন, তিনি তপস্বী ধার্ম্মিকগণের তপস্যার উত্তাপ।

এই জগজ্জীবন নিরাকার অখণ্ড পরম দেবতাকে জানিলেই মানবকুল আপনাকে জানিবার এবং জগতের সকল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হয়; নৈলে পৃথিবীর উপার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি, পড়াশুনা, এমন কি ধর্ম্মপুস্তকাদির পড়াশুনাতেও সে জ্ঞানলাভ হয় না। মহাপুরুষ নানক বলিলেন, "বেদ ও পুরাণ দর্পণের ন্যায় দুই ভাই, তাহা পাঠে মনের অন্ধকার দূর হয় না; ক্ষণমাত্র যে বিশ্বাস করে, তাহার সম্মুখে তখনই ঈশ্বর উপস্থিত হন, এবং তাহার নিকট তখন সকল বিষয়ে জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া যায়।" প্রাচীন ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিগণও বলিয়াছেন, বেদাদিপাঠে মাত্র অপরা বিদ্যা লাভ হয়, একমাত্র পরমচৈতন্য পরমেশ্বরকে জানিলেই পরাবিদ্যালাভ হয়, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়।

আসুন, আমরা সেই অখণ্ড নিরাকার পরমচৈতন্যকে জানিয়া, সাকার ও নিরাকার জগতের সকল জ্ঞান লাভ করি। তিনি আপনাকে জানাইবার, চিনাইবার ও গ্রহণ করাইবার জন্য, নিত্যচৈতন্যময় গুরুরূপে, বাস্ত কর্ম্মী বান্ধব ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ। যখন আমরা সেই অখণ্ড নিরাকার পরম দেবতার শিক্ষায় ও দিব্যালোকে, আমাদের মধ্যে ও ইহজগতের সকল সাকার ও খণ্ড নিরাকারের মধ্যে আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দর্শন করি, তখন এই পৃথিবীতে আমরা স্বর্গদর্শন করি, স্বর্গ সম্ভোগ করি। আর যখন সেই পরম দেবতার শিক্ষায় ও আলোকে আমরা জড়াতীত, সকল সাকার জগতের অতীত চিন্ময় দিব্যধাম সেই দেবতার অমৃতবক্ষে দর্শন করি, তখনই আমাদের পরলোক দর্শন হয়, দিব্যধামবাসী অমরাত্মা-দিগের সঙ্গে বাসের সুযোগ হয়, বাস সম্ভব হয়। তখন ইহলোকেও স্বর্গবাস, পরলোকেও স্বর্গবাস। ইহলোক পরলোক তাঁহার মধ্যে দেখিয়া তাঁহার দিব্যবক্ষে অখণ্ড স্বর্গবাস।

—০—

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

স্বার্থ

মানুষ যখন বিশ্বজগৎ হইতে এবং ভগবান্ হইতে নিজকে পৃথক করিয়া, আপন ইচ্ছা রুচির বশীভূত হয়, এবং আপনার ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য্যে নিজকে সুখী করিতে চায়, তখনই স্বার্থের মোহঘোরে অন্ধ হইয়া উঠে। স্বার্থদৃষ্টি আর কিছুই দেখে না, কেবল নিজকেই দেখে; সকল স্থান হইতে, সকল অবস্থা হইতে, মানবিক ও পারিবারিক সকল সম্পর্ক হইতে

কেবল আত্মসুখেরই অন্বেষী হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতার মোহমদে উচ্ছৃঙ্খলতার কত অভিনয় করে। সে নিজকে কর্ত্তা মনে করে, জগৎটা তাহারই প্রয়োজনে সৃষ্ট, সে ভাবে। যেখানে তার স্বার্থ প্রতিহত হয়, সেখানেই সে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। কায়মনোবাক্যে নিজ প্রয়োজনটাকেই জগতের সম্মুখে বড় করিয়া ধরিতে চায়, নিজের দাবীটাকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য মনে করে; অন্যের প্রয়োজন বা দাবী দাওয়া তাহার সম্মুখে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। স্বার্থ মানুষকে এমন করেই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আমিত্বের সংকীর্ণ রাজ্যের রাজা করে।

পরার্থ

আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা নিজের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, আপনাকে জগতের মাঝে বিলাইয়া দেন। নিজের যাহা কিছু, পরপ্রয়োজনে উৎসর্গ করিতে সদাই উৎসুক। স্বার্থের সংকীর্ণতার গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া, উদারতার প্রশস্ত গৃহে জগজ্জনের সঙ্গে তাদেরই একজন হইয়া বসবাস করিতে অভিলাষী হন। নিজে দুঃখ দৈন্যকে বরণ করিয়া পরকে সুখী করিতে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হন। "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই তাঁদের মন্ত্র, এই তাঁদের সাধনা, এই তাঁদের আত্মপ্রসাদ। এই পরার্থের মধ্যে একটা অভিমান আছে, একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার গন্ধ আছে; জগতের একজন বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা আছে। পরার্থই তাঁদের স্বার্থ হইয়া দাঁড়ায়, ভগবদিচ্ছার দিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে না। ভগবানের আদেশ ভিন্ন এই পরার্থের সূক্ষ্ম আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিয়া, আত্মেচ্ছা-রুচির বশবর্ত্তী হইয়া, আত্মত্যাগের কৌশলে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগই সর্ব্বথা খোঁজে। এখানে মানুষ আপনা হইতে আপনি মুক্ত বটে, কিন্তু জগজ্জনের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। স্বার্থের সংকীর্ণ ঘর হইতে মুক্ত হইয়া উদারতার প্রশস্ত গৃহে সদম্ভ বাস করে।

পরমার্থ

স্বার্থ ও পরার্থের এই বদ্ধ জীবন পরমার্থে মুক্ত হয়। স্বার্থ ও পরার্থের ভিতরে পরমই, শ্রীভগবান্‌ই যখন মানুষের একমাত্র প্রয়োজন হন, উদ্দেশ্য হন, তখন স্বার্থ ও পরার্থের গণ্ডী পরমার্থে বিলীন হইয়া যায়। মানুষ যখন ভগবদিচ্ছার অধীন হইয়া চলে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আমিত্বকে বিসর্জ্জন দেয়, তখন সে চারিদিকে শিব ছাড়া আর কিছুই দেখে না। জীবের মধ্যে শিবের অধিষ্ঠান অর্থাৎ জগৎটা শিবময় হইয়া উঠে। আমার মধ্যেও শিব, জগতের মধ্যেও শিব। আমার প্রয়োজনে যাহা কিছু, তাহাও শিব-প্রয়োজনে, জগতের প্রয়োজনে যাহা কিছু, তাহাও শিবপ্রয়োজনে। স্বার্থে ও পরার্থে কেবল শিবেরই ইচ্ছাপালন; আত্মেচ্ছা বা পরেচ্ছা নাই, শিবেরই ইচ্ছা। শিবেরই ইচ্ছাপালন যখন জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, সাধন হয়, তখন স্বার্থ পরার্থ পরমার্থে পরিণত হয়; স্বার্থ ও পরার্থ দুইই মুক্তির কারণ হয়। আমার ইচ্ছায় আমি আমার জন্যও কিছু করি না, জগতের জন্যও কিছু করি না; একমাত্র শিবের ইচ্ছায় যখন সব করি, তখনই শিবের অধীন হইয়া শিবত্ব বা মুক্ত জীবন লাভ করি। এই শিবত্বই জীবের পরমার্থ।

পিতৃদেবের জীবন-কাহিনী

(১০ই নবেম্বর, শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত)

দেবচরিত্র, পুণ্যাত্মা, চিরপূজ্য পিতৃদেবের এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জীবনকাহিনীর আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা, লোকদুর্ল্লভ গুণাবলী, তাঁহার পবিত্র জীবনের উন্নত আদর্শ এবং কর্ম্মসঙ্কুল সংসারে বাস করিয়াও তাঁহার জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় উৎসর্গীকৃত এই ঋষি-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যদি তাঁহার এই অযোগ্য সন্তানের শোকাবেগে কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠ যথাযথভাবে তাহার কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অসমর্থ হয়, অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতাবশতঃ এবং ভাষা ও ভাবের দৈন্যে যদি পরমভক্তিভাজন পিতৃদেবের উজ্জ্বল চরিত্র-মহিমা ও ধর্ম্মজীবনের অভিব্যক্তি পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা তাঁহার দীনহীন অযোগ্য সন্তানের ক্ষুদ্র শক্তির অতীত হয়, তাহা হইলে আমার কাতর প্রার্থনা, তাঁহার নরদেহ-নির্ম্মুক্ত অশরীরী আত্মা যেন এই অধম সন্তানের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করেন, এবং তাঁহার যে সকল প্রীতিভাজন আত্মীয় স্বজন, তাঁহার বিয়োগবেদনাকাতর, গুণমুগ্ধ যে সকল বন্ধুবান্ধব, মহিলা ও পুরুষ এই শ্রাদ্ধসভায় সমাগত হইয়াছেন, আশা করি, অযোগ্যের এই অক্ষমতা তাঁহারাও ক্ষমা করিবেন। শক্তিহীনের বর্ণনায় ত্রুটীতে মহতের মহিমা-জ্যোতি নিষ্প্রভ হয় না।

পিতৃদেব কখন আত্মকাহিনীকীর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, আমরাও আবাল্য প্রবাসে প্রতিপালিত, এইজন্য পিতৃদেবের বাল্যজীবনের কাহিনী-শ্রবণের সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি নাই; কেবল এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি, কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী অর্থাৎ একনবতি বর্ষ পূর্ব্বে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে তাঁহার মাতুলালয়ে, ২৪পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের সমৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে প্রায় এক শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা, এই দীর্ঘকালে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে, ধর্ম্ম ও নীতির ঘাত প্রতিঘাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের কি

পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে তাহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে; একদিকে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব, অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীগণের প্রচারফলে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণের ধর্ম্মান্তরগ্রহণে প্রবৃত্তি। এই সময়ে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলবিধানে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এই যুগসন্ধিকালে যখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন হিন্দু-ধর্ম্মের চিরাচরিত সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় পিতৃদেব জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাঁহার কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবনে সেকাল ও একালের মধ্যে যে যোগসূত্র সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই মিলনসূত্রকে স্বর্ণসূত্র বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

বস্তুতঃ পিতৃদেবের ধর্ম্মানুরাগ ও নিষ্ঠা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশ কেবল নিষ্ঠাবান্ কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ নহে। তাঁহার পিতামহ, যিনি সাংসারিক ভোগ-বাসনা তুচ্ছ করিয়া নিভৃত কূপের ভিতর বসিয়া যোগ সাধনা করিতেন এবং সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র শোণিত আমাদের পিতৃদেবের দেহে সঞ্চারিত ছিল বলিয়াই, পিতৃদেব সংসারী হইয়াও কর্ম্মজীবনে নিস্পৃহভাবে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং কর্ম্মকোলাহলমুখর সংসারে কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে, সংসারী হইয়াও ভোগের ভিতর ত্যাগের মহিমা-প্রদর্শনে কেহ তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইতে দেখেন নাই।

পিতৃদেব শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় তারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মেহেরপুরের সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মুখোপাধ্যায়-বংশের অলঙ্কার ছিলেন। নদীয়ার প্রধান নগর কৃষ্ণনগরে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, পূজনীয় পিতৃদেব আশৈশব মেহেরপুরে মাতুলের পৈতৃক বাসভবনেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর, আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে মেহেরপুরের যুবকসমাজে চরিত্রের আদর্শরূপে বিরাজিত থাকিয়া যে তরুণের দল গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই দল মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজের পরি-চালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা মেহেরপুরের হিন্দু সমাজে গোড়ামীর বিরুদ্ধে যে বিপ্লব ঘোষণা করিয়াছিলেন, কালে তাহা সফল হইয়া সুফল প্রদান করিয়াছিল। তাঁহাদের নূতন শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় পাইয়া, হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ্য মহিমা ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে কঠোর বজ্র উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রহণ করিয়াও পরাজয় স্বীকার করেন নাই। ন্যায় ও সত্যের জয় অপরিহার্য্য, তাহা ঝটিকা-বেগে পাপ, অধর্ম্ম, কুসংস্কার ধ্বংস করে না বটে, কিন্তু তুষানলের ন্যায় তাহা অতি ধীরে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অদৃশ্য থাকিয়া, সমাজের পাপ, কলুষ, নীতিহীনতা, কপটতা প্রভৃতি, যুগ-যুগ-সঞ্চিত জঞ্জালস্তূপকে ভস্মরাশিতে পরিণত করে। পূজনীয় পিতৃদেব ও পিতৃব্য এই ভাবে ধীরে ধীরে মেহেরপুরের সমাজ-জীবনে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ধীরে ধীরে সুপ্রকাশিত হইয়াছিল। প্রীতিভাজন সুহৃদ্‌বর্গের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের বন্ধন কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এবং একালে শিক্ষিতসমাজে সেরূপ নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত অদৃশ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমার পিতৃব্য যখন মাতৃগর্ভে, তখন আমার পিতামহ হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। তারপর কাকামহাশয় যখন মাত্র আড়াই বৎসরের, তখন আমার ঠাকুর মা স্বর্গগমন করেন। তখন বাবার বয়স ছয় কি সাত বৎসরের। বাবা কাকাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করেন, এবং পরে উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন। যৌবনে তিনি কাকাকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন এবং তাঁর যাবৎ খরচ নিজে বহন করেন। পরে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ভাগলপুরে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। কাকা মহাশয় এজন্য চিরদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান ছিলেন। তাঁদের ভ্রাতৃভাব অতুল-নীয়—এরূপ পবিত্র ভ্রাতৃভাব কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বাবা আজীবন পিতৃব্যের জন্মতিথিতে কোজাগর পূর্ণিমায়, পিতৃব্য যেখানে থাকুন না কেন, তাঁর সহিত মিলিত হইয়া একত্রে ভগবানের চরণতলে বসিয়া পূজা ও উপাসনা করিতেন। কাকা মহাশয় আমাদের পিতৃদেবকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেন। বাবার অসুখে বিসুখে, আমাদের বিপদে আপদে—কাকা বাঁকিপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সে আমাদের পিতৃদেবের স্নেহের টানে। এই পিতৃব্য মহাশয়ের আকর্ষণে ও প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া বাবা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, জীবনে একজন আদর্শ ব্রাহ্ম বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করিয়া, আপামর সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে জীবন কাটাইয়া গেলেন।

এখানে পিতৃদেবের নিঃস্বার্থ বন্ধুপ্রীতির একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মেহেরপুরের অধিবাসী যদুনাথ রায় মহাশয় পিতৃদেবের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। পিতৃদেব মহাধনাঢ্য জমিদারের পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় হইলেও, তিনি চিরদিন স্বাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং মাতুল বর্ত্তমানে তাঁহার কোন অভাব না থাকিলেও, আত্মনির্ভরের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল; এই আগ্রহের ফলে তিনি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদলের রাজার স্কুলের হেড্ মাষ্টারের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন চাকুরী করিয়া সেকালের রাজসংসারের আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হইল না। চিরদিন তিনি সত্যপ্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়চরিত্র; বড় লোকের চাকুরী

করিতে হইলে জল উঁচু বলিতে হয়, বড় লোকের যে সকল সংস্কার, আহার বিহারের অসংযম ও খেয়াল থাকে—তাহার সমর্থন করিতে হয়। পূজনীয় পিতৃদেব তাহার অনুমোদন ও অনুসরণ করিতে না পারায় দ্বিধায় পড়িয়াছিলেন; সেই সময় তাঁহার পরম বন্ধু যদুনাথ মহিষাদলে তাঁহার জন্য চাকরী বাকরীর সন্ধান করিতে অনুরোধ করায়, তিনি মহিষাদলের রাজা স্বর্গীয় লছমন প্রসাদ গর্গকে রাজী করিয়া, প্রিয়বন্ধুকে সেই চাকুরীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বয়ং প্রফুল্লচিত্তে মেহেরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার বন্ধু যদুনাথ—আমরা তাঁহাকে কাকা বলিতাম এবং সেইরূপ সম্মান করিতাম—পিতৃদেবের সহবাসে ও তাঁহার উন্নত চরিত্রের আদর্শে মহিষাদলে এরূপ সততা, ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন যে, কালে তিনি সেই বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বন্ধুর এই প্রকার উপকার করিয়া পিতৃদেব আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত একালে বিরল।

পিতৃদেবের মাতুলের মৃত্যুর পরও তাঁহাকে অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার মাতুলানী স্বর্গীয়া সখীমণি দেবী তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছিলেন। মেহেরপুরের মাতুলালয়ই তাঁহার বাসভবনে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় পিতৃদেব দুঃখী, রোগী, অসহায়, আর্ত্ত প্রভৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। একবার স্থানীয় একটী দরিদ্র গৃহস্থের স্ত্রী কয়েকদিন যাবৎ প্রসববেদনা ভোগ করিয়া মরণোন্মুখ হইয়াছিল; স্থানীয় ডাক্তার সেই সঙ্কট হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারায়, স্ত্রীলোকটি যন্ত্রণায় অচেতন হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। পূজনীয় পিতৃদেব তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়া, পিতৃব্যদেবকে তাহার চিকিৎসায় নিয়োজিত করেন। পিতৃব্য মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অস্ত্রচিকিৎসায় সাফল্যের পরিচয় দিয়া স্ত্রীলোকটির প্রাণরক্ষা করেন। কতবার গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে এক একখানি পল্লী ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে, পিতৃদেব সদলে জল বহন করিয়া অগ্নিরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছেন, জীবন বিপন্ন করিয়া বন্ধুগণের সাহায্যে অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত করিয়াছেন। নিরাশ্রয় কলেরারোগীকে সেবার গুণে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সেই উপকার স্মরণ করিবে, এরূপ বৃদ্ধ মেহেরপুরে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিছু দিন পরে এ সকল কাহিনী স্বপ্নে পরিণত হইবে।

আমার পিতৃব্য মেডিকেল কলেজে পাঠকালে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই ব্যাপারে মেহেরপুরে ব্রাহ্মসমাজে হুলুস্থূল পড়িয়াছিল। যে মুখোপাধ্যায় বংশ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক এবং পোষক, সেই বংশের ভাগিনের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলেন, ইহ অনেকেরই অসহ্য হইল; কিন্তু পিতৃদেব এই আন্দোলনে বিচলিত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার মাতুলানী তাঁহার প্রধান আশ্রয় সখীমণি দেবীও কৃষ্ণনগরে পরলোকে প্রস্থান করেন।

এই সময় তাঁহার সম্পত্তি লইয়া একটি জটিল মামলার উদ্ভব হয়, পিতৃদেব একালের বৈষয়িক লোকের ন্যায় চেষ্টা করিলে মাতুলের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন; কিন্তু সেজন্য বিচারালয়ে সত্যগোপন করিতে হইত। চিরদিন যিনি সত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, সম্পত্তির লোভে তিনি অসত্যের পোষকতা করিতে পারিলেন না। তিনি অর্থের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, চির জীবন কঠোর পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সেই অর্থের অনুরোধে জীবনের অবলম্বন সত্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এইবার তাঁহার জীবনের পরীক্ষা অতি কঠোর পরীক্ষা, কিন্তু এই পরীক্ষায় তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার ফলে বিপুল সম্পত্তি তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। মাতুলের সম্পত্তি তাঁহার জ্ঞাতিগণের অধিকারভুক্ত হইল; যে মাতুলালয় তাঁহার স্বগৃহে পরিণত হইয়াছিল, সেই মাতুলালয় পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞাতিরা অধিকার করিলেন।

এইবার মেহেরপুরের ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাকে আর ভয় করিবার কারণ পাইল না। পিতৃদেব সম্পদে এই ভাবে রিক্ত হইয়া, পরম আগ্রহে ধর্ম্মসম্পদ্ অবলম্বন করিলেন, পিতৃব্যের পন্থার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, এবং চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসনব্রত গ্রহণ করিলেন। সে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কথা, আমরা তখন বালক। মেহেরপুরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কোন্ সুদূরে চলিলাম, সে ধারণা ছিল না। কিন্তু ভগবান ভাগলপুরে যে পিতৃদেবের জন্য স্নেহ ও প্রেমের আসন প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কি তখন আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য ছিল? যিনি অসহায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুর জন্য জননীর বক্ষে ক্ষীরধারা প্রবাহিত করেন, পিপাসার্ত্ত পান্থের জন্য দুর্গম মরুক্ষেত্রে পান্থপাদপের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, ভাগলপুরে তিনিই পিতৃদেবের জন্য শান্তিময় গৃহ এবং প্রীতিভাজন সুহৃদ্‌বৃন্দের সংযোজনা করিয়াছিলেন। তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া, পিতৃদেব সেই করুণাময় বিশ্বদেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভাগলপুরে আসিয়া তিনি নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ উদাম ভগবৎ-প্রেম যেন নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ভাগলপুর সমাজের তিনি উৎসাহী সভ্য এবং একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন। জামালপুর মন্দির উদ্ধারের কাহিনী তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই, অসীম কষ্ট-স্বীকারে মুঙ্গেরের মন্দিরের জীর্ণসংস্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় ইঙ্গিতে এই কার্য্য সংসাধিত করিয়াছিলেন ভাবিয়া, তিনি কোন দিন গৌরব-প্রার্থী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, কর্ম্মেই তাঁহার অধিকার, ফলের প্রতি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না; কিন্তু দয়াল হরি তাঁহাকে কোন দিন কর্ম্মফলে বঞ্চিত করেন নাই। সাংসারিক

কর্ত্তব্য-বিবেচনায় তিনি অর্থোপার্জ্জনকে ধর্ম্মেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন এবং পরিমিত অর্থে কিরূপ শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার সহিত সকল সাংসারিক কর্ত্তব্য—সংসার প্রতিপালন, সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন, পুত্রাদির সুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহ চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি যেমন অনুপম ছিল, অতিথিবাৎসল্যও সেইরূপ অতুলনীয় ছিল। দীর্ঘকাল পরে স্নেহাস্পদগণের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে, কি গভীর স্নেহে ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে তাঁহার স্নেহপূর্ণ উদার বক্ষে যেরূপে গ্রহণ করিতেন, তাহা ভুক্তভোগিগণের সুবিদিত। এরূপ স্নেহময়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মানুরাগী পিতার পুত্র হইয়া আমরা গৌরব অনুভব করিয়াছি। আজ তাঁহার সেই অপার্থিব স্নেহ হারাইয়া, আমরা এই পরিণত বয়সেও অসহায় শিশুর ন্যায় তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। বার্দ্ধক্যে জীর্ণ দেহে তিনি স্বয়ং পৌত্রগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও, সুপরামর্শদানে তাঁহার পুত্রগণকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতেন। প্রবাসে বাস করিয়াও দেশের জন্য প্রাণ তাঁহার ব্যাকুল হইত, বন্ধুবান্ধবগণের সর্ব্বদা সংবাদ গ্রহণ করিতেন; এবং সুযোগ পাইলেই বাল্যের ও প্রথম যৌবনের মধুর স্মৃতির আগার স্বদেশ দর্শন করিয়া আসিতেন, প্রতিগৃহে পদার্পণ করিয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রীতিভাজন স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কাহারও বিয়োগ-সংবাদ শুনিলে বিচলিত হইতেন। তাঁহার হৃদয় মধুর, বাক্য মধুর, ব্যবহার মধুর ছিল। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই সত্য তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেন।

তাঁহার জীবনের শেষ সাত বৎসর পা ভাঙ্গিয়া চলচ্ছক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; এই অবস্থায় তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-প্রেমে আচ্ছন্ন থাকিতেন। নামজপ, নামশ্রবণ, নামই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। অশক্ত দেহেও সমাজে মন্দিরে গমনের জন্য তাঁহার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা! ভগবান্ যেন তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাধু সন্তানকে তাঁহার সুশীতল শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণের জন্য, নানাভাবে তাঁহাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন।

জীবনে তাঁহাকে বহু দুঃখ কষ্ট এবং শোক সন্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা বিধাতার বিধান মনে করিয়া, অসীম ধৈর্য্য সহকারে সকলই সহ্য করিয়াছিলেন।

বন্ধুবান্ধবের সহিত আত্মীয়তা করিবার জন্য আগ্রহ তাঁহার চিরদিন সমান ছিল। রোগশয্যায় শয়ন করিয়া যখন আর উঠিবার শক্তি ছিল না, তখন পুরাতন বন্ধুগণ দেখিতে আসিলে কি আনন্দই না প্রকাশ করিতেন; তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিতে যাইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন; যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে বলিতেন, যাঁহাদিগের গানের অভ্যাস আছে, তাঁহাদিগকে গান করিতে বলিতেন। সেই সংগীত শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখ আনন্দে তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হইত। তাঁহার জীবনে ভগবৎ-প্রেম ও স্বদেশপ্রেমের অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষিত হইত। তিনি আজীবন সেবাধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং রোগী দুঃখীর সেবা ও পরিচর্য্যায় আনন্দ লাভ করিতেন।

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার সকল গুণের আলোচনা করিয়া, তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্য এবং উদারতার চিত্র পরিস্ফুট করিব, সে সামর্থ্য আমার নাই। তিনি আমাদের পিতা, ইহা অপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয়ও আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহার অনুগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে আমরা জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছি। তিনি আমাদের ও আমাদের পুত্রকন্যাগণের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, দেহ মন পরিপুষ্ট করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সকলই দান করিয়াছেন। পিতৃঋণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে না, আমরা কখন তাঁহার সামান্য মাত্র ঋণও পরিশোধ করিতে সমর্থ হই নাই। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আজ আমাদের প্রার্থনা, জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার আত্মা চিরতৃপ্তি লাভ করুন।

অভিভাষণ

(টাঙ্গাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের অংশবিশেষ)

এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম সত্যের পূজা প্রবর্ত্তন করেন। সে কি অন্ধকার যুগের তিমির রাত্রি আমরা দেখিয়াছি। ধর্ম্মের নামে রোরুদ্যমানা জননীর বক্ষ হইতে নবজাত শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া পিতাই নিজ ঔরসজাত পুত্রকে সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গরের মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে! গভীর জঙ্গলের মধ্যে কালীমন্দির স্থাপন করিয়া কোনো হতভাগ্য পরিবারের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া ধর্ম্মের নামে নরবলি দিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলাম ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। স্বামীর জলন্ত চিতায় স্ত্রীকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া নিয়া, বাঁশ চাপা দিয়া, জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া ভাবিতেছে, ইহাই সতীধর্ম্মপালনের পরাকাষ্ঠা হইল! গুরুবাদ, কর্ত্তাভজা এবং বামাচারাদি বহু দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠানের প্রচলন করিয়া গার্হস্থ্য এবং সামাজিক জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া, ধর্ম্মের নামে সমাজে জীবন্ত নরকের প্রতিষ্ঠা করিয়া, মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিয়েছে।

সেই তিমির রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া, যে মহাপুরুষ এদেশে এক নব উষার নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই প্রচারিত ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, সেই নবযুগের বার্ত্তাবাহী মহর্ষি রাজা রামমোহন রায়কে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি, যাঁহার বাণীকে কবি তাঁহার অমর কণ্ঠে ভাষা দিয়া গাহিয়াছেন,—

মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন,
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয় নাহি ভয়,
জয় জয় সত্যের জয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন বাংলার সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, দেশাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিলেন এবং তাহার ফলেই এদেশ সর্ব্বপ্রথম মুক্তির আস্বাদ পাইল। রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম এদেশের বুকের উপর হইতে দেশাচার এবং লোকাচারের জগদ্দল পাথর ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং মৃতপ্রায় জাতিকে অমৃতের বাণী শুনাইলেন। তারপর Pilgrim Father-দিগের ন্যায় কত মনীষী এবং কত মহাপুরুষ রামমোহনের পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বজ্রনির্ঘোষে সত্যের বাণী সকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তেত্রিশ কোটী দেবতাধূষিত দেশে, ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু ও মনসা পূজায় মগ্ন, মরণোন্মুখ জাতি সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠ হইতে ঋষিযুগের প্রচারিত উপনিষদের সেই অমরবাণী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল,—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

রূপবিবর্জ্জিত অরূপকে যাহারা আপনাপন কল্পনানুযায়ী রূপ না দিলে দেখিতেই পাইত না এবং ভূমা অসীমকে যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে না পারিলে সেই বিরাট অনাদি পুরুষের সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারিত না, তাহারা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মপূজার বাণী শ্রবণ করিল—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাহারা মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় শুনিল, সাধু ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মপূজকগণ ঙদ্গাতচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন,—

অসতোমা সদগময়
তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়—

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও! অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও! মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও!

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বাংলা দেশের সামাজিক বেষ্টনী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া, নানারূপ দেশাচার এবং অন্ধসংস্কারের বজ্রবাঁধুনীর মধ্যে বদ্ধিত হইয়া যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম, তখন ব্রাহ্মসমাজের সেই অগ্নিযুগের ক্ষুরধার যুক্তির মুখে পড়িয়া, সকল মিথ্যার আবরণ এবং বজ্রবন্ধন কাটিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; আমি যেন এক নবজীবন এবং মুক্তির আস্বাদ পাইলাম। সেই হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকেই আমি আমার জীবনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমি মার্কামারা তিলকধারী ব্রাহ্ম নই, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমি একটা hide-bound, creedbound লোহার ছাঁচে ঢালা, হাত পা বাঁধা dogmatic religion বলিয়া কোনও দিন বুঝি নাই এবং গ্রহণও করি নাই।

জগতের সকল ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর সম্মুখে ইহা বিশ্বজনীন এবং সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের এমন এক বিশাল, বিরাট আদর্শ স্থাপন করিয়াছে যে, ইহার স্বরূপ যতই উপলব্ধি করিতে যাই, ততই ইহার বিশালতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে থাকি এবং এই বিশ্বরূপের চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত, মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি হইয়া যাই। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ever-wakeful, ever-progressive and ever-expanding.

মনুষ্যজাতি এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ চিরগতিশীল এবং চিরচলিষ্ণু। সময় এবং জলস্রোতের ন্যায় অবিরাম, অবিশ্রাম গতিতে চলিতেছে ;—এই অত্যন্ত চলার পথে, কত সময় তাহাকে হয়ত পঙ্কিল কর্দ্দমাক্ত বদ্ধজলাশয়ের পাঁকের মধ্যে পড়িয়া চারিদিকে পূতিগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে হইতেছে; কিন্তু ইহার গতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দুর্ব্বার শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহারই তেজে এবং প্রভাবে সকল বাধা বিঘ্ন কাটিয়া, পথের কাঁটা দলিয়া, মথিয়া, ঠেলিয়া ফেলিয়া, সে আবার নূতন তেজে নিজের পথ নিজেই কাটিয়া বাহির হয়—জনপদকল্যাণকারিরূপে পূজিত ও আদৃত হয়।

মানবজীবনে এবং মনুষ্যসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ দুর্নিবার শক্তি-সঞ্চয়ের এক বিরাট Storage-battery. এইখানে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে, তবে ইহার গতির আর বিনাশ নাই।

'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী'

পৃথিবী বিশাল এবং বিপুল, কালও অনন্ত। এই অনন্ত

পথে চলিতে চলিতে কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত পঙ্কিল আবর্জ্জনা আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু ঐ Storage battery-তে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে, তবে মাভৈঃ মাভৈঃ!! বিগতভীঃ হইয়া সব বাধা বিঘ্ন দলিত মথিত করিয়া তবে পথ চলিতে পারিবে।

যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে।

ভক্ত সাধক মিথ্যা এই গান করেন নাই। মানব-জীবনের শত পাপ প্রলোভন এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে পড়িয়া যদি কোনদিন হাবুডুবু খাইয়া থাক, এবং "সব গেল" "সব গেল" বলিয়া তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাহু তুলিয়া যদি সেই রাজার দোহাই দিতে পার, তবে নিশ্চয়ই জেন, ঐ Storage battery হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সব পাপ প্রলোভন পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আবার বলি, ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবজীবনের এই Storage battery.

হায়, আর সে সব Pilgrim Father-দের জ্বলন্ত বাণী শুনিব না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, দার্শনিক নগেন্দ্রনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাথ, আজ তোমরা কোথায়! যে সকল কণ্ঠের বাণী শুনিবার জন্য হাজার হাজার নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া থাকিত—আজ সে সকল কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে—কেবল তাহার ঝঙ্কার থাকিয়া থাকিয়া মন প্রাণ আলোড়িত করিয়া তুলে। সে সকল কণ্ঠ নীরব হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেই জ্বলন্ত জাগ্রত বাণী নিভিয়া যায় নাই। মানুষের প্রাণকে তাহা দিকে দিকে এমনভাবে দোলা দিতেছে, যে একবার তাহার আঘাত প্রাণে লাগিলে যে তরঙ্গ উঠে, তাহার ঢেউয়ে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। মহাপুরুষেরা চলিয়া যান, তাঁহাদের কণ্ঠও সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের বাণী মরে না। অমর কবি Tennyson গাহিয়াছেন,—

"Our echoes roll from Soul to Soul
And live for ever, and for ever."

(ক্রমশঃ)

—•—

পিতৃ-তর্পণ

(১০ই ডিসেম্বর, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, কন্যা শ্রীমতী সরলা দাস কর্ত্তৃক স্বর্গবাসী পিতৃদেবের চরণে শ্রদ্ধা ভক্তির তর্পণ।)

যে পুণ্যবান ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত সাধকের গৃহে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে পবিত্রকুটীরে আমাদের জন্মস্থান, সেই ঘরের সর্ব্বজনপ্রিয় গৃহস্বামী বিধাতার আহ্বানে আজ স্বর্গবাসী। সেই গৃহের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী পরমারাধ্য স্নেহময় গৃহদেবতা আজ অমরধামে। যাঁহার অজস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, যাঁহার প্রাণভরা গভীর আদর ভালবাসা প্রাণে ভরিয়া, যাঁহার অন্তরের নিঃস্বার্থ স্নেহভরা শুভকামনা কল্যাণপ্রার্থনা হৃদয়ে বহন করিয়া আমরা এই জগতের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আজ সেই বিশ্বজনমঙ্গলপ্রার্থী সেবক, আমাদের পরমপূজ্য স্নেহ-পরায়ণ পিতৃদেব, ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নিজ জীবনের কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক স্বধামে গমন করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার সেই প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ আজ আর আমাদের জন্য নাই? সেই অফুরন্ত স্নেহভালবাসা কি এত শীঘ্র এ জীবন থাকিতে সব হারাইতে হইবে? সেই বৈকুণ্ঠবাসী পিতৃদেবের, সেই পরমহিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহময় পিতার হৃদয়ের অমূল্য অনন্ত শুভাশীর্ব্বাদ যে চিরদিন আমাদের জন্য রহিয়াছে। আমাদের জীবনগ্রন্থের প্রতি পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাহা যাবজ্জীবন প্রকাশিত থাকিবে। তাঁহার সেই প্রাণভরা সুধামাখা স্নেহা-শীর্ব্বাদ আজ স্বর্গের দেবতা পরম পিতার আশীর্ব্বাদের সহিত মিলিত হইয়া, শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া, স্বর্গ হইতে অজস্র-ধারে বর্ষিত হইতেছে। এই আশা ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহার চরণে প্রাণের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া, তাঁহার সুমিষ্ট পবিত্র স্নেহময় জীবনকাহিনীর দু'চারিটী কথা আলোচনা করিয়া সুখী ও ধন্য হইতে চাই।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই তিনটি পবিত্রসলিলা স্রোতস্বিনীর মিলনস্থান ত্রিবেণী একটি পুণ্য তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পবিত্র তীর্থধামে এই পুণ্যাত্মা শান্তসাধক জন্ম গ্রহণ করেন। উচ্চ বৈদ্যকুলে, ভদ্র সম্ভ্রান্ত বংশে পিতৃদেবের জন্ম হয়। পরিবারের মধ্যে তিনি অতি আদরের একমাত্র প্রিয়তম সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত দুই ভাই তখন বর্ত্তমান, তাঁহাদের মধ্যে বাড়ীতে তিনিই কেবল একমাত্র বংশধর পুত্রসন্তান। তাঁহার জন্মোপলক্ষে গৃহে কত সমারোহ, কত আনন্দোৎসব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জন্মগ্রহণের আটদিনেই তাঁহার স্নেহময়ী জননী দেবী নবজাত শিশুকে অকালে অকূল সাগরে ভাসাইয়া হঠাৎ স্বর্গারোহণ করিলেন। এত আদরের সন্তান সংসারে আসিয়াই আট দিনের মধ্যে মাতৃহীন হইয়া কি দুঃখের সাগরে ভাসিলেন! জানিনা, কি মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, ভগবান তাঁহার স্বর্গের প্রিয় শিশুরত্নকে, এই অপরিচিত সংকটময় সংসারে পাঠাইয়াই মাতৃহারা করিয়া, অপূর্ব্ব অমূল্য মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করিয়া মহাদুঃখের সমুদ্রে ভাসাইলেন। অথবা স্নেহময়ী জগজ্জননী স্বয়ং সেই সদ্যোজাত শিশুর জননী হইয়া, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার সকল ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রিয় পুত্রকে নিজের হাতে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, নিজের মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন বলিয়াই, বুঝি জগদ্ধাত্রী

জননী দেবী আপনার হাতে সেই মাতৃহীন অনাথ শিশুকে আপন স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। তাই বুঝি সে জীবন এত সুন্দর, এত সুমিষ্ট, এত কোমল, এত পবিত্র হইয়াছিল। তাই বুঝি আজীবন সেই মাতৃহারা সন্তানের মা হইয়া, নিশিদিন সাথে সাথে থাকিয়া, তাঁহাকে নিজের কোলে নিরাপদে রক্ষা করিলেন, এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত সে দেবজীবনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সকল বিষয়ে সার্থক করিয়া, অবশেষে সমাদরে শান্তিধামে ডাকিয়া লইলেন। জননীর বিশেষ করুণায় দেবশিশু পৃথিবীতে আসিয়া, দয়া স্নেহ প্রেম ভালবাসা ক্ষমা শান্তি ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানাবিধ সুমধুর পবিত্র সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থির শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মধুর প্রকৃতি, তাঁহার সরল সুমিষ্ট সুকোমল স্বভাব যিনি একবার দেখেছেন, একবার তাঁহার সহিত পরিচিত হয়েছেন, তিনি কখনও ভুলিবেন না। তিনি একজন পরম ভক্ত বিশ্বাসী, নির্ম্মল সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। উচ্চ উদারহৃদয়, সর্ব্বদা সুন্দর পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণ দ্বারা সুশোভিত ছিলেন। এই বিশাল সংসারে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না। পৃথিবীর সকলকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, আপনার জন ও আত্মীয়জ্ঞানে চিরদিন সকলের শুভকামনা ও মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। এমন স্নেহপরায়ণ কোমল হৃদয় পাইয়াছিলেন যে, কাহারও দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলেই বড়ই কাতর হইতেন। সকল সময় তাঁর সুকোমল স্নেহময় প্রাণ পরদুঃখে গলিয়া যাইত। শেষ জীবনে রোগশয্যায় পড়িয়া, যখন রোগের যাতনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখনও দেখিয়াছি, অন্যের কষ্টের কথা শুনিলেই তাঁর হৃদয় বিগলিত হইত, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কোনও পুত্রহারা জননী তাঁহার অসুখ দেখিতে আসিয়াছিলেন; তিনি সেই শোকার্ত্তা মাতাকে দেখিবামাত্র, তাঁহার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া, আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। কোনও উচ্চ সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি নবজামাতাকে অকালে হারাইয়াছেন শুনিতে পাইয়া, রোগশয্যায় তিনি এত ব্যথা পাইয়াছিলেন যে, কয়েক ঘণ্টা অবিশ্রান্ত অনর্গল কাতরবাক্যে তাঁহার শোকে সহানুভূতি ও দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁর প্রাণ সকলের জন্য সব সময় সহানুভূতি, সমব্যথা, সমবেদনায় পূর্ণ থাকিত। আর এক জনের উপযুক্ত একমাত্র সন্তান জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষণ সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত, সেই বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিবামাত্র, তাঁহাকে অতি ব্যাকুল ভাবে কাতরস্বরে তাঁর সন্তানের সকল খবর জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাণ তাঁর সঙ্গে সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। নিজের রোগযন্ত্রণা সব যেন ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ কুসুমসম কোমলপ্রাণ ভক্তি কৃতজ্ঞতায় একেবারে যেন পরিপূর্ণ ছিল। কাহারও কাছে কোনও দিন কোনও উপকার পাইলে, সারা জীবনে তাহা কখনও ভুলিতেন না। একদিন তাঁর একজন প্রাচীন ধর্ম্ম-বন্ধু অসুস্থ শরীরে অনেক দূর পথ হাঁটিয়া তাঁহার অসুখে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই কৃতজ্ঞতাভরে সাদরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, আপনি এত কষ্ট করে এত দূর থেকে আমায় দেখতে এসেছেন! আর বলিতে পারিলেন না, প্রাণের গভীর ভক্তি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস ধারণ করিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। সারাজীবন প্রাণ ভরিয়া তিনি সকলকে ভালবাসিয়া গিয়াছেন। স্নেহের পুত্রকন্যা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার অসীম অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার তুলনা নাই, উপমা নাই, তাহা বর্ণনার অতীত। তিনি সন্তানদের যথার্থ মঙ্গলসাধনের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। কিসে সন্তান উচ্চ পবিত্র ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন, সেই একলক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সন্তানদের প্রকৃত কল্যাণ-কামনায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, পবিত্র সেবাব্রতে অকাতরে নিজ দেহপাত করিয়া-ছেন। কঠোর কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়ব্রত, স্থির বিশ্বাসী হইয়া সন্তান-সেবায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়াছেন। সন্তানদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, প্রত্যেক শোণিতবিন্দু দান করিয়া, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া গিয়াছেন। জগতের মঙ্গলের জন্য, সন্তানের কল্যাণ ও পবিত্র জীবনলাভের জন্য, তাঁর সেই প্রাণের প্রিয় দেবতা ভগবানের চরণে কত কাতর প্রার্থনা, কত আকুল ক্রন্দন, কত অশ্রুজল ঢালিয়াছেন, পৃথিবী চিরকাল তাহার সাক্ষ্যদান করিবে। দৈনিক পারিবারিক উপাসনা, নিত্য প্রার্থনা, ভগবদারাধনা তাঁর সাধু জীবনের মহাব্রত ও শ্রেষ্ঠভূষণ ছিল। সন্তানগণের জীবন যেন ফুটন্ত গোলাপ ফুলের ন্যায় সুন্দর, সুমিষ্ট ও পবিত্র হয়, ভক্তবৎসল ভগবানের চরণে, সেই ভক্তের ভক্ত দিবারাত্র ভক্তিভরে এই প্রার্থনা করিতেন। প্রাত্যহিক নিত্য উপাসনার সময় সব ছেলেদের যোগদান সম্ভব হইত না বলিয়া, প্রতি শুক্রবারে সন্ধ্যায় উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া, সকলকে লইয়া ভক্তিভরে পিতার চরণতলে পূজায় বসিতেন। তিনি একজন ব্রহ্মভক্ত, নববিধানবিশ্বাসী, আদর্শ ব্রাহ্ম ছিলেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগৎপিতা তাঁর এই প্রিয় সন্তানের মহাসাধনায় সিদ্ধি দান করিয়া, তাঁর এই সারা জীবনব্যাপী মহাতপস্যায় সফলতা দান করিয়া, অনন্তকাল স্বর্গের অক্ষয় আনন্দ শান্তিতে তাঁহাকে চিরপূর্ণ রাখিবেন, ইহাই আশা ও বিশ্বাস।

—:—

বিশ্বাসীর স্বর্গলাভ

ভক্তিভাজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে পঞ্চপ্রদীপের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই পঞ্চপ্রদীপ দিয়া যাঁহারা জীবনে কিছুকালও বিধাতার পূজা করেন, তাঁহাদের জীবন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাঁহাদের চক্ষের দৃষ্টি অন্যরূপ হয়, তাঁহাদের বক্ষে মূল্যের ধারাও

পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাতে রক্ত মাংস নূতন মূর্ত্তি লাভ করে, অস্থিমজ্জায় তেজ ফাটিয়া বাহির হয়। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে পরিষ্কার অনুভব করিতে পারা যায়, ঐ পঞ্চপ্রদীপের আলো ভিতরের হাড় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সেখানে জমা হইয়াছে এবং সাধকের অস্থি অধিকতর শুভ্র হইয়াছে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী প্রেরিতদলের মধ্যে যে নূতন ধর্ম্মবিধানের অভিব্যক্তি হইল, বহুযুবক সেই বিধানের সত্য ও মহিমা উপলব্ধি করিলেন। কেশবদলের বিদ্যুৎপ্রভাবের মধ্যে পড়িয়া বিপরীত ভাবে পূর্ণ সমাজের সম্মুখে আপনাদের বিশ্বাস স্বীকার করিয়া, নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার শক্তিও এই সকল সাধকবৃন্দ লাভ করিলেন। নববিধানের ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান লুপ্ত হইবার নহে। মণ্ডলীর প্রাচীন জ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার তিরোধানের সংবাদ পাইয়া যখন দেহাবশেষ দর্শন করিতে গেলাম, সেই জরাশীর্ণ অস্থি চর্ম্মের ভিতরে নববিধানের স্থির সাধকের অবশেষ ও অস্থির জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

অটুট লীলাময় চিরকর্ম্মী বিধাতার এই যে বিরাট নূতন ধর্ম্মবিধান, এই বিধানে যাঁহারা অকপট বিশ্বাস লাভ করেন ও সাহসের সহিত সেই বিশ্বাস স্বীকার করেন, এবং তৎপরে সমস্ত জীবন তাহা অক্ষুন্নভাবে পালন ও সাধন করেন, তাঁহারা কি বীর নহেন? সে সকল বীর কি সৌভাগ্যবান্ নহেন? সেই সকল সৌভাগ্যশালী আত্মার অদৃষ্ট ও নিয়তি কি কামনার বস্তু নয়? পৃথিবীতে সাধক হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সহিত নববিধানবিশ্বাসী যে মণ্ডলী তাঁহার জীবনের সাধন ফল ও সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কি সে সৌভাগ্যের অংশ লাভ করিতে উন্মুখ হইবেন না? এক একটী বিশ্বাসী জীবনের মূল্য তাঁহাদের সোণার ওজনেরও অধিক। ভগবান্ ভক্তের অধীন। মণ্ডলীর ভিতর যে শূন্যতার হাহাকার, শুষ্কতার হাহাকারে আমরা কাতর হইয়াছি, বিশ্বাসের দিকে আবার দৃষ্টি দিলে এই শূন্যতা, এই শুষ্কতা হাওয়ায় মিশিয়া যাইতে কতক্ষণ লাগিবে?

১১শের জন্মোৎসবের পরেই এই স্বর্গে নবজন্মের উৎসব। কেশবজীবনে বিশ্বাসের অলৌকিক রক্তধারার স্পন্দন আবার অনুভূতির পরই নববিধানবিশ্বাসী প্রাচীন সাধকের বিশ্বাসে এই নবনিয়তিলাভ—বিধাতারই ব্যবস্থা। প্রিয়জনের চিরবিদায়, মণ্ডলী হইতে বিশ্বাসীর তিরোধান, দীর্ঘ সাধনের অবসানে সাধকের দিব্যলোকে নবনিয়তিলাভ—এই সকল উৎসব হইয়া যদি সকলের মধ্যে নূতন সংকল্প ও বিশ্বাসকে দৃঢ় মূল দান করে, গৈরিককে স্থায়ী করে, symbol এ loyalty আনিয়া দেয়, এবং বিবেককে উন্নীত করে, তবে আমাদের জন্য বিধাতার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। নূতন আনন্দে মণ্ডলী প্লাবিত হইবে, যে নববিধান তাঁহাদের বক্ষের মাণিক, সাধনের ধন হইয়াছিল, জগৎকে তাহার অংশী করিবার জন্য আমাদের ভিতরে কত উন্মাদনা আসিবে, কর্ম্মের নূতন পথ ও পরিকল্পনা বাহির হইবে, নববিধানের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইবে, প্রচারের জন্য কত ত্যাগ, কত দান আসিবে, কত গ্রন্থমালা রচিত, প্রকাশিত, বিক্রীত ও বিতরিত হইবে এবং পৃথিবীর কত পুস্তকালয়ে প্রেরিত হইবে, যাহা এই সকল গ্রন্থমালাকে স্থান দান করিয়া মানবকে নূতন ধর্ম্ম, কর্ষণ ও পরিমার্জ্জনার পথে তুলিয়া দিবে, কত বৃত্তি, কত সাহায্য উৎসাহী তরুণগণকে ভ্রমণে রত, কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও ভক্তিমূলক সেবায় অনুপ্রাণিত করিবে, নূতন সার্থকতায় মণ্ডলীর মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইবে, জগতের মধ্যে ইহা আবার একটী বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে, বিশ্বাসীর দেহরক্ষা দধীচির অস্থিদান হইবে।

নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ।

—·—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২২শে নবেম্বর, ৬৭।১ একডালিয়া রোডে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের সপ্ততিতম শুভ জন্মদিনে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা বসু প্রচারভাণ্ডারে ২৲, বালকদের নীতিবিদ্যালয়ে ২৲, বালিকাদের নীতিবিদ্যালয়ে ২৲, পুণ্যাশ্রমে ২৲, ভগ্নীসমিতিতে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে নবেম্বর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

স্বর্গগত শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ বিমানবিহারী দের এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দের শুভ জন্মদিনে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সেবিকা হেমলতা চন্দ তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া উপাসনা ও প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৪ই ডিসেম্বর, ৪০।১এ মনোহরপুকুর ফার্ষ্ট লেনে, শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের গৃহে, তাঁহাদের প্রিয়তমপুত্র স্বর্গীয় মনোজিতের জন্মদিন-স্মরণে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী শ্রীমতী স্নেহলতা রায় দাতব্য ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১৩ই ডিসেম্বর, পি,২০ডি, কালিদাস পটিটোণ্ডি লেনে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্র, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নবজাত শিশুপুত্রের শুভজাতকর্ম্মানুষ্ঠানে, শিশুর প্রমাতামহ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২৪শে অক্টোবর মাতামহগৃহে জন্মলাভ করে। শিশুর পিতা এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা

দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২৬শে অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় ৬৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, সম্বলপুরনিবাসী স্বর্গীয় বামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্রের সহিত, কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকারের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইলার শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। বোলপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন পৌরোহিত্য করেন। ২৬শে বরানুগমনে ও ২৭শে বরবধূর শুভাগমনে ২৪।২ বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়াছে। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

প্রেমেন্দ্র-আশ্রম—গত ৩০শে নবেম্বর, পুরীতে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধা দেবীর একমাত্র সন্তান স্বর্গীয় প্রেমেন্দ্রের স্মৃতিতীর্থ "প্রেমেন্দ্র-আশ্রমের" প্রস্তরফলক শ্রীমতী আনন্দিতা দেবী কর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত হয়। নূতন হলে সতরঞ্চ পাতিয়া স্কুলের প্রায় ৫০টী শিশুকে মিষ্টিমুখ করান হয় ও প্রেমেন্দ্রকাহিনী বলা হয়।

পারলৌকিক—গত ২৪শে নবেম্বর, স্বর্গীয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, কলিকাতার সহিত যোগরক্ষা করিয়া, ভাগলপুরে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু, বাঁকিপুরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে পরেশবাবু উপাসনা করেন।

পরলোকগমন—আমরা অতীব দুঃখের সহিত শোক-সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৫ই ডিসেম্বর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, "সঞ্জীবনীর" স্বনামধন্য সম্পাদক, স্বদেশী যুগের বর্ষীয়ান নেতা, নারীরক্ষা-সমিতির প্রাণস্বরূপ, নির্ভীক, মহাতেজস্বী, ধর্ম্মপ্রাণ, অনীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী, শক্তিবান্ পুরুষসিংহ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র গৌরবদীপ্ত কর্ম্মময় জীবনের অবসানে, ৮৫ বৎসর বয়সে, অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে পরিবার, সমাজ ও দেশ মহা ক্ষতিগ্রস্ত। ভগবান্ পরলোকপ্রস্থিত আত্মাকে উন্নতলোকে স্থানদান করুন, শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাগণের এবং বন্ধুবান্ধবগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই ডিসেম্বর, ২৪নং তারক চাটার্জ্জি লেনে, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ, সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর, সাধু অঘোরনাথের সাম্বৎসরিকে, ৬।২বি, এণ্ডালিয়া রোডে, পুত্রদের গৃহে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, প্রাতে ৫।১ মাধব লেনে, শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দের পুত্র স্বর্গীয় মনোগতধন দের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং ভগ্নী শ্রীমতী অশোকলতা দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। অদ্য পাটনায় ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা দের গৃহেও উপাসনা হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সেবিকা হেমলতা চন্দ সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ২৲ এবং ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

অদ্য সন্ধ্যায় আলিপুরে, ২৮নং নিউ রোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠজামাতা শ্রদ্ধেয় গৌরীপ্রসাদ মজুমদার-প্রেরিত প্রার্থনা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন পাঠ করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকার সংবাদ—গত ১০ই অক্টোবর, বিধানপল্লীর দেবালয়ে প্রেরিত শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারের পুণ্যস্মৃতিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে দেবালয়ে সঙ্গীত ও জীবন-চরিত সম্পর্কে আলোচনাদি হয়। এই উপলক্ষে পৌত্র অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২২শে অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত পাঁচদিন স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের ভবনে শারদীয় উৎসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ, পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সমাদ্দার ও শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ উপাসনা করেন।

গত ২৪শে অক্টোবর, সন্ধ্যাকালে স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেনের ভবনে, তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীমতী চারুবালা দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ আচার্য্যের কার্য্য করেন। চারুবালা দেবীর শোকাতুরা জননী ক্ষীরোদা দেবী একটী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে পাঞ্জার জন্য ১০০৲ টাকা দান করা হয়।

গত ৪ঠা নবেম্বর সন্ধ্যাকালে ঐ ভবনে, স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেনের পৌত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শৈলেন্দ্র বাবু মন্দির ফণ্ডে ২৲ দান করেন। ইতিপূর্ব্বে ২৮শে অক্টোবর তাঁহার তৃতীয়া ভগ্নী শ্রীমতী রেণুকার বিবাহে মন্দির ফণ্ডে ১০৲ দান করিয়াছেন। এই বিবাহ-সংবাদ পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ৮ই নবেম্বর, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় সুধেন্দুকুমারের হঠাৎ পরলোকগমন উপলক্ষে, তাঁহাদের ঢাকাস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ আত্মশ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস নববিধান ব্রহ্ম-মন্দির ফণ্ডে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭১ ভাগ। ২৪শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ 31st. December, 1936 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা দীনজননি, তুমি তোমার দীন অকিঞ্চন সন্তানদের নিয়ে উৎসব করিতে অভিলাষ করিতেছ। আমরা আমাদের নিজেদের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি, তখন লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাই। কত অবিশ্বাস, অপ্রেম, অমিলন, কত পাপ তাপ, কত দুর্নীতি, দুরবস্থা! এহেন আমরা তোমাদের উৎসবের অধিকারী! যে উৎসবানন্দ স্বর্গের দেবতারা সম্ভোগ করেন, সেই উৎসবানন্দ আমাদের ভাগ্যে তুমি বিধান করিতেছ! মনে হয়, এ যে অসম্ভব; তবে তুমি বুঝিতে দিতেছ, তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, মহাপাপী পলকে তরিয়া যায়। তোমার কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা। "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্"। তোমার কৃপায় "অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেটে যায়, বোবা গীত গায়, বধিরে শোনে।" তোমার কৃপায় মহাপাপী যে, সেও স্বর্গের সুধা পান করে। উৎসব আর তো কিছু নয়, স্বর্গের সুধাপান। নানা রকমে আমরা অপরাধী, কত তোমার অবাধ্য; তোমার অধীন না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভেসে চলেছি। নিজেরা দুঃখের বোঝা রচনা করে তাতে ভারাক্রান্ত হইতেছি। নানা রকমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অন্তর্য্যামিণি মা, তুমি সবই জান। তোমাকে কিছু জানাতে হয় না। আমাদের এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য তুমি সদাই ব্যস্ত। "ওপথে যেও না, ফিরে এস বলে" কতবার তুমি আমাদের ডেকেছ। সুখে ডেকেছ, দুঃখে ডেকেছ, বিপদ প্রলোভনে ডেকেছ, পাপ তাপে ডেকেছ। সদাই তুমি ডাক, যাতে তোমার কথা শুনে তোমার পথে চলি। তোমার ডাক না শুনে এবং তোমার পথে না চলেই তো আমাদের এত দুরবস্থা। অবাধ্য সন্তানদের কি করে ভুলাতে হয়, তুমি যেমন তাহার কৌশল জান, এমন আর কে জানে? "আমাদেরই জন্যে, স্বর্গ নিকেতনে গো মা, কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি রেখেছ যতনে, নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে গো মা।" উৎসবের মধ্যে এই স্বর্গের ছবি দেখাইয়া কত আদরে আমাদিগকে ডাক। তাই তো উৎসবের আহ্বান শুনলেই প্রাণ কেমন করে উঠে। তুমি যেমন মন ভুলাতে পার, পাপমুগ্ধ প্রাণকে স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্য দেখাইয়া পাগল করতে পার, এমন আর কে পারে? তাই বলি, তোমার প্রেমের জয় হবেই হবে। পাপী কোথায় পলাবে? তোমার প্রেম-ফাঁদে তাকে একদিন না একদিন পড়তেই হবে। অনন্ত প্রেমময়ী মা, তাই তো বৎসরকার দিনে তোমার ঘরে

গিয়া তোমার প্রেমের উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে ডাকিতেছ। ডাক, খুব ভাল করে ডাক। মোহমুগ্ধ প্রাণের ঘুম ভাঙ্গুক, প্রাণ জেগে উঠুক, তোমার স্বর্গের উৎসবের দিকে উন্মুখীন হউক, আকুলপ্রাণে উৎসবের দিকে ছুটিয়া চলুক। কত বাধা প্রাণে, তাতো দেখছ! সব বাধা দূর করে দিয়ে, প্রাণগুলিকে একবার তোমার প্রেমে মাতাও দেখি মা। উৎসবে তুমিও মাত, তোমার ভক্তদেরও মাতাইয়া তোলো। না মাতলেতো তোমার উৎসব হয় না। আমরাও একেবারে মেতে যাই। মেতে প্রেমানন্দে নাচি গাই, আর উৎসবানন্দ সম্ভোগ করি। প্রস্তুত করিয়া লও। সকল প্রাণের রুদ্ধ দ্বার তুমি তোমার প্রেমের স্পর্শে খুলিয়া দাও, সকলকে প্রাণে নিই, সকলের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হই; আর তোমার প্রেম-স্রোতে ভেসে যাই, বিচারে আর কাজ নাই। এমনি করি সকলকে প্রস্তুত করে নাও, মা উৎসবজননি! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

উৎসবের আহ্বান

ঐ শোন, ভাই বোন, মা ডাকছেন! বৎসরকার দিনে, প্রেমোন্মাদিনী মা প্রেমভরে, কত ভালবেসে আদর করে সবাইকে ডাকছেন। বলছেন, ওঠ, জাগ, একবার নয়ন খোল। ঘরে ঘরে মা যেমন ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে তোলেন—ওরে ওঠ, দেখ, রাত্রি অবসান হয়েছে, নবপ্রভাতের সূর্য্য দেখা দিয়েছে। তেমনি জগজ্জননী মোহনিদ্রাভিভূত নরনারীকে করুণনিঠুরস্বরে আজ শুভ-দিনে ডাকছেন, ওরে ওঠ, কতকাল আর মোহনিদ্রায় অচেতন থাকবে; একবার উঠে দেখ, নবোৎসবের নব প্রভাতের আলোক দিগ্‌দিগন্ত ছাপিয়া প্রকাশিত হইবার উপক্রম করেছে: সুসময় উপস্থিত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া এই নবালোককে বরণ কর। নবালোকে স্নাত হইয়া তেজোময় হও, জীবনের অসাড়তা, শীতলতা পরিত্যাগ করে এই আগুনের স্পর্শে অগ্নিময় হও।

মরা মানুষগুলিকে বাঁচাবার জন্য নবজীবনদায়িনী জননী উৎসবের আগুন নিয়ে আসেন। তাই ভক্ত কবি উৎসবের দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর দহন-দানে।" "হরিপ্রেমানলে জ্বলে হবে খাঁটি সোণা (এবার)।" সংসারের কাল পথে চলিয়া জীবনটা কত কাল হয়, অঙ্গার-সদৃশ হয়, ভাল মা তাই এই কালকে ভাল করিবার জন্য, কাল অঙ্গারকে সোণার রঙ্গে রাঙ্গা করিবার জন্য উৎসবের আগুন নিয়ে আসেন এবং আগুনের ভিতর পড়িবার জন্য আহ্বান করেন। এই আগুনে যাঁরা ঝাপাইয়া পড়িতে পারেন, তাঁরাই মরিয়া আবার নূতন জীবন লাভ করেন। সংসারের মানুষটি একবার না মরলে তার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হয় না। সংসারের মানুষটার রূপ কি? না, আমিত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা, অবিশ্বাস, অপ্রেম, স্বার্থপরতা প্রভৃতি। এই সব কাল দাগে শরীর মন আত্মা বিকৃত, বিবর্ণ। এই মোহের বিকৃত আবরণটা যখন পুড়ে যায়, তখনই ভিতরকার সোণার রং ফুটিয়া বাহির হয়।

আবার সারা বৎসর সংসারপথে নিজের ক্ষীণ বুদ্ধি-জ্ঞানের আলোক ধরে যতবার চলিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই পথতো দেখি নাই, বরং নিজের আলোকে নিজে পুড়িয়া কত জ্বালা অনুভব করিয়াছি। ছোট ছেলের আলোক নিয়ে চলতে গেলে এই অবস্থা হয়, নিজের আলোকে নিজে পুড়িয়া মরে; কিন্তু মা যখন আলো দেখান, তখন শিশু নিরাপদে মায়ের সাথে সাথে আলো ধরে ধরে চলে যায়। আমরাও যে শিশু ছেলের মত কত অবোধ; নিজের অজ্ঞানতা নিজে বুঝিনা, তাই নিজেই আলো ধরে জীবনপথে চলতে গিয়ে এই দুর্দ্দশা হয়। অনন্তজ্ঞানদায়িনী জননীর কাছে আমরা শিশুর চেয়েও শিশু। কোন্ পথে কি ভাবে তিনি নিয়ে যাবেন, তিনিই জানেন; এই জীবন-রহস্য আমরা কিছুই জানিনা। তিনি পৃথিবীতে এনেছেন, রেখেছেন, শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে জীবনটাকে তাঁর মনোমত তাঁর আলোকে চালাবেন। ইহা মানবজীবনের নিয়তি ও গতি। মোহের অন্ধকারে এই নিয়তির পথ আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাই উৎসবের জ্বলন্ত জ্যোতির রাজ্যে আমাদিগকে টেনে নিয়ে, আমাদের জীবনের গতি, নিয়তি সাক্ষাৎভাবে সুস্পষ্টরূপে জানিতে ও বুঝিতে দেন। উৎসব একটা দিগ্‌দিগন্তব্যাপী জ্বলন্ত জ্যোতির ধারা। সারা বৎসর যে ঘুমিয়ে থাকে, সেও এই জ্যোতির প্রকাশে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না।

এই জ্যোতির ঝলকে সেও চমকে উঠে, তার নয়ন ঝলসিয়া যায়, চোখ না মেলে আর পারে না। জীবন্ত জাগ্রতরূপিণী জননী এইরূপে উৎসব এনে আমাদের ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়ে দেন, জীবনরাজ্যে নব যাত্রার সূচনা করেন।

আর এক কথা। জীবনের কোণে কোণে কত আঁধার লুকিয়ে আছে, কত পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, কত অহঙ্কার, কত অপ্রেম, কত স্বার্থপরতা, কত জঘন্যতা অজ্ঞানতার ঘনীভূত ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া আছে, তাহাতো সব সময় দেখি না। রঞ্জনরশ্মির যোগে যেমন শরীরের অভ্যন্তরস্থ সকল গুপ্ত রোগ ধরা পড়ে, তেমনি উৎসবের ঘনীভূত আলোকের উজ্জ্বল কিরণে জীবনের সমস্ত পাপরোগ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সারা বৎসর একা একা জীবনের পথে চলিয়া নিজের অন্ধকারে নিজকে হারাইয়া ফেলি; উৎসবের মধ্যে ভাইভগ্নীদের মহামিলনের জীবন-জ্যোতির মাঝে নিজের জীবনকে পরখ করে নিতে গিয়ে দেখি, আমি নরকের কোন গভীরতম অন্ধকারে পড়িয়া আছি। দশজনের ভিতরে না গেলে, দশজনের জীবনের আলোকে নিজেকে না দেখলে, নিজের জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না, আত্মজ্ঞান সুস্পষ্টরূপে লাভ হয় না। নিজের আলোকে নিজেকে দেখতে গিয়েই ভ্রান্তিতে পড়ি; দশজনের জীবনের আলোর মাঝে নিজকে দাঁড় করাইলে দেখি, জীবনের মধ্যে কত কালি, কত ছাই। আপনার মধ্যে হারাণ জীবনকে দশজনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া মহা সৌভাগ্য। নিজের মনোমত হয়ে আমি জীবনপথে চলতে পারি না, সে পথ বিধানের নয়; বিশ্ববিধাতার মনোমত হয়ে, তাঁর পুত্র কন্যাদের মনোমত হয়ে, দশজনের মনোমত হয়ে চলার রাস্তাটাই আমার পক্ষে প্রশস্ত ও উদার পথ। উৎসবের মধ্যে দশজনের সঙ্গে প্রেমের মিলনে আমাদের জীবনের সম্মুখে উদার প্রশস্ত পথের সন্ধান পাইয়া, বিধানের পথে নূতন জীবনযাত্রা সুরু হয়। ইহা জীবনের পক্ষে মহালাভ। সংকীর্ণ মৃত্যুর পথ পরিত্যাগ করিয়া, উদার নিত্য নবজীবনের, অনন্ত জীবনের পথে জীবনযাত্রা বিধানবিশ্বাসীর নিত্য নিয়তি।

উৎসবের মধ্যে বিধানের উদার পথে জীবনের গতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যায়। আমার ছোট্ট প্রাণের মাঝে একমাত্র নিজকে নিয়া আমি এতদিন ছিলাম; এখন দেখি, সে প্রাণে কত জনের অধিকার, কতজনের দাবি দাওয়া সে প্রাণের উপরে। এতদিন স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইয়া, আমিত্ব স্বামিত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতার বিলাসভোগে মত্ত ছিলাম, এখন দেখি, ভগবদিচ্ছায় আমার ইচ্ছা প্রতিহত, দশজনের ইচ্ছার কাছে আমার ইচ্ছা অনুগত। স্বামিত্বের অহঙ্কার তখন অতি তুচ্ছ মনে হয়, চিরদাসত্বের অলঙ্কারই জীবনের আকাঙ্ক্ষণীয় মহাভূষণ হয়। ভেদাভেদবাদের তুচ্ছ প্রলোভনের ভিতরে আপনাকে পৃথক রেখে এতদিন কি দৈন্যের মুকুট পরিধান করিয়া ভ্রান্তগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলাম, উৎসবের প্রেমবন্যায় সে ভেদাভেদ কোথায় ভাসিয়া যায়, মহাপ্রেমের রাজ্যে দাসত্বের অভেদরূপের সৌন্দর্য্য মন প্রাণকে কত মুগ্ধ ও বিনীত করিয়া রাখে। স্বেচ্ছার রাজ্যে অহঙ্কারবিষে জর্জ্জরিত প্রাণ উৎসবের মধ্যে পরেচ্ছার সহিত মহামিলনরাজ্যে বিনয়ামৃতরসপানে অমরত্ব লাভ করে ধন্য হয়।

উৎসব-ক্ষেত্র একটা মহাযোগের ঘর। এখানে মানুষের সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ যোগ, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের যোগ, ধনীর সঙ্গে গরিবের যোগ, সাধুর সঙ্গে পাপীর যোগ, দেহীর সঙ্গে বিদেহীর যোগ। একাত্মতা-সাধনের স্থান উৎসবক্ষেত্র। আমরা যে এক অখণ্ড পরিবারের লোক, এক পিতামাতার সন্তান, কেহ কাহাকে ছাড়তে পারি না; আমরা সকলে প্রাণে প্রাণে মিলে মায়ের প্রেমান্ন ভোজন করিবার অধিকারী। ভাই বোন সকলে একপ্রাণ হয়ে মার প্রেমান্ন ভোজন করাই উৎসব। এতে আনন্দময়ী মার প্রাণে কত আনন্দ হয়। সবাই যদি মার ঘরে এসে, মার হাতে তাঁর প্রেমান্ন ভোজন করে, তবে মা যে কত সুখী হন। কেহ এল, কেহ এল না, এতে যে মার প্রাণে বড়ই অঘাত লাগে। মা চান, তিনি যেমন আমাদের ডাকছেন, আমরাও পরস্পর পরস্পরকে ডাকি, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলি, এবং সব বিবাদ বিসম্বাদ অপ্রেম অমিলন ভুলে গিয়ে, মার অনন্তপ্রেমের খাতিরে সবাইকে জড়িয়ে ধরে বুকে করে মার ঘরে টেনে নিয়ে আসি। আমি হয়তো কত প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সেই জন্য তাঁরা অভিমানভরে মার ঘরেও আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার দোষে মার প্রতি তাঁদের এই অবমাননা। উৎসবের পূর্ব্বে তাঁদের সকলের পায়ে

ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে বলি, ভাই, এ যে আমার অপরাধ; আমার অপরাধে মাকে ভুলিও না, ছাড়িও না। আমাকে ক্ষমা কর, "চল চল, ভাই, মার কাছে যাই।"

উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। মা সকলকে ডাকছেন। মার জন্য, ভাই বোনদের জন্য প্রাণের খুব ব্যাকুলতা হউক। মাকে ছেড়ে, ভাইবোনদের ছেড়ে জীবনের কি যে দৈন্যদশা, আজ ভাল করে অনুভব করি। মাকে ভাল করে দেখব, ভাইবোনদের ভাল করে পাব; সবাই মিলে মার কোলে বসব, মার মুখপানে তাকাব, মার হাতে খাবো, মার কোলে ঘুমোবো, কি আনন্দ! এই স্বর্গের উৎসবের কথা ভাবিলেও কত আনন্দ হয়। এই স্বর্গের ছবি প্রাণে নিয়ে সর্ব্বতোভাবে আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই। মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

—৹—

ঈশাতত্ত্ব

"এই বহুভাবজড়িত, প্রলোভন-তাড়িত, ধর্ম্মজীবনে আমি এমন সহায় ও সঙ্গী আর কাহাকেও পাই না, ঈশা যেমন। মানুষ-জন্ম লইয়া জনসমাজের শত প্রলোভনে কিরূপে সংসার মধ্যে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হয়, তিনি তদ্বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। আমি সেই পথে বহুকষ্টে চলিতেছি। আমার অস্থির অন্তরে ঈশার চিন্ময় প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার জীবনপ্রদ জীবন, তাঁহার মুক্তিপদ মরণ, তাঁহার নিশ্চিত অমরত্ব ক্রমে ক্রমে স্বয়ং পরমাত্মা প্রকাশ করিলেন; ইহার ঐতিহাসিক ও বাহ্যিক প্রমাণও অনেক পাইলাম, নিজ জীবন, নানা জাতির জীবন তার সাক্ষী। এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। আমার নিকট পরম পিতার স্বভাব, গুণ, চরিত্র ও অভিপ্রায়, মানুষের সঙ্গে পরমাত্মার সহানুভূতি এ জীবনে যতদূর ব্যক্ত হইতে পারে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিলেন ও করিতেছেন। আমার নিকট এই খৃষ্টাত্মা কেবল ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, অভিমানী ধর্ম্মাচার্যাদের কল্পিত পুরুষ নহেন, কিন্তু জীবন্ত দীপ্তিমান, বর্ত্তমান আদর্শ। এই আদর্শ, হে সত্যস্বরূপ, তোমার প্রতিরূপ, তোমাতে পরিপূর্ণ, তোমারই দ্বারা প্রকাশিত, ইহাতে আমার পক্ষে সার ধর্ম্ম সাধ্য হইয়াছে। আমি এই ঈশার অবতারণা মধ্যে জীবে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মে জীবদর্শন করিয়াছি, হে বিশ্বরূপ নারায়ণ, তোমার দিব্য দর্শন পাইয়াছি। এইরূপে আমার চক্ষে দেবাত্মাগণ ও সাধকগণ একাত্মা হইয়াছেন, ও তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ঈশা সকলের অগ্রগামী, সকলে তাঁহার অনুগামী। মুখে কি মতে আমি কাহারও অনুগামী হইতে চাই না, ঈশারও নয়, অন্য কাহারও নয়। কার্য্যে, ভাবে, চরিত্রে, জীবনে মরণে প্রভু ঈশার অনুগামিত্ব ও অধীনতা চিরদিন অবলম্বন করিয়াছি।"

(আশীষ—প্রতাপচন্দ্র)

"মা বলিলেন, 'বুকের ঈশা, তোকে খুব ভালবাসি, কিন্তু কি করিব। মুখ দেখ্‌লে প্রেম উথলিয়া উঠে। পৃথিবীর দুষ্ট লোকগুল বড় ভয়ানক হয়েছে, ক্ষমা করে না; সংসারের মায়া ছাড়ে না। তুই আমার কথা শুন্‌বি? অরণ্যবাসী হতে হবে। তোকে একখানাও বাড়ী দেব না। শেয়াল থাকবে গর্ত্তেতে, কিন্তু ঈশ্বরতনয়ের মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না।' মাতৃগর্ভে তোমার কপালে দুঃখ কষ্ট লেখা ছিল। বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া মাতৃগর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে। নিয়তি উল্টায় কে? মা বলিলেন, 'যারে, ঈশা। একবার পৃথিবীর লোকগুলোকে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আয়। গোয়াল থেকে যে সকল গরু পালিয়ে গিয়েছে, তাদের আবার গোয়ালের মধ্যে নিয়ে আয়। বিপথগামীদের নিয়ে আয়। সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে যাহারা পাপাচার ক'রছে, তাদের হাত ধরে নিয়ে আয়। সুস্থদের দরকার নাই। কাণাকে চোখ, খোড়াকে পা দিয়ে আদত করিয়া দিতে হইবে। রোগীকে ঔষধ দিয়া প্রতীকার করিবে।' হে সুন্দর ঈশা, তুমিও বলিলে, 'মা, চলিলাম। চির ফকীর হইব। প্রাণ যদি কেহ টেনে লয়, তা হলে এই প্রাণ জননীর চরণে দেব। আমার ইচ্ছা তোমাকে দিয়া চলিলাম।'"

(খ্রীষ্টসমাগম—কেশবচন্দ্র)

—৹—

আমার দেখা আর্য্যনারী

জগন্মোহিনী নামের সঙ্গেই জীবন মিলিত ছিল। জগন্মোহিনী দেবীর শৈশব ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি নববিধান ও ব্রহ্মানন্দকে কিরূপে প্রাণে গ্রহণ করে, নিজ জীবন ও সকল নারী-জীবনে কি প্রকারে যথার্থ আর্য্যনারীর গুণ প্রস্ফুটিত হতে পারে, তাহারই জন্য যাবজ্জীবন যত্ন করে গিয়েছেন। আমি যখন থেকে জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে বিশেষভাবে মিলিত হয়েছিলাম, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শ্রীআচার্য্যদেব স্বর্গারোহণ করেছেন। তাঁর আশ্চর্য্য পতিভক্তি, ধৈর্য্যশীলতা দেশের সকল নারীর গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বলেই সকলের কাছে নিবেদন করছি; শ্রীআচার্য্যদেবকে পতি লাভ করে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করতেন। স্বামীকে আচার্য্যরূপে, বন্ধুরূপে, ইহ পরলোকে ধর্ম্মসঙ্গিরূপে আত্মস্থ করে, যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন, তন্ময় হয়ে ভগবানের সেবা, ধর্ম্মের আলাপ, নববিধানের কার্য্য, আর্য্যনারী গঠন ইত্যাদি

ধর্মসাধন ও প্রচার করে গিয়েছেন। শ্রীআচার্য্যদেবের যে নাম-মালা লিখেছিলেন, অতি সুললিত সুন্দর সে নামপাঠে আর্য্যনারী ও সকল ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। আচার্য্যদেবের তিরোধানের পরে জগন্মোহিনী দেবী যে অল্প দিন ১৫ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন, ভক্ত স্বামীর ধর্ম্মকে প্রাণগত করে, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করতে কি প্রকার যত্ন ও প্রাণপণ করেছিলেন, যাহারা দেখে নাই, তাহাদের নিকট বলিয়া বোঝান অসম্ভব মনে হয়। জগন্মোহিনী দেবী একটী যোগের ঘর করে ভোর থেকে যোগে বসতেন; আবার সন্ধ্যার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত যোগ সাধন করেও, গভীর রাত্রে কখনও কখনও অনিদ্র হয়ে তিনি যোগে বসে থাকতেন। তাঁর সুকুমার কোমল দেহে অনেক কঠিন বৈরাগ্যব্রত তিনি গ্রহণ করলেন। স্বহস্তে রন্ধন, একাহার হবিষ্য, নানা ব্রতাদি সাধন করতে লাগলেন। নিজ জীবনে তো নববিধানের ধর্ম্ম-সমন্বয় পালন করলেন, পরিবারের সকলকে শিক্ষা দিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মত ভিক্ষালব্ধ অন্ন প্রস্তুত করে খাওয়া, তাও আমাদের করতে শিখিয়ে দিলেন। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে জগন্মোহিনী দেবীর হাতেই আর্য্যনারী প্রস্তুত হয়েছিল। সেই সময় হতে গভীর উৎসাহের সঙ্গে তিনি আচার্য্যদেব-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যনারী সভা সোমবারে করতেন। আর্য্যনারীর বাৎসরিক ও অন্যান্য উৎসব করা তাঁর যেন বিশেষ কাজ ছিল। মধ্যে মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে উৎসব করতেন, পরে আবার বনভোজন, উদ্যান-মিলন, সেখানে উপাসনা সংকীর্ত্তন সদালোচনায় ধর্ম্মজীবনের আনন্দ বর্দ্ধিত হত। শুনা যাইতে পারে অনেক, কিন্তু জগন্মোহিনী দেবী নববিধানের আদর্শে যে আর্য্যনারী গঠন করেছিলেন, বিশ্বাস এবং আশা নয়নে দেখি, তাহা হারাইবার নয়, নব যুগে চিরদিন সব মেয়ে তা গ্রহণ করবে, আর্য্যনারী হবে। মাতৃদত্ত ধন মেয়ে কি ছেড়ে থাকতে পারে? আমাদের প্রিয়তমা রাণীদিদি, বিনিদি'দ যার আদর্শে জীবন কাটিয়ে, আজ যার চরণে উপনীত হয়ে, না জানি কত আনন্দে মগ্ন আছেন।

ধর্ম্মজগতে জগন্মোহিনী দেবী যেমন তাহার গভীরতার ভিতরে মগ্ন হয়েছিলেন, তেমনি আবার জনসমাজকে ভুলেন নাই। নৈতিক দৃষ্টি, জ্ঞানের গবেষণা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, জগতের সকল সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

মাঘোৎসবে প্রতি বৎসরের বরণের গান নিজে করতেন। তাঁর সে ভাবের স্বর্গীয় সঙ্গীতাবলীর, তাঁর গানের পুস্তক জগৎ-হার চিরদিন সাক্ষ্য দিবে। ভক্তজন বিনা তাঁর সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও অমর সুষমা বোঝবার সাধ্য কার। জগন্মোহিনী দেবীর প্রার্থনা-গুলি "প্রার্থনাকুসুমাঞ্জলি" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ভক্তের প্রার্থনা ও নিজ প্রাণের মিলিত সেই প্রার্থনা সকল অতি সুন্দর প্রাণের বস্তু। আরও অনেক লেখা জগন্মোহিনী দেবী লিখেছিলেন।

স্নেহ বাৎসল্যে অনুগত দরিদ্র কাঙ্গাল জনের প্রতি দয়া তাঁকে সর্ব্বদা করতে দেখেছি। আর্য্যনারী কন্যাগণকে হৃদয়ের সহিত স্নেহ করতেন। প্রেরিত প্রচারকগণের সহধর্ম্মিণীদিগকে সহোদরা ভগিনীর মত জ্ঞান করতেন। তাঁর কাছে যখনই কেহ গিয়াছে, কিছু না খাইয়া বা না লইয়া ফিরে নাই। তিনি নিজে একদিন বলেছিলেন, কেহ আমার কাছে এলে কিছু না দিতে পারলে আমার কেমন মনটা অস্থির হয়। জগন্মোহিনী দয়াবতী ছিলেন।

এত মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি যাঁহার ছিল, তিনি দেখিতে সুন্দর না হলেও জগৎকে মোহিত করতে পারতেন; কিন্তু তাঁহার মত সুন্দরী নারী বুঝি একটী মাত্র ভগবান্ গড়েছিলেন। জগন্মোহিনী দেবীর রং স্বর্ণাভ ছিল, সে মুখের সৌষ্ঠব একবার কেহ দেখিলে ভুলিবে না, এমনি ছিল। আমরা তো তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। এতাবৎকাল আমরা মনে রেখেছি, তাঁর চোখ দুটী ছিল শ্রী আননের মাঝে যেন পদ্মপুষ্পে ভ্রমর। তাঁকে কতবার দেখেছি, শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর কোন বিষয়ে তাঁর কথা বলতে বলতে অশ্রু ঝরিয়া পড়ত, চোখ দুটী লাল দেখাত, যেন কি এক সে নয়নের অপরূপ শোভা! জীবনভরে তেমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমা আর দেখিনি ও মনে হয়, আর এ জগতে দেখিব না। বিশ্বাস করি, এ নব-বিধানের জন্য নববিধানের দেবতা ভিতর বাহির সুন্দর করে তাঁকে সৃজন করেছিলেন।

শ্রীকেশবসহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবী সাধ্বী রমণী। তাঁর দেহ শৈশবাবধি অতি সুকোমল ছিল। শ্রীআচার্য্যদেবের অভাব-জনিত কষ্ট তাঁকে বড় ব্যাকুল করেছিল। জগন্মোহিনী দেবী সেই স্বামিশোকের পর থেকে, স্বামী যা ভালবেসেছিলেন, সেই আর্য্যনারী হবার জন্য, নববিধান সাধন করবার জন্য, বৈরাগিণী হয়ে সকলকে আহ্বান করতেন। ভক্তের প্রিয় নবদেবালয়ে অধিক সময় কর্ত্তন করতেন। ভগিনী কন্যা সবাইকে উপাসনা, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তন, রাত্রি জাগরণ, যোগ ধ্যান শেখালেন; তেমন আর হবে না। কিন্তু সুকুমার দেহখানি আর এত বৈরাগ্য সহ্য করতে না পেরে, Diabetes হওয়ার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে অবস্থায়ও যতদিন পেরেছিলেন, ধর্ম্মজীবন পালন করেছিলেন।

দশটী পুত্র কন্যা তাঁর জন্মেছিল। আশ্চর্য্য, ধার্ম্মিকা সতী জগন্মোহিনী দেবী সব সন্তানদিগকে সম্মুখে রেখে, স্বামীকে দেখতে দেখতে স্বর্গারোহণ করলেন; বল্লেন, তুমি এসেছ? আমি যাচ্ছি।

জগন্মোহিনী দেবীর মিষ্ট সম্বোধন, ধর্ম্মের মিলন আমরা যেন না ভুলি। ইঁহার মত আর্য্যনারী যাতে সবাই হই, ধর্ম্মতত্ত্বে তাই এই নিবেদন। (ক্রমশঃ)

সেবিকা—হেমলতা চন্দ

—৩—

জ্যেষ্ঠ হরিনাথ

জ্যেষ্ঠ হরিনাথ আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন! তিনি ব্রাহ্মসমাজের যে যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগে এ ধর্ম্মে আসা সহজ বীরত্বের কাজ ছিল না। সে সময়ে দুর্ভেদ্য সমাজ-বন্ধন, অনতিক্রমণীয় দেশাচার ও শাস্ত্রবিধি এবং আর আর অন্তরায় ভেদ করিয়া আসা ধর্ম্মবীরের বীরত্বের প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মবীর হরিনাথ এই সব অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি হিন্দুপ্রধান ভাগলপুর নগরে বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। আজ এই স্থানে ভাগলপুরনিবাসী আর আর ধর্ম্মবীরের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সময়ে ভাগলপুরনিবাসী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভক্ত নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়গণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া বীরের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বীরত্বের সহিত ভক্ত হরিনাথের ভিতর যে মহত্ব বর্ত্তমান ছিল, তাহারও একটা দৃষ্টান্তের চিত্র না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক সময়ে তিনি যখন এই বাঁকিপুরে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতার আবাসে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। বিনয়ের অবতার হরিনাথ যখন সেই অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে সেই ব্রাহ্মবন্ধুকে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন না এবং সেই ভুলের কথা অবগত হইলেন, তখন তিনি শূন্যপদে শিশু বালকের মত সেই অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মবন্ধুর বাটীতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন এবং করযোড়ে বন্ধুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভাই, ভুল হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করিতে হইবে, আপনি আসুন।" বৃদ্ধ হরিনাথ তখন বন্ধুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন। বিনয়ের অবতার হরিনাথ সেদিন যে দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন, এখন কি সে দৃশ্য বর্ত্তমান সমাজে কেহ দেখিতে পায়? এই দৃশ্য একদিন প্রাচীন হিন্দু সমাজে দেখিয়াছি।

তাহার পর ভক্ত হরিনাথের উপাসনানিষ্ঠার কথা না বলিয়া এ পত্র শেষ করিতে পারিলাম না। বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক সময়ে রাঁচিনগরে আমাদের নিকটবর্ত্তী কোন বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করিতেন। তাঁহার সে সময়ের যোগের ভাব এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে, তিনি কোন্ স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা তখন He knew not where he went. কলিকাতায় যখন পক্ষাঘাতের বাড়ীতে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও রবিবারে রবিবারে নাতীদের সাহায্য লইয়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। তিনি তাঁহার সত্তর বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াও, উপাসনার নিষ্ঠা এবং তাঁহার মজ্জাগত আগ্রহ ভুলিতে পারেন নাই। নাতীরা যখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারে শকটারোহণে কোনরূপে তাঁহাকে উপস্থিত করিতেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের ঠাকুরদাদা মহাশয়কে শিশুর মত কোলে করিয়া মন্দিরে বসাইয়া দিতেন। বর্ত্তমানে এ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

রাঁচিতে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার সঙ্গে কুচবিহারতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপারের প্রকৃততত্ত্ব ও আলোক ধরিতে তিনি অনেক দিন বিরলে চিন্তা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি ইহার সম্বন্ধে এই সত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, এ বিবাহ বিধাতার আজ্ঞামূলক। এই ব্যাপারে ব্রহ্মানন্দ বিধাতার আজ্ঞাপালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যদি লোক-নিন্দা এবং লোকের বিরোধ ও বাধা বিঘ্ন ভয় করিয়া আজ্ঞাপালন হইতে বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে আজ বিধাতার প্রেরিত নববিধানে তাঁহাকে এ আসন দিতে পারিতাম না। ব্রহ্মানন্দের এ আজ্ঞা-পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেবল নববিধানের ইতিহাসে নহে, অন্যান্য ধর্ম্মবিধানের ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হউক।

আজ উপাসনাশীল হরিনাথ সেই উপাসনার অদৃশ্য লোকে উপাসনায় মগ্ন।

সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

প্রার্থনা

(স্বর্গীয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

হে পবিত্র পরমেশ্বর! আমাদিগের পিতৃস্থানীয় সাধু হরিনাথকে তুমি স্বর্গে লইয়া গিয়াছ। হে দয়াল প্রভু, তুমি কেন যে সাধু জীবনকে এত রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে জীবিত রাখিয়াছিলে, তোমার সে গূঢ় রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করিতে পারি না। তবে রোগের মধ্যে, যাতনার মধ্যে, হে প্রভু পরমেশ্বর, তোমার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তির যে আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিয়াছি, মণ্ডলীর জন্য তাঁহার কল্যাণ-চিন্তার যে স্পর্শ লাভ করিয়াছি, ইহাই আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তিনি ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের একটী স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অসাধারণ দয়া তাঁহার অশেষ সেবার সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার গৃহকে একটী তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিল। কত নিরাশ্রয় গরিব ছাত্র তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল, কত অসহায় দুঃস্থ আত্মীয় তাঁহার কৃপার দান পাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখনও চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। তুমি

স্বর্গে তাঁহার আত্মাকে শান্তি বিধান কর এবং এই পরিবারকে স্বর্গের সান্ত্বনা দিয়া চিরদিন রক্ষা কর। ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতৃ-তর্পণ

(১০ই ডিসেম্বর, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের সাম্বৎসরিকে পঠিত)

ঠাকুর! আজ কোথায় আনিলে। আজ কোন্ ঘাটে তর্পণ করিতে বলিলে। এই কি আমাদের ত্রিবেণীর ঘাট? গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনা এক জায়গায় মিলিয়া এ ঘাটকে তর্পণের ঘাট করে, কত তৃষিত আত্মাকে তৃপ্তি দান করিতেছে। আত্মার পিপাসা তৃপ্ত না হইলে যে তর্পণ হয় না। তোমার তীর্থে তুমি কত নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ কর। যিনি ত্রিবেণীর সঙ্গমভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এবং যিনি গঙ্গার বেলাভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলেন, তুমি আজ তোমার এই দুই নবজাত শিশুকে এই ঘাটে ও তীর্থে উপস্থিত করিলে। তোমার নববিধানে তোমার নব ভক্ত শ্রীমধুসূদন এবং তোমার হিন্দুবিধানে নারায়ণভক্ত শ্রীভবানী দুই জনেই সহযাত্রী হইয়া এই অবগাহনের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সে অবগাহনের শেষ নাই। তাঁহারা আর সে জল হইতে উঠিয়া পৃথিবীতে ভাসতে চান না। সে গভীর জলে ইঁহাদের মহামিলন। ইঁহাদের সমুদ্র এক। ভিতরের ভূমধ্যসাগরে সকল জল মিলিতেছে। ঠাকুর! এত বড় জলে আমরা কি নাবতে পারবো? এখনও যে আমরা বাহিরের খোসার ভিতর পড়ে আছি। গুটি পোকাটি যে আবরণ ভেঙ্গে দিয়ে অনন্ত আকাশে উড়ে যায়। এঁরাও যে বাহিরের আবরণ ভেঙ্গে দিয়ে অদৃশ্য অনন্ত আকাশে চলে গিয়েছেন। এই তর্পণের ঘাটে ডুব্‌লে সব আবরণ চলে যায়। মানুষও উড়তে পারে। শ্রীঈশা যে জর্ডানে ডুব দিয়ে অবগাহন করিলেন ও তাঁহার সামনে ওড়া পাখীর সঙ্গে উড়তে গেলেন। তোমার নববিধানের ঘাটে এসে যে তোমার নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ পায়রা ওড়ালেন, এবং তাঁহার ছোট "আমি" পক্ষীকে উড়িয়ে দিলেন। ঠাকুর! এ সব না হলেত প্রেত আত্মাকে পিণ্ড দেওয়া হয় না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর জলে অবগাহন করে, ওঁরা যে প্রেতশিলায় উঠিয়া প্রেত আত্মাকে শ্রদ্ধা-পিণ্ড অর্পণ করেন। ঠাকুর! আজ আমরাও নববিধানের নিভৃত ফল্গুর জলে অবগাহন করিয়া প্রেতশিলায় চলিয়া যাই। অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে সে পাহাড়ে যেতে হয়। নচেৎ পিণ্ড দেওয়া হয় না। ঠাকুর! তোমার যজুর্ব্বেদীরা প্রেত আত্মাকে পিণ্ড দিয়াছেন। তাঁদের সংহিতায় পিণ্ডদান যে মহা সমন্বয়ের নব-সংহিতা। তাঁরা যে বাহিরের সব ভেঙ্গে দিয়ে অদৃশ্য প্রেত-শিলায় চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই পিণ্ডের সঙ্গে ওঁদের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন। প্রেত আত্মার ভোজ্য পিণ্ড ওঁরাও ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "ঈশার রক্ত পান না করিলে ঈশাকে গ্রহণ করা হয় না।" আজ আমরা আমাদিগের নববিধানের প্রেতশিলায় আসিয়া আমাদের নিবেদিত ভক্তি-পিণ্ড ভোজন করিয়া তর্পণ সাধন করি। তোমার নববিধানে পিণ্ডদান কত নূতন। আজ দেখেতেছি, এই দুই মিলিত প্রেত আত্মার সঙ্গে আমাদের মা মঙ্গলা দেবী, ভাই বিনয়েন্দ্র ও ভাই রাজনও মিলিয়াছেন। তোমার বিধানটা কি এতই অদ্ভুত যে, আমাদের স্নেহের জামাতা বিনয়কুমারও পথটা চিনে নিয়ে এঁদের সঙ্গে মিশিলেন। আজ তুমি তোমার এই ঘাটে আমাদেরও নামাও, এবং এঁদের সঙ্গে মিলিত কর। এ মিলন ভিন্ন আমাদের তর্পণ সিদ্ধ হইবে না। তাই আজ, ঠাকুর, তোমার নিকটে ভিক্ষা যে, এই তর্পণযজ্ঞে আমাদেরও তৃপ্ত কর। আমরাও পৃথিবী ভুলিয়া যাই, ওঁদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি, ইহাই প্রার্থনা। এই মিলনই আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার

—•—

কেশব বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

গত ১৯শে নবেম্বর হইতে ২২শে নবেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন রকমের উৎসবের সমাবেশে এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে নবেম্বর প্রাতঃকালে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবক ও আধুনিক ছাত্রবৃন্দের সহিত প্রার্থমিক উপাসনার পর কীর্ত্তন ও সংগীতাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আরকুহার্ট বেলা ৯টার সময় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের প্রাথমিক অনুষ্ঠানস্বরূপ, বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণনা করিয়া, একটী শ্রুতিসুখকর সময়োপযোগী, নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠান সমাধা করেন।

বেলা ১৷৷টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পলান্ন প্রভৃতি খাদ্য দ্বারা ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দের ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন হয়।

অপরাহ্নে বয়স্কাউট্ দলের ঐকতানবাদন, নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল-প্রদর্শন বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সায়াহ্নে পত্রপুষ্প ও নানাবিধ আলোকমালায় সুশোভিত, এবং নানাবিধ বাদ্যমুখরিত বিদ্যালয়গৃহটী অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল।

কেন্দ্রুয়া হইতে বিদ্যালয়-প্রবেশের পথটী বিচিত্র তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ও বিদ্যালয়-

গৃহ নানাবিধ ধ্বজ পতাকা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। নব নির্ম্মিত প্রশস্ত ভবনটী অভিনব ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের উৎসব-পরিচালকগণ অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিয়া নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা উৎসবের সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রাক্তন ছাত্রগণ বিদ্যালয়গৃহে "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে যিনি চাণক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্য বিশেষ ভাবে দর্শনীয় হইয়াছিল। এন্টিগোনাসের সরল স্বাভাবিক অভিনয় দর্শকবৃন্দের পরমতৃপ্তি সাধন করিয়াছিল।

এলবার্ট হলে পরদিন সন্ধ্যায় সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে, টি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসবে সংগীতের নৈপুণ্য ও নানাবিধ ব্যায়াম-কৌশল-প্রদর্শন এবং নানা ভাষায় আবৃত্তির প্রতিযোগিতা প্রভৃতি দ্বারা দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পরদিন রবিবারে প্রাক্তন ও আধুনিক ছাত্রগণের মধুর মিলন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণের সময়ানুকূল ও যুগোপযোগী বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের সকল প্রকার উন্নতির জন্য যে সকল শিক্ষক প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতির পথ প্রশস্ততর করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলি বাস্তবিক ধন্যবাদার্হ। সন্ধ্যা ৫টায় অভিনব পদ্ধতিতে সুব্যবস্থাপূর্ণ জলযোগে উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাদি নানাবিধ অনুষ্ঠানের পর রাত্রি ৯টায় সভাভঙ্গ হয়।

বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিধাতার আশীর্ব্বাদে ৫০ বৎসর এই বিদ্যালয় সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইয়া সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করিল; সাধারণের অবগতির জন্য ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল।

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ভগবান্ নরদেহে অবতীর্ণ হইয়া মানবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে সকল সাধু, মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতের উজ্জ্বল রত্ন, নব ভাবের ও নববিধানের আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা কেশবচন্দ্র অন্যতম। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহকর্ম্মী ভাই প্রসন্নকুমার সেন এই বিদ্যালয় দুই বৎসর পরে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে নবীন ভারতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী বহুসংখ্যক কর্ম্মী ও মনস্বী আবির্ভূত হইয়া, দেশমাতার সেবায় দেশমাতার প্রকৃত সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। এই বিদ্যালয় প্রথমে বিডন ষ্ট্রীটে একটী ভাড়া বাড়ীতে ছিল, কয়েক বৎসর পরে এই বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবৎ এই বাড়ীতেই আছে।

নৈতিক শিক্ষা এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য, মানুষ চরিত্রবলে বলীয়ান্ না হইলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে চরিত্রবলই প্রধান সহায়, এ বিষয়ে এই বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য অনন্যসাধারণ। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে শিক্ষক ও ছাত্রের এরূপ মধুর মিলন একান্ত দুর্লভ। অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবহিত থাকিয়া, তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকারে সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

প্রশান্ত বাগ্মী ভাই প্রসন্নকুমারের জামাতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক, সুপণ্ডিত মন্মথনাথ দত্ত এম,এ, মহাশয় এই বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

মন্মথবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। নানাকারণে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তাঁহারা বিদ্যালয়ের স্বত্ব বিক্রয় করেন।

বিধান এডুকেশন সোসাইটীর পক্ষ হইতে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ও ভাই প্রমথলাল সেন মহাশয় এই বিদ্যালয় ক্রয় করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহকরূপে বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন।

এই সময় হইতে বিদ্যালয়ের অশেষ উন্নতি দেখা যায়। শিক্ষকগণ ও পরিচালকবর্গ মিলিত ভাবে চেষ্টা করিয়া বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতেছেন।

১৯,৪খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশিষ্ট কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দ্বারা অতি সুচারুরূপে বিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ায়, গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত দর্শকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারা মন্তব্য-পুস্তকে বিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়কে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট মাসিক ২০০৲ টাকা এবং কলিকাতা কর্পোরেশন সাময়িক ২৫০৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন।

—•—

অভিভাষণ

(টাঙ্গাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের অংশবিশেষ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাপুরুষেরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে এবং জনসমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূজারীদিগকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজও গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। আজ এক শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে সে দীপ কেন হীন এবং নিষ্প্রভ হইয়া

পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে আপনাদিগকে চিন্তা করিতে বলি। ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় চারিদিকে তাহার দীপ্তি ও কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিল, তখন বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। আজ সে সকল মন্দিরের দরজা খুলিবার লোক নাই এবং মন্দিরগুলিও ধ্বংসোন্মুখ। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের মধ্যে অনেককে আচারে ব্যবহারে আর ব্রাহ্ম বলিয়া চেনা যায় না বলিয়াই বুঝি, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন।

ব্রাহ্মসমাজও এখন যেন lengthened shadows of the founders of the Church হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ভারতের একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের একটা বিরাট ক্ষেত্র রচনা করিয়া গিয়াছিলেন এবং মানবজীবনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রোগ শোক দুঃখ এবং আধিব্যাধি-প্রপীড়িত পৃথিবীতেই এক নূতন স্বর্গ-রাজ্য-রচনার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—

জগতে আমরা ক'রেছি ঘোষণা
ঘুচাব ধরার কলুষ যাতনা
গড়িব ভুবন নূতন ক'রে।

তাঁহারা একে একে সকলেই প্রায় চলিয়া গিয়াছেন; মাত্র মুষ্টিমেয় জন কয়েক অশীতিপর বৃদ্ধ শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় এখনও ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছেন। এই স্তিমিতপ্রায় প্রদীপ কয়টির আলোকে ব্রাহ্মসমাজের চারিদিকে যে গভীর অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই নিবিড়তা যেন আরও ফুটিয়া উঠিতেছে। তবুও এই সকল অশীতিপর বৃদ্ধের মনে এবং প্রাণে যৌবনের যে তেজ এবং আশা দেখিতে পাই, হায়, হায়! যদি তাহার এক সহস্রাংশও যুবকদের মধ্যে দেখিতে পাইতাম, তবে আমার এই জন্মভূমির মুখশ্রী ফিরিয়া যাইত। আর কি এদেশে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতির ন্যায় দেশকাললোকাতীত মহামানব সকলের জন্ম হইবে না!

চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে একটা রব শুনিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজ এখন তাহার কাজ গুটাইতে পারে, কারণ হিন্দুসমাজ তাহার অনেক মত গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহাই হইত, তবে সে কি সুখের দিন হইত! মহাত্মা রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাম—হে নরোত্তম মহামানব! ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য তোমার যথাসর্ব্বস্বত্যাগ—শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ধিক্কার মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া নেওয়া তোমার সার্থক হইয়াছে!

ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে যাহারা বলে, তাহাদিগকে আজ জিজ্ঞাসা করিতেছি,—

১। দেশ হইতে পাপ দুর্নীতি, এবং ব্যভিচার কি দূর হইয়া গিয়াছে?

২। যাহারা পরস্ত্রী-অপহারক, মদ্যপ এবং ব্যভিচারী, যাহারা নানা দুষ্ক্রিয়ার দ্বারা সমাজকে কলুষিত এবং দেশের নৈতিক হাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় আমরা কি তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া সমাজ-দেহকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি? না, তাহাদিগকেই আবার নৈবেদ্যের সন্দেশের মত সকল সভা সমিতি এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মাথায় বসাইয়া মোড়লী করিতে দিয়া মানবজীবনের উচ্চ আদর্শকে ধূলায় টানিয়া নামাইয়াছি এবং জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছি!

৩। জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং "বারো সেপাহীর তের হাঁড়ী" কি আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে?

৪। অস্পৃশ্য এবং অনাচরণীয় জাতিদিগকে এতকাল ধরিয়া আমরা মানবজীবনের সকল আশা, আনন্দ এবং উত্থানের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে যে পশু করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ এত আন্দোলনের পরেও আমরা কি তাহাদিগের সকলকে মনে প্রাণে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইবার কোনও আয়োজন করিয়াছি?

৫। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের (Father-hood of God and Brother-hood of Man) যে মহান্ এবং উচ্চ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন, এ দেশের লোক কি তাহা গ্রহণ করিয়াছে?

৬। এ দেশের ছত্রিশ রকমের পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিবদমান জাতির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ

এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মন প্রাণ

রূপ যে মহা সাধনার সূচনা করিয়াছেন, ব্রাহ্মেতর সম্প্রদায় সমূহ কি সেই সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন?

৭। মন্দির, মসজিদ্ এবং দেউল নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান্কে একটা চৌহদ্দীর মধ্যে পুরিয়া, মানুষ শুধু সেই জায়গাটাকেই পবিত্র মনে করিত এবং পাপাচরণের অতীত করিয়া রাখিত; কিন্তু তাহার বাহিরে সব জায়গায় শয়তানের লীলা রচনা করিতে এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ করিত না। এই অন্ধবিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন—ভগবানের মন্দির কোনও চৌহদ্দী আঁটা ক্ষুদ্র স্থানে সীমাবদ্ধ নহে—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং, সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি, প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং, ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সারা পৃথিবীটাই ব্রহ্মের মন্দির; এবং যাহা শাশ্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্য, তাহাই শাস্ত্র। ব্রহ্ম নাই এমন কোনও স্থান নাই। যদি কেবল মন্দিরের মধ্যেই ভগবান থাকেন, এই বিশ্বাসে মন্দিরের মধ্যে কোনও পাপ ও মিথ্যাচরণ করিতে ভীত এবং সঙ্কুচিত হও, তবে

সুবিশাল এই পৃথিবীইত সেই ব্রহ্মমন্দির—এ মন্দিরে থুতু ফেলিয়া নোংরা করিবে কি করিয়া? দেশবাসী সকলে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কি গ্রহণ করিয়াছে?

৮। শুধু তাই নহে; ব্রাহ্মসমাজ আপনাপন দেহকেই ভগবানের মন্দির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের মন এই মন্দিরের পূজারী। Temple of God is within you. যে দেহ ভগবানের মন্দির, তাহাকে কেমন করিয়া পাপে মলিন এবং কলঙ্কিত করিবে? যে মন ভগবানের উদ্দেশে অঞ্জলি দিবার জন্য সাধনা করিতেছে, পাপ চিন্তার দ্বারা কেমন করিয়া তাহাকে কলুষিত করিবে? মানবজীবনেই ভগবানের দেউল গঠন করিয়া, তাঁহাকে সকল মনপ্রাণ দিয়া "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তঃ" হইয়া, এই যে এক অভিনব পূজার পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজ প্রচলিত করিয়াছেন, দেশের লোক ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন এই প্রাণময় পূজাপদ্ধতি কি গ্রহণ করিয়াছেন?

৯। সমাজে, সাহিত্যে এবং ছায়াচিত্রে প্রতিনিয়ত উলঙ্গ নরনারীদিগের যে সকল লজ্জাকর ছবি বাহির হইতেছে—কাব্যে, কবিতায় এবং গল্পে যেরূপ জঘন্য রুচিবিকারজনক গংলেখারী রচনা সকল বাহির হইতেছে—দেশের সর্ব্বত্র যে দারুণ দুর্নীতির প্লাবন দেখা যাইতেছে,—যাহার স্রোতে পড়িয়া মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় এবং বরণীয় আদর্শগুলি একে একে ভাসিয়া যাইতে সুরু হইয়াছে,—কই, তাহার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনসমাজ, মণিহারা দলিত ফণিনীর ন্যায় গভীর গর্জ্জনে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে কি? দেশের যুবকগণ যৌবনের অমিত তেজ এবং শক্তি লইয়া কচুরী পানার ন্যায় জনপদধ্বংসকারী এই দূষিত বন্যাপ্রবাহের মুখ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে কি?

১০। সর্ব্বোপরি সমগ্র দেশ কি একেশ্বরবাদী হইয়াছে এবং পরব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য এবং আরাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? এ সব যদি না হইয়া থাকে, তবে বলি যে, ব্রাহ্মসমাজ তুমি বাঁচিয়া থাক—তোমার কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। (ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

শ্রীঈশার জন্মোৎসব—গত ২৫শে ডিসেম্বর, শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর ব্যবস্থামত, শ্রীঈশার জন্মোৎসব উপলক্ষে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

জন্মোৎসব—গত ১৭ই ডিসেম্বর, ৬২।২নং বীডন ষ্ট্রীটে, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে, স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক প্রিয়তম মামুদার (শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের) জন্মদিনের উৎসবে বাজিপোড়ান, সঙ্গীত ও উপাসনা হয়; ডাক্তার সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে মধুর প্রীতিভোজনে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

নামকরণ—গত ২৭শে ডিসেম্বর, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, কেশব একাডেমী স্কুল গৃহে, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের পৌত্রী ও দৌহিত্রীর শুভনামকরণে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পৌত্রীর (শ্রীমান্ সুকুমার দাশ গুপ্তের কন্যার) নাম "শ্রীমতী মিত্রা", দৌহিত্রীর (শ্রীমান্ সুধেন্দুকুমার সেনগুপ্তের কন্যার) নাম "শ্রীমতী তৃপ্তি" রাখা হয়। এই উপলক্ষে মনোরঞ্জনবাবু প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন। বিশ্বজননী শিশুদুইটীকে এবং তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১৪ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর), ঢাকার বিধানপল্লীতে, হাওড়া-নিবাসী ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ কল্যাণকুমারের সহিত, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নীহারিকার শুভপরিণয় নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ এই শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা কলিকাতা নববিধানপ্রচারভাণ্ডারে ৫৲ এবং মুঙ্গের আশ্রম-নির্ম্মাণে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নবগৃহে প্রবেশ—গত ২৫শে ডিসেম্বর, সায়ংকালে, ঢাকুরিয়ায় (বালিগঞ্জ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী) আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের নবগৃহে প্রবেশোপলক্ষে বিশেষ উপাসনার অনুষ্ঠান হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন এবং কৈলাসবাবু ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। বন্ধুবান্ধব অনেকেই এই মধুর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

উৎসব—২৩নং রামকান্ত সেন লেনে, উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, গত ২৪শে ডিসেম্বর, প্রাতে ৭টায় নগর সংকীর্ত্তন, ৮॥টায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত উপাসনা করেন। ১০টায় কানাইলাল সেনের স্মৃতিসভা, ১০॥টায় বার্ষিক সভা হয়। অপরাহ্ণ ৫টায় শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভড় শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মল্লিক "সমাজসংস্কারে ধর্ম্মের দান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সেবা—ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার ভ্রাতা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় রেঙ্গুনে অবস্থানকালে, একদিন ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদারের গৃহে উপাসনা, আহার ও ধর্ম্মালোচনা হয়। ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করেন। রেঙ্গুনে ইঁহারা শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদারের গৃহে কয়দিন থাকিয়া, তাঁদের সেবা ও পরিচর্য্যায় অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত দুইটী শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ২৩শে ডিসেম্বর, রূপসায়, বালেশ্বরের আমাদের শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ পুত্র, স্বর্গগত ভাই আশুতোষ রায়ের জামাতা শ্রীমান্ অভয়চন্দ্র দাস জ্বর ও রক্তামাশয়ে, বৃদ্ধপিতা, সহধর্ম্মিণী, চারিটী অপগণ্ড শিশু ও আত্মজন পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গত ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর, শেষ রাত্রি ৩টার সময়, ৩নং রায় ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাসগুপ্তের সহধর্ম্মিণী, ময়মনসিংহের ডাক্তার স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ রায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা (সকলের আদরের ফুল) প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে, হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া, প্রিয়তম পতি, ৯ বৎসরের একটী পুত্র ও ৮।৯মাসের একটী শিশুকন্যা, বৃদ্ধা মাতা, ভাইবোন, আত্মজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে পিতৃসন্নিধানে চলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—টাঙ্গুর (বর্ম্মা) অ্যাডভোকেট স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বানার্জির কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিনীতার পরলোকগমনে তাঁর পুণ্যস্মৃতিতে, মাতৃদেবী শ্রীমতী চারুবালা প্রচারভাণ্ডারে ২৲, ভগ্নীসমিতিতে ৩৲, প্রেমাশ্রমে ২০৲ এবং গরিবদের সাহায্যার্থ ৫৲, এবং ভগ্নী শ্রীমতী পতিমা প্রচারভাণ্ডারে ৪৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফাণ্ডে ৪৲, জনৈক গরিব বিধবাকে ২৲ এবং প্রেমাশ্রমে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অরুণাশোভা পিতৃদেব স্বর্গীয় মনোগতধন দের সাম্বৎসরিক দিনের পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় সুহাসকুমারের পুণ্যস্মৃতিতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে কোন দুস্থ বালকের সাহায্যার্থ ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে নবেম্বর, ৬৩নং ল্যান্সডাউন রোডে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর, ৪৬এ রমেশ মিত্র রোডে, কেশব একাডেমী স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সিংহের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

অদ্য ১০নং নারিকেল বাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে পুত্রকন্যাগণ ৩৲ এবং কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২১শে ডিসেম্বর, স্বর্গগত ভাই আশুতোষ রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজিনী রায় প্রার্থনা করেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর, ৬১।২ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং মাতৃদেবী প্রার্থনা করেন।

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতি।

(মণ্ডলীগত ও পারিবারিকভাবে সাধনীয়)

কার্য্যপ্রণালী।

১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭, ১৭ই পৌষ, ১৩৪৩, শুক্রবার—প্রাতে ৬।০টায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা-পাঠ এবং ৯টায় উপাসনা। "রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ"।

২রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, শনিবার—"নববিধান" এবং "শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"।

৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, রবিবার—"মাতৃভূমি"। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৪ঠা জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, সোমবার—"গৃহ"।

৫ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, মঙ্গলবার—"শিশুগণ"।

৬ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, বুধবার—"ভৃত্যগণ"। স্বর্গগত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। রাত্রে প্রচারকার্য্যালয়ে ভৃত্যসেবা।

৭ই জানুয়ারী, ২৩শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—"দীনগণ"।

৮ই জানুয়ারী, ২৪শে পৌষ, শুক্রবার—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের ত্রিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক। কমলকুটীরে প্রাতে ৬টায় নাম-পাঠ ও ৯টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে স্মৃতিসভা।

৯ই জানুয়ারী, ২৫শে পৌষ, শনিবার—"মহাজনগণ"।

১০ই জানুয়ারী, ২৬শে পৌষ, রবিবার—"জনহিতৈষিগণ" সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১১ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, সোমবার—"উপকারিগণ"।

১২ই জানুয়ারী, ২৮শে পৌষ, মঙ্গলবার—"বিরোধিগণ"।

১৩ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ, বুধবার—"চিত্তশুদ্ধি"। ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় মহিলাদিগের বিশেষ উপাসনা ও রাত্রি ১২টায় "জাগরণ"।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে (৭৮বি, অপার সার্কুলার রোড) ১লা ও ৮ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতে ৮টায় উপাসনা।

ব্রহ্মমন্দিরে ৩রা, ৮ই, ১০ই ও ১৩ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রসঙ্গ হইবে।

আচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দের "মাঘোৎসব" পুস্তক পাঠ করিয়া বিভিন্ন দিবসের প্রস্তুতি সাধনায় ভাবগ্রহণ প্রার্থনীয়।

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসব।

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।)

১লা মাঘ, ১৩৪৩, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬।০টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬।০টায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশানবরণ।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, রবিবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬।০টায় বক্তৃতা।

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬।০টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, বুধবার—শ্রীদরবারের উৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬।০টায় বার্ষিক সভা।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, শুক্রবার—সুনীতিশিক্ষালয়ের পুরস্কার-বিতরণ।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে বিধানমুরলী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, রবিবার—[illegible] উৎসব। প্রাতে ৭।০টায় কীর্ত্তন, [illegible] উপাসনা; অপরাহ্ণ ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫।০টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার—নববিধান-ঘোষণার দিন; প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ণে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ৫।০টায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইবে।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রাতে ৯টায় মঙ্গলবাড়ীর উৎসব।

১৪ই মাঘ ২৭শে জানুয়ারী, বুধবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৯টায় আর্য্যনারীসমাজের ও ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব। প্রাতে কেশব একাডেমী স্কুলের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৯টায় ১২।১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অনাথ আশ্রমে উৎসব। সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, অপরাহ্ণ ৫টায় প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, বালকবালিকাসম্মিলন ও পুরস্কার-বিতরণ। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, রবিবার—সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, তৎপর কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে শান্তিবাচন।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

ভক্তির অঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন,

মায়ের আহ্বানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাগমে যে মহোৎসব হয়, তাহাই ভক্তির পরম তীর্থ ও পবিত্র সেবার ক্ষেত্র। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সকলের সেবা করার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? ভক্তি ও সেবার ভাবে যথাসাধ্য শক্তি ও অর্থদান এখানেই সম্যক্ সার্থক হয় এবং অনন্ত স্নেহময়ী জননীর প্রচুর আশীর্ব্বাদও লাভ হয়। ভক্তির অঞ্জলিরূপে এই মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, ১৯এসি, পার্ক ষ্ট্রীট ঠিকানায় সম্পাদকের নামে, অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার নন্দের নামে যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ১০ই ও ১১ই মাঘ ঝুলি ধরা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

বিনীত—
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীগিরিজানাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।